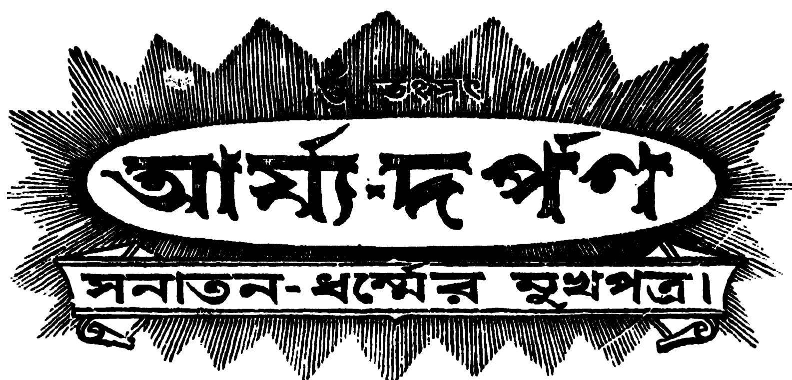
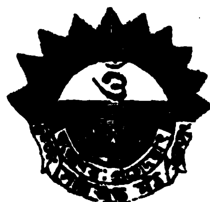


আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্বিজয়তাদ্বিপশ্চিতা
মর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ॥



আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে
তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ—১৩৩৮

সম্পাদক—শ্রীমৎ সত্যচৈতন্য ব্রহ্মচারী

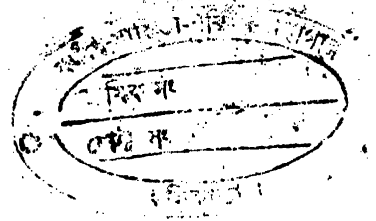
বার্ষিক মূল্য—২॥০ প্রতি সংখ্যা—।০

বর্ষসূচী

(বর্ণমালানুসারে)

---*---

বগুড়া
ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং মেসিন প্রেস হইতে
শ্রীশক্তিচৈতন্য ব্রহ্মচারী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২৪শ বর্ষ | ১ম খণ্ড

বৈশাখ—১৩৩৮।

সমষ্টি সং ২৫২ | ১ম সংখ্যা

অক্ষয়-তৃতীয়ায়

আমার শুভ ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার সহায় একমাত্র তোমরা। একদিন মুষ্টিমেয় কয়টীকে লইয়াই আমার কার্য্যের সূত্রপাত হয়। আমি কাহাকেও ডাকিয়া আনি নাই। আমার বিভূতি দখিয়া কেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমার শরণাপন্ন হয় নাই। যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের আর কোন হেতু নাই, আমাকে ভালবাসিয়াছিল তাহারা। আমি একজায়গায় বসিয়া বিশুদ্ধ সঙ্কল্পই করিয়াছিলাম। সেই সঙ্কল্পের অদৃশ্য আকর্ষণের ফলেই তোমাদের মিলন!

তোমাদের জীবনের ভাবে-কর্ম্মে ভাগবত-প্রেরণা নামিয়া আসুক! তোমরা সঙ্কল্পসিদ্ধির দরুণ অক্ষয়-বীর্য্য লাভ কর!

আমার সিদ্ধি তোমাদের চারিত্রিক বল এবং নির্ম্মলতার উপর নির্ভর করে। তোমরা যেন আমার ভাবের পথে বিঘ্ন না হও!

এই দেহ দিয়াই কাজ হবে তবে ইহার রূপান্তর চাই। তোমরা নির্ভীক সাধক—এই জন্যই আত্মদানে তোমাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নাই। আজ অক্ষয়-

তৃতীয়ায় তোমাদের কি আশীর্ব্বাদ করিব ? তোমরা মানুষ হইয়া উঠ, এই আমার আশীর্ব্বাদ !

আমার মায়া নাই, কিন্তু আমি তোমাদের ভালবাসি ! এই ভালবাসা দিয়াই, তোমাদের জীবন গড়িয়া উঠিবে। ভালবাসা সব চেয়ে সেরা—আমার কাছে যাহারা অন্য কিছু দাবী কর, তাহারা বঞ্চিত হইবে ! আর দেখিতেছও আমার প্রতি যাহাদের নিছক ভালবাসা রহিয়াছে, তাহারাই আমার কাজকে, আমার ভাবকে, আমার আদর্শকে বুক দিয়া জড়াইয়া দরদীর মত নিঃস্বার্থ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

আমার বলিয়া যদি আমি একটীকেও পাই, তাহাই আমার পরম লাভ ! পরীক্ষার ভিতর দিয়াই সেই বাছাই হইয়া যাইতেছে ! আমার অনুভূতি সত্য, কাজেই বাস্তবজগতেও তাহার অনিবার্য্যরূপ একদিন না একদিন ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে ! তোমরা আমার সাহায্যকারী—আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাকেই রূপ দিতে তোমাদের এই অকুণ্ঠ-আত্মদান !

অক্ষয়-তৃতীয়াতেই তোমাদের নব-জীবনের দীক্ষা ! এই দিনটীর সঙ্গে আমার ভাবের এবং তোমাদের প্রাণের যোগ রহিয়াছে। সেই শুভ-দিনে, শুভ-লগ্নে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ তোমাদের আত্মদান, তাহার অক্ষয়-স্মৃতিতে আজ আবার তোমরা নূতন হইয়া উঠ !

তোমরা মানুষ হইতে, সাধু হইতে আসিয়াছিলে, আর কোন কামনা-বাসনা নাই তোমাদের ! নব-বর্ষে নব-দীক্ষার দিনে মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করিয়া দেখ, কোথায়ও স্বার্থে, প্রলোভনে আদর্শচ্যুত হইয়াছ কিনা। দীক্ষার মন্ত্র ভুলিয়া গেলে, আর উদ্ধারের উপায় নাই ! অধিকারী হওয়া সব চেয়ে বড় কথা। তোমাদের সাধনা সেই অধিকার অর্জ্জনের দরুণই। অহঙ্কার আসিয়া মাঝখানেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দেয়, সেই জন্যই সমর্পণের পথ ধরিয়া চলিলে আর কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না !

মানুষ দুই দিনেই প্রতিষ্ঠা চায়, প্রভুত্ব চায়, এই জন্যই সমর্পণের ধারা ধরিয়া চলিতে তাহাদের এত আপত্তি ! এই অপূর্ণতা লইয়াই কত মানুষ পূর্ণতার অভিনয় করিয়া যায়—কিন্তু হইলে কি হইবে, সেই জীবনের কোন সাত্ত্বিক প্রেরণা সঞ্চারের ক্ষমতা নাই। অভিনয়ে একদিন না একদিন আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়ই হয়। তোমরা অভিনয় ছাড়, নিখুঁত ভাবে মানুষ হইয়া উঠ, অক্ষয় বীর্য্য লাভ করিয়া এই মর্ত্ত্য জগতেই অমৃতানন্দ অনুভব কর—ইহাই আমার অভিলাষ এবং আশীর্ব্বাদ !!

—

প্রার্থনা

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়াপিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

বেদবাক্যের মধ্যে যিনি প্রধান, যিনি সর্ব্বব্যাপ্তি-হেতু বিশ্বরূপ, যিনি বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি অমৃতত্ত্বের, মোক্ষের উপায় (The means of obtaining immortality) সেই ইন্দ্র অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী আমাকে প্রজ্ঞা দ্বারা বলবান্ করুন!

সবল—মেধাবী সাধকই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী! এইজন্যই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু প্রার্থনা করিতেছেন—আমাকে মেধা দ্বারা সবল করুন। আমি যেন দুর্ব্বল না হই।

প্রজ্ঞালাভের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার হৃদয়ে বল উৎপন্ন হয়। আর যথার্থ প্রজ্ঞা লাভ হইলে বল উৎপন্ন না হইয়া পারে না—কেননা প্রজ্ঞার ভিতর দিয়াই বিরাট, ভূমা মহান্ ব্রহ্মের অনুভূতি আসে। সেই অজর-অমর-অক্ষয় অনুভূতিতে মানুষের মেধা পরিপুষ্ট হয়। এইজন্যই বলা হইয়া থাকে যে, সত্যের চেয়ে আর বড় বল নাই। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সেই সত্যকে জড়ে চেতনে সমদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এই প্রত্যক্ষানুভূতিই পরম বলের উৎস। যাঁহারা এই বজ্রদৃঢ় ব্রহ্মানুভূতি পাইয়াছেন, তাহাদের ভয় নাই, দুঃখ নাই, জড়া নাই, আধি, ব্যাধি কিছুই নাই। তাহারা তখন ব্রহ্মের বলে বলবান, ব্রহ্মের দীপ্তিতে দীপ্তিবন্ত, ব্রহ্মের বিমল আভায় উদ্ভাসিত—এককথায় বলিতে গেলে, তাহারা তখন দেহে-মনে-প্রাণে ব্রহ্মময় হইয়া যায়। সাধকের পরম সিদ্ধিই হইল এই তন্ময়তা লাভ।

মেধার মাঝে, অনুভূতির মাঝে দুর্ব্বলতা থাকিলে বিরাট ব্রহ্মের সম্যক অনুভূতি আসিতে পারে না! এইজন্যই অটলবীর্য্য, অক্লান্ত মেধার প্রয়োজন। বীর্য্য আর স্মৃতি এই দুইটী সম্পদ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। দুর্ব্বল সাধক, নির্ব্বিকল্প সমাধি (যাহাকে বলা হয়—The Terrible door leading to the gulf of the Absolute) লাভ করিতে পারে না। তাহার ভয় আসে, আতঙ্ক উপস্থিত হয়, এমন কি বীর্য্যের অভাবে, স্মৃতির বিপর্য্যয়ে পাগল পর্য্যন্ত হইয়া যায়। এইজন্যই অক্ষত বীর্যের প্রয়োজন—অটুট স্মৃতির প্রয়োজন। ব্রহ্মোপলব্ধির করণে দুর্ব্বলতা থাকিলে, উপলব্ধির বন্যায় সব ভাঙ্গিয়া-চুড়িয়া চুড়মার হইয়া যাইবে। ব্রহ্মকে ধারণা করা বড় শক্ত কথা সেই Terible doorকে অনেকেই ভয় করিয়া পিছাইয়া আসে।

মেধা বলিতে কেবল পুস্তক মুখস্থ করাকে বুঝায় না। অজকালকার অনেক মেধাবীর মাঝেই বেশ রীতিমত দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। তাহারা বুদ্ধি দ্বারা সব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিতে চায়, এমন কি করেও; কিন্তু তবু তাহাদের ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধির দুর্ব্বলতা অপসারিত হয় না। তাহারা কবি হয়, দার্শনিক হয়, বড় বড় বচন আওড়ায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের যে সংযম-শক্তি সেইটুকু পর্য্যন্ত তাহাদের আয়ত্ত নাই। তাহারা মেধাবী, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায়, মনের চঞ্চলতায় প্রশান্ত হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা সব বুঝে, অথচ কোন দুর্ব্বলতার হাত হইতে নিজকে সংরক্ষণ করিতে পারে না। এইজন্যই ব্রহ্মোপলব্ধির মেধা

আলাদা বস্তু, তাহা লাভ হইলে মানুষ মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত হয়।

ব্রহ্মের অনাবিল স্মৃতি, সবল মেধা থাকিলেই হয়। এইজন্য প্রথমেই ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, মেধয়া স্মৃণোতু, আমার মেধা যেন পরিপুষ্ট হয়। মেধার মাঝে যেন কোন দুর্ব্বলতা না থাকে। ব্রহ্মকে স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, কাজেই প্রথমেই স্মৃতির বৈশারদ্য প্রয়োজন। আর স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিতে হইলে সবল মেধাই তাহার একমাত্র সহায়।

বীর্য্যের অভাবেই মালিন্য আসে, আবিলতা আসে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া উঠা যায় না। কিন্তু অটুট-বীর্য্যের তেজস্বীতায় ব্রহ্মের উজ্জ্বলরূপ প্রকট হইয়া পড়ে। এইজন্যই ব্রহ্মোপলব্ধির সাধক মাত্রেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছুর সকল দিক দিয়াই যোগ্যতা থাকা চাই। ভগ্ন স্বাস্থ্য, দুর্ব্বল শ্লথ ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মকে বিকৃতভাবে উপলব্ধি হয়। ঋষিদের চতুরাশ্রমের মূলে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা কোন কিছুকেই অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু সংযমের ভিতর দিয়া প্রত্যেক জিনিষেরই পরিণতি আনয়নে সচেষ্ট ছিলেন।

অপরিণত দেহ মন বুদ্ধি লইয়া ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে গিয়া অনেকেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভুল মত প্রচার করিয়াছেন! ঋষিদের মাঝে এই উগ্রতা ছিলনা, একদেশদর্শিতা ছিলনা, তাঁহারা দেহে-মনে-প্রাণে ঋষি ছিলেন! তাঁহারা শুধু বুদ্ধিতে, শুধু কর্ম্ম-ক্ষমতায়, শুধু কৃচ্ছ্র-সাধনায় পরিতৃপ্ত হন নাই, সকল অঙ্গের, সকল মতের সামঞ্জস্য করিবার দরুণ একান্ত ব্যাকুলতা ছিল তাঁহাদের। অঙ্গহানি রাখিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিয়া তাঁহারা বসিয়া থাকিতেন না। যাঁহার যে দিকে অভাব, সেই অভাব পরিপূরণার্থে শিশুর মত তাঁহাদের সরলতা আর ঐকান্তিকতা ছিল। এইজন্যই ব্রহ্মজ্ঞান হইল সকল মতের, সকল পথের সামঞ্জস্যস্থল।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চেয়েও, ব্রহ্মজ্ঞান ধারণা করিয়া রাখা বড় শক্ত। যে-কোন কারণেই হউক কোন দিক দিয়া দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতা থাকিলে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানই বিকৃতরূপে প্রকাশ পায়! সব দেহ-মন-প্রাণের উপরই সব নির্ভর করে! কোনদিক দিয়াই মালিন্য রাখিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল-দীপ্তিলাভের আশা করা বৃথা।

ধারণ করিয়া রাখিবার শক্তিই হইল আসল! মানুষ সাময়িকভাবে কত ভাল জিনিষই পায়, কিন্তু তাহা সংরক্ষণ করিতে পারে না বলেই যেই দৈন্য সেই দৈন্যই থাকিয়া যায়। ধারণা-শক্তি যাহার যত প্রবল হয়, সেই তত উন্নত অধিকারী। ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শক্তিও উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানকে ধারণ করিতে হইলে পরিপুষ্ট মেধার প্রয়োজন, তাহার পর শুধু মেধা থাকিলেই হইল না। ব্রহ্মানুভূতিকে শরীরময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইবে, কাজেই বজ্রদৃঢ় শরীরও চাই।

ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন "আমার জিহবা যেন অতিশয় মধুরভাষিণী হয়", কাজেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই যে অষ্টপ্রহর অভিশাপ দিবার দরুণ প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। দেহে-মনে-প্রাণে-বাক্যে ব্রহ্মকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিবার দরুণ কি উদগ্র ব্যাকুলতা! ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াই থাকেন না, ব্রহ্মানুভূতির প্রশান্ত প্রেরণায় সকল দিকেই সামঞ্জস্যের সুর বাজিয়া উঠে। বাস্তবিকই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীর কথায় যেন মধু বর্ষণই হইয়া থাকে। কত তাপিত প্রাণ সেই অমৃত মধু-বর্ষণে পুনরুজ্জীবিত হইয়া

উঠে। জ্ঞানী হইলেও রূঢ় ব্যবহারে, রূঢ় ভাষায় অনেকের চিত্ত আহত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী কাহারও হৃদয়কে কোনদিক দিয়া এতটুকু আঘাত প্রদান করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন। জ্ঞানলাভ করিবার ফল যদি দাঁড়ায় অভিমান, ক্রোধ, তাহা হইলে সে জ্ঞানের কোন মূল্যই নাই।

প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে যাহারা অজ্ঞানী তাহাদের মুক্তির দরুণ সস্নেহ-ব্যাকুলতা জন্মে। তখন মনে হয়, মিষ্ট কথায়, মিষ্ট আচরণে কি করিয়া পতিতের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা যায়। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞানীর আচরণে তখন কিছুমাত্র ক্ষোভ বা অভিমানের লেশ থাকে না। লোকহিত প্রেরণায় তাঁহাদের সকল অহঙ্কার অভিমান অপসারিত হইয়া যায়।

"আমি যেন কর্ণে বহু শ্রবণ করি।" জগত হইতে বিমুখ হইয়া কূপ-মণ্ডুকের মত কৈবল্য-গুহায় আশ্রয় লইয়া বসিয়া থাকিতে ঋষিরা কখনো অভিপ্রায় করেন নাই। সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ছিল ব্যাপ্তিবোধ, কোথায়ও সঙ্কোচের চিহ্ন নাই। অদ্বৈতানুভবের মহাবীর্য্য ধারণ করিয়া তাঁহারা আর মর্ত্ত্যমানবের ন্যায় দুর্ব্বল ভীরু থাকিতেন না, তখন তাঁহাদের প্রাণ অজর-অমর অনুভূতিতে পূর্ণ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিত।

ঋষিদের প্রত্যাখান নাই কোথায়ও, সবকেই আত্মগত করিয়া লইবার মত দুর্লভ বীর্য্য তাঁহাদের ছিল। এইজন্যই দেখি, বৈদান্তিকের ধ্যানের কোন সময় নাই, গোপনতা নাই। বিশাল জগতের পানে চক্ষু মেলিয়াও দেখি বৈদান্তিক ভাব-সমাধিতে বিভোর-আত্মস্থ। কোলাহলের মাঝেও আত্মভাবে মস্‌গুল হইয়া থাকিবার সামর্থ্য রহিয়াছে বলিয়াই ঋষি লোকসমাজ হইতে পলায়ন করিয়া আত্ম-ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে চাহেন নাই। বহির্জ্জগতের কোলাহল আসিবে বলিয়া কাণ বন্ধ করিয়া থাকেন নাই তাঁহারা—বরঞ্চ বহু শ্রবণমানসে কর্ণকে উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। মার্কিণ কবি বৈদান্তিক ওয়াল্ট্ হুইটম্যানেরও এমনি একটি উক্তি রহিয়াছে। তিনিও "Song of myself"এ একজায়গায় বলিয়াছেন "You shall listen to all sides and filter them from within". একই কথা। তিনিও বহির্জ্জগতের সবকেই গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আত্মরসে অভিসিক্ত করিয়া। তাহা হইলেই বৈদান্তিকের কিরূপ শক্তিশালী অব্যর্থ বীর্য্য তাহারই পরিচয় পাওয়া গেল। অদ্বৈতানুভবের মহাজ্যোতি যাহাদের ভিতর জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আর কোথায়ও দীনতা নাই, এই বিশ্ব-সংসারে তাহাদেরই একচ্ছত্রাধিপত্য।

সর্ব্বশেষে ঋষি বিনীত হইয়া প্রার্থণা করিতেছেন—ওঁকাররূপী ব্রহ্মোপলব্ধির কোশকে। কেননা প্রণবের মাঝেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান! লৌকিক প্রজ্ঞা দ্বারা প্রণবের মাহাত্ম্য বুঝা দুষ্কর, এই জন্যই ব্রহ্মের কোশ প্রণব সামান্য প্রজ্ঞার অবিদিত। মেধা দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না, যদি না তিনি স্ব-মহিমায় প্রকাশিত না হন!

—

সত্ত্বগুণ।

সাংখ্যকারিকার গৌড়পাদ ভাষ্যে সত্ত্বগুণের বেশ সুন্দর লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকংচ যদা সত্ত্বমুৎকটং ভবতি তদা লঘূন্যঙ্গানি বুদ্ধি-প্রকাশশ্চ প্রসন্নতেন্দ্রিয়ানাং ভবতি।"

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক। সত্ত্বগুণ যখন উৎকট হয় অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবের চরম সীমায় উঠিতে পারিলে অঙ্গাদি লঘু হয়, বুদ্ধি প্রকাশক এবং ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হয়।

এই শ্লোকে দুইটি কথাই বিশেষ মূল্যবান্। একটি হইল বুদ্ধি প্রকাশক হওয়া আর একটি ইন্দ্রিয় প্রসন্ন হওয়া। সাধারণতঃ আমাদের বুদ্ধি জড়গ্রস্থ, তমোদ্বারা আচ্ছন্ন তাই সহজে একটা কথা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। কোন একটা বিষয় বুঝিতে আমাদের এত দেরী লাগে। কিন্তু দেহ-মন-বুদ্ধি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলে, তখনই Spirituality inspires intellect, আর তখনই প্রকৃত Genius লাভ হয়। বুদ্ধি সম্প্রসাদযুক্ত হইলেই বুঝিতে হইবে, ভিতরে সাত্ত্বিকগুণ উৎপন্ন হইয়াছে।

বুদ্ধির উপর যখন আত্মার আলো পতিত হয়, তখন বুদ্ধিও আর একরূপ ধারণ করে। তখন বুদ্ধি নিম্নাভিমুখী না হইয়া উর্দ্ধাভিমুখী হইয়া যায়। ইহাই প্রকৃত বুদ্ধিযোগ, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ইহারই কথা বলিয়াছেন। এই বুদ্ধিযোগ দ্বারাই ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়। বুদ্ধি সম্প্রসাদযুক্ত না হইলে ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ ভাব আসেনা, আর ভিতরে একবার দুইবার সাত্ত্বিক ভাব আসিলেই তাহাতে বড় কিছু হয়না। চাই একটানা প্রবাহ। আর এই প্রবাহ চলিতে পারে, যদি মন বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়, পবিত্র হয়।

সাত্ত্বিক মানুষের বুদ্ধি প্রকাশক হয়, অর্থাৎ তাহাতে কোন আবরণ কিম্বা মোহ থাকেনা। আর সেই বুদ্ধি আত্মাকেই প্রকাশ করে, নিজে স্বচ্ছ হইয়া যাওয়ায় আত্মার বিশুদ্ধ জ্যোতি ধারণে সক্ষম হয়। তখন এই বুদ্ধিই বিষয়ের প্রতি ধাবিত না হইয়া, আত্মার দিকে ফিরিয়া তাকায়। ভিতরে সাত্ত্বিকগুণ উৎপন্ন হইলেই এইজন্যই রুচি ও বদলাইয়া যায়, মন-বুদ্ধি তখন আত্মানুশীলনেই বিশেষ আনন্দ লাভ করে।

বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় Spirtiuality (আধ্যাত্মিক ভাব) দ্বারাই, তাই মানুষ সাত্ত্বিক হইতে না পারিলে, তাহার ভিতর বুদ্ধি প্রতিভার দিব্য স্ফুরণ হয় না। আর বুদ্ধি বিশারদ না হইলে (অর্থাৎ Refined না হইলে,) সেই বুদ্ধি জগতের আসল রহস্য (Riddle) আবিষ্কারে সমর্থ হয় না। সেইজন্যই শাস্ত্রানুশীলনে বিশারদ বুদ্ধি থাকা চাই, তাহা না হইলে, শাস্ত্র হইতে অমৃত সঞ্চয় করিতে না পারিয়া নিছক তর্ক-যুক্তিতেই দিন অতিবাহিত করিতে হয়।

শুধু পাণ্ডিত্য দ্বারা বুদ্ধি বিশারদ হয়না। বুদ্ধির বৈশারদ্য সাধনা দ্বারাই জন্মে। এইজন্যই বুদ্ধিকে প্রকাশক করিতে হইলে, নিজকে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইতে হইবে। আর সাত্ত্বিকভাব লাভ করিতে হইলেই, সাধনা সংযমের প্রয়োজন হইবে।

আমাদের ভিতর মলীমতা বেশী বলিয়াই এক একটা বিষয়কে বুঝিতে, আত্মগত করিতে এত সময় লাগে আমাদের, কিন্তু প্রতিভার স্ফুরণ হইলে, সকল গুহ্য অর্থই যেন বিদ্যুতের মত মনের মাঝে চমকাইয়া উঠে। আর এই যে বুদ্ধির বিশুদ্ধ দীপ্তি, শরীর-মন সাত্ত্বিকযুক্ত না হইলে তাহা

লাভ হয়না। বিশ্লেষণবুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়কেই (As a whole) সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না। এই-জন্যই বিশ্লেষণে অনেক অসম্পূর্ণতা এবং গলদ থাকিয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধি স্বচ্ছ নির্ম্মল হইয়া গেলে, বিষয়ের আসল তত্ত্ব তাহাতে ধরা না দিয়া থাকিতে পারেনা।

বুদ্ধি সূক্ষ্ম এবং প্রকাশক দুই-ই হওয়া চাই। শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ স্থূল বুদ্ধি দ্বারা আবিষ্কার করা যায়না। আবার নিছক সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইলেই সত্য আবিষ্কার হয় না, বুদ্ধির বিশুদ্ধতা চাই। এক কথায় বলিতে গেলে খুব Sensitive হওয়া চাই। আবার সেই Sensitiveness টা বলিষ্ঠ দৃঢ়-আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা শোধিত হওয়া চাই, তখনই শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য লাভ করা যায়। সাধক হইতে না পারিলে বুদ্ধি সাধারণতঃ নিম্ন ভূমিতেই বিচরণ করে। আর এইজন্যই সাধারণ মানুষ বুদ্ধি দিয়া কোন একটা মহৎ বস্তু লাভ করিতে পারেনা।

বুদ্ধি সূক্ষ্ম এবং দ্যোতিসম্পন্ন হইলেই তাহার চরম সার্থকতা হইল। বুদ্ধি অনুশীলন দ্বারা মার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু সাধনা দ্বারা তাহার আন্তরিক বিশুদ্ধতা ঘটে বলিয়াই, বাহিরের অর্থ ছাড়াও অন্তর হইতে এক নূতন অর্থ ব্যঞ্জিত হইয়া উঠে। সেই অর্থ বইএর ধার ধারে না, মন হইতে আপনি তাহা উৎপন্ন হয়। এইজন্যই সাত্ত্বিক মানুষ বিশেষতঃ সাধকদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং সাধারণ মানবের শাস্ত্র ব্যাখ্যাতে রাত দিন-পার্থক্য থাকিয়া যায়। সাত্ত্বিক মন বুদ্ধি দ্বারা সাত্ত্বিক অর্থই প্রদ্যোতিত হইয়া উঠে, কিন্তু স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ সেই অর্থের কোন মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে না।

বুদ্ধি সাত্ত্বিকভাবযুক্ত না হইলে তাহা Penetrating অর্থাৎ কোন বিষয়েরই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। আর এইজন্যই অমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা কেবল উপরভাষা অর্থই ধরা যায়, কিন্তু নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কারে সমর্থ হওয়া যায়না না। শরীর-মন-বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া যত সূক্ষ্ম হইবে, ততই অনুভূতি উচ্চ উচ্চ স্তরের লাভ হইতে থাকিবে।

দৈবীপ্রকৃতির আশ্রয় লইতে না পারিলে, সাত্ত্বিক বুদ্ধিরও স্ফুরণ হয় না। সাধারণ মানুষ আসুরী প্রকৃতির কবলে কবলিত, তাই ঊর্দ্ধ-জগতের কোন তোয়াক্কাই রাখে না সাধারণ লোক। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, মন যদি একবার দৈবী প্রকৃতিতে আশ্রয় লইতে পারে, তাহা হইলে আর কোন চিন্তাই থাকেনা। ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

দৈবীপ্রকৃতি হইতেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির উদ্ভব। এই বুদ্ধি আত্মার পক্ষে অনুকূল, এই বুদ্ধি দ্বারাই ক্রমশঃ মানুষ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হইতে পারে। কিন্তু মলিনা-প্রকৃতি বা আসুরী-প্রকৃতি হইতে যে-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা মানুষকে নিম্নস্তরে নামাইয়া আনে। কাজেই প্রকৃতির তারতম্যেই বুদ্ধিরও বিপর্য্যয় ঘটে। সাত্ত্বিক মানুষের বুদ্ধিই একরকম, আর অসাত্ত্বিক মানুষের বুদ্ধিই একরকম। বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া একজনার হয় আত্ম-সাক্ষাৎকার, আর একজনের হয় নিম্নবিষয়ের প্রতি গতি। কাজেই দৈবী-প্রকৃতির আশ্রয় লইতে না পারিলে বুদ্ধিরও মালিন্য থাকিয়া যায়। দৈবী-প্রকৃতির বিশুদ্ধাংশই বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি আর দৈবী-প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নাই।

বুদ্ধি যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেই বুদ্ধির সহায়ে জ্ঞানও বিকাশ লাভ করিতে পারেনা। বুদ্ধি হইবে স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ এবং পবিত্র, সেই দ্যোতিসম্পন্ন বুদ্ধির ভিতর দিয়াই জ্ঞান

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু বুদ্ধি যদি মার্জ্জিত না হয়, সূক্ষ্ম না হয়, প্রকাশক না হয়, তাহা হইলে আসল জ্ঞানলাভ হইবে কেমন করিয়া? এইজন্যই অমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রানুশীলন হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না তাহাতে।

আসল কথা হইল, দেহে-মনে-বুদ্ধিতে সাত্ত্বিক হওয়া চাই। আর সত্ত্বগুণ উৎকট না হইলে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের চরম সীমায় না পৌছিলে করণের মাঝে মালিন্য, সংস্কার থাকিয়া যায়ই যায়। এইজন্যই দেহ-মন-বুদ্ধিকে জ্ঞান প্রকাশের যথোপযুক্ত উপকরণ করিয়া লইবার দরুণ যথাসাধ্য সাধনা করিতে হয়।

সত্ত্বগুণ সহজে লাভ হয় না, তাহার দরুণ নিয়মিত সাধনা চাই। সাত্ত্বিক মানুষের সবই লঘু হইয়া যায়। আত্মার ক্ষুধা খুব কম, অল্পেই তাহার পরিপুষ্টি, কিন্তু শরীরকে আত্মানুভব, দ্বারা তন্ময় করিতে পারিনা বলিয়াই, দেহের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া আমাদের বহু উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। খাওয়া-পড়া সর্ব্বদিকেই সংযম চাই। কিন্তু মানুষের ভিতর একটা রাক্ষসও রহিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ চাপিয়া ধরিলে তাহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া যায়। এইজন্যই আস্তে আস্তে খোরাক কমাইয়া তাহাকে কাবু করিয়া নিতে হয়। গীতাতেও উপদেশ আছে "যুক্তাহার বিহারস্য"—কাজেই বাড়াবাড়ি করিতে নাই। সাত্ত্বিকগুণ এক দিনেই অর্জ্জিত হয় না, দেহ-মন-বুদ্ধি, ক্রমশঃই আত্মাভিমুখী হয়। তাহাদিগকে অতিরিক্ত চাপ দিয়া মারিয়া ফেলাও অন্যায়, আবার চাপ না দিয়া প্রশ্রয় দেওয়াও অন্যায়। কাজেই ধীরে-সুস্থে সবকেই সাধনার অনুকূল করিয়া লইতে হইবে।

এখন দ্বিতীয় কথাটি নিয়ে আলোচনা করিব। দ্বিতীয় কথাটি হইল এই যে, সত্ত্বগুণ যখন উৎকট হয়, তখন ইন্দ্রিয় সকলও প্রসন্ন হইয়া ওঠে"। তৃপ্তি না পাইলে প্রসন্নতা আসিতে পারে না, কাজেই ইন্দ্রিয়ের তর্পণ হয় সত্ত্বগুণ দ্বারাই। ভোগে কোনদিন তৃপ্তি আসে না, বরঞ্চ জ্বালা বাড়িয়াই চলে; কাজেই সাত্ত্বিক মানুষ ইন্দ্রিয়দিগকে প্রসন্ন করেন কি করিয়া—ইহাই হইল আসল বিষয়। সত্ত্বগুণ দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রসন্ন হয়; আর ইন্দ্রিয় প্রসন্ন থাকিলেই তাহাদের মাঝে অবিক্ষোভ অবস্থা নিশ্চয়ই আসিয়াছে জানিতে হইবে। কাজেই প্রসন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তখন আত্ম-দর্শন ঘটে।

মানুষ মনে করে, ভোগ করিয়া, ভোগ জুটাইয়াই ইন্দ্রিয়দিগকে তৃপ্ত করা যায়। কিন্তু আসলে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ভোগে আসে না। ভোগের একটা জ্বালা আছেই, এই জ্বালায় কিছু না কিছু সংস্কার থাকিয়া যায়ই যায়। কাজেই ইন্দ্রিয়কে প্রসন্ন করিতে হইলে, তাহাদিগকেও শান্তির পথে, অবিক্ষোভের পথে লইয়া যাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়দিগকে সাত্ত্বিক পথে নিতে হইলেই, নিজকেই সর্ব্বাগ্রে সব দিকে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। ইন্দ্রিয় আত্ম প্রকাশেরই উপকরণ, আত্মার সাত্ত্বিক বেদনা হইতেই ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, কাজেই ইন্দ্রিয়ের মাঝে স্বাভাবিকই আত্ম-প্রকাশের একটা ব্যাকুলতা রহিয়াছে। তাহারা পাষণ্ড নয়, মানুষই স্বেচ্ছায় অপব্যবহার দ্বারা তাহাদের বিকৃত করিয়া তুলে। ইন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, এইজন্যই। তখন এই আত্মাই (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই) আত্মাকে হনন করিতে উদ্যত হয়। প্রকৃতিই প্রকৃতির প্রতিশোধ তুলিতে সচেষ্ট হইয়া উঠে।

আত্ম-বিকাশের বেদনাতেই এক একটি ইন্দ্রিয়ের স্ফুরণ হইয়াছে। কাজেই যাহার প্রয়োজনে যাহার সৃষ্টি, সে কি কখনো তাহার স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে?

এইজন্যই ইন্দ্রিয়ের মাঝে আত্মানুরাগী ভাব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।

আত্মার প্রয়োজনেই দেহের, ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দেহকে খাটাইয়া নেবার ভার মানুষের। মানুষ না বুঝিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে, তাহারা যাহা চায় না, তাহাতেই মানুষ তাহাদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিতে চায়। ইন্দ্রিয় সাধে বিক্ষোব্ধ হইয়া উঠে। আমরা মনে করি, উত্তেজনাই বুঝি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, কিন্তু এই ভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে যে কিরূপ মর্ম্মাহত করা হয়, তাহা বুঝা যায় সাত্ত্বিক অবস্থায় ইন্দ্রিয়দিগের প্রসন্নতা দেখিয়া। বিনা উপকরণে ইন্দ্রিয় তখন প্রসন্ন হয় কিরূপে? কাজেই নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের মাঝেও আত্মানুরাগ বলিয়া একটা জিনিষ রহিয়াছে। তাহারা নেমকহারাম নয়—স্রষ্টার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার দরুণ স্বাভাবিকই সদ্‌গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে ইন্দ্রিয়ের মাঝে।

ইহা একটি সহজ কথা যে, যাহার প্রয়োজনে যাহার সৃষ্টি, তাহাকে তাহার কর্ত্তার, স্রষ্টার মন জুগাইয়া চলাই উচিত, তাহাতে স্রষ্টার উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং সৃষ্ট ইন্দ্রিয়েরও কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় যদি আত্মা হইতে বিবিক্ত না হয়, তাহা হইলে এই ইন্দ্রিয় কখনো আত্মার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে উদ্যত হইতে পারে না। তখন ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম আত্মকর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। তবে কিনা এই অবস্থা লাভ করা এত সহজ নয়। ইহা সাধনা দ্বারাই আয়ত্ত হইয়া থাকে।

একটি কথা আছে "God created men after His own image" ভগবান তাহার নিজের মত করিয়া মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য 'মত' কথাটি দ্বারা কিছু না কিছু অপূর্ণতার আভাস থাকিয়া যায়ই, এইজন্যই মানুষের মাঝে অপূর্ণতা রহিয়াছে, আর এই অপূর্ণতা রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ তাহার যথার্থ স্বরূপ লাভ করিবার দরুণ সচেষ্ট এবং ব্যাকুল হয়। কিন্তু যতটুকু সাধ্য ভগবান মানুষকে তাহার মনোমত করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের সৃষ্ট জীবই যখন ভগবানকে অস্বীকার করিয়া বসে, তখন আশ্চর্য্য বোধ হয় না কি? ইহা কি কখনো সম্ভবপর হইতে পারে? এই বিদ্রোহভাব কি স্থায়ী হইতে পারে?

ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা আসে কখন? যখন সে তাহার স্রষ্টার মনোমত হইয়া চলিবার সুযোগ পায়। কাজেই মানুষ যখন সাত্ত্বিক হয়, তখন সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় প্রসন্ন চরিতার্থ হইয়া যায়। সত্ত্বগুণের সাহায্যে ইন্দ্রিয় তখন আত্মসাক্ষাৎকারের অধিকারী হয়। এইজন্যই সত্ত্বগুণের সাহায্যে ইন্দ্রিয় প্রসন্ন ঊর্দ্ধমুখী হয়। তাহার মনোভিলাস পূর্ণ হয় বলিয়াই, সে তৃপ্ত প্রসন্ন হইয়া ওঠে।

আর কিছু না সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইলেই, দৈবী-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারা যায়। এই দৈবী-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে, প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহারাও পরিতুষ্টি লাভ করে। এইজন্যই সত্ত্বগুণ প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের এত প্রসন্নতা! মানুষকে আত্মসাক্ষাৎকার করাইয়া দিবার দরুণ ইন্দ্রিয় ব্যাকুল, কিন্তু মানুষ স্বেচ্ছায় যখন তাহাদের একান্ত অভিলাসকে উত্তেজনা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তখন ইন্দ্রিয়ের ভিতর এক অবর্ণনীয় জ্বালা উপস্থিত হয়। নিষ্ঠুর পাষাণ বিবেকহীন মানুষ মৌন নির্ব্বাক ইন্দ্রিয় দ্বারা, জোর করিয়া তাহাদের রুচিবিরুদ্ধ কাজ করাইয়া লয়। এতে কার কি হয়, যে-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ দিব্য জীবন

উপভোগ করিতে পারে, সেই ইন্দ্রিয়কেই অপব্যবহার দ্বারা বিকৃত করিয়া তুলায় নারকীয় জীবন অতিবাহিত করে। দোষ অন্য কাহারও নয়। মানুষ স্বখাত সলিলেই ডুবিয়া মরে।

গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে সত্ত্বগুণের লক্ষণ বর্ণন রহিয়াছে। এই দেহের সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে যখন জ্ঞান প্রকাশ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে সাত্ত্বিকগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। কাজেই সাত্ত্বিক গুণের পরিপূর্ণ পরিণতি, দেহের প্রতি অণুপরমাণুকেই সার্থক দীপ্তিবন্ত করিয়া তুলে।

সাংখ্যকারিকার মূল্যবান কথা কয়টী মনে রাখিলেই যথার্থ সাত্ত্বিকতার সম্বন্ধে আর কোন ভুল বা ভ্রম উপস্থিত হইতে পারিবে না।

"সত্ত্বগুণ যখন উৎকট হয়, তখন অঙ্গ লঘু হয়, বুদ্ধি প্রকাশক ও ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হয়।"

গলদ্।

দুর্ব্বলমাত্রেই অসহিষ্ণু। পরের বাতাস গায়ে লাগলে, তারা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। পরের কথা শুনবার ধৈর্য্য নাই তাদের, পরের মতকে গ্রহণ করার উদারতা নাই তাদের, তারা চায় জগতশুদ্ধ লোক কেবল তাদের নিজের কথায় সায় দিয়েই চলুক! অপরের মনকে মেরে নিষ্পেষিত করে, আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদগ্র ব্যাকুলতা যাদের, তাদের মত অন্ধ, মোহগ্রস্ত জীব আর বুঝি দুনিয়ায় নেই।

দুর্ব্বল হলে মেজাজটাও হয়ে যায় নেহাৎ খিট-খিটে, তখন কেবল ভয় আসে মনে, এই বুঝি অপরের সংস্পর্শে, অপরের কথায় আমার আত্ম-সম্মান লাঘব হল। আমি বুঝি সকলের কাছে দুর্ব্বল বলে পরিগণিত হলাম……ইত্যাদি! কিন্তু সকলের সঙ্গে মেলা-মেশাতে যে নিজেরই কোন দিক্‌কার অভাব দৈন্য থাক্‌লে তা পূর্ণ হয়ে উঠবার সুযোগ ঘটে, এ কথা দুর্ব্বল বুঝলেও, স্বীকার করতে চায় না। তারা এই অন্ধ-সংস্কারের ক্ষয়-রোগে মরবার দরুণ প্রস্তুত হতেও রাজী, কিন্তু কিছুতেই তারা অপরের কথায়, অপরের বিচারে সায় দিবেনা। হোক্ না তা চরম সত্য—কিন্তু সে সত্য তাদের কাছে অবহেলার সামগ্রী বিশেষ। সে-দিন প্রবাসীতে রবি-ঠাকুরের "সোভিয়েট-নীতি" প্রবন্ধটীতে বেশ একটী প্রণিধানযোগ্য কথা পেলাম। তিনি লিখেছেন—দেশের সৌভাগ্যসৃষ্টি ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষা দ্বারা আড়ষ্ট করে রাখাই তাদের অভি-প্রায়-সিদ্ধির একমাত্র উপায়।"

নায়কত্বের লোভ দুর্ব্বল-সবল সবার ভিতরই রয়েছে দুর্ব্বলের বরঞ্চ নায়কত্ব করার বাতিকটা একটু বেশী। তারা দুর্ব্বল বলেই, অপরের দ্বারা ইষ্ট-সিদ্ধি করার ফিকির খুঁজে। নিজের ব্যাক্তিত্বলোপের আশঙ্কাটা দুর্ব্বলের খুব বেশী। এইজন্যই ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, দুর্ব্বল নায়ক চায়, সমষ্টির মনকে আরষ্ট করে রাখতে, কেননা সমষ্টি-চিত্তে চেতনার সাড়া পড়ে গেলেই যে তার প্রভুত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে আসবে!

মানুষকে অচেতন রেখে প্রভুত্ব করার মত বড় পাপ আর নেই। অশিক্ষিতদের উপর এরূপ অন্যায়

প্রভুত্ব বহুকালধরে চলে আস্‌ছে! কিন্তু জগতে কেউ চিরকাল হীন হয়ে থাক্‌বে না, প্রকৃতির বিধানে সকলেরই একদিন সচেতন-জাগ্রত অবস্থা আপনি এসে উপস্থিত হবে। তখন এ অন্যায়ের প্রতিশোধ হবে ভীষণ! সংস্কার ছাড়া বড় শক্ত কথা! আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত হয়েও, অনেকেই দেখি একনায়কত্বের প্রতি লুব্ধতাবশতঃ অপরের চিত্তকে আড়ষ্ট করে রাখবার ফিকিরই খুঁজেন। এ জায়গায় তাদের কত বড় মারাত্মক গলদ রয়েছে, তা তারা বুঝলেও, অভিমানে অস্বীকার করে থাকেন।

মোট কথা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে যাদের ভয়, অপরের মতকে ন্যায্য বিচার দ্বারা গ্রহণ-বর্জ্জন করতে যাদের সঙ্কোচ, তাদের যে কত বড় দুর্ব্বলতা রয়েছে তা আর বল্‌বার নয়। গুরু-গিরি করার প্রলোভনটা দুর্ব্বলেরই খুব বেশী, আর দুর্ব্বল বলেই অপরের চিত্তের জাগরণ তাদের পক্ষে ভীতির সঞ্চার করে!

অজ্ঞানীর মেলায় যাদের প্রভুত্ব, তাদের মত দুর্ব্বল হীন-চেতা আর নাই। কেননা যারা যথার্থ জ্ঞানী, তারা অজ্ঞানীকে জ্ঞানের আলো প্রদান করতে আরও বেশী সচেষ্ট-উদ্‌গ্রীব হয়। তাদের প্রাণে এ ভয় নাই যে, কি জানি অজ্ঞানীকে শিক্ষা দিলে শেষে তারা আর পূর্ব্বের মত তাদের সম্মান না করে। কাজেই রাজত্বের কাল দীর্ঘ করবার দরুণ, সাধারণ যাতে অজ্ঞান-তিমিরেই থাকে, তারই ব্যবস্থা করে তারা!

নিজকে ছাড়া অপরকে যারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, তারা যে নিজকে কত সঙ্কীর্ণ ভাবে অনুভব করে, তা আর বল্‌বার নয়। সাংখ্যের পুরুষের একদিকে দুর্ব্বলতা ছিল বলেই নিজকে ছাড়া জগতের আর সবকে তিনি জড় বলে দেখেছিলেন। এ দুর্ব্বলতার দরুণই সাংখ্যের পুরুষকে কৈবল্য-গুহার আশ্রয় নিতে হল, তিনি জগতের প্রতি বিমুখ হয়েই থাক্‌লেন চিরকাল!

মূলে একটা মারাত্মক দুর্ব্বলতা পোষণ করে এই যে আত্ম-প্রভুত্বের লোলুপতা, এর চেয়ে বড় ব্যাধি আর নাই। এইজন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করেও, সে-শিক্ষায় মানুষের চিত্তটা সহজে সচেতন সচেষ্ট হয়ে উঠেনা। মূলেই যে প্রকাণ্ড ভুল রয়েছে, শিক্ষাদাতার মনে রয়েছে ছাত্রের উপরে প্রভুত্ব করা, ছাত্র যাতে অন্ধভাবে গুরুকে মানে তারই প্রচেষ্টা। এতে ছাত্রের চিত্ত আড়ষ্ট হয়েই থাকে, আত্মজাগরণের পক্ষে এ শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নাই।

পীড়ন করতে করতে মনটাই যদি নিঃশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল, তাহলে সেই মন-মরা মানুষ দিয়ে দেশের দশের কি হিত হবে? একনায়কত্বের প্রলোভনে যারা প্রলুব্ধ তারা অপরের মনের ওপর এই জোর-জুলুম করতেই বিশেষ পটু! তারা চায় সকলকে ছোট করে, ছোট রেখে বড় হতে! কিন্তু এই বড় হওয়ার সার্থকতা কি?

বিকাশ হবার সুযোগ প্রদান করা চাই, তবেই প্রত্যেকেরই পরিণতি ঘটে। মন চঞ্চল বটে, কিন্তু এই চঞ্চলতাই তার পরিণতি নয়, এই মনই বিশুদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে, তবে কিনা মনকে একটু স্বাধীনতাও দেওয়া চাই সময় বুঝে। বড় বড়তেও সম্প্রীতি হয়, কাজেই আত্মচেতনা দ্বারা অপরকেও চেতন করে তুলতে পারলে, নিজেরই লাভ, নিজেরই সম্মান।

অনেক দিন ধরে আমরা পরাধীনতার নাগপাশে জর্জ্জরিত। এইজন্যই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করাও, কিম্বা চিন্তা করতে দেখলেও আমাদের মেরুদণ্ড কেঁপে উঠে। এ জায়গায় একটা প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

একদিন এক হিন্দুস্থানী সাধু এসে হাজির, তার সঙ্গে এক চেলা। চিম্‌টার আঘাতে তার সকল শরীরেই দাগ বসে গিয়েছে। এমনি করে পিট্টি খেতে খেতে তার এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। উক্ত সাধুটী আমাদের বাড়ীতে উঠেই কি এক তুচ্ছ কারণে সেই চেলাকে চিমটা দিয়ে পিটতে সুরু করলে। এরূপ নির্দ্দয় অমানুষিক অত্যাচার দেখে উক্ত সাধুকে খুব ধমক দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলাম। আর চেলাকে বলে-কয়ে আমাদের বাড়ীতে রেখে দিলাম। আমরা তাকে বন্ধন-দশা থেকে মুক্ত করলাম বটে, কিন্তু তার মন এমনিভাবে গড়ে উঠেছে যে, সেই পিট্টিই তার ভাল, কিন্তু তবু সে স্বাধীনভাবে আমাদের এখানে থাকবেনা। হঠাৎ একদিন দেখি সে পালিয়ে গিয়েছে। আবার তাকে সেই চিমটা-পিটা গুরুজীর আশ্রমেই দেখতে পেলাম।

কাজেই মুক্তি দিতে চাইলেও এক বিপদ—কেননা বহুদিন ধরে অধীন হয়ে থাকতে থাকতে মনোবৃত্তিও দাঁড়িয়ে গিয়েছে তেমনি। একদল মানুষ এইরূপ অন্ধসংস্কারে আড়ষ্ট হয়েই থাকতে চায়, কিন্তু এ কথা ঠিক, যাঁর ভিতরে সত্যিকার জ্ঞানের আলো প্রবেশ করেছে, তিনি রয়ে-সয়ে যে-ভাবে পারেন, সেইভাবেই জনগণের চিত্তকে জাগ্রত-চেতন করে তুলবার প্রচেষ্টাই অবলম্বন করবেন। তাঁকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয় বটে, কিন্তু তিনি অসত্য দ্বারা মানুষকে অভিভূত করে রাখতে পারেন না।

মনে প্রাণে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া শক্তির প্রয়োজন। অনেকেই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে ততটুকু, যাতে তার আত্ম-প্রভুত্বের হানি না হয়। কিন্তু বাস্তবিকই যিনি স্বাধীনতার মর্ম্ম উপলব্ধি করেছেন, তিনি অপরকে নিঃসন্দেহে শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে সাহায্য করেন। সবল না হলে সত্যদর্শী, না হলে, সংস্কারমুক্ত না হলে, কর্ম্মের পথে, ধর্ম্মের পথে, রাষ্ট্রের পথে সর্ব্বত্রই অজ্ঞানতাকে বাড়িয়ে তুলবার সাহায্যই করা হয়।

সেবকের আত্মানুভব

গীতায় আছে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ আমাকে (এই সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে) ব্রাহ্মণ হতে আচণ্ডাল যে যে-ভাবে চায়, সে সে-ভাবেই পায়। ছেলে মাকে প্রাণভরে ডেকে প্রাণভরা ভালবাসা লাভ করছে, আবার সে-ছেলেই দুষ্টোমি করে মায়ের সাজা পাচ্ছে। তবে আমি তাকে আত্মস্বরূপে পাবনা কেন? চাওয়ার মত চাইতে জানি না, প্রাণভরা পিপাসা হয়নি বলেই তো শুধু শুধু মুখে চাই চাই করে অন্ধকারে ফিরছি। চাওয়ার মত চাইতে জানলে অন্ধকারে আলো ফুটে, সে আলো মিটমিটে আলো নয়, আর যে-চোখে দেখবে সে চোখও শুধু এই স্থূল বস্তু দর্শনোপযোগী নয়, সে আলো বিদ্যুতের মত তেজীয়ান্ আলো, আর সে চোখ অণু হইতে অণু আবার মহৎ হতে মহৎ; নিকট হতে নিকট, আবার দূর হতে অতি দূরের বস্তু দর্শনক্ষম। আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলে স্বতঃপ্রকাশমান সহস্রকিরণধারী তপনদেব তোমার চক্ষুর অগোচর। মেঘ আছে বলেই তোমার কাছে সূর্য্য অপ্রকাশমান বলে বোধ হচ্ছে। ডাক পবন দেবকে, অমনি যখন পবন-

দেবের আগমনে মেঘ চলে গেল, স্বতঃপ্রকাশমান সূর্য্যও তখন তোমার নয়ন গোচর হল। আত্মাও তেমনি তোমার আমার বুদ্ধিরূপ গুহাতে লুক্কায়িত। তাঁকে দেখতে হলে ঐ গুহাটীকে ভেঙ্গে দিতে হবে। ঐ গুহাটীকে ভাঙতে গিয়েই জ্ঞানী নিলেন জ্ঞানরূপ অসি, কর্ম্মী নিলেন নিষ্কামকর্ম্মের বর্ম্ম এবং ভক্ত নিলেন ভক্তিরসের প্লাবন। উদ্দেশ্য হল, গুহা ভেঙ্গে আত্মদর্শন করা। পেটে ক্ষিদা পেয়েছে, অতএব ক্ষিদা নিবারণ করতে গিয়ে কেউ বা পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে, কেউ বা রসাল বস্তু দ্বারা, আবার কেউ বা শুধু নুন ভাত দিয়েই ক্ষুধা নিবারণ করল। শেষে জ্ঞানী গিয়ে জ্ঞানের বড়াই করছে, আমার জ্ঞানই বড়, ভক্ত বলছে আমার ভক্তিই বড়, আর কর্ম্মী বলছে ওহে, এ যে নিষ্কাম কর্ম্মের যুগ সুতরাং আমার কর্ম্মই যে শ্রেয়ঃ। ফলতঃ তিনটীকে সমন্বয় করে দেখেনি যে কোন্‌টাই বা কম? বিবেকানন্দ শিষ্যকে এক জায়গায় বলেছেন, যে-আধারে তিনটীরই সমন্বয় হবে সেটাই হবে ঠিক্ ঠিক্ আদর্শ, কথাটা আমার প্রাণে বেশ লাগল। শুধু দ্বন্দ্ব করে মরলে কি হবে, তিনটীর সমন্বয় করতে না পারলে জীবন পূর্ণ হবে কেন?

এক রঙ্গে আর্ট ফোটে না, তাই তো নানা রঙ্গের সৃষ্টি। মোটের উপর কথা হচ্ছে, যা চাই, তা প্রাণ দিয়ে চাই কিনা? এই যে দৈনন্দিন কাজগুলির মাঝেও তো কত কিছু শিখবার আছে। দিবসারম্ভে কত কিছুই না করব বলে ভাবি, কিন্তু কোথায় সব করতে তো পারছি না, কিন্তু করব বলে সঙ্কল্প করে যে কাজটা প্রাণপণে ধরি, কই সেটা তো নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে—আরগুলি হয় না কেন? গলদই হচ্ছে ওখানে, যা-ভাবি মনের একাগ্রতা নিয়ে করব বলে ভাবি না। যে-গৃহস্বামী আপনার দৈনন্দিন কাজগুলিকে কারও উদ্বেগ না জন্মিয়ে ঠিক্ ঠিক্ করে ও করিয়ে নিতে পারে, সোজা কথায় বলতে গেলে সে গৃহস্বামিই ভগবানকে চাইতে পারে। গৃহপতি মাত্রই অমন করে নিজকে তৈরী করে তুলতে পারলে ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা সুগম হয়ে উঠবে। পরের উদ্বিগ্ন জন্মাতে গিয়ে নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে বেশী, সুতরাং ঐ ভাবনা ভেবেই চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায়। তার ঐ দিনের কাজ, এমন কি সেই দৈনন্দিন জীবনটাই পণ্ড হয়ে যায়। অতএব ভগবানকে চাওয়ার আগে ধনী-নির্ধনী সকলকেই আগে সংসারের দিবসীয় কর্ম্মের হাঁপরে নিজের জীবনকে পুড়িয়ে খাদশূন্য করে ফেলতে হবে। সংসারী ভাবে, ঘর সংসার করে জড়িয়ে পড়ে কেবল হাবুডুবুই খাচ্ছি। আমার জীবনে কিছুই হল না, কিছুই করলাম না, ভগবান কেন জন্মালেন ইত্যাদি। এমন সংসারীকে বলতে হয়, আচ্ছা ভাই, আজ যদি তোমার মনিব তোমাকে শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে কোন একটি কাজে পাঠায়, তখন যদি তুমি কাজ করতে গিয়ে দিব্যি আরামে ঘুম দিতে থাক এবং পরে তোমার প্রত্যাগমনে কাজের নিকাশের বেলায় জিজ্ঞাসা করে তখন কি উত্তর দিবে? তখন অবশ্যই তোমাকে একটা কিছু বলতে হবে। যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে ঠিক কথাই বললে, আর যদি ফাঁকি দিয়ে মিথ্যা কথায় ধরা পড়লে, তখন তো আর লাঞ্ছনার সীমাই থাকেনা। সত্যের দরুণ হয়ত সেই দিনের মাহিনাটা না পেতে, কিন্তু চাকুরীটাতো থেকে যেত; মিথ্যা বলে কিন্তু সবই হারালে। অতএব নিজের সামর্থ্যের উপর দোষ চাপিয়ে বা ভগবানের উপর দোষারোপ করে শুধু তলিয়েই যাচ্ছ আর লাভে-মূলে সবই খোয়াতে বসেছ। তোমার পুঁজি নাই, অথচ খেঁটে-খুঁটে যা আয় করছ তার মধ্যেও নেশা-নৈস্যে খরচ করছ আধা, আর বাকি অর্দ্ধেক পারিবারিক খরচ চালাতে গিয়ে নিঃশেষ হল। আবার বাবুর দলে মিশে বিলাসিতায় ঝোঁক দিয়ে কিছু কিছু ধার করতে

থাকলে, শেষে কিছুদিন পরে নিকাশ করে দেখলে শুধু দেওনা হয়ে আছ, পাওনা তো এক পয়সাও নাই। তাই বলছি ভাই, পুঁজি দিয়ে রুজি কর, আর যদি পুঁজি না থাকে তবে রুজি বুঝে খরচ করেও কিছু পরিমাণ পুঁজি করতে শেখ। একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে—সেটা হচ্ছে "সংযম" বা মিতব্যয়িতা। সংযমের ডাণ্ডি হাতে থাকলে পাল্লা এদিক-সেদিক হতে তোমাকে টেনে রাখবেই। তারপর বিলিয়ে দেওয়ার মত অর্থ জমলে, আত্মপর না ভেবে প্রাণ ভরে বিলিয়ে দিবে। এমন হতে পারলে সংসারী হতে দোষ কি? দেখ তো, সংসারিকতার ভিতর দিয়েও তুমি আত্মপরের গণ্ডি ভেঙ্গে দিলে।

পরিচয়।

নিখিলেশ বাবুকে আমি বেশ নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত দ্রষ্টা বলেই জানতাম; কিন্তু যখন থেকে জানতে পারলাম তিনি অপরকেও নানা উপায়ে উত্তেজিত করে নিজের মতে আনতে চেষ্টা করছেন, তখন থেকেই তার প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধাটা একটু কমে আসতে লাগল। বাস্তবিকই মানুষের মন জিনিষটা অনন্ত-রহস্যপিণ্ডই বটে। তাতে যে কত কিছু প্রচ্ছন্ন-গুপ্ত রয়েছে, তা কে জানে। এই নিখিলেশ বাবুকে আমরা কত শ্রদ্ধা করতাম, তার অবিক্ষুব্ধ চিত্তের পরিচয় কতবার আমাদের মুগ্ধ-বিস্মিত করেছে—আর আজ সেই নিখিলেশবাবুর কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। কে জানত সামান্য একটা কারণকে উপলক্ষ করে জীবনের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে এত নীচে নেমে পড়বেন নিখিলেশ বাবু! আজ তার প্রতি কথায়, প্রতি আচরণে ক্ষোভ, বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠেছে। অথচ এতদিন কি আত্ম-গোপন করেই না চলেছেন তিনি। ১২টা বৎসর একজায়গায় কাটিয়েছেন, কিন্তু একদিনও তার মনের আসল ভাব ব্যক্ত করেন নি। আত্ম-গোপন করে চলবার শক্তি যে অসীম হয়েছিল নিখিলেশ বাবুর এ কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নাই; কিন্তু এক এক সময় তার এই দুর্ব্বলতার দরুণ করুণা হয়, দুঃখ হয়। কেন, ইচ্ছা করলে তো তিনি আরও আগেই তার সাধ পূর্ণ করতে পারতেন। এত বৎসর মনের অভিলাষের বিরুদ্ধে লড়াই করবার কি প্রয়োজন ছিল তার? ভণ্ডামি না করে যদি তিনি তার আপন পথ পূর্ব্বেই বেছে নিতেন, তহলে বোধ হয় পারিপার্শ্বিকের কাছ থেকে এত অভিযোগের কথা শুনতে হত না তাকে! জানিনা আজ তিনি এত উঁচুতেই উঠেছেন কিনা যে, এ-সব তুচ্ছ কথা তার কানেই প্রবেশ করতে অধিকার পাবে না! তা যদি না হয়, তাহলে পারিপার্শ্বিকের কথায় তাকে জবাবদিহী হতেই হবে!

অসম্ভব কিছুই নয় জগতে, অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর মায়ায় সব হতে পারে! বাইর থেকে নিখিলেশ বাবুর আচার-আচরণ দেখে আমরা কেউ তো ধরতে পারি নি যে, তার মন অন্য কোন এক বস্তুর দরুণ লালায়িত চঞ্চল। আজ এতদিনকার কামনার বহ্নি একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, আর কিছুই গোপন নাই। তার অন্তর-রাজ্যের প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের ধারা বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এখন বুঝেছি, নিখিলেশ বাবুর অন্তর্জীবন, কত জটিল, কত দ্বন্দ্বপূর্ণ। যে-সাধনায় মানুষের ভেতর প্রশান্তি আসে মানুষের

কামনার অনল নির্ব্বাপিত হয়, সে পথের সাধনা করেন নি তিনি, কাজেই তার নির্লিপ্ততার মূল্য তাকেই হারাতে হয়েছে। তিনি তার পণ রক্ষা করতে পারলেন না শেষ পর্য্যন্ত। এতদিন এত সংযম করে যে নাকি হঠাৎ এতদূর অসংযমের পথে নেমে পড়তে পারে তার সংযমের তো কোন মূল্য নাই। তিনি এখন শুধু নিজের পাপের দরুণই দায়ী হবেন না, ভণ্ডামী করে যে সাধুত্ব দেখিয়ে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আদর্শচ্যুত হওয়ার সকলের আক্রোশের উগ্র-জ্বালাও তাকেই সইতে হবে। কাজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, আদর্শচ্যুত হয়েও তার নিস্তার নাই। প্রকৃত অনুসূচনাকে অবজ্ঞা করবার মত আসুরিক বৃত্তি যদি তার মাঝে না জাগে, তাহলে একদিন তিনি তার ভুল ধরতে পারবেনই পারবেন।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এ সব বৃত্তি মানুষের রয়েছে, কিন্তু মানুষ এদের ঘারে পা দিয়েই মানুষ হতে পেরেছে। মানুষের জীবনে মহৎ আদর্শ রয়েছে, তাই মানুষ ভুল করতে গিয়েও আদর্শের কথা মনে করে ভুলের পথ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে আসে। মহৎ-আদর্শ মানুষকে কতদিক্ থেকে, কত বিপদ হতে যে নিস্তার করে তা আর বলবার নয়। কিন্তু সেই আদর্শই যদি অবমাননার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আর জীবন সংযত-উন্নত হবে কিসে?

তিনি অনেককে উপদেশ দিতেন, কিন্তু সে উপদেশের মাঝে কেমনতর একটা দুর্ব্বলতা যেন থেকে যেত! কোন কথাই জোর করে বল্‌তে পার্‌তেন না তিনি! আজ তার কারণ বুঝতে আর একটুকুও বাকী নেই! তিনি যে সম্পূর্ণ অন্য পথের পথিক ছিলেন। কাজেই যে-পথের উপদেশ দিতেন তিনি, সে পথের সঙ্গে তার অন্তরের কোন যোগ ছিল না।

স্বাতন্ত্র্য ছিল বটে, কিন্তু তার হৃদয়ের মাঝে মস্ত বড় দুর্ব্বলতা ছিল! এইজন্যই বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়েও আশ্রিত হয়েই এতকাল কাটাতে হয়েছিল তাকে! এখনো তার ভেতর আসল স্বাধীনতার আবহাওয়া খেলে নি, সব জায়গায় তার কপটতা, আর হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচয়! কোথায়ও স্বাধীন-ভাবে কোন একটা কিছু করার ক্ষমতা নাই!

পুরাণে-ভাগবতে পড়েছি, ব্যাসদেবকে দেখে মুনি-কন্যারা নাকি লজ্জিতা হয়ে বস্ত্র পরিধান করেছিল, কিন্তু তাঁরই ছেলে শুকদেবকে দেখে তাদের কিছুমাত্র লজ্জা কিম্বা সরম উপস্থিত হয়নি, তারা নিঃসঙ্কোচে নগ্ন-অবস্থায় সকলে মিলে আনন্দোৎসব করেছিল। কাজেই ব্যাসদেবের চেয়েও শুকদেব বড় আদর্শ! সেই আদর্শ বড় আদর্শ বলেই সেই আদর্শে পৌছতে এত সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন। শুকদেব হওয়া এত সহজ কথা নয়!

আজকাল নিখিলেশ বাবুর যেরূপ মনোভাব তাতে তিনি শুকদেবকে মান্‌তেই চান্‌না—তিনি বল্‌তে চান শুকদেব নাকি জড়পিণ্ড অপদার্থ! তাঁর ভেতর কোন বৃত্তির তরঙ্গই উঠ্‌তনা, কাজেই তাঁর নির্ব্বিকারের এবং নির্লিপ্ততার নাকি কোন অর্থই নাই! জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদন পেতে হলে সব দিকে সচেতন হতে হবে! তাহলে দেখছি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ শুকদেব অচেতন ছিলেন, অথচ তাঁর মুখ দিয়ে যে-সব তত্ত্ব কথা বের হয়েছে, তা অনেক সচেতন জ্ঞানীর মুখ দিয়েও বের হয় না!

তখন নিখিলেশ বাবু আমাদের মাঝে খুব বড় বৈদান্তিক! আমরা যুবক, এক এক সময় অনিবার্য্য কামনায় অধীর হয়ে, কিছুতেই নিজের মাঝে সংযম প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে, নিখিলেশ বাবুর কাছে ছুটে যেতাম। তিনি উপদেশ দিতেন—"দেখ আমার নিজের মাঝেই সব রয়েছে, কাজেই কামনায় বহির্ম্মুখী হবে কেন, নিজের মাঝেই তার কারণ

অনুসন্ধান কর।" উপদেশ দেওয়া খুব সুজা, কিন্তু এ কথাগুলোকে শ্রদ্ধায় মেনে নিতে যে কত আত্ম-পীড়ন করতে হ'ত আমাদের তা আর বল্‌বার নয়। এক এক সময় যৌবনের উন্মাদনায় উনার সব কথাকে অবজ্ঞা করে চলবার মত ঔদ্ধত্য ভাব জেগে উঠত—কিন্তু আমাদের মূল পরিচালকের সার্টিফিকেটেই আবার তার প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব আস্‌ত!

কিন্তু আজ কেবল হাসিই পায়—ও কথাগুলো মনে হলে। উপদেশের কোন মর্য্যাদাই তো রাখলেন না নিখিলেশ বাবু! যিনি বৈদান্তিক, যিনি বিশ্লেষণবাদী—জ্ঞানী, তিনি আত্মতৃপ্ত না হয়ে, সাধারণ মানুষের মত সামান্য কামনায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে একেবারে বিষয়ে আত্ম-সমর্পন করে দিলেন! এই কি তার উপদেশর মর্য্যাদা—নিজের মাঝে সব পাওয়া? গোটা-জগতটাকেই যিনি নিজের মাঝে দেখেন, উপলব্ধি করেন; তিনি সামান্য একটা বিষয় উপলব্ধির দরুণ এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কি উদ্দেশ্যে! ধ্যানে যে-রূপ নিজের মাঝে প্রত্যক্ষ করা যায়, সে-রূপের দরুণ পাগল হয়ে তিনি কেন বাইরে বাইরে ছুটলেন। কৈ বৈদান্তিকের মত তার আত্মস্থ হবার শক্তি কোথায়?

তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন "দেখ কোন জিনিষই সাধনা করে না পেলে তার যথার্থ মূল্য বুঝা যায়না! সাধনার দ্বারা নিজের চিত্তগত মালিন্য অপসারিত হলে—যাকে চাই, তার যথার্থ সদ্‌গুণ মনের মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! তখন সে আকর্ষণে কোন কুহেলিকা থাকে না! বেশ সুন্দর উপদেশ বটে, কিন্তু তিনি কি প্রকৃতই সাধনা দ্বারা মনোময়ী মূর্ত্তি গড়েছিলেন। কিন্তু কৈ তার তো আত্মস্থ হবার শক্তি দেখ্‌ছিনা। সত্যলাভ করতে গিয়ে তিনি সত্যের ছলনাতেই ভুলে গেলেন। তবে কি সত্যের ছলনাও সত্য—এই কি বৈদান্তিকের অনুভূতির চরম পরিণতি?

মানুষের মন বস্তুটার অন্ত পাওয়া কঠিন—হয়ত নিখিলেশ বাবু সম্বন্ধে আমার মনে যা খেল্‌ছে তা সত্য না-ও হতে পারে! কিন্তু মনকে অনেক দিকে বুঝিয়েও যখন দেখি, মনের মাঝে এই প্রশ্নগুলিই উঠে, তখন মনে হয়—না, এর মাঝেও কিছু না কিছু সত্য রয়েছেই! হয়ত নিখিলেশবাবু এখনো ঠিক তার আদর্শ ধরে চলতে পারেন নি, এখনো হয়ত রাগে-অভিমানে লক্ষ্যের পথ থেকে চ্যুত হয়েই চল্‌ছেন!

শেষ কথা—তিনি প্রায়ই যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর কথা বলতেন। যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধে তার মুখ থেকে অশেষ প্রশংসা শুনেছি। এমন কি সময় সময় বল্‌তেনও— "যাজ্ঞবল্ক্যই আমার জীবনের আদর্শ!" কিন্তু আজ আর বেশী কিছু বলবনা, এই একটামাত্র কথা বা অভিযোগ আমার—"যাজ্ঞবল্ক্য কি পলাতক ছিলেন? কারও মনকে কি তিনি আহত করে গিয়েছিলেন?"

—

বেদান্ত-বাদের সর্ব্বাঙ্গিন সার্থকতা।

সে দিনও খ্যাতনামা এক সাহিত্যিক বলেছিলেন যে, বেদান্ত-বাদে নাকি দেশটা উৎসন্ন গেল। দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন করতে হলে নাকি ঐ অদ্বৈত-বেদান্তবাদকে নির্ব্বাসন দিতে হবে। বেদান্তবাদে সবকে কেবল মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। তাতে জাতি ভাব-প্রবণ হয়ে শুধু কল্পনায় বিহার করে, তাতে কোন দিক দিয়ে উন্নতির আশা নাই।"

কথাগুলো যে একেবারে মিথ্যা তা বলছিনা, কিন্তু বেদান্তেরও অধিকারী রয়েছে। অদ্বৈত-বাদের নিগূঢ় অর্থ সকলেই ধারণা করতে পারেনা। কেউ কেউ "শিবোহহং" শিবোহহম্" বলতে বলতেও দেখি, সাধারণ মানবের ন্যায়ই বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলে, আর সবকে উড়িয়ে দিয়ে নিজেই একমাত্র রাজাধিরাজ হয়ে বসতে চান। কিন্তু অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অর্থ যে কি, তা সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া বুঝা দুষ্কর। বেদান্তে যদি মানুষকে দুর্ব্বল করে, ভাবপ্রবণ করে, তাহলে তো সর্ব্বাঙ্গিন কল্যাণের পরিপন্থী বলে বেদান্তকে নির্ব্বাসন দিতে হবেই। কিন্তু এত বড় একটা কথা বলবার আগে, খুব চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। এক দিন শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈত-বেদান্তের দুন্দুভিনিনাদে সব দেশ জয় করেছিলেন, এই শঙ্করাচার্য্যই নাকি দেব-দেবীর স্তোত্র রচনা করে গিয়েছেন, কাজেই জগৎ মিথ্যা, জগৎ মায়া এরও নিশ্চয়ই একটা তৎপর্য্য রয়েছে। জগতকে এককথায় মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে জগতের প্রতি যদি বিতৃষ্ণ হয়ে থাকতেন, তাহলে বুঝতাম শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের অর্থ অবজ্ঞাবাদ অর্থাৎ জগৎ কিছুই নয়। কিন্তু তাঁর রচিত ভাষ্যে যে-সব কথা পাওয়া যায়, তাতে তো তাকে জগত-বিমুখ উদাসী বলে মনে হয় না। বরঞ্চ ব্রহ্মকে প্রতি জীবে প্রত্যক্ষ করে, তিনি দুর্ব্বলকেও অদ্বৈতানুভবের শক্তিতে তুলে ধরেছেন। জাতির প্রাণ মরে গিয়েছিল, সবাই ভাবত, আমাদের জীবন দিয়ে আর কি হবে, আমরা নরাধম, পাতকী, দীন-হীন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এসে বললেন, কে বলছে তোমরা দীন-হীন. তোমাদের ভিতর যে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্ম রয়েছেন। উত্তিষ্ঠ—তোমরা জেগে ওঠ, ব্রহ্মকে নিজের মাঝে জাগ্রত প্রত্যক্ষ করে তোল। কে বলে তোমরা দুর্ব্বল, তোমাদের অসীম শক্তি, তোমরা ব্রহ্মময়।

পুঞ্জীভূত দুর্ব্বলতার সংস্কারকে এক মুহূর্ত্তে তিনি লোপ করে দিলেন—আত্ম শক্তিতে। তাঁর মায়ার অর্থ যদি কোন কিছু থেকে থাকে, তাহলে এই। জীবই ব্রহ্ম, অথচ জীব মোহে ভুলে আছে। তাঁর নিজের অদ্বৈতানুভবের খড়তর দীপ্তিতে, সকলের সুপ্তপ্রাণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। দুর্ব্বলকে নিজের শক্তি দ্বারা তিনি উত্তোলন করলেন। এই যে সুপ্তপ্রাণে চেতনা সঞ্চার এটা কি দুর্ব্বলতা? কতখানি শক্তি আয়ত্ত হলে পর, নিজের অনুভব দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জড়-চেতনকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়?

ব্যাপ্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে অসীম বল উৎপন্ন না হয়ে পারে না। তখনই জাতি, দেশের দরুণ, ধর্ম্মের দরুণ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। বেদান্তেই জাতিকে সজীব সচেষ্ট করে তোলে। তখন বাস্তবিকই মায়া থাকেনা, নিজের দরুণ কোন চিন্তাই আসে না, বৃহতের অনুভবে, ভূমার অনুভবে চিত্তের সকল দুর্ব্বলতা লোপ পেয়ে যায়। এতটুকু মানুষের বুকেও যেন অফুরন্ত হস্তির

বল উৎপন্ন হয়। "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" বলে তখন দেশের দরুণ, দশের দরুণ অকাতরে প্রাণ দেবার শক্তি আসে। বেদান্তবাদকেই প্রকৃত নির্ভীক-বাদ বলা যেতে পারে। আর এই বাদকে যারা মনে-প্রাণে মিশিয়ে নিতে না পেরেছে, তাদের ভিতর প্রকৃত নির্ভয় ভাব আসবেই না।

যে-জাতি পরাধীনতায় সঙ্কোচিত, তার প্রাণকে মুক্তির আস্বাদন পাওয়ানো-এ কম শক্তির কথা নয়। মানুষ নিজকে ছোট ভাবতে ভাবতে ছোটই হয়ে যায়। সংস্কারের এমন প্রবল শক্তি যে, তখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও নিজের শক্তি নিজের চোখে ধরা পড়ে না। শঙ্করাচার্য্য এসে শুধু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো নয়—নিজের বজ্রদৃঢ় অনুভবকে সঞ্চারিত করে দিলেন জাতির প্রাণে। জাতি অদ্বৈতানুভবের প্রবল শক্তিতে উল্লসিত হয়ে উঠল।

অনুভূতির অভাবে সর্ব্বত্রই ভণ্ডামী এসে প্রশ্রয় পায়। আজকাল হয়ত, প্রকৃত অদ্বৈতানুভব বড় কারও নেই, অথচ "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" বলে চীৎকার করে মরছে শুধু মানুষ। কিন্তু তা বলে কি উক্ত বাদের দোষ হল?

বলা হয়ে থাকে, অদ্বৈত-বাদী নিরস, অপ্রেমিক। কিন্তু জগন্ময় যার অদ্বৈতানুভব ব্যপ্ত হয়ে গিয়েছে, তার কাছে যে জগত কত মধুময়, সমানে সমানে যে কি প্রীতি তা কে বুঝবে? অদ্বৈত-বাদীর আসল কথা হল, তিনি কাউকে ছোট রেখে কৃপা করবেন না, সবকে সমান করে ভালবাসবেন। কাজেই অদ্বৈত-বাদীর ভালবাসার মাঝে লৌকিক দৃষ্টিতে একটু নির্দ্দয়তা আছে। অদ্বৈতবাদীর কৃপা নাই। কৃপাও একটা দুর্ব্বলতা। সমানে সমানে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, এর মাঝে আবার কৃপা কিসের? কিন্তু এই নিরস, শুষ্ক, বৈদান্তিকের প্রাণের মাঝেও যে কি গভীর ভালবাসার প্রস্রবণ রয়েছে, আত্মায় আত্মায় প্রীতি-সম্ভাষণের ব্যাকুলতা রয়েছে, তা বাইর থেকে কি বুঝা যাবে? অদ্বৈত বাদীর ভালবাসা করমর্দ্দনে—কেননা তিনি কাউকে ছোটনজরে দেখে পাপ সঞ্চয় করতে চান্ না। সব সমান কাজেই নিজকে তিনি যে ভাবে উপলব্ধি করেন, অপরকেও সেই ভাবে উপলব্ধি করবার মত ব্যবস্থা করেন তিনি। অদ্বৈতবাদী "স্বে মহিম্নি" বিরাজমান, কাজেই জগত তার কথায় সায় দিক্ আর না দিক্, তার দিকে তার কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপও নাই। তিনি নিজের অনুভবকে, নিজের বিশ্বাসকে অপরের অযোগ্যতা দেখে কখনো উড়িয়ে দেন্ না।

অদ্বৈতবাদীর বিশেষত্ব এইখানেই, তিনি তার প্রাত্মপ্রত্যয় হতে কিছুতেই বিচলিত হন না। হয়ত তার অনুভূতির প্রামাণ্য হতে হতে সময় লাগে, কিন্তু আপাততঃ অকৃতকার্য্যতা দেখে স্বীয় মতকে অস্বীকার করে, অপর মত গ্রহণ অদ্বৈত বেদান্তীর দ্বারা কখনো সম্ভবপর নয়। আমি ব্রহ্ম অজর-অমর, এই অনুভূতির চেয়ে সেরা অনুভূতি আর কিছু নাই। কাজেই জন্মার্জ্জিত সংস্কারকে উপেক্ষা করে, এই সত্যিকার অনুভবের কণামাত্র পেয়েও যদি মরতে পারা যায় তা হলে সে মরণ সার্থক মরণ।

দেশ রক্ষা করতে হলে, দেশের দরুণ আপদ-বিপদে প্রাণ দিতে হবেই। কিন্তু অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে কারা? যারা সেই বজ্রদৃঢ় অনুভূতি লাভ করেছে। যারা এই কথা জানে যে, দেহের নাশে আত্মার নাশ নাই; শুধু জানা নয়, অনুভূতির মাঝে স্পষ্ট এই ভাব উপলব্ধি করেছেন। কাজেই রাষ্ট্র-স্বাধীনতার দিক দিয়েও বেদান্ত-বাদের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সাধারণতঃ অজ্ঞ সৈনিকরা, কিছু না বুঝে, না শুনে আইনের ভয়েও

প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু সজ্ঞানে যদি মরণকে বরণ করে লওয়া যায়, তা হলে তার চেয়ে বড় সর্থকতা আর কি আছে? আত্ম-ব্যাপ্তিবোধ নিয়ে মরতে পারা সবের ভাগ্যেই ঘটে উঠে না।

জীবনে অনুভূতি চাই, আর অনুভূতির সেরা অনুভূতিই হল—আত্মানুভব। নিজকে উদার ব্যাপ্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে, তখন কর্ম্মের মাঝেও নবোদ্যম দেখা দেয়। সঙ্ঘ বল্‌তে গেলে এই উদার বৈদান্তিকদের দিয়েই প্রকৃত সঙ্ঘ গঠিত করা যায়। কেননা আত্মানুভব না হলে দুর্ব্বলতা থেকে যাবেই, আর দুর্ব্বল দিয়ে কোন দিন সঙ্ঘ গঠিত হয় না। এইজন্যই সঙ্ঘ হবে—বজ্রদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ী বৈদান্তিক দ্বারা।

বৈদান্তিকের প্রার্থনার মাঝেও একটা বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাব রয়েছে। পুরুরাজা একজন সাচ্চা বৈদান্তিক ছিলেন, তাই তার প্রার্থনার মাঝেও কোন দৈন্য ছিল না। বন্দী হলেও—তার আত্মানুভব অক্ষুণ্ণ ছিল, কাজেই তার উক্তি বন্দীর মত ছিল না। অদ্বৈতবাদের প্রচারক শঙ্করাচার্য্যের মাঝেও কিরূপ নির্ভীকতা ছিল, তা ঈশোপনিষদের একটী ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি। তিনি প্রার্থনা করছেন—"হে প্রাজাপত্য! ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্। সমূহ একীকুরু উপসংহরতে তেজ-স্তাপকং জ্যোতিঃ। যৎ তে তব রূপং কল্যাণ-তমমত্যন্তশোভনং। তৎ তে তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি। **কিঞ্চ, অহং ন তু ত্বাং ভৃত্য-বদ্‌, যাচে,** যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ, পূর্ণং বা অনেন প্রাণ-বুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ, পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ, সোঽহমস্মি ভবামি।"

কি সুন্দর কথা, যদিও আমি তোমার কল্যাণময় সুন্দর রূপ দর্শনপ্রার্থী, কিন্তু তা বলে আমাকে ভৃত্যের ন্যায় মনে করো না! আমাতে তোমাতে অভেদ, এইজন্যই নির্ভীকভাবে তোমার কাছে আমার নিবেদন। আমি ভৃত্য নই, আমার অধিকার আছে তোমাকে বল্‌বার, কেননা তুমি যে আমার আপন আত্ম-স্বরূপ!

এই একটীমাত্র কথায়, মনের স্বাধীনভাব এমন সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে তা আর বল্‌বার নয়। এই নির্ভীক বেদান্তের ভাব, তান্ত্রিকদের মাঝেও কোন কোন জায়গায় দেখা যায়। শাক্ত রাম প্রসাদের মাঝেও এইরূপ নির্ভীক ভাব ছিল। তিনি মাকে ভয় করে কোন কথা বলেন নি! তার মাঝে এইরূপ ভাব ছিল যে, মা দেখা না দিয়ে যাবে কোথা? মায়ের সঙ্গে যে আমার অন্তরের যোগ, নাড়ীর যোগ। কাজেই মাকে কাতর হয়ে ডাক্‌ব কেন? আমার ভয় কিসের? আমি যে ব্রহ্মময়ীর বেটা।

বেদান্তের সঙ্গে তন্ত্রের এই দিক দিয়া আশ্চর্য্য মিল রয়েছে। তন্ত্রের মাঝে যেমন বীরভাব, তেমনি বেদান্তে নির্ভীকবাদ। উভয়েরই অসীম শক্তি করায়ত্ত। উভয়ের অনুভূতির মাঝেই একটা সবল-পুষ্ট ভাবের বীজ রয়েছে!

বাস্তবিকই জাতির সুদিন ফিরিয়ে আন্‌তে হলে, তন্ত্রের, বেদান্তের পুনরালোচনা প্রয়োজন। মানুষ স্বাধীন স্বরাট্, একথা বল্‌বে বেদান্ত; আর মানুষ অসীম শক্তিশালী, মানুষের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই, একথা বল্‌বে তন্ত্র। বেদ-তন্ত্র মিলিয়েই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন!

তন্ত্রের মাঝে উপাস্য-উপাসক ভাব রয়েছে, কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্ত শক্তিকে হজম করে আত্মগত করে নিয়েছে। কাজেই সে শক্তিকে আলাদা করে কোন নামাকরণে বিশেষ কোন মূল্য নাই! শক্তিকে হজম করেই বৈদান্তিকের "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" উক্তি

বের হয়েছে। তান্ত্রিকের মাঝে একটা ভাববিহ্বলতা রয়েছে। কিন্তু বৈদান্তিকের চেতনা অতীব প্রখর, সেইজন্যই বৈদান্তিক আত্মস্থ হয়ে সেই বিহ্বলতাকে হজম করে নিয়েছেন। বৈদান্তিক যা Subjectively পেয়েই তুষ্ট, তান্ত্রিক Objectively তা না পাওয়া পর্য্যন্ত তুষ্ট নয়! এই দিক দিয়ে বল্‌তে গেলে, তান্ত্রিক বিশ্লেষণবাদী, আর বৈদান্তিক সংশ্লেষনবাদী। পূর্ণ জীবনে উভয়েরই একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সাহস চাই, নির্ভীকতা চাই, আর এই অমূল্য সম্পদ্‌গুলি আয়ত্ত হয় একমাত্র-আত্মানুভবে! নিজকে যে পেয়েছে, তার কোন কিছুতেই ভয় নাই। তান্ত্রিক-সাধক নিজকে "ব্রহ্মময়ীর বেটা" বলে উপলব্ধি করে, প্রলোভনের মাঝেই সাধনার আসন পেতে সিদ্ধিলাভ করে, বিজয়ী হয়ে উঠে এসেছেন। মূলে এই অনুভব এই আত্মপ্রত্যয় না থাক্‌লেই, পতন অবশ্যম্ভাবী।

বৈদান্তিক আর তান্ত্রিক এই দু'জনার অসীম সাহস। দু'জনাতেই ভয়, দুর্ব্বলতাকে ঝাটিয়ে বিদায় দিয়েছেন। মানুষ যেখানে ভয়ে জড়সর, সেখানেই তান্ত্রিক বৈদান্তিকের আসন! তাঁরা সেখান থেকেই, অসম্ভবের রাজ্য থেকেই সিদ্ধিলাভ করে উঠেছেন।

শঙ্করাচার্য্যের লিখা পড়্‌লে এরূপ অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়, যাতে তাঁর অসীম সাহস ব্যক্ত হয়েছে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অসীম সাহস এবং আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাস থাক্‌লেই মানুষ এতদূর নীচে নাম্‌বারও সাহস করে।

শঙ্করাচার্য্য যখন মণ্ডনমিশ্রকে তর্কে পরাস্ত করে দিলেন, তখন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী এসে শঙ্করাচার্য্যকে এক কঠোর প্রশ্ন করে মহা সমস্যায় ফেলিয়ে দিলেন। অসীম শক্তিধর ছিলেন বলেই, শঙ্করাচার্য্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। উভয় ভারতীর প্রশ্ন ছিল "কাম-কলা কিরূপ ও কতপ্রকার এবং তার আধার কি? নর-নারীতে তার কিরূপ অবস্থান?"

সন্ন্যাসীর পক্ষে এ হল ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বাদে প্রবৃত্ত, কাজেই তাকে বিরুদ্ধ পক্ষকে নিরস্ত না করলে আর উপায় নাই। বজ্রদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে শঙ্করাচার্য্য পর-শরীরে প্রবেশ করে এ তত্ত্ব জান্‌তেও কুণ্ঠা বোধ করলেন না। মাত্র একমাস সময় চেয়ে নিলেন, উভয়ভারতীর কাছ থেকে। তারপর অমরক নৃপতির শরীরে প্রবেশ করে সে-তত্ত্ব জেনে উভয় ভারতীকে এসে পরাস্ত করেন তবে ছাড়েন।

এই জায়গায় গিরিশ ঘোষের প্রণীত শঙ্করাচার্য্য নাটক বইখানি থেকে একটু উদ্ধৃত করে দিলাম।

শঙ্কর! সন্ন্যাস-আশ্রম মণ্ডন না কর্‌লে গ্রহণ,
জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচার!
কিন্তু মহা বিঘ্ন তাহে বাগ্‌দেবী!
মণ্ডন-গৃহিণী রূপে দেবী সরস্বতী,
কামশাস্ত্র নামে দ্বন্দ্ব মম দেবী সনে!
কিন্তু কাম-চিন্তা যোগীদেহে অতি অনুচিত,
হয় তায় সন্ন্যাস পতন।
করি পরকায় আশ্রয় গ্রহণ
কামশাস্ত্র করিয়ে অর্জ্জন,
পরাজিব মণ্ডন পত্নীরে;
তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয়।

শঙ্করাচার্য্য এক কথাতেই মণ্ডন-পত্নী উভয়-ভারতীকে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পার্‌তেন—কেননা এ হল সন্ন্যাসীর পক্ষে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু তিনি যে বাদে প্রবৃত্ত একথা স্মরণ হওয়ায় এবং নিজের মাঝে যথেষ্ট আত্মবল থাকায় তিনি উভয়-ভারতীকে প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন না! প্রশ্নকারীকে সন্তুষ্ট কর্‌বার দরুণ, তিনি প্রশ্নের যথোত্তর পাবার দরুণ সচেষ্ট হলেন। "কাম-চিন্তা যোগীদেহে অতি

অনুচিত"—একথাও তাঁর জানা ছিল। কাজেই কি করা—একটা উপায় তো বের করে নিতেই হবে। আর উপায় কি, পর-শরীরে প্রবেশ ছাড়া আর উপায় নাই! শক্তিশালী বৈদান্তিকের কাছে সে-পথও আবিষ্কৃত হয়ে গেল। আর বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্য যোগীও ছিলেন। কাজেই পর-শরীরে প্রবেশ তাঁর কাছে অসাধ্য ছিলনা! পাতঞ্জল-দর্শনের বিভূতি-পাদে একটী শ্লোক'ও রয়েছে—"**বন্ধকারণ-শৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।**"

যে কারণে চিত্ত এই একই শরীরে বাঁধা আছে, সে কারণ বিদুরিত হলে অর্থাৎ চিত্তের বন্ধন শ্লথ হলে এবং চিত্তের প্রচারস্থান (শরীরস্থ নাড়ী সমূহ) জান্তে পার্লে, চিত্তকে পর-শরীরে আবিষ্ট করা যায়।

এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝবার দরুণ, কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গালা অনুবাদটী যথাযথ তুলে দিলাম।

"চিত্তের স্বভাব এই যে, সে সর্ব্বগামী, অর্থাৎ সে সর্ব্বত্রই যাইতে পারে। এতাদৃশ সর্ব্বগামী চিত্ত যে কেবল এই একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট শরীরে প্রতিষ্ঠিত আছে, বাঁধা আছে—কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার প্রধান কারণ। সর্ব্বগামী চিত্ত কেবল স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মে জড়িত হইয়াই অসর্ব্বগামী হইয়া আছে! সংযমের দ্বারা, বা সমাধি দ্বারা যদি সেই চিত্ত বন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্ম শ্লথ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, চিত্ত স্বভাবস্থ হয় অর্থাৎ চিত্ত তখন স্বাধীনগতি প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাহার সর্ব্বগামিত্বের কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকে না। সে যে-সর্ব্বগামী, সেই সর্ব্বগামীই হয়। এই সময়ে আর একটী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। কিরূপ জ্ঞান? প্রচার-বিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ তাহার সঞ্চরণ-মার্গ বা গতি-বিধির পথ উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। চিত্ত ও প্রাণ কখন কোন্ পথে অর্থাৎ কখন কোন্ নাড়ীতে কিরূপ করিয়া সঞ্চরণ করে, গুরুর নিকট ও শাস্ত্রের নিকট তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। যদি সর্ব্বগামী চিত্তের বন্ধন শ্লথ করিয়া দেওয়া যায়, এবং তাহার সঞ্চরণ মার্গ জানা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহাকে যথেষ্ট বিনিয়োগ অর্থাৎ যথা ইচ্ছা প্রেরণ করিতে পারা যায়। যোগীরা প্রথমতঃ সংযমের দ্বারা, সমাধির দ্বারা চিত্তবন্ধন শ্লথ করিয়া দেন। তৎপরে গুরুর নিকট, শাস্ত্রের নিকট যাজ্ঞবল্ক্যকৃত নাড়ী নির্ণয় প্রভৃতি বিবিধ যোগ শাস্ত্রের নিকট, চিত্তের বা মনের ও প্রাণের সঞ্চরণের মার্গ অর্থাৎ তাহাদের গতিবিধির পথ নাড়ী-সমূহ উত্তমরূপে অবগত হইয়া সংযম দ্বারা তত্তাবৎকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন। অনন্তর তাহারা চিত্তকে সেই সেই নাড়ীপথ দ্বারা বহির্নিষ্কাশনপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ পর শরীরে প্রবিষ্ট করত তাহতে স্ব-শরীরের ন্যায় সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন। এই শরীরে যে-কোন ইন্দ্রিয় আছে, সমস্তই চিত্তানুগামী। চিত্ত পর-শরীরে প্রবেশ করিলে তৎসঙ্গে চিত্তানুগামী সমুদায় ইন্দ্রিয় তন্মধ্যে অর্থাৎ সেই পরকায়ে প্রবিষ্ট হয়। যোগী আত্ম-শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক পরকীয় শরীরে আপনার মন, প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিগকে প্রতিস্থাপিত করত তদ্বারা ইচ্ছামত আহার বিহারাদি করিতে সমর্থ হন।"

কাজেই যোগশাস্ত্রানুযায়ী শঙ্করাচার্য্যের পরকায়ে প্রবেশ ব্যাপারটা অলৌকিক কিছুই নয়। সাধারণতঃ আমরাও সংযম দ্বারা পরের চিত্ত-মন সম্বন্ধে কিছু জান্তে পারি। কাজেই বিশেষ সংযমশালী যোগী আরও বেশী জান্তে সক্ষম হবেন এতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভোজরাজকৃত পাতঞ্জলটীকাতে বেশ সুন্দর কয়েকটী কথা আছে। যেমন চিত্তবহা নাড়ী, প্রাণ-বহা নাড়ী। এই চিত্তবহা নাড়ীই চিত্ত-সঞ্চার দ্বার অর্থাৎ চিত্তবহা নাড়ীকে অবলম্বন করেই চিত্ত সঞ্চার করতে পারা যায়। তেমনি প্রাণবহা নাড়ী দ্বারা প্রাণ-সঞ্চার করা যায়। কাজেই চিত্ত ও প্রাণের সঞ্চরণ মার্গ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হতে পারলে, পরকায় প্রবেশ একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না।

সংযম না করলে চিত্ত ও প্রাণ কখন কোন নাড়ীতে কিরূপ ভাবে সঞ্চার করে, তা ধরা যায় না, আর বিশেষতঃ এই সব নাড়ী খুব সূক্ষ্ম নাড়ী, সুতরাং নাড়ীজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হতে হলে সূক্ষ্ম যোগপথ অবলম্বন করতে হবে। তারপর নিজের শরীরে এই নাড়ীপ্রচারস্থান বেশ স্পষ্ট ভাবে বুঝ্তে বা প্রত্যক্ষ করতে পারলে তখন পরশরীরেও প্রবেশ করা সহজসাধ্য হয়। প্রত্যেকের ভিতরই চিত্তবহা-নাড়ী প্রাণবহা নাড়ী রয়েছে। কলকব্জা প্রত্যেকের ভিতরই একরকম, কাজেই নিজের শরীরে যিনি এই সব প্রচারস্থান বেশ ভাল করে বুঝে নিয়াছেন, তার পক্ষে পরশরীর প্রবেশ করা কিছুই দুষ্কর নয়, কেন না তিনি যে প্রবেশ পথ সম্বন্ধে expert (বিশেষজ্ঞ)!

শঙ্করাচার্য্য তাঁর গুরুর কাছ থেকে যোগ সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে শিক্ষালাভ করেছিলেন, কাজেই প্রয়োজন পড়ায় উক্ত বিদ্যার চর্চ্চা করতে তাঁর বেশী কষ্ট বা বেগ পেতে হয় নি।

এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় রয়েছে। শঙ্করাচার্য্য কোন প্রলোভনে পড়ে বা স্বার্থসিদ্ধির দরুণ কাম-কলা-তত্ত্ব জান্তে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেন নাই। যোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়েও তিনি পর-শরীরে প্রবেশ করে কাম-কলা-তত্ত্ব জানেন নি। কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তখন যে পশ্চাদপদ হয়ে আসা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের পক্ষে তা অসম্ভব। কাজেই সত্য নিষ্কাশণের দরুণ এবং বাদে যখন প্রবৃত্ত তখন নিতান্ত কুৎসিৎ কাজে নামতেও তার ভয় হয় নি। এ কথা মনে রাখতে হবে, নিছক সত্য-নিষ্কাশণের দরুণ, বা তত্ত্ব জান্বার দরুণই তিনি উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কাজেই একদিকে তাঁর চিত্ত এতখানি সজাগ ছিল যে, কিছুতেই তিনি তত্ত্ব জান্তে গিয়ে প্রলোভনে, বা আসক্তিতে জড়িয়ে পড়েন নি। অবশ্য উভয়ভারতীর ইচ্ছা এই ছিল যে, এই তত্ত্ব জানতে গিয়ে কিছুতেই শঙ্করাচার্য্য নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারবেন না, কিন্তু যিনি শরীরাভ্যন্তরস্থ সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করে বুঝে নিয়েছেন, সেই বিশ্লেষণবাদীর পক্ষে প্রলোভনে পড়ে আত্ম-বিস্মৃত হওয়াটাও যে একান্ত অসম্ভব বাপার তা কিন্তু উভয়-ভারতী বুঝতে পারেন নি। কিম্বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করলে শঙ্করাচার্য্যের এই শেষ পরীক্ষা।

যোগ সম্বন্ধে যদি বিশেষজ্ঞ না হতেন শঙ্করাচার্য্য, তা হলে সাধারণ মনুষের মত তিনিও এককথা বলেই উভয়ভারতীকে নিরস্ত করে দিতেন। আর বাস্তবিকই সন্ন্যাসীর পক্ষে এ হল ধর্ম্ম বিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু অদ্বৈতবৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্যের ছিল Bold Spirit. তিনি বেশ বুঝেছিলেন, যে নিজকে সর্ব্বত্রই তিনি নির্লিপ্ত সজাগ রাখতে পারবেন। কাজেই উক্ত ব্যাপারে নামলেও পতনাশঙ্কা নাই।

অদ্বৈতবৈদান্তিক স্বামী রামতীর্থের মাঝেও এরূপ ভাব দেখতে পাই। সত্য নিষ্কাশণের আমোঘ বীর্য্য তাঁর মাঝেও ছিল। তিনি যখন যেটা ধরেছেন, তা থেকেই সত্য আবিষ্কার করে নিয়ে-ছেন। অবশ্য তার মাঝে কোন কৌতূহল ছিল না। যখন যে অবস্থায় পড়েছেন বা যে প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে তার মাঝ থেকেই তিনি আত্মোপলব্ধির উপায় আবিষ্কার করে নিয়েছেন।

নির্লিপ্ত হয়েও ভালবাসা যায়, অবশ্য ভালবাসার পাত্রের মাঝেও কোন কামনা না থাকা চাই। সাধারণতঃ মানুষ ভালবাসাতে অন্ধ হয়ে পড়ে, কামনায় আসক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু নিজকে সজাগ রেখে যদি এ কথা বুঝতে পারে মানুষ যে কাকে ভালবাসছি, কি জন্ম ভালবাসছি, তাহলে বোধ হয়, ভালবাসার মাঝেও স্বর্গীয় ভাব আসে। কিন্তু সব মানুষ তো আর যোগী নয়, সংযমী নয়, কাজেই অন্ধভাবে নিজকে হারিয়ে ফেলে, সুখাস্বাদন করাই অনেকের জীবনের লক্ষ্য।

শক্তি থাক্‌লে, প্রয়োজন উপস্থিত হলেও সে শক্তির প্রয়োগ না করা দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। আর যেখানে শক্তিপ্রয়োগ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তত্ত্ব-নিষ্কাশণ বা সত্যাবিষ্কার সেখানে তো কোন ওজর-আপত্তি থাকতেই পারেনা !

প্রশ্নকারীর প্রশ্নকে উপেক্ষা করে, স্ব-মতে আন্‌লে তাতে অনেক সময় ক্ষতি হয়। একেই হিপনোটাইজ বলে। এতে বিরুদ্ধ পক্ষও অন্ধ-ভাবে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এর পরিণাম ফল বড় ভাল দাঁড়ায় না। হয়ত শঙ্করাচার্য্য তাঁর অলৌকিক শক্তি দ্বারা উভয় ভারতীর মনকে পরিবর্ত্তন করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা হলে সেটা অন্যায় হত, বা নিজেরেই শক্তির দৈন্য প্রকাশ পেত। নিজকে উদ্বেগে পড়তে হবে বলে, অপরের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে চলা-এর মত দুর্ব্বলতা আর কি রয়েছে ? অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের পক্ষে এর চেয়ে অপমানের বিষয় আর নাই।

প্রলোভনের মাঝ থেকে সত্য-নিষ্কাশণ করতে হলে, নিজকে প্রলোভনের অতীত হতে হবে। তা না হলে প্রলোভনের ক্ষেত্রে গিয়া সবই ঘুলিয়ে যায়, সত্য অবিষ্কার করার কথা মনেই থাকে না তখন। আজকাল অবশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সবকে তন্ন তন্ন করে বিচার করবার উপায় উদ্ভাবন হয়েছে, কিন্তু তা হলে হবে কি, সংযমের অভাবে তন্ন তন্ন করে বিচার করেও প্রলোভনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকও দেখি অচেতন হয়ে পড়েন। কাজেই চিত্তের, মনের উৎকর্ষ না হলে বিশেষণ দৃষ্টি দ্বারাও কিছু আসে যায় না। চাই নিজের শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রচারবিষয়ক জ্ঞান। আর সে জ্ঞান লাভ করতে হলেই সংযমের পথ ধরে চলতে হবে।

পূর্ব্বোক্ত পাতঞ্জল সূত্রে—দুটী উল্লেখযোগ্য কথা পেয়েছি। একটী হল বন্ধকারণ শৈথিল্য। আর একটী হল প্রচারসংবেদন। এই দুটী বিষয় আয়ত্ব থাক্‌লে চিত্তকে পরশরীরে অনায়াসে আবেশ করা যায়। চিত্তের বন্ধন শ্লথ করবার দুটী পথ রয়েছে একটী জ্ঞানের পথ, আর একটী আবেগের পথ। পাতঞ্জল দর্শনে অর্থাৎ যোগমার্গে চিত্তের বন্ধন শ্লথ করবার উপায়ই হল সংযম। এই সংযমের দ্বারা চিত্তের বন্ধন শ্লথ করে দিলে চিত্ত তখন স্বাধীনগতি প্রাপ্ত হয়, তখন আর তার পক্ষে সর্ব্বগামীত্বের কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। সংযমের পথে rational element এর খুবই প্রয়োজন হয়। আবার আবেগ দ্বারাও অর্থাৎ emotional element দ্বারাও চিত্তবন্ধনকে শ্লথ করে দেওয়া যায়—তার প্রমাণ আমাদের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর খুব ঘন ঘন আবেশ হত। তার কারণ তিনি আবেগ দ্বারা খুব সহজ উপায়ে চিত্ত বন্ধনকে শ্লথ করে দিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় যে, মহাপ্রভুর ভাবের সময় নাকি তাঁর শরীরের গ্রন্থী অসাধারণ ভাবে শ্লথ হয়ে যেত। তাতে মহাপ্রভুকে অনেক লম্বা দেখা যেত।

শঙ্করাচার্য্য চলেছিলেন জ্ঞানের পথে, তাই চিত্তবন্ধন শ্লথ করতে গিয়ে তাকে ধরতে হয়েছিল যোগের পথ, আর মহাপ্রভু চলেছিলেন ভক্তির পথে, আবেগের পথে কাজেই তিনি চিত্তবন্ধন শ্লথ করেছিলেন আবেগ দ্বারা emotion দ্বারা।

যাক্, বলতে বলতে মূল বিষয় থেকে অনেক দূর পিছিয়ে পড়েছি। আমাদের মূল বক্তব্য ছিল এই যে, বেদান্তে দেশের কোন ক্ষতি করে নি। বেদান্তের নির্ভিকবাদ দ্বারাই দেশকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তত্ত্ব আবিষ্কারের দরুণ সত্য-নিরূপণের দরুণ বৈদান্তিক spirit না হলে চলবে না। যার মাঝে বেদান্তের ভাব সঞ্চারিত হয়েছে, সে-ই নির্ভিক মন্ত্রে দিক্ষীত হয়েছে। বৈদান্তিক হলে, দেশের কাজ, দশের কাজ ধর্ম্মে রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই সংযত-ভাবে সিদ্ধি লাভ করা যাবে। বেদান্তের অনুভূতিই চরম অনুভূতি, এই অনুভূতি নিয়ে যে যেখানেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করুক না কেন, সিদ্ধি তার অবশ্যম্ভাবী। দেশের প্রাণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দিক্ষীত করতে হলে—বেদান্ত এবং তন্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে। মরা প্রাণে স্বাধীনতার নবীন সতেজ ভাব সংক্রমণ করতে হলে চাই বৈদান্তিক spirit, তন্ত্রের spirit. দেশ জাগছেও এই দুটী বাদকে আদর্শ ধরেই। তবে তান্ত্রিকের মাঝে কিন্তু একটু উন্মত্ততা রয়েছে, শক্তিকে হজম করতে না পেরে তান্ত্রিক অনেক সময় অকাণ্ড ঘটিয়ে বসে, কিন্তু বৈদান্তিক আত্মস্থ—শক্তিকে আয়ত্ত করে নিয়ে স্থির-ধীর-অচল-অটল হয়ে বসে আছেন তিনি। কাজেই তন্ত্রই শেষ নয়—তন্ত্রের ভিতর দিয়ে বৈদান্তিকের আত্মস্থ-ভাবের সন্ধান নিতে হবে।

———

চিঠির উত্তর

সুধীর! তুমি আমাকে সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করেছ, কিন্তু তুমি জান আমি তেমন নামজাদা সাহিত্যিক নই। সাহিত্যের আসরে আমার চেয়ে অনেক গুণী-মানী পণ্ডিত মহাজন রয়েছেন, তবু তুমি যখন আমাকে প্রশ্ন করেছ, তখন আর কি করা আমার যে ক্ষুদ্র জ্ঞান এবং ক্ষুদ্র উপলব্ধি আছে, তারই একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব। তবে আগেই বলে রাখি ভাই, আমার কাছে বিশেষ কিছু পাবে বলে আশা করে উদ্‌গ্রীব হয়ে থেকো না!

সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে অভিজ্ঞতা বড় না অনুভূতিই বড়—এই তোমার জিজ্ঞাস্য। কিন্তু এ বড়ই কঠিন প্রশ্ন ভাই! তবে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে আমি যে ক্ষুদ্র উপলব্ধি পেয়েছি, তাই তোমাকে বলব। কেননা তুমি তো আমার মতই জান্‌তে চেয়েছ! আমার মতে অভিজ্ঞতা সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজন, এ কথার সন্দেহ নেই বটে, কিন্তু আসলে অনুভূতিই হল সাহিত্যের প্রাণ। তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

এইজন্যই দেখি, অনেকেই সাহিত্যের আসরে নেমেছেন বটে, কিন্তু সকলের কথায় প্রাণ যেন তেমন উদ্বুদ্ধ সচেতন হয়ে উঠে না। সাহিত্যিকের আসল কাজই হল অনুভূতির আনন্দ দিকে দিকে সঞ্চারিত করা। আর সেই আনন্দ যে যত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তার রচনার মাধুর্য্যও তত চমৎকার না হয়ে পারে না। মোট কথা আমার মতে অভিজ্ঞতার চেয়ে অনুভূতি বড় জিনিষ। অভিজ্ঞতা প্রয়োজন বটে, কিন্তু অনুভূতি পেলে, অভিজ্ঞতা তখন অনেক পেছনে পড়ে থাকলেও কিছু আসে যায় না। অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্দৃষ্টিও খুলে যায়। তখন অভিজ্ঞতা বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি, তার চেয়ে বড় জিনিষ লাভ হয় আমাদের। অভিজ্ঞতাটা বাহিরের জিনিষ কিন্তু অনুভূতির সহায়ে যে-অভিজ্ঞতা আসে, তা স্থান-কাল এবং সমাজকেও অতিক্রম করে চলে। অর্থাৎ দৃষ্টির ভঙ্গি তখন বদলে যায়। প্রত্যেক জিনিষকেই ভিতরের চোখ দিয়ে দেখবার শক্তি জন্মে তখন। কাজেই সেই অনুভূতির সঙ্গে হয়ত বাহিরের অভিজ্ঞতার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। সাহিত্য যদি বর্ত্তমানের বস্তুতন্ত্রতার বজ্র-আঁটুনীতেই কেবল বাঁধা পড়ে থাকত, তাহলে সে সাহিত্য মানুষের প্রাণে নূতন আলোক, নূতন শক্তি প্রদান করতে পারত না।

মানুষের প্রাণ মুক্তিই চায়, কিন্তু যারা সেই মুক্তির বাণী বহন করে নিয়ে আসেন তাঁরা যদি কেবল বাইরের অভিজ্ঞতা দিয়েই সেই বাণীকে প্রকাশ করতেন, তার মাঝে যদি সাহিত্যিকের সমবেদনার আবেগ মিশ্রিত না থাকত, তাহলে কি দুর্ব্বল, সমাজের বন্ধনে জর্জ্জরিত মানুষ ঠিক মুক্তির আনন্দ প্রাণে প্রাণে আস্বাদন করতে পারত? যা ঘট্‌ছে তাই একমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান নয়। মানুষের ভিতর এর চেয়ে বড় আদর্শ রয়েছে। কাজেই কেবল নিছক বস্তুতন্ত্রতার সাহিত্য ঠিক মানুষের প্রাণের বেদনার যথার্থ পরিচয় দিতে পারেনা।

অভিজ্ঞতা আর অনুভূতিতে রাতদিন পার্থক্য! অভিজ্ঞতা বাইরের জিনিষ, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ কর্‌বার যোগ্যতা এবং শক্তি তার নেই। কাজেই অভিজ্ঞতা থেকে কথা বল্‌লে, মানুষের যথার্থ বেদনার পরিচয় দেওয়া যায় না। সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে, বাহিরের অভিজ্ঞতা বাহিরের সংস্কার সব ভুলে গিয়ে নিজের মাঝে ডুবে যেতে হবে। নিজের মনে, নিজের প্রাণে যে সত্যিকার স্পন্দন উদ্ভূত হয়, তা দিয়েই প্রকৃত সাহিত্য রচনা সম্ভব। কাজেই গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন না হলে প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়া যায় না!

আত্মস্থ হয়ে কথা বল্‌তে না পার্‌লে, সেই কথার কোন মূল্যই থাকে না! মানুষ নিজের বেদনা, নিজের প্রকৃত অনুভব ধরতে পারে না। হয়ত প্রাণে প্রাণে একটা উপলব্ধি করছে, কিন্তু নানা দিকের ভয়ে আশঙ্কায় সে-ই আবার তার উল্টো মত প্রকাশ করছে। কিন্তু এ জায়গায় প্রকৃত সাহিত্যিক এসে সংযত

সুষমা-মণ্ডিত ভাষার ভিতর দিয়ে তার যথার্থ অনুভবটাকেই ফুটিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন। সাহিত্যিক সমষ্টি-মানবের প্রাণের বেদনা ভাষার সাহায্যে অভিব্যক্ত করেন। সাহিত্যিকের কৃতিত্ব এই অভিব্যক্তিতে। অপরের বেদনা, অপরের মনোভাব যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা এত সহজ কথা নয়। এইজন্যই সাহিত্য সৃষ্টি এত সহজ ব্যাপার নয়, সাহিত্যেরও সাধনা রয়েছে। সেই সাধনায় সিদ্ধ না হতে পারলে শুদ্ধ-স্বচ্ছ-স্ফটিকবৎ ভাবোচ্ছ্বাসও বের হয় না!

মানুষের অন্তরের ইতিহাস অতীব প্রচ্ছন্ন থাকে, সেই প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের ধারা খুঁজে বের করতে হলে, দৈনন্দিন সাধনার প্রয়োজন। আর সেই সাধনায় ক্রমশঃই অগ্রসর হওয়া যায়! হঠাৎ কেহই সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেনা, তা সাহিত্যেই হোক্, রাষ্ট্রেই হোক্, আর ধর্ম্মেই হোক্। Byron বলেছিলেন বটে "One fine morning I awoke and found myself great" কিন্তু এই বড় হওয়ার মূলে কত দিনের সাধনা যে নীরবে সহায়তা করে এসেছে তা কে জানে? এই যে আজ একটী ফুল পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে, তার মূলে কত দিনের সাধনা যে অব্যক্তভাবে সাহায্য করেছে তা কি কেও বলতে পারে? আমরা সাধারণতঃ ফলটা দেখেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই, কিন্তু এই ফলের মাঝে যে কত সুখ-দুঃখ, বাধা বিপত্তির ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে, এবং এই সব বাধা-বিপত্তি-বেদনা নিয়েও যে ফল ফল হতে পেরেছে, তা কি কেও ভেবে দেখি?

খুব গভীর ভাবে তলিয়ে গেলে পর মানব-চরিত্রের প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের ধারার সন্ধান পাওয় যায়। বহির্জগত হতে মনটাকে গুটিয়ে এনে, আত্মস্থ হলে, তারপর মানুষের হৃদয়ের যথার্থ আবেগ ধরা পড়ে। কিন্তু কেবল বাহিরের অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষকে বিচার কর্‌লে, সে-মানুষের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে কেমন করে?

সাহিত্য বৈষয়িক অভিজ্ঞতা-গত প্রাণ নয়। সাহিত্যের উন্নত আদর্শ রয়েছে, সেই আদর্শের কথা বাদ দিয়ে কেবল অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ কর্‌লে সেই সাহিত্যে মানুষের উন্নতি হয় না।

মানুষ দোষ করে, ক্রটী করে, কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরই ভাল হবার একটা আন্তরিক অভিপ্রায় রয়েছে। সেই যে ভাল হবার আকাঙ্ক্ষা, চরিত্রকে উন্নত করবার আকুল চেষ্টা—সে সব কথা বাদ দিলে কেমন করে হবে! দৈবী-দৃষ্টি নিয়ে আবিষ্কার করতে হবে, কি করে মানুষ মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত হয়।

বাস্তবজীবনের সুখ দুঃখকে বাদ দিয়ে কেবল আদর্শের কথা বল্‌লেও তাতে কোন কাজ হবেনা। সমবেদনা নিয়ে বিচার করে দেখতে হবে, এই বাস্তব-জীবনের সুখ-দুঃখ উত্থান পতনের মাঝেও মানুষের মহত্ব বলে একটা দুর্লভ জিনিষ প্রচ্ছন্ন, অব্যক্ত থেকে যাচ্ছে কিনা। সাহিত্যিকের আসল কাজই হল প্রত্যেকের ভিতর থেকে এই মহত্বটুকু

আবিষ্কার করা! মানুষ পাপ করে, পাপের অনুশোচনায় নিজের আর সব মহৎ গুণগুলি একবারে ভুলে যায়। তখন তারা নিরাশার সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে, কাজেই তাদের পরিত্রাণ করতে হলে প্রথমেই তাদের অভয় দিতে হবে, তাদের দেখিয়ে দিতে হবে, তাদের জীবনের মহত্বের দিকটা! এইভাবে মানুষকে সুখ-দুঃখে, আশা-নিরাশায় সমবেদনা দেখিয়ে; যে নীচে পড়ে আছে তাকে উপরে টেনে তুল্‌তে হবে। পরস্পরের জীবনের সঙ্গে যে পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ রয়েছে; তা আচরণ দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে সপ্রমাণ করে তুল্‌তে হবে। এই সমবেদনার ভাবটুকু নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করবে, তাই হবে প্রকৃত সাহিত্য নামোপযোগী। মনটাকে ডুবুরী বানাতে হবে, তাকে নামিয়ে দিতে হবে অন্তরের গভিরতম প্রদেশে!-সেখান থেকেই যথার্থ রত্ন আবিষ্কার হয়—রত্নের আড়ক সেখানেই। কিন্তু মনকে তলিয়ে দেওয়া, এত সহজ কথা নয়!

ব্যবহারিক জীবনে আমাদের যে অসংযম ক্ষোভ ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তার মূল অনুসন্ধান করে দেখলে অন্যরকমের একটা ধারনা হয়। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বাইরটা দেখেই মানুষের বিচার করি। এই বিচারে হয় কি, কেবল তাদের মনকে আরও অবনতির পথে নামিয়ে দেবার সাহায্য করে। কাজেই সাহিত্য রচনার পূর্ব্বে গভীর ধ্যানে বসে আগে যথার্থ সত্যানুভূতি নিজের মাঝে লাভ করে, তারপর তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করা উচিত। স্থূলচোখ দিয়ে যা দেখ্‌লাম তাই লিপিবদ্ধ করে গেলাম, এতে মানুষের নিগূঢ় চরিত্রের ইতিহাস কিছুই ব্যক্ত হয়না। এইরূপ উপর-ভাষা সাহিত্য দিয়ে কেবল সাময়িক কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আর বড় বিশেষ লাভ হয় না। আজকাল এইরূপ সাহিত্যের অভাব নাই।

প্রাণের ভিতর শুচিতা না এলে, সংযম না এলে, প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হতেই পারে না। মানুষের ভিতর যে দানব রয়েছে তার কামনা, তার লিপ্সার কথা প্রচার করলেই কি মানব চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হল? মানুষের ভিতর দেবতাও রয়েছে। সেই দেবত্বের উদ্বোধন করাই হল মানুষের আন্তরিক অভিপ্রায়! দানবের সঙ্গে হয়ত অনেক সময় মানুষ পেরে উঠে না, তাই বলে কি দানবের মহিমাই কীর্ত্তন করতে হবে; আর তার ভিতর যে মহৎ সংগ্রাম চলেছিল তাকে কি একবারে ধামা-চাপা দিয়ে যেতে হবে? ব্যক্তিগত রুচিকে বিসর্জ্জন দিয়ে, সত্যের অচল-অটল কেন্দ্র থেকে মানুষের স্বভাব-চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই মানুষ সম্বন্ধে ঠিক সুবিচার, সু-বিশ্লেষণ হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু ভাই সুধির! কয়জন বল তো দেখি সাহিত্য-রচনার পূর্ব্বে ধ্যান-স্তব্ধতায় নিজকে তন্ময় করে দিতে পারে?

আমার নিজের কথা বলছি, আমি প্রত্যক্ষ একটা ব্যাপার সচক্ষে দেখেও, তার সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা না করে কোন মন্তব্য

প্রকাশ করি না। এইজন্যই ভাই আমি তোমাদের মত prolific নই। আমার লেখা খুব অল্প-স্বল্প! আমার যেন মনে হয় সত্য দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য রচনা কর্‌লে খুব অল্প কথাতেই (অথচ তার মাঝে খাঁটী মাল থাক্‌বে) মনের আসল ভাব ব্যক্ত করা যায়।

এই দিক দিয়ে, আমি ঋষি Tolstoy কে আদর্শ বলে ধরে নিয়েছি! আসল কথাটা ধর্‌তে পার্‌লে, বোধ হয় এত বচন না ঝাড়্‌লেও পাঠকের মন-প্রাণকে বেশী উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়।

যাক্, আজ আর বেশী সময় নেই, আর চিঠিতে বেশী লিখতে গেলেও এক দলিল হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে আমার আরও বল্‌বার রইল—যদি তোমার একান্ত ইচ্ছে হয়, তাহলে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, সম্মুখে এ নিয়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা হতে পার্‌বে।

আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

ইতি—

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী

উপেন দা।

হিমাচলের পথে।

৩ আষাঢ় ১৮ জুন শনিবার

পাণ্ডার সঙ্গে কথা ছিল যে, ভোরে এসে আমাদের সঙ্গে গিয়ে সপ্ততলাও দেখাতে রওনা হবে। সকালে উঠে ৬টা, ৭টা, ৮টা বেজে গেল, পাণ্ডার দেখা নাই। দুই একজন লোক পাঠালাম, তারাও এসে খবর দিতে পারলো না—উদ্দেশ্য পাণ্ডাটি যাবেনা। পাণ্ডা না গেলে আমরা কার সঙ্গে যাব? পথ দেখাবার জন্য একজন লোক অবশ্যই দরকার। অগত্যা আমিই একমাইল দূরবর্ত্তি সেই নদীর সঙ্গমস্থানের পাশ দিয়ে নদীটি পেরিয়ে অনেক খোঁজার পর পাণ্ডার বাড়ী যেয়ে হাজির হয়ে জানলাম, পাণ্ডা বাড়ীতে নাই সে কোথায় চলে গেছে। তার মা, ভাই, বোন সবাই বাড়ীতে বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। পাণ্ডা না যাওয়ার জন্য আমি তাদের নানা প্রকার ভয় দেখাতে পাণ্ডাটি ঘর হতে বের হয়ে এল—তার মুখে ভীতির চিহ্ন। তখন তার মা তাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে, যাতে তার কোন বিপদ না হয়, সে জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করলো। তাকে সঙ্গে নিয়ে ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। তখন বেলা ১০টা বেজে গেছে। আমরা সকালে যাবো মনে করে পাকের বন্দোবস্ত করি নাই, কাজেই বেলা হলেও খাওয়া দাওয়া হলনা—তখনই বের হয়ে পরলাম, সেই ১০টার প্রচণ্ড রোদের মধ্যে।

বুড়াকেদারের উত্তরপূর্ব্বকোণে যে বড় পাহাড়টি তাল ঠুকে দাঁড়ায়ে আছে, মনে করেছিলাম তার শিখরে উঠলেই বোধ হয় আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সুতরাং পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পাকদণ্ডী পথে চড়াই করতে লাগলাম। যে পাহাড়টার শিখরে উঠলে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে ভেবেছিলাম, উপরে উঠে দেখি ঠিক সেইরূপই আর একটি বড় পাহাড় তার উত্তরে আবার তাল ঠুকে

দাঁড়িয়ে আছে—এ পাহাড়টি বুড়াকেদার হতে দেখা যায় না। এ পাহাড়টির শিখরে আরোহণ করতে হবে। পুনরায় পাকদণ্ডী পথে রওনা হয়ে, তার শিখরে উঠে দেখি, আবার আর একটি ঐরূপ উচ্চ পাহাড় আমাদের সামনের পথ রোধ করে যেন হাসছে। এ কি মুস্কিল! যেন কোন্ যাদুকরের যাদুবিদ্যায় আমরা অভিভূত হয়েছি। নীচু হতে কিন্তু অত উচ্চ পর্ব্বতের খবরই পাওয়া যায়না! এই দ্বিতীয় পাহারটির শিখরে উঠার পর একটি প্রশস্ত পথ পাওয়া গেল। এতক্ষণ তো অনুমানের উপর নির্ভর করেই পাণ্ডার আদেশ মত চলেছি। এই পথটিও বুড়াকেদার হতে বের হয়ে বালগঙ্গার পাশ দিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে এসেছে! টিহরী মহারাজা একবার এই সপ্ততলাও দেখতে গিয়েছিলেন, সেই সময় এই পথটি তৈরী হয়েছিল, এখন এর অবস্থা প্রায় লুপ্ত। সেই অস্পষ্ট পথে মাইলখানেক যাবার পর দুটি পথ পেলাম। উপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে, আমাদের সেই পথে যেতে হবে! সিধা পাহারের কোল দিয়ে যে-পথটি গিয়েছে, সেটা গ্রামে যাবার। সকলেরই জলপিপাসা লেগেছিল। সেই গ্রাম্য পথে গেলে নিকটেই ঝরণা পাওয়া যাবে। পাণ্ডাজী মহারাজ বলায়, আমরা তার সঙ্গে নীচের পথটিতে খানিক দুর যাবার পর সামান্য একটি উৎস পেলাম! পথে একজন পাহাড়ীর সঙ্গে দেখা হল। গরু-মহিষাদি চড়ায়ে ঘরে ফিরতেছে। এ পাহাড়ে ঘাষ তথা জঙ্গলের অভাব নাই, কাজেই গরু মহিষাদি চড়ান খুব সুবিধা। সে আমাদের দুধ দিবে স্বীকার করায় আমরা উৎসর পাড়ে বসে পাণ্ডাকে দুধ আনতে পাঠালাম। একঘণ্টা অতীত হয়ে গেল—পাণ্ডার দেখা নাই; অগত্যা তার খোঁজে প্রায় মাইল দুই ঘুরে এলাম। লোকজন বাড়ী ঘর কিছুই দেখা গেলনা, কেবল জঙ্গলই জঙ্গল। তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে, কাজেই এই উৎসের পাশে পাক করে খাওয়ার ব্যবস্থায় লেগে গেলাম। এ উৎসটীর উপর হতে জল ঝড়েনা— হাতখানেক লম্বাচৌড়া একটি ছোট কুণ্ডের মত, তার নীচু হতে ধীরে ধীরে জল বের হচ্ছে—কুণ্ডটি ৫।৬ ইঞ্চিও গভীর নয়। জলের খুব অসুবিধা হলেও অতি সাবধানের সহিত সেই জল তুলে পাক করে খাওয়ার পর পাণ্ডাটি পাঁচ সের দুধের হাড়ি সহ এসে উপস্থিত—পাহাড়িটীও সঙ্গে আছে। দুধের দাম ॥০ আট আনা দিয়ে তাকে বিদায় করলাম। পাণ্ডাকে আটা, আলু প্রভৃতি দিলাম, সে পাক করে খেয়ে নিল। তার আসতে অত দেরী হবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, এখান হতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে পাহাড়ীটীর গোশালা। সেখানে তার স্ত্রী দুধ দিতে নারাজ—পাছে দাম না দেই।

আমরা সেখান হতে বেলা ৪টার সময় বের হয়ে আবার সেই দুটি পথের সংযোগস্থলে ফিরে এসে উপরের পথে চড়াই করতে লাগলাম। ক্রমে প্রায় দুই মাইল চলবার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে শীঘ্রই বরিশপাতের লক্ষণ লক্ষিত হতে লাগলো। ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। সঙ্গে বৃষ্টি নিবারণের কোন জিনিষ নাই। এ সবপথে বৃষ্টিনিবারণের জিনিষাদি ছাড়া বের হওয়া মোটেই উচিত নয়, অথচ আমরা একরকম গায়ের জোরেই চলেছি—অহমিকার চূড়ান্ত, বটে! * * * খানিকদুর যাবার পর পাহাড়ীদের একটি গোশালা পেলাম, পাহাড়ীয়া গরু মহিষাদি সেই কুড়ে ঘরে রেখে রাত কাটায়, দিনের বেলায় পাহাড়ে পাহাড়ে গরু মহিষাদি চরিয়ে বেড়ায়। তাদের সেখানে আড্ডা নিলাম। তারা তিনজন অল্পবয়স্ক ছোকড়া, ১৫বৎসরের ভিতরে হবে। কিছু প্রাপ্যের আশায় আমাদের সানন্দে স্থান দিল। এ পাহাড়টি ঘন বন জঙ্গলে আবৃত। দেখতে দেখতে প্রবল জোরে এক পসলা বড় বৃষ্টি

হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘরে থাকার জন্য বৃষ্টিতে বিশেষ ভিজি নি। পাণ্ডাটিকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলে, সে বললো, সামনে থাকার আর কোন স্থান নাই। কাজেই রাত এখানেই বাস করতে হবে।

স্থানটির আশে-পাশে চারিদিকে অনেক আবাদী জমী পড়ে আছে। তাতে দুই হাত আড়াই হাত লম্বা বেতো শাকের ঝাড়! এত বড় বেতো শাকের ঝাড় আর কোথাও দেখি নি। মনে করলাম্, এখানে আজ শাকের নানা প্রকার ভাই-লুপন করে খুব সুখে খাওয়া যাবে। আমাদের কেমন অদৃষ্টের জোর! অত শাক থাকা স্বত্বেও কিন্তু জল নাই। জলশূন্য পাক হবে কি করে? এখান হতে দেড় মাইল দূরে জল আছে, তাও আবার চড়াই উৎরাই পথ। এদিকে সন্ধ্যা আগত—সূর্য্যদেব সমস্ত দিন কিরণ জাল বিকিরণ করে জগতের সেবার পর বিশ্রাম নিতে উদ্যত। অন্য দিকে জ্যোৎস্না রাত্রিও নয়—আজ কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, প্রায় একপ্রহর অস্তে চাঁদ উঠবে। অথচ সকলেই জল-পিপাসায় কাতর। গোশালায় মহিষের কাঁচা দুধের দই ছিল—একটি কাঠের হাড়ীতে, প্রায় তিন সের। সেই তিন-সের দই ।।/০ আনাতে কিনে সকলেই সামান্য সামান্য খেয়ে জল পিপাসার কষ্ট হতে রক্ষা পেলাম। পাণ্ডাকে বললাম, যেভাবেই হোক জল চাই—এদের পয়সা দিয়েও জল আনাও। কিন্তু জল আনবে কিসে? তাদের নিজেদের পানীয় রাখার জন্য দুটি কাঠের ঘড়া ছিল। কিছু পয়সা স্বীকার করায় তারাই সামান্য সামান্য বৃষ্টির মধ্যেই দেড় মাইল পথ চড়াই উৎরাই করে রাত্রি ৮।। টার সময় দুই ঘড়া জল এনে দিল। সেই জল দ্বারা রাত্রির আহার কোন রূপে সমাধা করে, লতা-পাতার ছাউনীর ভিতর গরু-মহিষের মল-মূত্রের দুর্গন্ধে কি করে যে রাত কাটালাম, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব পর নয়। অন্যদিকে সমস্ত রাতই বৃষ্টি হওয়ায় ঘরের ভিতর জল পড়ে সমুদয় জামা কাপড়াদিও ভিজে গেল। বুঝুন, কেমন শান্তিতে ছিলাম।

৪ আষাঢ় ১৯ জুন রবিবার—

সমস্ত রাত বৃষ্টি হলেও সকালে তার জোর কমে নি, বরং রাতের চেয়েও জোরে বৃষ্টি হতে লাগলো। রাতে তো সমস্ত জামা কাপড়াদি ভিজেই গেছে সুতরাং নূতন আর কি ভিজবে! বসে বসে ভিজার চেয়ে সামনের ৪ মাইল পথ এগিয়ে চলা যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় কম্বলমুড়ী দিয়ে বের হয়ে পড়লাম। চিদানন্দমহারাজ ও সারদাভায়ার সঙ্গে ছাতি ছিল; অন্য সকলেই কম্বলমুড়ী দিয়ে বের হয়ে অনবরত ভিজতে ভিজতে ধীরে ধীরে চড়াই পথে চলে দুই ঘন্টার মধ্যেই তিন মাইল চড়াই করার পর, এক মাইল সীধা ও উৎরাই পথে যেয়ে একটি তলাও পেলাম। বুড়াকেদার হতে ৮ মাইল আমরা পাকদণ্ডী পথে ক্রমোচ্চ চড়াই করে এসেছি।

সপ্ততলাও
৯ মাইল

এদিকে বৃষ্টি আরও জোরে মুষলধারে বর্ষিতে লাগিল। ১০।১২ হাতের দূরের জিনিষ দেখাও অসম্ভব। পথেও বরাবর বৃষ্টিতে ভিজ্তে ভিজ্তে এসেছি। তলাওটি দেখে কিন্তু পিত্তি চটে গেল! এই তলাওয়ের এত প্রশংসা! বাংলার প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর পিছনেই এর চেয়ে বড় বড় ডোবা বিদ্যমান আছে। কি আর লিখবো! এখানে গরু-মহিষাদি চরাইবার জন্য লোক থাকতো, পার্শ্বেই তার ভাঙ্গা কুড়ে প্রমাণ দিচ্ছে। আজকাল অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় জন্য সকলেই নীচে নেমে গ্রামে চলে গেছে। পাণ্ডাটির বিশেষ অনুরোধে নিকটবর্ত্তী দ্বিতীয় তলাওটিও দেখতে গেলাম, সেটা এর চেয়েও ছোট। দুটী তলাওয়ের

চারিদিক ঘুরে এলেও দুই ফার্লং হবে না—জলও সামান্য। এ সব দেখে ভক্তির পরিবর্ত্তে ঘৃণার ভাব উদয় হল। তখন বেলা ৮ টা। অন্য ৫ টা তলাওয়ের খবর জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আরও ১৮ মাইল পথ চরাই করলে সে স্থানে যাওয়া যায়, সে চিরবরফাবৃত দেশে পাণ্ডা সে পথ চিনে না, আমাদের দেখবার প্রবৃত্তি ও কমে যাওয়ায়, শীঘ্র নেমে আস্‌বার জন্য উদগ্রীব হলাম।

এদিকে অত কষ্ট করে এসে, কিন্তু একটি জিনিষ দেখে বাস্তবিকই আনন্দ হয়েছিল—সে একজন পাণ্ডার কষ্টসহিষ্ণুতা বা তিতিক্ষা বা লোভ। সপ্ততলাওয়ের মালিক বুড়াকেদারের পার্শ্ববর্ত্তী অন্য একটি গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ। আমরা সপ্ততলাও দেখতে যাত্রা করেছি, সে বেচারী সংবাদ পেয়ে কাপড়ের কোটে দুইদিনের নিমক রুটী বেঁধে তলাওয়ের পাশে উপনীত হয়ে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজেছে, অবশ্য তার সঙ্গে একটি ছাতী ছিল সেরূপ প্রবল বৃষ্টিতে ছাতী আর কতটা রক্ষা করবে? আমাদের তলাওয়ের জলে স্নান করে পূজাদি করার জন্য অনুরোধ করলেও, তলাওয়ের দৃশ্যে আমাদের ভক্তি চটে যাওয়ায়, আমরা তাড়াতাড়ি নাম্‌বার জন্য রওনা হলাম। আমাদের পাণ্ডাটিও তার সঙ্গে সায় দিয়ে শ্রাদ্ধাদি করবার জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কে আর সে কথা শুনে? বৃষ্টিতে ভিজে তো স্নান হয়েই গেছে। এবং সমস্ত রাত-দিন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্তেরও ফল লাভ করেছি, আর প্রায়শ্চিত্ত করবার দরকার নাই; তাদের বলে আমরা ফিরে আসার জন্য তখনই রওনা হলাম। যে-স্থান হতে একমাল উৎরাই ও সীধা গিয়েছিলাম, সেই স্থানটি সীধা ও চড়াই করে এসে একটী কুঁড়ে-ঘড়ে আশ্রয় নিলাম। এখানেও একজন পাহাড়ী একটী ছোট কুঁড়েঘর তুলে মহিষাদি চড়ায়। আমাদের সকল লোকের আশ্রয় হতে পারে, এমন স্থান সেখানে নাই। তার ধুনিতে হাত-পা গুলি একটু ছেকে নিয়ে গরম দুধ এক পোয়া করে খেয়ে, বুড়াকেদারের জন্য রওনা হলাম। উৎরাই পথে আমাদের খুব আনন্দ হয়—আমরা দৌড়ে উৎরাই করতে থাকি, তাতে ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে থাকি। আজও আমরা সেইভাবে দৌড়িয়ে নামতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টির জন্য পথ পিচ্ছিল হওয়ায় সাবধানে চলে বেলা ১টার সময় বুড়াকেদারে ফিরে আসি। তখনি কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেছে—তথাপি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আসার সময় ছোট মা পা চড়কে পড়ে যেয়ে, হাটুতে খুব চোট পেলে। আমাদের সেই অব্যর্থ ঔষধ **কানাইয়া লতা** দেওয়ায় দুই একদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে গেছিল। আমরা চলবার সময় যখনই কানাইয়া লতা দেখেছি, অমনি তুলে জলের লোটাতে করে বয়ে নিয়ে গেছি—জিনিষটি এমনই দরকারী। রাতেও এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়।

তলাও দেখে আমরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় পাণ্ডাজী লম্বা বাড়ী গিয়েছিল—আমাদের সঙ্গে দেখা করে নি। পরে তাকে ডেকে এনে দুটী টাকা দক্ষিণায় করেছিলাম। আমাদের সমস্ত জামা কাপড় ভেজার জন্য আজ রাত খুব কষ্টে কাটাতে হল। সকলেই কম্বলাদি শুখাবার জন্য শুকুতে দিয়ে ঘুমুলে সকালে সকালে উঠে দেখি পাগলীমার একটি ভাল কম্বল চুরী গেছে। খুঁজে ২ পেলাম না। সে একজন বৈষ্ণবসাধুবেশধারী চোর চুরী করেছিল। তাকে বদরীনারায়ণে ধরে কম্বল আদায় করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—সে কথা পরে বলবো। এর নিকটেই পাহাড়ের কন্দরে মহর্ষি বশিষ্টদেবের আশ্রম আছে—আমাদের দেখার সুযোগ হয় নি, কিন্তু পাঠকগণকে অনুরোধ করছি, তারা যেন পাণ্ডার কথামত সপ্ততলাও দেখতে রাজি হয়ে কষ্ট না পান। আমাদের আজকাল অনর্থক দুদিনে ১৮ মাইল

পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, তথা কষ্টও যথেষ্ট হয়েছে।

৫ আষাঢ় ২৪ জুন সোমবার—আমরা বুড়াকেদার হতে রওনা হয়ে দেড়মাইল বেশ চড়াই করে এবং আড়াই মাইল পথ সীধা এসে রাইগড় চটীতে আড্ডা নিলাম। চটীর পার্শ্বেই একটি খুব সুন্দর ঝরণা আছে। দ্বিপ্রহরের আহারের পর সামান্য চড়াই ও সীধা পথে একমাইল চলে মাল্লাচটী।

রাইগড়
৪ মাইল

চিদানন্দদা ও হরিদাসভায়া ইচ্ছা করেই রাইগড় চটীতে থাকলেন, এ চটীতেও জলের খুব সুবিধা। প্রকাণ্ড একটি ঝরণা পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওরা দুজন আজ না আসাতে আমরাও এখানেই আজ থাকা স্থির করলাম, এখানে ঘি বেশ সুবিধা, টাকায় ।৷৵০ পোয়া। ভাল ঘি পাওয়ায় আমরা এক টাকার কিনে নিলাম। অন্য জিনিষাদি বুড়াকেদারের মত। সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি হওয়ার জন্য খুব শীত লেগেছিল। দুধ বেশ পাওয়া যায়, তিনআনা সের। কিন্তু দোকানদারগুলি পয়লা নম্বর চোর, দুধে জল মিশিয়ে থাকে। আমাদের সামনে দুধ দুইয়ে দিবার সময় ভাড়ের ভিতর অনেক জল এনেছিল। দোকানদারকে জলশুদ্ধ ভাড় ধরাতে থ বনে গেল। অনেক দুধ কিনে খোয়া তৈরী করে নিলাম, আজ মাত্র ৫ মাইল পথ এসেছি, সকলেরই শরীর সামান্য সামান্য অসুস্থ। মাল্লাচটী অপর নাম উাল্লা চটী।

মাল্লা চটী
১ মাইল

৬ আষাঢ় ২৫ জুন মঙ্গলবার—আজ খাড়া পাকদণ্ডী পথে চড়াই করতে হবে। কাজেই খুব ভোর বেলা বের হয়ে বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খাড়া পাকদণ্ডী চড়াই করে তিন মাইল আসার পর ভৈরবচটী পেলাম। এ চটিটী বেশ পাহাড়ের উপর সমতল ভূমিতে অবস্থিত, স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ সুন্দর। ভৈরবজীর মন্দির আছে, জলের কষ্ট—চটী কয়েকটি। এখানে টাট্‌কা পেড়া পাওয়ায় এক টাকার পেড়া কিনে রওনা হলাম—উদ্দেশ্য সকলকে পেড়া খাওয়ান যাবে। কিন্তু দোকানদারগুলি ফাঁকিবাজ। পেরার মধ্যে যথেষ্ট আটা মিশান ছিল, তা তখন বুজতে পারি নি। এখান হতে বের হয়ে সামান্য সামান্য চড়াই করে দুই মাইল আসার পর গোলভোট চটী। এখানে ঝরণার পাশে বসে বাসী রুটী ও পেড়া দ্বারা প্রাতর্ভোজন করে আবার বের হয়ে পড়লাম। আজই সর্ব্বপ্রথম হিমালয়ে বসে রুটী খেলাম, খুব অন্যায় হয়েছিল। যার ফল কালই ভোগ করেছি। এখান হতে ক্রমে সীধা ও উৎরাই পথে চলে একটি বড় ঝরণার উপর পুল পাড় হয়ে ৮মাইল দূরবর্ত্তী গুত্তু বা রঘুনাথচটীতে এসে পৌছি। এ চটিটী বেশ ভালস্থানে অবস্থিত। আসার সময় পথে কয়েকটি গ্রাম পেয়েছি, আজ সকলেই তের মাইল পথ অতিক্রম করেছি। তখন বেলা ১টা বেজে গেছে রাস্তাটি বেশ ভাল। গুত্তু চটীতে বাবা কালীকম্বলীবালার সদাব্রত পেলাম—আটা আধসের, ডাল মিরচী দুটী। গুত্তু চটীতে পৌছবার পূর্ব্বেই একটি বড় নদীর উপর পুল পাড় হতে হয়। এটি ভিলঙ্গ গঙ্গা—গোমুখীর নিকট বরকান প্রদেশের দক্ষিণদিক হতে উৎপত্তি হয়ে গুত্তু চটীর পাশ দিয়ে টিহরীতে যেয়ে ভাগীরথীগঙ্গাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

ভৈরবচটী
৩ মাইল

গোলভোট
২ মাইল

গুত্তু চটী
৮মাইল

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজীর সুন্দর মন্দির থাকায় এ চটীটির অন্য নাম **রঘুনাথ** চটী। কিন্তু গুত্তু নামেই প্রসিদ্ধ। বাবাকালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালা লোকে ভর্ত্তি হওয়ায় আমরা চটীবালার ঘরে জায়গা নিলাম। শ্রীমৎ ব্রজমোহন দাস নামীয় জনৈক রামানন্দ বৈষ্ণব সাধু দ্বারা উক্ত রঘুনাথজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। দ্বিপ্রহরের আহারের পরই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঘরটী দেখতে শুনতে বেশ ভাল হলেও বেশ জল পড়ে। সুতরাং বৃষ্টিতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। এখানে মোটা চাউল টাকায় ছ'সের, ঘী আধ সের, স-খোষা ডাল দেড় সের।

৭ আষাঢ় ২২ জুন বুধবার—খুব সকাল সকাল গুত্তু হতে বেড় হয়ে, ভিলঙ্গ নদীর পাড় দিয়ে উত্তর দিকে আধ মাইল যাবার পর পূর্ব্ব দিকে ঘুড়ে চড়াই করতে লাগলাম। এর মধ্যে একবার ভিলঙ্গ নদীর পুল পাড় হতে হয়েছে। গুত্তু

গওয়ান গ্রাম
১ মাইল

হতে ১ মাইল আসার পর **গওয়ান** গ্রাম। এই গ্রামে মাত্র একটি দোকান। কোন যাত্রী বিশেষ বিপদ-গ্রস্থ না হলে, কেউ এখানে থাকে না—সকলেই গুত্তু চলে যায়। আমরা এখানে না থেকে ক্রমে চড়াই করতে লাগলাম। পাহাড়ে চড়াই করবার সময় গ্রামবাসীগণের জমির চিত্র দেখে খুব আনন্দ হল। গ্রামবাসীরা যতগুলি জমিন আবাদ কচ্ছে সবগুলীই কোথাও বা বর্ত্তুলাকার, কোথাও বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার, কোথাও বা বাদামী আকার, কোথাও বা সতরঞ্চ, পাশাখেলার প্রভৃতি নানা প্রকার আকারে জমিতে ধান বুনেছে। চড়াই করার সময় তাদের জমির উপর কারুকার্য্য দেখে চড়াইয়ের কষ্ট ভুলে যেতে হয়। বন-জঙ্গলের ভিতর পাহাড়ের কন্দরে বাস করেও এদের সৌখীনতা বা এদের মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য উপভোগের একটি প্রবল আকাঙ্খা আছে আশ্চর্য্য বটে! ক্রমে দুই মাইল চড়াই করে **ডুন্ডুরানী** নামক চটী।

ডুন্ডুরানী
২ মাইল

গওয়ানা গ্রাম হতে ডুন্ডুরানী সমস্ত পথটাই খাড়া পাকদণ্ডী চড়াই। এখানে জলের খুব কষ্ট বলে বাবাকালী-কম্বলীবালার জলছত্র আছে। নিকটেই অতি ক্ষুদ্র একটি দোকানে চানা, গুড়, দুধ মিলে। থাকার কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা এখান হতে এক পোয়া মালাই (দুধের সর) এক টাকা সের কিনে রওনা হলাম। আবার ঐরূপ দেড় মাইল খাড়া পাকদণ্ডী চড়াই করে **গওয়ান মণ্ডী**

গওয়ান মণ্ডী
১॥ মাইল

নামক চটী পেলাম। এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে। তবে জল প্রায় এক ফার্লং দূরে—সামান্য কষ্ট। তিন জন দোকানদার, সকলেই বেশ ভাল লোক। এখানে গরম গরম পুরী ভাজিয়ে দুধের সর দ্বারা গলাধঃকরণ করলাম। পুরী ৸৵৹ আনা দুধের সর ১৲ টাকা। দুধ যথেষ্ট মিলে। অনেক বেলা হয়ে গেছে, তা ছাড়া খাড়া চড়াই পথ। আমি হরিদাসভায়া বড় মা বৃন্দাবনের একজন মাতাজী ও সারদাভায়া বাদে আর সকলেই রওনা হয়ে গেছে। সঙ্গীয় সকলেই পুরী দ্বারা জলযোগ করলেও আমরা এখানে কিছু বেশী সময় বিশ্রাম করাতে আরও খারাপ হল—রোদের তীব্র তেজে রওনা হতে হ'ল। এখান হতে প্রায় দু'মাইল চড়াই করে, শরীর এমন অসুস্থ বোধ করলাম যে, আমরা সেই খাড়া ঢালু পাহাড়ের উপর সকলেই খানিকক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করে নিলাম। সকালে খেয়ে পথ চলাতেই আমাদের অসুখ করতো, আজকে জিহ্বার লোভে পড়ে বা পথ অতীব কঠিন বা অতি দূরে অবস্থিত বলে বা গরম লুচি ভাজতে দেখেই বোধ হয় খাবার ইচ্ছা হয়েছিল। সেখানে ঘণ্টা দুই নিদ্রা যাবার পর আবার চড়াই করতে

আরম্ভ করলাম। আমরা উপরোক্ত পাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলেই চলে গেছে।

দোফ্রন চটী
৩॥ মাইল

এখান হতে আরও দেড় মাইল খাড়া চড়াই করে দোফ্রন চটী পেলাম। মনে করেছিলাম অন্যান্য সকলেই বোধ হয় এখানে আছে। কিন্তু চটীতে পৌঁছে কাকেও দেখতে পেলাম না। সকলেই সামনের চটীতে চলে গেছে। এখানে মাত্র একখানা চটী, খাবার জিনিষাদি ভাল পাওয়া যায় না। এখনও চড়াই শেষ হয় নি। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। মনে করলাম এখানে পাক করে খেয়ে দেয়ে সামনের চটীতে চলে যাব। কিন্তু এখানে নুন আটা ভিন্ন, চাল ডালাদি অন্য কিছুই নাই। তা ছাড়া জলও কাছে নয়, অগত্যা আবার রওনা হলাম। এ সময় আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে পরেছি, তখন ১২ টা বেজে গেছে। রৌদের প্রখর তাপে ক্লিষ্ট হওয়া দূরে থাক্, ক্রমেই শীতে শরীর কাঁপতে লাগলো। আমরা অনেক উচ্চস্থানে উঠেছি, কাজেই শীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এখান হতে বের হয়ে খাড়া দুই মাইল চড়াই করবার পর, পাহাড়ের শীরদেশে পৌঁছি। এত কষ্ট সহ্য করে এ স্থলে এসে খুবই আনন্দ হল। এমন সুন্দর স্থানে আজ পর্য্যন্ত আমরা উঠি নাই! এ দু'মাইল পথ আমি খুব জোরে চলে এসেছি। সঙ্গীয় সকল লোক পেছনে থাকায় একটী পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসে বসে সকলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। উপরন্তু তীক্ষ্ণ রবির কিরণে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন রবির তেজ আরও প্রখর হলে ভাল হত। উত্তরদিকে সমুদ্রের তরঙ্গের মত রাশি রাশি বরফাবৃত অভ্রভেদী পর্ব্বতের শৃঙ্গমালা সমুন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। উত্তর দিক থেকে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাতাসের ঠাণ্ডার কথা ভুলে যেয়ে অবাক হয়ে চারিদিকের প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগলাম। গুপ্ত চটী হতে আসার সময় বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ৮ মাইল দুরস্থ দোকান চটী পর্য্যন্ত অসংখ্য বড় বড় গাছের নীচু দিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু দোকান চটী হতে এস্থানে আসতে বড় গাছ তো মোটেই নাই, মাঝে মাঝে নানা প্রকার ঋতু-পুষ্পে (Season flower) চারিদিকের পাহাড় শোভায়মান।

এ পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি শীতকালে ছয় সাত মাস বরফাবৃত থাকে, আজকাল বরফ গলে গেলেও মাঝে মাঝে বরফ থেকে শীত কালের বরফাবৃত্তের কথা স্মরণ করায়ে দিচ্ছে। পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে কোথাও পাথর দেখা যাচ্ছে না। বাংলা দেশের খেলবার মাঠ যেমন সুন্দর দুর্ব্বাঘাষ দ্বারা মখমলের বিছানার মত পরিপাটিরূপে সজ্জিত থাকে, এ স্থানের পর্ব্বতের শৃঙ্গগুলিও তেমনি প্রকৃতিদেবী যেন পাথরগুলি সব বেঁছে বেছে নীচুতে বিছিয়ে দিয়ে দুর্ব্বাঘাষের দ্বারা মখমলের বিছানার মতই যেন সজ্জিত করে রেখেছে এবং সেই বিছানার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য আপন হাতে নানা প্রকার রং-বেরঙ্গের সিজন-ফ্লাওয়ার উৎপন্ন করে তার সৌন্দর্য্য শত শত গুণে বর্দ্ধিত করে পথিকের শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরের সমস্ত গ্লানি অপহরণ করত: কি যেন এক অজানিত আনন্দের উদ্দেশ্যে প্রাণ আকুল করে দেয়। সে যে কি মধুর দৃশ্য! কেমন করে তার সম্যক বর্ণন করবো, আমরা সামান্য কীটানুকীট ক্ষুদ্র জীব হয়ে, কতপ্রকার আস্ফালনেই না ভগবানের হতে বুদ্ধিমান, মহীয়ান, গরীয়ান বলে ধরাকে কম্পিত করে তুলি; কিন্তু একবার পাহাড়-পর্ব্বত বনজঙ্গলের কন্দরে কন্দরে প্রবেশ করে বিশ্বপিতা বিধাতার বিশ্ব সৃষ্টির বিশ্বমোহন দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, আমাদের বুদ্ধির গর্ব্বতা নষ্ট হয়ে আপনা আপনিই প্রাণের অন্তঃস্থল ধ্বনিত করে বের হয়ে পড়ে :—

তুমি অন্তহীন, বিরাট, এ নিখিলব্যাপী-অচ্যুত-অক্ষর,
আমি ধূলিকণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ বিনশ্বর॥
তুমি নিত্যমঙ্গল, জ্যোতি: নির্ম্মল, শান্ত সুমধুর উজ্জ্বল।
আমি অন্ধ, তমসাচ্ছন্ন, নিস্প্রভ, পাপ-পবন বিচঞ্চল॥
তুমি পরম সুন্দর, বিশ্ব ভূষণ, পুণ্য বিভব-অলঙ্কৃত।
আমি অধম, কুৎসিত, দুঃখ পীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত
তুমি মধুর করুণা সান্দ্র লহরী তৃষাতুর চিরপোষণ॥
আমি শুষ্ক, নীরস, কঠিন, নির্ম্মম, জীব শোণিত শোষণ॥
আমি গর্ব্ব করি তবু, পুত্র তব প্রভু! ভ্রমি সুমঙ্গল পদতলে
তুমি এক গৌরব গর্ব্ব, বঞ্চিত না কর প্রভু দুর্ব্বলে॥

প্রশ্ন

আচ্ছা, অতুল বাবু বলুন তো দেখি, এই ১০।১২টী ছেলেকে নিছক ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে জীবনের কতখানি উন্নতি লাভ করিয়ে দিয়েছেন! এই যে দিন নাই, রাত্র নাই কেবল নীতির বচন, এ সবে এদের জীবন-গঠনের পক্ষে কতখানি সহায়তা করেছে? এদের জীবনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সবকে অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে এই 'ভাল-ছেলে' গঠনের জেল তৈরী করে বাস্তবিকই কি আপনি তৃপ্তি অনুভব করছেন?

সে দিন আপনার ঐ ছেলেদের মাঝ থেকেই দুটী এসে আমাকে তাদের দুঃখের কাহিনী জানালে! তারা নিরুপায়, প্রাণ মরে গিয়েছে, কেঁদে কেঁদে তাদের মনের গোপন কথা ব্যক্ত করলে আমার কাছে! ননী বললে, দেখুন বিজয়দা, আমার পড়াশুনার দিকে বেজায় ঝোঁক, কিন্তু গুরুজী হাতে বই দেখলে রেগে-চটে লাল! বলেন কি, বই-টই পড়ে কিছু হয় না, কেবল নাম জপ করবি? আচ্ছা বিজয় দা, বলুন তো দেখি, সব সময় নাম করতে করতে একটা অবসাদ জড়ত্ব আসে কি না? তারপর মনে এখন কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা জাগে, একটাও পূরণ করবার সুবিধা-সুযোগ নাই! পড়াশুনা করলে কি মানুষ অধার্ম্মিক হয় নাকি? আর মনে-প্রাণের যথার্থ অভাবকে পিসে মেরে ফেলবার চেষ্টা করলেই কি সহজে তা মরে! আমি তো একটু সুযোগ পেলেই অমনি বই নিয়ে বসি। অবশ্য এর দরুণ আমাকে কত তিরস্কার, কত লাঞ্ছনা যে ভোগতে হয়, তার সীমা নেই। কি করব, আমার সত্যিকার আকাঙ্ক্ষাকে তো কিছুতেই আমি দমন করতে পারি না! ধ্যানের চেয়ে আমার পড়াতেই মন বসে বেশী। এমন কি কিছু সময় ধ্যানের পর মনে আবোল-তাবোল চিন্তা আসে। তখনও বসে থাকতে হবে, কেননা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১মিনিট আগে উঠলে সে দিন রক্ষে নাই! কি করব, জোর করে বসে থাকতেই হয়! আর কারো জন্যি নয়, বিজয় দা তুমি একবার গুরুজীকে বলে-কয়ে যদি আমার পড়ার ব্যবস্থাটা করে দিতে পার তাহলে আমি বাঁচি আর কি? ধ্যানে বসে অযথা যে-সময়টা আমার নষ্ট হয়, সে-সময়টুকু যদি পড়তে পেতাম, তাহলেও আমার আকাঙ্ক্ষার কতকটা তৃপ্তি হত…… ইত্যাদি।" এই তো গেল এক ছেলের কথা। আর নিত্য বললে, বিজয়দা, আমার খুব ইচ্ছে হয় আমি একজন যোগী হই! আমার যোগের দিকে স্বাভাবিক টান রয়েছে। গুরুজী বলবেন, না তোকে দিয়ে ও সব হবেনা, তোকে লাঙ্গল নিয়ে ক্ষেতে চাষ করে স্বাবলম্বনের আদর্শ শিক্ষা দিতে হবে মানুষকে। মনের সঙ্গে লড়াই করে করে এতদিন চাষবাস করে দেখেছি, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। হবে কেমন করে বলুন না বিজয় দা, আমার প্রাণ চায় এক জিনিষ আর গুরুজীর আদেশ হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত"

এখন বুঝে দেখুন অতুল বাবু, আপনার উপদেশে সব ছেলে তুষ্ট নয়! আপনি চাচ্ছেন এদের প্রাথমিক অভাবকে অপূর্ণ রেখেই, ধার্ম্মিক করে তুলতে, কিন্তু সব ছেলের তো তাতে সুফল ফলবে না। সব ছেলেই সমান নয়, কারও কারও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে প্রবল। তাদের উপর জোরজুলুম করে কোন ফল হবে না। ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিলে কি হবে, ছেলের মন-প্রাণ বুঝে শিক্ষা না দিতে পারলে সেই ব্রহ্মজ্ঞানে কোন হিত সাধন করবে না। যে দুটী

ছেলে তাদের আন্তরিক অভিপ্রায় আমাকে, জানিয়েছে, তাদের তো কোন দোষ দেখছি না। তাদের প্রাণ যা চায় তাই আমাকে খুলে বলছে। দেখুন আপনি ওদের আচার্য্য, গুরু কিন্তু আপনাকে ওরা ভয় করে। কেন ওরা ভয় করে? না, আপনি শুনলে রাগ করবেন—কোন ব্যবস্থা বা প্রতিকার করবেন না তার। এটা কি আপনার সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য হল ?

কেন সব ছেলেকে আটকিয়ে রাখা কেন? পারুন যদি, তা হলে ব্যবস্থা করুন, আর তা না হলে যারা গতানুগতিক পন্থাতেই তুষ্ট, কোন প্রশ্ন তুলে না, তাদের নিয়ে বেশ ধর্ম্মালোচনা করুন, কিন্তু যারা শিক্ষা চায়, তাদের জোর করে শিক্ষা না দেওয়া আপনার কিরূপ বিবেচনা বলুন তো দেখি? তবে কি মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধির উৎকর্ষ না হলেই একমাত্র ধর্ম্মলাভের আশা! বেশী পড়লে, বেশী শিক্ষা দিলে ছেলেরা কি জানি নাস্তিক হয়ে যায়, অজ্ঞেয়বাদী হয়ে যায়, এই ভয়ে কি ছেলের মনে-প্রাণের যথার্থ আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে চলতে হবে? এই যদি আপনার মনোভাব হয়ে থাকে তাহলে ছেলে শিক্ষা দেবার ঔদার্য্য এবং মহত্ত্ব আপনার মধ্যে নাই বলতে হবে। এরূপভাব নিয়ে আপনি ছেলের হিতের চেয়ে অহিতই করবেন বেশী।

অতুল বাবু— "দেখ বিজয়, আমি যা করেছি বেশ বুঝে শুনেই। আজকাল ছেলেদের চিত্ত এরূপ উচ্ছৃঙ্খল বলেই আমি একটু কড়া বিধি-নিয়ম করেছি। তাদের চিত্তে মোটেই একাগ্রতা নেই। কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায় তাদের মন। আর মনকে স্থির করা সহজ নয়, দৈনন্দিন অভ্যাস-প্রযত্ন না থাকলে মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারা যায় না। ধর্ম্মলাভ এত সুলভ নয়, অথচ আজকালকার ভাব হল এই যে, বেশ খেয়ে-দেয়ে সহজ ভাবে জীবন-যাপন করলেই প্রচুর ধর্ম্মলাভ হবে! বেশী বই পড়ে পড়ে মনটা এমন উদার-ব্যাপ্ত হয়ে যায় যে, শেষে আর কোন একটা বিষয়েই মনকে তন্ময় করা যায় না! আমি বেশ দেখেছি, বেশী বেশী বচন যারা আওড়ায়, তাদের একাগ্রতা-শক্তি মোটেই নাই। কাজেই আমার আদর্শে আমি কোনই মারাত্মক ভুল দেখ্‌ছি না। আমি ধর্ম্মলাভকে এত সুলভ মনে করি না। যারা সহজ সহজ বলে চীৎকার করে, তাদের মাঝে নিশ্চয়ই ভণ্ডামী রয়েছে। তারা দুর্ব্বল, তাদের শক্তি নাই, কাজেই সহজ-পথ আবিষ্কারের দরুণ এত সচেষ্ট, এত ব্যাকুল।"

বিজয়!—দেখুন, অতুল বাবু আপনি ছেলেদের মনকে একাগ্র করতে চান্। কিন্তু একাগ্রতার পথ কি মাত্র একটী, আর কোন পথ থাক্‌তে পারে না? সব ছেলের ধ্যানে মন বসে না, কিম্বা কতকসময় বস্‌লেও, এত দীর্ঘকাল যাবৎ তারা মনকে এক বিষয়ে নিয়োজিত করে রাখতে পারে না! আমি জানি এ-সব ছেলেদের ওপর কড়া-শাসন করে কি ফল! এই ধরুন ননী আর নিত্য—এদের পড়া-শুনার দিকে বেজায় ঝোঁক, বেশ তো যতক্ষণ ধ্যানে তাদের চিত্ত স্থির থাকে ধ্যান করুক, কিন্তু মন যখন আবোল-তাবোল ভাবতে আরম্ভ করে, তখন যদি ওরা বই নিয়ে বসে তা হলে ক্ষতি কি? বই এর মাঝে যদি মনটা ডুবে যায় ওদের, তা হলে কি ক্ষতিটা হবে বলুন তো দেখি? এ কথা জান্‌বেন, আন্তরিক অভিপ্রায়কে যতই কেন ধাম'-চাপা দিয়ে রাখুন না, একদিন প্রবল শক্তি নিয়ে তা প্রকাশিত হবেই হবে। তখন আপনার ওপরই ওদের বেশী আক্রোশ হবে! এই ননী, আর নিত্য, এদের যে দিকে বেশী ঝোঁক, সে দিকে আপনি মোটেই লক্ষ্য করছেন না, আপনি কেবল জোর দিচ্ছেন আপনার বিধি-নিষেধের ওপর, কিন্তু এই যে বিতৃষ্ণা

নিয়ে ওরা আপনার আদেশ প্রতিপালন করে যাচ্ছে, তাতে ওদের কোন ফলই হবে না। তাতে হবে কি, না হবে ওদের এদিক, না হবে ওদিক্। শেষে দেখ্‌বেন, ব্যর্থ জীবনের হাহাকার নিয়ে আপনাকে রীতিমত অভিশাপ দেবে ওরা। যদি না দেয়, তাহলে আমার বিজয় নাম রাখ্‌ব না!

এইজন্যই আমি বল্‌তে চাই, অন্ততঃ ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াবার একটা ব্যবস্থা করুন। বেশ তো নিয়ম-সংযমের বিধি ব্যবস্থাও রইল তাতে ক্ষতি কি? আমার কথা হচ্ছে এই যে, ধরুন যে সব ছেলের, আপনি যা বল্‌ছেন, তার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা নাই, কিম্বা তারা তত উচ্চদরের অধিকারী নয়, তাদের যদি অন্ততঃ ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা থাকে, তা হলে এখান থেকে অন্যত্র গেলেও, তারা একটা পথ ধরে জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারবে। তা না হলে তাদের গতি কি হবে বলুন তো দেখি? আপনার যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দেখছি, তাতে, দু-একটী যদি উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক অনুভূতি পায়, তা হলেই আপনার পক্ষে যথেষ্ট, আর বাকী ছেলেদের যা হয় হবে, সে সম্বন্ধে আপনার মোটেই যেন চিন্তা নাই। সজ্ঞানে যে এইরূপ পাপ সঞ্চয় করে চলছেন তাতে কি আপনাকে একদিন তার ফল ভোগ করতে হবে না? বেশ তো আপনার আদর্শকে মূর্ত্ত করে তুলবার দরুণ বেছে বেছে দু-একটী ছেলেকে রাখলেই তো হয়। সব ছেলের জীবন পণ্ড করে কি লাভ বলুন তো দেখি?

জোর করে পথ লওয়ানোর চেয়ে যদি নিজের পথ নিজেই বেছে নিতে পারে তাহলে সেটা আমি সব চেয়ে ভাল মনে করি। এইজন্যই বলি ছেলের যাতে জ্ঞান হয়, শিক্ষা পায়, তার ব্যবস্থা করুন। অজ্ঞান রেখে আপনার আদেশ উপদেশ মানিয়ে নিলে, তাতে কি ফল, অবশ্য তাতে আপনার ইষ্টসিদ্ধ হবে, কিন্তু ছেলের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে কোন সাহায্যই হবে না। আমার কথায় আপনি রাগ করেন না যেন, আমি এত কথা বলতাম না, কিন্তু ছেলে দুটোর কান্নাতে আমার প্রাণে বড়ই লেগেছে। আমি বলি আপনার আদর্শ রক্ষা করুন, কিন্তু ছেলেগুলোর প্রতি দৃষ্টি থাকে যেন আপনার। যদি ব্যবস্থা করতে না পারেন বিদায় দিন। তবু মানুষকে অজ্ঞানে রেখে পর-হত্যা পাপে লিপ্ত হবেন না।

আপনি ওদের প্রায়ই উপদেশ দিয়ে থাকেন—"ব্রহ্মজ্ঞান যদি লাভ হয়, তাহলে আর কোন অভাব থাকবে না।" কিন্তু কবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে, কিম্বা যাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবার আশা নাই, তাদের সাত্যিকার অভাব কি অবজ্ঞার বিষয়? আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কামনাকে অপূর্ণ রেখে, জোর করে ব্রহ্মজ্ঞান দিলেও তাতে কোন্ কাজ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উচ্চ অধিকারী বিরল, তা বলে কি আর বাকী সবার জীবনই ব্যর্থ হবে? তাদের জীবনের উন্নতির কি আর কোনও পথই নাই! জ্ঞানলাভের, চিত্তকে একাগ্র করবার বিভিন্ন পথ রয়েছে। আপনি নিজের পথ ছাড়া আর সবকে অবজ্ঞা করেন, অস্বীকার করেন,—এই কি আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয়? আমার মনে হয়, যদি আপনি বুঝে থাকেন, তাহলে এই ছেলেদের শিক্ষা ব্যাপারে নেমেই আপনার যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হবার কথা—অথাৎ আপনাকে বৈচিত্র্য স্বীকার করতেই হবে। কাজেই সবার দরুণ এক ব্যবস্থা করলে চলবে না।

থাক আজ এই পর্য্যন্তই, এখন আমার কলেজে যাবার সময় হয়ে গিয়েছে। আপনি বেশ একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখবেন অতুল বাবু।

অভিভাষণ

উত্তর বাঙ্গালা বিভাগীয় ভক্তসম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত গুরুচরণদেব দ্বারা পঠিত।

প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ!

এই শিশু আশ্রম ১ম বর্ষ অতিক্রম করিয়া আজ ২য় বর্ষে পদার্পন করিল। গত বৎসর ঠিক এমনি দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের প্রত্যক্ষ অবস্থানে মহা আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া এই আশ্রমের জন্ম হয়। সে দিন কত আনন্দ কত উৎসব! তার পর পূর্ণ একবৎসর চলিয়া গেল, এই শিশু আশ্রমের বুকের উপর কত তুফান উঠিল, কত ঝড় বহিয়া-গেল। আবার বর্ষ পরে সে দিন ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই আনন্দের দিন উৎসবের দিন। আজ এই আনন্দোৎসবের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শুভ-সমাগমের অভাব পূর্ণ-ভাবে অনুভূত হইলেও তাঁহার এতগুলি ভক্ত তাঁহারই মহৎউদ্দেশ্য সাধনমানসে এই সম্মিলন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া যে কি আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা আমার নাই। আপনারা তাঁহার পার্ষদ তাঁহার লীলার সহচর, আজ আপনাদিগকে তাঁহারই আশ্রমাঙ্গনে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যে কি উদ্দেশ্য তাহার কিছুই জানিতাম না, আশ্রম কাহাকে বলে তাহাও অজ্ঞাত ছিল; কেমন করিয়া অন্তঃপ্রেরণা দিয়া অন্তর্য্যামী এই ক্ষুদ্রের অন্তরে আশ্রমগঠনের সঙ্কল্প জাগাইয়া তুলিলেন, কেমন করিয়া সে সঙ্কল্প মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল, আজ তাহা স্বপ্নবৎ। আজও জানিনা ঠাকুরের উদ্দেশ্য কি, আজও বুঝিনা কি উদ্দেশ্যে ঠাকুরের আশ্রম প্রতিষ্ঠা; তথাপি আশ্রমগঠনের সূত্রপাত করিয়াছি, আজও তাহার জন্য খাটিতেছি তবে এইটুকুমাত্র জানি নিজের কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত বা কোন কামনা মূলে রাখিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। শ্রীগুরু, হৃদয়ে যেটুকু প্রেরণা ও যতখানি শক্তি প্রদান করিয়া-ছিলেন তাহারই অনুপ্রেরনায় কার্য্য করিয়া গিয়াছি মাত্র। কাহাকে দিয়া যে তিনি কি কার্য্য করান, তাহা আমাদের বুঝিবার সাধ্য কোথায়? মানুষের করিবার ক্ষমতা কতটুকু? তাঁহার ইচ্ছায় জীব কাজ করিয়া কর্ত্তৃত্বটা আপন ঘাড়ে চাপাইয়া-লয়, মিথ্যা অহংএর দাপটে ফাপিয়া-ফুলিয়া উঠে। ইহাই তো পুরুষকার! নতুবা ভগবদিচ্ছা ভিন্ন গাছের পাতাটীও যে নড়েনা, চ'খের পলকটীও যে পড়েনা।

আলো আলোই। শুধু আধারের দোষ গুণানু-যায়ী তাহার বিকাশের তারতম্য হয়। তাঁহার শুভ-প্রেরণা এই অপূর্ণ আধারের মধ্য দিয়া হয়ত বিকৃত ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে, হয়ত কোথাও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা আজ ইহার দোষ ত্রুটী সংশোধন করিয়া ইহাকে সাকল্যমণ্ডিত করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিন; বুঝাইয়া দিন ঠাকুরের উদ্দেশ্য কি, বুঝাইয়া দিন আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কি, আবার বুঝাইয়া দিন কেমন করিয়া ইহা ঠাকুরের মনোমত ভাবে গড়িয়া উঠিবে কেমন করিয়া ইহা তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে। শুধু এক জনের উপর ভার দিয়া দূরে সরিয়া থাকিলে তো চলিবেনা। আপনারা যে আমার আপনার হইতেও আপনার জন। আপনারা আজ সকলে ইহার অপূর্ণতা পূরণের ভার গ্রহণ করুন, আপনাদের মহৎ শক্তি এই

ক্ষুদ্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অভীপ্সিত সাধনে সহায় হউক।

শিক্ষায়-দীক্ষায় এ দেশ অতি পশ্চাৎপদ। এই অনুন্নত দেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করুণাময়ের করুণারই নিদর্শন। আশ্রম এখন গড়িয়া উঠিতেছে মাত্র, এখনই ইহা হইতে ফল প্রাপ্তির আশা করা বৃথা। আমাদের সমবেত চেষ্টায় ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠুক, সময় হইলেই প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইবে। আর ভরসা করি, এই আশ্রমের মধ্য দিয়াই এ দেশ একদিন জাগিয়া উঠিবে।

এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলার ভ্রাতৃবৃন্দ সমীপে আমার নিবেদন, উত্তরাঞ্চলে এই আমাদের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমটীকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। আমরা প্রত্যেকেই এক একটী গৃহস্থালী পাতিয়া তাহার উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য নিজেদের দেহ মন প্রাণ সবই সমর্পণ করিয়া দিয়াছি; তাহারই আংশিক শক্তি যদি আমরা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই গৃহস্থালী পাতিতে অর্পণ করি তাহা হইলে ইহা পূর্ণ হইতে আর কতদিন লাগে? আপনারা সকলেই সাধ্যানুযায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে কিছু করিয়া এককালীন সাহায্য করিয়াছেন, এখনও এই আশ্রমটীকে গড়িয়া তুলিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমাদের দুই ধারায় কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। একটী আশ্রমের উন্নতি বিধানের চেষ্টা, অপরটি ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা। আশ্রমটীর উন্নতিবিধানকল্পে আপনারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আপনাদের পরিচিত সাধারণের নিকট আশ্রমের উদ্দেশ্যাদি প্রচার ও তৎসাধনকল্পে সাহায্য সংগ্রহ করুন। আর ইহার সংরক্ষণ বিষয়ে তো যথা নিয়মে আপনারা মাসিক চাঁদাই দিয়া আসিতেছেন, ইহা ছাড়া এ সম্পর্কে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বিভাগের অপরাপর জেলার ভক্তদের আদর্শে আপনারাও আপনাদের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন করিয়া আশ্রমের দৈনন্দিন ব্যয়-নির্ব্বাহের পন্থা উন্মুক্ত করুন। মুষ্টিভিক্ষা এমন কিছু নহে যাহাতে বিন্দুমাত্রও স্বার্থহানি হয়। শুধু খাওয়ার চাউল হইতে দুবেলা দু'মুঠি তুলিয়া রাখা; ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা তো নাই-ই, বরং রন্ধনের পূর্ব্বে শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে একমুঠ করিয়া চাউল রাখার ফলে তাঁহার প্রসাদ লাভেরই সুযোগ ঘটিয়া থাকে। তাই আপনাদের নিকট বার বার অনুরোধ, আপনারা আপনাদের মাঝে মুষ্টি ভিক্ষার প্রবর্ত্তন করুন, শ্রীগুরুর মহান্ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সকলেই যথাসম্ভব স্বার্থ ত্যাগ করুন, তাঁহার বিশ্বহিতকর কার্য্যে আত্মাহুতি দিন।

আমার আর বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার মত ভাব ও ভাষা উভয়েরই অভাব। আপনারা বহু দূর হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সম্মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাদের যথাযোগ্য আহার বাসস্থান দিয়াও যে আপনাদিগকে তুষ্ট করিব সে ব্যবস্থাও করিয়া উঠিতে পারি নাই, যাহা কিছু করিয়াছি তাহাতেও বহু দোষ-ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। তাই আপনাদের নিকট নিবেদন নিজ সোদর জ্ঞানে আপনারা আমার সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করুন।

আজ বড় আনন্দের দিন। আজ আমরা (এত-গুলি হৃদয়) পরস্পর মিলিত হইবার ও ভাবের আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পাইলাম, পরস্পরের মধ্যে পরিচিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্যে সমবেত ভাবে আত্মনিয়োগ করিবার শুভ অবসর পাইলাম। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর কথা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার সুযোগ পাইলাম, ইহা অপেক্ষা জীবনে আনন্দের দিন আর কি হইতে

পারে? তাই বলি ভ্রাতৃগণ! আসুন, আজ বাহিরের সমস্ত দোষ ত্রুটীর কথা বিস্মৃত হইয়া শুধু আনন্দে আমরা মিলিত হই, আনন্দই আমাদের লক্ষ্য. আনন্দেই আমরা ডুবিয়া যাই। কর্ম্মে আমাদের আনন্দ ফুটিয়া উঠুক, আনন্দে তাঁহার কর্ম্ম করিতে করিতে আমরা আনন্দেই প্রবেশ করি। ওঁ জয় গুরু।

অভিভাষণ

উত্তর বাঙ্গালা বিভাগীয় ভক্ত সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় দ্বারা পঠিত।

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।

হে আমার প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ! আজ যে অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের দয়ায় আমরা সম্মিলিত হইয়াছি, তাঁহাকে স্মরণ করি ও বারংবার তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।

আজ মনে হইতেছে একবৎসর পূর্ব্বে আজকার এমনি একদিনে পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ ভক্তগণের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনদিন ব্যাপী দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দে আনন্দ কোলাহলে এই পুণ্য ভূমি মুখরিত হইয়াছিল। আজ সেই দিনে আমারা এখনে সমবেত হইয়াছি সকলেই, কিন্তু নাই এবার আমাদের প্রাণতন্ত্রীর ধারকপুরুষ ঠাকুর। আমাদের স্থূল দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া তিনি আমাদের অলক্ষ্যে এই মিলন-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এ কথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই।

শ্রীগুরুদেব আদর্শ গৃহস্থজীবন গঠন, সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা ও ভাব বিনিময় এই তিনটী বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বার্ষিক সম্মিলনীর ব্যবস্থা করেন। এই সম্মিলনী ভক্তসম্মিলনী নামে খ্যাত। প্রাদেশিক সম্মিলনী এক এক বৎসর এক একটী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সম্মিলনী বিভাগের মধ্যে কোন এক বিশেষ স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এতদিন এই সকল সম্মিলনী একভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু আজ এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। ঠাকুর মহারাজ মঠের যে সকল বিশিষ্ট-কর্ম্মীর উপর কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া নিজে কয়েকদিন একটু অন্তরালে থাকিয়া সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা মঠ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সমস্ত ঠাকুরের উপরই আবার পতিত হইয়াছে। আবার তাঁহাকে তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য, রুগ্নদেহ লইয়া এই সুবিশাল মঠ ও আশ্রমগুলির কার্য্য পরিচালনা করিতে হইতেছে। প্রকৃত ত্যাগী কর্ম্মীর নিতান্ত অভাব হইয়াছে। এক্ষণে আমরা কায়মনপ্রাণে তাঁর আরব্ধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিলে মঠের কি অবস্থা হইবে তিনিই জানেন।

শিষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য গুরুর মন বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্যকরা, তাঁর মনের মত হওয়া। কিন্তু প্রকৃত

প্রস্তাবে আমরা ইহার বিরুদ্ধাচরণই করিয়া থাকি অর্থাৎ গুরুদেবকে আমাদের মনের মত কার্য্য করাইতে এবং আমাদের মন যোগাইয়া চলিতে সচেষ্ট থাকি। আমাদের সংসারের সর্ব্ববিধ দুঃখ ও অশান্তির মূল ইহাই। গুরুর বাক্যই সাধনের মূল, গুরুর আশীর্ব্বাদই জীবনের সিদ্ধি। তাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মস্রোতে দেহ-তরণী ভাসাইয়া দিতে পারিলে অচিরাৎ সুখময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সেই নির্ভরতা কোথায়? তাঁর সেই অহেতুক কৃপায় বিশ্বাস কোথায়? তিনি আমাদের বেদনায় ব্যথিত হইয়া নিত্যানন্দময়ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই সুখদুঃখময় সংসারে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া সাধারণ মানুষের ন্যায় দ্বন্দাতীত হইয়াও দৃশ্যতঃ দ্বন্দাধীন হইয়াছেন। আমাদের পাপের বোঝা লইয়া আমাদের কর্ম্মের বন্ধন খসাইতে আসিয়া কতই না বিরম্বনা ভোগ করিতেছেন! কিন্তু আমরা তাঁর শিষ্য এই নাম গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছি শিষ্যের কর্ত্তব্য কিছুই করিতেছিনা। "মন্ত্র মূলং গুরোর্ব্বাক্যং"—তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত যে আদেশ বা উপদেশ তাহাই আমাদের প্রকৃত মন্ত্র; সে মন্ত্রের সাধনা আমরা করিতেছি কই? সে মন্ত্রের সাধনা করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের প্রয়াস পাইতেছি কই? সে মন্ত্রের চৈতন্ত সম্পাদন করিয়া আত্ম-চৈতন্য লাভ করিতেছি কই?

আজ এই মন্ত্রের সাধন ক্ষেত্ররূপে তিনি আমাদের সম্মুখে এক বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়াছেন, এই মঠ ও আশ্রমগুলির রক্ষা ও উন্নতিকল্পে আত্ম-নিয়োগ করিলে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা। এই সাধনায় চিত্ত শুদ্ধি হইবে, এবং শুদ্ধ চিত্তে আনন্দঘন প্রভু স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! মায়ার এ কি অভাবনীয় শক্তি বিস্তার!—আমরা সর্ব্ববিষয়ে এমন সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াও সাধনার এমন সহজ সঙ্কেত সম্মুখে পাইয়াও কার্য্যতঃ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা; কূপমণ্ডুকের ন্যায় আপন গণ্ডীর মধ্যে পরিয়া থাকিয়া আপন অযোগ্যতা ও নির্ভরহীনতা গুরুর অযোগ্যতায় অর্পণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। কিন্তু ভাই সকল! কাল অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, সত্যের বিজয়দুন্দুভি ধ্বনিত হইতেছে, সত্যস্বরূপ ঠাকুরের আকুল আহ্বান ব্যাধ কর্তৃক পাশবদ্ধ পাখীর মত আমাদিগকে টানিয়া লইতেছে; আমাদের আর বিচার বিবেচনার সময় নাই, সকলকে এখনই কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, তাঁর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করার জন্য জীবন পণ করিতে হইবে। তিনি সারা জীবন কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনা করিয়া যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাই আজ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, আমরা যেন এমন সুবর্ণ সুযোগ না হারাই। তাই আবার বলি :—

ধ্যান মূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজা মূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

মনুষ্যজীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? আহার নিদ্রা আদি বৃত্তিগুলি তো মানুষে এবং পশুতে সমানভাবেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু "জ্ঞানমেতেষাং অধিকঃ বিশেষঃ"—একমাত্র জ্ঞান নিত্যানিত্য বিবেচনা আছে বলিয়াই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানের অভাবে—"জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ—মানুষে ও পশুতে কোন পার্থক্যই নাই। মানুষ ভগবানের সৃষ্ট জগতে শ্রেষ্ঠজীব। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সে ভগবৎজ্ঞান বা ভক্তি লাভ করিতে পারে।

জ্ঞানী জগতে নিজের জীবনকে মাত্র দুইটা উদ্দেশ্যে ধারণ করেন, একটী নিজের মুক্তি অপরটী জগতের হিত সাধন। আমাদের গুরুমহারাজ জগতের হিতের জন্য মঠাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটী আশ্রম তৎতৎ বিভাগীয় শিষ্য ও ভক্তগণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন। আমাদের কর্ত্তব্য যাহাতে এইগুলি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় ও উন্নতিলাভ করে। আমাদের বগুড়া আশ্রমটাই বাঙ্গালা দেশের বিভাগীয় প্রথম আশ্রম এবং এই জলপাইগুড়ি আশ্রমটাই প্রথম জিলা আশ্রম। প্রতিষ্ঠা হিসাবে ইহারা যেমন আদর্শ, কার্য্যাদি দ্বারা ইহারা তেমনি আদর্শরূপে পরিণত হইলে ঠাকুরমহারাজের উত্তরবাঙ্গালাস্থ শিষ্য ও ভক্তগণের মুখ উজ্জ্বল হয়। এতদর্থে মুষ্টির প্রচলন, মাসিক ও এককালীন দান, ভূম্যাদি সংগ্রহ এবং সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া সকলের কর্ত্তব্য।

পরিশেষে যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য এই আশ্রমোদ্দেশ্যে প্রায় ৬০ বিঘা পরিমিত জমি দান করিয়া অক্লান্ত-চেষ্টা দ্বারা এই মঠায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ত্যাগীশিরোমণি আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুমার গুরুচরণ দেবকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিলাম।

নরাকার পরব্রহ্ম রূপায়াজ্ঞান হারিণে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যুগান্তের আভাস

উত্তর বাঙ্গালা বিভাগীয় ভক্তসম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমৎশক্তিচৈতন্য ব্রহ্মচারী দ্বারা পঠিত

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
গীতা

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া অধর্ম্ম আত্ম-প্রকাশ করে তখনই শ্রীভগবান্ মায়ামানুষরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'ন। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও শিথিলমূলধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন জন্য যুগে যুগে তিনি এই ভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

যে সঙ্কট অবস্থায় শ্রীভগবানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী আজ সেই যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত। এক দিকে ভোগ—একদিকে ত্যাগ; একদিকে মিথ্যা—এক দিকে সত্য; একদিকে আঁধার, একদিকে আলো! এই যুগসন্ধিতে দাঁড়াইয়া জগৎ আজ স্তম্ভিত। কোন পথে সে যাইবে ?

এই যে সমগ্র জগৎ জুড়িয়া একটা বিপ্লবের নৃত্য সুরু হইয়াছে, অল্পেই তাহার যবনিকা পাত হইবেনা। কালের বুকে সে এমন একটা আচড় দিয়া যাইবে, যাহা বহু বর্ষব্যাপী বিশ্বের অন্তরে স্মৃতি রূপে জাগিয়া থাকিবে। আজ রজোগুণ ধ্বংসের সময় আসিয়াছে, অচিরেই সত্ত্বগুণের আবির্ভাব ঘটিবে। এই প্রচণ্ড দৃপ্ত রজোগুণ নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত বিলয়ের মুখে যে প্রভাব প্রদর্শন

করিবে তাহাতে সমগ্র জগতে একটা ধ্বংসের স্রোত বহিয়া যাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে।

ধ্বংস শ্রীভগবানের নিষ্ঠুরতার নিদর্শন নহে, দয়ার অমৃত ধারা। ধ্বংসস্তুপের উপরই নূতনের সৌধ গড়িয়া উঠে, ফুল মরিয়াই বীজের সৃষ্টি করে, বীজ মরিয়াই মহান্ মহীরুহে পরিণত হয়। পৃথিবী এখন অধর্ম্মের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে: এই ভার সংহরণ না হইলে পৃথিবীতে শান্তির আশা দুরাশা মাত্র। দ্বাপরের শেষ ভাগে পৃথিবীর দশা ঠিক এই প্রকারই হইয়াছিল। সেই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়া কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের অঙ্গনে সমস্ত অসুর-শক্তির ধ্বংস করিয়া যান। আজও কলির এই মধ্যাবস্থায় (অথবা অন্তিম সময়ে) কে জানে সেই লীলারই পুনরভিনয় হইতে চলিল কিনা! যে দিন এই ধ্বংস লীলায় সমস্ত রজঃশক্তির বিলোপ ঘটিবে, শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন হইবে সেইদিন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পরই বর্ষার ধারা নামিয়া আসে, আঁধারের পরই আলোর প্রকাশ হয়।

ভারতের আকাশে বাতাসেও আজ বিপ্লবের সূচনা, কিন্তু অন্তরে তার প্রেমের প্রবাহ। আত্মজ্ঞানের গৌরব-ধারা নীরবে বহিয়া চলিয়াছে তাহার প্রাণে, সকলের অগোচরে—আজ্ঞাতে। এই দারুণ উত্তেজনার দিনে শান্তি প্রবাহের সন্ধান কেহ রাখিতেছেনা। এই কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ী ধারা আপন মনে বহিয়া চলিয়াছে দেবতার অঙ্গুলিসঙ্কেতে। রৌদ্রলীলার অবসানে ধ্বংসস্তুপের উপর দিয়া এই ধারা বহিয়া যাইবে যে দিন, সেই দিনই নূতন জগৎ গড়িয়া উঠিবে। যে দিন জগতের তৃষিতহৃদয়ে অমৃত ধারা পরিবেশন করিবে এই ভারত, ভারতের শান্ত সমাহিত ঋষি। দীর্ঘ বিংশ বর্ষ ধরিয়া তাহারই আয়োজন চলিতেছে—অতি ধীরে। কৃচ্ছ্র কোন সাধনা নাই, উৎকট কোন তপস্যা নাই, আছে শুধু অনাড়ম্বর ঋষি-জীবনের সরল অভিব্যক্তির পূর্ণ প্রয়াস। আর এই জীবনই হইবে ভবিষ্যজগৎ রচনার আদর্শ।

আজ সমাজে বিপ্লব, রাষ্ট্রে বিপ্লব, ধর্ম্মে বিপ্লব এই ঘোর বিপ্লবের দিনে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা সুকঠিন। দেশের আকাশে-বাতাসে আজ স্বাধীনতার বাত্যা বহিতে সুরু করিয়াছে, দেশবাসীর শিরায় তপ্ত-শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষণিক উত্তেজনায় উত্তেজিত না হইয়া, অপরের কটাক্ষে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এই সঙ্কট অবস্থায় যাহারা স্থিতধী থাকিতে পারেন তাঁহারাই শক্তিধর, তাহারাই শান্তি-প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। ঋষিযুগের ভাবধারা বহন করিতেছে যে-কয়টী তপস্যানিরত সঙ্ঘ তাহারা এই পথেরই পথিক, স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্যই তাহাদের এই উদাসীনতা অবলম্বন, এই অভিক্ষোভ কর্ম্ম প্রচেষ্টা। যে-দিন সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, সে-দিন সগৌরবে এই ঋষিসঙ্ঘ জাগিয়া উঠিবে জ্ঞানের প্রদীপ্ত চক্ষু লইয়া, হৃদয়ে প্রেমের অফুরন্ত উৎস লইয়া।

ক্ষুদ্র হইতেই বৃহতের জন্ম হয়, বীজের মাঝেই মহা-মহীরুহ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত থাকে। অনুকূল আলো-বাতাস পাইলেই ক্ষুদ্র বীজ মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া গগন পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। বোধিদ্রুম মূলে যে দিন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল সে দিন কে জানিত তাহার আলো একদিন সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে? মোসলেম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদ মুষ্টিমেয় সঙ্গী লইয়া সত্যের যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন, কে জানিত একদিন তাহার উপর এমন একটা মহৎ শক্তিশালী জাতি গড়িয়া উঠিবে? ভগবান যীশু যাহার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আত্মবলি দিলেন, কে জানিত সেই নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম একদিন সমস্ত পাশ্চাত্য-জগতে এই ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে? আজ আবার যে ভাবধারা ব্যষ্টির

মাঝে গুমরিয়া ফিরিতেছে, কে বলিতে পারে ইহাই একদিন সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত করিবেন না?

বিংশবর্ষ পূর্ব্বে দেবতার প্রাণে যে-ভাব বীজাকারে দেখা দিয়াছিল, ধীরে অতি ধীরে তাহা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে যে দিন সে দিন সমস্ত জগৎ পুলক-বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিবে ইহার পানে। অদূর ভবিষ্যতে মহা-নাটকের অভিনয় হইবে দেশে, তাহারই রঙ্গমঞ্চ গঠনের আয়োজন চলিতেছে দিকে দিকে।

ঋষির প্রশান্ত ভাব, বুদ্ধের সঙ্ঘগঠন শক্তি, আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞান, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম—সব আসিয়া মিলিয়াছে একটী আধারে। এই সমন্বয়ী ভাব আজ প্রকাশ পাইতে চায় বিভিন্ন আধারে, বিচিত্র ভঙ্গীতে। চাই এখন তাহার প্রকাশোপযোগী শুদ্ধ আধার, আত্ম-সমর্পণের উজ্জ্বল মহিমায় দীপ্ত কয়েকটী প্রাণ। এই প্রাণকেই আজ জাগাইয়া তুলিতে হইবে, সমর্পণের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। এই সমর্পিত জীবনের ভিতর দিয়াই শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়া সমগ্র জগৎকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে নূতন প্রেরণায়, নূতন চেতনায়।

অ-প্রত্যক্ষের হেতু

যাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই যে অলীক এমন নিয়ম নাই। সাংখ্যকারিকার গৌড়পাদভাষ্যে একজায়গায় রহিয়াছে—"এবমষ্টধানুপলব্ধিঃ সতামর্থানামিহ দৃষ্টা।" সৎ হইয়াও উপলব্ধি না হওয়ার অষ্টপ্রকার হেতু আছে! যথা—অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভিঘাৎ, অন্যমনস্কতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, সমানাভিহরণ! এই অষ্টপ্রকার বিঘ্ন দূর হইলে, কোন বিষয়ই অপ্রত্যক্ষ থাকিতে পারে না। প্রকৃতি-পুরুষ প্রভৃতির যে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার হেতু ঐ সকল বস্তুর সূক্ষ্মত্ব! ভগবানকে যে আমরা দেখিতে পাই না, তাহারও কারণ রহিয়াছে! প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়াই যে ভগবান নাই, এই কথা বলা ভুল! তত্ত্ব হিসাবে ধরিলে ভাগবতত্ত্ব অতীব সূক্ষ্ম, কাজেই স্থূল মন-বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম করিতে না পারিলে সেই তত্ত্ব বোঝা যায় না। আমরা সাধারণতঃ নিজেদের করণের দোষ দেখি না, প্রধানতঃ করণের দোষেই বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না। সাংখ্যদর্শন কার্য্যকে প্রধানে সৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধবাদিরা অসৎ বলেন। এই জায়গায় বৌদ্ধদের চেয়ে সাংখ্যবাদীর দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম বলিতে হইবে; কেননা বৌদ্ধদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াও সাংখ্যবাদীকে আরও উর্দ্ধে গমন করিতে হইয়াছে, তবে সাংখ্যবাদী কার্য্যকে প্রধানে সৎরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। কাজেই কোন না কোন দিকের ইন্দ্রিয় বৈকল্যের দরুণই আমরা অভিপ্সীত বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়াই যে বিষয়ের সত্তাকে অস্বীকার করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই! উপলব্ধি না হওয়ার যে অষ্ট প্রকার হেতুর কথা বলা হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার একটা না একটা বর্ত্তমান থাকেই, সুতরাং প্রার্থিত বিষয় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না। বিষয় প্রত্যক্ষ না হইলে প্রথমেই করণে কোন দোষ আছে কিনা দেখিতেই হইবে। অষ্ট প্রকার অনুপলব্ধির হেতু একটীও যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে।

আমরা এমন অনেক কিছুকেই গায়ের জোরে অস্বীকার করিয়া চলি, অথচ একটু সুক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে পারিলেই দেখা যায়, কত অস্বীকৃত বিষয় বাস্তবিকই জগতে রহিয়াছে। আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেও, তাহারা যে নাই এমন কথা বলা চলেনা।

ভগবান নাই, এই উক্তি সকলের উক্তি নয়। একজন ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না বলিয়াই যে বাস্তবিকই ভগবান নাই, তাহার কি মানে রহিয়াছে? নাস্তিক নাস্তিকতার অখণ্ড-প্রভাবে অভিভূত। কাজেই সে ভগবান্ থাকিলেও, ভগবানকে দেখিতে পায় না! আসল কথা হইল একদিকে না একদিকে অযোগ্যতা থাকে বলিয়াই বস্তুর স্বরূপদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। প্রত্যক্ষদর্শনের অভাবে অনেকের চিত্তই নিষ্ঠুর নাস্তিকতারূপ মরুভূমীতে পরিণত হয়।

প্র্যাতক্ষ না হইলে স্বীকার করিব না ইহা চিত্তের সবল ভাব। ইহাকে যদি নাস্তিকতা বলা যায়, তাহা হইলে এইরূপ নাস্তিকতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা অনেক সময় অপরের মুখে ঝাল খাইয়া কথা বলি, বাস্তবিক পক্ষে হয়ত আমাদের সে বিষয়ে মোটেই অভিজ্ঞতা নাই। যে পর্য্যন্ত ভগবান আমার প্রত্যক্ষ না হইল, সেই পর্য্যন্ত ভগবান আছে বলিয়া স্বীকারোক্তিতেই বা কি লাভ? অনেক নাস্তিকের প্রাণেই মূলে এই সবল ভাব আছে। এই সব বীর-সাধকের কাছে ভগবান কিন্তু প্রত্যক্ষ না হইয়া পারেন না। নাস্তিক পরের কথায় অবিশ্বাসী বটে, কিন্তু নিজকে সে প্রচুর বিশ্বাস করে। ভগবান আছেন, এই বিশ্বাস থাকিলেই চরম কিছু হইল না, ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা চাই। কাজেই নিজের প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত পরের উপদেশে প্রাণের হাহাকার মিটে না।

প্রত্যক্ষ না হওয়ার আর একটী প্রধান কারণই হইল অনুদ্ভব। অর্থাৎ যে বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্ভূত বা আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন দুধে মাখন আছে, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত দুধ হইতে মাখন উদ্ভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যায় না বলিয়াই যে দুধে মাখনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে তাহার কোন হেতু নাই। সুক্ষ্মরূপে যাহা ব্যাপ্ত এবং বিদ্যমান, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে আবার সেইরূপ সুক্ষ্মদৃষ্টিরই প্রয়োজন।

আত্মা আমাদের শরীরময় ব্যাপ্ত কিন্তু তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সুক্ষ্মদৃষ্টি থাকা চাই। সুক্ষ্ম সত্বানুভবে সকলের পরিতৃপ্তি আসে না, এইজন্যই একাগ্রতা দ্বারা স্থূলরূপ দর্শন আবশ্যক।

আমাদের দৃষ্টিশক্তি অতীব সংকীর্ণ, কিন্তু এই দৃষ্টিশক্তিকে সাধনা দ্বারা বাড়ানো যায়। তখন দূরের বস্তুও প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ইহাকেই **যোগজ-প্রত্যক্ষ** বলে। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি-শক্তি খুব প্রখর ছিল। কাজেই সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে অনেক সৎ বস্তুই বিদ্যমান থাকে। দৃষ্টি-শক্তির উৎকর্ষ হইলে, তখন সেই সব বস্তু প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয়?

প্রত্যক্ষের করণে যাহাতে দোষ না থাকে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবান যদি প্রত্যক্ষ-আবির্ভূত না হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তোমার নিজেরই কোনদিকে ত্রুটী রহিয়াছে। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির দরুণ আপ্রাণ চেষ্টা হইবে। যাহা নাই তাহাকে নাই বলিয়া উড়াইয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আছে জিনিষকে নাই বলিয়া উড়াইয়া দিলে বুঝিতে হইবে, তোমার নিজের মাঝেই কোনদিকে গলদ রহিয়াছে, সুতরাং প্রত্যক্ষবস্তুও তোমার নিকট অপ্রত্যক্ষ।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ—বিগত অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সারস্বত মঠের চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক উৎসব ও পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন যথারীতি পূজা, হোম, আরতি, বেদ, গীতা চণ্ডীপাঠ এবং নাম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজাতে সকলেই যজ্ঞীয় তিলকাদি ধারণ করেন। এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে ফলমূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন, ও মিঠাই প্রসাদ বিতরিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও সহরের ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্য কোন স্থান হইতে এবার ভক্তসমাগম বিশেষ হয় নাই।

উক্ত অক্ষয়-তৃতীয়া ও তৎপরদিবসে জলপাইগুড়ি সারস্বত আশ্রমে বার্ষিক উৎসব ও উত্তর-বাঙ্গালা বিভাগীয় সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বগুড়া, কুচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বিভাগীয় সদস্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী, কুচবিহার জেলাসদস্য শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দলই ও জলপাইগুড়ি জেলাসদস্য কুমার শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দেব এই সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য ও তৎ সাধনে তাঁহার শিষ্য-ভক্তদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও প্রেস সংক্রান্ত নানা গণ্ডগোলে এবং দুর্ব্বিপাকে বৈশাখ মাসের পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিতে দেরী হইল, তজ্জন্য গ্রাহকগণের নিকট আমরা বিশেষ লজ্জিত! জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকা প্রকাশিত হইতেও বিলম্ব হইবে। আশা করি ইহার পর হইতে আমরা গ্রাহকগণকে নিয়মিত সময় পত্রিকা দিতে পারিব, পত্রিকা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়াই—গ্রাহকগণকে পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিতেছি, আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ ইহাতে ক্ষুন্ন হইবেন না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—আর্য্যদর্পণ

দান প্রাপ্তি।

[মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম]

জিলা শ্রীহট্ট

বালা গঞ্জ

শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র ধর ১৫৲

নলকূপের সহায্য

শ্রীযুক্ত গুণমণি ধর ১৲

জেলা ঢাকা

শ্রীযুক্তা সুরমা সুন্দরী দেবী ৫৲

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ২৲

জয়দেবপুর

শ্রীযুক্ত দীগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ১৲

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস ১৲

নলকূপের সাহায্য

শ্রীযুক্ত কৈলাস রঞ্জন দাসগুপ্ত ২৲

(উৎসবে)

আশ্রমের সেবকগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত

উড়িষ্যা

ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহারাজা

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সিংহ ভঞ্জদেব ৩০৲

ময়ূরভঞ্জের মহারাণী ২৫৲

শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ৫৲

,, দাউদ সাহেব ৫৲

,, নরমি নেনসী ২৲

,, বালকৃষ্ণ সাহু ২৲

,, লাল মোহনপতি উকীল ২৲

,, হরেন্দ্র নারায়ণ ধর একসাইজ ইন্‌স্পেক্টর ২৲

,, চন্দ্র মাধব সিংহ ডাক্তার চীফ ম্যাডিক্যাল অফিসার ২৲

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় এঃ জজ ১৲

,, বি, সি, দাস এ, পি ১৲

,, হরিদাস বসু, জজ ১৲

,, নৃপালচন্দ্র গুপ্ত এ ফরেষ্ট অফিসার ১৲

,, ভোলানাথ পাণ্ডা মুন্‌সেফ ১৲

,, বংশীধর পট্টনায়ক একসাইজ ডিপুটী কলেক্টর ১৲

,, অর্জ্জুন ভুঞা এ, ইঞ্জিনিয়ার ১৲

,, শচীন্দ্রনাথ দাস স্কুলইনস্পেক্টর ১৲

,, ত্রিলোচন দাস ফরেষ্টঅফিসার ১৲

,, দিব্যসিংহ পানিগ্রাহি উকিল ১৲

,, সুরেন্দ্রলাল বসু ডাক্তার ১৲

,, রঘুনাথ মহাপাত্র সেরেস্তাদার ১৲

,, গোবিন্দ প্রসাদ দাস রিজর্ভ ইন্‌স্পেক্টর ১৲

,, মায়াধর মহান্তি একসাইজ ইন্‌স্পেক্টর ১৲

,, শ্যামাপদ হালদার ওভারসিয়ার ১৲

,, ইন্দ্রদেও প্রসাদ ওভারসিয়ার ১৲

,, মহেশ্বর পতি ডাক্তার ১৲

,, রমেশ চন্দ্র দাস সেটেলমেণ্ট অফিসার ১৲

,, মন্মথনাথ কর ষ্টেশন মাষ্টার ১৲

,, বি, বসু ১৲

,, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ১৲

,, ধীরেন্দ্রনাথ দাস ১৲

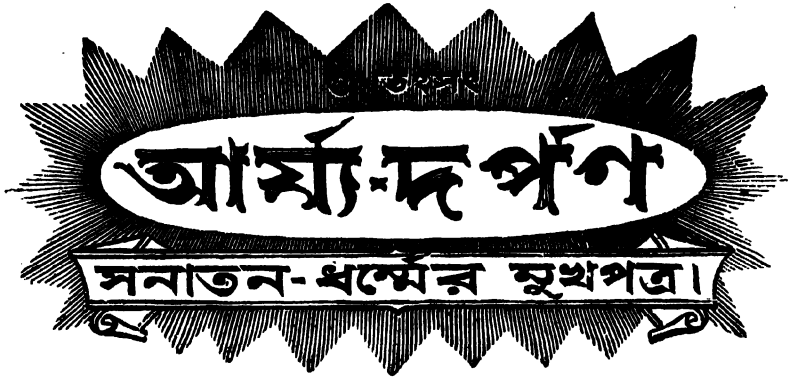
এ, গড্ ফ্রে	১৲
„ কালীপদ	১৲
„ গোবিন মিশ্র	১৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র দাস	১৲
„ গোপালবল্লভ পানিগ্রাহি	১৲
„ অভিরাম দাস	১৲
„ পীতাম্বর দাস	১৲
„ রামলাল মণ্ডল	১৲
„ রঘুনাথ দাস	১৲
„ শ্রীধরচন্দ্র দাস	১৲
„ অম্বিকাচরণ দাস	১৲
„ সভারচন্দ্র সাহা	১৲
„ যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৲
„ সেখ ইউসফ্ মিস্ত্রী	১৲
„ ভূপতি মোহন ঘোষ	১৲
খুচরা সংগৃহীত	১০॥০

বেতনটী (ময়ূরভঞ্জ)

শ্রীযুত এম্ পি এস্ আই আর বি এন আর	২৲
„ দীনবন্ধু রাউত ওভারসিয়ার	২৲
„ দুর্গাচরণ মহান্তি	১৲
„ রমেশচন্দ্র ঘোষ	১৲
প্রতাপ রাইস মিল	১৲
খুচরা সংগৃহীত	৩৲

বালেশ্বর

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল মুখার্জ্জি ওভারসিয়ার	৫৲
„ হরিপ্রসাদ সা ওভারসিয়ার	৩৲
„ জি, সি, বন	২৲
„ নলিনাক্ষ ঘোষ	২৲
„ সুধীন্দ্র নারায়ণ রায় উকিল	২৲
„ নরেন্দ্রনাথ সরকার উকিল	২৲
„ ক্ষিরোদচন্দ্র নন্দী ষ্টেশন মাষ্টার	২৲
শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী লেডী ডাক্তার	২৲
শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ দাস	১॥০
„ জ্ঞানেন্দ্র নাথ বাক্‌চি	১।০
„ শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় উকীল	১৲
„ চারুচন্দ্র রায় উকীল	১৲
„ দেবেন্দ্র নাথ গিরি উকীল	১৲
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ উকিল ,	১৲
„ বরেন্দ্রনাথ বসু উকীল	১৲
„ রমেশচন্দ্র প্রধান উকীল	১৲
„ শশাঙ্কশেখর পট্টনায়ক উকীল	১৲
„ ক্ষেত্রমোহন রায় ডাক্তার	১৲
„ প্রমোদ রঞ্জণ গুহ ইঞ্জিনিয়ার	১৲
„ ভাবগ্রাহি মিশ্র ডিঃ মাজিঃ	১৲
„ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ডিঃ মাজিঃ	১৲
„ গোবিন্দ চন্দ্র ত্রিপাঠী ডিঃ মাজিঃ	১৲
„ রাধাপ্রসাদ দাস জমিদার	১৲
„ নিরোদনাথ পাল সাব রেজিষ্টার	১৲
„ দামোদর মহান্তি হেল্‌থঅফিসার	১৲
„ বংশীধর নায়েক সাব ডিপুটী	১৲
„ যজ্ঞেশ্বর গিরি মোক্তার	১৲
„ নগেন্দ্রনাথ দাস মুন্‌সেফ্	১৲
„ চারুচন্দ্র নায়েক ডাক্তার	১৲
„ অনুপমচন্দ্র সামন্ত একসাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	১৲
„ ভবেন্দ্রবিজয় ঘোষ ওভারসিয়ার	১৲
„ জীউশঙ্কর কণ্ট্রাক্টর	১৲
„ কানাইলাল কর	১৲
„ বাঞ্ছানিধি	১৲
„ গোপীকৃষ্ণ	১৲
„ গোবর্দ্ধন ফুল চাঁদ	১৲



২৪শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮ | ১ম খণ্ড
সমষ্টি সং ২৫৩ | ২য় সংখ্যা

ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্

—ঃ*ঃ—

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্—যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি!

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। তিনি একাকী (কর্ম্ম সম্পাদন করিতে) সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তিনি উত্তম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিলেন, যাহারা দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়, যথা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান!

ব্রহ্ম এক হইয়াও বহু হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন, নির্গুণ হইয়াও গুণে অবতরণ করিলেন, কেননা, তাহা যদি না হইত, তাহা-হইলে জগতের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত কোথা হইতে? ভগবান বহু হইয়াই লীলা আস্বাদন করিতেছেন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—নির্গুণ, নির্গুণব্রহ্ম অসমর্থ, তাঁহার দ্বারা কর্ম্ম হয় না, আর কর্ম্ম না হইলে লীলা উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটিবে কেমন করিয়া? এইজন্যই ব্রহ্ম একাকী হইয়া সুখ অনুভব করিলেন না, তাঁহার ভিতর নিদারুণ আকুলতা আসিল। তিনি দেখিলেন, একে তাঁহার সম্যক্ অভিব্যক্তি হয় না। বহুতেই তাঁহার সম্যক্ অভিব্যক্তি। এইজন্যই তাঁহার ভিতর বহু হইবার কামনা জাগিয়া উঠিল। বহুর ভিতর দিয়া, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া তিনি নিজকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন।

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যেমন সত্য, তেমনি বহু-ও সত্য। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মের লীলাও সত্য। আর একের মাঝে ব্রহ্মের সম্যক্ অভিব্যক্তি হইতে পারে না, বহুর ভিতর দিয়া সেই একই বিচিত্র রূপে ধরা দেন আমাদের। বহুর মাঝে সেই একই বিচিত্র রূপে ধরা দেন বলিয়া, আমরা মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যাই! এইখানেই ব্রহ্মের লীলা।

একের মাঝে নিজকে আস্বাদন করা যায় না। এইজন্যই ব্রহ্মের ভিতর এত আকুলতা! তিনি প্রতি জীবে জীবে নিজকে আস্বাদন করিতে চাহিলেন।

কেমন সুন্দর কথা—"তদেকং সন্ন ব্যভবৎ।" এক হইয়া—তিনি সম্যক্ (ব্যক্ত) হইতে পারিলেন না। এইখানেই তিনি সকলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। তিনি দেখিলেন, এক হইয়া সুখ নাই, বহু হইয়া দুঃখ পাইলেও সেই দুঃখ বরণীয়। সেই বিরাট দুঃখের অনুভবও কত মহান্!

ব্রহ্মবিদ্ গুরু বলিয়াছিলেন, "আমি প্রথমে ব্রহ্মকেই জানিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার লীলা যে কি জিনিষ, কত মধুর, তাহা জানি নাই, কিন্তু শিষ্য করিয়া তাঁহার লীলা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি।"

এই কথাগুলোর মাঝেও সেই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। বহু শিষ্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গুরু নিজকে বিচিত্র-রূপে অনুভব করিবার সুযোগ পাইলেন। কাজেই ব্রহ্ম-স্বরূপে থাকিয়াও ব্রহ্মের তৃপ্তি নাই।

লীলার দিকটা বাদ দিয়া ব্রহ্মের পরিতৃপ্তি আসিবে কেমন করিয়া? কেননা ব্রহ্ম যে সকলকে নিয়া এক—কাজেই ব্রহ্ম সকলকেই আপন করিয়া নিয়াছেন। তাঁহাকে পূর্ণ ব্যক্ত করিয়া তুলিতে যে অংশেরও অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা ব্রহ্ম অস্বীকার করেন নাই।

ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব লাভ করিয়াও যে ব্রহ্ম সুখী হইতে পারিলেন না, তুষ্টিলাভ করিতে পারিলেন না, এইখানেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব। সবকে নির্ব্বাসন দিয়া রাজত্ব করিয়া কোন সুখ নাই, গৌরব নাই। ব্রহ্ম সকলকে লইয়া, সুখে দুঃখে-ব্যথায় সমভাগী হইতে চাহিলেন। ভূমা—মহান্ ব্রহ্মের বিরাট-হৃদয়ের পরিচয় এইখানেই। এক কথায় বলিতে গেলে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়াই ব্রহ্ম 'ব্রহ্ম' হইতে পারিয়াছেন।

একাকী সকল বিষয়ে সমর্থ হওয়া অসম্ভব, এই জন্যই বহুর প্রয়োজন। বহুর সৃষ্টিতেই বৈচিত্র্যের আস্বাদন হয়। বহুর ভিতর দিয়া বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়—এইখানেই লীলা আস্বাদন!

একাকী সুখ পাইলেন না বলিয়াই, আর

তাহাতে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়াই তিনি প্রথমেই সমর্থ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মের অব্যক্ত ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার ক্ষেম এই ক্ষত্রিয়ের মাঝেই নিহিত রহিয়াছে। এই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি। কিন্তু ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্মের অভাব বা অতৃপ্তির মোচন হইল না। তিনি দেখিলেন, এই ক্ষত্রিয় দ্বারাও সম্যক কর্ম্ম সম্পাদন হয় না। তাঁহাদের দ্বারা একদিকের প্রয়োজন মাত্র সিদ্ধ হয়। এই ক্ষত্রিয়ের সাহায্যেও তাঁহার বিরাট ইচ্ছা মূর্ত্ত হইল না।

স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে—বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি।

ক্ষত্রিয় সৃষ্টির পরও তিনি নিজের কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ বিত্তোপার্জ্জনক্ষম লোকের অভাবে সেই ব্রহ্ম উপযুক্তরূপে নিজে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলেন না। সুতরাং কর্ম্ম-সাধনোপযোগী বিত্ত উপার্জ্জনের নিমিত্ত বৈশ্য জাতির সৃষ্টি করিলেন। এই বৈশ্য জাতি কে? —যাহারা এই এক একটি গণক্রমে অর্থাৎ সংঘরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। দলবদ্ধ ব্যক্তিরাই ধন উপার্জ্জনে সমর্থ। এই জন্যই গণদেবতা অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব এবং উনপঞ্চাশৎ মরুৎ এর সৃষ্টি!

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পুষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ।

বৈশ্য জাতির সৃষ্টির পরও তিনি সর্ব্ব কর্ম্মে সমর্থ হইলেন না। সেই জন্যই পুষণরূপী শূদ্র জাতির সৃষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীই 'পূষা' নামে প্রসিদ্ধ; কারণ যাহা কিছু আছে পৃথিবীই তৎসমস্তকে পোষণ করিয়া থাকে।

স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্ম্মেণ যথা রাজ্ঞৈবং যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তত্তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্ম্মং বদতীতি ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি।

শূদ্র সৃষ্টি করিয়াও তিনি সর্ব্ব কর্ম্মে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি শ্রেয়োরূপী ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিলেন। এই শ্রেয়োরূপী ধর্ম্ম ক্ষত্রেরও ক্ষত্র (অর্থাৎ বলশালী অপেক্ষাও বলশালী)। এইজন্যই ধর্ম্ম অপেক্ষা বলশালী আর কিছুই নাই। ধর্ম্মের সাহায্যে বলহীন লোকও বলবান্‌কে শাসন করিয়া থাকে—যেমন রাজার সাহায্যে বলবান্ লোককেও শাসন করা যায়। যাহা ধর্ম্ম, তাহাই সত্য। এইজন্যই লোকে সত্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে—'এ ধর্ম্ম বলিতেছে' এবং ধর্ম্মবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলে যে—'এ সত্য বলিতেছে'; সুতরাং ধর্ম্ম ও সত্য একই!

কাজেই ব্রহ্ম সত্যের ভিতর দিয়া বা ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিলেন। কেননা ধর্ম্মের সর্ব্বনিয়ন্ত্রণশক্তি রহিয়াছে। সত্য বা ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়কেও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রহ্ম সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইলেন ধর্ম্মের ভিতর দিয়া, অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং সত্য দ্বারাই ব্রহ্মের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। সত্যের ভিতর—ধর্ম্মের ভিতর সর্ব্ব প্রকার যোগ্যতা রহিয়াছে, ধর্ম্মই—"ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং"— ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয়। একদিন এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই, ধর্ম্মকে অবলম্বন

করিয়াই, সত্যাশ্রয়ী, ধর্ম্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং বহুর শক্তির উপরও নিয়ন্ত্রণ শক্তি রহিয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণ্য-শক্তি। ব্রাহ্মণদের সেই শক্তি আয়ত্ত হইয়াছিল একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করিয়া।

এই ব্রাহ্মণ্যশক্তিই চিরকাল জগতের উপর প্রভুত্ব করিবে। ক্ষাত্রশক্তির নিয়ন্তা, অমিত-বীর্য্যশালী ব্রাহ্মণ! সেই ব্রাহ্মণ সত্যাশ্রয়ী, আর কোন অবলম্বন নাই তাঁহার। ক্ষাত্রশক্তির অমিতস্পর্দ্ধা আজ স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রভাবে! 'অর্দ্ধ-নগ্ন ফকীর' গান্ধী আজ ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রভাবেই জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন! অ-বলীয়ান্‌ও আপনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্‌কে কি করিয়া পরাজিত করিতে পারে, তাহাই আজ স্পষ্ট আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে! ধর্ম্মের কাছে, সত্যের কাছে, সকল শক্তিই যে পরাজিত হইবে ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের এখন সেই ক্ষত্রস্য ক্ষত্র ধর্ম্মকে, সত্যকেই আশ্রয় করিতে হইবে। ধর্ম্ম নির্জ্জীব নন—তিনি ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্! ধর্ম্মের ক্ষত্রিয়নিয়ন্ত্রণ শক্তি রহিয়াছে। ধার্ম্মিকের বল, বীর্য্য, ঔদার্য্য কোন দিকেই ন্যূনতা নাই

আমাদের আর অন্য কোন উপায়ে মুক্তির আশা নাই। আমরা ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি, সেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে হইবে আমাদের। আমরা আবার সেই সত্যাশ্রয়ী, ধার্ম্মিক হইতে পারিলে সকল শক্তি আমাদের কাছে করজোড়ে আত্মসমর্পণ করিবে!

ক্ষাত্রশক্তির উপরও ধর্ম্মের ক্ষত্রিয়ত্ব রহিয়াছে। ধর্ম্ম সকল বলের সেরা। সেই বল দ্বারা, বাহিরের সাজসজ্জা দ্বারা সজ্জিত, মদগর্ব্বিত ক্ষত্রিয়ের প্রাণও রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া যায়। সমস্ত জগত আজ সেই সত্যাশ্রয়ী ফকিরের সত্যের ক্ষত্রিয়ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। সত্যের বল আজ সু-প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। আর মানুষের সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই।

ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। আজ ভারতের এত দুর্দ্দশা কেন?—স্বধর্ম্মচ্যুত বলিয়া। ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ না হইতে পারিলে জগতে শান্তি আসিবে না। ব্রাহ্মণের ভিতর নিয়ন্ত্রণ শক্তি এবং সামঞ্জস্যের শক্তি উভয়ই রহিয়াছে। ব্রহ্ম—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এক এককে অবলম্বন করিয়াও সমর্থ হইতে পারিলেন না। কেননা তাহাদের এক এক দিকে মাত্র যোগ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু পরিশেষে সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণের ভিতরই সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন। এই ব্রাহ্মণ্য শক্তিই—গুরুশক্তি। ভারত এই ধর্ম্মের বলেই জগতের পূজ্য বরণীয় হইয়াছেন এবং হইবেন। কাজেই ধর্ম্মকেই ক্ষত্রস্য ক্ষত্রকেই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই স্বারাজ্যসিদ্ধি, এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

দুর্লভ।

—:*:—

নানক বলিয়াছেন—"কোটী মধ্যে কিনৈ বিরলৈ চিনা।" কোটী মধ্যে কেহ কেহ বিরল ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে পারে। গীতাতেও আছে—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥" কাজেই তাঁহাকে জানা এত সহজ নয়। আমরা যে জানি বলিয়া গর্ব্ব করি, তাহা আমাদের অন্ধ অভিমানের ফল। আমাদের বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে যতদূর ধরিতে পারি, তাহাকেই মনে করি চরম। কিন্তু আসলে যে ভগবত্তত্ত্ব আমাদের স্থূল মনবুদ্ধির অগোচর, তাহা কেহই চিন্তা করিয়া দেখি না!

যত্নশীলদের মাঝেও তত্ত্বতঃ ভগবান্‌কে হয়ত কেহ জানিতে পারে। আর যাহারা সাধক নয়, তপস্বী নয়, তাহারা যে কি করিয়া জানার অভিমান লইয়া বৃথা অভিনয় করিয়া বেড়ায় তাহাই আশ্চর্য্য! তিনি সহজ বটে কিন্তু তাঁহাকে পাওয়ার প্রণালী এত সহজ নয়। এই কৃচ্ছ্র-তার ভিতর দিয়াই সাধকের সত্যিকার আকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের মর্কটবৈরাগ্য আসে কিন্তু দু'মুহূর্ত্ত পরেই তাহারা আবার বিষয় সংসারে লিপ্ত হইয়া মনের আনন্দে দিন কাটায়! কাজেই সাময়িক ভাব, সাময়িক উচ্ছ্বাস দ্বারা যথার্থ সত্যলাভের কোন সাহায্যই হয় না, বরঞ্চ তাহাতে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ অবসাদই আনিয়া দেয়।

গীতার শ্লোকটি যখন প্রথম পড়ি, তখন মনের মাঝে এক নিদারুণ সংশয়ান্দোলন চলে। তখন ভাবিতাম, তাই তো ভগবানকে বাস্তবিকই কি সহস্রের মাঝে কেহ জানিতে সক্ষম হয়? তাহা-হইলে তিনি দয়ালু কিসের? তাহা হইলে এত মানুষ আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া পড়িয়া আছে কেন? নিশ্চয়ই উহা একটা কথার কথা মাত্র। কিন্তু সাধনক্ষেত্রে নামিয়া আজ ঐ কথার মর্ম্ম বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিকই আজ অকুণ্ঠচিত্তে, অবিকম্প ভাব নিয়ে বলিতে পারিব যে, যাহারা নাকি বলে ভগবান্‌কে পাওয়া সহজ, তাহাদের মাঝে নিশ্চয়ই কোথায়ও গলদ রহিয়াছে। তাহারা ভগবানকে পায় নাই, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার তৃপ্তি স্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছে। কিন্তু সত্যিকার ভগবান্ যে প্রাণ দিয়ে সাধনলভ্য তাহা তো কেহই ভাবিয়া দেখি না।

প্রচ্ছন্ন বাসনা কামনার উদ্রেক দেখিয়া আজ মনে হইতেছে, আমাদের ধর্ম্ম-পথে আসারও একটা নিগূঢ় স্বার্থপরতা রহিয়া গিয়াছিল। আজ দেখি প্রত্যেকের স্বরূপ প্রকট হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আজ নিঃসংশয় হইয়াছি—কেন গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ঐ মূল্যবান কথাটী উপদেশ দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহাকে তত্ত্বতঃ অল্প ব্যক্তিই জানিতে সক্ষম হয়।

সাধু হইতে আসিয়া, এমন কি ১০।১২ বৎসর মহতের আশ্রয় নিয়ে থাকিয়াও দেখি, দুর্ব্বার কামনা বাসনার অদৃশ্য আকর্ষণে চিত্ত প্রমত্ত হইয়া উঠে। তখন আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে বিচারাবিচার না করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া পড়ে মানুষ। কাজেই ভগবান্‌কে জানা এত সহজ কেমন করিয়া বলি! জীবনের লক্ষ্যই যাহার ঠিক থাকে না,

তাহার আবার ইষ্টসিদ্ধি হয় কেমন করিয়া?

স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবার কোন্ উপায় নাই, কোন্ সময় চিত্তের গতি কোন পথে প্রবাহিত হয় কে জানে? তবে তাঁহার নাম নিয়া তাঁহারই শক্তিতে গর্ব্ব অনুভব করিবার আশা আমরা পোষণ করিতে পারি, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু জোর করিয়া, স্পর্দ্ধা করিয়া আমরা বলিতে পারি না যে, ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিয়াছি।

তীর্থক্ষেত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া কত যাত্রী পথেই বিরত হয়, কিম্বা তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও তাহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হয় না, কাজেই কার্য্য সফল না হওয়া পর্য্যন্ত যাত্রাকেই চরম কিছু মনে করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। সত্য-লাভের যাত্রী আমরা, কিন্তু সত্যকে লাভ করিবার পথে যে কত প্রচ্ছন্ন গুপ্ত শত্রু রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন্ সময় কোন্ অতল গহ্বর হইতে কে মাথা তুলিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইবে তাহা কে জানে? এই জন্যই সত্যলাভেচ্ছুকে বিনয়ী, নম্র, সদা জাগ্রত হইয়া থাকা প্রয়োজন।

একদিন আমরা সেবক-জীবন অবলম্বন করিয়া মহতের আশ্রয় লইয়াছিলাম! আমাদের লক্ষ্য ছিল সেবা সহায়ে চিত্ত-শুদ্ধি করা। কিন্তু যাঁহাকে সেবা করি, তাঁহাকে যদি সুপ্রসন্ন না করা যায়, তাহা হইলে সেই সেবার তো কোন সার্থকতাই রহিল না। নানক বলিয়াছেন—'সুপ্রসংন ভয়ে গুরুদেব। পূরণ হোই সেবক কি সেব।' গুরুদেব সুপ্রসন্ন হইলে তবে সেবকের সেবা পূর্ণ হয়। কিন্তু গুরুদেবের সুপ্রসন্নতার দিকে কি আমাদের দৃষ্টি রহিয়াছে? আমরা এখন আত্ম-তৃপ্তিকেই গুরুদেবের তুষ্টি বলিয়া ধরিয়া নিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। কাজেই সত্যের পথ যে সহজ নয়, তাহার প্রমাণ পদে পদেই পাইতেছি।

জীবনের আদর্শকে, জীবনের লক্ষ্যকে আমরণ উজ্জ্বল প্রদীপ্ত রাখিয়া চলিতে পারে কয়জন? সারা জীবন এক ভাবে চলিয়া মৃত্যুর আগে অনেকের মন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে, তখন সব পণ্ড হইয়া যায়। কাজেই জীবনের পরিপূর্ণ সফলতার অধিকারী সকলেই হইতে পারে না। চরম গতি,—বিশিষ্ট অধিকারীরই প্রাপ্য। তবে এই কথাও ঠিক, যাহারা সত্যের নাম করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের আবার পর জীবনে তাহাই সম্বলস্বরূপ হইয়া থাকিবে। কাজেই কোন কিছুই ব্যর্থ হইবে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি নিজের স্বার্থকে বজায় রাখিয়া সত্যের সঙ্গে রফা করিয়া চলিবার ফিকির। কিন্তু সত্যের সঙ্গে কি সুবিধা অসুবিধার বিচার চলে? অনেক সময় জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব জলাঞ্জলি দিয়া নিঃসম্বল হইয়া তবে সেই সত্যের হিরণ্ময় দ্বারকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। কাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়াও সত্যের উজ্জ্বল প্রেরণাকে যাহারা জীবনে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, তাহারাই সেই বিরল সাধক, তাহারাই ভগবানকে যথার্থতঃ লাভ করিতে পারে।

যৌবনের উচ্ছ্বাসে কত রঙ্গীন-কল্পনাই না করিতাম, কিন্তু সত্যের নিষ্ঠুর পরীক্ষায় আজ সবই ম্লান হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। আজ দেখি, প্রাণের যথার্থ আকাঙ্ক্ষাকে তখন ঠিক নিরূপণ করিতে পারি নাই, কেবল আবেগে, উচ্ছ্বাসে একটা পথ ধরিয়া চলিয়াছিলাম। জীবনের আঁকে বাঁকে কত প্রচ্ছন্ন বাসনা রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যে একদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত করিয়া দিবে, তাহা তো স্বপ্নেও ভাবি নাই! কিন্তু আজ সব শিক্ষা, সব অভিজ্ঞতা লাভ হই-

তেছে। তাহা না হইলে, ভাল হইতে আসিয়া, মহতের আশ্রয় লইয়াও কেন আজ এই পরিণাম?

আজ আর অহঙ্কার নাই, সর্ব্ব সম্ভাব্যতা স্বীকার করিয়া শুদ্ধ হইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। মানুষ গর্ব্ব করে, অভিমান দেখায় কি সম্বল লইয়া? এক মুহূর্ত্তে যাহার জীবনের লক্ষ্য-চ্যুত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার কি নিয়া বড়াই করিবার আছে? সে যে কাঙ্গাল—ভিখারী, কৃপাময়ের দুয়ারে ভিখারী মাত্র! স্বেচ্ছায় যদি কিছু দেন তাহা হইলে ভাগ্য, তাহা না হইলে অব্যক্ত বেদনা লইয়াই মরিতে হইবে। সেই বেদনার স্মৃতিতেই সাধন-পথে নূতন আলোক পাইবার আশা রহিয়া গেল। এইটুকু মাত্র তাহার সান্ত্বনা, মঙ্গল-ময়ের অদৃশ্য ইঙ্গিত!

লক্ষ্য যখন উজ্জ্বল থাকে, বাহিরের দাবী-দাও-য়ার প্রতি তখন স্বাভাবিকই কম নজর পড়ে; কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যাওয়া মাত্রই বাহিরের অভাব, স্বার্থ পূরণের উদগ্র ব্যাকুলতা হঠাৎ আসিয়া পূর্ণ মাত্রায় প্রকট হয়। যৌবনের প্রথমাবস্থায় যে প্রেরণা লইয়া মহতের আশ্রয় লইয়াছিলাম, আজ যদি সেই প্রেরণা মনের মাঝে উজ্জ্বল থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় লক্ষ্যের চেয়ে স্বার্থটাই এত বড় হইয়া উঠিত না!

মহৎ সঙ্কল্প লইয়া, মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা সুরু হয় বটে, কিন্তু যাত্রা ব্যর্থ হয় সেই সঙ্কল্পকে—সেই উদ্দেশ্যকে সমভাবে চিত্তে জাগ্রত রাখিতে পারি না বলিয়া। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত লক্ষ্যের উজ্জ্বল স্মৃতি মনের মাঝে জাগরূক থাকিলে, তবেই জীবন সফল হয়। কিন্তু সেই সফলতা লাভের অধিকারী বিরল। মানুষ এক উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা সুরু করে, কিন্তু পরিণামে তাহার ফল দাঁড়ায় অন্য রূপ!

'অহং' সম্পূর্ণ রূপে না মরিলে তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিবার অধিকার জন্মে না। তত্ত্বতঃ জানা মানেই হইল—তিনি যথার্থতঃ যাহা, ঠিক তদ্রূপেই জানা। কাজেই নিজের মনের ব্যক্ত অব্যক্ত বাসনা কামনা ইহার মাঝে জড়িত থাকিলেই তাঁহাকে আর তত্ত্বতঃ জানিবার সুযোগ থাকে না।

নিছক সত্য-লাভের পিপাসা কয়জনের মাঝে রহিয়াছে? অনেকেই এক এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ সত্যের আশ্রয় লইয়াছে, কাজেই আংশিক সত্যের বিকাশ ছাড়া তাহাদের জীবনে আর কিছুই লাভ হয় না। খাঁটি ব্যাকুলতা দুর্ল্লভ জিনিষ, কেননা ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা আসে কখন? যখন চিত্তে কোন রূপ মালিন্য না থাকে, কেবল তাঁহা-রই বিরহে শুদ্ধ চিত্তে তাপ সঞ্চিত হয়।

সত্যের আশ্রয় লইয়া আজ বুঝিতে পারি-য়াছি, কত প্রকার অসত্যের সঙ্গে আমাদের বাসনা কামনা জড়িত রহিয়াছে। সত্যকে আমরা সত্যের আসন হইতে নামাইয়া আনিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ করিয়া লইয়াছি। কাজেই সেই সত্য লাভ করিয়া আমাদের জীবনের বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না।

আমাদের একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা সাধক, সাধু হইতে আপ্রাণ চেষ্টা করাই আমোদের লক্ষ্য। কাজেই সাধুত্বের বৃথা অভিমান আমাদের সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য!

সাময়িক ভাবকে, সাময়িক উচ্ছ্বাসকে এত সহজে বিশ্বাস করিতে নাই। তাহাদের অন্তরালে অনেক বিরোধী সত্ত্বার বীজ সঙ্গোপন থাকিয়া যায়। এইজন্যই বিনয়ী হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত সাধুত্বের সাধনা করিয়া যাওয়া উচিত।

ধ্যানযোগ।

—) (—

ধ্যেয় বস্তুর তৈলধারাবৎ অনুচিন্তন বা ধ্যেয় বস্তুতে মনের আনুক্ষণিক সংযোজনই 'ধ্যানযোগ' নামে অভিহিত হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত যোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আংশিক ভাবে এই ধ্যানযোগেরই অন্তর্ভুক্ত বা স্তর বিশেষ। যোগ-সূত্রে পতঞ্জলী বলিতেছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"— অর্থাৎ বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া অন্তরাভিমুখে প্রেরণ করার নামই যোগ। অনুরক্তি যেমন সংসারে পতিত হইলে আসক্তি এবং ভগবানে অর্পিত হইলেই প্রেম আখ্যায় আখ্যাত হয়, চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ বাহ্যবিষয়—শব্দ স্পর্শাদিতে যুক্ত হইলে বহির্ম্মুখী এবং ধ্যেয় বস্তুতে লগ্ন হইলে অন্তর্ম্মুখী বিশেষণে বিশেষিত হয়। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাস্তবিকই "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" —কর্ম্মব্যতিরেকে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে কেহই বসিয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মকর্ত্তা মন, নিয়ন্তা বা প্রেরয়িতা বুদ্ধি, করণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়। বুদ্ধির পরামর্শে ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহচর্য্যে মন জীবকে এমন বহির্ম্মুখী করিয়া তুলিয়াছে যে, জীব স্বীয় স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব বিস্মৃত হইয়া বিমুগ্ধ ভাবে প্রবৃত্তিরই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে; শ্রেয়ঃ যাহা, সত্য যাহা, ভূমা যাহা, তাহাকে না চাহিয়া মন-বুদ্ধির গোলক ধাঁধায় পড়িয়া শুধু অনিত্যের পানেই ছুটিয়া চলিয়াছে। এই ছুটিয়া চলাই কি তাহার স্বভাব? না তাহার এমন কোন বিশ্রাম-ভূমি রহিয়াছে, যে-স্থানে শান্তির প্রেমের মলয়ানিল সদার তরে প্রবাহিত হইতেছে! তাহাই যদি হয়, তবে সে এমন আকুল ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে কেন?—কিসের আশায়?—সুখের সন্ধানে, তৃপ্তির সন্ধানে, শান্তির সন্ধানে! সে যেন কিসের একটা অভাব অনুভব করিতেছিল,—কি যেন তাহার ছিল, আজ তাহা নাই। তাই সে তারই অনুসন্ধানে, তারই উদ্দেশে ফিরিতেছিল। বুদ্ধি বলিল, "তুমি কি খোঁজ ভাই? —শান্তি! যাও মনের সঙ্গে, তার দশ সহচরের আনুকূল্যে তোমার হারানো জিনিষ ফিরে পাবে।"........জীব তারই প্ররোচনায় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, মনের সঙ্গে এক হইয়া তাহার হারানো জিনিষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কোথায় তৃপ্তি! কোথায় শান্তি! এ তৃপ্তি তো তৃপ্তি নয়, এ শান্তি তো শান্তি নয়! তৃষা নিবারণাক্ষম বারিবিন্দু যেমন তৃষাতুরের তৃষাবেগ আরও বাড়াইয়া দেয়, সেইরূপ এই ক্ষণিক তৃপ্তি, ক্ষণিক শান্তি জীবকে আরও

অধীর করিয়া তুলিতেছে। সে সুখের সন্ধানে উন্মত্ত ভাবে তরঙ্গিনী-তরঙ্গ-বিতাড়িত তৃণ-খণ্ডবৎ সংসার-তরঙ্গে দিশেহারা হইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে;—খুঁজিতেছে শান্তি, খুঁজিতেছে তৃপ্তি! কিন্তু হায়! মায়া মরীচিকাময় এ মরু-সংসারে সুখ কোথায়? এ জগতে যে শুধু দুঃখেরই তাণ্ডব-লীলা, মৃত্যুরই প্রলয় গর্জ্জন! জীব সুখভ্রমে এই দুঃখের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, সুধাভ্রমে হলাহল পান করিতেছে। তবে জীব-হৃদয় যে মাঝে মাঝে সুখের বিদ্যুচ্চমকে আলোকিত হইয়া উঠে, তাহা এই প্রবহমান দুঃখের আংশিক নিবৃত্তিতে, প্রেমময়ের প্রেম কণিকার ক্ষণিক স্ফূরণে। এই ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তিকে, এই প্রেম কণিকার ক্ষণিক স্ফূরণকে যদি চিরস্থনে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই জীব আবার তার হারানো রতন ফিরিয়া পাইবে, আবার শান্তির প্রেমের উদ্দেশ পাইয়া প্রেমময়ের প্রেম-সাগরে চিরতরে ডুবিয়া যাইবে, ক্ষুদ্র জীবত্ব মহান্ শিবত্বে লীন হইবে। ইহার উপায়,—মনোবৃত্তির বহির্ম্মুখীনতা নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্ম্মুখে ভগবদভিমুখে বা স্বরূপাভিমুখে প্রেরণ করা।

মনের শক্তি অনন্ত। সে শক্তির অবধারণ করা জীবের সাধ্যাতীত। জীবের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। মন যদি অনন্ত শক্তি-মান্ই না হইবে, তবে ব্রহ্মাংশ-সম্ভূত জীবকে সে এমন ভাবে আত্মবিস্মৃত করাইয়া নানা বিষয়ে প্রধাবিত করিবে কি প্রকারে? তবে যে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার শক্তির ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয়, তাহা তাহার নানা বিষয়ে ব্যাপ্তি জনিত। মনের এই বহু বিষয়িণী গতিকে প্রত্যাহৃত করিয়া এক কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে মন অসীম শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই প্রত্যাহৃত কেন্দ্রীভূত মনঃশক্তিকে যদি স্বাধীনে রাখিয়া পরিচালনা করা যায়, তবেই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। জীব মনের সঙ্গে একীভূত হইয়া তাহারই প্ররোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রধাবিত হইতেছে। তাই কোন প্রকারে এই মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাকে আত্মানুমোদিত পথে পরিচালিত করিতে পারিলেই স্বরূপ সিদ্ধি অনিবার্য্য। যে-মন এতদিন জীবকে সংসার পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সে-ই আজ তাহার বন্ধন মোচন করিয়া স্বরূপে পৌঁছাইয়া দিবে। তাহা করিতে হইলেই প্রথমে নিজকে মন হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে। তারপর সেই মনকে ধীরে ধীরে বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অন্তরে আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। এইস্থানেই সাধনার পুণ্য উদ্বোধন।

'সাধনা' অর্থে আর কিছুই নহে, সাধ্যবস্তুর পৌনঃপুনিক অনুধ্যান বা অভ্যাস। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীব কোন প্রকারেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে

না। মন ইন্দ্রিয়গ্রামকে নানা কার্য্যে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং নানা বিষয়ে প্রধাবিত হইবেই। তাই বলি, এই অবসরে সাধনার উদ্বোধন সময়ে সাধককে স্ব-আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধীরে সু-কৌশলে মনকে স্ববশে আনয়ন করিতে হইবে। এই স্ববশে আনয়ন, কর্ম্মদ্বারাই হইবে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" এতদিন যে কর্ম্মের ফল নিজে ভোগ করিতে ছিলাম, যে ফলাকাঙ্ক্ষার নেশায় নিত্য নূতন কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলাম আজ সেই কর্ম্মফল—সেই ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। এ অবস্থায় কর্ম্মের রূপ বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইবে না, কিন্তু ভাবের ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে। যে যেমন কাজ করিতেছিল সে প্রকারই করিবে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হওয়ায় এই সমস্ত কর্ম্ম আর জীবকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। ক্রমে এই ভাবের পুষ্টিতে সমস্ত কর্ম্মই ভগবদ্প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইবে। এই কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগের পৌনঃপুনিক অভ্যাসে চিত্ত সংযত হইয়া আসিবে, চিত্তবৃত্তি বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরে প্রবেশোন্মুখ হইবে। এই অবসরে চিত্ত যাহাতে আর সংসার-মোহে মুগ্ধ হইয়া বহির্ম্মুখী না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য অনুক্ষণ নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের বিশেষ প্রয়োজন। এই বিশ্ব সংসারে যে দিকেই দৃক্‌পাত করিনা কেন, সবই তো অনিত্য। আজ যাহা দেখিতেছি, কাল তাহা থাকিবেনা,—কাল যাহা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা নাই, যে দিন চলিয়া গেল সে দিন আর আসিল না, আজ যে সংসার হইতে বিদায় লইল আর সে ফিরিল না।

এ জগতে শুধু অনিত্যেরই লীলা। স্থায়ী কি আছে? চিরন্তন কি আছে? যার নেশায়, যার রূপে, যার মোহে আজ মজিয়া আছি, বিশ্ব-সংসার বিস্মৃত হইয়াছি, কালই তাহার অবর্ত্তমানে বিরহের তপ্তশলাকায় দগ্ধ হইতে হইবে। তবে কি সংসারে নিত্য বলিয়া কিছুই নাই? মানুষ শুধু এই অনিত্যের মায়াতেই ছুটিয়া বেড়াইবে? কে বলিয়া দিবে তাহার সন্ধান!

প্রাণে যখন এই হিয়াধক্-ধকি পরাণপোড়ানি জ্বালা উপস্থিত হয়, যখন জগতের অনিত্যতা স্মরণে নিত্যবস্তুর সন্ধানে মন উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ জীবের বন্ধনমোচন জন্য প্রেমকল্পতরু শ্রীগুরু রূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন। তখন সে বুঝিতে পারে, এজগতে সবই অনিত্য—সত্য, কিন্তু ইহারই মাঝে ইহারই রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, আবার ইহাকেই সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া সেই চিরন্তন নিত্যবস্তু রহিয়াছে। তিনি অরূপ, আবার তিনিই বিশ্বরূপ। জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই তিনি, আমাতেও তিনি, তোমাতেও তিনি, তাঁরই

সত্ত্বায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্বাবান্। তিনি অজ, অব্যয়, নিত্য, শাশ্বত, জ্ঞান-প্রেম-শক্তি-স্বরূপ। এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পুষ্ট হইলে আর অনিত্যের মায়ায় মুগ্ধ হইতে হইবে না। ভালবাসা তখন আর অনিত্যের পশ্চাতে না ছুটিয়া হৃদয়-দুয়ার ভাঙ্গিয়া সেই সারাৎ-সারের পানেই ধাবিত হইবে। এই স্থানেই জ্ঞানযোগের পরিসমাপ্তিতে ভক্তিযোগের পুণ্য উদ্বোধন। জ্ঞানযোগদ্বারা তাঁহাকেই সারাৎসার, পরাৎপর, প্রেম-স্বরূপ অবগত হইয়া ভক্তি যোগে তাঁহাকে হৃদয়ের ভাল-বাসা অর্পণ করা, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত তাঁর চরণে লুটাইয়া দেওয়া, বিলা-ইয়া দেওয়াই জীবের চরম সার্থকতা! তখন সাধক আর নিমেষের তরেও তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারে না। মনে হয়, সদাই যেন তাঁহাকে চোখে চোখে রাখি। কিন্তু তিনি কোথায়? বাহিরে খুঁজিলে তো তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, তিনি যে পঞ্চকোষের পরপারে হৃদয়-দহরে জ্যোতিষ্মান্-রূপে বিরাজমান। তিনি নির্ব্বিকার, সাক্ষীস্বরূপ, নিত্যচৈতন্য। তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিতে হইলে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ডুবিয়া যাইতে হইবে, তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া তাঁহা-রই মননে তাঁহারই ধ্যানে দিবস রজনী নিমগ্ন থাকিতে হইবে। ইহাই সমস্ত যোগের সারভূত 'ধ্যানযোগ'। এই ধ্যানযোগে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

এই ধ্যান, এই ধারণা, এই মনন করিতে হইবে মনে; কাজেই মন যাহাতে শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনকে শক্তিসম্পন্ন করিতে হইলে, স্থির করিতে হইলে তাহার আশ্রয়ভূত, তাহার সহিত নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত এই দেহকেও তদনুযায়ী শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের উক্তি :—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামা রোগ্যং মূলমুত্তমম্।" তাই এই দেহ যাহাতে নীরোগ থাকে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাই শরীর মন নীরোগ রাখার একমাত্র উপায়। এই ব্রহ্মচর্য্য-সাধন অষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জ্জনাত্মক। ইহার বিস্তার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহা বলিয়া রাখা সমীচীন যে, এই ব্রহ্মচর্য্য-পালনের প্রধান অন্তরায় কাম। কাম রিপুর উত্তেজনায় জীব হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া ক্ষণিক সুখের আশায় পতঙ্গ-বৎ কামানলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। দেহ ও মনের উপর ইহার প্রভাব কিরূপ, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাই অন্তরেন্দ্রিয় বশীকরণে এই ব্রহ্মচর্য্য সাধন বা কাম রিপু দমনই প্রধান সাধ্য। এতদ্ব্যতীত ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসার্য্য, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতিও সাধন পথের কম অন্তরায় নহে। অতএব এই সমস্ত রিপু যাহাতে চিত্ত-সরসে কোন তরঙ্গের অভিঘাত সৃজন না করিতে পারে তাহার জন্য সদা জাগ্রত থাকিতে হইবে। এই

সংস্ত রিপুর বিপরীত বৃত্তি—ভক্তি, মৈত্রী, স্বাধ্যায় প্রভৃতির আচরণে তাহাকে বিলোপ-সাধন করিতে হইবে। মোট কথা, সর্ব্বা-বস্থায় সর্ব্ববিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া সুখ-দুঃখ, শান্তি অশান্তি, হর্ষ-অমর্ষ, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বাভিঘাতে অবিচলিত থাকিবার অভ্যাস করিতে হইবে। এইপ্রকারে দেহ ও মন গঠিত হইয়া উঠিলে জীব ধ্যানের অধিকারী হইবে। এই মনকে সমস্ত বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়া অবিচলিত রাখিবার প্রধান উপায় প্রাণায়াম। প্রাণায়াম সাধনে মন নানা দিক্ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া স্থির ও বশীভূত হইয়া আসিলে গুরূপদেশানুসারে সাধক নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে কোটী সূর্য্যসমপ্রভ, কোটী চন্দ্রসুশীতল ব্রহ্মজ্যোতির ধারণা করিবেন। এই ধারণাই ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া ধ্যানে পরিণত হইবে। ধ্যেয়বস্তুর নিরন্তর চিন্তা বা ধ্যানের ফলে সাধক-হৃদয়ে এই মূর্ত্তি প্রতিনিয়তই ভাসিতে থাকিবে। এই প্রকার ধ্যান করিতে করিতে সাধক তন্ময় হইয়া যাইবেন। জগন্ময় সেই ধ্যেয়েরই স্ফূরণ হইবে, প্রত্যেক বস্তুতেই সেই প্রেম-ময়কে দেখিতে পাইবেন, আকুল ভাবে প্রত্যেককেই বুকে জড়াইয়া ধরিবেন; ভেদ ভাব দূরীভূত হইবে,—প্রত্যুতঃ সেই জ্যোতি-র্ম্ময় সত্ত্বা ভিন্ন অন্য কিছুর সত্ত্বাই আর উপলব্ধ হইবে না। ইহাই সমাধি। এই অবস্থায় ধ্যান, ধ্যেয়, ও ধ্যাতার আর পৃথক্ সত্ত্বা থাকে না, এক ব্রহ্ম-সমুদ্রে সবই লীন হইয়া যায়। এই স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়াই না জীব সুখের আশায় শান্তির সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—আসক্তির শতবাহুতে অনিত্যকেই আঁকড়িয়া ধরিতেছে! কিন্তু সুখ কোথায়? সুখ তো বাহিরের কোন বস্তুতে নাই। সুখ ভিতরে, সুখ অন্তরে, সুখ তোমাতেই। প্রথমে নিজেকে খোঁজ—তুমি কে? তার পর দেখিতে পাইবে তোমার মাঝেই যে আনন্দের উৎস রহিয়াছে! তুমিই তো আনন্দ-স্বরূপ!

এই ধ্যানযোগেই দ্বৈতাবস্থা হইতে অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে শান্তির—তৃপ্তির শত ধারায় সিক্ত হওয়া যায়। অত-এব প্রত্যেক জীবেরই ইহা চরম লক্ষ্য, প্রত্যেক সাধকেরই ইহা পরম সাধ্য। হয় তো দু'এক জীবনে ইহার কিছুই হইবে না, হয় তো জন্ম জন্ম ধরিয়া ইহার জন্য দেহ ধারণ ও দেহপাত করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে ভয় কি বীর! আমরা যে অনন্ত পথের পথিক, অনন্ত পথের যাত্রী! এ জীবনে না পারি, শত জনম পরেও তো পারিব। তবে পারিব যে একদিন ইহা ধ্রুব সত্য। যদি এজীবনে এই সাধনার কথঞ্চিৎ চেষ্টাও করিয়া যাইতে পারি, তাহাও মহা মঙ্গলের বিষয়; তাহাই আবার আগামী জীবনে মহান্ পুণ্যের উদ্বোধন করিয়া দিবে। যদি

এবার ইহার জন্য কিছু চেষ্টা করিয়াও মরিতে পারি, তবে আগামী-জীবনে যোগ সাধনোপযোগী দেহ ও গেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। ইহা তো সেই পুরাণ পুরুষেরই উক্তি। অতএব মাভৈঃ, জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া যিনি যুগে যুগে স্বধাম হইতে মায়া-মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া মায়ামুগ্ধ জীবকে সতত আপনার পানে টানিয়া লন, করুণা-বাঁশরীর তানে সর্ব্বদাই তাহাদের মন আপনমুখী করিয়া দেন, তাঁরই অভয়বাণীতে নির্ভয় হইয়া,তাঁরই আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিয়া আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব—তাঁহাতে লীন হইয়া যাইব। তিনি তো যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া এই স্বরূপ-প্রাপ্তির পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই স্বরূপ প্রত্যাবর্ত্তনের পথেই আমাদিগকে আসিতে হইবে, ধ্যানযোগে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে।

কর্ম্মী।

—)·(—

জীবন ভরে কর্ম্ম থাকবেই। স্বয়ং ভগবানের বাণী—নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ—কেহ ক্ষণকালও কর্ম্ম না করে থাকতে পারে না। কিন্তু সকলের মাঝেই আবার এমন একটা ইচ্ছাও দেখা যায় যে, কর্ম্ম থেকে বিরত হয়ে একটু বিশ্রামজনিত আনন্দ নিয়ে যেন কিছু সময় কাটাতে পারে। মুখে যতই বড় কথা বলি না কেন, কর্ম্ম যেমন আমাদের ইচ্ছানিচ্ছায় চল্‌তে চল্‌তে দেহের স্বভাবগত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি সেই দেহের ধর্ম্মেই আবার বিশ্রামেরও প্রয়োজন। সাধনা দ্বারা আমারা এইটুকু করতে চাই যে, দেহের সঙ্গে যেন মনও জড়ত্বের বিশ্রাম না চায়। দেহ বিশ্রামের আনন্দে এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক, কিন্তু মনটা যেন সতেজ থাকে। দেহ-বাহকের সঙ্গে সঙ্গে আরোহী-মনও যেন অবুঝ হয়ে না পড়ে। আবার অন্যদিকে যখন দেহ কর্ম্মে চঞ্চল হয়ে নৃত্য করবে, তখন মনটা যেন সেই কর্ম্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ্রিত হয়ে শুধু চঞ্চল হয়ে ঘুরেই না বেড়ায়।—একটা মন যেমন প্রতি কর্ম্মের মাঝে দেহের সঙ্গে খেটে বুদ্ধি বা ভাবনা চিন্তার কাজ (কর্ম্মের intellectual part) বহন করবে, তেমনি অন্য দিকে আর একটা মন যেন অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ নিখর হয়ে সমস্ত কর্ম্মের মাঝেও আসল আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে না ভুলে। অভ্যাস দ্বারা এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, যতই কাজ দেহ দ্বারা অনুষ্ঠিত হোক, মন নিশ্চল হয়ে ইষ্টজপে বা ধ্যানে মগ্ন থাকছেই। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে আমাদের এই বিরোধ যে, পাশ্চাত্য আদর্শ হল কর্ম্ম করতে

করতে শেষ নিশ্বাসটি যাবে, A death on a horseback, তাতে মনের যদি সেই কর্ম্মে নিবিষ্টাবস্থায় দেহের পতন হয়, তাতে দুঃখের কিছুই নাই, বরং শ্লাঘার বিষয়। শেষ মুহূর্ত্তটীও কর্ম্মে ব্যয় করা খুব মহৎ জীবন-প্রচেষ্টার পরিচয়। কিন্তু আমাদের প্রাচ্যদেশে অমন কর্ম্মরতাবস্থায় দেহপাত হলেও মন যাতে ইষ্ট নামরূপে অর্থাৎ ভগবন্নামে নিবিষ্ট হতে পারে, সে জন্যে মৃত্যুকালে বিশেষ করে ভগবন্নাম শ্রবণের ব্যবস্থা রয়েছে। ঘোড়ার উপরে অর্থাৎ হঠাৎ দেহত্যাগ হওয়া অনেক ক্ষেত্রে অপমৃত্যু বলে গণ্য হয়। মরণের পূর্ব্বে মনকে সময় দেওয়া চাই।

মনের অবসর দেহের মত জড় বিশ্রামের জন্য নয়; মনের অবসরের উদ্দেশ্য আরও উন্নত-স্তরের চিন্তা করা। বিষয়ভেদে চিন্তার উন্নত বা অবনত আখ্যা দেওয়া হয়। সব চেয়ে উচ্চ-বিষয়ের অবতারণা একমাত্র ভগবচ্চিন্তা বা আধ্যাত্মিক চিন্তা। কারণ, অন্য যে সব চিন্তা সে সমস্ত এই জগতের বিষয় লইয়া; কিন্তু ভগবচ্চিন্তা বা আধ্যাত্মিকচিন্তায় মনকে এই জগতের বহু উর্দ্ধে তুলতে হয়। মনের অবসর বলতে এই জগতের বিষয়-চিন্তা থেকে বিরত হওয়া। তখনই আধ্যাত্মিক চিন্তার সুযোগ ঘটে। যেমন এই জগতের জড় বিষয় নিয়ে চিন্তা ক'রে ক'রে অনেক মনীষী জড় বিজ্ঞানে নূতন জিনিস আবিষ্কার করেছেন এবং সে আবিষ্ক্রিয়ার গূঢ়মর্ম্ম অবধারণ করতে হলে তাঁদের মতই স্থির হয়ে সে বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হতে হয়, তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যেও বহু মহাত্মা সাধনসিদ্ধ হয়ে নানা তথ্যের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন—শাস্ত্রাকারে তাহার অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু মনকে এই জগতের এলাকা হতে টেনে নিয়ে তাঁদের সেই সমস্ত তত্ত্ব চিন্তায় বিভোর করতে না পারলে সে সকলের অর্থ কেমন ক'রে বুঝা যাবে? আমাদের এই বুঝবার অসামর্থ্যই শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ দর্শনের হেতু। যে শাস্ত্রকার যেই ভূমিতে (Point-এ) দাঁড়িয়ে তাঁহার ভূমিকা আরম্ভ করছেন, সেই সঠিক সন্ধান পাওয়ার মত মনের গভীরতা বা শক্তি নাই বলেই আমাদের মনে শাস্ত্র বিরোধও মিটেনা, সুতরাং শাস্ত্রের উপর গভীর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাও আসে না। শাস্ত্রের কথাও অন্ততঃ দু' একটী প্রমাণ নিজের জীবনে না পেলে সে জীবনে শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করা বিচিত্র নয়। নতুবা যে কোনও সাধন-পন্থায় গেলেই পর পর তাহার কি অবস্থা আসবে, সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক স্তর বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়ে সুবিন্যস্ত রয়েছে,—সাধন পথে অগ্রসর না হলে আমরা তার পরিচয় পাব কি করে? সাধনরাজ্যে শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় যে যেমন ভাবে চলতে সুরু করেছে, পন্থার শেষ পর্য্যন্ত না গিয়ে মাঝেই অধৈর্য্য হয়ে অন্য পথ ধরলে ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হয়ে বজ্রদগ্ধ তরুর মত জীবন ধারণ করতে হয়। আধ্যাত্মিক বা সাধন পথে জোর পাবার জন্যই সাংসারিক বিষয় থেকে মনকে অবসর দিয়ে দৈনিক কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া করে তাকে সাধন চিন্তায় নিরত করতে হয়। তাই আমাদের ত্রিসন্ধ্যা। এই ত্রিসন্ধ্যা শুধু ব্রাহ্মণেরই নয়—মানুষমাত্রেরই ইহা পরম প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ এমন অনেক জীবন দেখা গিয়াছে—যাঁরা এই ত্রিসন্ধ্যার অবসর নাই অথবা প্রয়োজন নাই বলে আপনাদিগকে মহাকর্ম্মী ও সমর্পিত-জীবনের অহঙ্কারে মহাদাপটে কয়েক বৎসর চালিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু সেই রজোবিক্ষোভের পরই তাঁহারা এমন নাস্তিক বা তমোগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন যে

তখন তাঁহাদের সারাজীবনের কৃত কর্ম্মের উপর এবং নিজের সমস্তটা জীবনের উপর মহা অশ্রদ্ধা এসে পড়েছে। এইরূপ সঙ্কটে পড়ে অনেকেই পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। যতখানি প্রচণ্ড জোরে পূর্ব্ব জীবনে তাহাদের কর্ম্ম চলেছিল, অনেকের ঠিক ততখানি বা তাহারও বেশী অবসাদ এসে পড়ে। তখন লোকের কাছে পূর্ব্ব-জীবনের কৃত-কর্ম্মের বড়াই ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে গর্ব্ব কর্‌বার মত তাদের কিছু থাকে না। ভারতবর্ষের মত সেই সমস্ত ভারতীয়ের পূর্ব্ব গৌরব তখন অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ বর্ত্তমানের বেশী ভক্ত, তাই বর্ত্তমানে সে কোনও প্রমাণ না পেলে কেবল অতীত বা ভবিষ্যতের গর্ব্ব-কথায় তার মন ভরে না, বরং বিদ্রূপের মৃদুহাসি চেপে যাওয়াই তখন সে উপযুক্ত ভদ্রতা মনে করে। এই সমস্তের মূল কারণ শুধু সেই সময়মত মনকে বিশ্রাম দিয়ে উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন না করা। মহা কর্ম্মীই হোক বা মস্ত নির্ভরকারীই হোক্, সাধন-জীবনে প্রত্যেকেরই আত্মচিন্তা ও উপযুক্ত স্থলে সংশয় ভঞ্জন করানো দরকার। এই দুটি একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে উদাসীন থাকাতে বহু সাধকেরই অর্দ্ধপথে পতন ঘটে। সমর্পিত-জীবনেরও সাধনা রয়েছে। যাঁর ওপর নির্ভর ক'রে জীবন সমর্পণ করা হয়, তাঁর ওপর যদি দিন দিন প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাস বা ভালবাসার উদ্রেক না হয়, তবে সে নির্ভর বা সমর্পণের ভাব বেশী দিন টিকেনা। আর যদি তেমন ভক্তি বা ভালবাসার ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, তবে সেই প্রেমাস্পদের কর্ম্মেই সারাদিন নিরত থাকলেও দিনের মাঝে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তার সঙ্গ করার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। কুলবধূ সারাদিন স্বামীর গৃহকর্ম্মে নিরত থাকলেও স্বামীর সম্মুখে কোন এক সময়ে তাঁর সোহাগ পাওয়ার আশায় আকুল হয়ে থাকে। ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সাধকের সেই প্রিয়সংসর্গেরই সূক্ষ্মরূপ।

কাজেই পরম উচ্চাধিকারীই হোক বা একেবারে নিম্নাধিকারীই হোক্, সকলের পথেই সাধ্যমত আত্মচিন্তা বা ধ্যান ধারণা অথবা এক কথায় বল্‌তে গেলে ত্রিসন্ধ্যারূপ সূক্ষ্মভাবে প্রিয়সংসর্গ একান্ত প্রয়োজন। যারা শুধু কর্ম্মের উন্মাদনায় সেই আসল প্রিয়তমকে ভুলে যায়,—শুধু তাঁর কর্ম্ম করেই মনকে বুঝ্ দেয়, তারা কর্ম্মের উদ্দেশ্যের চেয়ে কর্ম্মকেই বড় করে দেখে। পক্ষান্তরে কর্ম্মের মত্ততায় প্রভুর কর্ম্ম ভুলে গিয়ে শুধু স্বভাববশে কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মদ্বারা বন্ধন প্রাপ্তিও তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। যেমন শস্ত্র ও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য প্রবলের হস্ত থেকে বা পাপের মুখ হতে দুর্ব্বলকে বা সত্যকে উদ্ধার করা—কিন্তু সেই শস্ত্র ও শাস্ত্রের বিপরীত ব্যবহার দ্বারা মানুষ আত্মঘাতীও হতে পারে, তেমনি কর্ম্মের দ্বারা মানুষের মুক্তি ও বন্ধন দুই-ই হতে পারে। ভাবের পরীক্ষাস্থল যেমন কঠোর কর্ম্ম, তেমনি নীরস বা বন্ধনকারী কর্ম্মের রসের আশ্রয় বা মুক্তি দায়ক হল ভাব। এই ভাব-রূপ প্রেম বা ভক্তির যাতে উদ্রেক হয় বা দিন দিন তার বেগ বাড়ে, তার উপায় কিছু অবলম্বন না কর্‌লে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় বল্‌তে গেলে বলতে হয় যে,- 'সিকেয়তোলা মাটির কলসের জলের মত সে ভাব বা ভক্তি ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়। তাই প্রতিদিন কোনও না কোনও উপায়ে সেই ভাব ভক্তির আলোচনা কর্‌তে হয়। এ জন্য জ্ঞানীর পক্ষে যেমন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ভক্তের পক্ষে তেমনি শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন করা বা পরস্পর আলোচনা করা, প্রার্থনামূলক সঙ্গীত বা সংকীর্ত্তনাদির দৈনিক অনুষ্ঠান বা ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রয়োজন। সমাজের

আবহাওয়ার দোষ বা সাংসারিক কাজের চাপ দেখিয়ে এ সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন, কিন্তু স্থূল দেহ ধারণের জন্য যেমন আমাদের দৈনিক আহারটী বন্ধ হয় না, তেমনি সূক্ষ্মদেহ ধারণ ও গঠ-নের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই বিষয়টীতে আপত্তি তুললে চলে না। তার পর সব চেয়ে বড় কথা এই যে, যার জলের জন্য প্রাণ কণ্ঠাগত, সে জল খুঁজতে না গিয়ে নানা ওজর দেখিয়ে স্থির থাক্‌তে পারে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশেচ্ছু সকলেই —"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।"

কর্ম্মেরও কৌশল রয়েছে, তারই নাম যোগ—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। এই কর্ম্মের কথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বল্‌ছেন—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥

—কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি এবং অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা নিরূপণে বিবেকিগণও মোহপ্রাপ্ত হন; এই জন্য আমি তোমাকে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে উপ-দেশ দিতেছি, তাহা জ্ঞাত হইলে তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করবে।

অর্জ্জুনের মত মহাকর্ম্মীকেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীভগবান্‌কে উপদেশ দিতে হয়েছিল—কর্ম্মের কৌশল কি; তা বলে দিতে হয়েছিল। আর আমরা এতই বুদ্ধিমান্ যে, সেই দুরূহ কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের কারও উপদেশ বা পরামর্শ নিবার আব-শ্যকই হয় না। যদিও বা কোন্ কাজটী কিরূপ ভাবে করলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সে বিষয়ে সেই কর্ম্ম যাঁরা পূর্ব্বে করেছেন তাঁদের পরামর্শ নেওয়া হয়, কিন্তু আসলে সমগ্র কর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে যাতে শেষে সেই কর্ম্মদ্বারা চিত্তবিভ্রান্ত না হয় বা বন্ধন না ঘটে, সে বিষয়ে বুদ্ধি, পরামর্শ বা উপদেশ নিবার আমাদের আবশ্যকই হয় না—কারণ আমরা সবজান্তা, নিজেই সমস্ত জানি ও বুঝি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত পণ্ডিতম্মন্য সবজান্তা মহাকর্ম্মী-দেরই পরিণামে বিশেষ করে চিত্তবিভ্রম ঘট্‌তে দেখা যায়। কারণ, যেখানে সমস্ত কর্ম্মের মূলে এক নিশ্চিন্ত নির্ভরতা বা সেই নির্ভর বা সমর্পণ-জনিত প্রেমভক্তির উদ্রেক হৃদয়ে আসে নাই, সেখানে শুধু কর্ম্মের মত্ততার আনন্দ আর কতদিন জীবনকে বহন করে চল্‌তে পারে? শীঘ্রই সমস্ত জীব-নের উপর দৈহিক ও মানসিক এক ভীষণ অবসাদ এসে জীবন দুর্ব্বহ করে তুলে। কিন্তু কর্ম্মের কৌশল বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যদি পূর্ব্ব হতে সচেতন হয়, তবে আর এমন অবস্থা ঘটে না, —কর্ম্মই মুক্তির কারণ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত মহা আনন্দে জীবনকে বহন করে নিয়ে যায়। তাই কর্ম্মযোগও একটা সাধনপন্থা।

শ্রীভগবান্ নিজের মুখে স্বীকার করে বল্‌-ছেন যে কর্ম্মতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়, যথা:—

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥

—কর্ম্মও বোঝা দরকার, নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি তাও বুঝতে হয়, (আর অকর্ম্ম অর্থাৎ অবিহিত কর্ম্ম যে সম্বন্ধে নিষেধও নাই কিন্তু বিধানও নাই, এমন কর্ম্ম সম্বন্ধেও) জানতে হয়; যেহেতু কর্ম্মের গতি অতি দুরূহ। পরের শ্লোকে আপাতদৃষ্টে অদ্ভুত কথা বল্‌ছেন—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

—যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখেন, তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধি-মান্। মানুষের মাঝে তিনিই যোগী, তিনিই সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। প্রথমতঃ এই কথাগুলি শুন্‌তে অদ্ভুত মনে হয় বটে, কিন্তু এর বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় সে তাৎ-

পর্য্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি কর্ম্মের মাঝে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে বর্ত্তমান থেকেও নিজকে দেহাদি থেকে পৃথক্ জানেন, সুতরাং দেহাদি দ্বারা কৃত কর্ম্মকেও স্বাভাবিক অকর্ম্ম বলেই অনুভব করেন, তিনিই বুদ্ধিমান অর্থাৎ তাঁর বুদ্ধিই খাঁটি বুদ্ধি। কর্ম্ম করেও তাঁর নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়েছে বুঝতে হবে। আবার সাধারণ লোকে অজ্ঞান বলে কর্ম্ম অতি কষ্টকর ভেবে যে কর্ম্ম ত্যাগ করতে চায়, তাহাদের সেই অকর্ম্মের মাঝেও তিনি আপনার দেহ মন প্রভৃতিকে কর্ম্মরত রাখেন, সুতরাং অজ্ঞানদের ভাষায় যা অকর্ম্ম, তার মাঝেও তিনি কর্ম্ম দেখেন। এইরূপে তিনি দেহধারণের যোগ্য সমস্ত কর্ম্ম করা সত্ত্বেও আসল কর্ম্মতত্ত্বের জ্ঞান আছে বলে, আপনাকে তিনি অকর্ত্তারূপে জেনে সমাধিস্থ হয়ে সব সময়ে কর্ম্ম করেন বলে তিনিই যোগী। তাঁর মন আসল কর্ত্তারূপ শ্রীভগবানের সঙ্গে সর্ব্বদাই যুক্ত থাকে। এইজন্য জ্ঞানীদের অভক্ষ্যভক্ষণেও দোষ হয় না, কেননা তাহাতে তাঁহাদের আসক্তি নাই। কিন্তু অজ্ঞলোকেরা আসক্ত হয়ে সব কিছু করে বলে তাহা দোষের হয়।

আসক্তিশূন্য হয়ে সমজ্ঞান লাভ করাতেই ত্রৈলঙ্গস্বামী লোকের দান করা অভক্ষ্য খেয়েও হজম করতে পারতেন। তাঁদের পক্ষে মদ মাংসও দোষের হয়না, কিন্তু আসক্তি থাকাতে মহা সাত্ত্বিক খাদ্যও আমাদের বন্ধনের কারণ হয়। আসক্তিশূন্যের কাছে অনেক সময়ে স্থূল জগতের নিয়মও উল্‌টে যায়, আর তা সাধারণ লোকের কাছে সেই মহাপুরুষের বিভূতি বলে গণ্য হয়। ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনে এরূপ বহু ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া ব্যাসদেব সম্বন্ধে এক গল্প আছে যে, তিনি একসময়ে যমুনা নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছেন, গোপীরাও তার কিছু পূর্ব্বে যমুনাতীরে এসে বিষণ্ণ মনে বসে রয়েছেন। তিনি তাঁদের বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বল্‌লেন—"ঠাকুর, আমাদের ওপারে যেতে হবে, কিন্তু কোনও নৌকাই পাওয়া যাচ্ছে না—তাই ক্ষুণ্ণ মনে বসে আছি। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি আমাদের ওপার যাওয়ার কোনও প্রকার বন্দোবস্ত করে দিতে পার না?" ব্যাসদেব তখন ছেলে মানুষের মত গোপীদিগের দইএর ভাণ্ডের দিকে তাকাচ্ছেন আর বল্‌ছেন—"তাতে আমার লাভ কি? তোমরা যদি ওপারে যেতে পার, তাতেই বা আমার কি লাভ, আর যেতে না পার্‌লেই বা আমার কি ক্ষতি?—আমি কেন মিছামিছি হাঙ্গামার মধ্যে যাই?" গোপীরা তখন তাঁর মন কিছু বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন—"আচ্ছা ঠাকুর, তুমি আমাদের কাছে কি চাও? কি পেলে তুমি আমাদের পার করে দিতে পার?" তখন ব্যাসদেব সেই দই ও মাখনের ভাণ্ডের দিকে বার বার তাকাচ্ছেন, আর বল্‌ছেন—"বেশী কিছু ত চাই না, তবে বেলাও হয়েছে, ক্ষুধাটাও বড় জ্বালাতন কর্‌ছে, তাই পেট্‌টা ঠাণ্ডা হলে সবই কর্‌তে পারি।" গোপীরা তখন হেসে ঠাকুর যত খেতে পারেন মাখন, দই দুধ ইত্যাদি তাঁকে খাওয়ালেন। খেয়ে দেয়ে ব্যাসদেব বল্‌ছেন—"চল এখন তোমাদের পার করে দেই।" তাঁরা এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্‌লেন—"কই ঠাকুর, নৌকা কোথায়? আগে নৌকা আন তবে ত পার হব।" ব্যাসদেব বল্‌লেন—"আহা, চলই না জলের কাছে—দেখ পার হতে পার কিনা!" গোপীরা ভাবলেন—"কি জানি, ঠাকুর শেষটায় আমাদের সাঁতারিয়ে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থাই ভাবছেন নাকি! তবে তো গিয়েছি আর কি! যাক্—যখন বল্‌ছেন, তখন জলের

নিকটে তো যাই—দেখি শেষ পর্য্যন্ত কি করেন।" ব্যাসদেব তখন তাঁদের নিয়ে জলের কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"যদি আমি কিছু না খেয়ে থাকি, তবে নদীর জল দু'দিকে সরে যাক্—যাতে আমরা হেঁটে ওপারে যেতে পারি।" গোপীরাও ভাবলেন—"ওমা সে আবার কি! এত খেয়েও 'কিছু না খেয়ে থাকি যদি—' তবেই হয়েছে!" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্যাসদেবের কথা সাঙ্গ হতে না হতেই নদীর জল দুদিকে সরে গেল, তখন ব্যাসদেব আগে আগে চল্‌লেন, গোপীরা তাঁর পিছনে পিছনে হেঁটে নদী পার হয়ে গেলেন। এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে ব্যাসদেবের আহার-রূপ কর্ম্মে অনাসক্তি-রূপ কৌশলই যে যোগশক্তি হয়ে এমন অসম্ভব সম্ভব করেছিল, তাতে আর সন্দেহ নাই।

কর্ম্মের কৌশলই হচ্ছে—অনাসক্তি অবলম্বন করে, কর্ম্মের আসল কর্ত্তার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করে, তাঁরই প্রেম বুকে নিয়ে আনন্দে জীবন ভরে তাঁর কর্ম্ম করা। অহং-ভাব, সংশয়, নিরানন্দ সে যোগীর কাছে ঘেঁস্‌তে পারে না। কিন্তু আমাদের মত মন্দাধিকারীর পক্ষে প্রথমেই অতটা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই সেই ভাব পাওয়ার জন্য জগতের কোলাহলে কাণ না দিয়ে, সংসারের চিন্তা হতে মনকে বিশ্রাম দিয়ে সংসারের আসল কর্ত্তার খোঁজে দেহ মনকে দৈনিক অন্ততঃ কয়েকবার নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তাতে কর্ম্মের মাঝে রসের যোগানও আস্‌বে, সারা জীবন ধরে কর্ম্মকেই মুক্তি-দ্বার বলে চিন্‌বার ও জীবনে প্রত্যক্ষ কর্‌বার শক্তি আস্‌বে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, জপ-ধ্যানাদি ত্রিসন্ধ্যা বা ভগবন্নাম ও গুণ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ ও আলোচনা, দৈনিক নির্দ্দিষ্ট শান্ত সময়ে, স্নিগ্ধ ও একাগ্র মনে প্রাণ উঘারিয়া প্রার্থনা সঙ্গীত বা স্তোত্রাদি পাঠ সমস্তই তার উপায় স্বরূপ। এই ভাবে যে কোনও পন্থায় দিনের মাঝে প্রিয়তমের সূক্ষ্ম সঙ্গ না কর্‌তে পার্‌লে মহাকর্ম্মীরও দু'দিন পরে পতন অনিবার্য্য। এই কর্ম্মকে সাধন রূপে নিতে হলে সেই নীরস কর্ম্মকেই তাঁরই প্রেমে সরস কর্‌তে হবে,—নতুবা অন্য রসে মাতোয়ারা হয়ে কর্ম্ম কর্‌তে গেলেই মতি ভ্রষ্ট হয়ে পথ হারাবে।

চলহে আবার।

—)•(—

ভুলে যাও অতীতের ব্যর্থ দুঃখ-খেদ—
দিবানিশি অশ্রু আর মর্ম্মবাহী স্বেদ।
সে কাহিনী ভুলে গিয়ে,
যা আছে আজ তাই নিয়ে,
হে পূজারী চল নিয়ে এজীবন-বেদ—
ভুলে যাও অতীতের ব্যর্থ দুঃখ খেদ।

কেমনে জীবন-যজ্ঞ হবে সমাপন,
নাহি জান তুমি কিছু অবোধ যখন,—
ভুল ক্রটি অপরাধ,
সব তুমি দিয়া বাদ,
চেয়েছিলে গড়িবারে এ হৃদয় মন,
শুভ্র তাহে রাখিবারে ফুলের মতন।

হায়, তুমি চিন নাই কুটীল জগৎ—
কুসুম-স্তবকে নহে পূর্ণ এই পথ;
ছিংস্র বন্য সেথা কত,
পথে আসে অবিরত—
ভাব নাই সে সকল শুনি মত্তা মত
এখানে রয়েছে দুই সৎ ও অসৎ॥

লাভ ও ক্ষতির কথা ভুলে তাই আজ,
নব আশে বাঁধি বুক ধর নব সাজ—
নিশার আঁধারে ভুলি,
উষায় কমল গুলি,
বরে যথা সবিতায় হৃদয়ের মাঝ—
তেমনি উষায় ব'রো, নহে এতো সাঁঝ!

সম্মুখে রয়েছে দীর্ঘ দিবস তোমার
নিরাশায় দূর করি চল আরবার;
জীবনে আঁধার কত
কভু করে দিবে নত,
হাসিবে মোহন দৃশ্যে কভু চারিধার।
বুক বেঁধে তাই বীর চলহে আবার॥

বীর সাধক

আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এই জন্যই স্থূল-বুদ্ধির দ্বারা সেই দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব অবগত হওয়া কঠিন। পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পর-প্রত্যয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলা দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। ইহা হইতে positivist (প্রত্যক্ষবাদীর) এর নির্ভীকতা আদর্শ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মাঝে প্রায় অধিকাংশই সত্যিকার অনুভূতি লাভ না করিয়াও, বেশ সুন্দর ভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যাইতে পারি। কিন্তু এই ধর্ম্মোপদেশে মানবের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে না। ভারতের মানব ধর্ম্মপ্রবণ, কিন্তু এই ধর্ম্মের নামে আজ যে কুৎসিৎ অনাচার নির্ব্বিরোধে চলিয়া যাইতেছে, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়!

সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে মনে আর কোন সন্দেহ বা সংশয় উপস্থিত হয় না। আর সংশয় কিম্বা সন্দেহ উপস্থিত হয় না অজ্ঞানীর—যারা তমের মাঝে পড়িয়া আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! কিন্তু যাহাদের প্রাণ সত্য-লাভের দরুণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা পরের মুখের নিছক উপদেশেই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। অগণিত সংশয়, সন্দেহ আসিয়া তাহাদের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তুলে। এই সংশয়, এই সন্দেহই কিন্তু মানুষকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দেয়। কাজেই যাহাদের ভিতর sharp criticism এর শক্তি রহিয়াছে, যাহাদের সহজেই বিশ্বাস আসে না, তাহারা একদিকে ধন্যই বটে! কেননা প্রাণে জ্বালা আসিয়াছে বলিয়াই তাহারা আর স্থির থাকিতে পারে না। যে আবেই হউক, উত্তেজিত করিয়া, আঘাত দিয়া নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই তাহাদের আসল লক্ষ্যের বিষয়।

চিকাগো বক্তৃতা-মঞ্চে একদিন যিনি বিজয়-

লাভ করিয়াছিলেন, সেই বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রাণের অব্যক্ত জ্বালায় অধৈর্য্য হইয়া এমন করিয়াই একদিন শিশুর মত সরল সহজ প্রাণ গুরু পরমহংসদেবকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন! সত্যদ্রষ্টা গুরু তাহাতে বিচলিত হন নাই। তিনি শুধু জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করিতেন, যাহাতে নরেনের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। সংশয়ান্দোলিত হইয়া পরম স্নেহভাজন নরেন একদিন রামকৃষ্ণের সম্মুখেই বলিয়া বসিলেন—"আপনি কি করিয়া জানেন যে আপনার আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল নয়?" এইরূপ বাক্যবাণ দ্বারা বিদ্ধ করিবার কারণ, বিবেকানন্দ তখনো সেই ধরণের সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই। কাজেই তিনি নিজে যাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, অনর্থক তাহা স্বীকার করিয়া যাইবার মত স্বানুরাগ তাঁহার ছিল না। এই জন্যই তিনি বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—"How do you know that your realisations are not the creations of your sick brain, mere hallucinations?"

আধ্যাত্মিক জগতে সংশয়বাদীর বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা বিরুদ্ধ মনোভাব যাহাদের, তাহারা যদি একবার সত্যের আলো প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সত্যকে যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত করে, অন্য কেহই আর তেমনি পারে না। এইজন্যই নাস্তিক যখন আস্তিক হয়, তখন ভগবানের মহিমা আরও বেশী প্রকট হইয়া পড়ে।

প্রাণ নীরস শুষ্ক হইয়া গেলে, অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তিই আর থাকে না। তখন ঘুমের ঘোরে অপরের কথায় সায় দিয়া চলিতে পারাটাই শান্তি মনে হয়। এই মারাত্মক ভাব সংক্রামিত হইলেই ক্রমশঃ জাতির অবনতি ঘটে। বিবেকানন্দের ভিতর এই সংশয়, এই জ্বালা আসিয়াছিল বলিয়াই তিনি যথার্থ সত্যলাভ করিয়া অপরের প্রাণেও শান্তি-বারি সেচন করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সমষ্টি মানবের অভাব-অভিযোগের মূর্ত্ত-প্রতীক হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা সেই দুর্লভ স্থান অধিকার করেন, তাঁহারা সবদিকেই বীর,—চিন্তায়, ভাবনায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে সর্ব্বত্রই তাঁহারা নির্ভীক।

নিজের ভিতর সত্যকে উপলব্ধি করিতে যাইয়া তাঁহারা চারিদিক্ হইতে কত বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! প্রত্যক্ষানুভব না হইলে মনের সংশয় মিটে না। এইজন্যই পরের কথায় এত সহজে আস্থা স্থাপন না করিয়া নিজের উপর একটু বিশেষ করিয়া জোর দিতে হয়। নিজের উপর বিশ্বাস করিয়া চলিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না, তাহারাই দুর্ব্বল—ভিখারী; পরের কৃপাভিখারী তাহাদিগকেই হইতে হয়। কিন্তু এইরূপ দুর্ব্বল অধিকারী দ্বারা মৌলিক সত্যের আবিষ্কার হয় না।

গীতাতেও এক জায়গায় আছে বটে,—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" কিন্তু এই সংশয়েরও পার্থক্য রহিয়াছে। যাহাদের জীবনের লক্ষ্য সত্যলাভ, তাহাদের সন্দেহ সত্যের পথই বরঞ্চ দেখাইয়া দেয়। কাজেই লক্ষ্য নিয়াই বিচার করিতে হইবে। সন্দেহ কিম্বা সংশয়ের অভাবে অনেকেই অন্ধের মত পরের অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হয়।

সত্যের জ্বালা বড় বিষম জ্বালা, সেই জ্বালা মানুষকে পাগল করিয়া তুলে! এইজন্যই সত্যানুসন্ধিৎসু সাধক রাত-দিন জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে। কিছুতেই তাহাদের সোয়াস্তি আসে না, জাগতিক কোন প্রলোভনেই তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতে

পারে না। সকলেই বলে,—'ভগবান্ আছেন', কিন্তু তাহারা সেই অনিবার্য্য জ্বালায় অস্থির হইয়া বলে—'ভগবান্ নাই!' সহজে তাহাদের বিশ্বাস আসে না। এইজন্যই জগতের লোক রামকৃষ্ণকে মহাপুরুষ বলিলেও, ভগবান্‌কে তিনি প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াছেন বলিলেও বিবেকানন্দের প্রাণের জ্বালা ইহাতে বিন্দুমাত্র উপশম হয় নাই। তাঁহার প্রাণের জ্বালা সমভাবেই রহিয়া গেল। এইজন্যই রামকৃষ্ণকে স্পষ্ট তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—"আপনি যে ভগবান্ ভগবান্ করেন, তাঁহাকে কি আপনি দেখিয়াছেন?" প্রত্যুত্তরে রামকৃষ্ণদেব যোগ্য গুরুর ন্যায়ই উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—"হাঁ, যেমন তোমাকে দেখিতে পাইতেছি তেমনি ভগবান্‌কেও আমি দেখিতে পাই, বরঞ্চ তোমাদের চেয়ে ভগবান্‌কে আরও সুস্পষ্টভাবে আমি দেখি।" এই উত্তরেও কিন্তু তাঁহার তৃপ্তি আসিল না, তিনি রামকৃষ্ণকে ধরিয়া বসিলেন যে—ভগবান্ যদি থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে দেখিয়ে দিন। উপযুক্ত শিষ্যের সময়োচিত প্রার্থনা সত্যদ্রষ্টা গুরু উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আত্মিক বল দ্বারা বিবেকানন্দের সংশয়কে তিনি অপনোদন করিয়া দিলেন। কাজেই যথার্থ আকুলতা কিম্বা সংশয়ের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। ইহাতে অনেক দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব আবিষ্কার হয়।

না বুঝিয়া, উপলব্ধি না করিয়া স্বীকারোক্তিতে কোন লাভ নাই। বীর-সাধক কোনরূপ তুচ্ছ-সংস্কার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন না, এইজন্যই চরম সত্যলাভের অধিকারী বীর-সাধক। দুর্ব্বল—কৃপার পাত্র, কাজেই সামান্য কৃপাতেই তাহাদের পরিতুষ্টি। তাহারা দাস হইয়া থাকিতেই ভালবাসে। প্রভুত্ব লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তি তাহাদের নাই!

বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় উপেক্ষা বা অবজ্ঞা আসিয়া পড়ে। কিন্তু সত্যলাভেচ্ছুর' সংশয়ের মাঝেও বিশেষত্ব রহিয়াছে। তাঁহাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা, বিদ্রূপ নিজের স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্তই। এইজন্যই উপেক্ষা বা অবজ্ঞা তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট করিয়া দেয় না, শত দিক হইতে শত শত প্রশ্ন দ্বারা অনুভবকারীকে তাহারা উত্যক্ত করিয়া তুলে। এই উত্যক্তির ফলে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। একজেদী ছেলের আবেদন যেমন মা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, তেমনি সত্যলাভেচ্ছু অক্লান্ত সাধকের প্রার্থনাও ভগবান্ পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

নিজে নিজে বুঝিবার প্রবৃত্তি ভিতরে জাগ্রত হইলেই আপনি অন্তর হইতেই সেই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। মানুষের জড়ত্ব জিনিষটা হইয়াছে—কালস্বরূপ! সর্ব্বত্রই তাহার আধিপত্য রহিয়াছে। ধর্ম্মজগতে এই জড়ত্বের দরুণই ভণ্ডামী প্রবেশ লাভ করে। কেননা নিজের সঙ্গে যাচাই করিয়া দেখিবার সচেষ্ট ভাব সকলের প্রাণেই থাকে না। কাজেই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়া সংস্কার না করিয়াও যদি ধর্ম্মলাভ হইয়া যায়, তাহা হইলে ফাঁকতালে এই সুযোগ হারাইবার প্রয়োজন কি?

বিভিন্ন মত, বিভিন্ন সাধন প্রণালীর উদ্ভব হয়, জাতি যখন সজীব থাকে। আর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ আরম্ভ হইলেই বুঝিতে হইবে জাতির প্রাণ শক্তি—spontaneity লুপ্ত মৃত প্রায় হইয়া গিয়াছে। মৌলিক রচনার পর যখন ভাষ্য, ঠিকা টিপ্পনী আরম্ভ হয় তখনই বুঝতে হইবে, প্রাণের আসল উৎস শুকাইয়া আসিয়াছে। তখন কেবল ধর্ম্ম-রক্ষার দরুণ যুক্তি বিচারের প্রয়োজন হয়। অথচ সজীব ধর্ম্ম কিন্তু টীকা টিপ্পনীর তোয়াক্কাই রাখে

না। কেননা সেই ধর্ম্ম যে প্রাণ স্বরূপ, তাহাকে প্রতিপন্ন করিতে অন্য কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্ম স্বতঃ স্পন্দমান, স্বতঃ স্ফূর্ত্ত!

তীব্র আবেগ দ্বারা, তীব্র জ্ঞানস্পৃহা দ্বারা ধর্ম্মের জড়ত্বকে অপসারিত করা যায়। এইজন্যই ধর্ম্ম যখন কুসংস্কারে পরিণত হইয়া পড়ে, তখনই বীর সাধকের উদ্ভব হয়। তাঁহারা আসিয়া মানুষের অনন্ত শক্তির কথাই প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইচ্ছা করিলে যে মানুষ ধর্ম্ম-জগতেও ক্রমোন্নত হইতে পারে, সেই অগ্নিময় বিশ্বাস জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দেন।

ধর্ম্ম দুর্ব্বল নয়, অসহায় নয়। ধর্ম্ম বিদ্যুতের ন্যায় শক্তি-সঞ্চারের প্রাণ! কাজেই ধার্ম্মিক জাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়,—ধর্ম্মের আসল উৎস যেন নানা আবরণে আবৃত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। আবার আমাদিগকে ধর্ম্মের মূল উৎসে পৌঁছিবার দরুণই সজাগ, সচেষ্ট, সচেতন হইতে হইবে।

কোন দিক হইতে প্রশ্ন উঠিলেই গোঁড়া ধার্ম্মিকের প্রাণ কাঁপিতে আরম্ভ করে। এই কি ধর্ম্মের লক্ষণ? ধর্ম্ম মানুষকে দেহে মনে প্রাণে সবল করিয়া তুলে, কিন্তু আজ সেই ধার্ম্মিক কোথায়? সংশয়বাদীকে নিরস্ত করিবার মত সত্যানুভব কয়জনের মাঝে রহিয়াছে? প্রশ্ন উঠিলে, প্রশ্ন করিলে, আজকালকার ধার্ম্মিক ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। কেননা প্রশ্নকারীর সংশয় অপনোদন করিয়া দিবার শক্তিই যে নাই ধার্ম্মিকের!

রাষ্ট্রে যেমন একদল নির্ভীক আত্মোৎসর্গ পরায়ণ মানবের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনি ধর্ম্মের দিক দিয়াও যথার্থ সত্যান্বেষী একদল বীর সাধকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শুধু বচনবাগীশ হইলে চলিবে না, যারা সত্যের দরুণ প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বেদে, পুরাণে, ভাগবতে অসংখ্য ভাব রহিয়াছে, কিন্তু সেই ভাব সত্যি কিনা, তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারা যায় কিনা, সেই পরীক্ষার দরুণই বীর সাধকের প্রয়োজন।

রাষ্ট্র-স্বাধীনতার দরুণ অসংখ্য মানব আজ আত্মাহুতি দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না, কিন্তু ধর্ম্মের দরুণ প্রাণ উৎসর্গ করিতে এখনো দ্বিধা রহিয়াছে। এখনো মানব ভাবুকতা নিয়াই তৃপ্ত! কাজেই ধর্ম্মজগতেও নির্ভীক সাধকের আত্ম-দান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই রাষ্ট্র-সংগ্রামের চেয়ে, আধ্যাত্মিক-সংগ্রাম কম প্রয়োজনীয় নয়। বিশেষতঃ যেখানে ধর্ম্মের নামে অন্ধ সংস্কারই আধিপত্য বিস্তার করিতেছে!

আমাদের শাস্ত্রে পুরাণে সব আছে, এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়া কোন লাভ নাই। এখন চাই যাচাই করিয়া দেখিবার মানুষ—সেই মানুষের প্রাণে অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত উদ্যম, অনন্ত বীর্য্য থাকা চাই। ভারতের অগৌরব দূর করিবার দরুণ সত্যান্বেষী বীরসাধকেরই বিশেষ প্রয়োজন।

শান্তিধাম।

——:(*):——

শান্তি কোথায়? তৃষিত জীবের আকুল প্রাণ হইতে কেবল এই এক প্রশ্ন নিয়ত উত্থিত হয়—শান্তি কোথায়? কত রকম করিয়া মানুষ সুখকে ভোগ করে; আজ যাহা একান্ত কামনার বস্তু, কাল তাহা পায়, পাইয়া তাহাকে মন্থন করিতে কতই না উপায় সে অবলম্বন করে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে সুখের উপকরণ লিপ্ত করিয়াও মানুষ অন্তরে শান্তি পায় না। পরের সুখোপকরণে যে আজ লালায়িত, দুদিন বাদে নিজে সে সমস্তের অধিকারী হইলেও আবার নূতন কামনায় তাহাকে যেন পাগল করে। এমন ভাবে নিত্য নূতন ভোগের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া শেষে মানুষ ক্লান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করে—'শান্তি কোথায়?'

অতি পুরাতন প্রশ্ন, মুখস্থ করা উত্তরও হয়ত মিলিবে, কিন্তু তবুও নিরন্ন কৃষকের জীর্ণকুটীর হইতে সাম্রাজ্যাধিপতির দুগ্ধ-ফেননিভ হর্ম্ম্যতলাবধি একই করুণ-কান্না প্রতিধ্বনির বিরাম নাই—শান্তি কোথায়? কতজনে কত রকম করিয়া শান্তির সন্ধান অপরকে দান করে, কিন্তু হায়, পূর্ণশান্তি হইতে হয়ত স নিজেই বঞ্চিত! আংশিক শান্তি সে হয়ত পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি হয়? আংশিক-শান্তি অনেকেরই,—হয়ত বা প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও বিষয়ে আছেই, তাহাতে 'কি প্রাণ মানে? প্রাণ ভরিয়া আমি যাহা চাই, তাহা যদি না মিলিল, তবে রাজার রাজত্বেও আমার সুখ নাই। আর আমি যাহা চাই, তাহা যদি পাই, তবে জগতের সব তুচ্ছ। কেননা, আমার তদতিরিক্ত সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বে কোনও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, মানুষ কি এমনি করিয়া শান্তি চায়? যুক্তির সহায়ে বলা সহজ যে, শান্তিকেই যদি জীবনের কাম্য করিয়া থাকি, তবে তাহা চাহিব না কেন? কিন্তু না, মানুষ তেমন ভাবে শান্তিকে চায় না। আমি যাহা চাই, তাহাকে লইয়া সমস্ত বিশ্বসংসারের এক নিভৃত-কোণে, জগতের সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বাস করিতে হইলেও আমার আপত্তি নাই—এমন সাহসের কথা, প্রাণের একান্ত তেজের সঙ্গে প্রেমের সংমিশ্রণ প্রায়ই দুর্লভ। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, প্রথমতঃ আমি কি চাই, সত্যই কি পাইলে আমার এই অশান্ত হৃদয় শান্ত হইবে, আনন্দের চির-স্রোত জীবনে স্বতঃ সর্ব্বদা প্রবাহিত হইবে, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না। কেবল মাত্র একটা অশান্ত ও অস্থির ভাবে জীবনকে দুঃসহ মনে করি। কেহ কেহ হয়ত বর্ত্তমানে একটী মাত্র কামনার বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া উন্মনা হইয়া ফিরিতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে যদি নিবিড়ভাবে আপন হৃদয়কে পরীক্ষা করিতে বলা হয়, তবে সেই সুপরীক্ষিত হৃদয়ের উত্তরে কথনও এই জগতের কোনও বস্তু দ্বারা চিরশান্তির প্রত্যাশা করে না দেখিতে পাইবে।

আসল কথা হইতেছে, মানুষ চিরশান্তি চায় না। আপাততঃ যে হাহাকার তার বুকে নিয়ত গুমরিয়া মরিতেছে, কেবল মাত্র তাহারই উপশম সে চায়। সেইজন্য যদি তাহাকে ধর্ম্ম-কথা শুনিতে হয় তবুও স্বীকার, অন্য যাহা কিছু তাহার সাধ্যায়ত্ত তাহা তো করিবেই। চিরশান্তি বা আনন্দ প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রের কথা আছে বটে, কিন্তু

মানি জীবনে সেগুলি যে সত্যই মিলে, এমন ভরসা শাস্ত্রে বা মহাপুরুষের কণ্ঠে মিলিলেও তাহাদের কামনাকুলিত চিত্তে ও সমস্ত শুধু ছেলেভুলানো ভূয়ো কথা। প্রাণ তাহাতে মানে না, তাই শাস্ত্র কথার অবতারণায় তাহারা ভয় ও বিরক্তিতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। সুতরাং তাহাদের পথ একটু অন্য রকমের। অর্থাৎ এই সব শাস্ত্রকেই যদি অন্য রকম ঢংএ জীবনের প্রাকৃত ভাবের সঙ্গে মিলাইয়া সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়, যদি বাস্তব-জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাহাদের নানা প্রকারে সামঞ্জস্য দেখাইয়া শাস্ত্রকে জীবনের দরদী বন্ধুর স্থলাভিষিক্ত করা যায়, তবেই শাস্ত্রের সমাধান শুনিতে অবহিত চিত্তের অভাব হয় না। নতুবা পুরাণ কথা সত্যই পুরাণো কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও দিন দিন আরও দাঁড়াইতেছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রের আজ বিশ্বময় প্রতিপত্তির মূল কারণই হইল—তাঁহার বাণী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে একদিন আমাদের দর্শন-কাব্য-পুরাণ প্রভৃতিও মানুষের এই অভাব পূরণ করিত, কিন্তু আজ কালক্রমে দর্শনাদির আমাদের কাছে সে স্থান বা Position নাই। এই (Degradation) অবনতির বস্তুতঃ কারণ কি তাহা তলাইয়া না দেখিয়া অনেক আধুনিক শিক্ষিতই নাসিকাকুঞ্চন সহকারে বলিয়া থাকেন যে—'ওসবের দিন এখন আর নাই;—এখন সব নব ভাব—নবীন যুগ ইত্যাদি।' কিন্তু কেন নাই, সে কারণ যদি গম্ভীর ভাবে বিচার করা যায়, তবে পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করিতে হয় যে এই অবনতির মূল যে শাস্ত্রসমূহের শক্তিকে আমরা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি, তাহা নয়; বরং সে অতিক্রম নিম্নদিকে হইয়াছে, অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রভাব হইতে জীবন বহু নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছে।

যাহাই হউক, অধিকাংশ অধিকারীই যে বর্ত্তমানে জীবনে শাস্ত্র-মতকে তেমন আকঁড়াইয়া ধরিবার প্রয়োজনীয়তা দেখেন না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কাজেই—"যখন যেমন তখন তেমন" পথেই চালাইয়া ক্রমশঃ প্রকৃত পন্থায় আনিয়া উন্নীত করাই এখন যথার্থ দরদীর কর্ত্তব্য। তাই মানুষ যাহা চায়, তাহা দ্বারাই প্রথমে তাহাকে পরিবেশন করিতে হইবে। অবুঝ বালকের মত—হিতকর ও রুচিকর পথ্য না চিনিয়া—যখন শুধু রুচিকর পথ্যই তাহার প্রার্থনীয়, তখন প্রথমে তাই দিয়াই ক্রমশঃ তাহার রুচিকে সুন্দর করিতে হইবে। নতুবা সেই শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা—"উন্মত্তবৎপ্রেক্ষাবন্তিরুপেক্ষ্যতে।"

ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি, সমষ্টিসমাজ বা দেশের কাছে প্রথমে তুচ্ছরূপে গণ্য হইলেও ক্রমশঃ তাহাই সমাজ ও দেশকে আচ্ছন্ন করে। আবার সমগ্র দেশের যে প্রবল অভাব বা স্বাভাবিক দৈন্য তাহাও সমাজ ও ক্রমশঃ ব্যষ্টি জীবনের অভাব ও অশান্তির কারণ হয়। ব্যষ্টি সমষ্টি পরস্পর নির্ভর সাপেক্ষ। কাজেই কোনটাকেই অবহেলা করা চলে না। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যে অশান্তি বিরাজমান, হয় ত রাষ্ট্রগত সমষ্টি কারণে তাহার উদ্ভব। আবার সমস্ত প্রকার দুঃখই রাষ্ট্রগত কারণে হয় না; কেননা তাহা হইলে স্বাধীন দেশবাসীদের মধ্যে দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিত না। বর্ত্তমানে এই দেশের অবস্থা যদিও অধিকাংশ পরিমাণে রাষ্ট্রগত কারণে মন্দভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অন্য দেশেও আবার রাষ্ট্রগত স্বাস্থ্য অটুট থাকিলেও সেই সুস্থ সমষ্টির মাঝেই আবার ব্যষ্টি দুঃখের বীজ ঢুকিয়া সমগ্র দেশকে এক সময়ে ঘোর বিপ্লবে পরিণত করিতে পারে। কারণ ব্যষ্টির ক্রমশঃ ব্যাপকতাই

সমষ্টির রূপ ধারণ করে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, অশান্তির উদ্ভব যে কারণ হইতেই হউক না কেন, সে অশান্তি যখন আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে, তখন তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় আমাকে খুঁজিতেই হইবে। এই উপায় খুঁজিবার ধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দেশে দুই প্রকার। পাশ্চাত্য, ব্যক্তিগত দুঃখের নিরসন করিতে যাইয়া যে স্থূল বস্তুর অভাবে তাহার অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সংগ্রহে প্রাণপাতী প্রয়াস পায়, তবুও যদি তাহা না পারে, তবে হয় ত সমশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রমশঃ বিপ্লব বাধাইয়া দেশের বা রাজার কাছ হইতে স্বীয় স্বীয় অভাব পূরণ করিয়া লয়। আর প্রাচ্য অর্থাৎ ভারতবাসী অশান্তির কারণ দূর করিতে প্রথমতঃ তাহার যে সামান্য ক্ষুদ্র শক্তি রহিয়াছে, তদনুযায়ী কিছু প্রচেষ্টার পরই যদি তাহাতে সফলকাম হইতে না পারিল, অমনি অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, পূর্ব্বজন্ম বা দৈবের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া, জীবনকে দুঃসহ অশান্তিপূর্ণ করিয়াই রাখে। এহেন সময়ে শাস্ত্র বা সাধু-সন্তবাণী তাহার ভাল না লাগিবারই কথা। কেননা, যতই শান্ত ও বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ে শাস্ত্র-বাণীর অনুসরণ করা যায়, ততই সে সমস্ত জীবনে সমধিক ফল প্রসূ হয়। কিন্তু সুস্থ ভাবে যে ঔষধ খায় আর যে চঞ্চল হইয়া সে ঔষধ পান করিবার সময়ে ফেলিয়া দিতে চায়, এতদুভয়কেই—যিনি সুচিকিৎসক হইবেন—তিনি সমভাবে ঔষধ যেমন করিয়াই হোক পান করাইয়া তবে ছাড়েন, তেমনি যতই অস্থির ও অশান্তিপূর্ণ মন হউক, তাহার প্রশান্তির যাহা উপায় শাস্ত্রাদি তাহা সমভাবে প্রদর্শন করিবেই।

অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করার সর্ব্ব প্রধান উপায়—যোগ্য পাত্রের ভালবাসা। অধিকাংশ অশান্তিপূর্ণ জীবনে শান্তি আনয়নের একমাত্র ইহাই উপায়। বহু বৈরাগ্যের প্রধান ও প্রথম কারণই থাকে একান্ত প্রিয়জনের বিরহ। সেই শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করিতে যদি সেই প্রিয়-প্রেমের সম্ভাবনা আর না-ও থাকে, তথাপি তাঁর সেই প্রিয়-স্মৃতি যেখানে মিলে সেখানেই প্রাণ মজে। স্থূল জগতে সেই প্রেমের আংশিক ভাবও যদি কাহারও মধ্যে আরোপিত দেখা যায়, তবে সেই আধারই অশান্ত জীবনের অনেক খানি অবলম্বন রূপে গৃহীত হয়। দৈবাৎ এই জগতে যদি তেমন প্রাণ মন মুগ্ধকারী কোনও হৃদয় মিলে, তবে সেই হৃদয়ের সহায়ে মানুষ পরম শান্তির অধিকারী হইতে পারে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই স্থূল অবলম্বনের কথা বলিতে গিয়াই বৈষ্ণব শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডীদাসে কিছু কয়—
ছাড়ি জপ-তপ, করহ আরোপ, ইহা ছাড়া কিছু নয়।"

কিন্তু এই আরোপের অবলম্বন মনোনীত করিবারও নানা রূপ লক্ষণ এই শাস্ত্রে রহিয়াছে। সে সমস্তই পরম শান্তির পথ প্রদর্শক, সুতরাং প্রাকৃত ভালবাসা নয়। চণ্ডীদাস এই প্রেমের সাধকরূপে যে দেহ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ইষ্ট দেবতাকে আরোপিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়।"

কাজেই প্রাকৃত ভালবাসার পরিণাম যে সাধারণতঃ কামে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, সেই ভালবাসা কখনও পরম শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। বরং তাহার পরিণামে হৃদয়ে এক অশান্তির তুষানল জ্বলিতে থাকে। আর বর্ত্তমান দেশ ও সমাজের পরিস্থিতির মধ্য হইতে এই সাধনার যোগ্য পাত্র এবং অবলম্বন উভয়ই পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং সকলের সমস্ত প্রিয়জনের যেখানে

সমুচ্চয়, সেই পরম মঙ্গল পরম প্রেমময় দেহ যাঁহার, সেই ইষ্ট দেবতায় মন প্রাণ নিলীন করাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলের পক্ষেই শ্রেয়ঃ। যে কোনও অশান্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি লৌকিক উপায়ে হয় না ; এ সম্বন্ধে সাংখ্য সূত্রকার বিজ্ঞান ভিক্ষুর সূত্র যথা :—

"ন দৃষ্টাৎ তৎ সিদ্ধি র্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।"

দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে সে সিদ্ধি হয় না, সে দুঃখনিবৃত্তি হইলেও পুনরায় তাহার অনুবৃত্তি হয় অর্থাৎ আবার দুঃখ বা অশান্তি আসে। তাই বলিতেছিলাম, শান্তি আর কোথাও নাই—একমাত্র তিনি ছাড়া—যিনি সবার চেয়ে প্রিয়, সমস্ত মঙ্গলের নিদান, পরম শান্তিময় ; চরম শান্তিধাম সেইখানেই।

রোগ-শয্যায়।

আজ এলিয়ে পড়ে দেহ—
আস্‌বে না আর কেহ,
এই নিরালায় মনটাকে তোর
ঊর্দ্ধ দিকে তোল্—
আজ জগৎ-বাঁধন ভোল্।

মনের যত শক্তি আছে,
হোক্‌না যাচাই নিজের কাছে—
থাক্‌না দেহ অমনি পড়ে
কি তোর আসে যায়—?
হারাস্‌নে এই মস্ত সুযোগ হায়!

প্রাণের যত ভরসা আশা,
শুধুই বুকে লয় যে বাসা—
কর্ম্মে চটুল দেহের বাধায়
হারায় তাদের দিক—
আজ মিল্‌ল সুযোগ ঠিক।

বিশ্রামে থাক্ ওই দেহ তোর—
মন আজ নেশায় যাক্ হয়ে ভোর—
যেই নেশাতে পাগল হ'য়ে
ভক্ত গাহে গান—
তাতে হোক্ না মত্ত প্রাণ!

দেহের জ্বালা, মনের দাগা,
ভোল্‌রে এবার ও অভাগা—
দ্বারের কাছে আস্‌ছে কে আজ
তাঁরই কথা ভাব—
যদি চাস্ জীবনে লাভ।

ও তোর জন্ম হতে ক্ষতি,
আজ পড়্‌ছে তাতে যতি ;—
যায় যদি রে যাক্‌না দেহ
ফুরালো তোর কাজ ;
এ যে পরম সুযোগ আজ

খাঁটী মানুষ।

হৃদয়ের মহত্ত্ব দিয়েই কে ছোট, কে বড় তার পরিচয় পাই আমরা। মানুষ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুর পরিবর্ত্তন হয় না, শুধু তার হৃদয়েরই পরিবর্ত্তন ঘটে। আর একটী বিষয় মন থেকে একদম লোপ পেয়ে যায়—সেটী হল সঙ্কীর্ণতা। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি জিনিষটী খুব বেড়ে যায়। তখন সকলের দরুণই সমবেদনা হয়, করুণা হয়। মহতের কাছ থেকে যদি শিক্ষণীয় কোন বিষয় থেকে থাকে, তাহলে এই হৃদয়বত্তাটুকুই! মানুষের হৃদয়টী প্রশস্ত হয় কি ক'রে, কি করে মানুষ মানুষের ভুল, ত্রুটী, সবকে অতিক্রম করেও মানুষ বলে সম্মান করে, এগুলোই হল শিক্ষার বিষয়। জীবনের লক্ষ্য যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে এগুলোই ভাল করে জেনে নিতে হবে।

একটী সত্যিকার ঘটনা বলছি শুন। আমরা হ'লে হয়ত যে নাকি অন্যায় করেছে, তার দিকে কোন দিন মুখ তুলেও চে'তেম না। আর বিশেষতঃ যে গল্পটী বলব, তার মাঝে যে দোষী, তার মত দোষও হয়ত বড় কেউ করে না। কিন্তু গুরুজী সেই পাষণ্ড শিষ্যকেও কি ক'রে হৃদয়ের অমায়িক আকর্ষণ দিয়ে কাছে টেনে নিলেন, তার সকল অপরাধ, সকল ত্রুটী পিতার ন্যায় কি করে মার্জ্জনা করলেন, তা জানলে তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে। লোকে তাঁকে মহাপুরুষ বলে, যোগী বলে, জ্ঞানী বলে, কিন্তু আমার কাছে তিনি যে ভাবে ধরা দিলেন, সে হল সহজ মানুষরূপে। আমার তাঁকে মান্য করতে ইচ্ছে হচ্ছে, তাঁর দিকে আমার মন আকৃষ্ট হচ্ছে,—শুধু তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখে। আমি তাঁকে যোগী ব'লে, জ্ঞানী ব'লে জানি না, আমি জানি তিনি হৃদয়বান্, মহৎজন; তাঁর হৃদয়ের অসীম স্নেহ, অসীম করুণার সঙ্গে আর কোন কিছুরই তুলনা হয় না। আমার মনে হয়—যোগ, জ্ঞান, ভক্তি এসব হচ্ছে শুধু বাইরের নাম, আসলে মানুষের হৃদয়টী যখন প্রশস্ত হয়, তখন তার সবদিকে পূর্ণতা ঘটে। জ্ঞানী হয়ে, যোগী হয়ে যদি লোক জগতের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠে, আশে-পাশের লোকের দুঃখ দেখে যদি তার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়, তাহ'লে তার সেই যোগের মূল্য কি? আমি বুঝি মানুষের প্রাণকে মানুষের হৃদয়কে। বুদ্ধদেবকে মানুষ জ্ঞানী, যোগী কত কি বলে, আমি কিন্তু জানি তিনি পরম হৃদয়বান্। তা না হলে কি সামান্য একটা ছাগ-শিশুর প্রাণ রক্ষার্থে আপন জীবন দান করতে কেউ প্রস্তুত হতে পারে? আমার

কাছে এই হৃদয় জিনিষটাই সকলের চেয়ে সেরা। আমাদের মানব-সমাজে যে ক্রমোন্নতি হচ্ছে তার নিদর্শন বুঝ্‌ব কি করে? —না, যখন থেকে আমরা মানুষের সুখে-দুঃখে সমভাগী হয়ে বেশ আনন্দে সম্মিলিত হয়ে জীবন-যাপন কর্‌তে পার্‌ব! ...... যাক্, ভূমিকাতেই অনেক কথা বলে ফেল্‌লাম; এখন সত্যিকার ঘটনাটী বলি, তোমরা মন দিয়ে শোন।

এক মহাপুরুষ আর তাঁর ১০।১২টী শিষ্য। তিনি সত্যলাভ করে বুঝ্‌লেন, মানুষকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করে তোল্‌বার সাহায্য, যত্ন, চেষ্টা না কর্‌লে কিছুতেই কিছু হয় না। ছোটবেলাতে মানুষের মনটীও কাঁচা থাকে, তখন থেকে তাকে যে ভাবে গড়া যায়, সে-ভাবেই সে গড়ে উঠে। তাই মহাপুরুষের মনে এক সঙ্কল্প জাগ্‌ল একটী ছোট-খাটো আশ্রম কর্‌বার। বেশী না—৪।৫টী ছেলেকে নিয়ে তিনি থাক্‌বেন, আর তাঁর জীবনের অনুভূতিগুলিকে এইসব উপযুক্ত আধারের ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত করে তুল্‌বেন। এই সঙ্কল্প নিয়েই তিনি আশ্রমের পত্তন করেন। আজ হ'তে হ'তে ৫টীর জায়গায় ১০।১২টী শিষ্য হয়েছে তাঁর।

শিষ্যদের সঙ্গে যে গুরুজীর কি অমায়িক ব্যবহার, তা আর তোমাদের কি বল্‌ব! পিতা-পুত্রের যে সম্বন্ধ, পরের ছেলে হলেও গুরুজী তাদের তার চেয়েও বেশী স্নেহ করেন! সাংসারিক ভালবাসার একটা মোহ থেকে যায়, কিন্তু সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের কি অমায়িক ভালবাসা, সে ভালবাসায় প্রত্যেকের হৃদয় নিহিত স্বরাট্ পুরুষের আত্ম-জাগরণ হয়। তিনি বলেন,—"আমি যে ওদের এত ভালবাসি, ওদের দোষ-ক্রটীতে যে আমাকে এত আঘাত দেয়, এর একমাত্র কারণ হ'ল আমি ওদের পরম পবিত্র বলে মনে করি, ওদের ভিতর আমি ভগবদ্দর্শন কর্‌ব, এই আমার একান্ত অভিলাষ। আমি ওদের দেহকে ভগবানের মন্দির বলে মনে করি। কাজেই ওদের অপরাধের দরুণ আমার এত জ্বালা হয়, আর ওদের দরুণ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয় আমাকেই।" এই তো গেল গুরুজীর হৃদয়ের পরিচয়ের কথা।

এমনি করে বেশ তিন চার বৎসর কেটে গেল। গুরুজী পরীক্ষার্থে সবচেয়ে বয়সে এবং গুণে বড় শিষ্যের উপর আশ্রমের ভার দিয়ে তীর্থ-ভ্রমণে বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় সকল শিষ্যকে ডেকে বলে গেলেন—"আমি আজ আবার তীর্থ-ভ্রমণে বের হচ্ছি। তোমরা বেশ মিলে-মিশে থেকো। আমি দূরে থাক্‌লেও তোমাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ ঠিক থাকে কি না, তাই এসে ফিরে দেখ্‌ব। আমি আর কয়দিন? আমার দেহান্তে যদি তোমরা জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শকে ঠিক রেখে না চল্‌তে পার, তাহলে এই শিক্ষা-দীক্ষার

কি সার্থকতা রইল? আমি যাকে ভার দিচ্ছি, তাকে তোমরা ভক্তি করো, বড় ভায়ের মত দেখো।” এই কয়টী উপদেশ দিয়ে গুরুজী তাঁর তীর্থ-ভ্রমণে বের হয়ে গেলেন।

এদিকে গুরুজী যে তীর্থে গিয়েছেন, প্রায় দু’বৎসর হয়ে গেল। তিনি এখন হরিদ্বার হৃষিকেশ অঞ্চলের বেশ পরম মনোরম এক নিভৃত স্থানে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছেন। আর ৬ মাস পরেই আশ্রমে ফির্‌বেন। তাঁর মনে কত আশা-ভরসা! কিন্তু এ দু’বৎসরের মাঝে কত যে পরিবর্ত্তন, কত যে বিপ্লব হয়ে গিয়েছে, তা কিন্তু গুরুজী জানেনও না।

ইতিমধ্যে ব্যাপার হয়েছে কি জান? গুরুজী যার উপর আশ্রমের ভার অর্পণ করে গিয়েছিলেন, সে-ই সকলের চেয়ে আশ্রমের বিরোধী হয়ে উঠল! যে কয়টী ছেলে ছিল আশ্রমে, তাদের মনেও আগুণ ধরিয়ে দিলে। কেবল তার মুখে একই কথা যে,—“এরূপভাবে আশ্রম করে কোন হিতের আশা নাই। ধর্ম্মের নামে অনর্থক কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করে শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। ও-সব ঋষি-যুগের আদর্শ কি আর এ-যুগেও খাটে? Spirit of the age বুঝে কাজ কর্‌তে হয়।” এরূপভাবে বিরুদ্ধ-ভাবকে প্রশ্রয় দিতে দিতে সে এমনি চরম-সীমায় গিয়ে পৌঁছলে যে, আশ্রমটীকে সমূলে বিনাশ কর্‌বার যত ফিকির আছে তাই কাজে খাটালে। চূড়ান্তভাবে মনের সাধ মিটিয়ে সে আশ্রম থেকে সরে পড়্‌ল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ৫।৬ টী ছেলেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ কর্‌ল। রইল কেবল (তার ভাষায় বল্‌তে গেলে) যারা দুর্ব্বল বা গুরুর প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

ছয় মাস শেষ হলে পর গুরুজী আশ্রমাভিমুখে রওনা হলেন। মনে কত আশা, কত ভরসা! কিন্তু আশ্রমে এসেই আশ্রমের এই দুর্দ্দশা দেখে কি যে অব্যক্ত ব্যথা পেলেন তিনি, তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম। কিন্তু আশ্চর্য্য! সাধারণ মানুষ এই ব্যাপারে কত ক্ষুব্ধ কত বিচলিত হয়ে উঠ্‌ত। গুরুজী কিন্তু স্থির-ধীর-গম্ভীরভাবে, যে চলে গিয়েছে তার প্রতি আশীর্ব্বাদই কর্‌তে লাগ্‌লেন। ছোট ছোট যে তিন চারটী ছেলে ছিল, তাদের ডেকে গুরুজী বল্‌লেন—‘কি রে তোদের বিশ্বরঞ্জনদা কোথায় চলে গিয়েছে?’ একথা বলাতেই নিরাশ্রয় ছোট ছোট ছেলে ক’টীর চোখে জল এসে পড়্‌ল। গুরুজী তাদের আদর করে কোলের কাছে নিয়ে চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিলেন, দিয়ে নিজেও আবেগে বল্‌তে লাগলেন—“দেখ্ পরেশ, যতীন, সুরেশ! তোদের বিশ্বরঞ্জনদা আবার আমার কাছে ফিরে অস্‌বে! আমার এই আশ্রম আমার সত্য-উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনের খেয়ালে আমি এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিনি, অন্তর্য্যামীর স্পষ্ট নির্দ্দেশ এবং প্রেরণা পেয়েই আমি এই আশ্রমের পত্তন করি। মানুষের মন সহজে সত্যের পথে আসে না। তোদের বিশ্বরঞ্জনদাকে আমি আশীর্ব্বাদ করি—ওর চোখ

ফুটে উঠুক। ওর ভুল দু'দিনেই ভাঙ্গবে। আর কোন দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়া না হলেও মানুষ হিসেবে ও আমাকে যে ব্যথা বেদনা দিয়ে গিয়েছে, তার প্রতিফল ওকে ভোগ করতেই হবে। আমি গুরু—তোরা আমার সন্তান। কাজেই দোষ ত্রুটী করলেও, তোদের অমঙ্গল কামনা আমি করতে পারি ন ৷৷ বিশ্বরঞ্জন চলে গিয়েছে, কিন্তু আমি এখনো ওকে এত ছোট ভাবতে পারি না। তোদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার যে কি মহৎ ধারণা তা আর তোদের কি বলব? হাজার বিরুদ্ধ ভাব দেখেও আমি কিন্তু কিছু মাত্র বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হই না তোদের ওপর, কেননা আমি জানি তোদের ভিতর একদিন আত্ম জাগরণ হবেই। আর আমার আশা সেই দিনই সার্থক হবে। তোরা দুঃখ করিস্না, আবার তোদের আনন্দের দিন ফিরে আসবে।"

তিন-চারটী ছেলেকে নিয়ে গুরুজী আবার পূর্ব্বের মত আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে বিশ্বরঞ্জনের মনে শান্তি নাই। সাময়িক একটা আবেগ-উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে যা সে করে ফেলেছে, তার দরুণ সে এখন অনুতপ্ত! এত অনুতপ্ত হয়েছে যে এক মুহূর্ত্তের দরুণও তার গুরুদেবকে সে ভুলে থাকতে পারে না। যতই সে এই ভাবকে মন থেকে তাড়াতে চায়, উল্টো দ্বিগুণ চাপে তার মাথায় কেবল সেই চিন্তাই খেলতে থাকে! এদিকে অভিমানও আছে, আর ওদিকে প্রাণের বেদনাকেও অস্বীকার করে উড়িয়ে দিতে পারছে না। কাজেই এক মহা দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে কেবল হাবুডুবুই খাচ্ছে! এরূপ ভাবে এক বৎসর কাটিয়ে দিলে। মনের অশান্তি ক্রমশঃ বেড়েই উঠল। কত দর্শনের আলোচনা করলে, কত নূতন নূতন ভাবকে assimilate করে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই তার প্রাণে শান্তি এলনা। কোথায় যেন তার মস্তবড় একটা ভুল হয়েছে, যার দরুণ প্রত্যেকটী কাজ কেবল পণ্ডই হচ্ছে।

গুরুদেবের কৃপায় আস্তে আস্তে যেন তার বিরুদ্ধ ভাবটা প্রশমিত হয়ে আসতে লাগল। শত্রু ভাবেই হোক আর মিত্র ভাবেই হোক মহতের চিন্তা যে আশ্রয় করেছে তাকে! মহৎ চিত্তের প্রভাবে, তার ভিতর উল্টো একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল। একদিন সে আর কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারলে না। যুক্তি বিচারের দৃঢ় আবরণ কোথায় যে কে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কে জানে? বিশ্বরঞ্জন আজ থেকে আবার নূতন জীবন লাভ করল। গুরুকৃপায় ভিতরে সে এমন জিনিষ পেয়েছে, যার বলে সে সকল জ্বালা, মানুষের বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ, সব অবিক্ষুব্ধ চিত্তে সয়ে যাবার শক্তি এবং সামর্থ্য লাভ করেছে।

আর এক মুহূর্ত্ত দেরীও সহ্য হয় না। বিশ্বরঞ্জন অমনি গুরুদেবের আশ্রমের দিকে প্রাণ পণে ছুটল।

গুরুদেব আশ্রমেরই একটী কুটীরের বারান্দায় বসে আছেন ; আর কি যেন একটা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময় বিশ্বরঞ্জন এসে গুরুদেবকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না! তখন আর তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। গুরুকৃপার কথা মনে করে সে একদিকে উল্লসিত হয়ে উঠছে, আবার যখন তার কৃত কর্ম্মের স্মৃতি মনের মাঝে জাগ্‌ছে, তখন লজ্জায় যেন মুহ্যমান হয়ে পড়্‌ছে। সাশ্রু নেত্রে আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে সে বল্‌তে লাগ্‌ল—"ওগো! বল বল, তুমি আমার সেই প্রাণের ঠাকুরই আছ কিনা! আমি দূরে গিয়েই তোমাকে চিনেছি, বিরুদ্ধ-ভাবের ভিতর দিয়েই তোমার মহৎ শক্তির পরিচয় পেয়েছি। ওঃ, অভিমানী জীবের কি আস্পর্দ্ধা! না, তাই বা বল্‌ব কেন,—তাতে ক্ষতি কি ? তা না হলে যে মোহান্ধ জীব তাঁর কৃপা লাভ কর্‌তে সক্ষম হ'ত না। আমি তোমার ওপর অভিমান করেই সত্যের বিমল-জ্যোতিঃ দর্শন কর্‌তে পেরেছি। আর তো তোমাকে ভুল্‌ব না, কেননা এবার যে তোমায় সত্ত্বায় সত্ত্বায় অনুভব করেছি। তুমি যে আমার হয়ে গিয়েছ, কিম্বা আমিই তোমার হয়ে গিয়েছি!.........

গুরুদেব এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, তাঁর প্রিয় শিষ্যের অন্তরের অস্ফুট-অনুভবের কাহিনী শুনে তিনিও বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি আর আবেগ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লেন না। বিশ্বরঞ্জনকে লক্ষ্য করে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"দেখ্‌ বিশ্ব, তুই আমাকে যে-দিন থেকে ছেড়ে গিয়েছিস্‌, সেদিন থেকেই আমি তোর দরুণ বেশী আকুল হয়ে উঠেছি। আমি জান্‌তাম তুই নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরে আস্‌বি। এইজন্যই মনে হলেও, তোকে আমি ডাকিনি। আমি মানুষকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই আমার যা শক্তি তা সংক্রামিত হয়। আমি বা আমার মত গুরুশ্রেণীর মহৎ ব্যক্তি ছাড়া মানুষের এত অন্যায়, এত অপরাধ কেউই ভুল্‌তে পারে না। তুই আমার কাছে ফিরে এসেছিস্‌, আর আমার কোন ব্যথা নাই, দুঃখ নাই, অতীতের এতটুকু স্মৃতিও নাই। তোকে আমি আগের বিশ্বরঞ্জনের চেয়ে আরও মহৎভাবে ফিরে পেলাম। এতদিন নামে তুই বিশ্বরঞ্জন ছিলি, আজ থেকে তুই আমার আশীর্ব্বাদে প্রকৃতই বিশ্বরঞ্জন হলি।

* * *

বিশ্বরঞ্জনের এই আত্ম-সমর্পণের দরুণ অনেকের কাছেই অনেক সমালোচনা শুন্‌লাম, কিন্তু আমার যা আসল প্রাপ্য, তা আমি এই ঘটনা থেকে বিশেষ ভাবে লাভ করেছি।

বাস্তবিক আজ থেকে মহাপুরুষত্ব বল্‌তে কি বুঝায়, তা বেশ মনে-প্রাণে বুঝে নিলাম। মহাপুরুষ বল, অবতার বল, যুগাবতার বল, ওসব কেবল বাইরের উপাধি মাত্র ; কিন্তু এই উপাধির অন্তরালে মানুষের যথার্থ

প্রাণের উৎস। মানুষ বড় হলে এই প্রাণের দিকটাই বিশেষ করে খুলে যায়। জ্ঞান বল, যোগ বল, সবের ওপর হল প্রাণে প্রাণে অব্যক্ত আকর্ষণ। এই আকর্ষণই সত্য, এতেই মানুষ 'মানুষ' হয়ে উঠে। আর যা কিছু সব বাইরের বস্তু। আমি গুরুও বুঝি না, অবতারও বুঝি না, আমি চাই এই ধরণের খাঁটী মানুষ, যারা নিছক্ ভালবাসা দিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে।

আপনপর

—)(—

সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু
সর্ব্বো কামান্ অবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥
শিবমস্তু সর্ব্বজগতাম্, পরহিতনিরতা ভবন্তু ভূতগণাঃ।
দোষাঃ প্রযান্তু শান্তাঃ সুখিনো ভবন্তু লোকাঃ।

—সকলে জীবনের (সমস্যারূপ) কঠিন-স্থল হইতে পরিত্রাণ লাভ করুক, সকলে মঙ্গল-দর্শন করুক; সমস্তের ইষ্টবস্তুসমূহ লাভ হউক এবং সবাই সর্ব্বত্র আনন্দ করুক।

—সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক, জীবগণ পরের উপকারে নিযুক্ত হউক, সকল দোষ (বা ভ্রান্তি) দূরীভূত হউক, লোকসমূহ যেন সুখী হয়।

কেন এ প্রার্থনা? দেবতার নিকট আপনার কথা না বলিয়া পরের জন্য এই মঙ্গলকামনা কেন? মানুষ চিরদিন স্বার্থপর, ইতর প্রাণীর যেমন দেহের স্বার্থ প্রবল, মানুষের তেমনি মনের স্বার্থ প্রবল। মানুষের দেহও তাদের মনের বিচার ও কর্ত্তৃত্বানুসারে চলে। সুতরাং মানুষের মনই সর্ব্বস্ব; এই মনের স্বার্থের জন্যই পরেরও মঙ্গলকামনা করিতে হয়।

কথাটা প্রথমে কিছু অদ্ভুত শোনায় বটে, আর মানব-সমাজের প্রতি স্বার্থপর বলিয়া দোষারোপও করা হয় বটে, কিন্তু সত্য কথা না বলিয়া উপায় কি? বড় জোর একটু মিষ্ট করিয়া বলিতে পারা যায়, নইলে কঠোর সত্য কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিবে; কিন্তু সত্যনিষ্ঠকে যেমন ভাবেই হউক সত্য কথাই বলিতে হইবে। তাই বলি, মানুষ সবচেয়ে স্বার্থপর।

কিন্তু এই স্বার্থ সর্ব্বত্রই পশুর মত শুধু দেহ-ধারণ মাত্রেই পর্য্যবসিত নয়। পশুর দেহধারণ-ব্যাপার যেমন অনেকটাই প্রকৃতির বশে সাধিত হয়, মানুষের তেমনটী হয় না, মানুষকে সব সময়ে মনের অধীন হইয়াই থাকিতে হয়। মনকে বাদ দিয়া শুধু প্রকৃতির বশে দেহ পরিচালনা মানুষের হয় না। অভ্যাস বশে যেটুকু হয়, তাহাও পূর্ব্বে সেই অভ্যাসের জন্য মনকে আগে প্রহরী রাখিয়া কাজ হয়, তারপর অভ্যাসবশে মানুষের দেহ কিছুটা প্রকৃতির পরিচালনার ন্যায় স্বভাবতঃই চলিতে পারে। কিন্তু সব কাজই মানুষ প্রকৃতি-বশে করে না।

মানুষের মনের অসীম শক্তি আছে, ইতর প্রাণীর তাহা নাই, তাই মানুষ সকলের শ্রেষ্ঠ। এই মনকে

বড় করিতে, আনন্দ দিয়া তুষ্ট রাখিতেই মানুষ সংসার পাতে। অপরকে না লইয়া তাহার মনের ঘর-কন্না চলে না, তাই সে অপরকে না আনিয়া না ডাকিয়া পারে না।

আপনার সমস্তপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও একজনের সঙ্গ-সুখ কামনার নামই ভালবাসা। মানুষ প্রথমে এমনি ভালবাসার টানেই অপরকে জীবনের সঙ্গী করিতে চায়,—নতুবা তাহার মনের সম্পূর্ণ তৃপ্তি সে পায় না। এই সঙ্গী স্থায়ী করিতে সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও থাকিতে পারে, কিন্তু প্রাণের আনন্দ যেন তার অক্ষত থাকে; সংসারে প্রবেশেচ্ছু নবীনের ইহাই সাধনা।

কিন্তু প্রথমে এমনি ভাবে জীবনের একজন সঙ্গিনী করিয়া পরিবার গঠন করিলেও মানুষের মন সেই পরিবার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না—তাহাতে সংসারও চলে না। তাই প্রতিবেশীর প্রয়োজন হয়; বন তাহার বসতিযোগ্য হয় না। পরিবার, সমাজ প্রভৃতি মানুষের শুধু বাহিরের প্রয়োজনই সাধিত করে না, তাহার মনের তৃপ্তির পক্ষেও বহু সাহায্য করে। এই সমস্ত গঠনের মূলে মন না থাকিলে কিছুই গঠিত হইতে পারে না।

পরকে নিয়ে থাকাই সঙ্গ-সুখলাভেচ্ছু মানুষের মনের স্বভাব না হইলে নির্জ্জন কারাবাস শাস্তি বলিয়া গণ্য হইত না। পরিবার ও নিজ সমাজের সুখ-সুবিধা পরিত্যাগ করা তাহার মনের পক্ষে দুঃখকর না হইলে মানুষ দ্বীপান্তরকে শাস্তি বলিয়া ভাবিত না। মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়া যদি কিছুমাত্র সুখ না হইত তবে মৌনব্রত কঠিন সংযমরূপে পরিগণিত হইত না। তাই মানুষই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ তৃপ্তিদায়ক ও শান্তিপ্রদ।

বাহিরের মানুষের মনের নীচ-প্রবৃত্তিগুলি যদিও অন্তরের পশুভাবগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে, তথাপি সে যেন কাল বৈশাখীর মত আকস্মিক। ঝড়ের বেগ যতই বৃদ্ধি হউক, শান্ত একসময়ে হইবেই এই যেমন ভরসা থাকে, সমাজ ও পরিবারের শত যন্ত্রণা হইলেও তাহার মাঝে এক সময়ে একটু শান্তি মিলেই—ইহা নিশ্চিত। যদি তাহা না হয়, তবে সে সমাজ ও পরিবার হইতে মানুষ দূরে থাকে। কিন্তু সে জীবন প্রায়ই দুঃখময় হয়।

তাহা হইলে দেখা গেল, মানুষ নিজের জন্যই অপরকে না লইয়া পারে না। সে যে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অপরকে চায় তাহা নহে, ভবিষ্যৎ মঙ্গল দূরে থাকুক, পরকে ছাড়িয়া—সম্পূর্ণ জনসংস্রব ত্যাগ করিয়া মানুষ বর্ত্তমানেও বাঁচিতে পারে না। কারণ, বাহিরে ত্যাগ করিলেও মনের চিন্তা কোথায় যাইবে? বরং তখন বাহিরে না পাইয়া মনের আকুলতা আরও বেশী বাড়িবে। সেই আকুলতা সাধারণ মানুষের পক্ষে মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

অপরের সঙ্গ অপরিত্যাজ্য বলিয়াই কি মানুষ নিজের কাজ আদায়ের জন্য অপরের মঙ্গলকামনা করে? নিম্নস্তরে আসিয়া মানুষ তাহা করিলেও উচ্চস্তরে অবস্থান কালে মানুষের এমন কূটবুদ্ধি হয় না। অথচ তখনও মানুষ শুধু নিজকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে না। বরং মন যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে, ততই আপনাকে অপরের মাঝে বিস্তৃত করে ও অপরের প্রাণের সুর আপনপ্রাণে অনুভব করে। তাই কবি বলিয়াছেন :—

অয়ং নিজঃ পরোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

—অল্পপ্রাণ মানুষেই 'ইনি আমার আপনার, উনি পর'—এইরূপ গণনা করে, উদার চরিত্র মহাজনদিগের সমুদয় বিশ্বই কুটুম্বস্বরূপ। আপনার

প্রাণে অপরের প্রাণ অনুভব করা মানুষের স্বাভাবিক উচ্চধর্ম্ম। কেবল যদি স্বার্থপরতার ভাব ও শিক্ষা বাল্যকাল হইতে সে না পায়, তবে তাহার স্বাভাবিক ব্যাপক মন ভবিষ্যতে সকলের মাঝে ব্যাপ্তই হইতে চাহে। স্বার্থের সংঘর্ষে যেটুকু সে পরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়, অন্য সময়ে অপরের কাছ হইতে বিপদ্‌কালে সাহায্য পাইয়া আবার ততটুকু কাছে টানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

সংসারের কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া যেমন মানুষ অপরের মাঝে ব্যাপ্ত হয়, অপরকে সম্যক্‌-প্রকারে বুঝিতে পারে, তেমনি বেদান্তের অধ্যাত্ম পথেও আপনার মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্তা অনুভব করিয়া মানুষ শুধু আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিতে পারে না। স্থূল-সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র অপরের সত্তা যদি আপনার বলিয়া অনুভব করিতে হয়, তবে প্রাণ আপনিই বিশ্বময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সে মহান্‌ চেতনায় আপন-পর ভেদ ভুলিয়াই বিশ্বের মঙ্গল-আবাহন ধ্বনিত হয়। মঙ্গল ও আনন্দ তখন সকলের জন্যই কাম্য হয়।

সুদীর্ঘ জীবনের মাঝে বিপদ্‌ ও উৎসব, ক্লান্তি ও শান্তি, পাশাপাশি আসিয়াই থাকে। আমরা উৎসব ও শান্তির সময়েই শুধু অপরের সত্তানুভব করিয়া থাকি। দুঃখের সময়ে সমস্ত বিশ্ব যেন আমাদিগকে এক কোণে ঠেলিয়া রাখে! আত্মানুভবের পরীক্ষা যেমন সুখের সময়ে ধীরভাবে অপ্রমত্তচিত্তে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া করিতে হয়, তেমনি দুঃখের সময়েও আপন সত্তা শুধু দেহের মাঝেই অনুভব না করিয়া পারিপার্শ্বিকের মাঝে অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতির যতখানি ধারণায় আসে, ততখানির মাঝে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে হয়। তখন সেই বিরাট সত্তানুভূতির কাছে কোথায় রহিবে ক্ষুদ্র মানুষ, আর তার ক্ষুদ্রজীবন! এক মহানন্দে সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ দুঃখকে আবৃত করিয়া জীবনে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দান করিবে। ব্যাস-বশিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকল দার্শনিকেরই যে পরিপার্শ্বিক অবস্থা বা পারিপারিক জীবন অত্যন্ত সুখময় ছিল এমন নহে, অথচ তাঁহাদের তত্ত্বানুভূতি ও আনন্দ যে ধারায় প্রবাহিত হইত, তাহাতে সমস্ত সাংসারিক দুঃখকে ভুলাইয়া তাঁহাদিগকে কোন্ অরূপ রাজ্যে ভাসাইয়া নিত। এখনও কি তাহা একেবারেই অসম্ভব?

তথাকথিত শুষ্কজ্ঞানের ভিতর দিয়াই যদি এমন অপরূপ অনুভূতি মিলে, তবে দ্রবীভূত-প্রাণের প্রেমের দৃষ্টিতে যে বিশ্বময় সমস্ত একাকার হইয়া হৃদয়ে ভাসিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রেমিক-হৃদয় কখনও কাহাকেও বিষম দুর্গে নিপতিত, অমঙ্গল দর্শনে অভিভূত, কামনায় ব্যাহত বা নিরানন্দযুক্ত দেখিতে পারে না। সে হৃদয়ের কামনাই এই যে, সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক, জীবসমূহ কেবল পরের অনিষ্ট সাধন করিয়া পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া একে অপরের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হউক, সমস্ত দোষ বা ভ্রমপ্রমাদ অপসারিত হইয়া সে স্থলে শান্তি বিরাজ করুক, সমস্ত লোক সুখী হউক। কেন? না, তাই যে আনন্দ। সে সবার আনন্দ, আমারও আনন্দ। আনন্দময় জগতে যদি কেহ দুঃখের আঘাতে ম্রিয়মাণ না হইয়া আনন্দেরই স্বরূপ ঘোষণা করে, তবে তাই যে সবার মঙ্গল—আমারও মঙ্গল। এই দৃষ্টিতে জগৎ দেখিলে—তখন কে-ইবা ভাল, কে-ইবা মন্দ? কে-ইবা আপন, কে-ইবা পর? সব আনন্দম্! আনন্দম্! ওম্।

জ্ঞান ও সদাচার।

—:(•):—

অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা যে জ্ঞানের পর আর কর্ম্মের বালাই থাকে না। এইজন্যই অনেক সময় আমরা মনে করি, কর্ম্মত্যাগই সিদ্ধের লক্ষণ, কিন্তু গীতার বাণী অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—যাঁহার ত্রিলোকে কোন কর্ত্তব্য নাই—তিনিও অবাধে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। কাজেই জ্ঞান এবং সদাচার যুগপৎ অভ্যস্ত না হইলে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায় না। এই বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষুপ্রকরণের বিংশ সর্গে বেশ সুন্দর কয়টী উপদেশ রহিয়াছে। স্বয়ং রাম তাহার শ্রোতা, আর বক্তা হইলেন পরম জ্ঞানী বশিষ্ঠদেব। বশিষ্ঠ বলিলেন—

আর্যা সংগম যুক্ত্যাদৌ প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং নয়েদ্বলাৎ।
ততো মহাপুরুষতাং মহাপুরুষলক্ষণৈঃ॥ ১

মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে সাধুসঙ্গ, সাধু-মহাজনের উপদেশ গ্রহণ ও সদাচার শিক্ষা দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে। অনন্তর মহাপুরুষের লক্ষণানুসারে স্বীয় মহাপুরুষত্ব নির্দ্ধারিত করিবে।

প্রজ্ঞা (intuition) বর্দ্ধিত করিবার উপায় গুলি কি তাহাই দেখিতে হইবে। প্রজ্ঞা বৃদ্ধির তিনটী উপায়—সাধুসঙ্গ, সাধুমহাজনের উপদেশ গ্রহণ ও সদাচার শিক্ষা। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ এই তিনটীর একটী উপদেশও মানিয়া চলি না, কাজেই তাহাতে প্রজ্ঞার (intuition) বৃদ্ধি না হইয়া মারাত্মক বিশ্লেষণ বুদ্ধিরই উদ্ভব হয়। সেই বুদ্ধি দ্বারা হৃদয় পবিত্র হয় না, অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় না। কেবল উপরভাষা জ্ঞানই আয়ত্ত হয়। এইজন্যই আজকালকার বড় বড় intellectualists দেরও অন্তরের বিশুদ্ধ ভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে বটে, কিন্তু সেই বিশ্লেষণের ফলে বিন্দুমাত্র আত্মহিত হয় না। প্রজ্ঞা (intuition) আর বুদ্ধিতে (intellect) রাত দিন পার্থক্য। নানা পুস্তক পড়িয়া বুদ্ধির বিকাশ বা ক্রমোন্নতি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজ্ঞার উন্মেষ একটুকুও হয় না! প্রজ্ঞা লাভ করিতে হইলে উপরোক্ত তিনটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আর উক্ত উপায় অবলম্বন করিতে গেলেই পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানীর অভিমানে আঘাত লাগিবেই। প্রজ্ঞা লাভের প্রথম দুইটী উপায়কেই তাঁহারা বলিবেন—slave mentality, আর তৃতীয় উপায় সদাচার হইবে গোঁড়ামী বা চিত্তের সঙ্কীর্ণতা। কিন্তু তাহা হইলেও এই তিনটী উপায়কে অনুসরণ করিয়া যে সব মুনি-ঋষি শাস্ত্রাদি প্রণয়ণ করিয়া গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং গভীর জ্ঞানের প্রশংসা তাঁহারাও কিন্তু না করিয়া পারেন না।

দ্বিতীয় শ্লোকে আরও সুন্দর একটী কথা বলিলেন—

যো যো যেন গুণেনেহ পুরুষঃ প্রবিরাজতে।
শিক্ষেতে তং তমেবাশু তস্মাদ্বুদ্ধিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥ ২

যদি সমগ্র মহাপুরুষ-লক্ষণ (অর্থাৎ গুণ) কোন এক পুরুষে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে যে মহাজন যে যে বিষয়ে বিশেষ গুণী, সেই পুরুষের সেই সব গুণ শিক্ষা দ্বারা প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করিবে।

চিত্ত কতখানি উদার হইলে যে এইরূপ সার্ব্ব-

ভৌম, উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা চিন্তনীয়! জীবনকে সবদিক দিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা যাহাদের রহিয়াছে, তাহারা এক স্থানে বা এক মহাজনের কাছে থাকিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আর বিশেষতঃ সমগ্র মহাপুরুষ-লক্ষণ এক পুরুষে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়! কাজেই যে বিষয়ে যিনি বিশেষ গুণী, তাঁহার নিকট হইতে সেই বিষয়ে উপদেশ অবলম্বন করিয়া নিজের প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

সত্যদ্রষ্টা গুরু ব্যতীত এই ঔদার্য্য প্রদর্শন অসম্ভব। অনেকেই চায় শিষ্যকে স্বীয় মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে, কিন্তু চরম সত্যাভিলাষী শিষ্য এই বন্ধনে কিছুতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা মধুকরের ন্যায় ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া বেড়ায় এবং জীবনের পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। আর ইহা একেবারে খাঁটী কথা যে, যাহাদের প্রাণে পূর্ণ সত্যলাভের অদম্য স্পৃহা জাগিয়াছে, তাহারা স্বল্পে তুষ্ট হইতে পারে না কিছুতেই। তীব্র সংবেগ থাকার দরুণ তাহারা সহজেই বিশিষ্ট গুণ আয়ত্ত করিয়া ফেলে, সুতরাং আয়ত্ত হইয়া গেলে নূতন তত্ত্ব লাভ করিবার দরুণ পুনরায় আকুল হইয়া ওঠে, এই ভাবে আকুলতা নিয়া মহাজনের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাহারা জীবনের পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। কথিত আছে, বুদ্ধদেব নাকি এইরূপ ভাবে তাঁহার প্রথম গুরুর নিকট সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় অন্যত্র চলিয়া যান। সত্যদ্রষ্টা গুরুও তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। তিনি বুদ্ধদেবকে অমায়িকভাবে এবং অবাধে বলিলেন যে, আমি ইহার চেয়ে বেশী অবগত নই। বুদ্ধদেবও সানন্দে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার অন্তরের জ্বালা মিটাইতে পুনরায় গুরুর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। অনেক গুরুই এই ঔদার্য্যের অভাবে, মহত্ত্বের অভাবে শিষ্যের উপর অনর্থক আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকিতে চান। সর্ব্বজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত, এইরূপ মিথ্যা অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিলে নিজেরই ক্ষতি!

পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন—মহাপুরুষ-লক্ষণ দ্বারা স্বীয় মহাপুরুষত্ব সম্পাদন করিবে। সেই মহাপুরুষ লক্ষণ কি তাহাই এখন বলিতেছেন—

মহাপুরুষতা জ্ঞেয়া শমাদি গুণশালিনী।
সম্যগ্ জ্ঞানং বিনা রাম সিদ্ধিমেতি ন কশ্চন॥ ৩

—হে রাম! শমদমাদি গুণ এবং প্রজ্ঞাই মহাপুরুষের লক্ষণ। সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত এই মহাপুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না।

জ্ঞানাচ্ছমাদয়ো যান্তি বৃদ্ধিং সৎপুরুষক্রমাঃ।
শ্লাঘনীয়াঃ ফলেনান্তর্বৃষ্টেরিব নবাঙ্কুরাঃ॥ ৪

নব অঙ্কুর যেমন বৃষ্টিসলিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ফল-সম্পদে পূর্ণ হয়, তদ্রূপ শমদমাদি সদাচার জ্ঞানপ্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া আন্তরিক ফল—আত্মসুখ উৎপন্ন করিয়া শ্লাঘ্য হইয়া থাকে।

শমাদিভ্যো গুণেভ্যশ্চ বর্দ্ধতে জ্ঞানমুত্তমম্।
অন্নাত্মকেভ্যো যজ্ঞেভ্যঃ শালিবৃষ্টিরিবোত্তমা॥ ৫

অন্ন দ্বারা যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে আবার অন্ন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শমদমাদি দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, আবার জ্ঞান দ্বারা শমদমাদি গুণের বৃদ্ধি ঘটে। কাজেই সদাচার এবং জ্ঞান পরস্পরের বৃদ্ধির—উন্নতির সহায়ক। কাহাকেও বাদ দিলে কাহারও পূর্ণতা আসিবে না। এইজন্যই কেবল জ্ঞানী এবং কেবল নিষ্ঠবান্ কেহই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান-কর্ম্মের সমন্বয় হওয়া চাই।

সাধারণতঃ কর্ম্ম আমাদিগকে বহির্মুখী করিয়া তুলে, কিন্তু এমন কর্ম্মও আছে যাহাতে মানুষ

অন্তর্মুখী হইতে পারে। কাজেই জ্ঞানের সহায়ক যে সব কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই অবলম্বন করিতে হইবে। আর জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই সেই সব মহান্ কর্ম্মের প্রতি একটা সরস নিষ্ঠা আসে।

কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক—আর শুদ্ধ চিত্তেই জ্ঞানের বিকাশ। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নব-নব জ্ঞানোন্মেষ হয়। এইজন্যই সদাচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বাড়ে এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সদাচারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরস্পর পরস্পরের সহায়ক বলিয়াই কেহ কাহারও পথের বিঘ্নস্বরূপ হয় না, বরঞ্চ উভয়ে মিলিয়া ক্রমোন্নতির পথেই চলে। জ্ঞান-কর্ম্মের অহি-নকুল সম্পর্ক হইল বাহিরের কর্ম্ম লইয়া; কিন্তু কর্ম্মেরও বৈচিত্র্য আছে। চিত্ত যাহাতে শুদ্ধ হয়, সেই সব কর্ম্মের স্থান অতি উচ্চে।

জ্ঞানঃ শমাদয়ো জ্ঞানাচ্ছমাদিভ্যস্তথা জ্ঞতা।
পরস্পরং বিবর্দ্ধন্তে তে পঙ্কজসরসী ইব॥

পদ্ম হইতে যেমন সরোবরের শ্রীবৃদ্ধি এবং সরোবর হইতে পদ্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ জ্ঞান হইতে শম দমাদির শ্রীবৃদ্ধি ও পরিণতি এবং শমদমাদি হইতে সম্যগ্ জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়।

জ্ঞান যেন শতদল পদ্মের ন্যায় সদাচাররূপ সরোবরের বক্ষে ফুটিয়া রহিয়াছে। পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছে। কাহাকেও বাদ দিয়া কাহারও সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় না। সদাচারকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান সার্থক, আর জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সদাচার সার্থক। পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির হেতু।

এখন মতিমান্ মুমুক্ষুর আদর্শ কে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—

শম প্রজ্ঞাদি নিপুণ পুরুষার্থক্রমেণ চ।
অভ্যাসেৎ পুরুষো ধীমান্ জ্ঞান সৎপুরুষ ক্রমৌ॥ ৮

"শম-দম-প্রজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা সুনিপুণ মহাপুরুষের চরিত্র আদর্শ করিয়া মতিমান্ মুমুক্ষু জ্ঞান ও মহাপুরুষাচার অভ্যাস করিবে।"

উপরোক্ত শ্লোকে বিশেষ করিয়া একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। **মহাপুরুষাচার** অভ্যাস করিতে গিয়া অনেকেরই পতন হয়, তাহার কারণ জ্ঞানের অভাব। জ্ঞান দ্বারা মহাপুরুষাচার না বুঝিলে, স্থূল বুদ্ধিতে অনেক সময় অনিষ্ট সাধন করে। মহাপুরুষের আচরণ না বুঝিয়া অনুসরণ করিলে নিজেরই অবনতি ঘটে। এই জন্যই শ্রীধরস্বামীর একটী উল্লেখ যোগ্য উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছেন "সিদ্ধের যাহা লক্ষণ, সাধকের তা সাধ্য"। কেবল মহাপুরুষাচার অনুসরণ করিলে, ভিতরে যদি জ্ঞানের আলো প্রজ্জলিত না থাকে, তাহা হইলে সেই আচারানুসরণে উন্নতি না হইয়া অবনতিই হয়। সিদ্ধের যাহা লক্ষণ, তাহা বহু সাধনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই শম-দম-প্রজ্ঞা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরের আচার অনুসরণ করিয়া অনেকেরই চিত্তবিকৃতি ঘটে। সাধনহীনদের স্বভাবতঃই পল্লবগ্রাহী মনের দৌরাত্ম্য থাকে, সেই জন্যই তাহারা অন্তর্নিবিষ্ট না হইয়া, বিচার না করিয়া কেবল বাহিরটা নিয়াই আলোচনা করিয়া থাকে। মহাপুরুষাচার অনুসরণের পিছনে জ্ঞানের ভিত্তি থাকা চাই।

ন যাবৎ সমমভ্যস্তৌ জ্ঞান সৎপুরুষক্রমৌ।
একোঽপি নৈতয়োস্তাত পুরুষস্যেহ সিধ্যতি॥ ৯

এই শ্লোকে বড় সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। বশিষ্ঠ দেব বলিলেন, হে বৎস! যে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অভ্যস্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তদুভয়ের কোনটাই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না।

যুগপৎ দুইটীতেই অভ্যস্ত হওয়া চাই। আর দুইটা অভ্যস্ত না হইলেই একদেশদর্শিতা আসিয়া

পড়ে। জ্ঞানী এবং সদাচারী মহান্ ব্যক্তিই সকলের আদর্শ স্থানীয়। কেবল জ্ঞানোপাসককে আদর্শ করিয়া অশুদ্ধচিত্ত মানবের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইয়া থাকে। জ্ঞানের অভাবে আবার অনেক আচারী নিষ্ঠাবান্‌দেরও তেমন উন্নতি হয় না। আচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সংমিশ্রণ না থাকিলে মানুষ সহজেই প্রকৃতির কবলে কবলিত হইয়া যায়। অর্থাৎ তখন অভ্যাস বশতঃ কর্ম্ম হইয়া যায় বটে, কিন্তু মন সাত-পাঁচ ভাবিতেই থাকে, এইজন্যই কোন আচার অনুষ্ঠান দ্বারাও চিত্তের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি বা উন্নতি লাভ হয় না।

জ্ঞান না থাকিলে, আচার অনুষ্ঠানের নব-নব তত্ত্বের উন্মেষ হয় না, আর সেইজন্যই সহজে মন মরে আসে। জ্ঞানের অভাবে অনেক আনুষ্ঠানিকেরই চিত্তের উন্নতি হয় না, বরঞ্চ তাহারা মিথ্যা অভিমানের বোঝা বহন করিয়া মরে! চিত্তে জ্ঞানের দীপ্তি না থাকিলে আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার মানুষকে চিরকাল বদ্ধ করিয়া রাখে। এইজন্যই পরস্পরের সম্মিলনেই পরস্পরের উন্নতি হয়। জ্ঞান হইলে সদাচারের মাঝেও বেশ একটা আনন্দোজ্জ্বল ভাব থাকে, আবার সেই আচার প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের দীপ্তিও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

"শম দম প্রজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা সুনিপুণ মহাপুরুষের চরিত্র আদর্শ করিয়া মতিমান্ মুমুক্ষু জ্ঞান ও মহাপুরুষাচার অভ্যাস করিবে।"—সাধকদের ইহাই উৎকৃষ্ট উপদেশ। জ্ঞান এবং সদাচার উভয়টী যুগপৎ অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মহাপুরুষত্বের অভিমান করা বৃথা!

হিমাচলের পথে।

—)•(—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমি অবাক্ হয়ে বিশ্বপিতা বিধাতার বিশ্ব-সৃষ্টির রচনা-কৌশল দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিভোর হয়ে গেলাম। হিমালয়ের চারিধাম—কেদারনাথ, বদরীনাথ, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরীর মধ্যে তুঙ্গনাথ সকলের চেয়ে উচ্চস্থানে অবস্থিত। কিন্তু এই পঁপলীর পাহাড় উপরোক্ত চারিধামের অপেক্ষাও উচ্চ স্থানে অবস্থিত। যাঁরা হিমালয়ের উপরোক্ত ধাম গুলি পর্য্যটন করেছেন, তাঁরা জানেন এই পঁপলীর মত এত উচ্চস্থান উক্ত ধাম গুলির মধ্যে নাই। অবশ্য কেদার বদরীর পার্শ্বের পর্ব্বত এবং গোমুখীর পার্শ্বের পর্ব্বতমালা গুলির শৃঙ্গ ২২০০০ ফুটের চেয়ে উচ্চ হলেও কেউ সে শৃঙ্গে আরোহণ করেন না। তাঁরা তো বদরী নারায়ণ পর্য্যন্ত ১০৮০০ ফুট উচ্চ স্থানে আরোহণ করেই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েন। উক্ত ধাম গুলির মধ্যে তুঙ্গনাথের মন্দির ১৩০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বলে, প্রতিবৎসর যত যাত্রী এ পথে আসেন, তন্মধ্যে সিকি যাত্রিরাও তুঙ্গনাথ দর্শন করতে যান না। আর এ পঁপলীর পাহাড়

১৪০০০ ফুটেরও উচ্চে অবস্থিত। এখন সহজেই পাঠক গণের অনুমান হতে পারে, বদরিনারায়ণে প্রায় এগার হাজার ফুট উচ্চে উঠিলেই যেরূপ শীত, যেরূপ কষ্ট অনুভব হয়, সুতরাং এরূপ স্থানে এলে কত শীত, কত কষ্ট হওয়া উচিত! কিন্তু অত কষ্ট করেও এস্থানে এলে, এস্থানের চারিদিকের সুমধুর দৃশ্যে পুত্রশোকও ভুলে যেতে হবে—যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখবার চোখ থাকেতো—নতুবা পাথর আর মাটীই সার হবে।

পঁপলী হতে যে পথটি ত্রিযুগী নারায়ণ পর্য্যন্ত গিয়েছে, সে পথটি ভীষণ সাঙ্ঘাতিক বিপদ-সঙ্কুল এবং তার দুই পার্শ্বের অতি নিম্ন গহ্বর দেখ্‌লে আপনা আপনিই মাথা ঘুরতে থাকে। দুই পার্শ্বের নিম্ন গহ্বর হতে পাহাড়টি যেন আপনার উন্নত মস্তক সুষমায়ে ক্রমে আকাশের দিকে বেড়েই চলেছে। সেই উচ্চ শৃঙ্গমালার শৃঙ্গদেশ অতি সন্তর্পণে অতিক্রম করে ত্রিযোগীনারায়ণে যেতে হয়। উত্তরাখণ্ডের কেদার বদরীর রাস্তা রাজপথ বললেও অত্যুক্তি হয়না এবং এমন সুন্দর রাস্তা হিমালয়ে আর কোথাও নাই। প্রত্যেকটী লোক—কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর—কেদার বদরীর পথগুলি অতিক্রম করে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছে অভীষ্ট দেবকে দর্শন করে মানব জীবন ধন্য কর্‌তে পারে। কেদার বদরীর পর গঙ্গোত্তরীর পথ বেশ কঠিন। গঙ্গোত্তরীর পথ হতে যমুনোত্তরীর পথ আরও কঠিন। কিন্তু তবুও ঐ সকল পথ ভাল; গ্রাম আছে, লোকজনের বসতি আছে এবং বিপদ্ আপদ্ হলে নানা প্রকার সাহায্য পাওয়াও সম্ভব। কিন্তু পঁপলীর পথ উপরোক্ত কয়টি পথ হতে অতীব উৎকট, চড়াই উৎরাই অত্যন্ত কঠিন, তথা পর্ব্বতের শিখরদেশ দিয়ে অতিক্রম করতে হয় বলে বড়ই বিপদ-সঙ্কুল। এই পঁপলীর পথের মত বিপদ সঙ্কুল পথ হিমালয়ের চারিধামের মধ্যে আর কোথাও নাই—কিন্তু প্রকৃতির রম্য নিকেতন বড়ই সুন্দর! বড়ই চিত্তাকর্ষক!

বাংলার **থানকুনি পাতা** বোধ হয় সকলেই জানেন। আমরা এপথে আমাশয়ের রোগীর চক্ষুতে থানকুনি পাতার রস দিয়ে অনেক আরোগ্য করেছি। এপথে আসার সময় আমি কেদার হতে বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি বাংলা দেশের মত অনেক থানকুনী গাছ আছে। প্রথমে মনে করে ছিলাম, আমশায় রোগীর জন্য ব্যবহার করা যাবে এবং শাক পাক করে খাওয়া যাবে, তাতে পেটের অসুখাদি আরোগ্য হয়। কিন্তু যতই হিমালয়ের উপরের দিকে চড়্‌তে লাগলাম ততই সেই থানকুনি গাছগুলি ক্রমে ডাল পালা পাতা সহ বড় দেখতে লাগলাম! এই পঁপলীতে ও দোফন চটীতে তার ডাল, পালা, পাতা, ফুল দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। তার এক একটি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত গাছ মানুষের মত উঁচু এবং পাতা বড় বড় পদ্মের পাতের মত, ডাটিগুলিও পদ্মের মত মোটা মোটা; ঠাণ্ডা বা স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বা ঝরণার ধারে অপর্য্যাপ্ত গাছ আপন ফুল সহ গরবে যেন হাস্‌ছে। তার এক একটি ফুল বাংলার রাধাপদ্ম (Sun flower) ফুলের মত বড় বড়, ৮।৯ ইঞ্চি চওড়া—এত বড়! বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল, এমন সুন্দর ফুলের বীজ কি করে মঠে নিয়ে যাওয়া যায়? তখন নূতন ফুল হচ্ছে, পাকে নাই; কাজেই বীজ পাওয়া অসম্ভব। তার মূল তুলেও আনা যায় না, গরমে বা বেশী দিনে নষ্ট হয়ে যাবে। সে ফুলগুলি যে কিরূপ চিত্তাকর্ষক, প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্যকে বুঝান দুষ্কর।

আমি বেশ ভাল মালা গাঁথ্‌তে জানি। কলি-

ক্যতার মালা গাঁথ্‌তে অনেক সময় হগ্‌ সাহেবের বাজার হতে অনেক ভাল ভাল সিজেন ফ্লাওয়ার অনেক দাম দিয়ে এনে মালা গাঁথ্‌তে হতো। আজ এখানে সেইরূপ অসংখ্য প্রকারের ফুলের সৌন্দর্য্যে আবার মালা গেঁথে ঠাকুরকে পরাবার সাধ হলেও কেমন করে সে সাধ পূর্ণ হবে? ইচ্ছা হয়েছিল তবুও মালা গাঁথি। সেই জন্য আমরা অনেক ফুলও তুলে ছিলাম। কিন্তু তিনি সেখানে আর আমি এখানে! তিনি কি আমার এ দূর দুরান্তরের মনো বেদনা বুঝতে পারবেন? এই ভাবেই অনুভাবিত হয়ে হরিদাস ভায়া হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে প্রবেশ করার সাথে সাথে প্রায়ই গেত :—

আমার কুঞ্জ কুটীর দুয়ারে
অতিথি এসেছে আজ।
তুলি নাই ফুল, গাঁথি নাই মালা,
শূন্য পড়িয়া কুসুমের ডালা—

* * *

আমিও সর্ব্বদা তার সঙ্গে যোগ দিয়ে গানটি মধুময় করে তুল্‌তাম। আমরা হিমাচলে চলবার সময় চুপ করে পথের কষ্ট ভেবে ভেবে কখনও চলি নাই। প্রত্যেক দিন কোন না কোন গান গেয়ে গেয়ে তার তালে তালে আপনাকে বিভোর করে দিয়ে পথ অতিক্রম করেছি। পথের কোন কষ্টই আমাদের অন্তঃস্থল ভেদ করে কষ্ট দিতে পারে নাই—সেও শ্রীশ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণা। ধন্য গুরুদেব! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

আমি হিমাচলের কন্দরে কন্দরে যে সকল মনোরম স্থান দেখেছি, এখনও সে সকল স্থানের বিষয় মনে হলে হৃদয়ে অনন্ত দুঃখের বোঝা চেপে যায়। ঠাকুরের শ্রীচরণে কাতরে প্রার্থনা করি, তিনি কি আমার তেমন দিন করে দিবেন, যে দিন পুনরায় আমি হিমাচলের কন্দরে কন্দরে প্রবেশ করে তাঁরই সৃজিত বিশ্বের অনুপম সুষমা প্রত্যক্ষ করতঃ জীবনকে আনন্দের পথে উন্নীত করে তুলতে পারবো!

আমার সঙ্গে কোন কেমেরা না থাকায় পাঠকদের আমার বর্ণিত স্থানের চিত্র দিতে পারি নাই। আমি ভিখারী, কেমেরা কোথায় পাব? কোথায় টাকা পাব যে কেমেরা কিনে পাঠকদের হিমালয়ের মধুময় চিত্রগুলি তুলে তাঁদের উপহার দিয়ে আমার আনন্দের ভাগী করবো? এখনও ইচ্ছা হয়, যদি তাঁর কৃপা হয়—আবার হিমাচলে যেয়ে অসংখ্য ফটো তুলে এনে প্রিয় পাঠকদের উপহার দিয়ে আনন্দের স্রোতে ভাসায়ে দেই। কে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে?

পাঠকগণ আমায় ক্ষমা করবেন, আমি হিমালয়ের পথের বিবরণ বল্‌তে যেয়ে ভুলে কতকগুলি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে দিলাম। বাস্তবিক পক্ষেই স্থানটি এমনই সৌন্দর্য্যময় যে আপনা আপনিই স্থান মাহাত্ম্যে এমন উচ্ছ্বাস বের হয়ে পড়ে। * * *

অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গীয় সকলে এসে হাজির হলেন। আমরা এ পথের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছি। আজ আর চড়াই করতে হবে না। এবার আবার উৎরাই করতে লাগলাম। এক মাইল উৎরাই করার পর পপলী চটী পেলাম। স্থানটি যেমন সুন্দর তেমনি ঠাণ্ডা, তার উপর বিকেলে খুব বৃষ্টি হওয়ায় খুব বেশী শীত লাগতে লাগলো। মনে হচ্ছিল যেন হাড়ের ভিতর মজ্জা পর্য্যন্ত যেয়ে শীত ঢুকেছে। জল একটু দূরে। এহেন শীতপ্রধান দেশে এসেও স্নান করতে ভুলি নাই। তখন বেলা দু'টা বেজে গেলেও স্নান করে নিলাম। ঝরণা আছে—সেখানেও অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। এ ছাড়া অসংখ্য অশোক ফুলের গাছ। অশোকের কাঠ দ্বারাই পাকাদি সমুদয় কাজ সম্পন্ন

পপলী
৩ মাইল

করতে হয়। মোটা চাউল ॥৵৹। ৸৹ আনা, ডাল মসোয়া ৸৹ আনা, আটা ॥৵৹ আনা, চানা ॥৶৹ আনা, গুড় ১৲ টাকা, ঘী ২৸৹ আনা সের।

বড় মা একজন মৌনী সাধুকে আজ ভোজন করালেন। এ সাধুটীর সঙ্গে দেবপ্রয়াগের পথে রামপতী চটীতে আমাদের দেখা হয়েছিল। অল্প বয়স, সদাই মৌনী; কখনও কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। হৃষিকেশের কুকুতবালা একদল বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, তা' যথা সময়ে পাঠকদের জানিয়েছি। এই মৌনী সাধুটী এতদিন তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। তারা হরদম গাঁজায় দম যোগাযে পঞ্চমে চড়ে থাকতো। তাদের ধর্ম্মানুযায়ী "তৃণাদপি সুনীচেন" স্থানে সদা দাই গর্ব্বের আস্ফালন দেখা যেত। এ সাধুটী খুব ভাল লোক হলেও তারা কাল এঁকে খুব মেরেছে এবং কিছুই খেতে দেয় নাই। তাই সাধুটী কাল হতে আমাদের সাথে সাথে আছেন, কাল আমরা কিছুই বুঝতে পারি নাই। আজ ইসারাতে জানিয়ে দিলেন—ভাত খেতে চান। বড়মা তাঁকে খুব আনন্দের সহিত জল খাওয়ালেন। তাঁর সঙ্গে এক বস্ত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তিনি যে কি করে এমন কঠিন শীত অতিবাহিত করতেন, আশ্চর্য্য বটে! আমরা তাঁকে খুব আদর করতাম। আমাদের আদর পেয়েই বোধ হয় পরে আর আমাদের কাছে ঘেষতেন না। সাধুদের লীলা বুঝাও ভার!

পাঁপলীতে বাবা কালী কম্বলী বালার ধর্ম্মশালা আছে, সদাব্রতও পেলাম। তা ছাড়া কয়েকটি ভাল ভাল দোকানও আছে। দোকানদার গুলি ভাল, লোকের কষ্ট হলে আগুণ জ্বেলে সেবা শুশ্রূষা করে থাকে।

—১২

৮ আষাঢ় ২৩ জুন বৃহস্পতিবার—

রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। এত বেশী ঠাণ্ডা পড়েছিল, গরম কাপড়াদির অভাবে ঘুম মোটেই হয় নাই। সমস্ত রাতই প্রায় ঠাণ্ডাতে হী হী করে কাঁপতে হয়েছে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য বের হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী করলাম। বেশ রোদ উঠলে বের হলাম। এখান হতে ৯ মাইল গেলে চটী পাব; এর মধ্যে চটী, ঘর, বাড়ী, গাছ পালা কিছুই নাই। আজকের পথটী সব চেয়ে কঠিন। কালকের পথে তবুও কয়েকটী চটী ছিল, গাছ পালা অনেক দূর পর্য্যন্ত পেয়েছিলাম, কিন্তু আজকের পথ তার চেয়েও ভীষণ। তবে আজকের পথ কালের মত চড়াই না হলেও, চড়াই মন্দ নয় এবং কালের চেয়ে বিশেষ বিপদসঙ্কুল। এ পথে ঝড় বৃষ্টি হলে মৃত্যু অনিবার্য্য। এ পথটুকু বিশেষ সাবধানে চলা উচিত।

পাঁপলী হতে বের হয়ে কিছু দূর পর্য্যন্ত অশোক ফুল গাছের ভিতর দিয়ে এসে, শুধু ন্যাড়া পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর দিয়ে অতি সাবধানের সহিত চলতে লাগলাম। চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর! হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধক!!

কাল বিকেলে একদলে কয়েকজন সাধু রওনা হবার পর খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় দুইজন সাধুর মৃতদেহ পথের ধারে পড়ে আছে, অন্য কয়জন সাধুর কোন খবর নাই। আমাদের সঙ্গেই কয়েকজন পাহাড়ী পাঁপলী হতে এসে সাধু দুইজনের সঙ্গীয় জিনিষাদি নিয়ে তাদের টেনে হেলান বরফের মধ্যে ফেলে দিল। শব দুটী গড়াতে গড়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। এখান হতে ৫ ৬ হাজার ফুট নীচে গ্রাম আছে—অস্পষ্ট দেখা যায়। নীচে অবশ্য বস্তি আছে, কিন্তু নামা খুবই

কঠিন ব্যাপার। সাধু দুইজন গঙ্গোত্তরী হতে আসছেন বুঝলাম; তাদের সঙ্গে একটি ঘটিতে গঙ্গাজল আছে—ঘটিটীর মুখ সোলা দ্বারা বন্ধ।

কয়েকটি জায়গায় বরফের উপর দিয়ে পার হলাম। বড্ড ঢালু! পার হবার সময় দুই-এক জন ডাণ্ডীবালা মায়েদের সাহায্য করলো। এখানে পা হড়কে পড়ে গেলে কি অবস্থা দাঁড়াবে বক্তা দুষ্কর;—পঞ্চত্ব তো পেতেই হবে—কোন সন্দেহ নাই। উত্তর দিকে রাশি রাশি বরফের পাহাড়—তার সুশীতল বাতাসে আমাদের কাঁপায়ে তুলছে। কাঁপায়ে তুললেও জোরে চলবার উপায় নাই—বিপদ হতে পারে। এই ভাবে পঁপলী হতে সাত মাইল ক্রমোচ্চ চড়াই করে এসে চড়াইয়ের শেষ সীমানায় উপস্থিত হলাম। এখান হতে শুধু উৎরাই। এ দুইদিন যেমন খুব চড়াই করে এসেছি আবার তেমনি ভাবে খুব উৎরাই করতে হবে। পঁপলী হতে ৭ মাইল দূরে যে স্থানে আমরা পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গের শিখরদেশে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই স্থানে টিহরি ও বৃটিশ রাজ্যের সীমানার চিহ্ন পাহাড়ীরা দেখালে। দেখলাম আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি, তার ২০।২৫ হাত উত্তর দিক হতে অন্য একটি পথ আরম্ভ হয়েছে, অথচ তার আরম্ভই এখান হতে! সেটী বৃটিশের পথ। এই স্থানটিই বৃটিশ ও টিহরী রাজ্যের সন্ধিস্থল। এবার আমরা টিহরি ছেড়ে বৃটিশে পড়লাম। শৃঙ্গদেশ হতে চারিদিকের শোভা অতীব চিত্তাকর্ষক।

উৎরাই করতে লাগলাম। উপরের শৃঙ্গে বরফ গলে গেলেও নীচে অনেক বরফ আছে। আমরা কয়েক জায়গায় অল্প অল্প বরফের উপর দিয়ে চড়াই উৎরাই করতে করতে (উৎরাইয়ের ভাগই বেশী) দুই মাইল আসার পর মঙ্গু-

মঙ্গুচটী ৯ মাইল

চটী পেলাম। এখানে একটী ধর্ম্মশালা ও দুখানি দোকান। আমরা ধর্ম্মশালার দুখানা ঘরই দখল করে এক খানাতে মায়েদের দিয়ে অপর খানাতে আমরা রইলাম। ধর্ম্মশালাটী অতি ছোট, বাবা কালীকম্বলী বালার সদাব্রত পাওয়া গেল। দুধ যথেষ্ট মিলে। জল নীচুতে বলে একটু কষ্টকর। কিন্তু কষ্ট হলেও আজ আর এখান হতে নড়বো না বলে স্থির করলাম। যারা পঁপলী হতে মঙ্গু চটীতে আসবেন বা যাবেন, তাঁরা যেন সকাল ভিন্ন কখনও এ পথটি অতিক্রম না করেন। এ বড়ই ভীষণ বিপদ্‌সঙ্কুল পথ। পাহাড়ীরাও বিকালে এ পথটি অতিক্রম করে না।

আমরা মঙ্গু চটীতে আসার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। মেঘগুলি পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে, দেখে আনন্দ হল। যাঁরা কেদারনাথে বা তুঙ্গনাথে উঠেছেন তাঁরা এইরূপ মেঘের খেলা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। নামার সময় অনেক বার মেঘ আমাদের ঢেকে ফেললেও আমরা ভিজে যাই নাই। উপরে একটু স্যাঁৎসেঁতে হয়েছিল বটে! বাংলার আকাশে দৃষ্টিপাত করলে মেঘগুলিকে যেরূপ আকাশের গায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়—এগুলিও সেইরূপ মেঘ, ঠাণ্ডা বাতাস লাগলেই এই কুয়াসারূপী বাষ্পগুলি জলের রূপ ধারণ করে ও অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ করে থাকে—মেঘের খেলা খুবই সুন্দর।

দুপুরের আহারের পরই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বৃষ্টি এমন জোরে হচ্ছিল যে সামনের পাঁচ হাতের দূরস্থ জিনিষ বা লোকজন দেখাও দুষ্কর। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি থেমে গেল। জিনিষাদির দাম খুব বেশী। সের প্রতি ঘি ৩।০, ডাল ৮০ আনা, মোটা চাল ৸০, চিনি ২৲ টাকা, দুধ-দই ।৵০ আনা, আটা ৷৷০ আনা। মুখশুদ্ধির মসল্লা অনেক দিন হল পথে

ফেলে এসেছি, এখানে পাওয়ার সামান্য কিছু কিনে নিলাম। সুপারী ৪৲, মৌরী ২৲ সের।

পাঁপলীর মত শীত অতি কঠোর না হলেও নেহাৎ কম নয়। তার পর আবার সমস্ত রাত বাতাস ও বৃষ্টির জন্য খুব ঠাণ্ডা লাগ্‌ল। আমাদের শীতবস্ত্র খুব কম থাকায় রাত্রে খুব কষ্ট পেতে হয়েছে।

৯ আষাঢ় ২৪ জুন শুক্রবার সকালে বেশ রোদ উঠার পর সবিতাকে প্রণাম করে মস্তু হতে বের হলাম। বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে' উৎরাই করতে লাগ্‌লাম। ৫॥ মাইল উৎরাই করার পর কেদারনাথের পথে **ত্রিযোগী নারায়ণে** পৌঁছি। আজকের পথটি বেশ ভাল।

ত্রিযোগী-নারায়ণ ৫॥ মাইল

চড়াই মোটেই নাই, শুধু উৎরাই। তার উপর অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য গরম নয়—বেশ ঠাণ্ডা, রোদের তাপ নাই। তা ছাড়া বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আস্‌তে বেশ আনন্দ হল। এ পথে এক রকম নূতন ফুল দেখেছিলাম—কৃষ্ণের মাথার চূড়োটী যেমন বাম দিকে বাঁকা অবস্থায় বাংলার ফটোতে দেখেছি, এ দিকের এক প্রকার ফুলও সেইরূপ আমের বোলের মত ক্ষুদ্রাকারে শীষের মধ্যে বের হয়ে বাঁ দিকে একটু হেলান, —সামান্য সুগন্ধ; দেখ্‌লে মনে হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাথার চূড়া তৈরী করার জন্যই যেন এ ফুলগুলি প্রকৃতি দেবী সৃজন করেছেন। দেখ্‌তে কেমন সুন্দর! (ক্রমশঃ)

হৃদয় ও বুদ্ধি

—)•(—

বুদ্ধির প্রাখর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির আবেগ মিশ্রিত হওয়া চাই, তবেই জীবন পূর্ণ হইয়া উঠে। একদিকে গভীর জ্ঞানী, অন্য দিকে গভীর ভাবে দরদী, এই দুইটী ভাবের সমন্বয়েই পূর্ণ জীবন আরম্ভ হয়। বৈদিক যুগের ঋষিদের মাঝে যুগপৎ এই দুইটী ভাবেরই সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিবেকানন্দও বলিয়া গিয়াছেন—"We want to-day that bright sun of intellectuality, joined with the heart of Buddha, the wonderful infinite heart of love and mercy. This union will give us the highest philosophy." শঙ্করের প্রতিভা, আর বুদ্ধদেবের হৃদয়, এই দুইটীর সমন্বয় হইলেই পূর্ণ জীবন! আর বাস্তবিকই যতদিন পর্য্যন্ত এই দুইটীর সমন্বয় ভাব ছিল, ততদিন গৃহস্থের মাঝেও ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের আবির্ভাব হইত, কিন্তু পরে যখন নিছক নিজকে নিয়ে থাকার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাটা বিশেষ করিয়া জাগ্রত হইল, তখন হইতেই ধর্ম্মের মাঝেও দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিল! ঋষিদের আদ জগতের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া চলা। তাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই দেখি সমন্বয়ের ভাব। আর এই সমন্বয়ের ভাব থাকাতেই উপনিষদের

জ্ঞানের মাঝে বেশ একটী পবিত্র সরস ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। উপনিষদ্ আলোচনা করিতে করিতে শুষ্ক জ্ঞানে হৃদয়-ধর্ম্ম লোপ পায় না, বরঞ্চ উপনিষদের সমন্বয় ভাবে প্রত্যেকেরই আপ্যায়ন হয়। এই আপ্যায়নের ভাব ইহ-বিতৃষ্ণ, ইহ-বিমুখদের কখনো আসিতে পারে না। জগতে যে কেহই বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাব ছিল সহানুভূতির ভাব, সমন্বয়ের ভাব! সমন্বয়ের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ ভাব পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অপরকে ঘৃণা করিয়া থাকাতে নিজেরই ক্ষতি।

ধর্ম্ম আর বিজ্ঞান নিয়ে আজকাল এক ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। উভয়ই উভয়ের প্রতি কটাক্ষ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু আশ্চর্য্য! কেহ কাহাকেও অবজ্ঞা করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয় না। এই যে অবজ্ঞার ভাব, একে অন্যকে দেখিলে তেলে বেগুণে জলিয়া উঠে, ইহার কারণ কি?—এক কথায় বলিতে intolerance ই ইহার মূল কারণ। অথচ যাহারা জ্ঞানের চরম সীমায় উঠিয়াও জাগতিক ভেদকে বড় করিয়া দেখে, এবং নিজকে তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে চায়, তাহাদের সেই ঊর্দ্ধে উঠার ফলই বা কি হইল, তাহাই বুঝিয়া উঠি না। ভেদ অস্বীকার করা যায় না; একাংশে ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আর বাকী তিন অংশই যে সমন্বয়ের সুরে পূর্ণ। এই ভেদকে রাখিয়া, এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়াও তো মিলন হইতে পারে, যদি প্রত্যেকেরই আবার মিলনের দিকটায় নজর পড়ে। কাজেই বিবেকানন্দ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন—"Science and religious will meet and shake hands"—ইহা অলীক কল্পনার কথা নয়। দিব্যানুভূতি লাভের পথে ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বরঞ্চ বলিতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্যে, অর্থাৎ বিশ্লেষণ বুদ্ধির বিচারের ফলে, অনেক সময় আমাদের ব্যক্ত অনুভূতির মাত্রা গুলি একটু কমিয়া আসে। কিছু নাই, অথচ আমরা মনে করি—না জানি তাহাতে কি আছে। বিশ্লেষণ বুদ্ধি একদিক দিয়া আমাদিগকে মহান্ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছে। যাচাই করিবার সাহস এই বিশ্লেষণ বুদ্ধির মাঝেই রহিয়াছে। কাজেই এই বিশ্লেষণ বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের উন্নতর পথ নিষ্কণ্টক হইয়া যায় বলিতে হইবে। সত্য অসত্যের প্রকাণ্ড বোঝা বহন করিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বিশ্লেষণ বুদ্ধি আসিয়া আমাদের সেই ভার লাঘব করিয়া দেয়।

ঝোঁক এবং বাতিক এই দুইটা এক দিক দিয়ে মানুষের প্রভূত ক্ষতি করে। বাতিকে ধরিলেই তখন মানুষ অন্ধ হইয়া যায়। নিজকে স্বল্প পরিসরে ব্যাপ্ত দেখিয়াই তাহার তৃপ্তি। এই যে আত্মানুভূতির গণ্ডী সৃষ্টি, ইহাতেই মানুষ নিজের ধর্ম্মকেই, নিজের মতকেই একমাত্র চরম মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, আর জগতের সবই অবজ্ঞার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই যখনই যে ক্ষেত্রে পড়ি না কেন, লক্ষ্যকে সর্ব্বদা নিষ্কলঙ্ক ভাবে রাখিতে হইবে। কর্ম্ম-ক্ষেত্রের প্রচণ্ড আবর্ত্তে যদি লক্ষ্য অস্পষ্ট আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে উন্নতির চেয়ে অবনতির আশঙ্কাই বেশী!

হৃদয় হীনের বুদ্ধি বিচারের কোনও সার্থকতা নাই, কেননা তাহাতে আত্মোন্নতির বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। বুদ্ধিমান্ যেক্ষেত্রে আর সকলের চেয়ে বুদ্ধির দিক দিয়ে বড়, সেই ক্ষেত্রে তো অবুঝদের প্রচুর সাহায্য করিতে পারেন।

কিন্তু হৃদয় জিনিষটীর অভাবে, তাঁহাদের বুদ্ধি কোন কাজে লাগে না।

আদান প্রদানে মানুষের নব নব শক্তির বিকাশ হয়। বৈদিক যুগের ঋষি-সঙ্ঘের মাঝেও এই আদর্শ দেখিতে পাই। অপরের সঙ্গে নিজেদের অনুভূতি, জ্ঞান লইয়া তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করিয়াছেন। এই পরস্পরের অলোচনার—চর্চ্চার ফলে জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংরক্ষণ করিবার প্রবৃত্তিটা একদিকে দুর্ব্বলেরই অধিক মাত্রায় থাকে। কিন্তু সবলের মাঝে এই দুর্ব্বল চিন্তার প্রশ্রয় নাই; তাঁহারা অবাধে সকল মত, সকল পথকে স্বীকার করিয়াও নিজের মতের বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহা সুপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। মহত্ব থাকিলে সকলকে সঙ্গে লইয়াও নিজের মহত্বই ফুটিয়া উঠে। বরঞ্চ সকলকে স্বীকার করাতে নিজের মহত্ব আরও বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায়।

একজনকে বা এক জাতিকে সকল দিক দিয়া পূর্ণ করিয়া তুলেন নাই ভগবান্। এই অপূর্ণতা রাখিবারও নিগূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে;—পরস্পরের সম্মিলন-সুযোগ দেওয়াই ইহার তাৎপর্য্য। পরস্পরের সম্মিলনেই পরস্পরের অভাব অভিযোগ মিটিয়া যায়, আর এই যোগাযোগের ফলেই একটা বিশ্ব-মৈত্রীর ভাব আসিয়া পড়ে। আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভ করিয়া এই জন্যই ঋষিরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেন সেই অমৃতানন্দের অংশ লইয়া যাইতে। আর ইহা সত্যি কথা যে, প্রাণে প্রাণে একটা জিনিষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে, সেই উপলব্ধির আনন্দেই মানুষ পাগল হইয়া উঠে। তখন বিলাইয়া দিয়াই আনন্দ, সকলের সঙ্গে সম্মিলনেই আত্মতৃপ্তি!

যে কোন মত বা পথকে অবলম্বন করিয়াই চরম সত্যের শিখরে আরোহণ করা যাউক না কেন, সেই স্থলে পৌঁছিলেই হৃদয়ে ব্যাপ্তি বোধ না জন্মিয়া পারে না। তখন নিজের মতকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও অপরের সঙ্গে বেশ করমর্দ্দন করা যায়। বৈদান্তিকের আত্মোপলব্ধি রহিয়াছে, কিন্তু সেই আত্মা তাঁহার বাইরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। কাজেই বৈদান্তিকের চৈতন্য কূটস্থ-চৈতন্য নয়,—বিশ্বকে উজ্জ্বল মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দীপ্তি পাইতেছে সেই চৈতন্য!

নিজে আস্বাদন করিয়া অপরকেও আস্বাদন করাইতে পারিলে, তবেই সার্থক সেই আস্বাদন! কিন্তু সকলের তো এক দিক দিয়া তৃপ্তি আসে না। তাহা না হইলে অনুভূতি জিনিষটী হৃদয়ে হৃদয়েই সঞ্চারিত হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ বাদীর তো তাহাতে পরিতৃপ্তি আসিবে না। কাজেই তাহাকে বুদ্ধির ভিতর দিয়াই আস্বাদন পাওয়াইতে হইবে। অনুভূতিকে যথাসম্ভব বুদ্ধির স্তরে স্তরে নামাইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিলে, তখন intellectualist এর মনেও একটা তৃপ্তি আসে। আর ইচ্ছা করিলে যে মানুষ সম্পূর্ণ না হোক্, অংশতঃ যে অনুভূতিকে বুদ্ধিতে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইতে না পারিবে, তেমনও কিছু নয়। চেতনাকে উর্দ্ধে লইয়া যাওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী সেই চেতনাকে নামাইয়া আনাও সম্ভব! আরোহ এবং অবরোহ-বাদের ইহাই তাৎপর্য্য। তবে ইহাও ঠিক যে, হৃদয়ের দিক দিয়া একটা বিষয়কে যত সহজে আমরা আয়ত্ব করিয়া নিতে পারি, বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সেই বিষয়কে

বুঝিতে আমাদের সময় লাগে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়,—আধার যত স্বচ্ছ সজীব হয়, ততই বিষয়োপলব্ধি সহজ হইয়া আসে। কিন্তু বুদ্ধি প্রাণহীন কাঠাম মাত্র; তাহার ভিতর একটা জিনিষকে প্রবেশ করাইতেও সময় লাগে।

Emotionএ, কম্পনেই সৃষ্টি! বুদ্ধির কিন্তু সৃষ্টিক্ষমতা নাই। নিজের প্রাণ দিয়া অপরের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা রহিয়াছে একমাত্র emotionএর! এইজন্যই বুদ্ধদেব যদি নিছক্ rationalist হইতেন, তাহা হইলে জগতের লোক তাঁহার দিকে এত আকৃষ্ট হইত না। তিনি হৃদয়বান্ ছিলেন বলিয়াই,সকলের হৃদয়কে আলিঙ্গন-স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। Philosophy দেখিয়া কয়জন লোক আকৃষ্ট হয়, যত হয় ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া? বুদ্ধদেবের তত্ত্বোপদেশে আর কয়জন লোক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল, সব লোক তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াই চরণে আশ্রয় নিয়াছিল।

কাজেই Bright sun of intellectuality joined with the heart—প্রত্যেকেরই আদর্শ হওয়া প্রয়োজন। Reason এবং emotion এর একত্রে সম্মিলন হওয়া চাই। একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেই, পরিপূর্ণ আদর্শ ফুটিয়া উঠিবার ব্যাঘাত হইবে। হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধি সম্মিলিত হইলে, সেই বুদ্ধিই হইয়া যায় প্রজ্ঞা!

আরণ্যক

—:(*):—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।"

—ঋগ্বেদ সংহিতা

আমরা মানুষের মত মানুষ হতে চাই। আমরা কর্ম্ম পটুত্ব চাই, প্রতিভার স্ফূর্ত্তি চাই, অন্তরের দিব্য দৃষ্টি চাই। আমরা আত্মস্থ প্রদীপ্ত হয়ে সমগ্র দেশের বুকে ছড়িয়ে পড়্ব—আমাদের জীবন্ত জীবন-প্রদীপ হতে লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে উঠে দেশের শ্মশানান্ধকার আলো করে তুল্বে। আমরা এমন প্রাণ আমাদের মাঝে সঞ্চয় কর্ব—যা জগতের কিছুর নিকটেই নত হবে না; মানুষের কাছে না, সমাজের কাছে না, রাষ্ট্রের কাছে না, কিছুর কাছেই না!

* * *

জগতে যে মাতৃ-স্নেহের প্রবল আকর্ষণ, তাতেই বুঝ্তে পারি—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—তিনি তাঁর সন্তানকে কত খানি ভালবাসেন।

* * *

ভগবান্ ব্যষ্টির যোগফল নন—কিন্তু তিনিই সমষ্টির রস-স্বরূপ।

কর্ম্মসমর্পণে কর্ম্মত্যাগ হয়, আবার ভালবাসলেও কর্ম্মত্যাগ হয়। কেননা আমি যাকে ভালবাসি, সে আমার সুখে-দুঃখে অংশীদার না হয়ে থাকতেই পারে না।

* * *

প্রেমে যেখানে অতি গভীর বিশ্বাস এনেছে, সেখানে ঈর্ষ্যা নেই। কারণ—জানি, দুজনে দুজনার কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

* * *

জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এ তিনটী, তিনটী আলাদা পথ নয়। যেমন পরস্পরের সঙ্গে না মিশে ত্রিগুণ থাকতে পারে না, তেমনি একে অন্যের আশ্রয় না নিয়ে এ তিনটীও থাকতে পারে না।

* * *

ভগবানের নামে যে মন্দির উৎসর্গ করেছি, তমো দিয়ে তাকে কলঙ্কিত করব কেমন করে?

* * *

মানুষের আর কিছু থাক্ বা না থাক্, তার মানের হুঁশ বেশ রয়েছে। কেউ মন্দ বল্লে বা অপমানকর কথা শোনালে, এক কথায় লেজে পা পড়লে, অমনি চিত্ত ফোঁস্ করে ওঠে। তখন বাইরে দংশন করতে পারুক বা নাই পারুক, অন্তরে সেই অপমানের জ্বালা সইতে সহজে পারে না। এর কারণ, তার ভিতরে যে মহান্ সত্ত্বা রয়েছে, তার সূক্ষ্ম স্মৃতি এসে তাকে কারও কাছে নত হইতে দেয় না। কিন্তু সেই বিরাট রূপীকে—যে অন্তরে রয়েছে—মানুষ তার খোঁজ করে না, কিসে যে সকলের নাগালের উপরে থাকতে পারে, তা সে জানে না। বেদান্ত সেই তত্ত্ব মানুষকে অহরহ জানিয়ে দিচ্ছে। তার সেই তত্ত্বমসি বাণীর হুঙ্কারে সুপ্ত মন জেগে উঠবে একদিন, কিন্তু তার পূর্ব্বে হতে তোমাকেও তার সহায় হতে হবে,—অহরহঃ নিজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে,—ইহাই মহত্ত্ব লাভের উপায়।

দেহ নীচকুলোদ্ভব বলে কি মনেও চির-অবরুদ্ধ থাকবে? যিনিই এজগতে বড় হয়েছেন, পারি-পার্শ্বিকের বিরুদ্ধ বা হীনভাব থেকে আপনাকে বাঁচাবার দরুণ তাঁকেই মহাসংগ্রাম করতে হয়েছে। বিনা রক্তপাতে অর্থাৎ সংগ্রাম ভিন্ন কখনও শত্রুরাজ্য অধিকার করা যায় না। কেবল কি আধ্যাত্মিক রাজ্যই এ নিয়মের বাইরে যাবে যে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাকে জয় করা যাবে?

* * *

দেহের বাধা, মনের বাধা যিনি জয় করতে পারেন, অর্থাৎ নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে যে জিৎবে, পারিপার্শ্বিকের বাধা তার কিছুই করতে পারবে না—এ একেবারে ধ্রুব সত্য। মানুষ এ কথা তলিয়ে বুঝতে চায় না যে, নিজের উন্নতির সবচেয়ে বড় বাধা সে নিজেই। সে বাধা সরিয়ে দাও, ভগবৎ কৃপায় সব সুযোগ তখন আপনি আসবে।

* * *

পরের সুযোগ সুবিধা দেখে মানুষ ঈর্ষ্যায় মরে, কিন্তু সেই সুযোগ টুকু পেতে যে তাকে কত কঠোরতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, সমবেদনা নিয়ে সে কথা চিন্তা করলে হয়ত তার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠবে, সে যাতে আরও সুযোগ পায় সে জন্য ভগবানের কাছে আপনি প্রার্থনা আসবে এবং তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শত কঠোরতার মাঝ দিয়ে যেতেও আর নিজের ভয় হবে না। এমনি করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়।

* * *

তুমি-আমি জগৎরহস্যের কতটুকু জানি যে কেবল পরের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকব? সাধক মাত্রেরই আত্মরত হয়ে জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকতে হয়। কর্ম্মগতিকে সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা অসম্ভব হলেও যতদূর সাধ্য উদাসীন থাকার চেষ্টা ভাল। নতুবা আপন মনই চঞ্চল হয়ে সাধনবিঘ্ন ঘটাবে। তাতে ক্ষতি হয় অপরের নয়—নিজেরই।

উৎসবে সাহায্যপ্রাপ্তি

—— •(——

সারস্বতমঠে ঃ—

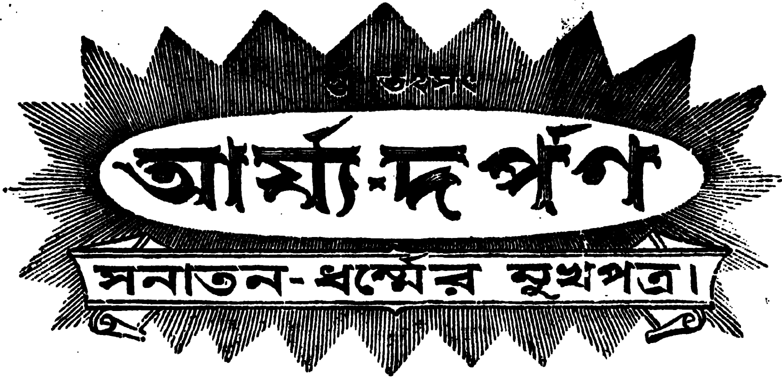
পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ৫৲, উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ৩৲, জলপাইগুড়ি সারস্বত আশ্রম ২৲ উচালন সারস্বত সঙ্ঘ ৫।।/০, পুকুরপার ভক্তবৃন্দ ৫৲, আমিলাইস মহিলাসঙ্ঘ ২৲।

শ্রীযুক্তাঃ—অক্ষয়কুমার রায় ২॥০, সচ্চিদানন্দ ভোল ৩৲, গোবিন্দ চন্দ্র কুণ্ডু ৫৲, তারানাথ দাস মণ্ডল ৫৲, রাধানাথ দে ১৲, অমূল্যচরণ দাস ॥০, গগনচন্দ্র দাস ২৲, সরয় রক্ষিত ॥০, অনুকূল চন্দ্র রায় ২৲, বিন্দুচরণ দাস ৫৲, হরপ্রসাদ রায় ১৲, সুরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত ১৲, গোবিন্দ চন্দ্র পুততুণ্ড ১৲, এস্ এন্ পট্ট নায়ক ১৲, জীবনকৃষ্ণ বানার্জ্জি ১৲, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, মন্মথ নাথ বসু ২৲, মহেন্দ্রনাথ মাইতি ১৲, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইতি ১৲, সারদাপ্রসাদ পট্টনায়ক ২৲, ভীমাচরণ বসু ২৲, ললিতকুমার চৌধুরী ১৲ হেমন্তকুমার ঘোষ ১৲, জয়ন্তকুমার ঘোষ ৩৲, নিশিকান্ত আচার্য্য ১৲, প্রিয়নাথ হালদার ১৲, শরৎ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ২৲, মৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৲, নৃসিংহ পদ পাল ১৲, নারায়ণ দাস নন্দী ১৲, শম্ভুনাথ দালাল ২৲, অন্নদাচরণ মাইতি ১০৲, কৈলাসচন্দ্র দাস ১৲, ননীগোপাল মাইতি ।০, হারাধন দাস ।০, সতীশ চন্দ্র মণ্ডল ।০, ভূতনাথ মাইতি ।০, কুমুদবান্ধব মাইতি ১৲, গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল ॥০, কেনারাম মণ্ডল ।০, অমরনাথ মণ্ডল ॥০, ধরণীভূষণ দাস ॥০, যামিনী ভূষণ দাস ।০, অধরচন্দ্র সেন ।০ বামাচরণ দাস ।০, জন্মেজয় দাস ।০, কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ।০, জ্ঞানদা-চরণ মাইতি ।০, হেমাঙ্গিনী দেবী ২৲, পুষ্পরাণী দেবী ১৲, সুহাসিনী দেবী ২৲, বিদ্যাসুন্দরী ।০ ।

পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে :—

শ্রীযুক্তাঃ —রাধানাথ দে ১৲, হেমন্ত ঘোষ ১৲, চন্দ্রনাথ ভৌমিক ১৲, নীলচাঁদ চক্রবর্ত্তী ॥০, শরৎ চন্দ্র পাল ৮০, বিপিন সাহা ১॥০, বৈকুণ্ঠ নমঃ ১৲, রাইবিনোদ পাল ১৲, নিবারণ চন্দ্র দে ১৲, ললিত চৌধুরী ১, তরণী দত্ত ১৲, অনুকূল দত্ত ১৲, দ্বারকা দাস ১৲, অদ্বৈত কুরী ১৲, হরলাল কুরী ॥০, হেমচন্দ্র কুরী ॥০, ভগবান কুরী ।০, সুভাষিণী ভৌমিক ১৲, মহারাণী কুরী ।০, আমিলাইস মহিলা-সঙ্ঘ ২৲, আজমিরীগঞ্জসংঘ ৫৲, আমিলাইস মহিলা-সঙ্ঘ ১।০ ।

মন্তব্য :—আষাঢ়ের পত্রিকা শ্রাবণের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইবে।



২৪শ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩৮ | ১ম খণ্ড
সমষ্টি সং ২৫৪ | | ৩য় সংখ্যা

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ

—ঃ*ঃ—

ব্রহ্মকে বিশিষ্ট কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না। তিনি সর্ব্বব্যাপ্ত—অথচ সর্ব্বাতীত। এই নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান জানিতে হইলে অন্তরের মাঝে ডুবিয়া যাইতে হইবে।

আমরা তাঁহাকে দেখিতে চাই, জানিতে চাই—কিন্তু ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহার বিরাট-রূপের কণিকাও উপলব্ধি করিতে পারি না। এইজন্যই দেহ-মন-প্রাণ উজাড় করিয়া দিয়া যখন তাঁহাকে অনুভূতিরূপে পাই, তখনই আমাদের আত্যন্তিক তৃপ্তি আসে।

কঠোপনিষদে আছে :—

> ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
> ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
> হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
> য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

সেই অরূপ-রতনকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। তাহা হইলে তাঁহাকে জানার উপায় কি? উপায় তিনটী—হৃদয়, মনীষা এবং মনন।

তিনি আমা হইতে বিবিক্ত নন—কাজেই হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি আমার মাঝেই প্রকাশিত হইবেন। আমাকে ব্যক্ত, আলোকিত করিয়া যিনি আমার মাঝেই প্রকাশিত হইবেন, তাঁহাকে তো সকল ইন্দ্রিয় দিয়াই অনুভব করিব। তিনি বাহিরের সামগ্রী নন, তাঁহাকে জানিতে হইলে বাহিরের দৃষ্টিশক্তির কোন প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন শুধু হৃদয়ানুভবের।

ব্যষ্টি মানবের ব্যষ্টি-বুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার নাই। সে চায় অনন্তকে ক্ষুদ্র আধারের ভিতর পূরিয়া রাখিতে। কিন্তু অনন্তকে ধারণ করিয়া রাখিবার যোগ্যতা কি এই ক্ষুদ্র-আধারের ভিতর রহিয়াছে? যখন সামান্য মাত্র অনুভূতি পাই, তাঁহার অহেতুকী কৃপা উপলব্ধি করিতে থাকি, তখন যেন বেদনার আতিশয্য উপস্থিত হয়। কাজেই সাধ্যাতীত আকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন লাভ নাই।

তাঁহাকে আমরা পৃথক্ করিয়া জানিতে পারি না, তিনি আমাদের হৃদয়-মন-প্রাণের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিজড়িত। এইজন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'মনসাভিক্লৃপ্তো'—তিনি মনন দ্বারা প্রকাশিত হন।

অনুভূতিরূপে যাঁহাকে পাই, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া কোন জায়গাতেই পাই না; এমন কোন স্থল নাই, যাহাতে তিনি ব্যাপ্ত না থাকেন। এইজন্যই অনুভূতি দ্বারা আমরা তাঁহাকে পাই, আর বুদ্ধি-বিচার দ্বারা তাঁহাকে জানি। পাওয়া আর জানার মাঝে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

মনে প্রশ্ন জাগে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সৃষ্টির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া যে তাঁহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না, তাহাই বুঝানো। চোখ দিয়া যখন রূপের সীমা পাই না, তখন বাহিরের অবলম্ব-

নের প্রতি আর তত জোর থাকে না, ভরসা থাকে না, তখন মনের গতি অন্য দিকে ফিরে যায়। মনে হয়, কেন ভগবান্ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিলেন। চোখ যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে শরীরের প্রতি অণু-পরমাণু দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারিতাম! সেই দেখাই তো খাঁটী দেখা।

এই চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দিব্য-চক্ষু খুলিয়া যায়, তেমনি প্রত্যেকেরই একটী দিব্যরূপ রহিয়াছে, সেই রূপের সাহায্যেই আসল রূপীকে চিনা যায়। সকল সংস্কারকে ভুলিয়া যাইতে পারিলেই তাঁহার প্রকাশ হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। তখন সাধক একদম চুপ হইয়া যায়; কি দিয়া, কিসের সাহায্যে তাহার অনুভূতি আসিল, বিশেষ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। মৌন-স্তব্ধ আনন্দে সাধক আত্ম-ভোলা হইয়া যায়।

আমরা যাহাদের সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে চাই, জানিতে চাই, তাহারা নিজেরাই দেখার জানার এক একটী বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক। কাজেই চোখ যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম, কর্ণ যদি না থাকিত, তাহা হইলে শুনিতে পারিতাম—অর্থাৎ কোন কিছুর অভিমান বা সংস্কার যদি না থাকিত, তাহা হইলেই সংস্কারাতীত 'নিরাকার' পুরুষকে জানিতে পারিতাম। কাজেই যাহা আমাদের আছে, তাহাই আমাদের প্রতিবন্ধক। গীতার ভাষায় বলিতে গেলে দিব্য-জন্ম, দিব্য-কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। কাজেই শিশুর মত সরলতা, এবং সংস্কার-রহিত অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মের অনুভূতি পাওয়া যায় না।

এই খানেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবের বিভিন্নতা। ঋষি তাঁহাকে জানিতে গিয়া অন্তরের মাঝে ডুবিয়া পড়িয়াছেন, তিনি দেখিলেন এক একটী ইন্দ্রিয়ই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রতিবন্ধক। কাজেই তিনি জোর দিলেন হৃদয়, মনীষা আর মননের প্রতি। কিন্তু পাশ্চাত্যের আদর্শ হইল, ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান; অর্থাৎ অরূপকে, অজানাকে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানিবার প্রয়াস।

আমরা সাধারণতঃ যাহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া চলি, তাহারা যে নিজেরাই প্রবঞ্চক। বিরাটরূপ হইতে বঞ্চিত করিবার দরুণই চক্ষুর সৃষ্টি, তেমনি মন-বুদ্ধি সকলই এক একটী প্রবঞ্চক। এইজন্যই মায়া বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র হৃদয় দ্বারা তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করা উচিত।

শিশুর কাছে ভগবান্ যখন-তখন ধরা দেন, কেননা শিশু সংস্কাররহিত।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে শিশুর স্থানই সর্ব্বোচ্চে ! বুদ্ধি-জ্ঞান-সাধনা সবের বালাই বিসর্জ্জন দিলে, তবেই তিনি অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হন।

তাঁহাকে না জানার উপায়-কৌশল তিনিই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ।" ইন্দ্রিয়কে তিনি বাহ্যপদার্থদর্শী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, এইজন্যই ইন্দ্রিয় "পরাঙ্ পশ্যতি"—বাহ্যবিষয়ই কেবল দেখে। কিন্তু যাহাদের আবার তাঁহারই কৃপায় জ্ঞাননেত্র খুলিয়া গিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রিয়ের উপর একদম ভরসা ছাড়িয়া দেয়। ভগবান্‌কে পাইতে জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের কি প্রয়োজন? প্রয়োজন—হৃদয়, মনীষা, আর মননের।

কর্ম্ম-কথা

—)•(—

কোলাহলের মাঝে মাথা ঘুলাইয়া যায়, লক্ষ্য মনের কাছে ফিঁকে হইয়া আসে, এইজন্যই দিনান্তে একবার লাভ-লোকসানকে রোজই খতিয়ান্ করিয়া দেখিতে হয়। জগতে আমরা আসিয়াছি কর্ম্ম করিয়া যাইতে, বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকিতে; কিন্তু কি করিয়া অক্লান্ত ভাবে অবিক্ষুব্ধ চিত্ত লইয়া কর্ম্ম সমাপ্তি হয়, তাহার সঙ্কেতই আমরা জানি না। গীতায় আছে—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" কর্ম্ম সকলেই করে, প্রাণী মাত্রেই নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেহ ৫ মিনিটের তরেও বসিয়া থাকিতে পারে না. কিন্তু কর্ম্ম করিলেই তো কর্ম্মের সিদ্ধি আসে না; যোগ চাই, কর্ম্মের কৌশল জানা চাই—তবে না কর্ম্ম করিয়া আমরা ধীরে ধীরে ইষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারি।

আসল কথা, ইষ্টসিদ্ধির মুখ্য উপায়ই হইল কর্ম্ম কি করিয়া করিতে হয় তাহাই জানিতে হইবে। মজুরের মত রাত দিন খাটিয়া গেলেই সব শেষ হইল না। কর্ম্মের মাঝে যে নিগূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকে হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। কর্ম্ম করিয়া ক্লান্তিতে, অবসাদে আমরা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, কিন্তু জগৎস্রষ্টার দিকে তাকাইলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়, তিনি কি করিয়া সেই আদিযুগ হইতে কর্ম্ম-প্রবাহে নিজকে ভাসাইয়া দিয়াও সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাহাই এক নিগূঢ় রহস্য! আমরা কর্ম্ম করি, কিন্তু কর্ম্মের ভিতর কি করিয়া নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার থাকা যায়, তাহার কোন সঙ্কেত জানি না, এইজন্যই কর্ম্মের উচ্ছ্বাসের পর স্বাভাবিক একটা অবসাদ আসিয়া আমাদিগকে অনেক নিম্নে, চেতনাহীন এক অন্ধকার রাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়। সেই

অবসাদ, জড়ত্ব অনেকেই আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি না বলিয়া সেই অন্ধতম প্রদেশেই আমাদের গতি হয়। বাহির হইবার পথ তো আমাদের জানা নাই—তাই চুপ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিই।

কর্ম্মের কৌশল জানিতে হইলে আত্মস্থ হইতে হয়। কাজেই কর্ম্ম-ঝঞ্ঝাটের মাঝ থেকে কিছু দিন ছুটি লইয়া আপন মনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহস্যের কোন সন্ধান মিলে কিনা, তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। জগত থেকে পলাতকের ন্যায় ভীরুর ন্যায় পিছাইয়া যাইতে বলি না, কিন্তু একদিকে প্রচণ্ড কর্ম্মের প্রবাহে নিজকে ভাসাইয়া দেওয়া, আবার অন্য দিকে আত্মস্থ হইয়া বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা, এই দুইটী শক্তি যুগপৎ আয়ত্ব করা চাই।

জগতের দরুণ যে যত পার খাটিয়া যাও—কিন্তু সেই খাটার মূলে অভিমান, অবসাদ ক্লান্তি যেন না থাকে। আর এইজন্যই কর্ম্ম-যোগ বা কর্ম্ম-রহস্য আবিষ্কার করিয়া, বুকে অফুরন্ত বল লইয়া তবে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হয়। জগতের হিত অনেকেই করিতেছে, তুমি-আমি না হয় সেই বড় সুখ্যাতি লাভ না-ই করিতে পারিলাম, কিন্তু জীবন দিয়া যদি বুঝিয়া যাইতে পারি, কি করিয়া মানুষ কর্ম্মের আবর্ত্তের মাঝে পড়িয়াও চিত্তকে অবিক্ষুব্ধ অচঞ্চল রাখিতে পারে, তাহা হইলে সেইটাই বা কম লাভ কি? আমার আসল কথা হইল আমি কর্ম্মই করিতে চাই—কিন্তু দু'দিন থাকিয়াই যেন কর্ম্ম থেকে পেন্সন লইয়া বিদায় নিতে না হয়। কেননা আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, সঙ্কেত জানিয়া কর্ম্ম করিলে মানুষ জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত জগতের হিতের দরুণ বিতরণ করিয়া যাইতে পারে।

আমার প্রাণ সেই আশায়, সেই আনন্দে বর্ত্তমানের কর্ম্ম-বিরতিকেও ভয় করে না। প্রয়োজন হইলে আপাততঃ সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া একমনে ধ্যানে বসিয়াও যাইতে আমার আপত্তি নাই; তবু ভণ্ডামী লইয়া, সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া অনর্থক জীবনী-শক্তির অপব্যয় করিতে চাই না।

যাহা করিব, তাহা যেন স্থায়ী হয়, টিকসই হয়, তাহার দিকেই আমার লক্ষ্য। এইজন্যই তাড়াহুড়াটাকেই আমি প্রাণের সত্যিকার সুস্থ লক্ষণ বলিনা। সমুদ্রের উপরেই তরঙ্গ, কিন্তু যতই গভীর প্রদেশে তলাইয়া যাওয়া যায় ততই সাগরের প্রশান্ত, অবিক্ষুব্ধ চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অবিক্ষুব্ধ চিত্ত মূলে আছে বলিয়াই উপরের তরঙ্গ তাহার কিছুমাত্র উত্তেজনা হয় না। উত্তেজনা—তরঙ্গ সব উপরের জিনিষ, তাহাদের মূল বেশী দূর নয়, মূলে আছে একটা সুগভীর সাম্যভাব।

প্রত্যেকের জীবনেই সেই শান্ত-সমাহিত ভাব রহিয়াছে। সেই ভাবের সঙ্গে যে যত নিজকে মিশাইয়া দিতে পারিয়াছে, সেই তত নীরব কর্ম্মী। তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মাঝে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার রেস নাই, কিন্তু কি অফুরন্ত আনন্দের উৎস বুকে লইয়া যে সে কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহা আর বলিবার নয়। আমি চাই সেই নীরব-জীবনের অফুরন্ত কর্ম্মোদ্যম। নাম যশ এসব পথের কণ্টক, কিন্তু এই কণ্টকের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে উপরে ভাসিয়া না উঠিয়া যত পার গভীর প্রদেশে তলাইয়া যাইতে হইবে। সমাহিত হইতে পারিলে, বুকে অজস্র দ্বন্দ্বের অভিঘাত, কর্ম্ম জগতের অসংখ্য ঝঞ্ঝাটের উপদ্রবও নীরবে সহিয়া যাইতে পারিবে। কাজেই তাড়াহুড়া না করিয়া

আগে নিজের মাঝে তলাইয়া যাইতে শিখ।

সুস্থ দেহ, সবল মস্তিষ্ক নিয়া কি করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত কর্ম্মোৎসাহে, কর্ম্মোদ্যমে অতিবাহিত করা যায়, সেই বিষয়টীই সকলের আগে জানিতে হইবে। কাজেই কর্ম্মে নামিবার পূর্ব্বে বেশ গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, কর্ম্মের সূত্রকে শেষ পর্য্যন্ত উদ্যম দ্বারা চেষ্টা দ্বারা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিব কিনা। বিনা সাধনায় চিত্তের মাঝে বজ্রদৃঢ় ইচ্ছার উদ্বোধন হয় না।

বীরের মত কর্ম্মের মাঝেই জীবনটাকে উৎসর্গ করিয়া যাইতে হইবে, এই আদর্শকে যেমন-তেমন করিয়াই হউক শেষ পর্য্যন্ত সজীব-পুষ্ট রাখিতেই হইবে। কিন্তু এই কথাটীও মনে রাখিতে হইবে, গভীর ভাবে তলাইয়া গিয়া কর্ম্ম রহস্যের সন্ধান জানিতে না পারিলে কর্ম্মোদ্যম বেশী দিন টিকিবে না।

জগতে হৈ চৈ এর আর অন্ত নাই, ক্ষণিক উচ্ছ্বাস, ক্ষণিক ভাবের উন্মাদনা লইয়া এক এক জন অসাধ্য সাধন করিতে নামিয়া পড়ে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাতে চিত্ত যখন অবশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারাই আবার সকলের আগে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রয়াস পায়। নদীর স্রোতের মত একটানা প্রবাহে জীবনটাকে কাটাইয়া দেওয়া এত সহজ কথা নয়। দেশের হিত, দশের হিত সকলের দ্বারা সম্ভবপর নয়, কাজেই অলীক কল্পনা লইয়া নিজের ক্ষুদ্র শক্তির অপব্যয় না করিলেও বোধ হয় ভগবান্ রুষ্ট হইবেন না। বরঞ্চ নিজের শক্তি বুঝিয়া এতটুকু জায়গার মাঝেও নিজের কর্ম্মোদ্যমকে সার্থক করিতে পারিলে, ভগবান বেশী পরিতুষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করি।

সঙ্ঘ পরিচালনা করিতে গিয়া দেখিতে পাইতেছি, একদিকে যেমন অফুরন্ত কর্ম্মোদ্যমের প্রয়োজন, তেমনি সেই উদ্যমকে, সেই চেষ্টাকে স্থায়ী এবং সরস রাখিবার দরুণ একদল ধ্যান-নিরত শান্ত স্তব্ধ সাধকেরও প্রয়োজন। তাহা না হইলে সঙ্ঘের বাহিরের বিরাট কর্ম্মের স্থায়িত্ব বেশী দিন থাকে না। তখন আপনি শক্তি সামর্থ্যের অভাবে সকল দিক হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখি, সমাহিত চিত্তের অভাবে কাজের ক্ষেত্রে অকাজই হয়ে যায় বেশী। এই জন্যই একদম কর্ম্ম না হওয়াও ভাল তবু তাহার মাঝে মারাত্মক ভুলের অংশ থাকা সমীচীন নয়।

জীবনকে জগৎহিতের দরুণ উৎসর্গ করিবার, বিলাইয়া দিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের রহিয়াছে। কিন্তু ভগবান্ সকলের ভিতর সেই শক্তি দেন নাই যাহাতে উৎসর্গ সার্থক হয়, অথচ নিজের কোনই অবনতি না ঘটায়। অনেকেই লোভে পড়িয়া আদর্শের পিছনে পিছনে ছুটে, তাহাদের কিন্তু বড়ই দুর্গতিতে পড়িতে হয়। হিতের চেয়ে তাহাদের দ্বারা অহিতই হয় বেশী।

শক্তি সংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চারের দরুণ একদল সাধক এবং সিদ্ধের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে! জগতের কাজ চলিতে থাকিবেই। তুমি আমি স্বার্থপর হইয়াও যদি নিজকে সম্যকরূপে পাইয়া, নিজের অব্যর্থ বীর্য্যের সন্ধান জানিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আবার ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে কি জগতের কাছে, ভগবানের কাছে আমরা অমার্জ্জনীয় ত্রুটী করিয়া বসিব? যদি তাহাই হয়, আমি বলি, সেই ত্রুটীরও মূল্য আছে।

শান্ত হও সমাহিত হও। লোক দেখানো অস্থায়ী কর্ম্মের মোহে কখনও ভুলিয়া যাইও না, কর্ম্ম করিবারও সঙ্কেত আছে, কৌশল আছে—সেই সঙ্কেত এবং কৌশলই আয়ত্ব করিতে চেষ্টা কর।

আনন্দের বাণী

—:(*):—

বলে কয়ে মানুষকে ত্যাগ শিখানো যায় না; ত্যাগ বড়ই দুর্ল্লভ সামগ্রী। ভিতর থেকে আপনি সহজ ভাবে তার উদ্বোধন না হলে, সে ত্যাগে আনন্দ নাই। এই জন্যই দেখি স্বাভাবিক যেখানে ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে কোন কৃত্রিমতা নাই, প্রশ্ন নাই; ভাল লেগে গিয়েছে, তাই ভালবাসা জন্মে গিয়েছে। এদিক দিয়ে বল্‌তে গেলে ভালবাসা অন্ধ, আর এই অকারণ ভালবাসাই ঠিক খাঁটী ভালবাসা!

কৃত্রিমতা যেখানে, সেখানেই মরণ! ত্যাগ শিখানোর বিদ্যালয় বা আবহাওয়া গড়া যেতে পারে, কিন্তু যথার্থ ত্যাগীর সেখানে উদ্ভব হবে কিনা তা কেউ বল্‌তে পারে না। কখন কার ভিতর দিয়ে ত্যাগের আদর্শ ফুটে উঠে, তা কেউ বল্‌তে পারে না। নিম্ন শ্রেণীর নর-নারীর ভিতর যে ত্যাগ বা ভালবাসার আদর্শ দেখা যায়, অনেক শিক্ষিত নর-নারীর মাঝেও সচরাচর তা দেখা যায় না। এইজন্যই বলি—ত্যাগ, প্রেম, ভালবাসা এ সব হল অন্তরের অমূল্য সম্পদ্। এ সম্পদের বিশিষ্ট কোন অধিকারী নাই, সকলের ভিতর দিয়েই অপ্রত্যাশিত ভাবে তার বিকাশ হতে পারে। ওগুলো বিধাতার দান।

নিজের মাঝে আনন্দ না পেলে ত্যাগ-শক্তি ফুটে উঠে না। আমরা ছেলেদের দোষ দিই, মারি ধরি, কেন ওরা ত্যাগের আদর্শ ধরে চলে না? কিন্তু এ কথাটা তলিয়ে বুঝি না, ত্যাগ যাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠ্‌বে, মূলে সেই আনন্দ প্রস্রবণ রয়েছে কিনা। অষ্টক্ষণ বিধি নিষেধের মাঝে রেখে রেখে ছেলের মনটাকে নিষ্ক্রিয় নিরানন্দ করে, তার পর এই যে অন্যায় দাবী, কেন ছেলে আনন্দ করে না, ত্যাগের আদর্শ ধরে চলে না, এ সব কি মূঢ়তা বা অবিবেচনার লক্ষণ নয়? আনন্দের যোগান পেলে, আনন্দে থাক্‌বার সুযোগ সুবিধা কোন দিক দিয়ে ব্যাহত না হলে, এতটুকু ছেলের মাঝেও ত্যাগের মহিমা ফুটে ওঠে।

আসল কথাটা আমরা ভুলে যাই, আর আদর্শের মোহে পড়ে আদর্শকে শ্রদ্ধা করবার আয়োজন উদ্যোগ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। মানুষের ভিতর ত্যাগ শক্তি কেন ফুটে উঠে, স্বেচ্ছায় কেন মানুষ পরের দরুণ ত্যাগ স্বীকার করে, এর হেতু না খুঁজে, মূল অনুসন্ধান না করে, আগ থেকেই ত্যাগ শিক্ষা দিবার এক বিদ্যালয় গঠন করে তুলি। মানুষ তখন প্রাণ হারিয়ে রীতি-নীতি নিয়েই ভুলে থাকে। কিন্তু এতে কি হয়? দু'দিন পর চিত্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, মন-মরা ভাব এসে মানুষকে স্বার্থপর বানিয়ে তুলে!

আমরা ভুল করি নিজের মাঝে, কিন্তু প্রতিকারের উপায় খুঁজি অন্যের ওপর জুলুম করে! ছেলেরা দেখে শিখে, কিন্তু আমাদের আচরণ কি তাদের অন্তর-পুরুষকে যথার্থই উদ্বুদ্ধ করে তুলে? আমরা যা চাই তা জোর করে আদায় কর্‌তে চাই, এই জন্যই জুলুমের জিনিষের শেষ ফল ভাল দাঁড়ায় না।

পুরাতনকে ধরে রাখ্‌বার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে মানুষের, কিন্তু পুরাতন যেখানে প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে না, সজীব প্রেরণায় উৎফুল্ল করে তুলে না, সেখানে পুরাতনের মায়াকে অবজ্ঞা করে চল্‌লে পাপ সঞ্চয় হবার কোন ভয় নাই। পাপ সঞ্চয় হয় কোথায়?—মলিন চিত্তে। কিন্তু সরস প্রেরণায় প্রাণ সর্ব্বদার দরুণ ভর পুর

থাক্‌লে, মালিন্যের পঙ্কিলতা স্থায়ীভাবে মনের মধ্যে জমে উঠ্‌তে পারে না। এইজন্যই আনন্দের মাঝে যে ভুল যে ত্রুটী হয়ে যায়, তার কোন দাগ বা সংস্কার চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে তুল্‌তে পারে না। মনের স্ফূর্ত্তিতে থাক্‌লে, মানুষের ভিতর দুর্ব্বল কামনার কিল্‌বিলিটা অনেক কমে আসে। কাজেই সবের মূলে হল আনন্দ পাওয়া। সেই আনন্দের উৎস শুকিয়ে গেলে ঐশ্বর্য্যও তখন প্রতি পদে পদে প্রাণকে পীড়িত করে।

উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই আছে—"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগ করে ভোগ কর। আর যথার্থ ত্যাগ করতে পার্‌লে, ভিতরটা দিব্য ভোগের আনন্দে আপনি ভরে ওঠে। ত্যাগে আনন্দ পায় বলেই মানুষ ত্যাগ করে। কিন্তু যেখানে ত্যাগের ভিতর আনন্দ নাই, সেখানেই বুঝতে হবে সে ত্যাগের মূলে বাধ্য-বাধকতা রয়েছে। ছোট ছোট ছেলেরা নিজের মনের আনন্দে অনেক সময় নিজের খাওয়ার জিনিষ সাথীকে বিলিয়ে দেয়, কিন্তু ছেলে যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত না হয়, তাহলে তাকে দিয়ে ত্যাগ করানো, আর তার মর্ম্মে অসহ্য পীড়া উৎপাদন করা একই কথা।

এই জন্যই আমি বলি, ছেলেদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমেই কড়া কড়ি নিয়মের প্রবর্ত্তন না করে, তাদের আনন্দপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের জোগান দিতে হয়। আনন্দে থাক্‌লে প্রাণ আপনি তাজা থাকে। তখন শক্তির আতিশয্যে, আমরা যে ভয়টা করি (অর্থাৎ ঔদাসীন্য, আলস্য, জড়ত্ব) সে ভয়টা তাদের কাছে ঘেঁসতেও পারে না। আনন্দে তারা কর্ত্তব্যাতিরিক্ত কাজও অনেক সময় সমাধা করে দেয়।

আমরা যা চাই, তা খুব তাড়াতাড়ি চাই বলেই কৃত্রিমতাটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কোন মতে ফল লাভই আমাদের লক্ষ্য কিন্তু পরিণত সুপক্ক ফলের আশায় ধৈর্য্য ধরে বসে থাকার মত সহিষ্ণুতা আমাদের অনেকের নাই বল্‌লেই চলে। এইজন্যই ত্যাগ, প্রেম, ভালবাসা এদের কৃত্রিম লক্ষণ দেখেও আমরা পরিতুষ্ট। কিন্তু যথার্থ ত্যাগ, যথার্থ প্রেম ভালবাসা কয়জন পেয়েছে বা দিতে পেরেছে? দুর্লভ সামগ্রীকে পেতে হলে অনেক সাধ্য সাধনার প্রয়োজন হয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস এরা সাধ্য সাধনারই পর এসে দেখা দেয়।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দকে চায় মানুষ বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়ে পেতে। নিয়ম-কানুন মেনে চল্‌লেই যে মানুষের ভেতর মহত্ত্ব আস্‌বে তার কোন হেতু নাই, মহত্ত্ব জিনিষটা নিয়মাতীত। অনেক ছোটলোকের মাঝেও এমন মহত্ত্ব দেখা যায়, যা নাকি নামজাদাদের মাঝেও বড় দেখা যায় না।

লোভ জিনিষটা মানুষের সর্ব্বত্রই রয়েছে, অপরের দেখা দেখি রাতারাতি বড় হয়ে যাবার বাতিক অনেকেরই আছে, কিন্তু পরের অনুকরণ করলেই যে ঠিক তার মতন হওয়া যাবে, এ দুরাশা করা বৃথা। অথচ এই অনুকরণ বাদ দিয়ে যদি মানুষ ঠিক নিজের স্বভাব-প্রেরণানুযায়ী চলে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দেখি ফল ভাল হয়। আদর্শের মোহ অত্যন্ত বড় মোহ। সব ছেড়ে দিয়েও অনেকে এসে একজায়গা থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না। এইজন্যই নিজের জীবনে একরূপ অনুভব অনুভূতি পেলেও, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দরুণ মানুষ অপরকে খুব উপদেশ দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রাণসম্পর্ক বিহীন এই উপদেশে যে মানুষের কোন হিত কর্‌বে না, একথা বুঝেও মানুষ আদর্শের

প্রতি অন্ধ সশ্রদ্ধ মোহে অভিভূত হয়ে পড়ে। মন মরে গেলে অপরের উপর বেশী পীড়নও করা যায় না। আনন্দে মানুষ সাধ্যাতীত বোঝাকেও বড় বেশী কেয়ার করে না। কিন্তু নিরানন্দে মানুষের পক্ষে সহজ বোঝাও ভারী হয়ে ওঠে। কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা দেখে, নিয়ম কানুনের বিপর্যায় দেখে আমরা সহজেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি, আর খুব কড়া কড়া নিয়ম সংযোজন করি। কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো। মন যাতে আনন্দযুক্ত হয়, তার দরুণ সাময়িক রেহাই দিয়েও যে সুফল ফলে সে দিকে কিন্তু আমাদের মোটেই লক্ষ্য নাই।

আমি ত্যাগও বুঝি না, প্রেমও বুঝি না, ভালবাসাও বুঝি না; আমি বুঝি এই যে, মানুষের মনটাকে সরস রাখাই হল আসল কাজ। সকলেরই এক পথে ত্যাগ আসতে পারে না। ছেলেদের দিয়েই দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি—এই আমাদের মণি গল্প শুনে রাতকে রাত কাটিয়ে দিতে পারে, যোগেন আসন-প্রাণায়ামের উপদেশ শুনে ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে ভুলে যায়, প্রফুল্ল অঙ্ক করতে করতে প্রায় সমাধিস্থ হয়ে পড়ে, কাজেই ত্যাগেরও সবারই এক পথ নয়। যে যে-পথে আনন্দ পায়, তার পক্ষে ত্যাগ-স্বীকারের ক্ষমতাটাও সেই পথ দিয়েই আসে, যদি তার মাঝে কোন কৃত্রিমতা না থাকে। কাজেই সবকে নিয়ে এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ লাগানোও অনুচিত। বৈচিত্র্য সর্ব্বত্রই রয়েছে।

ঐশ্বর্য্যের মাঝে থেকেও বুদ্ধদেবের একদিন ত্যাগ এসেছিল—সে ত্যাগ কারও শেখানো ত্যাগ নয়। ভিতর থেকে তার উদ্বোধন হয়েছিল বলেই সেই ত্যাগের মহিমা আজ জগৎময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। ভিতর থেকে যাই উদ্বুদ্ধ হয়, তার মূল্য বাইরের শেখানো-সংস্কারের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ মানুষ নিজের শক্তিকে এত অবিশ্বাস করে যে তা আর বলবার নয়।

যথার্থ ত্যাগের একটা আন্তরিক পরিতৃপ্তি রয়েছে, এইজন্যই ভালবেসে অনেকে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পায়, তবু সেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই যেন তাদের মাথার মাণিক। আর যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে মানুষের চিত্ত শুষ্ক কঠোর, কাজেই সংস্কৃতায় যে তৃপ্তি, সেখানে তা জন্মাতেই পারে না।

বুদ্ধদেব আনন্দ পেয়েছিলেন বলেই ৬ বৎসর একাসনে বোধিদ্রুম মূলে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেও দিন অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু আনন্দ না পেলে একদিনও একাসনে বসে থাকার সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন। এইজন্যই কেবল বুদ্ধদেবের আদর্শকে শ্রদ্ধা করে—সেই শক্তি, সেই আনন্দ না নিয়ে সাধনা করতে বসে গেলে বুদ্ধদেবের মত সিদ্ধিলাভ না হয়ে অসিদ্ধিই যথেষ্ট লাভ হবে। অপরের আদর্শ আমারও কেন আদর্শ হতে পারল না—এই আক্ষেপ নিয়ে মনক্ষুণ্ণ হয়ে বসে থাকাও নির্ব্বোধের কাজ। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলে একটা কথা রয়েছে, হয়ত আমি যে-পথ ধরে ত্যাগ দেখাতে পারব, অন্য কেউ সে পথে সেরূপ ত্যাগ দেখাতে পারবে না, কেননা আমি যে-পথে আনন্দ পেয়েছি, সকলে হয় তো সে পথে আনন্দ না-ও পেতে পারে। এদিক দিয়ে বলতে গেলে প্রত্যেকেরই একটা বিশিষ্ট আদর্শ রয়েছে, এবং তার পরিণতি অন্য একজনের আদর্শ ধরে চললে হবে না।

এতগুলো কথা বলবার উদ্দেশ্যই হল আমার এই যে, মানুষকে কি করে আনন্দ দিতে পার, আনন্দে রাখতে পার তারই বিধান কর। আনন্দের পথে বিধি-নিষেধের বালাই নাই; কেননা

আনন্দে থাকলে যে মানুষকে বিধির কথা—নিজের কথা আলাদা করে বলে দিতে হয় না, স্বেচ্ছায় আনন্দে মানুষের কর্ত্তব্য উদ্বুদ্ধ হয়।

ভাল বানাতে গিয়ে আমরা যত মানুষকে নষ্ট করি, তার চেয়ে যারা আমাদের ভাল-বানানোর কলে এসে ধরা দেয়নি, তারাই দেখি আপনি ভাল হয়ে ওঠে। কাজেই আসল কথা হল তিনটী—মানুষকে মুক্তি আনন্দ আর স্বাধীনতা দিলে, মানুষ নিজের সুখে নিজের মনে সব দিকে পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে উঠ্‌বার সুযোগ পায়।

তীর্থ-রেণু

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—)•(—

অন্যায় করেছিল বলে এক অজ্ঞানীকে একজন গাল দিয়ে বলেছিল, "ধিক্ তোকে! তুই মানুষ নোস্!" লোকটা কিছু বোঝে না কিনা, তাই সে মানুষ কিনা তা যাচাই করবার জন্য আর একজনের কাছে গিয়ে বল্‌ল, "বল না, আমি কি?" যাকে জিজ্ঞাসা করল, সে জানে ও বোকা, তাই বল্‌ল, "আচ্ছা, তোমায় ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিচ্ছ তুমি কি!" তারপর "তুমি এ নও, তা নও, জড় নও" ইত্যাদি করে সব বাদ দিয়ে শেষ কালে সে বল্‌ল, "তুমি অ-মানুষ নও।" এই বলে চুপ করে রইল। বোকারাম তখন বল্‌ছে, "তুমি আমায় বোঝাতে বোঝাতে চুপ করে রইলে কেন গো? আমায় বুঝিয়ে দাও আমি কি?"—অজ্ঞানান্ধ সংসারী জীবের এই দশা!

সংসারে যারা চালাক, তারা হচ্ছে আল্‌পিনের মত; মাথা আছে বলেই তারা বেশী দূর এগুতে পারে না।

কর্ম্মে কখনো মুক্তি হতে পারে না। টাকা পয়সা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র, কিন্তু লোকে শেষ কালে তাকেই লক্ষ্য করে তোলে; তেমনি যারা নির্ব্বোধ, তারাই কর্ম্মকে জীবনের লক্ষ্য করে; বাস্তবিক কর্ম্ম তো লক্ষ্যের একটা তুচ্ছ সাধন মাত্র।

প্রকৃতির চিত্র যেমন শান্ত অথচ স্পষ্ট ভাবে চোখের সামনে ভেসে যায়, সংসারের সম্পদ্ বিপদও তেমনি ভেসে যাবে। চিরকাল তোমার মনের সামনে জেগে থাক্ তোমার আত্মস্বরূপ—আর কিছু নয়—আর কিছু নয়।

গল্পে আছে একটা গাধার ছালের কথা। তার ওপর বসে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকটী চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছালেরও একটুকরা উড়ে যায়।

দোকানদারী আর কাঙ্গালীপনা—একে কি ধর্ম্ম বলে? যখনই চেয়েছি, তখনই পাইনি। নিজকে

যখন মুক্ত করলাম, তখনই সব পেলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাত কচলাবে, কিছুই পাবে না। বাদ্‌শার মত কোন কিছুর তোয়াক্কা না রেখে চল— সব তোমার পেছু ছুটবে, যেমন না ডাকতেও লোকে রাজদর্শনে ছোটে।—বাসনাতেই তোমায় নারী করেছে। কত সহজে মানুষের লিঙ্গ পরিবর্ত্তন হয় তাই ভাবি!

সমে সমে মিল হয়; আবার যার জোর বেশী, সেই কম জোরকে কাছে টেনে আনে। আমরা যখন আনন্দ-স্বরূপ হয়ে সংসার ভোগের ঊর্দ্ধে উঠে যাই তখনই সংসারের ভোগ আমাদের আসে। যতই চেষ্টা করনা কেন, আত্মসমর্পণ ও বৈরাগ্যের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাসনার ঊর্দ্ধে যতক্ষণ না যেতে পারছ, ততক্ষণ বাসনা পূরণ কিছুতেই হবার নয়।

একটা খাড়া কাঠীর ওপর একটা তোতা বসে আছে। কাঠীটা হঠাৎ উল্‌টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তোতাটাও উল্‌টে গেল—উল্‌টে জলে পড়ে আর কি! পড়ে যাওয়ার ভয়ে তোতাটা কাঠীটা ছাড়ছে না। কিন্তু ওই ভয়েই তার বন্ধনদশা ঘটল—বেচারী ব্যাধের হাতে পড়্‌ল।

বাসনায় নিজকে খণ্ডিত করি শুধু, নিজের ভার-কেন্দ্র হারিয়ে ফেলি। সমস্ত বসনার মূলেই আসক্তি, আসক্তিই ভগবান্‌। অতএব সমস্ত বাসনাই ভগবান্‌। বাসনাকে আত্মস্বরূপ-রূপে যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি প্রণবের উপাসক। জগৎ বাসনা নিয়ে বেঁচে আছে; অতএব জগৎ আমাতেই বেঁচে আছে।

ব্যক্তিগত বাসনার গলদ এই, পরাসক্তি বা ভগবান্‌ তাহতে একেবারে বাদ পড়ে যান। ঢেউএ সমুদ্রের স্বরূপ আড়াল হয়ে পড়ে—সর্ব্বময়ের সঙ্গে মানুষের আর সুর মেলে না। যদি কোনো বাসনায় তোমার মাঝে বিশ্বপ্রেম নিয়ে আসে, যে বাসনা সতী।

শারীরক ভাষ্যে অধ্যাস বা দেহাসক্তির কথাটি আগে বলা হয়েছে, অজ্ঞানের কথা নয়। কেননা অধ্যাসেই বাস্তবিক দুঃখের উৎপত্তি, অজ্ঞানে নয়। সুষুপ্তিতে অজ্ঞান আছে, অধ্যাস নাই, তাই সুষুপ্তি দুঃখরূপ নয়।

সংসারাসক্তি, যশের আকাঙ্ক্ষা, লৌকিকতা, সৌজন্য, দয়া, পরকে সুখী করবার ইচ্ছা, তোষামদপ্রিয়তা, অভিমান—এইগুলো হচ্ছে মায়ার শাণিত অস্ত্র। এরাই হল অজ্ঞান আর বেদনার জাল, মানুষকে সম্মোহিত করে এরাই। সংসার তোমায় সম্মোহিত করে দেহের গণ্ডীতে আটুকে ফেল্‌বে কেন? বাজে বই পড়া, সংসারী আলাপ—ওসব ছুঁড়েফেল। নামরূপের জগতে বিচরণ করবে কেন? সংসার তোমায় নারী বানাবে? তার কি অধিকার? বেঁচে থাকার আকিঞ্চন হতেই মানুষের যত দুঃখ। বৈরাগ্যের আকিঞ্চন হতেই আসে শান্তি আর আনন্দ।

জাতিতে, বর্ণে, দেশে, ধর্ম্মে মিলেছে বলে কারু সঙ্গে ভাব করো না। তোমার সঙ্গে এক চিন্তারাজ্যে যে বাস করে, সে-ই তোমার আত্মীয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—এরা আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে যাবে, আবরণ হয়ে থাক্‌বে কেন? তারা কাচের মত হবে, আলো আস্‌তে বাধা তো দেবেই না, বরং চস্‌মার মত—কি অনুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণের মত দৃষ্টির সহায়তা করবে, পীড়া জন্মাবে না। মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধটা এমন হবে না যেন পিঠে করে খাবারের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। সেই খাবারই পেটে পুরে হজম করে নিতে হবে। মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধে সত্যের পথে সাহায্যই পাব, বাধা নয়। দড়ীর নাচুনিয়া প্রথম একা একাই দড়ির ওপর নাচে। যখন নাচায় ওস্তাদ হয়, তখন একটা ছেলে কি ভারী একটা কিছু সঙ্গে

নিয়ে থাকে। তেমনি একা থেকে আগে সিদ্ধ হতে হবে, তারপর অপরকে কাছে আসতে দিতে পার। যদি সম্বন্ধ রাখতেই হয়, তাহলে সেটা যেন জোলাপের কাজ করে—অর্থাৎ ময়লা বের করে দেয়, বোঝা হয়ে না থাকে।

যারা তোমার প্রশংসা করে, পূজা করে, খোসামোদ করে, তাদের বিশ্বাস করো না। তারা তোমার সর্ব্বনাশ করছে। শিষ্য করো না, কারু সঙ্গে সম্বন্ধ রেখো না, সমস্ত সম্পর্কজাল হতে মুক্ত হও। হয় লেখায় নয় তো ধ্যানে সময়টা কাটুক। যাদের সত্যানুভূতি হয়নি, তাদের বই পড়ো না। সত্যলাভের পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা হচ্ছে খবরের কাগজ, সমালোচক, খোসামুদে বন্ধু-বান্ধব, আর শিষ্যবর্গ। তাদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সম্মোহিত হয়ে তুমি দুঃখের পাথারে পড়। ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক, কবি, বাজে লেখক আর সাময়িক পত্রিকা হচ্ছে সত্য সাধকের মহাশত্রু। সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেল; বাঁধনে জড়িয়ে থাকবে কেন?

মানুষকে ভালবাসা কেবল দুর্ব্বলতা আর জড়ত্ব ছাড়া কিছুই নয়। ভালবাসার এত প্রশংসা শুনি, তার দুটী কারণ। প্রথমতঃ অধিকাংশ মানুষই ওই রোগে জর্জ্জরিত। অতএব সিংহকে চিত্রকর রূপে না দেখে মানুষকে চিত্রকর দেখলে সোয়াস্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, নির্ব্বোধ কবিরা বিশ্বব্যাপ্ত দিব্য প্রেম আর স্বার্থগন্ধি ব্যাক্তিগত ভালবাসাকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে। একের স্তুতি অপরের ঘাড়ে চালান হয়, একের কুৎসিৎ দিকটা অপরের গরিমায় ঢাকা পড়ে—তাই ভালবাসার এত গৌরব।

শক্তিসঞ্চয় করবার জন্য ভালবাসার দরকার হতে পারে; কিন্তু উচ্চ ভূমিতে উঠতে গেলে তাকে বর্জ্জন করতেই হয়। ভালবাসা জিনিষটা কি? এর কি কোনও কেন্দ্র নাই, যে কেন্দ্রকে আশ্রয় করে এ ছড়িয়ে পড়তে পারে? নিশ্চয়ই আছে। এই যে কেন্দ্রচ্যুত আলগা একটা মনোবৃত্তির কথা সবাই বলে, এর মূল্য কি? যে ভালবাসা প্রতিদান চায় না, তাই মহাশক্তির আধার। জগতের বিষয় হতে ভালবাসাকে কুড়িয়ে এনে যদি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলেই তা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আত্মহারা প্রেমই শক্তি।

নক্ষত্রমণ্ডলী যেন গতিশীল; কিন্তু দিকচক্রবালকে স্থির জেনে জ্যোতিষীরা আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করেন। এ না হলে তাঁদের সিদ্ধান্ত সব অনিশ্চিত হত। তেমনি অন্তর্নিহিত ব্রহ্মে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ না করি, আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর যদি বিশ্বাস হারাই, বাজে দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক আর ঐতিহাসিকের হাতের ক্রিড়াপুত্তলী যদি হই, তাহলে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কোনো আইন-কানুনই আমরা ঠিক মত জানতে পারব না।

নিজেই নিজের চিকিৎসক হও, নিজেই নিজের উকিল হও, নিজেই নিজের পুরোহিত হও, এই হচ্ছে কাণ্টের আদর্শ। যে আত্মপ্রত্যয় অপরের বচনে প্রতিষ্ঠিত, সে আত্মপ্রত্যয়ই নয়। "সম্ভাবিত সত্তা" কথাটা হচ্ছে কল্পনার বদহজম; জগতে যদি সত্যিকার কিছু থাকে তো সে "বাস্তব সত্তা"। কাগজের উপর "প্রলয়ের আগুন" লিখে তুলার গদিতে ফেলে দাও, আগুন ধরবে না। কিন্তু সত্যিকার আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ জগৎটাকে ছারখার করে দিতে পারে। গোলাম যে গোলাম, সে-ও স্বাধীন বলেই গোলাম।

পশ্বাচার নামে একটা ভিখারীর ধর্ম্ম আছে; তা হতে তফাৎ! দাতা হও, গ্রহীতা হতে যাবে কেন? ভাব, সবাই মুক্ত। বন্দীও স্বাধীন বলেই

বন্দী; রাজাও স্বাধীন বলেই রাজা। মানুষ সুন্দর, কেননা সেটাও তার আপন খুসী; আবার তুমি কুৎসিৎ, সেটাও তোমার আপন খুসী, অতএব তোমার ক্ষোভ করবার তো কিছুই নাই। কেননা তোমার নাহক্ দাবীও কিছুই নাই, প্রত্যাশাও কিছু নাই। যা ফিরে চাইতে পারবে না, তাই দাও। তুমি ঈর্ষ্যা করতে পার না, কিছু চাইতেও পার না, কেননা তুমি তো জান, যে স্বাধীনতায় তোমার জন্মাগত অধিকার, সেই স্বাধীনতার বলেই অপরের এই সহজ সম্পদ্! অতএব বাসনার নির্ব্বাণে আনন্দ ও কল্যাণের অফুরন্ত উৎস হও। তোমা হতে বিষাদ বা ক্রোধ যেন কখনো না ক্ষরিত হয়।

তুমি প্রবক্তা? আত্মস্বরূপের বেদীতে যখন ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিতে পেরেছ, তখনই তুমি সত্যের পাতকাবাহী হয়েছ, প্রকৃতির রহস্য তখনই তোমার অধিগত হয়েছে।

নিজকে স্বচ্ছ রাখ—জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি তাহলেই তোমার ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হবে। যারা আগ্‌লে রাখতে চায়, খবরের কাগজে নাম খোঁজে, লোকের কাছে হাত কচ্‌লায়, জনমতের পেছনে ছোটে, তারা মানুষের দৈবীপ্রতিভাকে ব্যাহত করে, মানুষের বীর্য্যকে পরাভূত করে।

বাইরের দেবতার কাছে প্রার্থনা কেন? প্রার্থনা কর অন্তরের দেবতার কাছে! দেবতার কাছে যদি বল, "ঠাকুর ওপারটা এপারে এনে দাও"—কিছুই ফল হবে না। কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে নদী পার হবার দৃঢ়সঙ্কল্প কর, ওপারে গিয়ে নিজেই হাজির হবে। নাম-রূপের চেয়ে অধ্যাত্মবিধানের ওপর যার শ্রদ্ধা বেশী, তারই জয় অবশ্যম্ভাবী। ঘটনার স্রোতকে যে বড় মনে করে, সে ঠকে। কর্ম্মের মাঝেও সত্যকে দীপ্ত রাখ মনের সামনে। বাইরের ঘটনায় যেন তোমায় অভিভূত না করে।

সম্মোহনের কবল হতে মুক্ত হও—অপরের কথায় ভ্রূক্ষেপ করো না। জীবনটা একটা ওপর ভাসা চাল মাত্র, জগৎটা কেবল ইন্দ্রিয়ের জুয়া-চুরী। সত্যকে এমনি একান্ত ভাবে অনুভব কর যে তার সামনে এজগৎ তুচ্ছ হয়ে যাক্। মানুষ ঘরেও থাকে না, দালানেও থাকে না; সে আছে নিজের সৃষ্ট নরকে—চারদিক বন্ধ করে, যাতে বাতাসটুকু পর্য্যন্ত না ঢুকতে পারে! এই কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়।

অন্ধকারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দৃষ্টি আপনা হতে খুলে যায়। তেমনি পারি-পার্শ্বিকের আঁধারের প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে যে তাকে জ্যোতির্ম্ময় করে তুলতে পারে, সে-ই ধন্য।

বেরোও নিজের বিবর থেকে! ছড়িয়ে পড়। মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে, মেরুদণ্ড সটান করে দাঁড়াও দেখি! কারু প্রতীক্ষায় বসে থেকোনা—নিজের পায়ে দাঁড়াও। কোন কিছুর ওপর ঠেসান দিতে যেও না। আশা করো না—চেও না—খুঁজোনা! ওম্!

অন্তরঙ্গ-সাধনা

——:(*):——

বাঙ্গালীর সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই বৈশিষ্ট্যের মূল অনুসন্ধান করলে বাঙ্গালীর সাধনায় যে কি আশ্চর্য্য মহৎ উজ্জ্বল অনুভূতি রয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কে বলে বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ, ভাবের উন্মাদনায় তার চেতনা আচ্ছন্ন? বাঙ্গালীর সাধনার মাঝে স্পর্দ্ধা এবং মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ হয়েছে। বাঙ্গালীর ভাব বাঙ্গালীর কাছে স্পষ্ট, সেই ভাবকে রূপ দেবার দরুণই রূপান্তরের সাধনা! এই রূপান্তরের সাধনায় বাঙ্গালী সিদ্ধ হতে পেরেছিল, তাই বাঙ্গালী তান্ত্রিক বৈষ্ণবের কাছে এ জগৎ মায়া নয়, অসত্য নয়। তারা কাউকে প্রত্যাখ্যান করেনি, মাত্র রূপান্তর করে নিয়েছে। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, সকলের মাঝেই এই রূপান্তরের সাধনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এই মৃণ্ময়ী জননীকেই চিন্ময়ী জননীরূপে প্রত্যক্ষ করে ভাব-বিহ্বল নেত্রে অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন। এই রূপান্তরের সাধনায় বাঙ্গালী সিদ্ধ। সাধনক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট দানই হল—এই রূপান্তরের সাধনা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব অতুলনীয় সাধন-সম্পদ্ বলতে গেলে একেই বলা যায়। বাঙ্গালী তান্ত্রিক-বৈষ্ণব সাধন-ক্ষেত্রে তাঁদের আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। স্থূলকে নিয়ে এরূপ ভাবে নির্ভয়ে, নির্দ্বন্দ্বে কেহই নাড়া-চাড়া করতে পারেনি। বীর-সাধক, তান্ত্রিক, তেজস্বী বৈষ্ণবের মাঝে রূপান্তরের বীজ আশ্চর্য্য ভাবে সুপ্ত রয়েছে। স্থূল-সাধনার মাঝেও চিন্ময় ভাবকে কেহই এরূপ অবতরণ করাতে পারেনি। যাদের সাধনার ভিতর এরূপ অসীম স্পর্দ্ধা, অসীম সাহস রয়েছে, ইচ্ছা মাত্রই যারা স্থূল-দেহকে ভাগবত দেহে রূপান্তরিত করবার সাধন-সঙ্কেত জানে, তাদের সাধনা কি নিছক ভাবুকতার সাধনা?

বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ সাধনাই হ'ল, রূপান্তরের সাধনা। এই স্থূল-দেহকেই কি করে ব্রাহ্মী-তনুতে রূপান্তরিত করতে পারা যায়, তার সঙ্কেত বীর-সাধক তান্ত্রিকের কাছে সুপরিজ্ঞাত। এইজন্যই স্থূলকে প্রত্যাখ্যান করেননি তান্ত্রিক। আত্মবল-দ্বারা রূপান্তরিত করে নেবার শক্তি আছে বলেই তান্ত্রিকের কোথায়ও প্রত্যাখ্যান নাই। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বাঙ্গলার গীতি কবিতার এক জায়গায় এ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর কয়টী কথা বলেছেন—'প্রাণের ভিতর অনুভূতি যখন দেহ-মন-প্রাণে একাঙ্গীভূত হয়, তখনই জীবনের রূপান্তর। এ রূপান্তর বুদ্ধের জীবনে হইয়াছিল, যখন বুদ্ধ মহাতপস্যার পর গেহ কারককে নিজের ভিতরেই চিনিতে পারিলেন। এই রূপান্তর চণ্ডীদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি তিমির-অন্ধকার পার হইয়া সহজকে জানিলেন, যখন প্রাণের অনুভূতির কষ্টি-পাথরে 'বিষামৃতের' একত্র মিলন-রেখা মরমের দাগে সোনার নিকষের মত দাগ দিল। রূপান্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন সব ঠাঁইয়ে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফূরণ হইতে লাগিল। এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন, অবোধ বালকের মত মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, কখনো বা

তাঁহাকে গালি দিতেন। এই রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধনা রামকৃষ্ণের ভিতর যেন জীবন্ত রস-মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।'

বাঙ্গলার সাধনার এই বৈশিষ্ট্য যেখানে ফুটে উঠেছে, সেখানেই অধ্যাত্ম-সাধনের কেন্দ্র সৃজন হয়েছে। বাঙ্গলার নিজস্ব-সম্পদই যে এই রূপান্তরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা!

এই দেহকে, এই স্থূল-জগৎকে অনেকেই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছেন, কেউ মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, কেউ তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করে চলেছেন, কিন্তু তান্ত্রিক আর বৈষ্ণবের সুর আলাদা। তাঁরা এই দেহকে, এই জগৎকে ভগবানের লীলাস্থল বলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে গিয়েছেন।

ভাবকে রূপ দেওয়া সহজ কথা নয়, আর সেই রূপ হল দিব্যরূপ, চিন্ময়রূপ। অন্তরের দিক দিয়া কতখানি বিশুদ্ধতা অর্জ্জন হলে পর যে এই শান্ত স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের প্রেরণা পাওয়া যায়, তা আর বল্‌বার নয়। তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবের ভিতর সেই অপ্রাকৃত ভাবের উন্মাদনা নেমে এসেছিল, তাই তাঁরা যাকে-তাকে ধরে উচ্চস্তরে রূপান্তরিত করে দিতে পার্‌তেন।

বাঙ্গলার অন্তরঙ্গ-সাধনা বল্‌তে গেলে দুটো সাধনাই ঠিক অন্তরঙ্গ-সাধনা। তান্ত্রিক আর বৈষ্ণব সাধনায়ই বাঙ্গালী সিদ্ধ। আর দুটোতেই শক্তিরই খেলা মাত্র। শক্তির মাধুর্য্যই হল বৈষ্ণব-সাধনার প্রাণ। এইজন্যই বাঙ্গালীকে জাত-তান্ত্রিক, জাত-বৈষ্ণব বলা হয়।

ভোগের ভিতর দিয়াও কি করে সংযম রক্ষা করা যায়, তা দেখিয়েছেন তান্ত্রিক। কোনরূপ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা শক্তির ন্যূনতা থাকলে স্থূলকে নিয়ে এরূপভাবে নাড়া-চাড়া কর্‌বার সাহসই যে আস্‌ত না। কাজেই বাঙ্গালীর এদিক দিয়া full nervous controll আছে! তাঁরা সত্যকে উদ্ধার করে আন্‌বার দরুণই অপরের পক্ষে ভয়ের স্থলেও ঝাঁপিয়ে পড়্‌তেন।

সবকেই প্রয়োজনে খাটানো, এবং সেই প্রয়োজন কত ঊর্দ্ধ-প্রয়োজনে সার্থক হতে পারে, তা দেখিয়েছেন তান্ত্রিক। আত্মবলে কতখানি বলীয়ান্ হলে পর যে মানুষের এই নির্ভীকতা আসে তা আর বল্‌বার নয়।

প্রত্যাখ্যান করে চলা, অবজ্ঞা করে চলা খুবই সহজ। কিন্তু দরদ দিয়া, সহানুভূতি দিয়া যারা পরকেও আপন করে নিতে পারে তাদের শক্তির কতখানি মহত্ত্ব রয়েছে, তাকি আবার বুঝিয়ে দিতে হয়?

বাঙ্গালী প্রাণ-মন্ত্রে, শক্তি-মন্ত্রে দিক্ষীত। এইজন্যই সকল প্রয়োজনেই বাঙ্গালীর আহ্বান আস্‌ত। আর তাতে বাঙ্গালী কোথাও কুণ্ঠিত হ'ত না! কিন্তু সেই যে প্রাণোপাসনা, অন্তরঙ্গ সাধনা, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে বলেই বাঙ্গালীর আজ এই দুর্দ্দশা। সেই অন্তরঙ্গ সাধনার সঙ্গে সুগভীর ভাবে পরিচয় হলে, আবার বাঙ্গালায় চণ্ডীদাস, রাম প্রসাদ, রামকৃষ্ণের জন্ম হবে।

শক্তিধর তান্ত্রিকই ঔপনিষদিক যুগের বৈদান্তিক! তন্ত্রের মাঝে বেদান্তের democracy-র ভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—বাঙ্গালী বলহীন নয়। কিন্তু কি যেন একটা নেশার ঘোরে যে আবিষ্ট হয়ে আছে। চেতনার সঞ্চার হলেই, আবার সেই বিক্রম, আধ্যাত্মিক জগতে প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ হবে বাঙ্গালীর ভিতর।

"How great God is in small things" এর পরিচয় বাঙ্গালী তান্ত্রিক যত স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন, এমন আর কেউ পারেনি। অতি তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করেও শক্তির কি প্রচণ্ড লীলা দেখিয়ে গিয়েছেন তান্ত্রিক!

তন্ত্রের মাঝে 'শুদ্ধি' কথাটার খুবই ব্যবহার দেখা যায়। এর তাৎপর্য্য কি—না, সেই রূপান্তর! অর্থাৎ আত্ম শক্তি দ্বারা জড়িত করে নিয়ে সবকে গ্রহণ করলেও তাতে অনিষ্টাশঙ্কা থাকে না। প্রচুর প্রাণ শক্তি না থাকলে, যথার্থ 'শুদ্ধি' করতে পারা যায় না। তান্ত্রিক সবকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রথমেই 'শুদ্ধি' করে নিয়েছেন।

আমাদের প্রাণশক্তির দৈন্য ঘটেছে বলেই ভয়টা আতঙ্কটা খুব বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ভয়, এই আতঙ্ক বাঙ্গালীর পক্ষে অস্থায়ী সম্পদ্। তাদের ভিতর অসাধারণ শক্তির কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

আমিই সব কিম্বা সবকে আমার করে নিতে পারব,—এই ভরসা, বা সুদৃঢ় প্রত্যয় যাদের ভিতর রয়েছে, তাদের ভিতর কোনরূপ দুর্ব্বলতা বা ভয় আসতেই পারে না! শক্তি আছে বলেই তারা অনেক খানি প্রশ্রয় দিয়েও চলতে পারে। এই সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের দরুণই সাধনার ভিতর বাঙ্গালীর অপরূপ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বাঙ্গালীর সেই বৈশিষ্ট্যকে জীবনে মূর্ত্ত করে তুলতে হলে আবার আমাদের সেই সহজ সরল অন্তরঙ্গ-সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করে নিতে হবে।

বেদান্তের সাধন

বেদান্তের প্রথম স্বীকার্য্যই হচ্ছে—"ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

তবে তো সাধনা থাকে না। কিন্তু সাধনা তো চাই—নতুবা অধিকারী নিরূপণ কেন? অধিকারী বিচারের দরুণই সাধনার নির্দ্দেশ রয়েছে, তা নাহলে বেদান্তের কোন সাধনা নাই। জীব যে ব্রহ্মই;—কাজেই ব্রহ্মত্ব পাবার দরুণ আবার আলাদা করে সাধনার তো কোন প্রয়োজন নাই! কিন্তু সব জীব তো তার আসল স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

তাই বললেন—সবই ব্রহ্ম বটে, কিন্তু ব্রহ্মে নানা বিভ্রমের অধ্যারোপ হয়ে গেছে। তুমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, কিন্তু মলিন ব্রহ্ম!

এই অধ্যারোপিত মলিনতারই অপবাদ করতে হবে, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ ব্রহ্মের গায়ে কাদা মাখিয়ে তারপর সেই কাদা ধুয়ে ফেলতে হবে।

কোনটাই তাত্ত্বিক নয়—প্রাতিভাসিক; তবু তাকে মানতে হবে; কেননা মায়া অনাদি।

এ এক মজা; কি করে যে ব্রহ্মে মলিনতার অধ্যারোপ হল, তা-ও এক আশ্চর্য্যের ব্যাপার। জীবই ব্রহ্ম—অথচ জীবই আবার তা জানতে পারে না।

আমরা মনে করি, শাস্ত্র-জ্ঞান বুঝি খুব বড় জ্ঞান; আসলে তা নয়। শ্রেষ্ঠ অধিকারীর শুনবা মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। কাজেই এই যে শাস্ত্র, ভাগবত, পুরাণ রচিত হয়েছে—তা কার জন্য জান? যারা আত্মার স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ, শ্রুতি তাদের সম্বন্ধেই কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন।

আসল বিষয় হল উপলব্ধি। কাজেই যতই বচন ঝাড়্‌তে থাক, ততই বুঝতে হবে ব্রহ্মকে তুমি ঠিক ঠিক বুঝনি। উপনিষদের হেঁয়ালীর বচনগুলির মাঝে পরম রহস্য নিহিত। যাঁরা বলেন আমরা ব্রহ্মকে জানিনা, তাঁরাই ঠিক ব্রহ্মকে জানেন, আর যাঁরা বলেন আমরা ব্রহ্মকে জানি, তাঁরা ব্রহ্মের কিছুই জানেন না।

অগাধ শাস্ত্র পাণ্ডিত্যের মোহে পড়ে আমরা মূল কথাটা ভুলে যাই। শাস্ত্রের চেয়ে বড় জিনিষ উপলব্ধি; উপলব্ধি হয়ে গেলে আর কোন সংশয়ই থাকে না, কাজেই তখন এত বাগাড়ম্বর ভাল লাগে না।

ঠিক বুঝি না বলেই, অনুমান সহায়ে চারিদিক থেকে শত শত কূটতর্কের উদ্ভব হয়। আর আমরা পণ্ডিত বলি তাদেরই, যারা কূটতর্কে খুবই ওস্তাদ। কিন্তু আসলে পণ্ডিত যিনি, তিনি বেশী কথা বলেন না।

বৈদিক যুগটা স্বভাব-সিদ্ধের যুগ ছিল। কাজেই স্বরূপ উপলব্ধির দরুণ পৃথক্ করে সাধনার প্রয়োজন হ'ত না। এখন যে সাধন করে নিজকে জান্‌তে হয়, এটা ক্রমোন্নতির লক্ষণ নয় কিন্তু। কিম্বা ভূরি ভূরি শাস্ত্র রচনা দিয়েই উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা শুনবা মাত্র জ্ঞানকে নিজের মাঝে আয়ত্ত করতে পারি না, তাই ভাষ্য, টীকা, টীপ্পনীর প্রয়োজন হয়। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের ব্রহ্ম-জ্ঞানের উন্মেষ হয়ে যেতো, কিন্তু আজকাল কাণের কাছে হাজার বার "তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম" একথা বল্‌লেও বোধ হয় অচেতন ব্রহ্মের সুপ্তি ভঙ্গ হবে না।

কাজেই বুঝ্‌তে হবে আমাদের মাঝে চেতনার অংশ কমে গিয়ে, জড়ত্বের অংশই বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে। এইজন্যই শুনার সঙ্গে সঙ্গে বোধশক্তি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে না।

বাস্তবিকই বেদান্তের কোন সাধন নাই—কিন্তু সাধনের প্রয়োজন মলিনতার অপবাদ। এই মালিন্যের অপবাদ হলেই সূর্য্যরূপী ব্রহ্ম স্বচ্ছ চিদাকাশে সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেন। স্বরূপ-উপলব্ধির প্রতিবন্ধক হয়ে গিয়েছে অনেক; ব্রহ্ম চির সমুজ্জ্বল, কিন্তু মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় তাঁর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে পার্‌ছে না।

শঙ্করাচার্য্যের মত হল ব্রহ্মাত্মৈক্য। জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে অধিকার ভেদ রেখে জ্ঞান-কর্ম্মের বিরোধের একটা মীমাংসা তিনি স্থাপন করে গেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্মজ্ঞানই বেদের প্রতিপাদ্য, তবে নিম্নাধিকারী বা নরত্বাভিমানীদের পক্ষে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করণীয়; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য জোর দিয়েছেন—আত্মোপলব্ধির দিকে। আত্মা জেগে উঠ্‌লে সব দিক সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে।

শ্রদ্ধাবানের শ্রবণ মাত্রেই জ্ঞান লাভ; তাতে যার না হল, সে 'তৎপর' হয়ে অর্থাৎ কারু আশ্রয় নিয়ে জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়; এতেও যার না হয়, বুঝতে হবে, তার ইন্দ্রিয়ের দোষ আছে, তাকে সংযতেন্দ্রিয় হতে হবে—তবে তার জ্ঞান লাভ। গোড়ার কথা হল শ্রদ্ধা। জন্মান্তরের সুকৃতিফলে স্বভাবতঃই যার মর্ম্মে শ্রদ্ধা এসেছে, সে শুনবা মাত্রই পাবে; যার শ্রদ্ধা না হবে, তাকে উল্টো-

দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে সে ইন্দ্রিয় সংযম করবে, তার ফলে মন একাগ্র হবে, তারপর সে পাবে। কাজেই বেদান্তের প্রথম স্বীকার্য্যের অনুভূতি—যারা শ্রদ্ধাবান্ তাদেরই সহজে হয়ে যায়।

বেদান্তের সাধন যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে মনন। এই মননের ওপর জোর দিতে হবে। আত্মোপলব্ধির অভাবে আত্মাও সশঙ্কিত,—কিন্তু সেই নির্ভীক বেদান্তের ভাব দ্বারা আবার সেই আত্ম-জাগরণের সাহায্যই করতে হবে।

শুন্‌বা মাত্র জ্ঞান লাভ হয় না বলেই আমাদের এর চেয়ে নিম্ন পন্থা ধরে চলতে হয়। সেটা আমাদের গৌরবের বিষয়ও নয়, কিম্বা উন্নতির লক্ষণও নয়; বুঝতে হবে চিত্ত আমাদের স্বভাবতঃই অবিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বড় বড় গুরুরা এইজন্য কিছু বলেন না—কেননা তিনি শিষ্যকে আত্মস্বরূপে দেখ্‌ছেন। কিছুই তো অধ্যারোপ করেন নি, অপবাদ করবেন কিসের? নিজকে যেমন নিজথেকে আলাদা ভাবতে পারি না আমরা, তিনিও শিষ্যকে তেমনি আলাদা বলে ভাবেন না। এইজন্যই—

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরুস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥"

প্রত্যেককে ব্রহ্ম-স্বরূপে দেখতে হবে। এই দেখার ফলেই সুপ্ত ব্রহ্মের জাগরণ হবে! কাজেই মানুষ আসলে যা, তার দিকেই জোর দিতে হবে, অধ্যারোপিত ধর্ম্ম তখন আপনি লোপ পেয়ে যাবে। শঙ্করাচার্য্যের process টা হল ভিতর থেকে, অর্থাৎ আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে পারলে ভ্রম-প্রমাদ সব অপসারিত হয়ে যাবে। ভ্রম-প্রমাদ অপসারিত করার আর অন্য কোন উপায় নাই।

বৈদিকযুগে সমষ্টি সাধনার জোরটা খুব প্রবল ছিল বলেই ব্যক্তিগত সাধনার প্রতি তত জোর না দিলেও ক্ষতি হ'ত না। তাঁদের ব্রহ্মোপলব্ধিটা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ছিল; এর দরুণ আলাদা করে তাঁদের সাধন করতে হয়নি। বেদান্তের কোন সাধনা নাই, এ কথা খাঁটী কথা। স্বরূপ-উপলব্ধি যেখানে স্বাভাবিক, সেখানে সাধনার উপদ্রবটা নাই বললেই চলে। কাজেই কষ্ট করে, সাধন করে, আত্মোপলব্ধিটাই চরম নয়। স্বাভাবিক একটা অবস্থা রয়েছে—সেইটাই হল অসাধনের অবস্থা। অথচ এই অবস্থাটা জড়ত্বের লক্ষণ নয়,—পূর্ণ চেতনা থাকলে তবেই এই দুর্ল্লভ অবস্থা লাভ হয়।

চিত্তের জাগরণ নিয়ে হল কথা, আর এই চিত্তের জাগরণের মাত্রা দিয়েই সাধনার পরিমাপ হয়। উন্নত চিত্তের লক্ষণই হল, সে সহজে একটা জিনিষ আয়ত্ত করে ফেলে, অর্থাৎ কোন আয়াসই লাগে না তার; আর সাধারণ চিত্তের লক্ষণ হল, সে একটা জিনিষকে সহজে আয়ত্ত করতে পারে না; সব ক্ষেত্রেই তার অপরিমিত সময় লাগে।

আজ যে আমরা গুরুবাক্যকে শুনেও ধারণা করতে পারি না, তার কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা। বিনা সাধনে, স্বাভাবিক অবস্থায় থেকেও যে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তা আমরা মনেই করতে পারি না। কিন্তু এক যুগ ছিল, যখন সাধনটা ছিল স্বভাব, তাতে কোন আয়াসই ছিল না।

পাণ্ডিত্য বেড়েছে—কিন্তু আত্মোপলব্ধির পথটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমাদের উন্নতি না হয়ে অবনতিই হচ্ছে দিন দিন।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

—:(•):—

ছেলের সঙ্গে ছেলে হওয়ার মাঝে যতটা বিপদ্ আমরা কল্পনা করি, বাস্তবিক ততটা বিপদ্ তার মাঝে নাই। প্রথমতঃ ছেলের সঙ্গে ছেলে হতে গেলেই যে একেবারে অধম ছেলে হতে হবে, এমন কোন কথাই নাই। শিক্ষক যখন ছেলের দলে মিশ্‌বেন, তখন তিনি হবেন ছেলেদের নেতা। এটা অবশ্যি সকলেই লক্ষ্য করেছেন, ছেলেরা নেতার কত খানি ভক্ত। অতি ভাল ছেলেও নেতার ইঙ্গিতে তার বিবেক-বুদ্ধি সব বিসর্জ্জন দিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সুতরাং ছেলেদের মাঝে এই নেতৃভক্তিকে অবলম্বন করেই তাদের হৃদয় জয় কর্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হবে।

এর জন্য চাই তৎপরতা, উদ্ভাবনী শক্তি, আর চাই নিঃসংশয় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করা। সবাই বোধ হয় দেখেছেন, ছেলের দলে যে সব চেয়ে চটপটে, যে নূতন নূতন ফন্দী বের কর্‌তে ওস্তাদ এবং নিঃসংশয়ে প্রভুত্ব কর্‌তে পটু,—সে-ই নেতা হয়ে সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। যদি শিক্ষক এই তিনটার সাহায্যে ছেলেদের মাঝে একবার আধিপত্য স্থাপন কর্‌তে পারেন, তবেই তাঁর কাজ বহু দূর এগিয়ে গেল বল্‌তে হবে। তবে প্রথমতঃ উদ্ভাবনী শক্তি ও তৎপরতার পরিচয় দেওয়া চাই। শিক্ষক ছাত্রদের চেয়ে বেশী ওস্তাদ—এই ধারণাটা একবার তাদের মনে বদ্ধমূল হলে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা কঠিন হয় না। কিন্তু সতর্ক থাকৃতে হবে, দুর্গজয় না করে যেন কেউ প্রভুত্ব কর্‌তে না যান।

আর এই আধিপত্য যখন কর্‌তে হবে, তখন চূড়ান্ত ভাবেই কর্‌তে হবে। একটু ইতস্ততঃ ভাব, লেশমাত্র সংশয় যদি কথায় বার্ত্তায় চালচলনে প্রকাশ পায়, তবেই ছেলেদের নেতার উপর শ্রদ্ধা শিথিল হয়ে যাবে। যাঁরা ধীরে ধীরে অতি বিবেচনার সঙ্গে ছেলেদের মাঝে চলা ফেরা কর্‌তে চাইবেন, তাঁরা বয়সের দরুণ একটা মান তাদের কাছে সম্ভবতঃ পেতে পারেন, কিন্তু তাদের হৃদয় জয় কখনো কর্‌তে পার্‌বেন না। অর্থাৎ তাঁর চেয়ে তরুণ অথচ তৎপর ও নিঃসংশয় প্রকৃতিক ব্যক্তির সঙ্গেই তাদের আত্মীয়তা বেশী হবে।

নেতার গুণগুলি পর্য্যালোচনা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়, ছেলেদের সঙ্গে মিশেও এমন ভাবে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে চলা যায়, যাতে তারা কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না, অথচ শিক্ষকও তাদের কাছে খেলো হয়ে যান না।

মোটকথা, শক্তির পরিচয় দেওয়া চাই। জগতে সবাই শক্তির ভক্ত—বিশেষতঃ বালকদের তো কথাই নাই। এই শক্তি যদি উৎপীড়নে ব্যয়িত না হয়ে নেতৃত্বে ব্যয়িত হয়, তবে শাসন সম্পর্কে একটা মস্ত বড় সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। মা যে ছেলের আশ্রয়, তা শুধু এই শক্তির প্রকাশে। যে মা শক্তি পরিচালনা কর্‌তে পারেন না, তিনি ছেলেকে অফুরন্ত স্নেহ দিয়েও বশ কর্‌তে পারেন না। আবার যিনি এই শক্তির অযথা পরিচালনা করে একে আতঙ্কের ব্যাপার করে তুলেন, তিনিও সদ্বিবেচকের কাজ করেন না

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, বাইর থেকে ছেলের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে যিনি তার হৃদয় জয় করতে চান, তাঁকে নেতৃত্বকৌশল শিখতে হবে।

এই যে নেতৃত্বের কথা বললুম, এর পত্তন করতে হবে ছেলের অভাবের দিক চেয়ে। ছেলেরা নিজের গরজেই কিছু না কিছু চায়। তাদের এই আপন ইচ্ছাটুকুকে খুসীমত খেলিয়ে নেওয়াতেই হয়েছে নেতৃত্বের ওস্তাদী। ভয় নাই, ছেলেদের নিজের ইচ্ছা বহাল রাখতে হচ্ছে বলে তাতে যে ওরা উচ্ছৃঙ্খল হবে, এমন কথা নয়। ছেলেরা কতটুকুই বা চাইতে জানে? ওদের শাদা মন; কি করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে হয়, তা না শিখালে নিজেরা বুঝতে পারে না। ওদের অভাব আর অভিযোগ দৈনন্দিন সুখ দুঃখ নিয়ে; তাতে জন্মার্জ্জিত সংস্কারের কিছু কিছু যোগ থাকে বটে; আচার্য্যকে ও গুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আচার্য্য-গিরির যত কিছু কসরত, ওই সংস্কারমূলক ইচ্ছাগুলির সংস্কারের উপর। প্রয়োজনমত ওদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে, কিম্বা খর্ব্ব করতে হবে। কিন্তু তা এমন ভাবে করতে হবে, যাতে ব্যাপারটা আগাগোড়া সহজ বলে অনুভব হয়। ছেলেদের ভুলিয়ে ভালিয়ে পথ চালাতে হবে চলার আনন্দে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তা যেন ওরা বুঝতে না পারে। সু-ইচ্ছাগুলিকেও যেমন সহজ-আনন্দে পরিপুষ্ট করতে হবে, কু-ইচ্ছাগুলিকেও তেমনি সহজ আনন্দে দমন করতে হবে।

কিন্তু এ তো গেল ছেলের দিকের কথা। এখন আচার্য্যের দিকের কথাটারও বিচার করতে হবে। অনেকগুলি বৃত্তি আছে, যা নাকি ছেলের মাঝে স্ফুরিত হয়নি; অর্থাৎ সে সম্বন্ধে ছেলে কোনও অভাব অনুভব করছে না। কিন্তু স্ফুরণের অভাব যদি আচার্য্যের কাছে পীড়াদায়ক বলে মনে হয়, তবে এই অভাবটা হবে আচার্য্যের গরজে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্ত অভাব কি করে জাগানো যায়।

যে বৃত্তিরই স্ফূরণ আমরা দেখতে চাই না কেন, তারই একটা ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। আমরা অনেক সময় তার পরিণত ভাবটাকেই আদর্শ বলে মনে করে ছেলেদের মাঝে তাকেই ফুটিয়ে তুলতে চাই। এই যেমন ছেলের মাঝে ভক্তির উন্মেষ করতে হবে; এখন ভক্তির যে তন্ময়তা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি অঙ্গ-সাধনার আবেগে প্রকাশ পায়, তার সবগুলিই যদি পূর্ণ মাত্রায় ছেলের মাঝে বিকশিত দেখতে চাই, তবে চাওয়ার একটু বাড়াবাড়ি হবে। অনেক সময় এই ভুলটা আমরা অতি সহজেই করে ফেলি। একেবারে ছেলেকে যীশু বা গৌরাঙ্গ করে তুলবো, এমন আব্দার করাটা ঠিক নয়। এতে কেবল কৃত্রিমতার শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং রসের ভজনকেও শুষ্ক পরিচালনার দোষে নীরস করে তোলা হয়। বাধ্যতার কড়াকড়িতে ছেলেরা হয়ত কতগুলি কসরৎ শিখবে, এবং প্রাণহীন যন্ত্রের মত তা আবৃত্তি করে যাবে। এমনি করে অতি শৈশবেই প্রাণকে সঙ্কুচিত করে প্যাটার্ণ মত সাধু তৈরী করা বিশেষ কঠিন নয় বটে, কিন্তু এই সব ধারকরা সাধুত্ব কতদূর টেঁকসই হবে, তাই বিবেচ্য।

প্রবাহ

—)•(—

জীবন-প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে অবিরাম গতিতে। কোথায় জীবনের আরম্ভ, কোথায় বা তাহার শেষ কে বলিতে পারে? কোন্ এক স্মরণাতীত যুগে আরম্ভ হইয়াছে জীবনের গতি, আবার কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে কে জানে? স্রোতস্বতীর উদ্ভব হয় পাষাণের কোন্ নিভৃত প্রদেশে, তমিস্র কন্দরে। পাথরের ঘরে খেলিতে খেলিতে, আঁকিয়া-বাঁকিয়া দিবস-রজনী বহিয়া বহিয়া নামিয়া আসে সানুদেশে; তারপর কত বন, কত উপত্যকা, কত পার্ব্বত্য-প্রদেশ, কত সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া কত দিনে কত যুগ পরে শেষ হয় তাহার গতির। তেমনি করিয়াই বহিয়া চলিয়াছে এই জীবনের প্রবাহ। কত বাধা, কত বিঘ্ন তাহার পথে রোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে, পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা দেখিয়া ভয় হইতেছে আর বুঝি পারি না। ধূ ধূ মরুর উপর দিয়া যাইতে যাইতে মনে হয়, বুঝিবা এখনই স্রোত শুকাইয়া যাইবে; এমনি করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে জীবনের প্রবাহ। জানি না, কবে এই প্রবাহের শেষ!

শাস্ত্র জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, মহাপুরুষেরাও তাহার সমর্থন করিতেছেন। মাঝে মাঝে কথাটার সত্যতাও উপলব্ধি করি। বাস্তবিকই যখন ভাবি—আমি কে, জীবনটা কি, এ সংসারটা কি, কেমন করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি হইল, তখন যেন সব গুলাইয়া যায়। মনে হয় সবই প্রহেলিকা! ক্ষুদ্র জীব আমরা, প্রত্যেকে নিজের গণ্ডী লইয়াই ব্যস্ত, ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেছি, অপরের দিকে দৃক্পাত করিবার অবসর মিলিতেছে না। এমনি করিয়া এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কত ব্যষ্টি-জীবন আকুলি-বিকুলি করিয়া ফিরিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে?

এই বিশ্ব-সায়রে কেমন করিয়া এক একটী জীবন ফুটিয়া উঠিল, কেমন করিয়া তাহাদের মাঝে ব্যষ্টি অনুভূতি জাগিয়া উঠিল, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সৃষ্টি হইল, এসব কথা চিন্তা করিতে গেলে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্ত ধারণায় অসমর্থ হইয়া অবশ হইয়া আসে। কত যুগ হয়ত পূর্ণ অজ্ঞানতায় কাটিয়া গিয়াছে, কত যুগ হয়ত অর্দ্ধ নিদ্রিত, অর্দ্ধ জাগরণাবস্থায় গত হইয়াছে, আবার আজ যে অস্ফুট স্মৃতির জাগরণে এত সব কথা মনে হইতেছে, হয়ত এমনিতর জীবনই আরও কতদিন কাটিবে! জানি না কবে পূর্ণপ্রজ্ঞা ফুটিয়া উঠিবে, জানি না কবে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে!

দিনের পরে রাত্রি, রাত্রির পর দিন, সৃষ্টির পর ধ্বংস, ধ্বংসের পর সৃষ্টি, ইহাই জগতের আবর্ত্তক্রম। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের পরিবর্ত্তন হইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একের স্থান অপরে অধিকার করিতেছে; কাল যাহা দেখিয়াছিলাম আজ তাহা নাই, আজ যাহা দেখিতেছি, কাল তাহা থাকিবে না, এ জগতে শুধু পরিবর্ত্তনেরই খেলা। ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-জীবনও ঠিক এই ক্রমেই আবর্ত্তিত। বিরাট বিশ্ব যে নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা, ক্ষুদ্র ব্যষ্টিজীবনও তাহারই কুক্ষিগত। একটা

জীবন আর কতটুকু? কিন্তু এই এতটুকু জীবনের মাঝেই যে কত বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, কত বাধা-বিঘ্ন, কত শান্তি-অশান্তি, আনন্দ-নিরানন্দ, হাসি-কান্নার উদ্ভব বিলয় হয়, তার তো ইয়ত্তা নাই!

শুনি নাকি ভগবান্ লীলাচ্ছলে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি একা ছিলেন, আপনার আনন্দে আপনিই বিভোর ছিলেন, কিন্তু এই আনন্দ একা ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না বলিয়া তাহা অপরের মাঝেও সঞ্চারিত করিবার জন্য এই জীব-জগতের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু কই, এ জগতে তো আনন্দের কণাও দেখিতেছি না? এখন হয়ত একটু আনন্দে হৃদয় ভরপূর হইয়া উঠিল, পূর্ব্বের ব্যথা-বেদনার দাগ মুছিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যে আবার সেই রৌদ্র-লীলারই অভিনয় চলিবে। তবে কি জীবকে ব্যথা-বেদনা, হাসি কান্না, দুঃখ-কষ্টের আবর্ত্তে ফেলিয়াই ভগবানের আনন্দ? এই কি তাঁর লীলা?

দুঃখ-ব্যথা-বেদনা যে জীবনের নিত্য সঙ্গী, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বুকে হাত দিয়া সকলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রত্যেক জীবনেরই দুইটী করিয়া দিক্ রহিয়াছে—একটী ভিতর, আর একটী বাহির। বাহিরে হয়ত আমি বেশ হাসি-খুসিতে সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা করিতেছি, কিন্তু অন্তর যে আমার দুঃখের—নিরানন্দের—নিরাশার তুষানলে জলিয়া পুড়িয়া খাঁক্ হইয়া যাইতেছে, তাহাতো আর বুক চিরিয়া দেখাইবার উপায় নাই। জগতের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে গেলে আমাকে যে দুইটী দিকই বজায় রাখিতে হইবে।

দুঃখ-কষ্ট যে মানুষের নিত্যসঙ্গী—তাহা মানুষ মাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেনও। জীবনের যদি কিছু সত্য সত্তা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা এই দুঃখ। ইহাকে ধামা চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার উপায় নাই, প্রলেপ দিয়া এ যন্ত্রণা নিবারণের প্রয়াস নিষ্ফল। দুঃখ-যন্ত্রণা মানুষের নিত্য সঙ্গী বলিয়াই ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এত দর্শনের সৃষ্টি, এত পথ এত মতের উদ্ভব। এই প্রবহমান দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য কত মনীষী কত পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, কত মহাপুরুষ কত সহজ পথের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কই, জগতের দুঃখ-অশান্তির তো নিবৃত্তি হইতেছে না। হয় ত মুষ্টিমেয় কয়েকটীর তাহাতে উপকার হইয়াছে, হয় ত সেই কয়জন শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে, কিন্তু এই যে বিরাট বিশ্ব অশান্তির দাবদাহে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতীকারের উপায় কি? শুধু একদিক দিয়াই যে জীবন ক্লিষ্ট, তাহাও তো নয়; দেহে মনে প্রাণে সর্ব্ব ক্ষেত্রেই যে জীবন দুঃখময়। হয় ত কাহারও উদারান্নের ব্যবস্থা নাই, কাহারও পরিধেয় সংস্থানের উপায় নাই, কাহারও বা মাথা গুঁজিবার স্থান টুকুরও অভাব। এই তো গেল দৈহিক দুঃখের কাহিনী। তারপর মনের প্রাণের। মন-প্রাণের দুঃখ কার কতটুকু, সে খোঁজ আমরা বড় কেউ কারো রাখি না, কিন্তু নিজের বুকের ব্যথা-বেদনা দিয়াই বুঝিতে পারি, জীবনে তাহার প্রভাব কত খানি! মনের দুঃখ, প্রাণের জ্বালা নিজের কাছে। বাহিরের দুঃখ নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেও এই আন্তরিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি? এই হিয়া ধক্‌ধকি পরাণ-পোড়ানি জ্বালা প্রশমনের পন্থা কি?

* * * *

বাহিরের সকল ভুলিয়া কতক্ষণ যে এই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম জানিনা। সহসা চিন্তার স্রোত রুদ্ধ

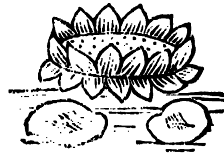
হইল, চমক ভাঙ্গিল। সূর্য্যদেব কতক্ষণ হইল অস্ত গিয়াছেন, পশ্চিমাকাশ তখনও লোহিত রাগে রঞ্জিত। সান্ধ্যসমীর ধীরে বাহিয়া যেন চিন্তাক্লিষ্ট দেহ মনের উপর শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিতেছে। দেখি, স্রোতস্বতী তখনও কুল কুল করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সে যেন বলিয়া যাইতেছে—ওগো চিন্তাতুর! এই ভাবে বহিয়া যাওয়াই আমার স্বভাব, জগতের স্বভাব। নিজের দিকে চাহিও না, নিজের কথা ভাবিওনা। তোমার যা আছে সবটুকু পরের তরে বিলাইয়া দাও, দেহ মন প্রাণ সব পরার্থে উৎসর্গ করিয়া সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হও—দুঃখ যন্ত্রণা থাকিবে না, বন্ধন বলিয়া কিছু থাকিবে না।

হৃদয় হইতে ধ্বনিত হইল বিমূঢ় শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুর চির পুরাতন আদেশ বাণী—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমাহপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত!

হৃদয় জোড়া হাহাকার প্রশমনের সমাধান মিলিল:—

সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না, শোক বেদনা সব আসিবেই! সমগ্র বিশ্ব রহস্যময়, সমগ্র বিশ্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ; বিশ্বের প্রত্যেকটী জীবনও রহস্যময়, প্রত্যেকটী জীবনও রহস্য পূর্ণ। প্রবাহাকারে বহিয়া চলিয়াছে এই জীবনের গতি, কখন কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া তাহাকে যাইতে হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই, বুঝিবার উপায় নাই। প্রকৃতির আবর্ত্তনে যখন যে অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে, মানুষকে সেই সেই অবস্থা অতিক্রম করিতেই হইবে। যতই সাধন ভজন কর, যতই দর্শনের আলোচনা কর, সুখ-দুঃখ তোমার নিত্য সঙ্গী, ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। উন্মুক্ত আকাশের বুকেও কত ঝড় বাদল, বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির কত প্রলয় নর্ত্তন চলিতে থাকে, কিন্তু আকাশ সর্ব্বাবস্থায় প্রশান্ত, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার। হৃদয়কে উদার কর, উন্মুক্ত কর, সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার চক্রাবর্ত্তে না পড়িয়া দ্রষ্টৃস্বরূপে তাহাদের খেলা দেখিয়া যাও, আকাশের মত দ্বন্দ্বাভিঘাতে নির্ব্বিকার থাক, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, ভাল-মন্দ, সবই মঙ্গলময়ের দান বলিয়া হাসি মুখে সে সব মাথা পাতিয়া গ্রহণ কর। দুঃখ আর দুঃখরূপে বাধা দিবে না, সুখ আর সুখরূপে মোহে ডুবাইয়া রাখিবে না, সকলই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে আনন্দে! ওঁ আনন্দম্!



ব্রহ্মপুত্র-তীরে

—)•(—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"পরেশ! সে দিন তো বুঝি আমাদের **যম** নিয়েই আলোচনা হয়েছিল—কেমন, না?"

পরেশ।—"হাঁ রমেশ দা, সে দিন আর সময় ছিল না বলে তুমি বলেছিলে, আর একদিন বেড়াতে এসে **নিয়ম** সম্বন্ধে আমাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবে। আশ্চর্য্য রমেশ দা, তোমার সেদিনের উপদেশ শুনে এবং তা শ্রদ্ধার সহিত পালন করে আমি আশাতীত ফল পেয়েছি। আমার মনে হয়, জীবনকে উন্নত-বিশুদ্ধ করতে হলে কথার চেয়ে সত্যিকার কাজের বেশী প্রয়োজন। এতদিন practically কিছু করিনি, তাই যোগের মর্ম্মও কিছু বুঝিনি। আর বুঝ্‌বার চেষ্টাই বা জাগ্‌বে কেমন করে, যোগের প্রক্রিয়া তো সাধারণের দরুণ নয়, বিশেষ বিশেষ অধিকারীর দরুণ। কাজেই এক এক সময় যোগ করতে ইচ্ছা গেলেও, ঐ ভয়েই বা অযোগ্যতার কথা মনে হয়েই আমরা সবাই যোগ থেকে পিছিয়ে পড়ি। কিন্তু তুমি যে-কয়টী উপদেশ দিয়েছ রমেশ দা, আমি তো দেখ্‌ছি এই কয়টী উপদেশ সার্ব্বভৌম ভাবে সকলেই পালন করে চল্‌তে পারে। তোমার মত এরূপ দু'চার জন যদি অগাধ শাস্ত্র-জলধি মন্থন করে অতীব প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ উপকারী কয়টী নিয়ম-প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে, আর সাধারণকে তা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে দেশের তাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে বলে আশা করি।"

রমেশ।—"আমি কোন প্রশংসা বা সুখ্যাতির প্রয়াসী নই। শ্রদ্ধার সহিত কয়টী নিয়ম পালন করে এর উপকারিতা বুঝেছি, তাই নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তোকেও আজ প্রাণ খুলে দুটো উপদেশ দিতে পার্‌ছি। আমারও কেবল এই দুঃখ হয়, আর্য্য-ঋষিদের প্রণীত শাস্ত্রাদিতে যে কত অমূল্য রত্ন পড়ে রয়েছে; তা আর বল্‌বার নয়; কিন্তু সে রত্ন উদ্ধার করার মত সাধু-প্রকৃতির লোক কোথায়? অবশ্য শাস্ত্রাদিতেও অনেক অপ্রয়োজনীয়, অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ রয়েছে, তা থাক্‌বেই, কিন্তু তা থেকে বেছে বেছে এমন সব রত্ন উদ্ধার করা যায়, যা থেকে সকলই কিছু না কিছু ফল পাবেই। আর একটা বিশেষ লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় হল এই যে, কোন কিছুই—বিশেষতঃ যোগের প্রক্রিয়াগুলি—নিজে হাতে-নাতে (practically) না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই ফল পাওয়া যায় না। কালিদাসের একটী শ্লোকেও আছে

"কেবল মাত্র মূঢ়েরাই পর-প্রত্যয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে চলে।" কাজেই নিজে প্রত্যক্ষ কিছু না করলে ফল পাওয়া দুষ্কর। থাক্, আর বিবৃতির প্রয়োজন নাই, এখন আমাদের প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্।

"সে-দিন আমরা পঞ্চবিধ **যমের** কথা বলেছিলাম, আজ পঞ্চবিধ **নিয়মের** কথা বলব। পাতঞ্জলে একটা সূত্র আছে—"শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।" শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পঞ্চবিধ ক্রিয়ার নাম **নিয়ম**। এখন এক একটী করে তার ব্যাখ্যা করছি, মন দিয়ে শোন্। প্রথমেই—

শৌচ—(Keep your body clean and your mind also.)

দেহ এবং মনকে বিশুদ্ধ রাখা চাই—তবেই যোগ করে ফল পাবি। এখন শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্যাভ্যন্তরঞ্চ। বাহ্য শৌচ হল—মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কৃত থাকা, সত্ত্ববুদ্ধি-বর্দ্ধক দ্রব্যাদি ভোজন করা; আর আভ্যন্তর শৌচ হল—"মৈত্র্যাদিভিশ্চিত্ত-মলানাং প্রক্ষালনম্।" চিত্তের যে মালিন্য, তা তো মৃত্তিকা কিম্বা জল দ্বারা অপনোদন করা যায় না, কাজেই চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হবে মৈত্রী-ভাবনা দ্বারা। এখানে একটু জ্ঞানের প্রয়োজন, স্থূল বুদ্ধি নিয়ে বিচার করলে এখানে চলবে না। ভিতরে rational element থাকা চাই। গায়ের জোরের সঙ্গে মনের জোরও থাকা চাই। মনের ময়লা শারীরিক জোরে ধুয়ে-মুছে যাবে না, মনের ময়লা কেটে যাবে মনেরই জোরে। এইজন্যই দৈহিক শক্তি আর মানসিক শক্তি উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। মনের জোর না থাকলে মৈত্রী ভাবনা করা যায় না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার এক-জন অহিত করছে, তবু তার সঙ্গে মিত্র-ব্যবহার করা, এ কি সহজ কথা? স্বভাবতঃ মানুষের মন অন্যায়ের প্রতিকারার্থে উত্তেজিতই হয়ে উঠে, কিন্তু উত্তেজনাকে আত্ম-শক্তি দ্বারা বশীভূত করে রাখতে হলে মানসিক জোরের খুবই প্রয়োজন। বিশেষতঃ যুবকদের শারীরিক শক্তিটা বেশী, তাই স্থূলতঃই তারা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার দরুণ ব্যগ্র হয়ে ওঠে; এইজন্যই দেখি অনেক বিপ্লব-পন্থী গান্ধীকে বিশেষ-ভাবে নাকচ করে চলে। কিন্তু গান্ধীর policy আলাদা, অপরের অন্যায়ের দরুণ তিনি নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করেন, এতে কি হয়—নিজেরই চিত্ত উন্নত হয়। আর এই উন্নত চিত্তের প্রভাবেই মানুষ অধর্ম্ম থেকে, অন্যায় থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে আসে। তবে এ কথা ঠিক, এতে অনেক সময় লাগে। অসুরকে পরাস্ত করতে দেবতাদেরও নাকাল হতে হয়।

"আমি এমন অনেক যুবকের কথাই জানি, তারা খাওয়া সম্বন্ধে বেশ নিয়ম-

কানুন মেনে চলে, কিন্তু তবু তাদের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কমে না বলে আমার কাছে অভিযোগ জানায়। শুধু সাত্ত্বিক খাওয়াতেই সব কার্য্যসিদ্ধি হয় না—সাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা সব চেয়ে কার্য্যকরী হয়। অবশ্য সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক চিন্তার সহায়তা করে বটে, কিন্তু শুধু আহারেই কিছু হয় না। এমন অনেক আছে—বেশ শুদ্ধাহার করে, কিন্তু মনে মনে এমন সব অহিতকর চিন্তা করে তা আর বল্‌বার নয়। এইজন্যই শৌচ বল্‌তে বাহ্যাভ্যন্তর উভয়ই বুঝায়। এই তো গেল শৌচ। তার পর দ্বিতীয় হল—

সন্তোষ—(Always remain cheerful and contented)

এখানে পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের রাত দিন পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য-জাতির আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। বিনা চেষ্টায় যা লাভ হবে, তাতেই তৃপ্ত থাকা, এ কিছুতেই পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ প্রাচ্যের আদর্শ হল অল্প আয়োজনে প্রভূত আনন্দ লাভ করা। প্রাচ্যের লক্ষ্য আন্তরিক তৃপ্তির দিকে, তাই তার বাহ্যোপকরণের দিকে তেমন লোলুপ দৃষ্টি নাই। অল্পে তৃপ্ত থাকাকে অনেকেই দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলে। পাশ্চাত্য জাতি তো আমাদের এইজন্যই বিশেষ ভাবে দোষ দেয়, কেননা আমরা ফকিরী খুব ভালবাসি। কিন্তু আসল কথা তা নয়; চিত্তের শান্তি, সুখ এই হল আমাদের লক্ষ্য। বেশী ঐশ্বর্য্য জুটিয়ে, বহুদেশ জয় করে, একচ্ছত্রাধিকার লাভ করেও যদি অন্তরে সুখ না থাকে, তাহলে সেই রাজত্বের তো কোন মূল্যই থাকল না। ভাগ্যে যা জুটবে তাই নিয়ে পরম সন্তোষে দিন অতিবাহিত করতে হবে, এই বল্‌লে যে আল্‌সেমি কুঁড়েমি করে দিন কাটাতে হবে তা নয়। সন্তোষ জিনিষটী ভগবৎ প্রদত্ত দান। অর্থ আছে, ধন-জন সবই আছে, কিন্তু চিত্তের প্রসন্নতার অভাবে অনেকের দিনই দুঃখ নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ জায়গায় আমাদের নিদারুণ অভিশাপ। সকল অবস্থাতে চিত্তের প্রসন্নতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলা, এ-ও মস্তবড় সাধনার বিষয়। কাজেই দুঃখ, দৈন্য, আঘাত সবের মাঝে আনন্দ চিত্তে, ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে লক্ষ্য-সিদ্ধির পথে এগিয়ে চল্‌তে হবে আমাদের।”

পরেশ। —“আচ্ছা, রমেশ দা, তাহলে তো দেখ্‌ছি মানুষের উন্নতির দরুণ সকল রকম উপদেশই রয়েছে শাস্ত্রে। তাহলে আসল দোষই হল আমাদের এই যে, আমরা শাস্ত্রবাক্যকে শ্রদ্ধার সহিত মেনে চলি না। তুমি যে সব কথা বল্‌লে, এতো ইচ্ছা কর্‌লে সবাই পালন করে চল্‌তে পারে।”

রমেশ।—“হাঁ, তুই যা বল্‌ছিস্ পরেশ, সবই খাঁটী কথা। কিন্তু মানুষের মাঝে সে ইচ্ছারই যে উদ্বোধন হয় না। এর কারণ কি জানিস্? আমাদের মাঝে প্রকৃত

কর্ম্মীর (অর্থাৎ যাঁরা নিজে প্রক্রিয়াদি করে ফল লাভ করেছেন) চেয়ে উপদেষ্টার সংখ্যাই বেশী। উপদেষ্টার উপদেশ এবং জীবনের মাঝে অসামঞ্জস্য দেখেই শাস্ত্রের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে যায়। এইজন্যই আমাদের এখন নীরব ভাবে কর্ম্ম করে যাওয়া প্রয়োজন। মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে—আর বিশ্বাস উৎপাদন করা সহজ কথা নয়। যোগ করে যারা প্রত্যক্ষ কোন কিছু অনুভব করেনি, তাদের বুকে অপরকে ভরসা দেবার বলই যে আসতে পারে না। তারপর নিজে যারা কিছু করে না, তাদের কাজই হল শাস্ত্র থেকে অলৌকিক সূত্রগুলি বেছে বেছে নেওয়া আর তার গুণ ব্যাখ্যা করা। বিভূতি-পাদে এমন অনেক সূত্র আছে, যা নাকি আজগুবিও বলা যায় কিম্বা চিত্ত শুদ্ধি হলে স্বাভাবিকই তার সঙ্গে অনুভূতি মিলে যায়। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি করবার যে সব সহজ অথচ সার্ব্বভৌম উপায় রয়েছে, সে দিকে তারা মোটেই লক্ষ্য করে না।

যাক্, আমাদের বক্তব্য বিষয়টা শেষ করে ফেলি, তারপর যোগ সম্বন্ধে আনুসঙ্গিক অনেক কথাই হবে। "শৌচ" গেল, "সন্তোষ" গেল, এখন তৃতীয় হল—

তপঃ—(Train up your system to co-operate with the mind)

তপস্যা অনেক রকমেরই রয়েছে। তবে মনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত systemকে তদুপযোগী উন্নত-বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। মনের সঙ্গে সঙ্গে চাই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ঠিক ততখানি উন্নত করে নেওয়া, অর্থাৎ মন যখন উচ্চ ভূমিতে বিচরণ করে, তখন যেন দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি কিছুই তার পরিপন্থী হয়ে না দাঁড়ায়; এইজন্যই তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যার আসল লক্ষ্যই হল সবের মাঝে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তপস্যা বল্‌তে যে কেবল হেট মুণ্ড হয়ে থাকাকেই বুঝায়, তা নয়। আমার কথা হল এই যে, দেহ-মনকে এরূপ ভাবে গঠিত করে নিতে হবে যেন সময় সুযোগ উপস্থিত হলে দু'জনে মিলে পূর্ণ শক্তিতে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যেতে পারে। এরই নাম তপস্যা। তারপর চতুর্থ হল—

স্বাধ্যায়—(store and assimilate good thoughts.)

অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নামই স্বাধ্যায়। তা না হলে প্রণব প্রভৃতি বেদমন্ত্রের উচ্চারণকেই স্বাধ্যায় বলে না। বেশ যাচাই করে, ভাল ভাল চিন্তাকে হজম করে নিতে হবে, পরিপাক করে নিতে হবে। নিজের চরিত্রকে উন্নত করতে হলে মহৎ চিন্তা, মহাপুরুষের উপদেশবাণীও যথেষ্ট সাহায্য করে। এইজন্যই রোজ কয়েক খানা ভাল ভাল বই বেছে নিয়ে পড়তে হয় এবং তা থেকে কল্যাণকর

চিন্তা গুলিকে মনের মাঝে বেশ ভাল করে সংস্কারবদ্ধ করে নিতে হয়। আত্মোন্নতিই চরম লক্ষ্য ; কাজেই যাতে আত্মার হিত হয়, সে সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে মনের মাঝে বিশেষ করে জাগ্রতোজ্জ্বল করে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হবে।

নিয়মের শুধু আর একটী কথা বাকী। সেটীই হল—

ঈশ্বর প্রণিধান—(Love God) ঈশ্বর-প্রণিধান বল্‌তে ঈশ্বরকে ভালবাসা। তোমার যেমন খুসী, যে ভাবে তুমি সুখ পাও, আনন্দ পাও, সেই ভাবেই তাঁকে ভালবাস্‌তে চেষ্টা কর। কাজেই ঈশ্বর-প্রণিধানের মাঝে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রয়েছে। ভগবান্‌কে যে ভাবে ভালবেসে চিত্তের উন্নতি হয়, সেই ভাবেই চল্‌তে হবে। শ্রদ্ধা, ভক্তি এ সব বড় জিনিষ তোমার নাই বা এল, কিন্তু নিছক ভালবাসা দ্বারা ভগবান্‌কে করায়ত্ত করা যায়। কাজেই প্রণিধান বল্‌তে জ্ঞানীর মত অর্থ না করে আমি বুঝি ভগবৎপ্রীতি বা ভগবানে অহেতুক ভালবাসা !

আজ এই পর্য্যন্তই থাক্, কেমন ভাই পরেশ ! আর একদিন এসে যোগের পথে কোন্ কোন্ শত্রু এসে দেখা দেয়, তারই কথা বল্‌ব। সে সব শত্রু ভূত, প্রেত, পিশাচ নয়। প্রত্যক্ষ যা দেখ্‌তে পাই তারই কথা বল্‌ব।

আজ কথা প্রসঙ্গে অনেক রাত্র হয়ে গেল। আর দেরী করা চলে না। এখন চল ভাই পরেশ, বাড়ীর দিকে রওনা হই।"

পরেশ।—"রমেশ দা, তোমার উপদেশ শুনে যে আর জ্ঞান থাকে না, তুমি বল্‌ছ রাত্র হয়ে গিয়েছে, অথচ আমার কিন্তু সে দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। আমি কেবল তোমার দিকে চেয়ে কান পেতে, তুমি যা বল্‌ছ নির্বিষ্ট চিত্তে তাই শুনে যাচ্ছি। কি আর বল্‌ব ! যোগ সম্বন্ধে এমন সহজ অথচ প্রাণস্পর্শী উপদেশে কেউ তো আমাকে এমন আকৃষ্ট করতে পারেনি।

আর একটী কথা বল্‌তে সঙ্কোচ হচ্ছে, কি জানি, তুমি কি বল। আমার সঙ্গে আর একটী—আমারই বন্ধু বেড়াতে আস্‌তে চায়। তাতে কি তোমার কোন আপত্তি বা বিঘ্ন হবে ?"

রমেশ।—"বিঘ্ন আর কি হবে, তবে আমি দল বাড়াতে চাই না। দু'টী একটী আমার এই উপদেশ শুনে যথাযথ ভাবে প্রক্রিয়াগুলো করুক, তবেই আমার শ্রম সার্থক। তা যদি তোর বন্ধু একান্তই আস্‌তে চায়, তা হলে সঙ্গে নিয়ে আসিস্। কিন্তু সাবধান ! আড়ম্বরকে আমি বড্ড ভয় করি। আর আমার তেমন পুঁজিই বা কোথায় ?"

পরেশ।—"তা তুমি যাই বলনা কেন—আর বিনয় দেখাও না কেন, তোমাকে আমরা কিছুতেই ছাড়ছিনা রমেশ দা।"

(ক্রমশঃ)

কাজ কোথায় ?

—)•(—

মনের আমার নাই ঠিকানা খুঁজছে বিফল স্বপ্নকে,
পরাণ গেল পাইনে খুঁজে প্রাণ মায়ের রত্নকে।

বাঙ্গালীর যোগ্য গানই বটে! ভাবের ঘোরে তার মনের ঠিকানা সে নিজেই জানে না, অপরে তো দূরের কথা। যার মনের ঠিকানা নেই, কাজের ঠিকানা তার আর কি করে হবে? তাই বাঙ্গালার ভাত খেয়ে বাঁচে পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, এমন কি চীনা, জাপানী প্রভৃতি বিদেশী পর্য্যন্ত। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন নাই, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ঘোচে না। অথচ ভাবুক বাঙ্গালীর গানের সীমা নাই।

ভাবুক বাঙ্গালীই প্রথমে বিদেশীকে ডেকে এনেছিল, আবার তাকে বিদায় দিতেও ভাবুক বাঙ্গালীরই জাঁকজমক বেশী। অথচ সে চিরদিনই বিফল স্বপ্নকেই খুঁজে আস্‌ছে। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নাই, তাই বাঙ্গালার কবি সঙ্কট সময়েও শুধু স্বপ্নই দেখেন, বিদেশে থেকে শুধু বাণী প্রচারের মাঝে মাঝে এক আধ বার দেশের কথা বুঝি স্বপ্নেরই মত স্মরণ করেন। তবু তাই আমাদের 'সাত রাজার ধন এক মাণিক্য।' নইলে যে আর বা'র করে দেখাবার মত আমাদের সম্বল নাই! বাঙ্গালার নেতারা শুধু ভাবের ঘোরে থেকে থেকেও বিরোধ করেন—আবার ভাবেই তা মিলিয়ে যায়। বাস্তবে কাজের জগতে খুব কম বাঙ্গালীরই চোখ ফুটে। শিক্ষা দীক্ষায় সে চোখ যেন আরও বেশী করে চস্‌মাবৃত হয়ে জগৎকে ঘোলাটে দেখে।

বাঙ্গালী গিয়ে সব দেশে উচ্চ আসন অধিকার করে সকলের ঈর্ষ্যার কারণ হয় বটে, কিন্তু তার প্রতিদানে আপন ঘরের অন্ন শূন্য করে যে বিদেশী এসে পেট ভরে যাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল নাই। বাঙ্গালীর অন্ন অপরকে বাঁচালে সেটা তার পক্ষে গৌরবের হত সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী সে অন্ন ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করে নাই—বিদেশী এসে ছলে বলে সে অন্ন আদায় করে নিচ্ছে, আর বেকার বাঙ্গালী শুষ্কমুখে হতাশার শূন্যপ্রাণে ঘরে ফির্‌ছে। কাব্য গিয়ে শুধু করুণরসেই পর্য্যবসিত হচ্ছে। পেটে অন্ন থাক্‌লে তো বীররস ফুটবে!

হিন্দুর বীর কবিদের—"একে একে সব নিবিছে দেউটী।" এখন হাতে আছে শুধু কলম, আর মুখে আছে অহঙ্কার। দেশের সাহিত্য খুঁজ্‌লে এর ভিতর দিয়ে বীরত্বের পরিচয় তত মিল্‌বে না, যত মিল্‌বে ভাবুকতা। কর্ত্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু ভারতের সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বকালেই প্রায় উন্মীলিত ছিল, কিন্তু কাজে কর্ম্মে বাঙ্গালীর দেহলতা যেমন দোদুল্যমান, তার বীরকাব্যও তেমনি দোদুল্যমান অর্থাৎ দেখা যায় কি না যায়। অথচ অন্যান্য প্রদেশে সমগ্রভাবে বীরত্বের পরিচয় নেহাৎ দুর্ল্লভ নয়। বাঙ্গালীর এই দুর্ব্বলতা অশিক্ষিতের মধ্যে পশুত্ব আনয়নে মস্ত সহায় হয়েছে। তাই বাঙ্গালার মত প্রতি সপ্তাহে নারীর উপর অত্যাচারের কাহিনী আর কোনও দেশের সংবাদপত্রে এত বেশী বাহির হয় না। যারা আপন মা-বোন প্রভৃতিকে বাঁচাতে না পারে, তাদের পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষমতা বিচিত্র নয়।

জিহ্বার জোরে বাঙ্গালী বেঁচে আছে। কি

আহারের কৌশলে, কি বাকাচ্ছটায় বাঙ্গালীর উপর আর কোনও প্রদেশ-বাসী যেতে পারে নাই। আহার্য্যের এত প্রকারভেদ, একই সামগ্রী হ'তে তৈরী রসনার এত প্রকার রস-যোগানো খাদ্যের আবিষ্কার এক বাঙ্গালী ছাড়া আর কারও মস্তিষ্কে আসে নাই। যেমন রসনাপুষ্ট, তেমন উদরতুষ্ট বাঙ্গালীর মত পেট-রোগা অথচ ভাতের কাঙ্গাল খুবই কম মিলে। বিদেশে বাঙ্গালী দেবতা, সুতরাং দেবভোগ্য ভোগের উপভোগে তার বিরাম নাই, কিন্তু সে সব হজমের শক্তি তার কোথায়?

বাঙ্গালীর আদর্শের অভাব নাই। কারণ শ্রীভগবানের এই এক অহৈতুকী কৃপা যে, বঙ্গজননী যথার্থ বিশ্ব-বিখ্যাত বহু সন্তান অঙ্কে ধারণ করেছেন। তাঁদের এক-একজন এক এক দিকে দিগ্বিজয়ী হয়ে জীবনের বহু সু-উচ্চ আদর্শ রেখে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমগ্রভাবে বাঙ্গালী অশিক্ষিত। প্রায় শতকরা সাতজন মাত্র বাঙ্গালী শিক্ষিত। তবে বল্‌তে পার যে, এই মুষ্টিমেয়ের দাপটেই দেশ টলমল, বেশী হলে না জানি কি হ'ত! কিন্তু দেশ টলমল হলেই নিজের বুভুক্ষা মিটে না। সব দিক দিয়ে সেই বুভুক্ষা মিটাতে হলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে শিক্ষার উপর। যথার্থ শিক্ষিত না হলে এ জাতির অধঃপতন ও ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গালীর সমস্ত গলদের মূল এই অশিক্ষা। অথচ এক বাঙ্গালা দেশে যত স্কুল, ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে তত স্কুল আছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালার বহু স্থানে প্রতি দুই মাইল অন্তর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তাতে ছাত্র সংখ্যা খুবই কম। কারণ, বিদ্যালয়ের খরচ সঙ্কুলান মধ্যবিত্ত অবস্থার অনেকের পক্ষেই ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা নিতান্ত নিম্নস্তরের, তাদের কথা তো বাদই দেওয়া গেল। শুধু স্কুল থাক্‌লেই বা কি হবে? বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বার হাজার ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল, কিন্তু কলেজে প্রবেশ্‌ছে ২।৩ হাজার ছাত্র। বাকী ছেলেদের জীবিকার উপায় কি? আর কলেজে শিক্ষিতদেরই বা জীবিকা নির্ব্বাহের পথ সুগম কোথায়? তবু প্রায় সাত কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার শিক্ষিত! তাই অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা যাতে সকলের মাঝে প্রচারিত হতে পারে, সেই জন্য অবৈতনিক বহু বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। যতদিন উন্নত ধরণের শিক্ষার আদর্শ সাধারণের মধ্যে বহুল ভাবে প্রচার না হয়, ততদিন প্রচলিত উপায়েও যদি দেশের অর্দ্ধেক লোকও শিক্ষিত হয়, তবু এদেশের চেহারা এমন থাকে না। বঙ্গজননীর যথার্থ রূপের অন্ততঃ কিছুটা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। যদি দেশের জন্য যথার্থ দরদ থাকে, তবে যতগুলি লোক রাজনীতি আঁকড়িয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য সভা সমিতিতে আসর সরগরম ক'রে অথবা সরকারকে দুটা গালি দিয়ে শ্রীঘর বাস বরণ ক'রে দেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখান, তাঁরা যদি সামান্য কিছু সময়ের জন্যও রাজনৈতিক আন্দোলনের অথবা সর্ব্ববিধ উন্নতির বিফলতার কারণ স্বরূপ এই 'অশিক্ষা' দূর করতে আত্মনিয়োগ করেন, তবে দেশের শ্রী শীঘ্রই ফিরে আসে।

শিক্ষার দিক দিয়ে মাত্র ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেও চীন নিতান্ত অনুন্নত ছিল, কিন্তু সরকারের তেমন কোন সাহায্য ছাড়াও শুধু যুবকদের আত্মচেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিক্ষার দিক দিয়ে চীনার রূপ মহাপরিবর্ত্তন লাভ করেছে। শুধু বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় সে যেমন ভাবে আপন দেশকে

শিক্ষিত করার সুযোগ পায়, আর কোনও প্রদেশ ততটা পায় না; কারণ, বাঙ্গালার আবহাওয়ার মধ্যে শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা ব্যাপ্ত রয়েছে। এখানে যেমন অন্য প্রদেশের মত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষের বাঁচতে হয় না, অর্থাৎ ষড়-ঋতু আপনি এসে সমতল বাংলার সময়ানুরূপে সেবা করে, তেমনি সে সেবার ফলে বহু মহান্ হৃদয় গড়ে উঠেছে; তাঁদের আদর্শ আজ সমস্ত বিশ্বে গ্রহণ করছে, নেয় না শুধু বাঙ্গালী!

শিক্ষিত বাঙ্গালী আপন গৃহে বসে যদি প্রত্যেকের জীবন দিয়ে অন্ততঃ কয়েকটী বঙ্গ-সন্তানকে 'করে খাবার' মত শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবু চীনের মত শীঘ্রই বাঙ্গালী শিক্ষিত হতে পারে। সরকার যদি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নাও করেন, তবুও আপন আপন শক্তিতে যতটুকু কুলায়, ততটুক শক্তিই যদি তথা কথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার প্রতিবেশী বা আপন ঘরের ছেলেমেয়ে গুলিকে শিক্ষা দান করতে নিয়োগ করে, তবে মাত্র গৃহশিক্ষার ভিতর দিয়েই দেশ বহু উর্দ্ধে উঠে যেতে পারে। সময় ও সুযোগ নাই বলে যাঁরা অজুহাত দেখান, তাঁদের প্রতি যদি সরকার থেকে বাধ্যতামূলক তেমন কোন আদেশ জারি হয়, তবে তখন তো তাঁদের অজুহাতের অবসর থাকে না। অজুহাত দিলেই বুঝতে হবে যে, অন্যান্য কাজের চেয়ে এই কাজটি নিতান্ত তুচ্ছ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই সব কাজ সেরে তার পর "এটা হয় হল, না হয় না হল"—এমনি ভাব রয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যার মত বা পঞ্চযজ্ঞের মত যদি দৈনিক অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে এটাও একটা অবশ্যকর্ত্তব্য বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে সব চেয়ে আগে এটার ব্যবস্থা না করে অন্নগ্রহণে রুচি হয় না।

বাংলার আজ যে অবস্থা, তাতে শিক্ষা ভিন্ন বাঙ্গালীর জাগবার যো নাই। কুশিক্ষা বলে গাল দিয়ে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে ত্যাগ করলেও আমাদের চলবে না। কারণ, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা উন্নত ধরণের শিক্ষা-প্রণালী আবিষ্কার করে সমগ্র দেশের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে না পারি, ততদিন এই 'মন্দের-ভাল' নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। এই শিক্ষায় আর কিছু হোক্ না হোক্, জীবনের চারদিকে স্থূল ভাবে যে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে যেতে হয়, সে সমস্ত সম্বন্ধে আমাদের চোখ ফোটে। আমরা যে কু-শিক্ষা বলে বর্ত্তমান পদ্ধতিকে নিন্দা করছি, তাও কিন্তু আমরা এই শিক্ষাদ্বারাই বুঝেছি। এখন তার সংস্কার খুবই প্রয়োজন বটে, কিন্তু বর্জ্জনই তার প্রথম বা প্রধান উপায় নয়। বর্জ্জনের পূর্ব্বে অর্জ্জনের অন্য ব্যবস্থা আগে করা চাই। নতুবা ইহার কুফল ফলবেই।

সংযমের সঙ্গে যে শিক্ষা, তা শুধু কতকগুলি স্কুল কলেজ করে সে সবার মাঝ থেকে পেতে যাওয়া দুরাশা। স্কুল কলেজে যতই না কেন strict discipline রাখা হোক্, মনের মধ্যের প্রবৃত্তিকে তা শুধু চাপা দিতেই পারে। প্রবৃত্তির আকর্ষণকে ছাড়িয়ে ওঠার প্রচেষ্টা এই ধরণের স্কুল কলেজের সাহায্যে হতে পারে না। কারণ, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষাদাতা ও শিক্ষার্থীর মধ্যে হৃদয়ের কোনও যোগ নাই। হৃদয়ের যোগ ভিন্ন মানুষ আপনার দুর্ব্বলতার পরিচয় নিজে হতে ইচ্ছা ক'রে দেখাতে পারে না। হৃদয়ের যোগ যেখানে, সেখানে সে স্বেচ্ছায় আপনাকে উন্মুক্ত করতে পারে, কারণ সেখানে সঙ্কোচ বা ঘৃণার স্থান নাই। দরদের সঙ্গে ত্রুটী-বিচ্যুতির সংশোধন হয় বলে মানুষ দরদীর কাছে দুঃখ-

দুর্ব্বলতা অকপট ভাবে প্রকাশ করে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে শুধু ভদ্রতা ও নিয়মের কড়াকাড়ি ছাড়া হৃদয়ের বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই যথার্থ শিক্ষা এখানে হয় না। বরং যে যত বেশী শিক্ষিত, সে যেন তত বেশী হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে। কারণ, তার তত বেশী দিন ধরে হৃদয়হীন আচারের খোলাস পরে থাকতে হয়।

এইজন্যই প্রাচীন ভারতে আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার যে সময়টা, তা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কাটাতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের শিক্ষা হত গুরুর আশ্রমে। সে গুরু হতেন জীবন্মুক্ত সংসারী জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি এই ভাবেই সংসার পেতে গেছেন। তাঁদের সংসারে গিয়ে ব্রহ্মচারী যথার্থ মাতাপিতার স্নেহ কি—তার পরিচয় পেত। কারণ সেখানে মায়ার বন্ধন নাই, অথচ মমতার শীতল ক্রোড়ের অভাবও নাই। আপনাকে লুকাবার যো নাই, অথচ সেই হৃদয়স্পর্শী ব্রহ্ম-দৃষ্টির সম্মুখে কেহই ঘৃণিত বা উপেক্ষিত হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সত্যলাভের জন্য ঋষি যে প্রচণ্ড তপস্যা করেছিলেন, ব্রহ্মচারীর জীবনে সেই তপস্যার আগুন জ্বেলে তার অন্তর-বাহিরের সমস্ত কালিমা ভস্মীভূত ক'রে, তাকে প্রদীপ্ত করে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় করে তুলতেন।

আজ আনন্দের দোহাই দিয়ে জগতে কি বীভৎস ভোগের লীলাই না চলছে! কিন্তু সেই সমস্ত মহাপুরুষদের জীবন থেকে আমরা এই বুঝি যে, আনন্দ সর্ব্বত্রই অনুস্যূত রয়েছে, কিন্তু প্রচণ্ড তপস্যার অরণি-ঘর্ষণে আমাদিগকে তা প্রদীপ্ত করে উপভোগ করতে হবে। আগুন যেমন সর্ব্বত্র থাকা সত্ত্বেও তা দিয়ে আমাদের স্থূল কাজ সম্পন্ন হয় না, তেমনি প্রাকৃত আনন্দের ক্ষীণ জ্যোতিতে আমাদের জীবনের অতি সামান্য অংশই উদ্ভাসিত হয় এবং তাও অতি অল্প সময়ের জন্য। তপস্যা ও নিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষার্থীর রুচি যত সুন্দর ও সংযত হয়, আনন্দের প্রকাশও তত মার্জ্জিত হয়—জীবনও তত পূর্ণ হতে পূর্ণতর হতে থাকে। এইরূপে মধুময় জীবনের চরম পরিণামই ব্রহ্মানন্দ-লাভ। আর সেই ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে জগৎকে উপভোগের যে আনন্দ, তাই জীবন্মুক্তের আনন্দ বা খাঁটি আনন্দ। আমরা চাই সেই বস্তুই, কিন্তু বিকৃত পন্থার অনুসরণ করি বলে বিকৃতরূপেই তা পাই। কিন্তু প্রাচীন ঋষি আপন জীবন দিয়ে শিষ্যের মাঝে তা সংক্রামিত করার কৌশল জানতেন। তপঃশুদ্ধিই সেই অমোঘ উপায়।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলায় ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত আশ্রম ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও অনেকটা দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী সেই প্রাচীন কালের শিক্ষার আদর্শকে যথাসম্ভব বর্ত্তমানে নিয়োগ করা। প্রাচীন গৌরবের কল্পনাকে বাস্তবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাতে গিয়ে যদিও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরস্পর সামান্য পৃথক্ ধরণের দেখা যায়, তবু তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হলে ক্রমশঃ একই ভাবে সমস্তের পরিণতি ঘটতে দেখা যাবে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যার সমাধান এই সমস্ত আশ্রম দ্বারাই বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, এগুলির আদর্শের মাঝে মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়েরই বিকাশের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু স্কুল কলেজ দ্বারা শুধু মস্তিষ্কেরই বিকাশ সম্ভব, হৃদয়ের নয়। বাংলার নবযুগ আনতে এই সমস্ত আশ্রমই প্রধান সহায়ক। কিন্তু মুষ্টিমেয় ও দরিদ্র এই কয়টী আশ্রমে কি হবে? বাঙ্গালীর যদি চক্ষুর উন্মীলন হয়, তবে প্রতি ঘরের সঙ্গে এই আশ্রমের আদর্শ যুক্ত হবে, সরকারের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও তাহলে বাংলার সুদিন ফিরে আসবে। ওঁ।

হিমাচলের পথে

——)•(——

পুণ্যানুব্রতি

বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে, আমরা হরিদ্বার হতে বের হয়ে কেদার-বদরীর পথে ৫৮ মাইল দূরবর্ত্তী দেব-প্রয়াগ পর্যন্ত এসে, পরে টিহরী হয়ে যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী যাই এবং সেখান হতে পাকদণ্ডী পথে ত্রিযুগীনারায়ণে আসি।

হরিদ্বার হতে রুদ্রপ্রয়াগ ৯৬ মাইল, ত্রিযুগী নারায়ণ ১৩৫ মাইল, কেদার নাথ ১৪৪ মাইল; কিন্তু ত্রিযুগী নারায়ণ হতে কেদার নাথ ১২ মাইল মাত্র। ত্রিযুগী নারায়ণ একটী বহু প্রাচীন পার্ব্বত্য নগর এবং চিরতুষারাবৃত (glacier) প্রদেশের পাদদেশে অবস্থিত। এর উত্তরে আর কোন গ্রাম বা বস্তি নাই, তা লোকজনের যাতায়াতের অসাধ্য। ত্রিযুগী নারায়ণ চিরবরফাবৃত প্রদেশের পাদদেশে বলে বেশ ঠাণ্ডা। বাবা কালী কম্বলীবালার প্রকাণ্ড দোতালা ধর্ম্মশালা ও সদা ব্রত দিবার চার্জ্জে যিনি আছেন, তিনি অতিশয় বদমেজাজী লোক। পার্ব্বত্য প্রায় সব লোককেই দেখেছি, তাদের সঙ্গে কথান্তর হলেই তারা মা-মাসী তুলে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিবে, কিন্তু সেই সময়ই প্রাণের মায়া বা ভাবী বিপদের আশঙ্কা না করে সপাং সপাং দু'চারটী উত্তম মধ্যম দিবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে চুপ হয়ে যাবে—গোলাম বনে যাবে। তাদের অত্যাচার করার প্রধান কারণ, এরা জানে যাঁরা তীর্থ করতে আসেন, তাঁরা কখনও অন্যায় করেন না; সুতরাং তাঁদের নিকট হতে যে কোন উপায়ে—সুবিধা হলে ছিনিয়েও টাকা পয়সা নিতে কসুর করে না। এর

ত্রিযুগী নারায়ণ

মধ্যে যদি কেউ আত্মশক্তি ধারণ করে প্রতিকার করতে যত্নবান্ হন, তখনই কিন্তু তারা একেবারে চুপ হয়ে যাবে। একটি সত্য ঘটনা আপনাদের জানাচ্ছি।

কলিকাতার হ্যারিসন রোডের ডাঃ শর্ম্মা নামীয় একজন ভদ্রলোক সাহেবী পোষাকে কেদার-বদরী যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের বদরীর পথে পাতাল-গঙ্গা চটীতে আলাপ পরিচয় হয়। তিনি যখন ত্রিযুগী নারায়ণে বাস করেন, তখন স্থানীয় দোকান হতে আহারীয় জিনিষাদি নিয়ে পাক করে খাওয়ার পর, জিনিষ গুলির দাম দিতে গেলে দোকানদার প্রত্যেক জিনিষেরই দাম দ্বিগুণ চায়। অর্থাৎ যে চাউল প্রথমে বার আনা সের চেয়েছিল, সে সময় দেড় টাকা সের —এই ভাবে বেশী দাম চায়। তিনি তাদের ভালরূপ বুঝিয়ে বললেও কিন্তু দোকানদার উল্টো তাঁকেই গালাগালি দেওয়ায়, তিনি দোকানদারকে এমনি উত্তম মধ্যম দিয়েছিলেন যে, তার জীবনে আর ঐরূপ করবে না বলে, তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। সুতরাং যাঁরা এ পথে আসবেন, এবং যাঁদের শাসন করার ক্ষমতা আছে, তাঁরা যেন পাপের ভয়ে ঐ রকম অত্যাচার সহ্য না করেন। মনে রাখবেন, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলেও তার অন্যায়ের সহায়তা করার জন্য পাপ হয়।

আমি এমন কথা বলছি না যে, হিমালয়ের প্রত্যেক লোকই ঐরূপ রুক্ষ-স্বভাবের। তাদের ভিতর এমন অনেক লোক আছেন, যাঁদের দেবতা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু সে সব লোক

সচরাচর মেলা দুষ্কর। তারা সাধারণতঃ পাহাড়ের সু-মনোরম কন্দরেই বাস করতে ভালবাসে। স্বোপার্জ্জিত আটা, গম, চাল, ডাল, নিমক, মরিচ দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং নিজের হাতের তৈরী হোমস্থান চট সদৃশ কাপড় দ্বারা লজ্জা নিবারণ করে থাকে। যারা পাহাড়ের সে সব সুমনোরম কন্দর হতে লোভের বশবর্ত্তী হয়ে বড় রাস্তার ধারে এসে চটী, দোকান আদি খুলে বা পাণ্ডা সেজে ব্যবসা-বাণিজ্য কচ্ছে, তাদের ভিতর এত অর্থলোলুপতা, এত স্বার্থপরতা, এত পরশ্রীকাতরতা, এত ব্যভিচারিতা, এত চাটুকারিতা বর্ত্তমান, যা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বুঝা সম্ভবপর নয়। সত্য বটে, চটীতে পৌঁছবার পরই চটীবালা আপনাকে "শেঠজী" "মহারাজ" "অন্নদাতা" আদি সুমনোরম শব্দে আপ্যায়িত করতে কসুর করবে না; কিন্তু একটু স্থির চিত্তে বিচার কল্লেই বুঝতে পারবেন—সে সব শুধু তাদের চাটুকারিতা বা ব্যবসায়ের সুমনোরম পন্থা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। আমরা খুব ভাল ভাবে তাদের আচার-ব্যবহার, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা আদি সমুদয় লক্ষ্য করেছি।

ত্রিযুগী নারায়ণে অনেক গুলি বড় বড় দোকান আছে। দোকান গুলি সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং দ্বিতল বিশিষ্ট। মোটা-মুটি অনেক জিনিষই এ চটীতে পাওয়া যায়। পাশেই অনেক আলুর আবাদ হচ্ছে। পাণ্ডা মহারাজ অনেকগুলি আলু-শাক এনে আমাদের উপহার দিলেন। আমরা সে সময় সেই সামান্য কয়েকটি আলুপাতা পেয়েই বিশেষ আনন্দিত হলাম।

ত্রিযুগী নারায়ণ "ভূ-বৈকুণ্ঠপুরী-যজ্ঞ" নামক পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত। ত্রিযুগী নারায়ণ দেবের **মন্দিরটী কতদিন হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ পর্য্যন্ত** তা নির্ণয় হয় নি। মন্দিরের চূড়াতে সুবর্ণ কলস সুশোভিত আছে। মন্দিরটির পার্শ্বেই ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও সরস্বতী কুণ্ড নামে চারটী কুণ্ড বিদ্যমান। ভৈরব কুণ্ড নামে অন্য একটি কুণ্ডও আছে। আমরা পাণ্ডার সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও ভৈরবকুণ্ডে ক্রমান্বয়ে স্নান করলাম। বিষ্ণুকুণ্ডের জলকে ত্রিযুগী নারায়ণের চরণামৃত বলে। উক্ত কুণ্ডের চরণামৃত পান করতঃ সরস্বতী কুণ্ডের ধারার পাশে বসে তর্পণাদি করার পর, ধর্ম্মশীলা নামীয় স্থানে সাধ্যানুযায়ী দান করতঃ পাপ মুক্ত হয়ে পুণ্য সঞ্চার হবার পর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীশ্রীনারায়ণদেবের ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণামাদি করে জীবন ধন্য জ্ঞান করলাম।

শ্রীশ্রীনারায়ণ মূর্ত্তির সম্মুখে অহোরাত্র একটি ধুনি জ্বলছে। স্থানীয় লোক ও পাণ্ডা বললেন, শিব যখন ত্রেতাযুগে হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী দেবীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন, তখন এই যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখেই ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং শিব এই অগ্নির সম্মুখেই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দুর্গার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিবাহ কালের সেই ধুনি আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থেকে তার সাক্ষ্য প্রদান করছে। যতদিন পর্য্যন্ত এস্থান বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত ধুনি জ্বলতে থাকবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, ঐ মন্দিরস্থিত অগ্নি তিন যুগ হতে বিদ্যমান আছে। ঐ অগ্নিকে ধনঞ্জয় অগ্নি বলে থাকে। যে মানব একবারও ঐ পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে, তার পুনরাগমন রহিত হয়ে মুক্তি লাভ হয়। যথা:—

ধনঞ্জয় অগ্নি

তস্মিন্নগ্নৌ তু যে মর্ত্ত্যা একামপ্যাহুতিং দদুঃ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমাপন্নাঃ পুনরাবৃত্তি দুর্লভাঃ॥

ঐ আয়তে "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষর

মন্ত্র দ্বারা যে ব্যক্তি হবন করেন, তিনি পাপ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সংসারে মহা সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকেন। যথা :—

হবনং কারয়েত্তত্র নারায়ণস্বমন্ত্রতঃ।
ধন্যো ভবতি লোকেষু নরঃ পাপবিবর্জ্জিতঃ॥

উক্ত যজ্ঞীয় ভস্ম যে ব্যক্তি ধারণ করেন, সে ব্যক্তি সর্ব্বদেবময় হয়ে যান এবং উক্ত ভস্ম ধারণ কারীকে দর্শন করলে সর্ব্বকৃত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। ঐ ভস্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করবার শক্তি কারও নাই। যথা :—

ভস্মনো ধারণং কৃত্বা সর্ব্বদেবময়ো ভবেৎ।
মাহাত্ম্যং ভস্মনঃ কেন শক্যতে মম বল্লভে
তদ্ভস্মধারিণং দৃষ্ট্বা পাপং সর্ব্বকৃতং দহেৎ॥

উক্ত যজ্ঞাগ্নি বরাবর প্রজ্বলিত রাখার জন্য এই স্থানের নরেশ টিহরী মহারাজের তরফ হতে কয়েক-জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। তাঁদের কর্ত্তব্য শুধু ধুনিতে কাষ্ঠ সংযোগ করা। তিনজন ব্রাহ্মণ তিন দিকে বসে যাত্রীদের দ্বারা মন্ত্রপাঠ করিয়ে যাত্রীদের দ্বারাই কাঠ যজ্ঞাগ্নিতে দেওয়াচ্ছেন। এ তীর্থে যাত্রীদের প্রধান কর্ত্তব্যই হচ্ছে যজ্ঞাগ্নিতে কাঠ দেওয়া। প্রত্যেক যাত্রীই শক্তি অনুসারে কাঠ দিয়ে ধুনি চেতিয়ে থাকেন। ধুনিতে কাষ্ঠ সংযোগ করার পর যজ্ঞীয় ভস্মের তিলক ধারণ করে স্থানীয় ব্রাহ্মণ-ভোজন করালেই এই তীর্থের কৃত্য সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। ধুনিতে কাষ্ঠ-সংযোগ করার পূর্ব্বে ধুনির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। আমরা তদনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করলাম।

তিনযুগ হতে এই স্থান বর্ত্তমান বলে এর নাম **ত্রিযুগীনারায়ণ**। সরস্বতী নাম্নী ধারাটী মন্দির স্থিত অষ্টধাতু-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনারায়ণের নাভিকমল হ'তে জন্ম নিয়ে একটা ছোট নালা দিয়ে বের হয়ে সরস্বতী-কুণ্ডে এসে পড়্‌ছে; জলের ধারা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সরস্বতী-ধারা সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই। যথা :—

সরস্বতীতি বিখ্যাতা ধারাপরমপাবনী।
শ্রীবিষ্ণোর্নাভিতস্তত্র আয়াতি দুরিতাপহা॥

উক্ত স্থানে পরম পবিত্র যে সরস্বতী নাম্নী ধারা বিদ্যমান আছে, তা সমস্ত পাপ তাপ নাশ কারী। এখানে যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ-তাপ হতে মুক্ত হয়ে যান।

নমো নারায়ণে ভুক্ত্বা মন্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥

যে মানব "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র দ্বারা উক্ত সরস্বতী ধারার জল অভিমন্ত্রিত করে পান করেন, শতকোটি কল্প পর্য্যন্তও তাঁর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ জন্ম হয় না। উক্ত ধারা সম্বন্ধে আরও উক্তি আছে যে, যিনি একবার উক্ত সরস্বতী ধারার জল দ্বারা আচমন করতঃ কোন প্রকার ধর্ম্মক্রিয়া করেন, জগতে এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যা তাঁর প্রাপ্য হয় না এবং যে যাত্রী ত্রিযুগীনারায়ণে যেয়ে ঐ সরস্বতী ধারার জল পান করেন, তাঁর উর্দ্ধ দশ পুরুষ এবং অধঃ দশ পুরুষের পিতৃগণ প্রসন্ন চিত্তে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন। যথা :—

সকৃদাচম্য দেবেশি নারায়ণ বিনিঃসৃতম্।
জলং সারস্বতং দেবি কিং তেন ন কৃতং ভবেৎ॥
ধন্যা লোকে নরা যেতু নারায়ণ সমীপকে।
জলং পিবন্তি তেষাং বৈ দশপূর্ব্বা দশাপরে॥
তৃপ্তা যান্তি পরংস্থানং পিতরো হৃষ্টমানসাঃ॥

সরস্বতী নাম্নী ধারাটি নারায়ণের নাভিকমল হতে জন্ম নিয়ে যে কুণ্ডে এসে পতিত হচ্ছে, তাকে সরস্বতী কুণ্ড বলে। আমরা পূর্ব্বে জানতাম না বলে সরস্বতী কুণ্ডে স্নান করিনি; কিন্তু শাস্ত্র সরস্বতী কুণ্ডে স্নান করার বিধি আছে এবং উক্ত

আছে—ঐ কুণ্ডে স্নান করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। যথা :—

তত্র সারস্বতে কুণ্ডে স্নাত্বা পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥

যজ্ঞভূমির অতি নিকটেই ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত এবং পরম পুণ্যপ্রদ বলে শাস্ত্রের উক্তি যথা :—

তত্রৈব ব্রহ্মকুণ্ডাখ্যং তীর্থং পরমপুণ্যদম্ ॥

উক্ত ব্রহ্মকুণ্ডের জল পীতবর্ণ এবং তাতে নানা প্রকার রঙ্গ-বেরঙ্গের অনেক কালসর্প বাস করলেও কিন্তু কোন যাত্রীকে বা কোন লোককে আজ পর্য্যন্ত দংশন করেনি, বরং স্নান করার সময় উক্ত কালসাপ শরীর স্পর্শ করলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়ে থাকে। পাপী তাপীদের ভীতি উৎপাদনের জন্যই ভগবান ঐ পবিত্র কুণ্ডে সাপ রেখেছেন এবং ঐ কুণ্ডে স্নান করলে ব্রহ্মলোক লাভ হয় বলে শাস্ত্রে কথিত আছে। যথা :—

স্নাত্বা যত্র বরারোহে ব্রহ্মলোকগতির্ভবেৎ।
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি তজ্জলং পীতবর্ণকম্ ॥
তত্র চানন্তরানাগাঃ স্থাপিতা ভীতিদাঃ প্রিয়ে।
ন দংশন্তি চ তে নাগা ভীতিকারণমেব তে ॥

মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত হতে বিষ্ণুগঙ্গা প্রবাহিত হয়ে বিষ্ণুকুণ্ডের সহিত মিলিত হয়েছে। এই বিষ্ণুকুণ্ডে (নামান্তরে বিষ্ণু-তীর্থ) স্নান করলে ভগবান বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ হয়। যথা :—

তস্য বৈ দক্ষিণে ভাগে বিষ্ণুতীর্থমিতি স্মৃতম্।
যত্র স্নাত্বা বরারোহে বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

ত্রিযুগীনারায়ণ যে মন্দিরে বিরাজ কচ্ছেন, সে মন্দিরটী বেশ বড় ; তা ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট মন্দিরে অনেক দেবতা বিরাজিত আছেন। মন্দিরের পশ্চিম দিকে লক্ষ্মীদেবীর ভাণ্ডার। ত্রিযুগীনারায়ণের পূজা বার মাসই হয়ে থাকে ; কেদারনাথ বদরীনাথের মত এঁর দরজা বন্ধ হয় না—যদিও বা এখানে শীতের সময় সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ দু চার ফুট বরফ পড়ে থাকে।

এখানে ৩০।৩২ ঘর পাণ্ডা আছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়ী দ্বিতলা বিশিষ্ট। তারা খুব চালাক চতুর হলেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করলেন। আমাদের পাণ্ডার নাম কল্পিরাম পাণ্ডা, পিতার নাম উত্তমরাম পাণ্ডা। ঠিকানা—পোঃ গুপ্তকাশী, গ্রাম—ত্রিযুগী নারায়ণ, জিলা—গাড়োয়াল, তহশীল—পৌড়ী ; মৌলী—কালীকাট।

আমরা যখন হিমালয় ভ্রমণ করতে যাই, তখন হিমালয়ের তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। শুধু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত হিমালয় কেমন, এই ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হয়েই রওনা হয়েছিলাম। হিমালয়ে বাস করার সময়ও কেদার খণ্ডের তীর্থমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। পরে যখন পাঠকগণকে আমার হিমালয়-ভ্রমণ সম্বন্ধে পথের বিবরণ জানাতে সঙ্কল্প করলাম, তখন মনে হল—শুধু পথের বিবরণ তো সকলেই দেয়, আমি এমন কিছু দিব, যা আজ পর্য্যন্ত নূতন ; তথা পথের সমুদয় বিবরণ এমন বিস্তৃত ভাবে দিব, যাতে যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হয় এবং তাহাও আজ পর্য্যন্ত নূতন হবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এ কাজে ব্রতী হই। যদিও বিস্তৃত বিবরণ জানাবার জন্য সমুদয় ঘটনা জানাতে অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, তথাপি বিশ্বাস আছে, আমি এ কাজে যে কত কষ্ট পাচ্ছি, এ সব বিষয় অনুভব করে সুধী পাঠকবর্গ আমায় ক্ষমা করতে ভুলবেন না।

হিমালয়ে বাস করবার সময় পাণ্ডামহারাজগণ তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করলেও কিন্তু তখন বিশ্বাস করতাম না মোটেই। মনে করতাম পয়সা আদায় করবার একপ্রকার ফন্দী আঁটছে। কিন্তু এখন

দেখছি—যদি আমাদের হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করতে হয়, যদি আমাদের পাপ তাপ ক্ষয় মানসে তথা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তীর্থে যেতে হয় এবং অন্তে পরমাগতি লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তাঁদের কথাও উড়িয়ে দেবার নয়। সব চেয়ে আমার বেশী আনন্দ হচ্ছে,—আমাদের হিন্দুশাস্ত্রকারগণের কথা স্মরণ করে। তাঁরা সেই কোন্ যুগে হিমালয়ের ক্রোড়ে বাস করে, আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন তথা মুক্তিলাভের জন্য এ সব মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, সে সময় নিরূপণ করার ক্ষমতা আমার নাই। তারপর কত যুগ যুগান্তর চলে গিয়েছে, কত শত শত, কত সহস্র সহস্র, কত লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হয়েছে, কত রাজা কত মহারাজা কত রাজ্য অন্ত হয়ে সে সব স্থান ক্রমশঃ হিন্দু হতে যবন, যবন হতে বৃটিশ আধিপত্যের ভিতর চলে এসেছে, অথচ এখনও সে সব শাস্ত্রের সঙ্গে অটুট ভাবে মিলে যাচ্ছে। যদি কেউ বলেন—পুরাণগুলি অল্প দিনের তৈরী, তাহলে আমি নাচার; সে সব প্রমাণ করার শক্তি আমার নাই। তাঁরা যেন একজন তার্কিক পণ্ডিত ডেকে এর মীমাংসা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শাস্ত্রের প্রত্যেকটি বাক্যই আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি, সুতরাং সেই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য আমি প্রকাশ করবো। কোনরূপ তর্ক করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে সব যাত্রী কত কঠোর কষ্ট সহ্য করে এ হেন দুর্গম স্বর্গভূমিতে মুক্তি লাভের আশায় ছুটাছুটী করে বেড়ান, শুধু তাঁদের ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য যথা সাধ্য শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ তুলে দিব। বোধ হয় শত করা নিরানব্বই জন যাত্রীই অন্ধ বিশ্বাসে তীর্থের নাম শুনে ধাবিত হন। তীর্থের উৎপত্তির কারণাদি বা তীর্থের মাহাত্ম্যাদি সম্বন্ধে বোধ হয় তাঁরা বিশেষ কিছুই জানেন না। তাঁদেরই এসব তীর্থ মাহাত্ম্য জানাতে চেষ্টা করব।

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডের প্রথম ভাগের ৪৩ অধ্যায়ে উক্ত আছে, ভগবান্ শিব জগন্মাতা পার্ব্বতীর নিকট ত্রিযুগী নারায়ণের মাহাত্ম্যাদি বর্ণন প্রসঙ্গে বলছেন :—

অথান্যত্তু প্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
কেদার মণ্ডলে এব যত্র গত্বা হরির্ভবেৎ॥

অর্থাৎ সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে পরমোত্তম একটি ক্ষেত্রের বর্ণনা করছি, ঐ ক্ষেত্রও কেদার মণ্ডলে অবস্থিত এবং সেখানে যাত্রা করলে যাত্রী সাক্ষাৎ হরিরূপ হয়ে যান।

ত্রিবিক্রমাতটে পশ্চান্নারায়ণসুতীর্থকম্।
যস্য দর্শন মাত্রেণ হরিভক্তিঃ প্রবর্দ্ধতে॥

ত্রিবিক্রমা নদীর তটের উপর নারায়ণ নামক সুতীর্থ বিদ্যমান আছে। যার দর্শন মাত্রেই শ্রীশ্রীহরি ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

শোন নদীর অন্য নাম ত্রিবিক্রম গঙ্গা। এই শোন নদিটী ত্রিযুগী নারায়ণের উত্তর পার্শ্বস্থিত বরফাবৃত পর্ব্বত হতে জন্ম নিয়ে, ত্রিযুগী নারায়ণ হতে তিন মাইল দক্ষিণে এসে কেদার নাথের পথে মন্দাকিনী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্থানকে **শোন প্রয়াগ** বা **ত্রিবিক্রম সঙ্গম** বলে। এই স্থানেই **শোন-চটী** অবস্থিত। কেদার নাথে যাবার সময় এই স্থানের বিবরণ জানাব। বোধ হয় পাঠকগণ বুঝতে পেরেছেন, ত্রিযুগী নারায়ণের স্থানটি কোথায় তাও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করে দিলেন। শুধু নির্দ্দেশই নয়, কত দূরে অবস্থিত তাহাও লেখা আছে। যথা :—

ত্রিবিক্রমাতটাদূর্দ্ধং সার্দ্ধক্রোশে মহৎফলম্।
নারায়ন ক্ষেত্রমিতি তস্মিন্বৈ যজ্ঞপর্ব্বতে॥

• যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা হরিপূজনমানসাঃ।
যজয়ামাসুরপি তং নৈবেদ্যৈর্হবনৈস্তথা॥

ত্রিবিক্রমা নদীর দেড় ক্রোশ উপরে মহৎ ফলদাতা নারায়ণ-ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে, এ যজ্ঞ পর্ব্বতের উপর হরির অর্চ্চনা কর্বার জন্য সর্ব্বদা ব্রহ্মা আদি দেবগণ নৈবেদ্য ও হবন দ্বারা যজন করেন।

তল্লিঙ্গং তু প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
নিত্যং তত্র স্থিতো বহ্নির্দৃশ্যতে মুক্তিদো মহান্॥

তার চিহ্ন আমি বল্‌ছি শ্রবণ কর। সেখানে গেলে অমৃত (মোক্ষসুখ) লাভ হয়, সেখানে মোক্ষদাতা অগ্নিদেব নিত্য বিরাজমান আছেন।

বিবাহস্থানমেতদ্বৈ গৌরীশঙ্করয়োঃ শুভম্।
তৎ আরভ্য বসত্যে নিত্যমত্র ধনঞ্জয়ঃ॥

ত্রিযুগী নারায়ণ গৌরীশঙ্করের বিবাহের শুভ স্থান। উক্ত বিবাহ দিন হতে আজ পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় নামক অগ্নি বাস কর্‌ছে। এই অগ্নির বিষয় আমি পূর্ব্বেই পাঠকদের জানিয়েছি।

যে মানব ত্রিযুগী নারায়ণের মুকুট হতে চরণ কমল পর্য্যন্ত দর্শন করে, তার নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়। যদি ভাগ্য বশতঃ কেউ কদাচিৎ স্পর্শ করতে পারে, তার যে কত ফল লাভ হবে তা বলা দুষ্কর। তাঁর পরিক্রমা কর্‌লে অশ্ব মেধ যজ্ঞের ফল হয়। যথা :—

আকিরীটাঙ্‌ঘ্রিপদ্মান্তং নারায়ণমিহাদরাৎ।
পশ্যতোঽপি নসংসারঃ কিমুত স্পৃশতঃ প্রিয়ে॥
প্রদক্ষিণাং হরেঃ কৃত্বা অশ্বমেধ ফলংলভেৎ॥

ত্রিযুগীনাথে এসে ত্রিযুগী নারায়ণের দর্শন করে, পরে কেদার নাথে যাবার বিধি শাস্ত্রে পাওয়া যায়; কিন্তু অনেক যাত্রী এই ত্রিযুগী নারায়ণের সামান্য চড়াই উৎরাইয়ের ভয়েই এ তীর্থে না এসে রামপুর চটী হতে (হরিদ্বার হতে ১৩১ মাইল) শোন প্রয়াগের দিকে রওনা হন। তাঁরা যেন সেটী না করে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ত্রিযুগীনাথকে দর্শন করে কেদার নাথ যান। যথা :—

দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্।
কল্প কোটি শতং দেবি নরো যমপুরে বসেৎ॥

নারায়ণ দেবকে দর্শন করে শিবমন্দিরে (কেদার নাথে) যেতে হয়। যে যাত্রী ঐরূপ করে, হে দেবি! সে শত কোটি কল্প পর্য্যন্ত আমার পুরে বাস করে।

অত্র স্থিত্বা সপ্তরাত্রং জপধ্যৈ ধ্যানতৎপরঃ।
সিদ্ধো ভবতি পূতাত্মা যথাহং মম বল্লভে॥

এখানে সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত ধ্যানে তৎপর থেকে যিনি জপ করেন, হে প্রিয়ে! তিনি আমার মত পুণ্যাত্মা হয়ে যান।

ত্রিযুগী নারায়ণের মাহাত্ম্য প্রায় সমস্তই বর্ণনা করেছি; কিন্তু একটি মাহাত্ম্য বর্ণনা না কর্‌লে বিষয়টির পূর্ণ বিবরণ হয় না বলেই, তাও এখানে উল্লেখ করতে বাধ্য হ'চ্ছি। আমরা হিমাচলের ভিতর ঢুকার পর আজ পর্য্যন্ত কোথাও খটমলের (ছারপোকার) উপদ্রবে কষ্ট পাইনি। আজ পবিত্র নারায়ণ ক্ষেত্রে রাত কাটান গেল—খুব কষ্টে। ঘরটি বেশ ভাল পেয়েছিলাম। বিকেল হতে মুষল ধারে বৃষ্টিপাত হলেও কিন্তু আমাদের মোটেই কষ্ট হয়নি। রাত্রিটা বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাটান যাবে মনে করে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। আহারের পর বাতি নিবিয়ে সকলেই শয্যা গ্রহণ করার প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যে উঃ আঃ করে জেগে পড়্‌তে হল। তখনই ব্যাপার অনুসন্ধানে লেগে গেলাম। হারিকেন জ্বালিয়ে দেখি, বড় বড় ছার পোকা (তারাও তিন যুগের কিনা, কে জানে?) সিপাহীর মত আমাদের বিছানার চারিদিক হতে এক সঙ্গে আমাদের আক্রমণ কচ্ছে সে সব ছার-

পোকা গুলি কিন্তু কালকাতার ট্রামের বা হাওড়ার মার্টিন কোম্পানীর রেলের ছার পোকা হতে তিন চার গুণ বড় হবে। এত বড় ছার-পোকা এ জীবনে আর কখনো দেখিনি। এত শীত প্রধান স্থানে ছার পোকা, বিশেষতঃ এত বড় ছার পোকা থাকার কারণ বুঝিনি; অনেক চিন্তা করার পর মনে হ'ল, এ বোধ হয় নারায়ণেরই দয়া! প্রথমতঃ তো আজ আমরা এখানে থাকবো না, এগিয়ে যেয়ে গৌরীকুণ্ডে আড্ডা দিব স্থির করে রওনা হবার সাথেসাথেই এমন প্রবল জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, যাতে আমরা বিবশ হয়ে এখানে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কমের পক্ষে একরাত্ বাস করা উচিত দয়াল গুরুদেব আমাদের বিবশ করে সে ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, নারায়ণ ক্ষেত্রে সমস্ত রাত্রি সাধন-ভজনে কাটান উচিত—সে পবিত্র ক্ষেত্রে এসে ঘুম কেন? সেইজন্যই বোধ হয় তিনি, ছার পোকা দিয়ে আমাদের জাগিয়ে রেখেছেন।

এখানে জিনিষাদির দাম খুব বেশী। চাউল সের প্রতি ৫০।৫৯/০ আনা, আটা ॥০ আনা, ঘী ৩৲ টাকা, সরিষার তৈল ২৲ টাকা, দুধ ।৵০ আনা।

ত্রিযুগী নারায়ণের অষ্ট ধাতুর মূর্ত্তির পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ পাথরের চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভিত। এ ছাড়া মহারাজ দক্ষ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ক্ষেত্রপাল, রামচন্দ্র দেব, অনন্ত, নারায়ণ ও শঙ্করা-চার্য্যের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। এখানে ত্রিযুগী-নারায়ণের অনেক ফটো ও তামার পাতের উপর ফটো পাওয়া যায়। তামার পাতের উপর ফটো এক পয়সায় একটি, আমরা অনেক কিনে ছিলাম।

(ক্রমশঃ)

সাথী

(আমার) সকল পথের দুঃখের বোঝা
ঢাক্‌বে বলে হাসিতে—
তান ধরেছি তোমার গানের
সুর তুলেছি বাঁশীতে।

আস্‌ছ তুমি সুরের ধারায়
আমার বুকে অবাধে—
এমন সহজ সরল ভাবে
কেউ তো আমায় না বাঁধে।

পথ চলেছি একলা আমি
ভয় ছিল মোর হৃদয়ে—
কখন তুমি আস্‌লে সেথায়?—
ফুটল হাসি বিদায়ে।

তাই ভাবনা কর্‌ব না আর
খুঁজ্‌ব না আর সাথীকে—
চল্‌বে এ রথ আপন বেগে
ভার দিয়েছি রথীকে।

বিশ্বাস-সূত্র

—:(*):—

জগৎটাই চলিয়াছে বিশ্বাসের উপর। বিশ্বাসই হৃদয়ের অমোঘ শক্তি। এই বিশ্বাস হারা হইলে জগতে বাস করা বিড়ম্বনা। কেবল অবিশ্বাস করিয়া, কেবল সন্দেহ পোষণ করিয়া মানুষ কয়দিন টিকিয়া থাকিতে পারে? জগৎ আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুক, কিন্তু আমি কাহাকেও বিশ্বাস করি না, এভাব যে বড়ই মারাত্মক। প্রত্যেকে নিজের অন্তর দিয়াই জগৎটাকে দেখে। সাধু দেখে সকলেই সাধু, চোর দেখে সকলেই চোর, ভণ্ড দেখে সকলেই ভণ্ড, অবিশ্বাসী দেখে সকলেই অবিশ্বাসী। বাস্তবিক আমরা নিজকে দিয়াই অপরকে যাচাই করি। যে কামুক, সে কোন দিন মনে করিতে পারে না যে জগতে কাম জয়ী পুরুষ থাকিতে পারে; যে কুটিল, জগতে সরলতা বলিয়া কিছু আছে তাহা তাহার ধারণার অতীত। বাহ্যিক আবরণ দিয়া অন্তরের রূপ যতই ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, কর্ম্মের সংঘর্ষে একদিন তাহার উলঙ্গ মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া পড়িবেই। ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য সাধন না করিয়া তাহার মিথ্যা অভিনয় আর কত দিন চলিতে পারে? সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে যে যোগ রহিয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? আমার চিত্ত যদি কাহারও উপর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিলেও তাহা তাহার চিত্তে আঘাত না দিয়া পারিবে না। শুধু বাহিরের যোগই যোগ নয়, অন্তরের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমাদের প্রত্যেকের যোগ রহিয়াছে। আজ আমার চিত্তে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার তরঙ্গ কোন না কোন আকারে প্রত্যেক হৃদয় স্পর্শ করিবেই। আজ যদি আমার চিত্ত কারো উপর প্রসন্ন হয়, বাহিরে তাহার নিদর্শন না দেখাইলেও, অন্তরে একথা গোপন থাকিবে না।

বিশ্বাসের কি অমোঘ শক্তি! জগতের বুকে তার কি অমিত প্রভাব! শুধু বিশ্বাসের বলে এক বস্তু অন্যতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। শিষ্য যতই পাষাণ্ড হউক, যতই পতনের নিম্নতম প্রদেশে ডুবিয়া যাউক, গুরু কিন্তু তাহাকে বিশ্বাসের চোখেই দেখেন, অবিশ্বাস কোন দিন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তিনি বিশ্বাস করেন—"এ কোন দিন এমন হইতে পারে না, হয়ত সাময়িক ভাবে এ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে।" তুমি শিষ্য, গুরুর কাছে যাইয়া বলিলে—'কই ঠাকুর, আমার তো কিছুই হইতেছে না, জীবনের তো কোন উন্নতির লক্ষণই দেখিতেছি না, যেন দিন দিন শুধু পিছাইয়াই পড়িতেছি।' তুমি নিরাশ ভগ্ন প্রাণে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মনে করিয়া প্রপন্ন হৃদয়ে শ্রীগুরুর সমীপে এই কথাগুলি নিবেদন করিলে। গুরু তোমার এই প্রশ্নের উত্তর কি বলিলেন? তিনি কি বলিবেন, "হাঁ তুমি নীচেই নামিয়া পড়িতেছ, নিজে সাবধান হও, আমি কি করিব?" না—তিনি একথা বলিবেন না। তিনি বলিবেন, 'কিসের পতন? আমি জানি তুমি দিন দিন উন্নতিই লাভ করিতেছ। বালক যখন হাঁটিতে শিখে, তখন দু'চার বার আছাড় খাইয়া পড়েই; ইহা কি তাহার পতনের নিদর্শন, না সে যে পতনের হাত হইতে ক্রমশঃ

নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে তাহারই পরিচয়? পতন ভাব সাময়িক আবেশ, এ আবেশ আসিবে এবং যাইবেও, ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলে চলিবে না। ধীর স্থির থাকিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাও, একদিন সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

শ্রীগুরুর এই বিশ্বাসের বাণীকে অনেকেই পুষ্পিত বাক্য বলিয়া রায় প্রকাশ করিতে ছাড়িবেনা না জানি, তথাপি সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে—যদি শিষ্য পতনের চরমে গিয়াও উপস্থিত হয়, তবুও শ্রীগুরুর এই সরল দৃঢ় বিশ্বাসই ত্রাণ শক্তি রূপে তাহার উদ্ধার সাধন করিবে। গুরু জানেন, গুরু বিশ্বাস করেন, আমি কখনও এমন হইতে পারি না। যদি আমি প্রকৃতই গুরুর শিষ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি বাস্তবিকই অমন হইতে পারিব না। আমাকে বিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে। বিশ্বাসের এমনি অমোঘ শক্তি।

অনেকে বলেন বিশ্বাস অন্ধ। আমি তাহা স্বীকার করি না। আমি জানি, বিশ্বাসের মত এমন পরম বন্ধু আর নাই। জগৎকে তুমি বিশ্বাস কর, অবিশ্বাসের কবলিত হইতে হইবে না; অবিশ্বাসের চোখে জগৎকে দেখ, দেখিবে জগৎটা শুধু অবিশ্বাসে ভরা। শ্রীগুরুর উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁর নির্দ্দিষ্ট পন্থায় চল, দেখিবে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছ, যেমনি বিশ্বাসের স্থানে অবিশ্বাস আসিয়া আসন পাতিল, অমনি সব পণ্ড হইয়া গেল। যত দিন নিজের উপর বিশ্বাস থাকিবে, দেখিবে যে কাজে হাত দিতেছ—সবই যেন কলের মত নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে, যেমনি আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস আসিল, অমনি সব পণ্ড হইতে আরম্ভ হইল। ইহাই জগতের নিয়ম। বিশ্বাসের যে কোন শক্তি থাকিতে পারে, অবিশ্বাসী তাহা মোটেই বিশ্বাস করিবে না। কারণ, সে যে কোন দিন বিশ্বাসের বাতাসও গায়ে লাগায় নাই।

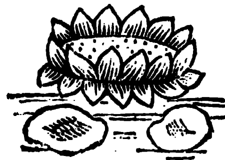
মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ কি জান? এই অবিশ্বাস। ঔরঙ্গজেব যদি পদে পদে সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ রাজ্যপরিচালকদের উপর এত অবিশ্বাস পোষণ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আরও কিছু দিন মোগলের বিজয় পতাকা ভারতের বুকে উড্ডীন থাকিত। আর ঠিক তার বিপরীতে বিশ্ব-বিশ্রুত বীর নেপোলিয়ান এই বিশ্বাসের বলে কি অসাধ্য সাধনই না করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। নেপোলিয়ানের বজ্র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর। সেই বিশ্বাসের বলেই তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তীদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন, তিনি জানিতেন এ বিশ্বাসের ব্যত্যয় কোন প্রকারেই হইবে না। বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিতে গেলেও তেমনি বুকের পাটা থাকা চাই। মহাবীর নেপোলিয়ানের সেই বুকের পাটা ছিল বলিয়াই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নগরবাসী প্রজা সাধারণের সমক্ষে আপনার বুক পাতিয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। দুর্ব্বলে কি ইহা সম্ভব?

দুর্ব্বলতাই অবিশ্বাসের প্রসূতি। কি জানি কখন কোন্ ছিদ্র অবলম্বন করিয়া কে কি অনিষ্ট করিয়া বসে, কখন বা কোন্ স্বার্থের হানি হয়, এই আশঙ্কাতেই অবিশ্বাসীর চিত্ত সর্ব্বদাই শঙ্কিত। অবিশ্বাসীর মনে কোন দিন শান্তি নাই।

জগৎকে তুমি যে রূপ ভাবিবে, জগৎটাও ঠিক তোমার নিকট সেই রূপই ধারণ করিবে। তুমি যদি জগতের ওপর অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ কর, দেখিবে জগৎটা বাস্তবিকই অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার স্থলে যদি বিশ্বাসের ভাব পোষণ করিতে

থাক, দেখিবে যে সমগ্র জগৎ তোমার কাছে বিশ্বাসী না হইয়া পারিবে না। আমরা ছেলেদের রীতি-নীতি শিক্ষা দেই, অষ্টপ্রহর তাহাদের নিয়ম কানুনের কঠোর নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করি, ভয়—পাছে ছেলে একটু ফাঁক পাইলেই খারাপ হইয়া পড়ে। তাদের উপর একটু বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না যে, তাহারা গণ্ডীর বাহিরে গিয়াও ভাল থাকিতে পারিবে। আর এই বিশ্বাসটুকু নাই বলিয়াই শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতার স্থানে বিফলতারই আবির্ভাব ঘটে বেশী। এই বিশ্বাসটুকুই যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারিলে, তাহা হইলে এতদিনের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল বলিতে হইবে। যদি ছেলেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাদের উন্মুক্ত আলো বাতাসে ছাড়িয়া দিতে, দেখিতে শুধু তোমার বিশ্বাসের বলে আর প্রকৃতির সহজ আবেষ্টনে তাহারা প্রকৃতই মানুষ হইয়া উঠিত। যতই বিধি নিষেধের কড়াকড়ি কর, যতই ছেলেদের অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা কর, তোমার ঐ অবিশ্বাসের ভাব তাহাদের মাঝে বিপরীত ক্রিয়া না করিয়াই পারিবে না। যদি তুমি বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিতে পার, দেখিবে ঘোর অবিশ্বাসীও তোমার স্পর্শে বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন জগৎকে বিশ্বাস নাই, তাঁরা নাকি জগৎকে বিশ্বাস করিয়া করিয়া ঠকিয়াছেন। তাঁদের কথার জবাবে বলি,—প্রকৃত বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাই ঠকিয়াছ; বিশ্বাস যদি খাঁটী হইত, তাহা হইলে আজ আর এ কথা বলিবার অবকাশ ঘটিত না। ভিতরে অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করিয়া, বাহিরে বিশ্বাসের আবরণ দিয়া তাহাকে ঢাকিলে কি বিশ্বাসের ফল পাওয়া যায়? ভিতরে বাহিরে এক হইয়া যাও, মানুষকে বিশ্বাস কর, জগৎকে বিশ্বাস কর। এই বিশ্বাসের বলেই তোমার কল্পিত ধারণা একদিন চুরমার হইয়া যাইবে, সঙ্কীর্ণতার স্থানে উদারতা আসিবে। দেখিবে জগৎটা বিশ্বাস-সূত্রেই গাঁথা।



উপদেশ

——:(*):——

(১৩৩৭ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

যোগ্যতা অর্জ্জন হলে কেউ কাউকে বন্ধন-দশায় ফেলে রাখ্‌তে পারে না। আমাদের সন্ন্যাসের মাঝে ব্যক্তিত্বকেই উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। নিজকে জান্‌তে পার্‌লে তখন আর কোন বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানুন থাকে না। তখন তুমি "পিঞ্জরাদিব কেশরী"র মত মুক্ত হয়ে গেলে! কিন্তু নিজকে জানা, নিজকে সত্য করে পাওয়া, এ অত্যন্ত কঠিন কথা। আমরা আমাদের আসল স্বরূপের সন্ধান পাই বহু কষ্টের ভিতর দিয়ে, বহু কৃচ্ছ্র-সাধনার ভিতর দিয়ে। নিজের ভেতরকার মালিন্য নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে না গেলে স্বরূপের সন্ধান মিলে না। এখন আসল কথা হল, নিজের ভিতরকার ময়লাকে দূর করা! গা-বাঁচিয়ে চলাতে নিজের কোন দিন উন্নতি হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি, নিজের আলস্য জড়তাকে প্রশ্রয় দিয়ে ধর্ম্মানুভূতি লাভের দরুণ তোমরা ব্যাকুল হয়ে ওঠ, কিন্তু এ ব্যাকুলতায় কোন ফল নাই। কৃপা লাভ করে কয়জন তোমরা সে কৃপার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ? এমন অনেক বার দেখেছি, আমি যাকে ভাল বলে একবার সার্টিফিকেট দিয়ে যাই, এরপর থেকেই সে আমার ভাল বলার মর্য্যাদা সুদে-আসলে আদায় করে সাঙ্গ করে দেয়। এর কারণ কি? একি আমার দোষ? একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তোমাদের মাঝে কত অভিমান, কত পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের পুঁজী রয়েছে। আমি ভাল বল্‌লে তখন আর তোমাদের ভাল হবার চেষ্টাটা আগের মতন থাকে না, তখন কেবল তোমরা আমার সার্টিফিকেট নিয়েই গর্ব্ব করে বেড়াও। আমার ভাল বলার উদ্দেশ্য—তোমরা আরও ভাল হও, উন্নত হও। কিন্তু ভাল বলার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উল্টো দাঁড়িয়ে যায়!

আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী চিরকাল। ভিক্ষা করতে গিয়ে কত জায়গায় যে অপদস্থ হয়েছি আমি, তা আর তোমাদের কি বল্‌ব? নিজে ভুক্ত-ভোগী বলেই তোমাদের আর সে পথে চল্‌তে যাতে না হয়, তারই আপ্রাণ চেষ্টা রয়েছে আমার। আমি চাই, তোমরা সব দিকে স্বাধীন হয়ে ধর্ম্ম পথে উন্নত হও। তোমাদের যা প্রয়োজন, তা তোমরা নিজেরা করে নাও। কারও কাছে যেন তোমাদের হাত পাত্‌তে না হয়। এইজন্যই তোমাদের কর্ম্ম করা। কিন্তু এই কর্ম্মের মাঝেও অভিমান এসে

পড়ুক্ত, যদি তোমরা আমাকে সব সমর্পণ করে না দিতে।

একবার ভেবে দেখ তো, কর্ম্ম করানো কি আমার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা স্বার্থের দরুণ, না তোমাদেরই সুযোগ-সুবিধা-উন্নতির দরুণ ?

কোনদিক দিয়ে আমি তোমাদের দুর্ব্বলতা দেখতে চাই না। ভিক্ষাটাকে সবাই হীন-চক্ষে দেখে। কেন,—তোমরা যুবক, তোমাদের শক্তি সামর্থ্য রয়েছে, পরের দুয়ারে তোমরা ভিক্ষা করতে যাবে কেন ? পরের সাহায্য নিয়ে আধ্যাত্মিক পথেও স্বাধীনভাবে চলা যায় না। এর চেয়ে নিজের শ্রম দ্বারা আর্জ্জিত যা, তা নিয়ে সগৌরবে সাধন-পথে উন্নত হওয়া যায়। আমি তোমাদের সব দিক দিয়েস্বাধীন দেখতে চাই !

আমি টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে তোমাদের দালান তুলে দিতে পারি, খাওয়া-পরার খুব সুবিধা করে দিতে পারি, কিন্তু এতে হবে কি ? এর চেয়ে আস্তে আস্তে অতি ধীরে ধীরে নিজের চেষ্টার ভিতর দিয়ে তোমরা সফলতা লাভ কর। তোমরা নিজেরা কৃষি কর। ক্ষেতের বড় বড় বেগুন, কুমড়ো, লাউ ইত্যাদি তরি-তরকারি দেখে আমার যে কি আনন্দ হয়, তা আর বলবার নয়। অথচ ইচ্ছা করলে পয়সা দিয়ে কিনেও যাতে এসব জিনিষ তোমরা আনতে পার, তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমি। কিন্তু এই প্রশ্রয়টুকু দিলে তোমরা নিজেরা আর কিছু করতে না। সব কাজে তোমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হ'ত। এই যে পরের দুয়ারে হাত পেতে থাকা, একে আমি নিদারুণ অভিশাপ বলে মনে করি।

স্বাধীন ভাবে আমরা কর্ম্ম করে যাচ্ছি, ভাবলে এর মাঝে কত আনন্দের উপকরণ পাওয়া যায়! তোমাদের এ খাটুনীতে বিন্দুমাত্র স্বার্থের গন্ধ নাই। কাজেই স্বাধীনভাবে তোমরা যত সহজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করবে, অন্য কেউ আর তেমন পারবে না।

তারপর নির্লিপ্ত ভাবে কি করে অজস্র কর্ম্ম করে যাওয়া যায়, তার আদর্শ তো তোমাদের সমর্পিত-জীবনের মাঝেই মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠবে। তোমরাই তো কর্ম্মের কৌশল শিখাবে জগৎকে, এর নামই তো যোগ। কাজেই আত্ম-সমর্পণের পথে যোগ আপনি ফুটে উঠে। নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত, নির্ম্মম হতে না পারলে ঠিক ঠিক কাজ হয় না। মানুষ খেটে মরছে, কিন্তু সেই খাটার মাঝে নানা দিক থেকে আবর্জ্জনা সঞ্চয়ের পথই রয়েছে, কিন্তু কর্ম্ম করেও নিষ্কাম হওয়া যায় একমাত্র সমর্পণের পথে।

তারপর আর একটা বিশেষ কথা বলে রাখি তোমাদের। আমাকে যারা ভালবাসে, তাদের কিন্তু সহজেই চিত্তের উন্নতি হয়ে যায়, কিন্তু কেবল নিয়ম-নিষ্ঠাকে ধরে যারা চলে, তাদের চিত্তের দিক দিয়ে সহজে তত উন্নতি দেখা যায় না। এর কারণ কি

জান? মানুষ নিয়ম-নিষ্ঠাকে আঁকড়ে ধরে যখন, তখন নিয়ম-নিষ্ঠার মূল বিষয় যিনি, তিনিই আড়ালে পড়ে যান। তাই নিয়ম-নিষ্ঠার মাঝে আত্ম-জাগরণের কোন সূত্র থাকে না।

নিছক ভালবাসা দ্বারা আমার কাছ থেকে অনেক দুর্ল্লভ জিনিষ আদায় করে নিয়েছে, এমন অনেক শিষ্য-ভক্ত রয়েছে আমার। তারা শাস্ত্র-টাস্ত্রের ধার ধারে না অথচ তাদের ভিতর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তত্ত্বের স্ফূরণ হয়। তা বলে যে পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য নাই, তা বল্‌ছিনে আমি, বরঞ্চ অনুভূতি আর পাণ্ডিত্য একত্রে যোগ হলে মণিকাঞ্চনের যোগের ন্যায়ই হ'ল। কিন্তু তমন অধিকারী কয়টা মিলে?

গুরুত্ব জিনিষটা ফুটে নিছক ভালবাসায় ও শ্রদ্ধায়! এইজন্যই গুরু অনেক পণ্ডিত-শিষ্যকে বাদ দিয়েও গুরু-গিরির ভার অর্পণ করে যান নেহাৎ সরল-সাধু শিষ্যের উপর। অকপট বিশ্বাস উৎপন্ন না হলে গুরুর কাছ থেকে আসল যা প্রাপ্য তা পাওয়া যায় না।

বিশ্বাসের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। খাঁটী বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের মাঝে অফুরন্ত বল সঞ্চয় হয়। তোমাদের কর্ম্মে উদ্যম আসে না, তোমাদের মন খারাপ হয়ে যায় যখন, তখন মনের মাঝে তলিয়ে গিয়ে দে'খো, তোমরা আমাকে ভুল্‌তে আরম্ভ করেছিলে। আমাকে যে ভালবাসে, আমার আদেশ তার শিরোধার্য্য। এই বিবেকানন্দের কথা তোমরা এত বল! বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে ভালবাসা দ্বারাই মুগ্ধ করে ফেলেছিল। এ জায়গায় বিবেকানন্দের একটী উক্তি উদ্ধৃত না করে পারছি না। কি সুন্দর কথা! রামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলছেন—"It is not just your words that attract me. I love you and need to see you."—আমি তোমার কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে আসিনি, তোমাকে আমার ভাল লাগে, ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হয়, তাই তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারি না।"

এই ভালবাসা পেয়েই বিবেকানন্দের ভিতর যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ফুটে উঠ্‌ল। কাজেই সবার মূল হল—ভালবাসা। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে কোন Philosophy পড়ান নি, বা রামকৃষ্ণের ভিতর তেমন কোন পাণ্ডিত্য ছিল না, কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে যা দিয়েছিলেন, তার সাহায্যেই বিবেকানন্দের ভিতর এত পাণ্ডিত্য, এত আশ্চর্য্য শক্তির স্ফূরণ হল।

আমার কারও উপর জোর-জুলুম নাই। তোমাদের সকলকে আমি স্বাধীন ভাবে চল্‌বার অবকাশ এবং সুযোগ দিয়েছি। এমন কি সাধন-ভজন সম্বন্ধে তেমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই আমার। তোমাদের ভিতর আধ্যাত্মিক ভাব স্বতঃস্ফূর্ত্ত হোক্, এই আমার

তোমাদের ভিতর যেন অভিমান না আসে। এখানের একমাত্র শত্রুই হল তোমাদের—অভিমান। কৃপা লাভ করা সহজ, কিন্তু কৃপা হজম করা বড় শক্ত কথা। এইজন্যই বলি, তোমরা দেহে-মনে-প্রাণে বীর্য্যবন্ত হও। কোন দিকে এতটুকু খুঁতও যেন তোমাদের না থাকে।

(ক্রমশঃ)

আরণ্যক

—)•(—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।"

—ঋগেদ সংহিতা

পথ যখন ভুল হয়, তখন সাথে সাথে অনেক সময় দিক্ ভুলও হয়ে যায়। যে দিক লক্ষ্য করে যাত্রা করেছ, সে দিকই যখন ভুল হয়ে গেছে, তখন আর চলা ঠিক হবে কি করে? কিন্তু অভিমানে মনে হয়, বুঝি ঠিকই চলা হচ্ছে। তাই যদি শেষ ভাল চাও, অভিমান ছেড়ে যে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নেয়, অবিচারে তাঁকে নির্ভর কর। নির্ভরকারীকে স্বয়ং ভগবানও ঠকাতে পারেন না।

* * *

দুর্য্যোগ চির দিনই হতে থাকবে—তাতে ভয় নাই। বুকের জোরে তার হাত হতে ত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে সেই বুকের জোরই উল্টো দিকে গিয়ে মরণ আনে। কাজেই সাবধান! আসল সর্ষেই যেন ভূতে না পায়—তাহলেই ভূতের হাতে মরণ।

* * *

দেবতারও ছদ্মবেশ ধরা যায়, কিন্তু আপন বুদ্ধির ছদ্মবেশই ভয়ানক।

* * *

চাও কি? একটু শান্তি?—আরাম? তা বাইরে নাই। বাইরে ক্ষণেকের তরে যদি বা পাও, তখনি আপন অন্তরে হুসিয়ার হয়ে তা ভোগ ক'রো—নতুবা দুঃখের কীটের কাছে নিস্তার পাবে না।

* * *

কত দিন আর ছদ্মবেশে বেড়াবে? বাইরে ছদ্মবেশ থাকতো, তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ও যে ছদ্মবেশ, সেই কথাই যে ভুলে যাচ্ছ! কাজেই আসল যে স্বরূপ, তারই স্মরণ কর।

* * *

কতই তো করলে, কারও মন উঠল কি? এখন আসল জনের মন পেতে চেষ্টা কর, দেখবে

সেই আসলের মন উঠ্‌লে সবারই মন উঠ্‌বে — সবই তখন আনন্দময় হবে!

* * *

পরের বড় কথা শোনায় কাজ নাই—আপন মনের ছোট কথাগুলি আগে শোন। বিবেকের সামান্য কথাটী মেনে চল্‌বে না, ওদিকে লম্বা কথা শুন্‌তে চাও—ঠক্‌বে যে নিজে।

* * *

পরোপকার খুবই ভাল, কিন্তু আত্মশক্তির পরিমাণ কতটুকু সে বিচার না করে শুধু উচ্ছ্বাসবশে পরের হিত করতে গেলে অনেক সময় হিত না হয়ে অহিতও ঘটতে পারে। তখন তার মনোগত উদ্দেশ্য ভাল বলে সেই পরের ক্ষতির পরিমাণ যে কম হবে তা নয়, আর ভগবানের বিচারেও উদ্দেশ্য ভাল ছিল বলে আত্মবিচারের দোষ ক্ষালন হবে না। কাজেই শুধু মহৎ উদ্দেশ্য হলেই হবে না—তদনুযায়ী শক্তি সংগ্রহ ও ধৈর্য্যের মত্তাসংযমও চাই। শুধু উচ্ছ্বাসে পড়ে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করলে তার ফল বড় বেশী ভাল হয় না।

মানুষের মাঝে সব কিছুর সম্ভাব্যতা থাকলেও এই জন্মে তার প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বীজেরই পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। কাজেই এই জীবনেই যে সে যা কিছু ধরবে, তাতে সর্ব্বতোভাবে সফল মনোরথ হতে পারবে, এমন নাও হতে পারে। কিন্তু সমস্ত প্রারব্ধের উপর দিয়ে ক্রিয়মান কর্ম্মের জোরে এমন নূতন বীজ আপনার মাঝে ফলিয়ে তুল্‌তে পারে যে, যার সম্পূর্ণ বিকাশ এ জন্মে না হলেও বহু দূর বিকাশ হয়ে সম্পূর্ণ বিকাশে হয়ত মাত্র তার একটী জন্মের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বেগবান্ কোনও প্রচেষ্টার ফলই নষ্ট হয় না। প্রারব্ধে যাই থাকুক না কেন, তাতে নিরুৎসাহের কোন কারণ নাই।

সংবাদ ও মন্তব্য

----)•(----

জন্ম-মহোৎসব

আগামী ১০ই ভাদ্র বৃহস্পতি বার ঝুলন পূর্ণিমাতে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে (পোঃ কাথুলী, জেলা নদীয়া) মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত এবং আর্য্য-দর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। সকল বিভাগের ভক্তগণেরই উৎসবে যোগদান বাঞ্ছনীয়। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজও উৎসব উপলক্ষ্যে গুরুধামে পদার্পণ করিবেন।

দান প্রাপ্তি

[মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম]

বালেশ্বর ঃ—

শ্রীযুক্তাঃ—শঙ্কর দাস কন্ট্রাক্টার ১৲, নলিনী বালা রায় ১৲, চারুলতা বসু ১৲, খুচরা সংগৃহীত ৬৷০।

রাজনীল গিরি (উড়িষ্যা) ঃ—

শ্রীযুক্তাঃ— পাটরাণী সাহেবা নীলগিরি ষ্টেট্ ২৲, রাণী সাহেবা নীলগিরি ষ্টেট্ ২৲, এইস্. পি কাপুরিয়া—পাটরাণী সাহেবার সেক্রেটারী ২৲, হরে কৃষ্ণ সামন্ত—দেওয়ান ১৲, এস্ পি দাস সেক্রেটারী নীলগিরি ষ্টেট্ ১৲, খুচরা সংগৃহীত ২৲।

ভদ্রক (উড়িষ্যা) ঃ—

শ্রীযুক্তাঃ—অনন্ত প্রসাদ পাণ্ডা সবডিপুটী ১৲, বৈদ্যনাথ রায় মুন্‌সেফ ১৲, অক্ষয় কুমার মিত্র উকিল ১৲, হরি দেও ঘোষ ১৲, সুধীর কুমার বসু ব্লক-ইন্‌স্পেক্টর ১৲, বানাম্বর দাস ১৲, নরেন্দ্র প্রসাদ দাস উকিল ১৲, কার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ্র এস্, ডি, ও ১৲, সুরেশ চন্দ্র মিত্র ১৲, বৃন্দাবন চন্দ্র মহান্তি ১৲, জয়কৃষ্ণ পাত্র ১৲, গোকুলানন্দ নায়েক হেড্ মাষ্টার ১৲, বিম্বাধর খণ্ডায়েৎ ১৲, ভোলা নাথ সিনা ডাক্তার ১৲, জগন্নাথ প্রসাদ দাস ১৲, কো-অপারেটীভ্ ব্যাঙ্ক ১৲, খুচরা সংগৃহীত ৩৲।

পুরুলিয়া (ছোট নাগপুর) ঃ—

শ্রীযুক্তাঃ—রাম কিঙ্কর ওঝা ৪৲, সুরেন্দ্র নাথ বসু ইঞ্জিনিয়ার ২৲, শচীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ২৲, সতীশ চন্দ্র সিংহ ১৲, শালগ্রাম মাড়োয়ারী ১৲, কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১৲, মহাতপ ভট্টাচার্য্য ১৲, হরিপদ দাঁ ১৲, নবাব হোসেন ১৲, মানভূম ট্রান্স-পোর্ট অফিস ১৲, ষ্টেশন মাষ্টার ১৲, কৃষ্ণ জেনারেল ষ্টোর ১৲, খুচরা সংগৃহীত ৮৸৶০।

কাশীপুর (মানভূম) ঃ—

শ্রীযুক্তাঃ—পঞ্চকোট রাজ ষ্টেট্ ৫৲, জনার্দ্দন কিশোর লাল সিংহ দেব ৪৷৶০, জগন্নাথ কিশোর লাল সিংহ দেব ১৲, শিব নারায়ণ সিংহ দেব ১৲।

ঝালদা (মানভূম) ঃ—

রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত উদ্ধব চন্দ্র সিংহ ১৲, খুচরা সংগৃহীত ৸৶০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ আমাদের একান্ত অনুরোধে জন্মোৎসবের সময় (১০ ই ভাদ্র) কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে শুভাগমন করিবেন। সমস্ত গুরুভ্রাতাদের উৎসবে যোগদান ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহারা আসিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুধামের সেবায়েৎকে পূর্ব্বেই জানাইলে বাধিত হইব।

যিনি যাহা স্বেচ্ছায় সাহায্য করিবেন, তাহা শ্রীশ্রীগুরুধামের সেবায়েতের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত

শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেসিডেণ্ট, গুরুধাম উৎসব-সমিতি।



২৪শ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৩৮ | ১ম খণ্ড
সমষ্টি সং ২৫৫ | ৪র্থ সংখ্যা

তপসা চীয়তে

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥

তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম বড় হইলেন, উপচিত হইলেন। তপস্যা অগ্নিময় শক্তির প্রসূতি। ব্রহ্ম যখন তপস্যা-নিরত হইলেন, তখনই শক্তির আতিশয্যে তিনি সৃষ্টি-কার্য্যের দরুণ উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। কাজেই জগৎ আর কিছুই নয়—ব্রহ্মেরই উপচিত শক্তির স্থূল-বিকাশ মাত্র!

ব্যাপ্তির মূল কেন্দ্রই হইল তপস্যা। এই তপস্যার ভিতর দিয়াই অব্যর্থ

শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। কাজেই বড় হইবার, জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবার মূল উপায়ই হইল তপস্যা। তপস্যা দ্বারা মানুষের অনবদ্য-শক্তি আয়ত্ত হয়। এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, বড় হইতে হইলে ভিতরে তাপ সঞ্চয় করিতে হইবে। সেই তাপ দ্বারাই, তপস্যা দ্বারাই জীবনের ব্যাপ্তি (Expansion)! 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম' (Brahma became enlarged through meditation)!

আমরা বড় হইতে চাই, জগতে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে চাই, কিন্তু বড় হওয়ার মূল সঙ্কেতই ভুলিয়া গিয়াছি। তপস্যা ছাড়া কোন জাতি কোন দিন উন্নত হইতে পারে নাই। ভিতরে ভিতরে তপঃশক্তির ফল্গুধারা নীরবে বহিয়া না গেলে মানুষ কিছুতেই উন্নত হইতে পারিত না।

কাজেই তপস্যাই ব্যাপ্তির উপায়। সকলের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে নিজকে বড় হইতে হইবে, মহৎ হইতে হইবে—আর বড় হওয়ার বীজমন্ত্র তপস্যার মাঝেই প্রসুপ্ত! ভিতরে তাপ সঞ্চয় হইলেই বড় হইবার উদগ্র বাসনা দেখা দেয়। যাহার ভিতর তাপ নাই, সে কোন দিন যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। বুদ্ধদেব বড় হইয়াছিলেন অন্তরের অসহ্য জ্বালায় বা তাপে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনও এই তপঃশক্তির প্রভাবেই রূপান্তরিত হইয়াছিল। আজীবন তাঁহার ভিতর এই তাপ সঞ্চিত ছিল বলিয়াই মহাপ্রভুর সাধনা হইয়াছিল তাঁহার চিরসঙ্গী। এই তাপ সঞ্চয় হইয়াছিল পরমহংস রামকৃষ্ণের বুকে—তাই বিবেকানন্দ প্রভৃতির নব-জন্ম লাভ!

তপস্যাই শক্তি-সঞ্চারের অফুরন্ত অক্ষয় উৎস। মানুষ যে মানুষকে স্পর্শ দ্বারা জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়, তাহার মূলেও রহিয়াছে এই তাপ, সঞ্চিত-অনুভূতির উত্তাপ! এই তাপের সাহায্যেই জগাই-মাধাইএর মত পাষণ্ড মানুষকেও মহাপ্রভু গলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন!

যে যত বড়, তাহার বুকে তত বেদনা। এই বেদনাতেই আনন্দ—কেননা বেদনাই যে প্রসব করে, সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টি দেখিয়াই প্রসব-ব্যথা নিঃশেষে ভুলিয়া যাওয়া যায়। মা যখন সন্তানের মুখ দেখিতে পান, তখনই তাঁহার প্রসবের অসহ্য বেদনার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া যায়। কাজেই বেদনাই আনন্দ, দুঃখই সত্য।

জগতের মূলে আনন্দ যেমন সত্য, তেমনি তপস্যা, তাপ বা দুঃখও সত্য।

এই তাপই আনন্দে রূপান্তরিত হয়। তখন দুঃখের ভিতরও শান্তির অবধি থাকে না। আনন্দ আর কিছুই নয়—দুঃখেরই রূপান্তর! দুঃখই সত্য।

সৃষ্টিকর্ত্তার মন অন্তর্ম্মুখী না হইলে সৃষ্টি হয় না। এইজন্যই ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে গিয়া নিজের মাঝে ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। সৃষ্টি আগে হয় নিজের মনে, তাহার পর তাহার রূপ ফুটিয়া উঠে বাহিরে। রূপ-সৃষ্টির আসল ক্ষেত্রই হইল নিজের অন্তর। স্রষ্টা মাত্রই—ধ্যানে স্তব্ধ! সমাহিত হইতে না পারিলে শক্তি-সঞ্চয় হয় না; আর শক্তি-সঞ্চয় না হইলে উপচিত-শক্তির জন্ম হইবে কোথা হইতে?

নিজের মাঝে নিজে পূর্ণ হইয়া উঠি কখন—যখন এতটুকু শক্তিরও কোন দিকে অপচয় হয় না। শক্তিকে ধারণ করিতে হইলেই চাই তপস্যা। বীর্য্য সকলেরই আছে, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ ধারণ করিয়াই একজন হয় অতি মানুষ, আর তাহারই অপব্যয়ে আর একজন হয় পশু! কাজেই শক্তিকে ধারণ করিয়া রাখিবার শক্তিই হইল আসল। অবিক্ষুব্ধ অচঞ্চল হইতে না পারিলে, শক্তির শান্ত-রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। চঞ্চল মানুষ দেখিতে পায় তাণ্ডব-লীলা—আর ভোলানাথ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে এই তাণ্ডবের মাঝেও শান্তিকেই নিরীক্ষণ করেন।

বড় হইতে হইলে নিজের মাঝে নিঃশেষে ডুবিয়া যাইতে হইবে। ভারতের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির এই বাণী। কাজেই অন্যান্য জাতির আদর্শ ধরিয়া চলিলে আমাদের কল্যাণ নাই: আমাদের বড় হইবার পথ ঝগড়ার পথ নয়, অশান্তির পথ নয়, সে হইল সামঞ্জস্যের পথ—শান্তির পথ!

নিজে পরিপূর্ণ শক্তির ধারণ কর্ত্তা হইতে পারিলে তখন বাহিরের বৈচিত্র্যের মাঝেও বিরোধের সুর পঞ্চমে চড়িয়া উঠে না। প্রত্যেকেই যেখানে শক্তিধর, সেখানে কাহারও সৃষ্টির মাঝে ন্যূনতা বা গলদ থাকিতে পারে না।

এইজন্যই বলি, মিলিত হইতে হইলে অন্তরের দিক দিয়া মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে আমাদের। আমাদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বাহিরে নয়—অন্তরের সঙ্গেই আমাদের বোঝা পড়া!

ব্রহ্মকে যে জানিতে চায় (অর্থাৎ যে বড় হইতে চায়)—তপস্যাই তাহার উপায়! "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"—স্বয়ং ব্রহ্মাও বড় হইলেন তপস্যাকে অবলম্বন

করিয়া। শিক্ষায়-দীক্ষায় তপস্যাকে অবহেলা করিয়া চলিলে আমাদের কল্যাণ নাই।

নিজে পূর্ণ হইতে পারিলে, শক্তি আপনি উপচিত হইবে। আর পূর্ণ হইবার একমাত্র উপায় তপস্যা! আমরা বাহিরের দিকে যতই বড় হই না কেন, যতই সম্মানের উপাধি লাভ করি না কেন, কিন্তু আসলে ভিতর আমাদের জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হইয়া না উঠিলে, আমরা নিজেও শান্তি পাইব না—অপরকেও সান্ত্বনা দিতে পারিব না।

সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, আসুরিক শক্তি—এই সব দ্বারা মানুষ বড় হইতে পারে না। 'তপসা চীয়তে'—তপস্যা দ্বারাই মানুষ বড় হয়।

বাহিরের সঙ্গে লড়াই করিতে হইলেও চাই আন্তরিক শক্তি—আর সেই শক্তি তপস্যা ছাড়া আয়ত্ত হয় না।

সিদ্ধির সঙ্কেত

আমরা দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের অভিঘাতে বিচলিত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি—সহজেই আমাদের চিত্তের অনাবিল আনন্দ-স্রোত মলিন হইয়া ওঠে, কিন্তু মহাপুরুষদের ঠিক ইহারই বিপরীত অবস্থা। অর্থাৎ তাঁহারা এমন অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে সুখ-দুঃখের তরঙ্গ অনেক নীচেই পড়িয়া থাকে, তাঁহাদের সেই উচ্চ অবস্থাকে কোন কিছুতেই বিচলিত, স্পর্শ করিতে পারে না।

গীতাতেও এইরূপ একটী শ্লোক আছে—'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।' অর্থাৎ এমন অবস্থাও মানুষ সাধন বলে আয়ত্ত করিতে পারে, যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে কোন দুঃসহ দুঃখেও বিচলিত করিতে পারে না। মনে হয়, ইহাই বোধ হয় মহাপুরুষত্ব! এই তিতিক্ষা-শক্তিতেই বোধ হয় মানুষ মানুষের চেয়ে এত বড় হইতে পারে।

আর সাধারণতঃ আমরা দেখিতেও পাই—মহাপুরুষদের কি অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এত দুঃখ সহিয়াও, এত নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও তাঁহারা জগৎকে এমন অমূল্য জিনিস বিলাইয়া দিয়া যান, যাহাতে তাঁহাদের নাম কত শত বর্ষ ধরিয়া স্মৃতির মাঝে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখা থাকে! যত মহাপুরুষ আসিয়াছেন, সবাই দুঃখকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। পরের দরুণ অবিক্ষুব্ধচিত্তে দুঃখ সহিয়া যাওয়াটাই যেন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। তাই তাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের কল্যাণের দরুণ নিজের প্রাণপাতী সাধনায় জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।

গুরুতর দুঃখও যদি চিত্তকে বিচলিত না করিতে পারে, তাহা হইলে তো সর্ব্বত্র জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা দুঃখ সহ্য করিতেই অপারগ, তাহার উপর যদিই বা সহ্য করি, তাহা হইলেও চিত্তকে অবিক্ষুব্ধ রাখিতে পারি না। এইজন্যই দুঃখে আমাদের চিত্তের উন্নত অবস্থাকে অনেক নিম্নে নামাইয়া লইয়া আসে। দুঃখে পড়িলে আমরা কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই, ভগবানের কথা মনে থাকে না, কাজেই দুঃখ তো আমাদের কাছে প্রতিবন্ধক! কিন্তু এই দুঃখকে যিনি নীরবে সহিয়া যাইতে পারেন, তিনি যে এই নিদারুণ দুঃখের মাঝেও ভগবানেরই মঙ্গল আশীর্ব্বাদ অনুভব করেন! দুঃখে তো তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।

আমাদের সেই নির্ব্বিকার দ্বন্দ্বাতীত অবস্থাই জীবনের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন। গুরুতর দুঃখেও যদি চিত্তে চাঞ্চল্য না আসে, ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিবার প্রবৃত্তির উদয় না হয়, তাহা হইলেই তো তুমি মহৎ—তুমি সাধু হইয়া গেলে।

এখন সেই অবস্থা কি করিয়া লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মানুষের তিতিক্ষা-শক্তি একদিনে আয়ত্ত হয় না, তাহার দরুণ তিল তিল করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। সেইজন্যই দৈনন্দিন অভ্যাস-প্রযত্নই হইল তাহার একমাত্র উপায়! প্রথম প্রথম দুঃখে চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিবেই। কর্ম্মময় সংসারের কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া জীবনের প্রশান্তির দিকটা খুব কমই লক্ষ্য পড়ে, এইজন্যই বাহিরের সুখ-দুঃখের অভিঘাতে এত চঞ্চল হইয়া উঠি আমরা। কিন্তু এই আবর্ত্তে পড়িয়াও জীবনের প্রশান্ত প্রবাহের দিকে লক্ষ্য থাকিলে, তখন বাহিরের এই উত্তেজনার ক্ষণিক স্রোতে বড় কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া স্থির ধীর মস্তিষ্কে আপন লক্ষ্যের উজ্জ্বল স্মৃতি লইয়া চলা বড় সহজ কথা নয়। এই অবস্থা সাধন-সাপেক্ষ।

সবই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাকে নিজের অধিকারে বা আয়ত্তে আনিতে হইলেই সাধনার প্রয়োজন। দুঃসহ দুঃখেও মানুষ কিছুমাত্র বিচলিত হয় না—এইরূপ একটা অবস্থা আছে। কিন্তু সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে চিত্তের একাগ্র শক্তি, তিতিক্ষা শক্তিকে অসম্ভব রূপে বাড়াইয়া তুলিতে হয়! মাঝে মাঝে আমাদের মাঝেও সেই অবিক্ষুব্ধ নির্ব্বিকার অবস্থা আসে, কিন্তু তাহা ইচ্ছামাত্র আমরা আনিতে পারি না। এই খানেই আমাদের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, আর ইহার দরুণই কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে নিজের লক্ষ্যকে স্থির রাখিয়া চলিতে পারি না।

দুঃখ জগতে থাকিবেই, কেননা দুঃখ যে পরম সত্য! কিন্তু মানসিক অবস্থার উন্নতি-অবনতি দিয়াই এই দুঃখেরও বিভিন্ন পরিণাম হয়। বহির্জগতের শত্রু থাকিলেও যে বড় কিছু আসে যায় না, তাহা আমরা মহাপুরুষ-চরিত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারি। তাঁহারা ভগবানের বিচার-বিবেচনার মাঝে খুব কম ভুলই দেখিয়া থাকেন—এই জন্যই দোষারোপ করার চেয়ে আত্ম-সংশোধনের ওপর তাঁহাদের জোর বেশী। অপরকে জাগাইতে গিয়া, নিজেরা স্বেচ্ছায় তাঁহারা দুঃখকে বরণ করিয়া লন।

যাহা সত্য, তাহাকে কোন কিছু দিয়াই ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী শত্রুকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মানুষ ইচ্ছাশক্তির জোরে বাহিরের জিনিসকে ভিতরে একদম প্রবেশাধিকার দিতে না পারে। দুঃখ

বাহিরের জিনিষ—বাহিরেই তাহার সত্যতা, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরে তাহার বিন্দুমাত্র আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা নাই, তাহা না হইলে এত দুঃখ সহ্য করিয়া, মানুষ এত লোকহিতকর কার্য্য করিয়া যাইতে পারিত কি? তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে মহাপুরুষত্বের লক্ষণ বা নিদর্শন এই হইল যে, তাঁহাদের সহ্যশক্তি বা তিতিক্ষা শক্তিটা অসীম। এই জায়গায়ই সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁহারা অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন। সাধারণ মানুষ সেই পূর্ণ অবস্থা লাভ করিতে পারে না, যেখান হইতে সুখ-দুঃখ অতীব তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সামান্য রোগ-শোকের জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়া পড়ি, ইষ্টনাম তখন ভুল হইয়া যায়। কিন্তু গলায় এই দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়াও পরমহংস দেব কি করিয়া অনর্গল ভাবে লোককে উপদেশ দিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাই চিন্তার বিষয়, অনুধাবনের বিষয়! রোগ সকলেরই হয়, তিনিও মানুষ, রোগ তাঁহারও হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের চেয়ে তাঁহার বিশেষত্ব হইল এই যে, তিনি রোগকে ভুলিয়া, কিম্বা রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও, জগতকে আনন্দের বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষত্ব বা বিশেষত্ব এই জায়গাতেই।

দুঃখ থাকিলেও দুঃখে কোন ক্ষতি বা বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না, এইরূপ অবস্থা যখন রহিয়াছে, তখন সেই অবস্থাই আমাদের আদর্শ। দিনের পর দিন সাধনা করিয়া আমাদের সেই চরম অবস্থাতেই পৌঁছিতে হইবে। সেই অবস্থা লাভ করিয়া যদি আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তাহা হইলে নির্ঝঞ্ঝাটে, বিনা কলরবে যে কত মহৎ কাজ সম্পন্ন হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই!

আশে পাশের সুখ-দুঃখে, চিন্তায়-ভাবনায় আমরা চঞ্চল হইয়া উঠি, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠি, এই জন্যই বিক্ষুব্ধ চিত্ত লইয়া অপরের হিত সাধন আমাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। জগতে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহারা খুব স্থির ধীর প্রশান্ত প্রকৃতির লোক। নিজের মাঝে সর্ব্বদা প্রশান্তিকে অব্যাহত রাখিতে পারেন বলিয়াই তাঁহারা নীরবে এত কাজ করিয়া যাইতে পারেন।

আমরা দুঃখকে দূর করিতে গিয়া বাহিরে যত শক্তির অপব্যয় করি, সেই শক্তিকে সংহত করিয়া যদি অন্তর্ম্মুখী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় দুঃখকে না তাড়াইয়া, উৎপীড়ন না করিয়াও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ সহজ সাধ্য হইত।

সাধক আমরা, সমর্পিত জীবন আমাদের: তিতিক্ষা শক্তি অর্জ্জন করিয়া নির্ব্বিরোধে, ভগবানের বিচারে কোন রূপ দোষারোপ না করিয়া মহত্ত্বের পথ ধরিয়া চলিতে হইবে আমাদের। মানুষ ভিতরের শক্তিতেই বড় হইয়া উঠে, এই কথাটী সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। দুঃখ যদি আসেই তাহাতেই বা বিচলিত হইব কেন? কেননা যিনি দুঃখ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে দুঃখের চেয়েও বড়, দুঃখের চেয়েও মহৎ—আর তিনিই তো আমাদের জীবনের আদর্শ। কাজেই ভাগ্যে যাহা আসে, তাহা লইয়া অসন্তোষ বা ক্ষোভ প্রকাশের কোন হেতুই তো তখন থাকিবে না।

গুরুতর দুঃখ আমদের উপর আসিবেই। শত নির্য্যাতন ভোগ আমাদের হয়ত করিতেই হইবে, কিন্তু সেই দুঃখে যেন চিত্তের অধ্যাত্ম-প্রসাদ বিনষ্ট না হয়, তাহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিন্তু দুঃখ লইয়া, দুঃখ সহিয়াও যদি প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের নাম করিতে করিতে মরিতে পারি, তাহা

হইলে তাহার চেয়ে গৌরবের বিষয় কি থাকিতে পারে?

আজ আমাদের সব দিক দিয়াই তিতিক্ষা-শক্তি কেই বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। নিরুপায় বলিয়া নয়—ইহাই যে আদর্শ পথ! জগতে এই পথেই একদিন শান্তি আসিবে।

অন্যায়ের প্রতিকার

-)•(-

জগতের মূলে এক মহা আনন্দ বা মঙ্গলের প্রেরণা রয়েছে; তাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষ সর্ব্বদা চায় কিসে তার মঙ্গল হবে। মানুষ মাত্রেই ভাল করতে বা ভাল হতে চায়—কারও ইচ্ছা হয় না যে, তার দ্বারা এমন কিছু হোক্, যাতে তার নিজের অমঙ্গল হয়। পশুপক্ষী সবাই যা কিছু করছে, প্রত্যেকের মূলেই একটা শুভ প্রেরণা রয়েছে, এমন কি যে হিংস্র জন্তু অপর প্রাণীর প্রাণ বধ করছে, তাও তার নিজের শুভ-কামনার বশেই করছে। সর্ব্বত্র সবাই নিজের মঙ্গলের আশাতেই যত কিছু ভাল-মন্দ কাজ করে। আপাততঃ মন্দ হলেও পরিণামে ইষ্ট-বস্তুই সকলের কাম্য। ইষ্ট সম্বন্ধে যার যেমন জ্ঞান, সে তেমন উপায় খোঁজে।

সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যে স্তরভেদে যে যেমন উঁচুদরের, আপন স্বার্থও তার সেই পরিমাণে বিস্তৃত। তাই দেখা যায়, কোন প্রাণী একা নিজের পেট ভরিয়ে আপন গণ্ডীর মাঝেই বাস করে, আবার কতকগুলি প্রাণী যূথবদ্ধ হয়ে বিপদে-আপদে অথবা আহারাদির অন্বেষণে একে অপরের সাহায্য গ্রহণ করে।

পরস্পরে যোগাযোগ ভিন্ন মানুষ জীবন ধারণে অক্ষম। যদিও সৃষ্টি বজায় রাখ্‌বার জন্য স্রষ্টার বিশেষ কৌশল বশতঃ প্রত্যেক জীবই অধিক না হোক্, অন্ততঃ আর একটী তৎসদৃশ প্রাণীর ভিতর আত্মবিস্তার না করে পারে না, তথাপি মানুষ শুধু সেই কারণেই আত্মবিস্তার করে না। মানুষ চায় প্রাণ বা আনন্দ। জৈব প্রেরণা বশে যে স্বাভাবিক আত্মবিস্তার, তার অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী অথচ পরম আনন্দের। মঙ্গলরূপী এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে গিয়ে মানুষ অনেক প্রকার বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করেছে। মানুষের মাঝে যারা জ্ঞান দ্বারা পশু হতে বিশেষ উন্নত হতে পারে না, তারা সে বিজ্ঞান খোঁজে না, সুতরাং আপন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির আনন্দকেই পরম সুখ ও মঙ্গলকর বলে ভেবে তারই উপকরণ জুটাতে থাকে, আর সেই অবৈজ্ঞানিক ভোগের ফলে অতৃপ্তির আগুনে দগ্ধ হয়।

তবু তার মূলে কিন্তু মঙ্গল বা তৃপ্তির কামনাই থাকে। তৃপ্তির আনন্দ খুঁজ্‌তে গিয়ে না জেনে হিতে বিপরীত হয়ে যায়। এখানে যদি সেই তৃষ্ণাকে বাধা দেওয়া যায়, প্রবৃত্তিকে একেবারে রুদ্ধ কর্‌তে যাওয়া যায়, তবে সে ভাব্‌বে যে

আনন্দের প্রেরণায় তাকে লুব্ধ করেছিল, বুঝি বা তাহ'তে সে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই স্বার্থহানির ভয়ে সে তখন রুখে ওঠে।

এখানে আসল ব্যাপারটা কি হল ? মূলে আনন্দ-রূপী যে বিরাট সত্য ছিল, সেই আনন্দের রূপ ওই তৃষাতুরের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে বলেই তা হতে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা তার মনে পীড়া দিচ্ছে, তা থেকেই তার ভয়ের উৎপন্ন হচ্ছে। তা হলে সে যে মহা আনন্দ চেয়েছিল, সে আনন্দ খারাপ বস্তু নয়। আনন্দ করাটা অন্যায় নয়, আনন্দের উপায় বা যথার্থ তৃপ্তিদায়ক আনন্দ কি তা বুঝ্‌তে না পারায় বিকৃত আনন্দোপভোগটাই অন্যায়।

কাজেই মানুষ যা চায়, সেটা অন্যায় নয় ; তা পাওয়ার পথটা সে ধর্‌তে না পেরে, বিরাট আনন্দকে ত্যাগ করে বিরাট সত্যের ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র গ্রহণ করে বলে আমরা তাকে অন্যায় আখ্যা দেই। বিরাট শাশ্বত ভূমাকে ছেড়ে ক্ষুদ্র, ক্ষণিক, তুচ্ছের ভজনাই অন্যায়।

আমরা সাধারণ মানুষ যাকে অন্যায় বলে, পাপ বা কুৎসিৎ বলে শুধুই ঘৃণা কর্‌তে শিখেছি, মহান্ হৃদয়ের কাছে তার মধ্যেও সত্য আবিষ্কারের পথ সুস্পষ্ট হয়। আমরা পাপাচারীকে ঘৃণা করে তাকে ত্যাগ কর্‌তেই বলি, তার মাঝে ভয় ঢুকিয়ে অনুতাপ আন্‌বার চেষ্টাই উত্তম বলি, কিন্তু সত্যদ্রষ্টা হিন্দুঋষি সে কথা বলেন না। ভ্রষ্টকে তিনি আর ভীতি প্রদর্শনও করেন না—তাই বলে পাপের পথে আর প্রচোদিতও করেন না। তিনি যাহা বলেন, তার অর্থ এই যে,—"তুমি যা করেছ, তা তোমার দৃষ্টিতে কিছু অসুন্দর কর নাই, কাজেই ভয় করে লুকাবার কিছু নাই তোমাতে, কিন্তু যে মহান্ আনন্দের কণিকা নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হও, তার পূর্ণাবয়ব যে তোমারই অধিকারে, তা যে তোমারই প্রাপ্য ! এস তুমি, তুমি তাই লও।"

"সেই বৃহৎকে স্বল্পের জন্য ছেড়ে দিয়ে তুমি যা করছ, তা হচ্ছে ক্লিন্ন ভোগ—সুতরাং লজ্জা কর। আর স্বল্পকে বৃহতের জন্য যে ছেড়ে দেওয়া, অর্থাৎ যা নাকি বৃহৎ ভোগ, তাই হচ্ছে ত্যাগ এবং তারই আনন্দ শাশ্বত আনন্দ। "ভূমৈব সুখম নাল্পে সুখমস্তি"—এই ভূমাকে পরিত্যাগ করে ক্ষুদ্রে আসক্তিই পাপ। প্রকৃত আনন্দের কামনা, যথার্থ সুখের বাসনা দোষের নয় ; বিকৃত আনন্দের, বিকৃত সুখ লাভের প্রচেষ্টাই পাপ। তাই ত্যাগ কর্‌তে হবে। ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করে তা হতে বঞ্চিত হয়ে মহান্‌কে সঞ্চয় করা চাই। আর সে সঞ্চয়ের শক্তিও তোমাতেই যে বর্ত্তমান। সদা বিদ্যমান সেই মহান্ আনন্দের আশ্রয় নাও, তুমি যা চাও পাবে, তুমি নিশ্চিত তৃপ্তি লাভ করবে।"

কিন্তু মহান্ হৃদয়ের এই যে পরম মঙ্গলকর বাণী, পরম হিতকর এই যে শুভেচ্ছা, সাধারণের পক্ষে তাও উৎকট মনে হয়। আপনার শক্তিকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ভেবে 'অত উঁচুতে আমার স্থান হয়নি, কাজেই যা পেয়েছি তা আর ছাড়্‌ছি না' বলে মানুষ ক্ষুদ্রেই আসক্ত হয়। তার এই দুর্ব্বলতাই যে অন্যায়, তা সে বোঝে বলেই লুকিয়ে পাপাচরণ করে। কাজেই সে অন্যায় কর্‌ছে বলে তুমি আর তাকে বেশী কি বোঝাতে যাচ্ছ? সে ওসব বেশ জানে। কিন্তু অজীর্ণদুষ্ট বালক যেমন অভিভাবকের ভয়ে তাঁকে লুকিয়ে গুরু পাক-দ্রব্য ভোজন করে, তেমনি প্রাকৃত মানুষ লুকিয়ে একটু-আধটু ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করে, আর তার হৃদয় যেন এদিক-ওদিক তাকায়—কেউ দেখ্‌ল নাকি! লৌকিক ভাষায় একেই বলা হয় অন্যায়। এই অন্যায় যে যত চতুরভাবে কর্‌তে পারে, সে তত বেশী সাধু সেজে থাকে।

অনেকেই এই সমস্ত অন্যায়-কারীদের জন্য মহা

পাতকের ব্যবস্থা করেও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না; তাকে পতিত বলে ভুলবার চেষ্টা তো দূরের কথা, আরও দ্বিগুণ বেশী করে তাকে পদতলে নিষ্পেষিত করতে ছাড়েন না; কেননা পতিতকে যে যত বেশী করে পদদলিত ক'রে ঘৃণা করতে পারবে, সে-ই যে তত বেশী সাধু বলে আপনাকে জাহির করতে পারবে। আর আপন সাধুতা প্রকাশের এর চেয়ে উত্তম সুযোগ কোথায়? আবার এদিকে অন্যায়-কারীও বুদ্ধির ভুলে একবার যা করে ফেলেছে, তা শোধরাবার দরুণ চিত্তে বল পাওয়া দূরে থাক্, এই সমস্ত ব্যবস্থার দাপটে যথাসাধ্য রজ্জুকে সর্প ভ্রম করে আপনা-আপনি কোণ ঘেঁসতে থাকে।

এর ফলে যে দুর্ব্বল, সে সবল তো হতেই পারে না বরং দিন দিন আরও বেশী করে দুর্ব্বল হতে থাকে। তারপর পাপের বা অধঃস্রোতের দিকেই সে যেন জিদ্ ধরে ঝুঁকে পড়ে। অবশ্য এমনি করেও চরমে গিয়ে সে একদিন ফিরবে, কিন্তু তার পূর্ব্বেও কি তাকে ফিরানো যায় না? আর এই ফিরানো বা অন্যায়ের প্রতিকারের পন্থা কি শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে শাস্তির বিধান? যদি শাস্তি দ্বারা সংশোধনই লক্ষ্য হয়, তবে তার মাঝে ঘৃণা কেন? সংশোধনাগারকে কারাগারই করা হয় দিন দিন, কারাগারকে সংশোধনাগারে পরিণত করার চেষ্টা কিন্তু খুব বিরল। স্বাধীন দেশে কিন্তু বিপরীত ব্যবস্থাই প্রবল!

জাতি দুর্ব্বল হলে তার মাঝে প্রথমেই দেখা যায় মানসিক বৃত্তির অধঃপতন। সুতরাং বাইরের ভাষা বা অনুষ্ঠানও সেই অনুযায়ী হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আমাদের সমাজে অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে উত্থানের প্রচেষ্টা তীব্র হতে পারে না। কেননা, সব সময়ে দুর্ব্বলতার লক্ষণই আমাদের আচারে-ব্যবহারে, ভাবে ও ভাষায় প্রকট হয় বেশী। স্বাধীন দেশে ছেলেদের খেলার মাঝে কারও বিচ্যুতি ঘটলে তাকে বলে out হওয়া অর্থাৎ খেলা হতে বেরিয়ে যাওয়া; আর আমাদের দেশে আমরা বলি তাকে "মরা"। হাডুডু প্রভৃতি দেশীয় খেলায় এই পরিভাষাই বেশী প্রযুক্ত হয়। যেমন দেশ, তেমনি পরিভাষার সৃষ্টি ও তেমনি ব্যবহার। ব্যক্তিগত বিচ্যুতিতে ফুটবলের খেলায় সমষ্টিই তার ফল ভোগ করে, কিন্তু আমাদের দেশীয় খেলায় ব্যষ্টি ছেলেই তার ফলভোগী। সংহতি বা একতা বোধের এমনি চূড়ান্ত-শিক্ষা ছেলেবেলা হতেই আমরা পাই।

সুতরাং পরিণত বয়সের দোষ ত্রুটীরও যে এই সমাজ থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের দোহাই দিলেও—কই, সেখানে কোথাও তো শাস্তির উল্লেখ নাই! শাস্তির মূলে যে পীড়ন, তা হয় পশুর জন্য। মানুষের জন্য শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রায়শ্চিত্ত, শাস্তি নয়। প্রায়শ্চিত্ত বলতে আপন অপরাধ আপনি বুঝে তা সংশোধনের উপায় অবলম্বন করা—আর শাস্তি বলতে অপরের জোর করে বিধান করা কতকগুলি পীড়নের ব্যবস্থা। তাতে মানুষের চিত্ত শাস্তি-দাতার প্রতি আরও রুখে ওঠে, আপনার দোষ সংশোধনের চেষ্টা আরও চাপা পড়ে। স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্তের বদলে যে শাস্তির বাহাদুরী দেখানো হয়, সেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই অনেকখানি নীচে নেমে পড়ে।

যতই সদিচ্ছা প্রণোদিত হোক্, শাসক ও শাসিত যেখানে দুর্ব্বল, সেখানেই এই শাস্তির হীন নীতি অবলম্বন ভিন্ন উপায় থাকে না। নতুবা অনেকেই হয়ত প্রত্যক্ষ করেছেন যে, দরদ বুঝে সুখে বা দুঃখে প্রাণ নিঙড়ানো যদি একটী কথা পাওয়া যায়, তবে তা সহস্র শাসনের চেয়ে বেশী ফলদায়ক হয়। সব সময়ে স্থায় বিচারকের সম্মুখ

সুরে, মনকে বেঁধে রাখলে তাতে কাঁধাকালে হৃদয়ের অভাবে ন্যায়ের চেয়ে অন্যায় বিচারটাই বেশী হওয়া সম্ভব। আঁতে ঘা দিয়ে দোষ দেখানো সহজ, কিন্তু আপন অন্তর দিয়ে ব্যথিতের ব্যথা অনুভব করে মর্ম্মস্পর্শী দুটী কথা বলা তত সহজ নয়। কেহ কেহ হয়ত মনে করবেন—পাপীর প্রতি সমানুভূতি দেখানো আর পাপকে আলিঙ্গন করা সমান কথা। এরূপ প্রশ্রয়ে অন্যায়কারীর অন্যায় দূর হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বরং তা বাড়তেই থাকে। কিন্তু এটাও জানা উচিত যে, শাস্তি, দ্বারা বাইরের পীড়নে অন্তর কোনও দিন শোধরানো যায় না। বরং পূর্ব্বে যা সরল ভাবে হত শাস্তির পর তা কুটীল পন্থা গ্রহণ করে।

ভয় একটা খুব বড় জিনিষ বটে ; ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতারা পর্য্যন্ত এই ভয়ের বশীভূত সত্য, কিন্তু তাদের চেয়েও স্বাধীন যে মানুষ, সে কখনও আজীবন ভয়কে ভয় করে, আপন প্রবৃত্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না ; যে কোনও আকারেই হোক্, তা সে প্রকাশ করবেই। সমাজের বা ব্যক্তিবিশেষের দরদশূন্য শাস্তিতে তা আমূল শুধ্‌রিয়ে কখনই মঙ্গল দায়ক হয় না।

স্নেহের পাত্রকে প্রবৃত্তির করাল গহ্বরে কারও দেখতে ইচ্ছা হয় না। ভবিষ্যতের অমঙ্গলের ভয়ে হৃদয়ের অন্তস্তলের প্রাচীন বৃদ্ধটী শিউরে ওঠেন হয়ত, কিন্তু তার ফলে তর্জ্জন গর্জ্জনই সব সময়ে একমাত্র উপায় নয়। যে চির নবীনটী যুগের পর যুগ ধরে তরুণের বুকে বাসা নিয়ে জগতের রূপ পরিবর্ত্তন করে দিচ্ছেন, তিনি কখনও অপ্রকাশ হয়ে থাকতে চান না। এখন তাঁকে যে পথে প্রকাশ হতে দিবে, সেই পথেই প্রকাশিত হবেন। পশু তাঁকে ক্লেদাক্ত ইন্দ্রিয় পথ দেখিয়ে দেয়, তিনি সেখানেই সুন্দর রূপে প্রকাশ পান। আবার যোগী তাঁকে জ্যোতির্ম্ময় উর্দ্ধ পথ দেখিয়ে দেন, তিনি সে পথে গিয়ে সহস্র দল বিশিষ্ট এক মহা কমলে বিরাজিত হন। মোটের ওপর জীবনের অভিব্যক্তির আদর্শ যে দিকে ধরবে, সে দিকেই বিকাশ হবে।

কাজেই ভয় হতে ভয়ই সংক্রামিত হবে, ভরসা বা আনন্দ থেকে আনন্দই সংক্রামিত হবে—এই রূপ সর্ব্বত্রই সমান জাতীয় বস্তু সমান ধর্ম্মবিশিষ্টকেই আকর্ষণ করে। বাহ্য জগতে এই নিয়ম হতে যেমন স্থুল দেহের চিকিৎসা হতে পারে, তেমনি অন্তরের চিকিৎসাতেও এই নিয়ম খাটে। যার ভিতরে সুন্দরকে দেখতে চাই, তার সাম্‌নে সুন্দরকে দেখাতে হবে। যেমন আদর্শ তার সম্মুখে ধরবে, তারই প্রতিফলন হবে। কাজেই সুন্দরের আকর্ষণে তাকে সুন্দর করতে হবে। এজন্য মানুষ গড়তে হলে আপন অন্তরে মহা সৌন্দর্য্যের খনি করে তাকে আকৃষ্ট করা চাই। প্রাণ-মন ভুলাতে হলে প্রাণ-মন ভুলানো মহানন্দের বার্ত্তা তাকে দিতে হবে।

আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতায় শিশুর জীবন গঠন সম্বন্ধে যেমন তাকে আনন্দ দানই প্রধান উপকরণ, তেমনি মানুষের মধ্যে যে আদিম শিশুটী রয়েছে, সে ওই পাঁচ বছরের খোকাটীর মতই কোনও যুক্তি মানে না, কোনও হিত-বচনের ধার ধারে না—সে চায় স্ফূর্ত্তি—আনন্দ ! তাকে সেই সন্ধান আগে দিয়ে তার পর মহাকঠোর বৈরাগ্যের দিকে নিতে চাইলেও সে প্রস্তুত। কিন্তু জুজুর ভয় দেখিয়ে তাকে চিরকাল বাঁধতে যাওয়া আর খরস্রোতাকে বালুকার বাঁধে আবদ্ধ রাখার কল্পনা একই কথা।

সুতরাং অন্যায়ের প্রতিকার নিজে অস্বস্থ হয়ে অপরকে অস্বস্থ করে নয়—তাকে আশ্বস্ত করে

মহাসত্যের মহানন্দের আশ্বাস দিয়ে। সেজন্য নিজের দৃঢ় প্রত্যয় চাই। আতঙ্ক স্নেহাশীর্ব্বাদকে দূরে রাখে—তার স্থানে রক্ত আঁখির বিকট ঘূর্ণনে শুধুই বিষ উদ্গীরণ করে। আপন অন্তরকে বিরাট করে সেই বিপুলতার মাঝে ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-কুৎসিৎকে সমান ভাবে প্রশান্ত দৃষ্টিতে সহ্য করা চাই। যারা অন্যায় বা অসুন্দর কিছু কর্‌ছে, তাদের জন্য উতলা না হয়ে প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে। সময়ে জানাতে হবে—জগতে বিধির নির্দ্দিষ্ট কিছুই অ-ন্যায়, অ সুন্দর বা অ সত্য নয়, কিন্তু এক বিরাট সত্যের অংশ। তাই যাতে অংশে মজে থেকে সমগ্রকে না হারায়, সেই জন্যই যত বিধি নিষেধ, আইনের কড়াকড়ি আর উপদেশের ছড়াছড়ি। এসব গুলি তাকে বাঁধ্‌তে চায় না—বরং বিপুল বিশ্বের উদার মুক্ত যে মহাশূন্য সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার, সেই বিরাটের সঙ্গেই যে তুমি যুক্ত. সুতরাং মুক্ত—ক্ষুদ্রের বন্ধনে আবদ্ধ নও—এই কথাটীই হৃদয়ঙ্গম করাতে চায়। অংশ অসৎ, সমগ্র সৎ; অংশ কুৎসিৎ—অন্ধকার, সমগ্র সুন্দর, জ্যোতির্ম্ময়; অংশ মৃত্যু, সমগ্র অমৃত সেই অমৃত তোমার তরে সঞ্চিত রয়েছে, তাই তোমাকে অধিকার কর্‌তে হবে। তাই মহারুদ্র তোমাকে হা'না দিচ্ছেন। তাঁকে প্রসন্ন কর, বল—"অসতোমা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময় আবিরাবির্ম্ময়েধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

দৈবী-সম্পদ

—)•(—

প্রসন্ন চেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে—প্রসন্নচেতার ব্রহ্মদার্শিনী প্রজ্ঞা শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। তা হলে প্রজ্ঞালাভের সহজ সুগম পন্থাই হল—চিত্তের প্রসন্নতা। চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সব সময় চিত্তকে অনাবিল, সুপ্রসন্ন রাখ্‌তে হবে—এই একমাত্র সাধনা। প্রসন্ন চিত্তেই ভগবানের অধিষ্ঠান। এইজন্যই ছেলের মাঝে ভগবান্‌কে এত সহজে আমরা দেখ্‌তে পাই। ছেলে সদা প্রফুল্ল, সংস্কারমুক্ত, এইজন্যই ভগবান্ সহজে তাদের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবান্ লাভ, জ্ঞান লাভ কর্‌তে হলে child like simplicity ই হল আসল, একথা আজ সবাই স্বীকার কর্‌ছেন।

সাম্যভাব থাক্‌লেই চিত্তের প্রসন্নতা অক্ষুন্ন থাকে, উত্তেজিত হয়ে গেলেই মনের সেই সুপ্রসন্ন সাত্ত্বিকভাব বিদূরিত হয়ে যায়। এইজন্যই সর্ব্বদা যাতে আনন্দে থাকা যায়. দৈনন্দিন কর্ম্মের বোঝা বহন করেও কি করে মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়, তার পথই আবিষ্কার করে নিতে হবে।

ভিতরটা সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ না হয়ে গেলে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মাতেই পারে না। সাত্ত্বিক মানুষের প্রসন্নভাব সকল সময়েই বিরাজমান। তারা স্বরূপ চ্যুত হয় না কখনো! এই জন্যই প্রসন্নচেতা

সাত্ত্বিক মানুষকে দেখ্‌লেও ভিতরে বাইরে একটা স্বাভাবিক পবিত্র আনন্দের হিল্লোল বইতে থাকে।

বুদ্ধিকে স্বচ্ছ নির্মল করার উপায়ই হল চিত্তের প্রসন্নতা। এই একটা মাত্র দৈবী সম্পদের অভাবে অনেকেরই জ্ঞান, পাণ্ডিত্য পণ্ড হয়ে যায়। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে চিত্তের প্রসন্নতা, অন্তরের সাত্ত্বিক ভাব সম্মিলিত না হলে—পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি কোন কিছুই সার্থকতা লাভ কর্‌তে পারে না। প্রসন্নতার অভাবে, কাজ সম্পন্ন হয়েও সার্থকতা লাভ কর্‌তে পারে না। চিত্তের প্রসাদগুণ সকল রকম রূঢ়তা, রুক্ষতা মার্জ্জিত বিশুদ্ধ করে দেয়।

নিরানন্দে থাক্‌লে বুদ্ধিও যেন তেমন দীপ্তিবন্ত হয়ে ওঠে না; সে বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে যায়, সে বুদ্ধির নব নবোন্মেষ শালিনী শক্তিই বিনষ্ট হয়ে যায়। আনন্দের মাঝেই সৃষ্টির লীলা সঙ্গোপিত। এই জন্যই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাদের ভিতর চিত্তের সম্প্রসাদ গুণ যুক্ত হয়েছে, তাদের বুদ্ধিই মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হয়।

এই জগৎটা ব্রহ্মেরই অপর্য্যাপ্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস মাত্র। এইজন্যই আনন্দের উৎসে না পৌঁছুতে পারলে আসল তত্ত্বের সন্ধানই মিলে না। আনন্দের ভিতর দিয়েই মানুষ সৃষ্টির আসল তত্ত্বের নিদানে গিয়ে পৌঁছুতে পারে।

জগৎকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করছেন তিনি ভোলানাথ—আশুতোষ, এই জন্যই পরিচালনার দরুণ তাঁকে আমাদের ন্যায় ব্যস্ত হতে হয় না। তাঁর বুদ্ধি পাটোয়ারি বুদ্ধি নয়—সেই বুদ্ধির জন্ম আনন্দ থেকে।

প্রসন্নচেতার বুদ্ধির মাঝে কোন মালিন্য বা গলদ সঞ্চয় হতে পারে না, কেননা চিত্তের প্রসন্নতা সকল মলিনতাকে বিদূরিত করে দেয়। এই জন্যই প্রসন্নচেতার মন এবং মুখ এক। কোথাও তাদের কৃত্রিমতা নেই—তাদের বুদ্ধি প্যাঁচালো বুদ্ধি নয়।

কুশাগ্র বুদ্ধি দ্বারা আমরা বিচার করি, বিশ্লেষণ করি; কিন্তু বুদ্ধি যেখানে তামসিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন, সেখানে বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর আসল তত্ত্ব অধিগত করা অসম্ভব! আমরা এত বুঝে শুনেও যে আন্তরিক তৃপ্তি অনুভব কর্‌তে পারি না। তার প্রধান কারণ, চিত্তের সরলতা বা প্রসন্নতার অভাব। অভিমান থাক্‌লে কোন কিছুরই স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না।

মনটা যখন অপ্রসন্ন থাকে, তখন স্বভাবতঃই যেন বুঝ্‌বার শক্তিটাও অবসন্ন, অস্পষ্ট হয়ে আসে; কিন্তু চিত্ত যখন প্রফুল্ল থাকে, তখন প্রত্যেক কাজেই অল্প সময়ে, অল্প আয়াসে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

হ্যাপিনেস আর আনন্দের মাঝে কিন্তু পার্থক্য আছে। আনন্দ মানুষকে ঊর্দ্ধ-প্রতিষ্ঠ করে, আর সুখ মানুষকে অনেক সময় আত্মভোলা করে দেয়। তখন মানুষ লক্ষ্য হারা হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ঋষিরা উপনিষদে যে আনন্দের কথা বার বার কীর্ত্তন করে গিয়েছেন, সে আনন্দ প্রাকৃত জগতের বহু ঊর্দ্ধে; অথচ সেই আনন্দের রসানুভূতি নিয়াই কিন্তু এই জগতে জীবন অতিবাহিত কর্‌তে হবে।

আনন্দ হতে বঞ্চিত হলেই মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভার মাঝেও ঘুণে ধরে। যাদের অন্তরে স্ফূর্ত্তি নাই, আনন্দে যাদের সর্ব্ব শরীর উল্লসিত হয়ে উঠে না, তাদের বুদ্ধি খুল্‌বে কি করে? টিক্‌টিকির প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই তখন দুষ্কর!

চিত্ত-প্রসাদের ফলে বিরুদ্ধ চিন্তার প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই ভিতরে অধ্যাত্ম-প্রসাদ লাভ হয়। যোগীরা নিম্নস্তরের চিন্তা নিয়ে সময়

কাটান না, তাঁরা ঊর্দ্ধমুখী চিন্তার স্রোতে নিজকে ভাসিয়ে দিয়ে আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। চিত্তে প্রসাদগুণ বর্দ্ধিত হলে তখন বুদ্ধিরও চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়। বুদ্ধির মোড় তখন উল্টোমুখী হয়ে যায়। আর সেখানেই বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা!

পাশ্চাত্য জাতি আজ বিদ্যায় বুদ্ধিতে খুবই উন্নত হয়েছে—কিন্তু তাদের সেই বিদ্যা-বুদ্ধিতে কারও ভিতর তো সম্প্রসাদযুক্ত ভাব আন্‌তে পার্‌ছে না। দিন দিন বুভুক্ষা নিয়ে, দানবীয় রূপে গ্রাস কর্‌তেই তো তারা পটু হয়ে উঠ্‌ছে। চিত্তের সেই স্থিতি-প্রবাহ কোথায়?

চিত্তকে প্রসন্ন রাখ্‌তে পার্‌লে, তবেই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌তে সক্ষম হয়। বুদ্ধির মাঝে স্থৈর্য্য আসে, বুদ্ধি বিশারদ হয়ে ওঠে। এখন চিত্তের প্রসন্নতা আসে কি করে, তাও আমাদের মুনি ঋষিরা বলে গিয়েছেন। সাত্ত্বিক ভাবে অন্তরকে পরিপূর্ণ করে রাখ্‌তে না পার্‌লে, চিত্তের প্রসন্নভাবকে অব্যাহত রাখা দুষ্কর। এই জন্যই সংযমের ভিতর দিয়ে, তপস্যার ভিতর দিয়ে মানুষ বাইরে শুষ্ক হলেও, অন্তরে তার যে প্রসাদগুণ বর্দ্ধিত হয়, তার অমল জ্যোতিঃতে সকলেই মুগ্ধ বিস্মিত না হয়ে থাকৃতে পারে না।

চিত্তকে প্রসন্ন রাখ্‌তে হলে, সাত্ত্বিক আহার—সাত্ত্বিক চিন্তার প্রয়োজন। এইজন্যই নিরামিষাহারের এত গুণ কীর্ত্তন করা হয়েছে। আহারের সঙ্গে দেহের মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আজ এসব কথা অবজ্ঞার—অবহেলার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শান্ত সমাহিত ঋষির বংশধর হয়েও আমরা পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় চঞ্চল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি।

সাত্ত্বিক প্রসন্নচেতা ব্রাহ্মণের কাছে পূর্ব্বের রাজারা বুদ্ধি নেবার দরুণ—যুক্তি নেবার দরুণ আসত! এর কারণ কি? রাজাদের কি বুদ্ধি ছিল না, বিচার শক্তি ছিল না? বিচার-বুদ্ধি থাক্‌লেও, সংসারের বিচিত্র ঘটনায় তাদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত, আর বিনা সাধনায় জীবনের কল্যাণময় পথের সন্ধান পাওয়া যায় না, এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির কাছে উপদেশ প্রার্থী হয়ে তাঁরা আস্‌তেন।

বড় বড় বুদ্ধি বিশারদও দেখি, বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যিনি প্রজ্ঞায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর কাছে আসেন উপদেশ নিতে। কর্ম্মী উপদেশ নিতে যায়, যিনি কর্ম্ম জগতের বিচিত্র কোলাহল হতে বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই কাজ করার সঙ্কেত সকলেই জানে না। কর্ম্মের কৌশল আবিষ্কার যাঁরা করেন, তাঁরা সাধারণ কর্ম্মী নন—তাঁদের কর্ম্ম-রহস্য আবিষ্কারের পর, বহু মানব সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেও বিপুল কর্ম্ম করে যেতে পারে! এ দিক দিয়ে বিচার কর্‌লে, কর্ম্মীর চেয়ে, ধ্যানী শ্রেষ্ঠ!

ঔপনিষদিক যুগের এক একটী ঋষি যেন আনন্দের সজীব উৎস! তাঁরা সহজ সরল ভাষায় আনন্দে যা ব্যক্ত করে গিয়েছেন, তাই আজ আমাদের কাছে উপনিষদ্—আধ্যাত্মিক জগতে অনির্ব্বচনীয় রহস্য স্বরূপ! উপনিষদ পড়ে যত আনন্দ পাই, শঙ্করাচার্য্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা স্বরূপ ভাষ্য পড়ে তো তেমন আনন্দ পাই না। এর কারণ কি? মানুষ আনন্দের অতিশয্যে যা প্রকাশ করে, তা তো বুদ্ধি দিয়ে রচনা করা যায় না!

আনন্দের মাঝে ভগবান্ নিজে অবতীর্ণ হন, কাজেই তখন যা বলা যায়, ব্যক্ত করা যায়, তাই অমৃত হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে নিরানন্দ সেখানে ভগবান্ অবতীর্ণ হন না, তাই যা বলি, তাতে আমাদের বুদ্ধির কারসাজিটাই স্পষ্টোজ্জ্বল হয়ে ওঠে!

আনন্দের মাঝে, প্রসন্নতার মাঝেই জগৎ-রহস্যের ইঙ্গিত-আভ্যাস পাওয়া যায়; কেননা আনন্দে যে মানুষ নিজকে ভুলে যায়। কাজেই তখনকার বুদ্ধির মাঝে তো ব্যক্তিত্বের প্রভাব থাকে না, বুদ্ধি তখন যে প্রভাবে প্রভাবিত হয়, সে প্রভাব হল মঙ্গলময় ভগবানের প্রভাব!

বুদ্ধি কেবল বাইরের পড়াশুনা, আলোচনা চর্চ্চাতেই মার্জ্জিত হয় না, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত-বিশুদ্ধ করতে হলে একটী মাত্র দৈবী সম্পদের অধিকারী হতে হবে—সে আর কিছুই নয়, অন্তরের প্রসন্নতা।

উদ্যম

—)•(—

জীবনের মাঝে শত শত বার
হইবে বিফল-মনোরথ—
তবু কি শ্রান্ত, তবু কি ক্লান্ত
হইবে কখনো জীবন-রথ ?

চারিদিক হ'তে বিভীষিকা কত
আসিবে জীবনে নামিয়া—
সেই ভয়ে আমি জড়সড় হয়ে
রহিব কি পথে পড়িয়া ?

অক্লান্ত উদ্যম বুক ভরা আশা
হইবে জীবনে সঙ্গী মোর,
সাধে কি আমার প্রাণে এত বল
সাধে কি গো এত বুকের জোর ?



তরঙ্গ

—(*)—

প্রাণ কি চায়, কি লাভ করিলে প্রাণে শান্তি আসিবে, সেই সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল ধারণা নিয়া চলিলে তবেই একদিন শান্তির সন্ধান মিলে! এইজন্যই দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মাবসানে রোজই একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়—আমার লক্ষ্য ঠিক আছে কি না এবং তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছি কি না!

আলোচনার অভাবে, চর্চ্চার অভাবে ভিতরের অদম্য আকাঙ্ক্ষা বা সত্যলাভের পিপাসাও স্তিমিত—নির্ব্বাপিত হইয়া আসে। সেবক-জীবনের কর্ত্তব্য—রোজই একবার করিয়া নিজের জীবনটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাচাই করিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া। এই পরীক্ষার ভিতর দিয়াই, নিজের আলস্য ঔদাস্যের দরুণ যে গলদ সঞ্চিত হয়, তাহা বাহির হইয়া পড়ে।

প্রাণে কি যেন একটা অভাবের পীড়ন সর্ব্বদাই অনুভব করি—কিন্তু সেই অভাবের নিবৃত্তি হয় কিসে, কেন অমন করিয়া বুকের মাঝে তুফান বহিয়া চলে, তাহার কারণ তো তেমন আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই না। এইজন্যই বুকের মাঝে ধিকি ধিকি করিয়া অভাবের বহ্নি একদিক দিয়া জ্বলিতেছে, আবার অন্যদিকে বেশ হেলায় খেলায়, আলস্যে ঔদাস্যে দিন অতিবাহিত করিতেছি। এইজন্যই বলি—এখনো প্রাণে সেই আকুল আহ্বান আসে নাই। ভিতরে যাহা হইতেছে, তাহা অন্তরের খুব গভীর প্রদেশে, তাহার দিকে তেমন লক্ষ্য নাই। অভাবের পীড়ন লইয়াও তো দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। কষ্ট, প্রতিকারের দরুণ সেই সচেষ্ট ব্যাকুলতা কোথায়?

যাহাকে পাইতে চাই, অন্তর যাহাকে পাইলে পরিতুষ্ট হয়, তাঁহার প্রতি সেই প্রাণপাতী শ্রদ্ধা কোথায়? তবে কি মানুষ হেলায় খেলায় সত্য লাভ করে? এই প্রশ্ন যখন জাগে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মন হইতেই যখন তাহার যথোচিত উত্তর পাই, তখন নিজের প্রতিই ধিক্কার আসে। তাই তো, কি ছিনিমিনি খেলা খেলিয়াই না দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছি!

নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতে পারে কাহারা—যাহারা অকুল সমুদ্রের কুল পাইয়াছে। কিন্তু আমরা যে এখনো যাত্রাই করিনি। ইহার পর তো কত দ্বন্দ্ব, কত অজানিত আশঙ্কা রহিয়াছেই। অথচ আমাদের ভাব গতিক দেখিলে মনে হইবে, আমরা যেন সমস্যার পর পারে পৌঁছিয়াছি। এখন আর কোন কর্ম্ম নাই, প্রচেষ্টা নাই, যাহা করি তাহা বিলাস মাত্র।

নিদারুণ অভাবের জ্বালা নিয়াও কি করিয়া যে ঘুম আসে, তাহাই এক এক বার ভাবি। মনকে যখন প্রশ্ন করি—তুমি কি কুলের নাগাল পাইয়াছ? মন তখন নীরব—কোন সাড়া-শব্দ নাই। ইচ্ছা হয় তখন কি করি?

ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু ইচ্ছার মাঝে তত জোর থাকে না বলিয়াই ক্ষমার কথাটা আগে মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষমা করিয়া, প্রশ্রয় দিয়াই যে দিন দিন লক্ষ্য হইতে কত

পেছনে পড়িয়া যাইতেছি, সেই কথা তো এক বারও ভাবিয়া দেখি না।

ভাবিয়া দেখিলে কর্ত্তব্যের সীমা নাই, বিশেষতঃ ব্রতধারী আমরা। সেই ব্রতকে অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিপালন করিয়া যাইবার মত সেই ধৃতি, সেই উৎসাহ কি আমাদের রহিয়াছে? দিনের পর দিন চলিয়াছে—সবাই নাকি পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু আমরা কি সত্যই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছি? তবে কি মানুষ নিজের উন্নতি সম্বন্ধে নিজে কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে না?

রাগ করিব কাহার ওপর? আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি অবনতির দরুণ দায়ী কে? চিন্তা করিয়া দেখিলে তো কাহাকেও দোষ দিতে পারি না। অপরের দরুণ আমি সত্যের পথ খুঁজিয়া পাইলাম না—ইহা কি একটা সত্যিকার যুক্তি? অথচ আমাদের অধিকাংশের অকৃতকার্য্যতার দোষ পড়ে গিয়া অন্যের ঘাড়ের ওপর!

যেখানটায় জোর দিলে আমাদের প্রাণে বল আসে, সেখানেই আমরা পঙ্গু—জড়বৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি, কাজেই অন্যের ওপর দোষ দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিলেই বা কি লাভ?

জীবনে কিছুই হইল না, মহতের আশ্রয় লইয়া পরমার্থ কিছুই লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া আক্ষেপ করি—এই আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মনের মাঝে অশ্রদ্ধার বাসস্থান স্থায়িভাবে পাকা হইয়া উঠে। তখন আর উল্টো দিকের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখি না। যাঁহাকে পাইতে চাই, তাঁহাকে যে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়াই, অর্থাৎ তিনি আছেন, এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াই যে লাভ করিতে হইবে, সে দিকে মোটেই লক্ষ্য করি না!

নাস্তিক হইতে পারিতাম সে-ও ভাল ছিল, কিন্তু অন্তরের মাঝে সেই বলিষ্ঠ অনুভূতি কোথায়? আশ্রয় ছাড়া নিরালম্ব হইয়া যে মন এক মুহূর্ত্তের দরুণও তিষ্ঠিতে পারে না। কাজেই আমাদের এই রাগ অভিমানের তো কোন মূল্য নাই! বরঞ্চ তাহাতে অন্তরটাই বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

চারিদিকের কোলাহলে, চিন্তাবীরদের বিচিত্র চিন্তার সংঘর্ষে হঠাৎ মনটা উত্তেজিত হইয়া ওঠে; ভাবি, আমার আদর্শও বুঝি তাহাই। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নামিয়া দেখি, আমার ধাতে যে তাহা মোটেই সহ্য হয় না। এইরূপ ভাবে কথার ছলনায়, আদর্শের মোহে, কতই না অপচয় করিয়া যাইতেছি আমরা; হিসাব করিয়া দেখিলে অপচয়ের পরিমাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইবার কথা।

শান্তিই সবার চরম লক্ষ্য, কিন্তু সেই শান্তি লাভ করিতে হইলে অন্তরকে বিদ্রোহী করিয়া—নাস্তিক করিয়া তুলিয়া কোন লাভ নাই। বরঞ্চ শ্রদ্ধার সহিত পৈত্রিক সম্পত্তিকে সম্মান করিয়া চলিলে সম্পদ্ বাড়িবে ছাড়া একটুও কমিবে না।

আজ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছি, শান্তির পথ, বিদ্রোহের পথ নয়,—অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়া চলার পথ নয়। আবার শ্রদ্ধারই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তবেই যাঁহাকে চাই, তিনি অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন।

চলার বিরাম নাই। জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলেই সেই অনন্ত পথের যাত্রী। কিন্তু যাত্রী যদি চলার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বুঝিতে না পারিত যে ক্রমশঃ গন্তব্য স্থলের নিকটবর্ত্তীই হইতেছি আমরা, তাহা হইলে তাহার

সেই চলার মাঝে আনন্দ থাকিত না। এইজন্যই বলি—চলে সকলেই, কিন্তু সেই চলার সঙ্গে নিজের চেতনাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়া চলিতে পারে কয় জন?

যাঁহাকে চাই, তাঁহাকে না হইলে যখন আর চলিবেই না, তখনই তাঁহাকে পাওয়ার সময়! কিন্তু আমাদের ভিতর সেই নিদারুণ আকুলতা কোথায়? কেবল রফা করিয়া, মনকে প্রবোধ দিয়াই তো দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে

সাত পাঁচ ভাবনা কাটিয়া ছাঁটিয়া এক চিন্তায় এক ধ্যানে দিন অতিবাহিত করিতে হইবে। কিন্তু সেই সংযম, সেই তপস্যার শক্তি কোথায়? কেবল পাই না পাই না বলিয়া চীৎকার করিলেই তো যাঁহাকে চাই তিনি আসিয়া দুয়ারে উপস্থিত হইবেন না। অশান্ত মনের সঙ্গে কৈফিয়ৎ করিয়া পারাও দায়! সে তো নিজের দোষ, নিজের অবহেলাকে বড় করিয়া দেখিবে না। সব দোষ বাহিরের।

মন বাহিরে শান্তি খুঁজিয়াছিল, কাহারও আশ্রয় লইয়া থাকিবে না ভাবিয়াছিল—কিন্তু কোথায় গেল আজ সেই মনের স্পর্দ্ধা! প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে ভুলাইয়া, অনর্থক কত পথে আমাকে ঘুরাইয়া আনিল—কিন্তু কই, সে তো শান্তির পথ কোথায় বলিয়া দিতে পারিল না!

অনেক ঘুরিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি—কিন্তু আজ নিঃসংশয় হইয়া গিয়াছি। এই ঘুরা ঘুরিতে কোন লাভ নাই; দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া, মরি-বাঁচি এই পণ লইয়া, বুকে অচল-অটল শ্রদ্ধার ভিত্তি করিয়া এক জায়গায় বসিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু মনের মাঝে এতগুলো তরঙ্গ যদি না উঠিত, তাহা হইলে বোধ হয় এত সহজে প্রশান্তির সন্ধান মিলিত না।

কোন দুঃখ নাই, কোন ক্ষোভ নাই, সব ভাল, ভালর জন্যই সব। 'ভগবতা যদ্বিধীয়তে তন্মঙ্গলায় ইতি।' চিন্তার এতগুলো তরঙ্গকে অতিক্রম করিয়া তবে না আজ মুখ হইতে এই বাণী বাহির হইয়াছে! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!!



সান্ত্ব্য-সন্দর্ভ

প্রকৃতির নিষ্ঠুর পীড়নে পীড়িত কে তুমি হত-ভাগ্য বিরলে বসিয়া অশ্রু মোচন করিতেছ? আজ এই দুঃসময়ে কত পূর্ব্বপরিচিতের স্মৃতিগুলি মনের মাঝে আসা যাওয়া করে, কিন্তু বল দেখি—আজ কে তোমার সহিত যুক্ত হইয়া তোমার মর্ম্ম পীড়ার ভার একটু কমাইবে? কেউ নাই, তোমার তুমি ছাড়া এ জগতে কেউ নাই। যাহার সঙ্গে যত নিবিড় ভাবে আপনাকে জড়াইয়াছিলে, আজ এই দুঃসময়ে তাহার কাছ হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা হয়ত নাই ই, অধিকন্তু তাহার কাছ হইতে দুর্ভাগ্যের কথা গোপন করিতে না পারিলে হয়ত আরও লজ্জা পাইতে হইবে। জগতের অধিকাংশ আত্মীয়-বান্ধব এমনি!

এইত সংসার! পুত্রকলত্র পরিবেষ্টিত সাধের সংসারের মোহময় ভালবাসার কত রঙ্গীন চিত্রই না কবিকণ্ঠে শুনিয়াছ, সময়ে সময়ে একটু হৃদয়ের

ছোঁয়াচ্ পাইয়া আপনাকে কত ধন্য মনে করিয়াছ, কিন্তু তার সেই মোহন মূর্ত্তির আসল রূপটা হয়ত দেখ নাই। মোহন মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যে নর-কঙ্কালের ভীষণ দৃশ্য লুক্কায়িত থাকে, তাহা বুঝি এত দিন জান নাই, তাই আজ সত্যিকার বীভৎস দৃশ্যে প্রাণ আতঙ্কিত! সংসারের ছলনায় মুগ্ধ প্রাণ আজ বিড়ম্বিত!

কিন্তু এমনটী চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। আজ যাহা তোমার পক্ষে নূতন, আসলে সে নূতন নয়। কত হতভাগ্য এমনি মোহের পীড়নে যেন চক্ষুবুজিয়া সংসারের মায়া মরীচিকায় ছুটাছুটি করিয়া শেষে এমনই ভাবে ধাঁধাঁয় পড়িয়াছে। যৌবনে নবীন প্রাণের উন্মাদনায় যেদিকে তাকাইয়াছে, সে দিকেই মধুময় মোহন দৃশ্যের লাস্য-লীলা দেখিয়াছে; তাই যেদিকে চক্ষু গিয়াছে, সেই দিকেই ছুটিয়াছে; ভাবে নাই, বিচার করিবার তর সহে নাই—শুধু মৃগতৃষ্ণার প্রবল আকর্ষণে ছুটিয়া শেষে এমনি হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে।

কেন এমন হয়, কে এমন ভাবে ভুলাইয়া নেয়, কাকেই বা ভুলায়, একবার খুঁজিয়াছ কি? এতদিন খুঁজিবার অবস্থা তোমার ছিল না। মুগ্ধ বিড়ম্বিত তুমি, শুধু ক্ষণিক আনন্দের বিজলীকে চাহিয়াছিলে, তার অপেক্ষায় ঝড়কেও উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া পৌরুষ দেখাইয়াছ ভাবিয়া ছিলে, কিন্তু তার পরিণামে—হায়, এ যে আসিল বজ্র! সে ত আনন্দ দিলনা—সে যে আনিল মৃত্যু! তাই আজ এই মরণের পারে বসিয়া তোমাকে খুঁজিতে হইবে—কে তোমাকে ভুলাইল, আর কাকেই বা সে এমন করিয়া ভুলাইয়া মরণের দিকে টানিয়া লইল! আজ তোমার সে সব ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ভয় নাই, এত দীর্ঘকাল আঁধার-পথে চলিতেছিলে, আজ দুঃখের সঙ্গে জীবনের অরণি ঘর্ষণে যে দীপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সেই জ্যোতিঃশিখাই ক্রমশঃ জ্যোতিঃসমুদ্রের চির আনন্দে তোমাকে টানিয়া লইতে সক্ষম হইবে। কাজেই দুঃখে ভয় কি?

এই আঁধারে যে তোমাকে নিয়া এত দিন চলিয়া আসিয়াছে, সে অন্ধা প্রকৃতি; যে তোমাকে তার সঙ্গে এক করিয়া যুক্ত করিয়াছে, সে তোমার অবিবেক; আর তাতে ভুলিয়াছ আত্মা-রূপী তুমি! আজ যে দুঃখের দহনে তুমি জর্জ্জরিত, তাহার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য চক্ষুর সম্মুখে হয়ত কত প্রতিকারের কথাই তোমার মনে ভাসিতেছে, কিন্তু আজ না হয় তাই দিয়ে মুক্ত হইলে, রোজ রোজ এমনি ক্ষুন্নিবৃত্তির মত কোথা হইতে তোমার দুঃখনিবৃত্তির উপায় বাহির করিবে? সব সময়ে সব স্থলে তো তুমি সে উপায় অবলম্বন করিতে পার না। কাজেই দুঃখের কারণ তোমার মোহ রূপী অজ্ঞান বা অবিবেককে—প্রকৃতিকে চিনিয়া লও; এ জগতে ভাই বন্ধু প্রভৃতি যেমন কেউ তোমার আপনার নয়, তোমার মন বা প্রকৃতিও তো তেমনি তোমার নয়। ইহারা যদি তোমার হিতকারীই হইত, তাহা হইলে আজ তোমার এই দুর্দ্দশা কেন? কাজেই এই তুমিও তোমার নও অর্থাৎ আজ যাকে "আমি" ভাবিতেছ, সে যথার্থ তোমার স্বরূপ নয়।

হয়ত ভাবিবে, এমন ভাবে আমার আসল 'আমি' যদি এই আমার মন বুদ্ধিকে ছাড়িয়াই হইল, তাহা হইলে আর আমার রহিল কি? এইখানেই ভুল, এইখানেই মোহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃত তোমার স্বরূপের যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব, তাহা এই মন বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতির এলাকা ছাড়িয়াই। এই ভাবে স্বরূপটী চিনাই হইল যথার্থ দুঃখের হাত হইতে মুক্তি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোক্ষ। তুমি হয়ত ভাবিবে, ইহা বড় শক্ত কথা; স্বভাবতঃই বদ্ধ যে আত্মা তাহাকে

মুক্ত করা বড় শক্ত! কিন্তু ভুল তোমার এ ধারণা। স্বভাবতঃই আত্মা যদি বদ্ধ হইত, তবে মুক্তির জন্ত সাধনার উপদেশ ব্যর্থ হইত। কেননা যাহার স্বভাবই বদ্ধ. তাহাকে মুক্ত করিতে কেহ পারে না। কাজেই সেরূপ উপদেশ বিফল হইত।

তুমি হয়ত বলিবে "কি করা—দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে আত্মা এমন ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" তাহাও তোমার ভ্রান্ত ধারণা। কেননা, নিত্য ব্যাপী আত্মা সমস্ত দেশ ও সমস্ত কাল জুড়িয়াই আছেন। আত্মার অবস্থান্তরও হয় না; কেননা, বেদে বলে,—"অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ" তিনি সঙ্গ রহিত। অবস্থার ভেদ হয় একমাত্র তোমার দেহের, আত্মার নয়। কাজেই আত্মা অবস্থা দ্বারাও বদ্ধ হন নাই।

যদি বল কর্ম্ম দ্বারা আত্মা এই ভাবে আবদ্ধ আছেন, তাহাও নয়। কেননা, কর্ম্মও তোমার দেহের: নির্গুণ আত্মার ধর্ম্ম কখনও কর্ম্ম নয়। যদি বল, আত্মার ধর্ম্ম যদিও কর্ম্ম না হউক, তবু দেহের ধর্ম্ম তো কর্ম্ম? সেই দেহের ধর্ম্মরূপ কর্ম্ম দ্বারাই আত্মা আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাও নয়; কারণ, যদি তাহাই হইত, তবে একের ধর্ম্ম দ্বারা অপরের বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। সেটা অযৌক্তিক কথা। আর তাহা হইলে মুক্তাত্মাদেরও আবার বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয়—এইরূপ সম্ভাবনা ঘটে!

কাজেই—দেশ, কাল, অবস্থা বা কর্ম্ম প্রভৃতি আত্মার বন্ধন আনে নাই, আনিয়াছে তোমার অবিবেক। যদি মনে হয় যে অবিবেক তো সবারই আছে, কিন্তু কেউ সুখী, কেউ দুঃখী হয় কেন? তাহাও হয় ঐ পূর্ব্বোক্ত দেহের কর্ম্মে। (অবশ্য দেহ বলিতে এখানে স্থূল দেহ হইতে চিত্ত পর্য্যন্ত সমস্তই দেহ) এই অনাদি সংসারে এমন কাহাকেও দেখা যায় না, যিনি সুখের কারণরূপে বা দুঃখের কারণরূপে কর্ম্ম না করিয়াছেন। একের কর্ম্মে যদি অপরের ফল ভোগ হইত, তাহা হইলে একের সুকর্ম্মে সবাই সুখী বা একের দুষ্কর্ম্মে সবাই দুঃখী হইত। বলশেভিক-বাদের মত একের সৌভাগ্য সকলে বণ্টন করিয়া লওয়া প্রকৃতির রাজ্যে খাটে না। যাহার যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফলভোগ করিতে হয়।

আবার একের ধর্ম্ম দ্বারা যদি অপরের কাজ হইত, তবে কাহার কতটুকু কাজ হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিত প্রকৃতি। তিনি যখন যে পুরুষের প্রতি প্রবর্ত্তিত হইতেন, তাহারই বন্ধনদশা ঘটিত। কিন্তু প্রকৃতি এমন ভাবে আপনা হইতে কাহারও প্রতি বন্ধন আনেন না, কারণ প্রকৃতিরও স্বাতন্ত্র্য নাই; কর্ম্মানুযায়ী তিনি চলেন, অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহার তেমনি ফল। সুতরাং প্রকৃতি পরতন্ত্র না হইলে, একপ্রকৃতি সকলের সমান ফল অর্থাৎ একের সুকর্ম্মে সবাই সুখী, একের দুষ্কর্ম্মে সবাই দুঃখী হইত। এই সমস্ত যদি হইত, তবে জগতের এত বৈচিত্র্য, ভোগের এত বিভিন্নতা থাকিত না। কাজেই প্রকৃতিও আত্মার বন্ধনের কারণ নয়। এখানে স্বাভাবিকই এই প্রশ্ন আসে যে, প্রকৃতিনিবন্ধন যদি আত্মার বন্ধন না হয়, স্বভাবতঃও যদি বন্ধন না হয়, তবে আর মুক্তির উপদেশ কেন? মুক্ত তো তিনি হইয়াই আছেন!

এরূপ প্রশ্ন অযৌক্তিক নয়। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বিশিষ্ট আত্মার বন্ধনযোগ প্রকৃতির যোগ ভিন্ন হয় না। শুদ্ধ বলিতে এখানে নির্গুণ ও বুদ্ধ বলিতে স্বচ্ছ বুঝায়। প্রকৃতির যোগ ভিন্ন অর্থাৎ অবিবেক বিনা আত্মার কখনো বন্ধন হয় না। কিন্তু অবিবেক হইতেই বন্ধন হয়।

'এখানে বলা হইল যে প্রকৃতি হইতে আত্মা আবদ্ধ হন না, কিন্তু প্রকৃতির যোগ হইতে। অর্থাৎ প্রকৃতি অনাদি হইয়া চিরকাল আছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে আপনাকে মিশ্রিতরূপে ভাব বলিয়াই—তাঁর সঙ্গে যুক্ত হও বলিয়াই বদ্ধ হও। অবিবেক বশে আমি বা আত্মা সুখী বা দুঃখী মনে হওয়াই প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এই প্রকৃতির সঙ্গে সাধারণতঃ মানুষ যুক্ত থাকে বলিয়াই আমি কর্ত্তা, আমি ভর্ত্তা এইরূপ অভিমান জন্মে। বস্তুতঃ দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই এইপ্রকার বোধ জন্মিয়া থাকে।

অবিদ্যা বলিয়া একটা কথা শুনিয়া থাকিবে; হয়ত বা কেহ এমনও ভাবিতে পার, অবিদ্যা হইতেই বন্ধন হয়। তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অবিদ্যা হইল বিদ্যার প্রাগ্‌ভাব বা ধ্বংসাভাব; সুতরাং অবিদ্যা অবস্তু বা মিথ্যা। মিথ্যাদ্বারা সত্যস্বরূপ আত্মার বন্ধন অসম্ভব। কাজেই অবিদ্যা দ্বারা বন্ধন হয়, ইহা মাত্র ছলের কথা, আসলে সত্য নয়। আর যদি বলা যায় যে, অবিদ্যা অবস্তু নয়—বস্তুই, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। কারণ, তাঁহারা বলেন অবিদ্যা বস্তু নয়—একপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান। আমাদের সাংখ্য মতেও অবিদ্যা সত্যবস্তু হইলে তাহার নাশ নাই বলিতে হয়, তাহা হইলে নির্ব্বিশেষ মুক্তি অসম্ভব হয়। অনাদি বস্তুর নাশ না হইলে সে বিষয়ে উপদেশও নিরর্থক হয়। আর যদি অবিদ্যা অনাদি ও বস্তু হয়, তবে তাহা নিত্য আত্মার মতই হয়। তবে অদ্বৈতবাদীর মত থাকে না; কেননা আত্মাও বস্তু আবার অনাত্মাও বস্তু, তাহা হইলে বিজাতীয় দ্বৈত থাকা প্রমাণিত হয়। এই ভাবে দেখা যায় যে, অবিদ্যা দ্বারাও বন্ধন হয় না।

তাহা হইলে বোঝা গেল যে, আর কিছু দ্বারা বন্ধন হয় না, বন্ধন হয় অবিবেক দ্বারা। অবিবেক অর্থে বিবেকের অভাব, বিবেক না থাকা। বিবেক বলিতে কোন্‌টা সৎ অর্থাৎ নিত্য, আর কোন্‌টা অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, তাহার বিচার। এই বিচার না করাই অবিবেক। যাহারা বিবেক দ্বারা বুঝে না, তাহাদেরই অবিবেকের বশবর্ত্তী হওয়া সম্ভব। বুঝিবার ভুলই আমাদের যত কিছু ভ্রমের কারণ। অসৎকে বুঝি যদি সৎ, আর অসৎকে সৎ বলিয়া বুঝিয়া তাহাতেই মগ্ন হই, তবে অসতের পরিণাম বিনাশ বা দুঃখ আসিবেই। এই বুঝিবার ভুল যাতে না হয়, বাহিরের চাকচিক্যে মন ভুলিয়া গিয়া যাহাতে অসৎ বস্তুতে লিপ্ত না হয়, সেইজন্যই শাস্ত্রের এত চীৎকার। সে সাবধান-বাণী যে ভাগ্যবানের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া বিকৃত পন্থা হইতে সত্যের দিকে, ধ্রুবের দিকে ফিরাইতে পারে, সে-ই ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পায়। নতুবা ঔষধাদি দ্বারা শারীরিক দুঃখ, মণি-মন্ত্রাদি দ্বারা আধিদৈবিক প্রভৃতি দুঃখ দূর হইলেও, বা সকলের সেই সব দুঃখ না থাকিলেও, আধ্যাত্মিক দুঃখের মধ্যে মনের দুঃখের হাত হইতে কিছুতেই নিস্তার পাওয়া যায় না। এমন সময়ও হয় যে, শত শত ভোগ্য সত্ত্বেও মন শান্তি পায় না। কাজেই ভোগ্য পাইলেই মনের দুঃখ যায় না। মনের দুঃখ যায়, উন্নত সংস্কার লাভ হইলে। আহার-বিহারাদিতে নিয়ম পালন, মহৎসঙ্গ ও মহৎকৃপা ব্যতিরেকে সে উন্নত সংস্কার লাভ করা দুরূহ।

আমি যাহাদের সঙ্গে যুক্ত আছি ভাবি, তাহাদের সঙ্গে যুক্ত নই। আসল আমি প্রকৃতি হইতে পৃথক্, বাহিরের যাহা কিছু—চিত্ত পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকৃতি, আমি তাহা হইতেও পৃথক্ - কেবল নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত—সব কিছু হইতে মুক্ত, এইরূপ পৃথক্‌জ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানই দুঃখের হাত হইতে বাঁচিবার মহৎ উপায়। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

কিসের অভাব ?

দেশে কিসের অভাব ? প্রধানতঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগের অভাব। কেউ কাউকে অনুভব করেনা, কেউ কারো দরদী নয়। ভাবের কথা মুলতুবী রাখ্লেও স্থূলতঃ আচার ব্যবহারের দিক দিয়েও কতকগুলি সাম্য ও সহানুভূতি এমন প্রচুর ভাবে ইচ্ছা করলে আমরা দিতে ও নিতে পারি, যা আমাদের চোখ উল্টিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার চেয়ে কোন অংশে কম লাভজনক বা কম কল্যাণকর নয়।

বাস্তবিক অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতাই আমাদের মাথা খেয়েছে। আত্মার সন্ধান নিতে গিয়ে কি মানুষ স্বার্থপর হয় ? নিজকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে কি মানুষ পরকে অবজ্ঞা করে ? যথার্থ শ্রদ্ধার নিদর্শন তো তা নয় !

স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে সর্ব্বতোভাবে আমরা যে বিশ্বের সঙ্গে বা সকলের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, ভাবুকের ভাষায় প্রাণে প্রাণে গাঁথা আছি, এইটাই তো প্রেম ! কিন্তু প্রেম তো শুধু নির্জীব বন্ধন-সূত্র মাত্র নয়—প্রতি অংশে প্রেম active। এখানেই প্রত্যক্ষ দেখ্ছি, যার যত ঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, সে তত বড় কর্ম্মী। প্রেমের একটা প্রধান লক্ষণই হল যে, যাকে ভালবাসা যায়, যার প্রতি প্রেম হয়, তাকে সর্ব্বতোভাবে সুখে শান্তিতে রাখাই জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়। আর অপরকে সুখ দিতে হলেই, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বলি দিতে হবেই। এ জায়গায় প্রেমিক প্রচণ্ড কর্ম্মী না হয়ে থাকতে পারেন না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"ত্রিলোকে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই, তবু আমি কর্ম্ম করে যাই।" এই কর্ম্মের মূল রহস্য—জগতের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা বা আকর্ষণ। এই জন্যই মনে হয়, আমরা যদি ঠিক ঠিক জগৎকে কিম্বা ভগবান্কে ভালবাসতে পার্তাম, তাহলে বোধ হয় আমাদের জাতির এই দুর্দ্দশা থাকৃত না। কেননা প্রগাঢ় ভালবাসা যেখানে, সেখানে আত্ম-স্বার্থ বিসর্জ্জনের দুর্জ্জয় শক্তির উদ্ভব হয়। এদের দিয়েই জগতে বড় বড় কাজ হয়। দরদী, প্রেমিক নিঃস্বার্থ ভাবে যতখানি খাটতে পারে, আর কেউ তেমন পারে না।

বিশ্বরাজকে কেন্দ্র করে এই যে বিশ্বাত্মবোধ—আধেয় কত বৃহৎ অথচ আধার মাত্র এই এতটুকু, আমাদের জীবনের মতই একটী জীবন—এই তো সহযোগের জ্বলন্ত আদর্শ। এই প্রেমই তো যথার্থ প্রেম। সব ভাইকে দিনান্তে সমস্ত দিনের শত বিচিত্র কর্ম্মাভিনয়ের পরও একটা স্থানে একটী মুহূর্ত্তের জন্য যা ঋজুমুখে সম্মিলিত করতে পারে, সেই প্রেমের চেয়ে বড় লাভ আর জগতে কি আছে ? মানুষ শত ত্রুটী, শত অসম্পূর্ণতাও প্রশান্ত হৃদয়ে সয়ে যেতে পারে কার বলে ?—এই স্বর্গীয় দুর্লভ প্রেমের শক্তিতে। বৈচিত্র্য নিয়েও পার্থক্য নিয়েও সম্মিলন হতে পারে, বৈচিত্র্যের চেয়েও, পার্থক্যের চেয়েও যে বড় জিনিষ রয়েছে প্রেম, সেই প্রেমের আকর্ষণে !

আজ দেশে এই প্রেমেরই অভাব, আমরা সব ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। অপ্রেমের মূল দুর্ব্বলতা, অন্তরের হীনতা দীনতা। যে সবল, নিজের অভাবকে অগ্রাহ্য করে ভাবময় আশা আকাঙ্ক্ষায় যে উদ্দীপিত, তার জীবনই সার্থক ! নিজের অভাবকে

ছোট করে, সকলের অভাবকে বড় করে দেখে, তার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রাণ ঢেলে দিতে পার্ সেই সত্যিকার প্রেমের জাগরণ হয়। আমাদের প্রাণে এই প্রেমের পুলক জেগে উঠুক। আমাদের আজ কি নাই, তার ভাবনায় কালক্ষেপ করলে কোন পক্ষে মঙ্গল হবে না। আমাদের যা আছে, তারই কি মূল্য কিছু কম?—এখনো যদি তাই নিয়ে সবাই অমরা সহযোগী হই, দেশের সে স্বুবর্ণ সুযোগ হেলায় কাটবে না, বিধাতার একটা সার্থক বিধান জাগবেই।

যথার্থ প্রেমিকের অসাধারণ কর্ম্ম-শক্তির স্ফুরণ হয়। প্রত্যক্ষ অনেকের জীবনে তা দেখতেও পেয়েছি। ভালবাসার ভিতর দিয়ে মানুষের ভিতর কি অসাধারণ শক্তি জন্মায়, তা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য নেই, একটা উজ্জ্বল আনন্দের স্মৃতি বুকে নিয়ে—দিন নেই রাত নেই মানুষ কিরূপ খাটুনী খেটে যেতে পারে, তাই এক এক সময় ভাবি!

ভালবাসা জিনিষটা দুর্লভ কচিৎ সত্যিকার ভালবাসার স্ফূরণ হয়, আর সে ভালবাসার কণা পেয়েই সঙ্ঘ হয়, প্রতিষ্ঠান হয়, বড় বড় কর্ম্মের সূত্রপাত হয়; অথচ মূলে রয়েছে দু'টী প্রাণের স্বর্গীয় আকর্ষণ। কাজেই জগতে একমাত্র ভালবাসাই সত্য, প্রেমই খাঁটী জিনিষ।

বিধি-নিয়ম দ্বারাও জগৎ চলছে, কিন্তু বিধি-নিয়মের আদর্শের প্রতি মানুষের তেমন যেন একটা শ্রদ্ধা নাই, কেননা সেখানে অন্তরের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হয়ত ওপরওয়ালার ভয়ে সব মেনে যেতে হয়। আত্মস্ফুরণের শক্তি যেখানে ব্যাহত হয়, সেখানে বড় একটা কর্ম্মের আশা করাও দুরাশা।

খাঁটী জিনিষ অত্যন্ত দুর্লভ। মহাপ্রভুর নাকি ২॥ জন মাত্র অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল। বুদ্ধদেবকে প্রকৃত ভালবেসেছিল কয়জন? শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল কয়টী গোপী? দু'একটীর জীবনের অমূল্য সম্পদের দিব্য দ্যুতিতেই হয়ত আমাদের মত সহস্র সহস্র লোক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্ছে। অথচ এর মূল অনুসন্ধান করতে গেলে দেখি—খাঁটী ভালবাসার পাত্র জগতে কত বিরল।

অনেকেই আক্ষেপ করে বলে থাকেন, মহাপ্রভুর প্রেম বিলানোর ফলেই নাকি দেশের মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, দেশ থেকে বীরত্বের ভাব লোপ পেয়ে গেছে, নিজের ভিতর দৈন্যকে প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন জাতিটা দীনতার মাঝেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হচ্ছে। অথচ মহাপ্রভুর সময় কাজের দিক দিয়ে—প্রতিভার দিক দিয়ে যে সব জিনিষের উদ্ভব হয়েছিল, আজ বিচক্ষণ বুদ্ধি দ্বারা বিচার বিশ্লেষণের ফলেও—কই, তেমন একটা সজীব জিনিষের তো উদ্ভব হচ্ছে না। আত্মত্যাগের কি অসীম ক্ষমতা অর্জ্জন হয়েছিল ভক্তদের! তারা মহাপ্রভুর দরুণ কি না করেছে!

যেখানেই বড় একটা কিছু গড়ে উঠেছে, তার মূল অনুসন্ধান করে খুঁজে পাই ভালবাসার ভিত্তি। হয়ত একটী প্রাণ আর একটীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। তাদের ভালবাসার অমর অনুভূতি নিয়েই আজ সঙ্ঘের প্রত্যেকের প্রাণে নব-উদ্যমের বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। কাজেই, জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ হয় দুটী একটীরই। আর সেই সিদ্ধ-জীবনের দিব্য প্রেরণাই শত শত লোককে দেহে মনে প্রাণে উদ্দীপিত করে তুলে।

খাঁটী মানুষের জল্পনা-কল্পনাটা অনেক কম। তাঁরা চান, অন্তরের অনুভূতি। পরমহংসদেবের মনে প্রতিষ্ঠানের কল্পনাও জাগেনি, তিনি মাত্র

কয়েকটীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, আর সে ভালবাসা নিঃস্বার্থ ভালবাসা। সেই ভালবাসার জোরেই অপরের প্রাণে মহৎ সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করবার বুদ্ধি, প্রতিভা, শক্তির বিকাশ হল। কাজেই আমরা বাইরের সম্পদ্ বা সিদ্ধির দরুণ যত মারামারি কাটাকাটি করি, অন্তর্ম্মুখী হয়ে তার বিন্দুমাত্র শক্তিও যদি ভিতরের দিকে খাটাতে পারতাম, তাহলে বোধ হয় আজ কর্ম্ম নিয়ে এত মনোমালিন্য, এত বিরোধের সূত্রপাত হ'ত না।

জগতে অনেক অমিল, অনেক অসামঞ্জস্য রয়েছে ; এ সব নিয়েও মানুষকে এই কর্ম্মময় জগতে অক্ষয় স্মৃতি রেখে যেতে হবে ! কাজেই বাহিরকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি আয়ত্ত করতে হলে অন্তর্ম্মুখী হওয়া ছাড়া—নান্যঃ পন্থাঃ, আর কোন উপায় নাই। ভিতরের ঐক্য নিয়েই আমরা বাইরে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আর ভিতরে সে জোর থাকলেই, বাইরের অসামঞ্জস্যের মাঝেও একটা সামঞ্জস্য করে চলা সম্ভবপর হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব আজ জগতকে বিস্মিত মুগ্ধ করে রেখেছে কেন ? না, তিনি বহির্জগতের বহু উর্দ্ধে একটা মনকে নিয়োজিত রেখেছেন, নীচের মনটাকেও তিনি সেই মনের দীক্ষাতেই পরিচালিত করেন, এইজন্যই তাঁর কর্ম্ম, দৃষ্টি, সামঞ্জস্যের সূত্রের মাঝে একটা আশ্চর্য্য শক্তির উদ্ভব হয়। মানুষের মিল অন্তরে অন্তরে, বাইরের মিল গোঁজামিল মাত্র।

প্রকৃত ভালবাসা যেখানে, সেখানে উন্মত্ততা নেই, আত্মবিস্মৃতি নেই। আজকাল অনেকেই ত্যাগ দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেই ত্যাগের মূলে উত্তেজনা বা স্বার্থসংরক্ষণের অভিসন্ধি রয়েছে বলেই সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। অপরের সঙ্গে স্বার্থের কারবার চলতে পারে, আর অনেক ক্ষেত্রে না করলে ক্ষতিও হয়, কিন্তু নিজেদের ঘরের মাঝেও যদি স্বার্থের দিকটা প্রবল হয়ে ওঠে, তা হলে সেখানে কল্যাণের আশা করা যেতে পারে কি ক'রে ? পরিবার—"আদর্শ পরিবার" হয়ে ওঠে আত্মত্যাগের পুঞ্জীভূত শক্তিকে উপলক্ষ্য করেই। কাজেই সবাই স্বার্থপর হলে, সেটাকে পরিবার না বলে হিংস্রের আবাসস্থল বললেই ঠিক হয়। কেউ কাউকে দেখতে পারে না, কারো প্রতি কারো দরদ নেই সেখানে। আজ আমাদের সব দিকেই আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে। রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সমাজ, যে কোন দিকের শীর্ষ স্থান অধিকার করতে হলেই, আমাদের গভীরভাবে আত্মস্থ হওয়ার শক্তি অর্জ্জন করতে হবে। আমাদের স্বভাব কি, ধাত কি, এগুলো বুঝতে পারলেই আমাদের মাঝ থেকেই সব রকমের, সব দিকের শক্তিধর মহাপুরুষের উদ্ভব হবে।

হুজুগের ভিতর দিয়ে বড় হয়ে যাবার উৎকট লোলুপতা যাদের, তাদের ভিতরই দেখি অসহিষ্ণুতা, অদূরদর্শিতা। তা না হলে, তিল তিল সাধনার ভিতর দিয়েই চরম সিদ্ধি লাভ হয়। ত্যাগের পেছনে যেখানে প্রশান্তি নেই, আত্মরতি নেই, সেখানে ত্যাগের রূপও দেখা দেয় প্রচণ্ড হয়ে। সে ত্যাগ শক্তির মাঝে প্রলয়ের বীজই সঙ্গোপিত ! অথচ এই জগতও টিকে আছে কিন্তু ভগবানের প্রসাদেই—ত্যাগ-শক্তিতেই।

মরার আগে প্রাণে খুব একটা ছটফটানি আসে, তখন মানুষ হাত-পা ছুড়তে থাকে ; সেটা কিন্তু প্রাণের লক্ষণ নয়, মৃত্যু তখন এগিয়ে আসছে তার। কাজেই ক্ষণিক উত্তেজনা, ক্ষণিক ত্যাগের কোন মূল্যই নাই। জীবনভরা ভালবাসাকে, ত্যাগশক্তিকে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখে চলতে পারলেই,

সেই জীবনের অমোঘ প্রভাবে শত শত প্রাণ প্রশান্তোজ্জ্বল অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কাজেই দেশের ব্যর্থতা, অসম্পূর্ণতার মূলে কিসের অভাব রয়েছে, সে কথাটাই আজ গভীর ভাবে আমাদের তলিয়ে দেখ্তে হবে।

—)•(—

সুখ-দুঃখ

সুখ-দুঃখ জীবনের নিত্য সঙ্গী। ছোটর বেলায় কি যেন একটা শিশু-পাঠ্যে পড়িয়াছিলাম—"সুখ-দুঃখ দুটী ভাই, থাকে সদা একঠাঁই, কেহ নাহি ছাড়ে কারো সঙ্গ।" বাস্তবিকই সুখ আর দুঃখ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ক্রমান্বয়ে জীবন-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া যাইতেছে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এই ক্রমে তাহাদের লীলা চলিয়াছে জীবনের উপর। মোহমুগ্ধ জীব এই সুখ-দুঃখের গোলক ধাঁধায় পড়িয়া কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে। সুখ-দুঃখের হাতে যেন সে ক্রীড়া-পুত্তলী! মানুষ নিজের শক্তির বড়াই করে, অহঙ্কার করে, কিন্তু এই সুখ-দুঃখের হাতে যে তাহারা ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছু নয়, এ হুঁস তো তাহাদের হয় না। আজ তোমার সুখের দিন আসিয়াছে, চারিদিক হইতে সুখের অজস্র উপকরণ আসিয়া জুটিতেছে, এই সুখের নেশায় তুমি জগৎ ভুলিয়াছ, নিজকে ভুলিয়াছ; কিন্তু তুমি জান না জীব! এখনই এই সুখের মেলা ভাঙ্গিবে, দুঃখের প্রবল নিষ্পেষণে তোমার এই সুখ স্বপ্ন টুটিয়া যাইবে। যখনই দেখিবে জীবনে সুখের বসন্ত আসিয়া দেখা দিয়াছে, জানিও তাহার পশ্চাতেই দুঃখের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বর্ত্তমান।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, সৃষ্টির পর ধ্বংস, ধ্বংসের পর সৃষ্টি, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ—এই ক্রমেই জগৎ-চক্র আবর্ত্তিত। শাস্ত্রেও পাই - "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ।" জগৎ-স্রষ্টার এমনি সৃষ্টি কৌশল, এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোন প্রকারেই হইবার নয়। আজ যেখানে দেখিতেছ আনন্দের হাট বসিয়াছে, আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইতেছে, কালই হয়ত দেখিবে সেখানে নিরানন্দের করাল-ছায়া। কোথায় গিয়াছে আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথায় গিয়াছে সেই সুখ-স্বপ্ন! দেখিবে সেই সুখ-স্মৃতি দুঃখের আগুনে যেন আরও বেশী করিয়া ইন্ধন যোগাইয়া দিতেছে। সুখের সময় আর দুঃখের কথা মনে থাকে না বলিয়াই, দুঃখের আগমনে আমরা মর্ম্ম-পীড়া পাই বেশী। যদি সুখের সময়ও এই

দুঃখের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঠিক সুখের মত এই দুঃখকেও বরণ করিয়া লইবার মত শক্তি আমাদের অর্জ্জিত হইত।

তুমি যতই পণ্ডিত হও, যতই অর্থশালী হও, সুখ-দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। আজ তোমার দুঃখের দিন আসিয়াছে, দুঃখ-কষ্টে তুমি জর্জ্জরিত—নিষ্পেষিত হইতেছ, দুঃখের আতিশয্যে জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইতেছে, মনে করিতেছ এই দুঃখ বুঝি তোমার বুকে জগদ্দল পাথরের মতই চাপিয়া বসিয়াছে, ইহা হইতে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। কিন্তু জানিও জীব! এ দিন তোমার থাকিবে না, দুঃখের পর সুখের আবির্ভাব অবশ্যই ঘটিবে। প্রবাহাকারে সুখ-দুঃখ নিত্য হইলেও, ব্যষ্টি-ভাবে তাহারা অনিত্য। এখন তুমি দুঃখ-কষ্টে জর্জ্জরিত, মুহূর্ত্ত পরেই আবার সুখের পরশে তুমি উল্লসিত হইয়া উঠিবে। একটু ধৈর্য্য ধর, দুঃখের আবেশ একটু সহ্য কর। এ জগতে স্থায়ী কিছুই নাই, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই জগতের পরিবর্ত্তন হইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একের স্থান অপরে অধিকার করিতেছে। কাজেই দুঃখের অবস্থানকে অস্থায়ী জানিয়া, অনিত্য জানিয়া সুখের প্রতীক্ষা কর; কিন্তু সাবধান! সুখের দিনে যেন এই দুঃখের কথা স্মরণ থাকে, সুখের স্রোতে যেন গা ভাসাইয়া দিও না—অতলে ডুবিও না।

জীবনের যদি কিছু সত্য বস্তু থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা এই প্রবহমান সুখ-দুঃখ। জগতের যত কিছু কর্ম্ম, যত কিছু প্রচেষ্টা, সকলের পরিণতি এই সুখ-দুঃখে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয় চিত্তে। যার চিত্ত যত দুর্ব্বল, সে সুখ-দুঃখের প্রবল অভিঘাতে অভিভূত হইয়া পড়ে তত বেশী। চরমে সুখ-দুঃখের অনুভূতি এক হইলেও, তাহাদের পরিণতি ঘটে বিভিন্ন কারণ হইতে। ধনহীন আমি, এখনই যদি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হই, চিত্ত সুখের সায়রে ভাসিবে; মানহীন আমি, এখনই যদি সম্মানের উচ্চ-পদ লাভ করি, চিত্ত সুখের অনুভূতিতে অবশ হইয়া যাইবে; আবার তাহার বিপরীতে ধনী আমি, এখনই যদি সর্ব্বস্বান্ত হই, অমনি দুঃখের জ্বালায় পুড়িতে থাকিব; সম্মানী আমি, আমার সম্মানের লাঘব হইলে জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা মনে করিব। এই ভাবে মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতি, জয়-পরাজয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বের প্রবল অভিঘাতে জীবন নিষ্পেষিত। সুখের সময় আমাদের চিত্ত কতখানি প্রশস্ত হইয়া যায়, আর দুঃখের সময় কত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে! কেন এমন হয়? আমরা স্বাধীন না হইয়া তাহাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া আজ আমাদের এই দশা। তাহারা যেন আমাদের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। সুখ আসিয়া যেমনি বলিল—এই আমি আসিয়াছি, অমনি অতীতের সকল স্মৃতি ভুলিয়া ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা না করিয়া আমরা তাহার স্রোতে গা ভাসাইয়া

দিলাম ; আবার যেমনি দুঃখ আসিয়া বলিল—আমি আসিয়াছি, অমনি যেন আমাদের সকল পণ্ড হইয়া গেল, মুখের হাসি মুখে মিলাইয়া গেল, বুকের আনন্দ মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গেল। এই ভাবে তরঙ্গিনী-তরঙ্গ-বিতাড়িত তৃণের মত আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি সুখ-দুঃখের স্রোতে। অবলম্বনের কিছু নাই, আশ্রয় করিবার কিছু নাই।

সমগ্র জগৎ জুড়িয়াই চলিয়াছে সুখ-দুঃখের এই আবর্ত্তন লীলা। সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়ত্রই ইহার সমান প্রভাব। সমষ্টি ভাবে একটা জাতিকে ধরিলেও দেখি, কখনও তাহাদের উত্থান, কখনও পতন। পতনের পর আবার উত্থান, আবার পতন। এমনি করিয়া সমষ্টি ভাবে জাতির ললাটেও সুখ-দুঃখের ক্রমবিবর্ত্তন চলিতে থাকে। আবার ব্যষ্টিজীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সুখ-দুঃখের পরিবর্ত্তন-লীলা চলিয়াছে তাহার উপর। কখনও সুখের শুভসমাগমে হৃদয় উৎফুল্ল, কখনও আবার দুঃখের প্রবল নিষ্পেষণে মর্ম্মস্থল নিষ্পেষিত।

যতই তুমি বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর, নিত্য নূতন যন্ত্রাদির আবিষ্কার কর, দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। কি করিয়া মানুষ সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে, কি করিলে দুঃখ আর তাহার ত্রিসীমানায়ও পৌঁছিতে পারিবে না, এই একটী মাত্র বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই বিজ্ঞানের প্রগতি। বিজ্ঞান চাহিতেছে যাহাতে জগতে দুঃখ বলিয়া কিছু না থাকে ; কিন্তু দেখিতেছি, যতই অভাব পূরণের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে, অভাবের পরিমাণও সমান ভাবে তাহার সঙ্গে তাল ঠুকিয়া চলিয়াছে। বরং অভাবের আগুন ইন্ধন পাইয়া দিন দিন বেশী করিয়াই জ্বলিয়া উঠিতেছে। বাহিরের অভাবই তো শুধু অভাব নয়, বাহির ছাড়াও ভিতর বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে। না হয় জড় জগতের জিনিষ দিয়া এই জড় দেহটার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে পার, কিন্তু স্থূল দেহের পরপারেও যে একটী সূক্ষ্ম সত্ত্বা রহিয়াছে, যেখানে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ সকলের অনুভূতি, সেই চিত্তের প্রশান্তি কি করিয়া আসে তাহার সন্ধান কি তোমার বিজ্ঞান দিবে ? যতই কলকারখানার আবিষ্কার কর, নিত্য নূতন যন্ত্রাদির জন্ম দাও, বাহিরের জিনিষ দিয়া ভিতরের অভাব মিটাইবার প্রয়াস বৃথা।

সুখ না চাহিলেও সুখ আসিবে, দুঃখ না চাহিলেও দুঃখ আসিবে। জগতের এই নিগূঢ় রহস্য অবগত নহে বলিয়াই মানুষ দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখই চায়, আর সুখ চাহিয়া দুঃখের আঘাতে পীড়িত হয় বেশী।

জীবনে সুখ-দুঃখের লীলাকে প্রবহাকারে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহারই মাঝে কেমন করিয়া তাহাদের অঙ্কুশাঘাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—ভারতের ঋষি তাহার পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। নিজের

জীবন দিয়া সে সত্য উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থাকারে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেমন করিয়া আমরা সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বাবস্থায় সমভাবে অবস্থান করিতে পারি, অবিচলিত থাকিতে পারি, ইহাদের মাঝে থাকিয়াও ইহাদের আঘাত হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাই, তাহার সহজ সরল কৌশল শিক্ষা করিতে পারি আমরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে। ভারতের দেবতা দ্বন্দ্বজর্জ্জরিত অর্জ্জুনের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কল্পে—স্নেহ-মধুর কণ্ঠে বলিলেন :—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ আসিবে এবং যাইবেও ; তাহারা অনিত্য, তাহাদের বেগ সহ্য কর। এই সহ্য করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। সুখ-দুঃখ আসিবেই, অথচ ইহাদের মাঝে থাকিয়াই আনন্দে কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। এই কর্ম্ম-কৌশলের শিক্ষা পাই আমরা আর একটী শ্লোক হইতে ; শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ চ্ছলে বলিতেছেন—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
তস্মাৎ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

সুখ-দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় প্রভৃতি সকল দ্বন্দ্বাবস্থাকে সমান জ্ঞান করিয়া কর্ম্ম কর ; সুখও চাহিও না, দুঃখকেও তাড়াইবার চেষ্টা করিও না ; প্রকৃতির আবর্ত্তনে যখন যাহা আসিবে, হাসি মুখে তাহাকেই তোমার বুকে বরণ করিয়া লও।

সুখ-দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার দুইটী মাত্র পন্থা। একটী জ্ঞান-পথ অপরটী ভক্তি-পথ। যদি তুমি জ্ঞানী হও, যদি তোমার বুকের পাটা শক্ত থাকে, হৃদয় সবল থাকে,—জান, বিশ্বাস কর, তুমি আনন্দ-স্বরূপ, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ; তোমাতে সুখ-দুঃখ আসিতে পারে না, সুখ-দুঃখের অভিঘাত তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা "আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ।"—তাহারা তাহাদের খেয়াল খুসী মত আসিবে এবং যাইবেও, তুমি শুধু তাহাদিগকে "তিতিক্ষস্ব"—সহ্য কর। সুখ আসে আসুক, তুমি সুখের আবেশে অভিভূত না হইয়া তোমার আনন্দ-স্বরূপত্ব অব্যাহত রাখ ; দুঃখ আসে আসিতে দাও, তুমি নির্লেপ জানিয়া দুঃখের আঘাতে নির্ব্বিকার থাক। এই সুখের আঘাত, এই দুঃখের আঘাত সহ্য করিতে হইলে অচলের মত অটল হইতে হইবে, নিজের আনন্দ-স্বরূপত্ব অব্যাহত রাখিয়া সুখ-দুঃখের দেনা পাওনা চুকাইতে হইবে। আর যদি তোমার হৃদয়ে তেমন বল না থাকে, যদি একটুতেই তুমি উল্লসিত বা দমিত হইয়া পড়, তাহা হইলে তুমি ভক্তি-পথ অবলম্বন কর। সুখ আসুক, দুঃখ আসুক, সবই মঙ্গল ময়ের দান মনে করিয়া আনন্দে তাহাদের বরণ করিয়া লও। সুখ আসে—তাও প্রভুর

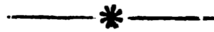
দান, দুঃখ আসে—তাও প্রভুর দান। যিনি আমার প্রভু, যিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমাকে সুখে ডুবাইয়া রাখিলেও আনন্দ, দুঃখের পাথারে ভাসাইলেও আনন্দ।

যে পথ ধরিয়াই চলনা কেন, উভয়ের ফল একই। যিনি এই পন্থাদ্বয়ের যে কোন একটী পন্থা অবলম্বন করিয়া সুখ-দুঃখের আঘাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন—তিনিই ধন্য, তিনিই মুক্তির অধিকারী। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

"যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ !
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।"

এই সকল মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বিষয়সম্বন্ধ সুখ-দুঃখে নির্ব্বিকার যে ধীর পুরুষকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে না পারে, তিনিই মোক্ষ প্রাপ্তির অধিকারী।

যদি শান্তি চাও, মুক্তি চাও, আনন্দ চাও, তাহা হইলে দেবতার এই উপদেশ-বাণী শিরে ধরিয়া নিজের সামর্থ্যানুযায়ী—হয় জ্ঞান পথ না হয় ভক্তি-পথ অবলম্বন কর। তাহা হইলেই সুখ আর সুখ রূপে তোমাকে মোহে ডুবাইয়া রাখিবে না, দুঃখ আর দুঃখ রূপে তোমাকে নিষ্পেষিত করিবেনা। জ্ঞানের সাধনায় তুমি আনন্দ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর ভক্তির সাধনায় সুখ ও দুঃখ উভয়েই আনন্দে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। সুখ-দুঃখের আঘাত হইতে পরিত্রাণের এই-ই পথ। নান্যঃ পন্থাঃ।



সঙ্ঘের-আদর্শ

অভাব নিয়ে প্রকৃত মিলন হতে পারে না। যদিও মিলন হয়, সে মিলন অস্থায়ী, দুদিন পরে মনোমালিন্যের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। স্বাতন্ত্র্যের গৌরববোধ নিয়ে মানুষ যদি আপন পথে চলে সত্যিকার মহত্ত্ব অর্জ্জন করতে পারে, তাহলে স্বাতন্ত্র্যের যে রেশটুক থাকে, তারও একটা মাধুর্য্য ফুটে উঠে। বড় হয়ে উঠ্‌লেই পরস্পরের মিলন সত্যিকার সামগ্রী হয়ে ওঠে, আর সে মিলনই শাশ্বত মিলন। কাজেই সাময়িক মিলনের চেয়ে, স্বাতন্ত্র্য বোধ নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েও যদি আপন জীবনের সার্থকতা লাভ করা যায়, তাহলে সে স্বাতন্ত্র্যের মাঝে মিলনের সুর আপনি বেজে উঠবে। মানুষ কোন কিছুই তলিয়ে দেখে না, ওপরভাষা তাৎপর্য্যেই সাধারণের মন পরিতুষ্ট। জনসাধারণ চায় জাঁকজমক, আড়ম্বর; কিন্তু এই আড়ম্বরের মাঝে যথেষ্ট অজ্ঞানতার—তামসিকতার প্রশ্রয় থাকে বলেই, দুদিন পর সাম্প্রদায়িক বিরোধ লেগে যায়। এইজন্যই মিলনের পূর্ব্বে মিলনের যোগ্যতা অর্জ্জন হয়েছে কিনা,

অর্থাৎ কোন দিক দিয়া আর অপূর্ণতা আছে কিনা, এ কথা ভেবে তারপর আড়ম্বরের সহিত সম্মিলন কর্‌তে হয়। রবিঠাকুরের কোন্ একটী প্রবন্ধে জানি পড়েছিলাম, তিনি লিখেছেন—"দীনতার মিলন, অদীনতার মিলন এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজা-মিলন মাত্র।" বাস্তবিকই এ মিলনের কোন সার্থকতা নাই। এই কথাগুলো বেশ গভীর ভাবে তলিয়ে দেখ্‌বার কথা। গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারব, নিজেদের মাঝে কত গলদ, কত অসম্পূর্ণতা, কত সঙ্কীর্ণতা নিয়াই না আমরা মিলনের গৌরব অনুভব করি!

মানুষের চিত্ত যত উন্নত হবে, culture যত পরিপুষ্ট হবে, ততই মিলনের মাঝেও একটা উৎকর্ষ দেখা দেবে। তখনই বুঝ্‌ব, বড় না হতে পার্‌লে যথার্থ মিলন সম্ভবপর নয়; চিত্তের সঙ্কীর্ণতা, বুদ্ধির জড়তা, এ সবকে সহচর রেখে প্রকৃত মিলন কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে আমরা যে মিলনের বড়াই করি, তার মাঝে যথেষ্ট অজ্ঞানতা রয়েছে। এখনো আমাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি খুলেনি। ব্যক্তিগত সাধনার উৎকর্ষেই যে প্রকৃত সাধুসঙ্ঘের সৃষ্টি—এ কথা বুঝ্‌লেও, কার্য্যতঃ আমরা সমষ্টির গৌরবেই—নিজেদের গলদ আছে জেনেও নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত করে দিচ্ছি এইজন্য মিলেও আমরা কোনদিক দিয়ে অগ্রসর হতে পার্‌ছি না। কেউ কেউ এই মিলনটাকেই চরম মনে করেন, কিন্তু এই মিলনের মাঝে যে কত দিক দিয়ে কত প্রকারের গোঁজা মিল রয়েছে—এ কথা স্বাধীন-চিন্তাশীল না হলে বুঝা দুষ্কর। চিত্তের দৈন্য নিয়ে, ব্যক্তিগত অনিবার্য্য দুর্ব্বলতার ব্যাধি নিয়ে যে মিলন, সে মিলনে পরস্পরকে সাহায্য না ক'রে বরং ডুবিয়ে দেবারই সহায়তা করে।

সঙ্ঘের অভাব নাই, সম্প্রদায়েরও কম্‌তি নাই; কিন্তু এই সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে অভাবকে অযোগ্যতাকে ভিত্তি করে। তাই এইরূপ সঙ্ঘ দিন দিন অধঃপতনের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। এইজন্যই বলি—দুর্ব্বলের কোন দিন সঙ্ঘ হতে পারে না।

এই গোঁজামিলনের চেয়ে পৃথক্ হয়েও যদি বড় হওয়া যায়, তাহলে সেই বড় হওয়ার যথেষ্ট মূল্য আছে। আমরা একথা বুঝে উঠি না যে, মিলনের মাঝে যেখানে অজ্ঞানতা, মূঢ়তা রয়েছে, সেখানে মিলনের কোন উপকারিতা নাই। আমাদের অধিকাংশ সঙ্ঘই হচ্ছে দুর্ব্বলের প্রশ্রয়-স্থল। কাজেই ওরূপ সঙ্ঘ দিয়ে জগতের হিত দূরের কথা, আত্মহিতও হয়ে উঠে না।

দল বেঁধে জাঁকজমক করে চল্‌লেই আত্মহিত হয় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ্‌তে পাই, লাফালাফিটা দুর্ব্বলের দ্বারাই বেশী হয়। তারা চায়—আশু লাভ, অস্থায়ী সুখ্যাতি; তাই দুদিন পর দলে দলে মারামারি, কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে যায়।

অভাবের মিলন, দীনতার মিলন্ যে বেশী দিন টিকে না, আর তাতে যে প্রাণে শান্তিও আসে না, তা রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রথম সম্মিলন দেখেই বুঝা যায়। তাঁরা যখন ব্যক্তিগত চেষ্টায় অন্তরের দিক দিয়ে মহত্ত্ব অর্জ্জন করে, তারপর সম্মিলিত হলেন, তখনই তাঁদের মিলন সার্থক হল। এর পূর্ব্বের মিলন খাঁটী মিলন হয়নি, এইজন্যই পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শক্তি সঞ্চয় কর্‌তে হয়েছিল তাঁদের।

কোনমতে বেঁচে থাক্‌তে, কোন মতে দিনের মাঝে দু'একবার ভগবানের নাম নিয়েই তৃপ্ত থাক্‌তে যারা চায়, তাদের কথা আলাদা; কিন্তু যারা আত্মহিত, জগৎহিতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সঙ্ঘ সৃষ্টি করে সাধারণকে উন্নত করে তুল্‌তে চায়, তাদের

পক্ষে দুর্ব্বল সজ্ঘের কাছে ঘেঁসাও অনুচিত। এক এক সময় মনে হয়, আমাদের মাঝে যে এত মিল, এত সহজে সজ্ঘের সৃষ্টি হয়ে যায়, তার মাঝে মারাত্মক দুর্ব্বলতা রয়েছে। প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই বলেই নির্ব্বিবাদে মিলন ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে মিলন, এই যে সজ্ঘ, এ কিন্তু আদর্শ সম্মিলন বা আদর্শ সজ্ঘ নয়।

আমরা যে এত অভাব, ব্যক্তিগত এত অসম্পূর্ণতা নিয়েও মিল্‌তে পারি, এটা গৌরব করার বিষয় নয়। বরঞ্চ আত্ম-চেষ্টায় নিজের অসম্পূর্ণতাকে বিদূরিত করে, তারপর মিল্‌তে পার্‌লে সে মিলন সার্থক হয়ে দাঁড়ায়। সজ্ঘ বা সম্প্রদায়ের মাঝে এত গলদ জমে উঠে কেন? কেননা সেখানে সবলের সংখ্যা কম, দুর্ব্বল বলেই পরস্পরকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকৃতে হয়। এই প্রাণহীন অচল সজ্ঘের মাঝে কোনমতে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু এই সজ্ঘ দ্বারা জনহিত হবার আশা করা দুরাশা মাত্র।

নিছক আদর্শের প্রলোভনে যারা সহজে বিচলিত হয়ে ওঠে, তাদেরই এই দুর্দ্দশা। তারা নিজেদের দৈন্যের দিকে, নিজেদের অক্ষমতার দিকে ফিরেও তাকায় না, তারা চায় কি করে একটা কিছু দাঁড় করে ফেলানো যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা মিলে যাই শুধু উচ্ছ্বাসের—আবেগের বশবর্ত্তী হয়ে। অথচ স্থির ধীর ভাবে চিন্তা কর্‌লে দেখি, ব্যক্তিগত সাধনার এখনো কত বাকী! সেই অভাব নিয়ে পূর্ণতার অভিনয় করা, আর আত্মহত্যার ফিকির করা একই কথা।

সজ্ঘের মাঝে দেখি, এক এক সময় অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এমন তুমুল কাণ্ড বেধে যায়, তা আর বল্‌বার নয়। অথচ উন্নত চিত্তে কিন্তু এত সঙ্কীর্ণতা আস্‌তেই পারে না। সজ্ঘবদ্ধ হয়ে চলেও যেখানে ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা বা গলদ সংশোধন হয় না, সেখানে নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে হবে, সজ্ঘের মূলে প্রচুর দুর্ব্বলতার ব্যাধি রয়েছে।

নিজকে, নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢেকে রাখ্‌বার অবাধ সুযোগ পাওয়া যায় বলেই সজ্ঘের প্রতি এত লোভ আমাদের। কিন্তু দুর্ব্বলের সজ্ঘে এই ভাব বেশী দিন চলে না—দু'দিন পর সব ফাঁক হয়ে যায়। অনেক সচল সজ্ঘও দেখি, এই মারাত্মক দুর্ব্বলতা ব্যাধির দরুণই দু'দিন পর অচল হয়ে যায়।

সবার চিত্ত যেখানে সজাগ, সবাই যেখানে কর্ম্মঠ, কেউ যেখানে পারতপক্ষে কারও সাহায্য প্রার্থনা করে না, সেখানেই প্রকৃত সজ্ঘের সৃষ্টি, আর ওরূপ সজ্ঘ দিয়েই জগতের কাজ হয়। সজ্ঘের মাঝে দু'একজন কর্ম্মবীরের প্রচেষ্টার দরুণ সজ্ঘ কিছু দিন টিকে থাকে, কিন্তু সকলের অসমাপ্ত কর্ম্মের বোঝা বহন করে করে সেই কর্ম্মবীরেরও অবসাদ এসে পড়ে, আর আসা স্বাভাবিকও। এইজন্যই প্রায় সজ্ঘেই দেখি, একজন গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সেই উদ্যম, সেই আনন্দ নিয়ে কাজ কর্‌বার দ্বিতীয় লোক জুটে না। এতেই কি প্রমাণ হয় না—সজ্ঘের মাঝে যারা আশ্রিত, তারা কর্ত্তব্যবোধের দিক দিয়ে, কর্ম্মের দিক দিয়ে, কোন দিক দিয়েই যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌বার দরুণ চেষ্টা করে না? কাজেই ওরূপ সজ্ঘ করে কি লাভ? এর চেয়ে নির্দ্দয়-নির্ম্মম হয়ে প্রত্যেককে আপন পায়ে নির্ভর করে দাঁড়াতে শেখানো উচিত। সজ্ঘ না হোক্, আড়ম্বর না হোক্, তবু দুর্ব্বলকে নিয়ে—সঙ্কীর্ণ চিত্ত মানবকে নিয়ে সজ্ঘ করা উচিত নয়।

চিত্ত যেখানে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, বিচারবুদ্ধি যেখানে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, সেখানে কি সজ্ঘ হবে? সজ্ঘ কি দুর্ব্বলের? ঋষিদের মাঝেও

সঙ্ঘ ছিল, কিন্তু এক একজন ঋষি আপন মত নিয়ে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত প্রদীপ্তোজ্জ্বল হয়ে সঙ্ঘকে অলঙ্কৃত করতেন। তাঁরা নিজেদের বিশেষত্ব, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেননি বলেই, নিজ নিজ মহত্ত্ব নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে এমন অমায়িক সরল সত্য ভাবে মিশ্‌তে পার্‌তেন। এই-ই ঠিক প্রকৃত সঙ্ঘের আদর্শ। আর ব্যক্তিগত জীবনের সম্পদ্‌ দিয়েই সঙ্ঘকে সম্পদযুক্ত করতে হয়। এইজন্যই বলি, ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা নিয়ে সঙ্ঘে যোগদান করা উচিত নয়—বিশেষতঃ যেখানে দুর্ব্বলের সংখ্যাই বেশী।

——)•(——

এক গুঁয়েমী

সকল প্রকার ভেদকে, বৈশিষ্ট্যকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ করিয়া তুলিতে পারিলেই যেন অসহিষ্ণু মানবের মনের সাধটা মিটে। অথচ মানুষ এই কথাটী ভাবিয়া দেখে না, সৃষ্টির মূল যিনি—তিনিও বৈচিত্র্যকে অতি সমাদরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

আমার মনে হয়, যে কোনও পথের চরমে পৌঁছিতে পারিলে বোধ হয় এত গণ্ডগোল, এত অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। কলরব করি আমরা শুধু মাঝখান হইতেই। কেননা, মধ্যভূমি হইতে কোনটারই শেষ দেখা যায় না।

সঙ্ঘের মাঝে প্রায়ই সামান্য কারণে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সে দিন একজন বেশ উচ্চকণ্ঠে (অর্থাৎ যাহাতে সকলেই শুনিতে পায়) নিজের কোদাল মারার বাহাদুরী কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি এমন মস্‌গুল আর অভিমানে স্ফীত হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার যেন নিদারুণ ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কোদাল না মারিলে জগৎ চলিবে কি করিয়া? আশ্চর্য্য মানুষের স্পর্দ্ধা! এমন করিয়া যে যাহাই করে না কেন, সকলেই যেন তাহার পন্থা ছাড়া জগতে আর কোন পন্থাই দেখিতে না পায়। এই দৃষ্টির অন্ধতা লইয়াই মানুষ আবার গর্ব্ব করে!

আমি তাকে বুঝাইয়া বলিলাম—আচ্ছা, তুমি যে এত গর্ব্ব করিতেছ, তুমি কি ভাব, কেবল মাত্র তোমার এই কোদাল মারার সাহায্যেই সঙ্ঘ চলিতেছে? হাঁ, এ কথা ঠিক, সঙ্ঘের বিচিত্র কাজের মাঝে তুমি একটা দিক ধরিয়া বসিয়াছ এবং তাহা সিদ্ধ করিবার দরুণই আপ্রাণ খাটিতেছ। এই দিক দিয়া তুমি ধন্য, তুমি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তা বলিয়া কি তুমি সঙ্ঘের আর কোন কাজ দেখিতে পাও না? যাহারা অন্যান্য কাজ করিতেছে, তাহারা কি তোমার চেয়ে সঙ্ঘের কম উন্নতি-বিধান করিতেছে?

বলিলে কি হইবে, ইহা যে যুক্তির কথা, আর বিশেষতঃ সে এখন নিজের কাজ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, সুতরাং আমার কথা যদিও বা একটু-আধটু বুঝিয়া থাকে, অভিমানের দরুণ গর্ব্বের দরুণ সে বলিয়া উঠিল—হাঁ, আর বেশী

বলিতে হইবে না, কেবল কলম চালাইলেই ভাতের জোগাড় হইবে না।

এই ভাবেই মানুষ অন্ধ হইয়া, নিজের মতকে নিজের কাজকে চরম মনে করিয়া, জগতের আরও মহৎবস্তু লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। চোখ থাকিতে, জ্ঞান থাকিতে মানুষ যে কেন এত অন্ধ হয়, অসহিষ্ণু হয়, তাহা ভাবিয়া পাই না।

সে দিন একজন আসিয়া আমার কাছে এক নালিশ রুজু করিয়া বসিল। তাহার নালিশের বক্তব্য হইল এই যে, অমুক কেন কৃষি-কার্য্য না করিয়া ধ্যান করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করে? কি করা, তাহার বক্তব্য শুনিয়াই যাইতে হইল। পরে একা একা ভাবিয়া দেখিলাম, অনধিকারীকে কথা বলিবার সুযোগ দেওয়াও অন্যায়।

এই অসহিষ্ণুতার ফলে বৈচিত্র্যকে অস্বীকার অবজ্ঞা করিয়া চলার ফলে যে আমাদের কোন কিছুই সুষ্ঠু ভাবে হইয়া উঠিতেছে না—তাহা আজ কয় বৎসর ধরিয়া স্বচক্ষেই দেখিতেছি।

সকলের উপলব্ধির ক্ষেত্র এক নয়, এক জায়গা হইতে সকলেই সৃষ্টি করিতে পারে না। কাজেই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিতেই হইবে। অনেকের উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে অতিক্রম করিয়া। কাজেই সসম্ভ্রমে তাহাদের নীরবেই থাকিতে দিতে হইবে। তাহারা নীরবে থাকিয়া জগৎকে যাহা দিবে, হট্ট-গোলের মাঝে আসিয়া হয়ত তেমন কিছুই দিতে পারিবে না। কাজেই যে নাকি নীরবতাই ভালবাসে, তাহাকে জোর করিয়া মেলায় নামানো কিছুতেই সঙ্গত নয়। যাহারা জোর প্রয়োগ করে, তাহাদিগকেই বলি আমি একগুঁয়ে।

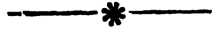
স্রষ্টার চেয়েও আমাদের বাহাদুরী বেশী। সৃষ্টিকর্ত্তা যদি আমাদের মত অসহিষ্ণু-অন্ধ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় জগৎটা এতকাল ধরিয়া একটা পিণ্ড হইয়াই থাকিত; জগতের মাঝে এত সৌন্দর্য্য, এত বৈচিত্র্যের বিকাশ হইত না। সবকে স্বাধীনতা দিয়াও যে সঙ্গতি রাখা যায়, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল হইলেন—সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার রাজ্যে ভাল-মন্দ সবই আছে, এবং এই বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই জগৎ এত সুন্দর, এত মনোহর!

গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের মাঝে যাঁহারা নাকি অপরকে খোঁচা দিয়া কথা বলেন, টিট্‌কারী দেন, নিজের কার্য্যের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা ছাড়া অন্য কোন কাজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না—তাঁহারা যে কত অন্ধ, কত বিমূঢ়, কত সঙ্কীর্ণচেতা তাহা আর বলিবার নয়। বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা কাহারও উন্নতি সহ্য করিতে পারেন না, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে তাঁহারা রীতিমত অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, জগৎশুদ্ধ লোক তাঁহাদের মতেই গড়িয়া উঠুক।

সকলকে এক ক্ষেত্রে, এক কর্ম্মে নামানো বিজ্ঞের কাজ নয়; বিশেষতঃ যাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বেশ সুস্পষ্ট দেখা দিয়াছে। একাকার করিয়া হিত হয় না, স্বাতন্ত্র্য দ্বারাই জগতের হিত হয়। তোমার মনোমত না হইলেই কি আসে যায়? সৃষ্টিকর্ত্তা যখন সবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহার মনোমত হইয়া গড়িয়া উঠাই আসল কাজ। আর প্রত্যেকের ভিতর বড় হইয়া উঠিবার, সার্থক হইয়া উঠিবার বীজ বা সংস্কার উপ্ত আছে।

গান্ধী যদি রবীন্দ্রনাথ হইতেন, তাহা হইলে তিনি আর গান্ধী হইতে পারিতেন না; তেমনি রবীন্দ্রনাথও যদি গান্ধী হইতেন, তাহা হইলে তিনিও আর রবীন্দ্রনাথ হইতে পারিতেন না।

কাজেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মাঝেই মানুষের মহত্ব। তুমি সবকে একাকার করিয়া দিতে চাহিলেও যে সব একাকার হইবে না—কেননা সৃষ্টিকর্ত্তা নিজেই যে বহুরূপী!



স্বানুভব

মনের মাঝে প্রাথমিক বেগ সঞ্চারের পক্ষে দেশ আর কালের আনুকূল্য খুবই প্রয়োজন। এইজন্যই চারিদিকে একটা প্রশান্তির আবহাওয়া, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতিতে মনের প্রাথমিক স্ফূর্ত্তির পক্ষে খুবই সাহায্য করে। তারপর মন একবার দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে পৌছে গেলে, তখন আর তাকে উর্দ্ধমুখী ঠেলে তুল্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মনকে স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাখ্‌তে হলে, বাইরের দৃশ্য, বাইরের মানবের সঙ্গে পরিচয় ও সম্বন্ধ রেখে চল্‌তেই হবে, তারপর যখন পূর্ণভাবে আত্মস্থ হবার শক্তি অর্জ্জন হবে, তখন আর বাইরের নিমিত্তেরও কোন ভরসা না রাখ্‌লে কিছু আস্‌বে যাবে না। এইজন্যই সাধকের পক্ষে অনুকূল স্থান-কাল খুবই লক্ষ্যের বিষয়।

এক ধ্যানে, এক চিন্তায় চিত্তকে সরস রাখা বড়ই কঠিন কথা। সাধকাবস্থায় অনেকরই বৈচিত্র্যহীন একের ধ্যানে ঘুমরূপ অচেতন সমাধি ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়না। কাজেই সাধনার প্রথমাবস্থায় সাধককে একটু স্বাধীনতা দিয়ে রাখ্‌তেই হবে। তারপর মন যখন এক বিষয়ে রস পেয়ে বস্‌বে, তখন আর তার বাইরের আনুকূল্য না থাক্‌লেও কিছু ক্ষতি হবেনা। সাধকাবস্থায় সিদ্ধের মত ফল-প্রাপ্তির আশা কর্‌লে কোনই লাভ হবেনা।

এ কথাটা মনে রাখ্‌তে হবে, মনকে সজীব-সরস রাখাই হল আসল কথা। কিন্তু মন যদি মরে যায়, তাহলে আর দুর্গতির সীমা নেই। আত্মস্থ হবার শক্তি মানুষ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই লাভ করে। বাইরের আয়োজনে যে আন্তরিক শান্তি আনয়নে বিন্দুমাত্র সাহয্য করে না, একথা বুঝতে হলেও আয়োজনের মাঝে একবার পরখ করে নিতে হবে কথাটাকে।

সাধন-ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ফললাভের দরুণ বা অপরের মাঝে ফল দেখ্‌বার দরুণ বিশেষ ভাবে ব্যগ্র হয়ে উঠি। এই জন্যই যে মন নিয়ে মানুষ আনন্দে উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌বে, সেই মনকেই অনেক সময় খুন করে বসি আমরা। তাতে সুফলের চেয়ে কুফলই ফলে বেশী।

বাইরের কোন কিছুতেই আত্মহিতের সাহায্য করে না, এ কথাটা মামুলী বচন হলেও প্রথম শিক্ষার্থী বা সাধকের পক্ষে প্রযুজ্য নয়। কেননা, ভোরের বেলায় পাখীর সুমিষ্ট গানে, পূব আকাশের রঙ্গীন ছায়ায় মন অনেক সময় অতি সহজে উঁচুতে উঠে পড়ে। কাজেই বহির্জ্জগতের দৃশ্যে যে মানসিক উন্নতির কোন সাহায্য করেনা, একথা বলা ঠিক নয়। মানুষের মনটা যদি তাজা থাকে, তাহলে সে সব জায়গা থেকেই আনন্দ বা রসাস্বাদন

করতে পারে। তারা মন-প্রাণ বাইরের উপলক্ষ্যের চেয়ে—অভাবের সম্পদটাই বেশ সুস্পষ্ট দেখতে পায়।

অপরকে আনন্দ পেতে দেখলেও আমাদের ঈর্ষ্যা হয়, আমরা চাই সবাই ভাল হোক্—অর্থাৎ নিরানন্দমনে ভূত সেজে বসে থাকুক। তার মাঝে যদি স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশই না হল, তাহলে সে মানুষ হল কি করে? এতগুলো কথা যে বলছি, প্রথম শিক্ষার্থী বা সাধকাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই। অবশ্য এর চেয়েও যে বড় অবস্থা নেই, অমন কথা জোর করে অস্বীকার করতে পার্বনা; কেননা এমন মহাজনও দেখেছি, যাঁরা বহির্জগতে নিরপেক্ষ হয়েও—সদানন্দ, সদা প্রফুল্ল! কিন্তু অন্তরের সেই শান্তির ফল্গু-ধারার সন্ধান পাওয়া এত সহজ নয়। অনেক সময় আমরা বাইরে থেকে জোর পেয়েই অন্তরের মাঝে ডুবে যাবার শক্তি পাই। কাজেই সকলের পক্ষে সমান ব্যবস্থা নয়—বিশেষতঃ সাধনার প্রথমাবস্থায়।

যৌবনে মানুষের প্রাণটা খুব সতেজ থাকে, তাই তারা পরের মুখের উপদেশের চেয়ে নিজের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ওপর জোর দেয় বেশী! প্রাণ সতেজ থাকে বলেই, প্রাণবন্ত যে কোন ঘটনা, যে কোন দৃশ্য থেকেই তারা আনন্দের যোগান পায়। অনেক সময় বলে কয়েও যে ছেলেকে আমরা শান্ত করতে পারি না, বাইরের একটা মনোরম দৃশ্যে আপনি তার মাঝে আশ্চর্য্যভাবে সে শক্তির উন্মেষ হয়ে যায়! কাজেই নিছক নীতির উপদেশের চেয়ে, বাইরের সজীব দৃশ্যে, বহির্জ্জগতের বিচিত্র ঘটনায়, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভক্তি আরও বেশী করে বেড়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের এক ঘেঁয়েমিতে, শ্রদ্ধা বিশ্বাস-ভক্তিও ক্রমশঃ দুর্ব্বল ধরণের হয়ে পড়ে। তখন ভগবন্নামের সঙ্গে সঙ্গে কুচিন্তা, কু-ভাবনাও চলতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য! পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের যে একত্রে সংস্থান কিছুতেই হতে পারে না, এ কথা আমরা মোটেই ভাবি না। আমরা এত দুর্ব্বল হয়ে পড়ি যে, তখন আর এই বিচার শক্তিটুকুও থাকে না, কিম্বা থাকলেও এত তলিয়ে দেখবার ইচ্ছাই হয় না।

যাঁরা নিছক আত্মানন্দে ডুবে থাকতে পারেন, তাঁদের অসীম ক্ষমতা, তাঁরা শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু কয়জন সে অবস্থায় স্থির থাকতে পারেন, তাই হল কথা। ঊর্দ্ধপ্রতিষ্ঠ আনন্দের আস্বাদন এত সহজে মেলে না—যত সহজ নাকি আমরা মনে করি। তাই অনেক শ্রমের পর, অনেক ব্যর্থতার পর, বিচিত্র পথে ঘুরে ফিরে তবেই মানুষ স্বর্গদ্বারের সরাসরি রাস্তার সন্ধান পায়। কাজেই নিজের মতে, নিজের পথে আনতে পারাটাই কৃতিত্বের বিষয় নয়। হয়ত আমি যা বুঝেছি, তার মাঝেও ভুল থাকতে পারে, আর বিশেষতঃ আমি যখন গন্তব্যস্থলে এখনো পৌছতে পারিনি। অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখি, মধ্যপথের যাত্রীদেরই অসহিষ্ণুতাটা বেশী মাত্রায়। গন্তব্য স্থলে যাঁরা পৌছে গিয়েছেন, তাঁদের কিন্তু এত বাড়াবাড়ি, পরকে ভাল করবার দরুণ এমন অদ্ভুত রকম টানাটানির প্রচেষ্টা নাই। শান্ত-সমাহিত চিত্তের যে কতখানি প্রভাববিস্তারের ক্ষমতা রয়েছে, তা তাঁদের দিয়েই বুঝি।

বাইরের কোন উপলক্ষ্য ছাড়াও যাঁদের চেতনা ক্ষণেকের তরেও অস্পষ্ট-আচ্ছন্ন হয় না, তাঁরা বহু সাধনার পর চিত্তের এই সুপ্রসন্ন সাত্ত্বিক ভাব লাভ করেছেন। তা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি, বাইরের নিমিত্তের প্রয়োজন হয়। মনটাকে অন্তর্মুখী করতে হলেও বাইরের কোন বিশিষ্ট ঘটনা দ্বারা চিত্তকে উদ্দীপিত করে নিতে হয়।

আমরা যা চাই, নিজেরাই অনেক সময় তার

প্রতিবন্ধক জুটিয়ে আনি। ছেলেকে একাগ্র করতে চাই, সাধন-ভজনশীল—শ্রদ্ধাসম্পন্ন করতে চাই, অথচ সেই শ্রদ্ধা, একাগ্রতার শক্তি, সাধন-পিপাসা যাতে করে জন্মে তার কোন ব্যবস্থাই করি না। অনেক ক্ষেত্রে দেখি, এর পরিণাম ফলও ভোগ করতে হয়।

অনুভূতির স্তর ভেদ আছে। এমনও অনুভূতি পায় মানুষ, যার জোরে নিছক্ নিজকে নিয়েই অফুরন্ত আনন্দে কালাতিপাত করে তারা। কিন্তু সেই অনুভূতির গভীর স্তরে পৌঁছতে হলে, মনটাকে সরস-সজীব রাখতে হবে। এইজন্যই প্রাথমিক অবস্থায় মনকে একটু স্বাধীনতা দিতে হবেই, অবশ্য সেই স্বাধীনতা যাতে উচ্ছৃঙ্খলতাতে পরিণত না হয়, তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যে শক্তিতে মানুষ নীচে নেমে আসে, ঠিক সেই শক্তিকে অবলম্বন করে মানুষ উর্দ্ধেও উঠে যেতে পারে। কাজেই সকল অবস্থাতেই লক্ষ্য রাখতে হবে—কিসে কার মনের শক্তি, প্রাণের প্রফুল্লতা বাড়ে।

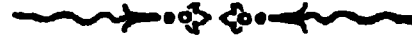
নিজের আদর্শ-রূপের সন্ধান পেতে পেতে অনেকের হয়ত জীবনই অতিবাহিত হয়ে যায়, কেউ হয়ত বিদ্যুতের দীপ্তির মত ক্ষণিক আভাস পেয়ে পাগল হয়ে উঠে; কিন্তু এ কথা ঠিক, জীবনের গূঢ়রহস্যের সন্ধান পেতে হলে, মনটাকে সজীব পুষ্ট রাখতেই হবে। কাজেই তাকে খোরাক না দিয়ে শুকিয়ে মারলেও কল্যাণের আশা নাই। নিজের ভিতরকার রসের সন্ধান, বাইরের রস দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। মানুষ বাইরটা দেখেই ক্রমশঃ অন্তর্লীন হয়ে যায়!

আমরা এ জায়গায় মারাত্মক ভুল করে বসি, অর্থাৎ মানুষের একাগ্র শক্তির ওপর লক্ষ্য না করে জোর দেই আদর্শের প্রতি; অথচ এ কথা ভেবে দেখি না, মনে শক্তি বা বল থাকলে আদর্শকে মূর্ত্ত করে তুলতেও যে বেশী সময় লাগে না। চিত্ত-স্থৈর্য্যের উপলক্ষ্য সবারই এক নয়। আমার এক বন্ধু ছিল, সে একদিন এক জটিল অঙ্ক-সমস্যার ভিতর দিয়েই ভগবৎশক্তির আশ্চর্য্য মহিমা উপলব্ধি করলে! তার একাগ্র শক্তি লাভ হল অঙ্ককে উপলক্ষ্য করে। এমনি করে মানুষ বিচিত্র পথে বিচিত্র উপায়ে চিত্তের একাগ্র-শক্তির সন্ধান পায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি—বাইরের একটা নিমিত্ত থাকেই, যাকে উপলক্ষ্য করে মন গভীরতম প্রদেশে তলিয়ে যেতে পারে।

স্বভাবসিদ্ধ মানুষও আছেন, কিন্তু তাঁদের সেই স্বভাব যে বহু অভ্যাস প্রযত্নের ফল নয় তাই বা কে জানে? আত্মশক্তির মহিমা এমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারে কয়জন? নিছক্ প্রাণের জোরে যিনি বেঁচে থাকতে পারেন, সে প্রাণ যে কত বড়, কত মহান্, তা আমরা—যারা নাকি অন্নময় কোষকেই অতিক্রম করতে পারিনি, তারা বুঝব কি করে? প্রত্যেক জিনিষের, প্রত্যেক বিষয়েরই সূক্ষ্মরূপ রয়েছে—সেই সূক্ষ্মরূপের অসীম শক্তি! এই স্থূল বায়ু, এই স্থূল প্রাণের অভ্যন্তরেও সূক্ষ্ম বায়ু বা সূক্ষ্ম প্রাণের সঞ্চরণ রয়েছে। মানুষ বেঁচে থাকে সেই প্রাণকে—সেই বায়ুকে অবলম্বন করেই, অথচ গভীর ভাবে তলিয়ে না গেলে কি মানুষ এত সূক্ষ্ম কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে?

মানুষ যতক্ষণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শেখে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে মাঝে মাঝে অবলম্বনও দিতে হবে, আবার পড়ে গিয়ে স্বাধীন চেষ্টায় উঠতেও সুযোগ দিতে হবে। কাজেই সময়ে

দরদী, সময়ে একটু নিষ্ঠুর, এইরূপ সহানুভূতি-অসহানুভূতি নিয়ে মানুষকে স্বাধীন হবার উপায়ই বলে দিতে হবে। নিছক আত্মতৃপ্ত, আত্ম-রতিসম্পন্ন হওয়া চরম আদর্শের কথা; কিন্তু এতখানি শক্তি লাভ করতে হলে, একেবারে বহির্জ্জগৎ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকাও দুষ্কর।



যদি আসিলে

—)•(—

(আমার) আঁধার রাতের স্বপন-রচা
ভেঙ্গে দাও তবে আজ—
দেখাও তোমার সত্য মূরতি
রুদ্র আলোক মাঝ।

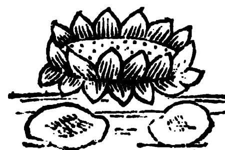
আঁধারের মাঝে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
আপনার জালে আপনি—
রয়েছি জড়ায়ে ভাবিয়াছি তারে
রুচিব রত্ন আপণি!

(আজি) ক্ষণিক আলোকে দেখিনু আপনা
ভেঙ্গে গেল মোর ভুল—
চাহিয়া দেখিনু পড়ে আছি একা
সারা গায়ে মাখা ধূল।

এ ঘুমের ঘোর যদি বা ভাঙ্গিলে
যদি হে দেবতা আসিলে,
যদি এ আমার চির জনমের
সঞ্চিত তমো নাশিলে—

ক্ষণিক জ্যোতির বিজলী চমকি
যেও না তুমি গো আজ—
অযাচিত প্রাণে দাও ধরা এসে
অথবা হান গো বাজ।

(তবু) যেও না যেও না ফিরে তুমি আর
দেবতা রাখ গো পায়—
চির আঁধারের এ ঘুমন্ত প্রাণ
আজিকে তোমারে চায়।



অনুভূতি

মানুষের অনুভূতির দিকটা যখন খুলিয়া যায়, তখন বায়স্কোপের দৃশ্যপটের মত নানা চিত্র মনের সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে। মন তখন এক বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন চিত্রক্ষেত্রে পিন সংযোগের ন্যায় নূতন নূতন দৃশ্যরাজির ক্ষেত্রে মন ক্রমশঃ ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে আর নূতন নূতন বিষয় অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এই অবস্থায় মনের স্থূল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকে না, জগৎটা যেন মুছা মুছা অস্পষ্ট দেখাইতে থাকে। বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ না হওয়ায়, কি করিতেছি—কি ভাবিতেছি এইরূপ সন্দেহ আসিয়া থাকে। জগতের বিষয়ে বিশেষ অভিনিবেশ থাকে না, তখন চিত্তক্ষেত্রই বিশেষ লক্ষ্যবস্তু হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় যাহা অনুভূত হয় তাহাই যে স্থির সিদ্ধান্ত, তাহাও নহে ; কখনও কখনও এলোমেলো ভাবেও অনুভূতি হইতে থাকে। এই অবস্থায় মনকে এক বিশেষ লক্ষ্যে লক্ষ্যীভূত করিলে তাহার চরম অবস্থা অভিব্যক্ত হয়। এই সব চরম অবস্থার মূল একেই দাঁড়ায়। তখন ইহাই স্থির হয় যে চরম একই বস্তু, এই চরম সীমায় উপস্থিত হইলে দেহের আর সাড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, দেহ মৃতবৎ অনুমিত হয়। মৃত্যু-ভয় আসিয়া সাধককে এই সময়ে লক্ষ্য-পথে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। সাধক যদি মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া চরম ও পরম লক্ষ্য-পথে স্থির থাকিতে পারে, তবে আত্মচেতনা বিলুপ্ত হইয়া সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সাধকের চিত্তের নির্ম্মলতা ও দৃঢ়তার উপর সমাধি নির্ভর করে। অস্থির ও অনির্ম্মল চিত্তে সমাধির আভাস পাওয়া দুঃসাধ্য। এইজন্য চিত্ত নির্ম্মল ও লক্ষ্য স্থির থাকা প্রয়োজন। যোগের পথে মন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিতে থাকে, কিন্তু অযোগীর পক্ষে এলোমেলো ভাবেই উন্নতির দিকটা খুলিতে থাকে। এই অনুভূতি জ্ঞানীর পক্ষে বা ভক্তের পক্ষে পৃথক্ ভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তত্ত্বের দিকটা খুলিতে থাকে, তখন আর বিশেষ পার্থক্য বোধ থাকে না ; তখন জ্ঞানী ও ভক্ত এক হইয়া যায়। কিন্তু যোগ বা ভক্তির সাহায্যে চলিলে অনুভূতিটা প্রথমতঃ অনুকূল ভাবেই হইয়া থাকে এবং সাধক সেই অনুভূতিতে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়চিত্ত হইয়া লক্ষ্যাভিমুখে ধাবিত হইতে পারে। অনুভূতি হইলেই যে সত্য নির্ণয় হয় এরূপ নহে, অনুভূতি বা সমাধির পরিপাকেই চরম লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়। আর চরম লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইলেই তখন সাধক সেই অনুভূতির সহায়ে ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলির ভিতরও সত্যানুসন্ধান-

পরায়ণ হয়। এইরূপে আরোহ ও অবরোহ-ক্রমে সত্য নির্ণয় হইলে তখন সাধক একটা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার কাছে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না বা অমীমাংসিত থাকে না। এইরূপ চরম মীমাংসাবিশিষ্ট মনের একটা স্থিরতা ও দৃঢ়তা জন্মে, যখন সাধক অভী, স্থিরচিত্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া যায়। চিত্তে অজানিত বিষয় কিছুই না থাকায় পরম শান্তির অবস্থা লাভ করে, যে অবস্থায় "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" এই অবস্থায়ই নিশ্চিন্ত হইয়া মহা-সুখ বা শান্তি প্রাপ্ত হয়। অনুভূতিটা জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে অনেকে বিচলিত হইয়া উঠে, এমন কি মানসিক বিকার প্রাপ্ত হয়। এই সকল সাধক শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা বা গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে কিছু করিবার চেষ্টাতেই উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; নতুবা ঐরূপ হইবার কোনই কারণ নাই। আত্মচেষ্টায় সকলই লাভ হইতে পারে, কিন্তু গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ ব্যতিরেকে শক্তি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হওয়ায় নানা রূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে। অতএব সাধক মাত্রেই সদ্‌গুরুর উপদেশানুরূপ ক্রিয়াদি অবলম্বন করিবে ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাঁহার অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

অনেকে খোদার উপর খোদ্‌গিরি বা গুরুর উপর গুরুত্ব দেখাইতে গিয়া বিপদে পড়িয়া যান। সাধক, সাবধান! মনে করিও না, তোমার জানার শেষ হইয়াছে—তোমার আর সাহায্যের প্রয়োজন নাই। সমুদ্রের অতল-তলে কত যে মণি-মাণিক্য রহিয়াছে কে বলিতে পারে? জ্ঞানের—অধ্যাত্ম-জগতের গভীর তলদেশে কোথায় কি আছে তাহা জানিতে এবং তাহার অনুসন্ধান করিতে যে কাহারও সাহায্যের দরকার নাই, এমন মনে করিও না। আর অজ্ঞাত রাজ্যে বিপথে পরিচালিত হইয়া বিপদে পড়িবার কতই না সম্ভাবনা রহিয়াছে! এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া—সাধক! অব্যাকুল চিত্তে গুরুকে কাণ্ডারী করিয়া তোমার জীবন-তরণী ধীরভাবে বাহিয়া চল। তোমার কিছু একটা হইয়া গিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইও না বা গর্ব্বিত হইও না। নিশ্চিন্ত হইলে তোমার গতিপথ রুদ্ধ হইবে, আর গর্ব্বিত হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

বিক্ষুব্ধচিত্তে সত্যবস্তু উপলব্ধ হয় না; চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের প্রশান্তিই অনুভূতির সহায়ক। সাধক ইহা জানিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও।

হিমাচলের পথে
(পূর্বানুবৃত্তি)

১০ আষাঢ় ২৫ জুন শনিবার—

সূর্য্যোদয়ের পর ত্রিযুগী নারায়ণ হতে বের হয়ে উৎরাই পথে দেড় মাইল আসার পর **শাকম্ভরী দেবীর** মন্দির পেলাম। এখানে কোন চটী নাই। হরিদ্বার হতে যে রাস্তাটি ত্রিযুগী নারায়ণ গিয়েছে, আমরা সেই রাস্তাতেই উৎরাই করে এসেছি। মন্দিরস্থিত শাকম্ভরী দেবীকে প্রণাম ও দর্শন করার পর প্রদক্ষিণ করলাম। এখান হতে আমাদের অন্য রাস্তায় একদম খাড়া দেড় মাইল উৎরাই করলে শোনপ্রয়াগে উপস্থিত হব, তথা কেদারনাথের রাস্তায় পড়ব। এখান হতে দক্ষিণদিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে, সেটী হরিদ্বার বা বদরীনারায়ণ যাবার রাস্তা।

শাকম্ভরী
১॥ মাইল

শাকম্ভরী দেবী সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা প্রকার উক্তি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতের অন্তর্গত বনপর্ব্বের ৮৪ অধ্যায়ে উক্ত আছে :—তিন লোকে বিখ্যাত এই স্থানে শাকম্ভরী দেবী হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষে এক মাস মাত্র শাক ভোজন করে তপস্যা করতেন। দেবীর তপে সন্তুষ্ট হয়ে মুনীশ্বর দর্শন দান করলে ভগবতী দেবী ঐ শাক দ্বারাই তাঁর সৎকার করেন। সেই দিন হতে এই স্থানের নাম শাকম্ভরী হয়। শাকম্ভরী দেবীর স্থানে উপনীত হয়ে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করে পবিত্র ভাবে তিন দিন শুধু শাক খেয়ে তপস্যা করা উচিত। অন্যত্র ১২ বৎসর শুধু শাক খেয়ে উপাসনা করলে যে ফললাভ হয়, এখানে শুধু তিনদিন মাত্র শাক খেয়ে উপাসনা করলে সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।

শাকম্ভরী
দেবীর উৎপত্তির বিবরণ

দেবী ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে উক্ত আছে :—হিরণ্যাক্ষের বংশে দুর্গা নামক দৈত্য জন্মে। দৈত্য হিমাচলে পৌঁছে ব্রহ্মার তপস্যায় নিমগ্ন হয়। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দান করতঃ বর দিতে চাইলে দুর্গাদৈত্য বর চায়, "আমি দেবতাদের জয় করব।" ব্রহ্মা—"এবমস্তু" বলে বর দিয়ে প্রস্থান করেন। ব্রহ্মার বরে বলী হয়ে দুর্গাদৈত্য অমরাপুরী জয় করার পর যজ্ঞ না হওয়ায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ জগতে খুব অনিষ্ট হতে লাগল। তখন ব্রহ্মা হিমালয় পর্ব্বতে প্রবেশ করে জপ, ধ্যান, পূজাদি দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করলে, দেবী প্রকট হয়ে নিজের হাত হতে অতি সুস্বাদু শাক, ফল, মূল আদি নানা প্রকার অন্ন ও পশুদের খাদ্যোপযোগী নানা প্রকার ঘাস প্রদান করেন, তথা নানা প্রকার সুস্বাদু শাক দ্বারা তিনি জীবগণকে রক্ষা করায় তাঁর নাম শাকম্ভরী হয়।

> ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ।
> ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
> শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।

চণ্ডী ১১ অধ্যায় ৪৮।৪৯ শ্লোক।

দুর্গাসুর উক্ত সংবাদ অবগত হয়ে অসংখ্য সেনা লয়ে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলে, দেবী নিজের শরীর হতে ৩২টী শক্তি উৎপন্ন করে যুদ্ধে রত হন। পরে দরকার অনুযায়ী আরও ৬৪ শক্তি উৎপন্ন করেন। ক্রমশঃ দশদিন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার সমুদয় সেনা ধ্বংস করেন। এগার দিনের দিন দুর্গাদৈত্য বিশেষরূপে পূজাদি

করে শক্তিবন্ত হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে দেবীর সমুদয় শক্তিকে পরাজিত করে। পরে মহাদেবী শতাক্ষীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে, দেবী তাকে ধ্বংস করেন। পরে দেবী বল্লেন, আমি দুর্গা-দৈত্যকে ধ্বংস করেছি, এইজন্য আমার নাম "দুর্গা" এবং আমার অসংখ্য চক্ষু আছে, সেই জন্য আমার নাম **"শতাক্ষী"** বলে জগতে ঘোষিত হবে। যে মানব আমার এই উভয় নাম স্মরণ করবে, সে মায়া হতে বিমুক্ত হয়ে পরম পদ লাভ করবে।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত কেদারখণ্ডের প্রথম ভাগের ৪৬ অধ্যায়ে উক্ত আছে:—পরম পীঠ শাকম্ভরী-ক্ষেত্র সর্ব্ব পাপ নাশকারী। এখানে মুনিদের রক্ষা করার জন্য শাকম্ভরী দেবী প্রকট হয়েছিলেন। এই তীর্থে উপনীত হয়ে শাকম্ভরী দেবীকে প্রণাম করলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে মানব নিয়মপূর্ব্বক এখানে তিন দিন তিন রাত বাস করেন, তাঁর বিপুল সিদ্ধি লাভ হয়।

আমরা শাকম্ভরী দেবীকে প্রণামাদি করার পর নীচের পথে উৎকট উৎরাই করে দেড় মাইল এসে শোনপ্রয়াগে পৌঁছি। শোন-প্রয়াগ সম্বন্ধে ত্রিযুগী নারায়ণের মাহাত্ম্যেই কিছু বলেছি। এখানে মন্দাকিনী গঙ্গার সঙ্গে ত্রিবিক্রমা নদী মিলিত হওয়ায়, একে ত্রিবিক্রমাসঙ্গম বা শোন-প্রয়াগ বলে। এখানেই এসে আমরা সর্ব্বপ্রথম মন্দাকিনী গঙ্গা দর্শন করলাম। এখানে মাত্র এক জন দোকানদার ছোট্ট একটী দোকান বসে আছে, থাকার কোন সুবিধা নাই। পুরী পেড়া আদি মিলে; শোন নদীর উপরিস্থিত Supension Bridge এর উপর দিয়ে পার হয়ে মন্দাকিনী গঙ্গার ধার দিয়ে ক্রমশঃ চড়াই করে আমাদের কেদার নাথ দর্শনে যেতে হবে। এখান হতে কেদার-নাথ ৯।। মাইল। আমরা টিহরী রাজ্য ছেড়ে গত পরশু দিন বৃটিশ রাজ্যে এসেছি, তা বোধ হয় পাঠকদের জানা আছে। আজ কেদারনাথের পথ দেখে খুবই আনন্দ হল। পথটী কেমন সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। এ রকম পথে চল্‌তে কোনই কষ্ট বোধ হয় না—মনেও বেশ আনন্দ হয়। এই শোন প্রয়াগের নিকটেই "কালীশ-নামীয়" শিব বিদ্যমান আছেন। **ত্রিবিক্রমাসঙ্গমে** স্নান করে তাঁর পূজা করে যাওয়া উচিত। কিন্তু কাকেও পূজা করে যেতে দেখ্‌লাম না।

শোন প্রয়াগ
১।। মাইল

মন্দাকিন্যাস্ত্রিবিক্রম্যাঃ সঙ্গমোহতীব পুণ্যদঃ।
যত্র তিষ্ঠামি কালীশ নাম্নাস্বস্থানদো হ্যলম্‌॥

উপরে একখানা বড় পাথরের উপর অনেক ক্ষণ বসে বসে দুটী পার্ব্বত্য প্রবল নদী—মন্দাকিনী-গঙ্গা ও ত্রিবিক্রমা গঙ্গার প্রবল জলস্রোতের সংঘর্ষ দেখে দেখে প্রাণে নানাপ্রকার চিন্তার তরঙ্গ উদয় হতে লাগ্‌লো। হরিদাস ভায়া ছাড়া সঙ্গীয় অন্যান্য সকলেই চলে গেছেন। আজ শরীরটাও বিশেষ ভাল ছিল না, তাই ইচ্ছা করেই অতি ধীরে ধীরে সকলের শেষে রুগ্ন শরীরকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হরিদাস ভায়া ব্যাপার বুঝে "শাকম্ভরী দেবী" হতেই সঙ্গ ছাড়ে নাই; আমি চুপ করে বসে জলের লীলা খেলা দেখ্‌ছি, এর ভিতর কোন্ সময় যে হরিদাস ভায়া এসে আমার পিছনে বসে আছে জানি না। অনেকক্ষণ পর ভায়াই আমার চেতন করিয়ে দিল। তখন দু'ভায়ায় মিলে আবোল-তাবোল কত কিছু আলোচনা করতে লাগ্‌লাম। জানি না কোন্ জন্মের কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়ে আমরা এমনি ভাবে হাবুডুবু খেয়ে মরছি। সত্য বটে,—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে আজ আমাদের এই অসহনীয় দুরবস্থা! শাস্ত্রেও বলে তাই—মনেও

হয় তাই। কিন্তু মনেরও অধিপতি যিনি, তিনি তো মাঝে মাঝে এ চিন্তার তরঙ্গকে কেমন যেন একটু এলোমেলো ভাবে নাড়া চাড়া দিয়ে থাকেন। মনে মনে যা চিন্তা করছি, ভাষায় তা প্রকাশ কচ্চি ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, তারই পিছনে যেন আর একটি মন একে হুঁসিয়া'র করে দিচ্ছে। জানি না সে মনটি কে? কেন সে আমার সঙ্গে এমন মিত্রতা করে আমায় হুঁসিয়ার করে দেয়? কেন সে আমার সুহৃদের মত হাতটি ধরে বন্ধুর পথগুলি পার করে নিয়ে যায়? সে কে? জানি না সে আমার কোন্ জন্মজন্মান্তরের চির প্রিয় সুহৃদ্!.........এইরূপ কতকিছু মনের ভিতর গোলমাল করে আমায় অস্থির করে তুল্‌ছিল—তাই ভাব্‌ছিলাম বসে বসে। স্থানটীও উপযুক্ত বটে!

মনে হল, যদি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই আমাদের এই ভবরবস্থা, তাহলে তার পূর্ব্বজন্মেও ত অবশ্যই কিছু না কিছু ভালমন্দ কাজ করেছিলাম, যার জন্য আমার পূর্ব্বজন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেই পূর্ব্ব তৃতীয় জন্মটির সময়ও হয়ত ভেবে'ছি, তার পূর্ব্ব জন্মে না জানি কত কাজই করে এসেছিলাম, যার ফলে সে জন্মে কত কিছু কষ্ট পেয়েছি। এইরূপ ভাবে যদি অনবরত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের হিসাব করা যায়, তাহলে অতি প্রথম জন্ম—যখন আমরা পরমাত্মা বা ভগবান্ হতে একদম এসে ভূতলে নেমেছিলাম, অর্থাৎ যা আমাদের আদি জন্ম, সে জন্মে ত এমন কিছুই করি নাই, যার ফলে আমাদের জন্ম হয়েছিল? অতি প্রথম জন্ম অর্থাৎ সৃষ্টির গোড়াতেই যখন আমার প্রথম জন্ম হয়, তার পূর্ব্বে যখন আমার জন্ম ছিল না—তখন কোন ভাল-মন্দ কাজ কর্ম্মও ত আমি করিনি ; সুতরাং কোন ভালমন্দ কাজ না করা সত্বেও—কোন কর্ম্মফল না থাকা সত্বেও কেমন করে আমার জন্ম হয়েছিল—সেই অতি প্রথম জন্মে! তা'র পূর্ব্বে তো আমার জন্মই হয়নি, কোন কাজ কর্ম্মও করিনি, তবে কেন কর্ম্মফলে আমার জন্ম হল? এ কর্ম্মফল কোথা হতে এল? কে আমায় কর্ম্মফলে লিপ্ত করলে? এ রহস্যের সমাধান তো আজ পর্য্যন্তও হল না!

এই বিষয়টি নিয়েই নানা আবোল-তাবোল চিন্তা করতে লাগ্‌লাম। হতে পারে ভগবানের ইচ্ছায়—আমার ইচ্ছা না থাকলেও বা আমার কোন কর্ম্মফল না থাকলেও—আমার জন্ম হয়েছিল। যদ্যপি গোঁজামিল দিবার জন্য এ কথাটি মেনে নিই, কিন্তু তখনই আবার অন্তঃস্থল ভেদ করে প্রশ্ন উঠে, প্রথম জন্মে যখন ভগবানের ইচ্ছাতেই আমি প্রথম জন্ম নিলাম, যখন কচিশিশুটির মত কর্ম্মফল শূন্য হয়েও জন্ম নিয়েছিলাম, তখন আমার হৃদয়ে কার ইঙ্গিতে কর্ম্মের প্রেরণা উদয় হয়েছিল? তখন কে আমার হৃদয়ে কর্ম্মের বীজ রোপণ করে দিয়েছিল? তখন ত আমি নিষ্ক্রিয় ছিলাম, ভাল-মন্দ কোন কাজ করবার কোনই শক্তি ছিল না আমার ভিতর, তখন বুঝিনিও কিছু ; তখনকার এমন শুদ্ধ, এমন পবিত্র অন্তঃকরণে কার প্রেরণায় কর্ম্মের প্রেরণা জেগেছিল? কে আমায় খারাপ কাজে—কর্ম্মের আবর্ত্তে ফেলেছিল?—প্রকৃতি! কই, আমি ত তখন প্রকৃতির কোন ধার ধারি নি, তখন ত আমি প্রকৃতির কোনও অনিষ্ট করিনি, আমি ত তখন প্রকৃতি কে, তাও জানতাম না? তবে কেন প্রকৃতি আমায় জোর করে কর্ম্মের আবর্ত্তে ফেলে দিয়েছিল? এই প্রকৃতিই বা কার ইঙ্গিতে আমায় নাচিয়ে কাঁদিয়ে মারতে এসে হাজির হয়েছিল?—স্থির চিত্তে চিন্তা করলে বুঝা যায়, প্রকৃতিরও যিনি স্বামী অর্থাৎ প্রকৃতিকেও যিনি জন্ম দিয়ে কাজে রত করেছেন,

সেই অনাদিনাথ ভগবানই প্রকৃতিকে আমায় নাচিয়ে কাঁদিয়ে মার্‌তে পাঠিয়েছিলেন। তা হলে ত বুঝা যায়, ভগবানই আমার এ দুঃখ-কষ্টের একমাত্র কারণ। হায়, কে আমার এ গূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা করে দিবে ?............

অনেকক্ষণ এইরূপ গোলক-দাঁধার চাপে পড়ে হাঁপিয়ে গেলাম। অন্তে একটি হৃদয়স্পর্শী গান বের হয়ে পড়লো, আকুল হয়ে তাই গাইতে লাগ্‌লাম।—

আমারি কঠোর প্রাণ আমারে দলিতে চায়।
আমারি সৃজিত কর্ম্ম ফেলে মোরে ভাবনায়॥
আমারি রোপিত তরু ধরেছে কণ্টক ফুল,
আমারি আনীত নদী উথলিয়া উঠে কূল।
আমারি সৃজিত আশা, আমারি ভালবাসা।
আমারি কর্ম্ম ডোরে ভুগিতেছি যাতনায়॥
আমারি তরণী লয়ে চলেছি অকূলে বেয়ে,
আমারে ধরিতে গিয়ে ভাসায়েছি আপনায়।
আমারি কর্ম্মের ডোরে পড়েছি মায়ার ঘোরে,
কিরূপে ছাড়িব তারে—তাই ডাকি দয়াময়॥

* * * *

কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম জানিনা, সঙ্গীয় সকলেই গৌরীকুণ্ড চটীতে পৌঁছে গেছিলেন। আমার অনেক দেরী দেখে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেননা রোজই আমি সর্ব্বপ্রথম যেয়ে চটীতে পৌঁছে চটী বেছে নিয়ে থাকি। অনেকক্ষণ এ ভাবে থাকার পর পেটের ভিতর যখন প্রচণ্ড অগ্নি আপন অস্তিত্ব জাহির কর্‌তে লাগ্‌লো, তখন উঠে রওনা হলাম। ক্রমোচ্চ চড়াই পথে ধীরে ধীরে আধ মাইল যাবার পর **মুণ্ড কাটা গণেশ** নামক স্থানটি পেলাম। এখানে কোন চটী নাই, একজন দোকানদার অর্থাৎ এখানকার পাণ্ডা মহারাজ আছেন মাত্র। দুধ, ভাজা চানা ও গুড় ভিন্ন অন্য জিনিষ পাওয়া যায় না। হাঁ, গণেশজীকে প্রণামী তথা

মুণ্ড কাটা গণেশ আধ মাইল

পাণ্ডাজীকে দক্ষিণাস্বরূপ এক পয়সা বা আধ পয়সা দিলেই তিনি গণেশজীর কিছু সিন্দুর দিয়ে থাকেন বটে! এই মুণ্ড কাটা গণেশকেই কৈলাস পুরীর দ্বারী বলে শাস্ত্রে উক্ত আছে। শিব পার্ব্বতীকে বল্‌ছেন যথা :—

বৈনায়কং তথা দ্বার সংস্থিত্যৈ সংস্থিতঃ শিবে।
গণেশস্তাবকঃ পুত্র অঙ্গরাগেন যঃ কৃতঃ॥
স্থাপিতো দ্বারি দেবেশি ত্বয়া চ স্নাপ্যমানয়া।
ময়া যস্য শিরশ্ছিন্নং পাতিতং শিবক্ষেত্রকে॥
প্রসন্নেন ময়া দেবি পুনঃ করিবরং শিরঃ।
সংযোজিতং তদঙ্গে তু ততো গজমুখোঽভবৎ॥
সংপূজ্য তং গণেশং বৈ নানা নৈবেদ্যদ্রব্যকৈঃ।
গচ্ছেন্মম মহাস্থানে যত্র গত্বা শিবো ভবেৎ॥
বিনাসম্পূজনাত্তস্য বিঘ্নভীর্জ্জায়তে নৃণাম্॥

যেখানে বৈনায়ক নামক দ্বার আছে, সেখানে তুমি অঙ্গরাগ হতে যে পুত্র উৎপন্ন করেছিলে, সেই পুত্রকে স্নান করার সময় কেদার ক্ষেত্রের দ্বারে দ্বার রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করেছিলে। সেই সময় হে দেবি! আমি গণেশের শির কেটে শিব ক্ষেত্রে (কাশীতে) ফেলে দিয়েছিলাম এবং পরে প্রসন্ন হয়ে শ্রেষ্ঠ হাতীর শির তোমার ঐ পুত্রের ধড়ে জোড়া দিয়ে তাকে জীবিত করেছিলাম। সেই দিন হতে গণেশ 'গজবদন' বলে বিখ্যাত হয়েছে। কেদার ক্ষেত্রে (কেদারনাথে) যে সব যাত্রী যাবে, তাদের উক্ত শিরকাটা গণেশকে নানাপ্রকার নৈবেদ্য আদির দ্বারা পূজা করে আমার ধামে (যেখানে গেলে লোক শিব হয়ে যায় সেই কেদার নাথে) যাওয়া উচিত। গণেশকে পূজা না করে গেলে নানাপ্রকার বিঘ্ন-ভয় উপস্থিত হতে পারে। সুতরাং গণেশকে পূজা করে যাওয়া উচিত। উক্ত ঘটনা স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডের ৪২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

এ ছাড়া শিবপুরাণান্তর্গত জ্ঞান-সংহিতার ৩২ অধ্যায়ে লেখা আছে—একদিন পার্ব্বতী দেবী ঘরে স্নান কচ্ছিলেন, নন্দী তাঁর দ্বার রক্ষা কচ্ছিল। নন্দীর নিষেধ স্বত্ত্বেও শিব ঘরে প্রবেশ করলে পার্ব্বতী লজ্জিত হয়ে স্নান হতে নিবৃত্ত হন। তখন পার্ব্বতী চিন্তা করতে লাগলেন, এমন একটি শ্রেষ্ঠ গণ হওয়া উচিত, যে সর্ব্বতোভাবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। এইরূপ চিন্তা করে তিনি হস্তস্থিত জল দ্বারা শরীরের ময়লা বের করে তদ্দ্বারা এক সুন্দর পুত্র উৎপন্ন করেন এবং তাকে দ্বারে বসিয়ে আদেশ দেন—"তুমি কাকেও ভিতরে আস্‌তে দিও না।" বালক দ্বার রক্ষা করতে লাগ্‌লো। পার্ব্বতী নিশ্চিন্ত হয়ে সখিগণের সঙ্গে নানা প্রকার আমোদে স্নান করতে লাগ্‌লেন। সেই সময় মহাদেব নিজের গণের (সৈন্য সামন্ত) সহিত উপনীত হয়ে ঘরে প্রবেশ কর্‌তে চেষ্টা করলে, বালক তাঁকে বারণ করেন। বালককে দূর করে দেবার জন্য শিব সৈন্যসামন্তদের আদেশ দিয়ে কৈলাস হতে এক ক্রোশ দূরে যেয়ে বিশ্রাম কর্‌তে থাকেন। বালক শক্তিময়ীর শক্তিতে শক্তি-বন্ত হয়ে লাঠিদ্বারা শিবের সৈন্য সামন্তকে এমন উত্তম-মধ্যম দিলে, যার চোটে তারা প্রাণ রক্ষার জন্য পালিয়ে শিবের নিকটে যেয়ে উপনীত হয়ে সব কথা খুলে বল্‌লো। যখন ঝগড়া হচ্ছিল, তখনকার উচ্চরোল পার্ব্বতীর নিকট পৌঁছ্‌লে, তিনি নিজের একজন সখীকে ব্যাপার কি জান্‌বার জন্য বালকের নিকট প্রেরণ করেন। সখী প্রত্যাবর্ত্তন করে সমুদয় খবর তাঁকে দিয়ে বল্‌ল, আমাদের গণ দ্বারে উপস্থিত না থাক্‌লে শিবের গণ ভিতরে প্রবেশ করে আমাদের লজ্জিত কর্‌ত।

পার্ব্বতীর আদেশে সখী পুনরায় দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয়ে বালককে বল্‌লেন, "তুমি খুব ভাল কাজ করেছ, তজ্জন্য ধন্যবাদ। তুমি নিজ বলে এদের ঘরে প্রবেশ কর্‌তে দাও নি, তজ্জন্য দেবী খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। দেবীর আদেশ—তোমাকে পরাস্ত করে বা তোমাকে তোষামদ করে সন্তুষ্ট করে যদি তারা ভিতরে আস্‌তে পারে ত আসুক।" শিবের সেনা সমূহ পুনরায় তখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা সখীর সব কথা শুন্‌তে পেলেও কিন্তু বালক শিবের গণদের বল্‌লে —"হে শ্রেষ্ঠগণ! আমি পার্ব্বতীর পুত্র। আপনারা শিবের সহচর, আপনারা দেবীর আদেশ সবই শুন্‌লেন, এখন যা কর্ত্তব্য হয় করুন। দুটী পথ আছে—হয় ত আপনারা আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে আমাকে জয় করে ভিতরে যান, নতুবা পায় ধরে অনুনয় বিনয় করে আমাকে সন্তুষ্ট করুন, আমি ভিতরে যেতে দিচ্ছি। নতুবা পৃষ্ঠ প্রদর্শনই আপনাদের পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা!" শিবের সহচরগণের কিন্তু এ বিদ্রূপ প্রাণে বড্ড বাজ্‌লো। তাই তাঁরা এ দুঃসংবাদটী শিবজীকে জানাবার জন্য দ্রুত চলে গেলেন।

শিবজী সহচরদের মুখে এরূপ বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে তাদের যুদ্ধ কর্‌তে আদেশ দেন। তারা ফিরে এসে যুদ্ধ করতে লাগলো। বালক শক্তিময়ীর শক্তিতে শক্তিমান্ ছিল, তাই তাদের সকলকে পরাস্ত করলে তারা "চাচা আপন বাঁচা" বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন কর্‌তে যার যার মত সরে পড়্‌লো। যুদ্ধের সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সাম্‌নে প্রলয়ের সূচনা দেখে বালককে বুঝাবার জন্য ব্রহ্মা বালকের নিকট উপনীত হওয়ার সাথেই বালক তাঁকেও শিবের অনুচর ভেবে তাঁর দাড়ি গোঁফ উৎপাটন করে তাঁর উপর পরিঘ প্রহার করেন। ব্রহ্মার দুরবস্থা দেখে মহাদেব ভয়ানক রেগে

যান এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে চারিদিক হতে বালকের উপর অস্ত্র চালাতে আদেশ দেন। পার্ব্বতী দেবীও কিন্তু ভিতর হতে এসব ঝগড়া উঁকি মেরে দেখছিলেন। যখন দেবগণ ও প্রমথাদি গণগণ বালকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল, তখন পার্ব্বতী দেবী নিজের শক্তি হতে দুই শক্তি নির্ম্মাণ করে বালকের সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। তারা দুজনে দেবতাদের সমুদয় "আয়ুধ" ছিনিয়ে ছিনিয়ে নিজেদের মুখে পুরলে দেবগণ অস্ত্র শস্ত্র রহিত হওয়ায় বালক একমাত্র পরিঘের সহায়তায় তাদের আচ্ছা রকম শিক্ষা দিয়ে পরাস্ত করেন। এ দুঃসংবাদ শিবের নিকট পৌঁছলে শিব সমুদয় দেব সেনা নিয়ে নিজে এসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেখানে বিষ্ণু উপস্থিত ছিলেন; অগত্যা তিনিও এসে শিবের সঙ্গে যোগদান করে বৈষ্ণবী মায়ার দ্বারা পার্ব্বতীর সৃজিত দুই শক্তি লয় করেন এবং নিজেই এসে বালকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দুই জনে ঘোরতর যুদ্ধ করার সময় অদূরেই শিব দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হচ্ছিল। যুদ্ধের পরিণাম ভাল না বুঝে শিব ত্রিশূল দ্বারা বালকের শির কেটে ফেলেন। এটা শিবের বিশেষ অন্যায় বটে! তাও আবার অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে !!

সে সময়ের 'রয়টার' ছিলেন জগৎপ্রসিদ্ধ কলহপ্রিয় নারদ মহারাজ। দুই পার্টিতে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে ভিজে বেড়ালের মত চুপটী করে ঝগড়া দেখা তাঁর বিশেষ প্রিয়। সুতরাং অগোণে নারদ মহারাজ পার্ব্বতীর কাণে এ দুঃসংবাদটি দিতে মোটেই দেরী করা সঙ্গত মনে করেন নি। পার্ব্বতীই বা কম কিসে? তিনিই বা শিবের ভয়ে চুপ করে থাকবেন কেন? বিশেষতঃ নিজের মানসপুত্রের এরূপ দুর্দ্দশা দেখে কারই বা না রাগ হয়? স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া লেগে গেল। বোধ হয় বর্ত্তমান সময়েও প্রায় সব সংসারেই এরূপ স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়ে থাকে, তিনিই বা হার মানতে যাবেন কেন? তখন তিনি এত রেগে গিয়েছিলেন যে তন্মুহূর্ত্তেই নিজের শক্তি হতে সহস্র শক্তি সৃষ্টি করে পাঠিয়ে দিলেন দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে। তারা দেবতাদের ধরে ধরে মুখে পুরতে লাগলো। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রলয়ের সূচনা দেখে ভয়ে ভীত হয়ে গেলেও কিন্তু অন্দরমহলে পার্ব্বতীর নিকট পৌঁছতে অসমর্থ হয়ে নারদের নিকট উপনীত হন এবং অন্যান্য যোগি-ঋষিগণ সহ নারদকেই যেয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন।

নারদ যোগি-ঋষিগণ সহ গিরিজার নিকট উপনীত হয়ে নানাপ্রকার বিনয়ের সহিত ক্ষমা প্রার্থী হন। তখন পার্ব্বতী ক্রোধ শান্ত করে বললেন—'যদি আমার পুত্র জীবিত হয়ে যায়, সমস্ত দেবতার মধ্যে সে পূজনীয় হয় এবং সকল দেবতার অধ্যক্ষ হয়, তাহলে জগতের বিনাশ হবে না।'

যোগি-ঋষিগণ বিষ্ণু আদি দেবতার নিকট পৌঁছে এ সংবাদ প্রদান করলে সব দেবগণ স্বীকার করে বিধিপূর্ব্বক বালকের কলেবর ধুয়ে মুছে, তার পূজা করে উত্তর দিকে গমন করেন। সর্ব্বপ্রথম তাঁদের একদাঁতওয়ালা হাতী মিলে। তখন তাঁরা হাতীর মাথা কেটে এনে বালকের ধড়ে লাগিয়ে দেন। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও অন্যান্য দেব-যোগি ঋষিগণ বেদমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে বালককে পুনর্জ্জীবিত করেন। মানস-পুত্র পুনর্জ্জন্ম লাভ করায় পার্ব্বতী দেবী প্রসন্ন হয়ে নিজের শক্তিদের প্রলয় করতে নিবারণ করলে, তারা নিবৃত্ত হয়ে দেবীর শরীরে লীন হয়ে যায়। পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন দেবতাই একত্র হয়ে বালককে বলেন, 'আজ

হতে তুমিও আমাদের সমান পূজিত হবে এবং মানব সর্ব্বপ্রথম তোমার পূজা করে পরে আমাদের পূজা করবে।” এর পর সমস্ত দেবগণ মিলে পার্ব্বতীর এ পুত্রকে “গণোকা স্বামী” অর্থাৎ “গণেশ” নামকরণ করলেন। সেই হতেই গণেশজী সর্ব্ব দেবতার প্রথমে পূজিত হয়ে আসছেন। (ক্রমশঃ)

চিন্তার খোরাক

আমাদের দর্শন পুষ্টির ও পরিবর্ত্তনের অনিচ্ছার নামই দিয়াছে 'তমঃ'। ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, সর্ব্বত্রই এই তমোর আধিপত্য রহিয়াছে। চিত্ত যখন সজীব-সরস-সচল থাকে, তখন স্বাভাবিকই চিত্তের মাঝে একটা বিজিগীষু ভাবের উদ্ভব হয়। হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই ছিল সচল, বিজিগীষু; তাই পরকে সে ঘৃণা করে নাই কখনো। তাদের সম্পূর্ণরূপে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। আত্ম-শক্তির এই যে বিরাট ঐশ্বর্য্য—ইহাই হইল প্রাণবন্ত জাতির লক্ষণ। নিজের 'কোট' ছাড়া জগতের আর কাহাকেও যে মানিতে চায় না, তার মরণ অবশ্যম্ভাবী। কেননা পুষ্টির উপাদান এক জায়গাতে নাই।

দুর্ব্বলেরই দেখি আদর্শ-বিচার নিয়া খুব মারামারি। নিজের অক্ষমতার দরুণই অতৃপ্ত প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষাটা অপরকে অধীন করিয়া সফল করিতে চায় তাহারা। কিন্তু সবলের মাঝে এই দুর্ব্বলভাবের স্থান নাই।

মান-অভিমানের বালাইটা দুর্ব্বল অশক্তের যতখানি এবং যে ধরণের, সবলের কিন্তু এর বিপরীত। আত্মশক্তির ঊর্দ্ধস্থিত অটল সিংহাসন হইতে কথা বলিয়া, তর্ক করিয়া তাহারা জগতের কাছ হইতে সম্মান আদায় করিবার দরুণ ব্যস্ত হয় না।

অন্ধ বলিয়াই দুর্ব্বল অপরের মনটাকে সম্যক্রূপে দেখিতে পায় না। এইজন্য তাহার নিজের সিদ্ধান্তই তাহার কাছে চরম। সে মনে করে, আমি ছাড়া আমার মন ছাড়া, দুনিয়ায় আর কোন কিছু নাই।

নিজে আদর্শকে পালন করিয়া চলিতে না পারিলে আদর্শের প্রতি তখন অতিমাত্রায় শ্রদ্ধার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই যে ভণ্ডামী, শক্তিহীনের এই যে বৃথা অভিনয়, ইহা দ্বারা কি জগতের কোথায়ও কোন হিত হইয়াছে?

অতীতের আদর্শ লইয়া বড়াই করিলেই কিছু হয় না। আদর্শকে নিজের জীবনে যতখানি খাটাইতে পারি, অপরকেও ঠিক ততখানি উদ্বুদ্ধ করিতে পারি। গুরুস্থানীয় যাঁহারা, সম্মান-প্রতিপত্তি আদায়ের দরুণ তাঁহারা এইরূপ ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে কি করিয়া?

এক এক মহাপুরুষ আসেন, আর তাঁহাদের জীবন্ত অনুভূতি দ্বারা শত শত লোক উন্নত হইয়া যায়। তাঁহারা চলিয়া গেলে আস্তে আস্তে প্রাণের দিকটা স্তিমিত হইয়া যায়, আবার মানুষ আস্তে আস্তে মন-মরা হইয়া আসে। আসল জিনিষটা হারাইয়া মানুষ তখন নকল নিয়াই আসলের

দাবী পূরণ করিতে চায়। ইহা কি কখনো সম্ভব?

নিজের শক্তির হ্রাস হইয়া গেলে তখন অত্যাচারটাই প্রবলরূপে দেখা দেয়। দুর্ব্বল ভাবে, সবাই বুঝি তাহার ওপর অত্যাচারই করিতে চায়। এই ভাবনাই হয় তাহার কাল, কার্য্যতঃ হয়ত কিছুই হয় না।

শক্তিহীন হইয়া আমরা করি শক্তির বড়াই, ধর্ম্মহীন হইয়া দিতে চাই ধর্ম্মের উপদেশ; সুতরাং শ্রোতার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক না হইয়া বিদ্বেষেরই সূত্রপাত হয়।

অতীতের আদর্শ লইয়া যাহারা নাকি বেশী বেশী চীৎকার করে, তাহারা এই কথাটী ভাবিয়া দেখে না, যে কোন ক্ষেত্রেই হউক—শীর্ষস্থানীয় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা স্বাস্থ্যে, আধ্যাত্মিক সম্পদে, বল বীর্য্যে তাহাদের মত হীন ছিলেন না। দুর্ব্বলের সম্মান প্রতিপত্তি আদায়ের অন্যায় জুলুম দেখিয়া এক এক সময় হাসি পায়!

দুর্ব্বলই দেখি বেশী বেশী নীতিবাগীশ, তাহারা অহোরাত্র বিধি-নিষেধ প্রণয়নেই নিযুক্ত। অথচ দুর্ব্বল-মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার মূল্য যে মোটেই কার্য্যকরী হয় না, তাহা তাহারা মোটেই ভাবে না।

সমালোচনা করিয়া, কূট যুক্তিদ্বারা কেহই আজ পর্য্যন্ত জগতের হিত করিতে পারে নাই। যাঁহারা জগতকে চিন্তা দ্বারা, কার্য্য দ্বারা অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ছিল দরদপূর্ণ—সহানুভূতিসম্পন্ন চিত্ত।

ভিতরের শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই বাহিরের মত, বাহিরের নূতন কোন আদর্শের উদ্ভব দেখিয়া আত্মারাম ভয়ে জড়সড় হইয়া যায়। অথচ যাঁহাদের আমরা আদর্শ আদর্শ বলিয়া প্রচার করি, তাঁহাদের মাঝে কিন্তু এই দুর্ব্বলতাটুকু ছিল না। সমন্বয় করিবার, অঙ্গীভূত করিয়া লইবার অসাধারণ শক্তি ছিল বলিয়াই, যে কোন পথের উদ্ভবেই তাঁহারা এত বিচলিত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেন না।

নিজের জীবনের ব্যর্থতা অপরের ওপর আরোপ করিয়া বিচার করিলে অন্যায় বিচার হয়। মানুষ যখন দুর্ব্বল হয়, তখন সে নিজকে ছাড়িয়া নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসনে বসিবার অধিকার হারায়।

জগৎস্রষ্টা যিনি, যাঁহার ভিতর অসীম শক্তি; তিনিও প্রত্যেকের স্বাধীনতা দিয়াই প্রত্যেকের জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিবার সাহায্য করিতেছেন। গোলাপ কেন পদ্মফুলের মত ফুটিয়া উঠিল না, এরূপ অন্যায় প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগেই না। প্রত্যেকেরই একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে যাহারা, তাহারা অন্ধ—মোহগ্রস্ত।

শক্তির প্রাচুর্য্য যেখানে, সে জায়গায় স্বাভাবিক শৃঙ্খলা দেখা যায়। কেননা শক্তিমানের ভিতর সংযম-শক্তিও যথেষ্ট। দুর্ব্বলের শুধু বিধি প্রণয়নেই বাহাদুরী, কার্য্যতঃ কিছুই হয় না।

পদ-মর্য্যাদাবোধ জিনিষটা দুর্ব্বলের খুব বেশী। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আত্ম-শক্তির ন্যূনতা। অনেক ক্ষেত্রে দেখি, সম্মান আদায়ের দরুণ দুর্ব্বল সত্তা ডাকে। হাস্যকর ব্যাপার বটে! স্বেচ্ছায় সম্মান না করিলে, সম্মানও কি পরম্পরার জিনিষ?

পরম্পরায় গুরুগিরি করা চলে, কিন্তু গুরু-শক্তির অভাবে যে গুরু শিষ্যের মাঝে ভগবান দর্শন করিবার শক্তিলাভ করিতে পারেন, তিনি নিজের মাঝেই ভগবান প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না।

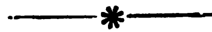
সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে গুরুগিরির সার্থকতা কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বৈশিষ্ট্য জিনিষটা জগতের প্রচলিত মতের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় না। সত্যিকার বিশিষ্ট অনুভূতির মাঝে সামঞ্জস্যের উপাদানও রহিয়াছে। কোনটারই চরমে পৌঁছিতে পারি না, এইজন্যই আমরা কেবল অসামঞ্জস্যই দেখিতে পাই বেশী।

জগৎ যত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে, ততই ঔদার্য্য, সামঞ্জস্য, পরমত-সহিষ্ণুতা এই সব গুণ গুলির বিশেষ স্ফূরণ হইতে থাকিবে। বৈদিক-যুগে এই ভাবের সুস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে।

কোলাহল কমিয়া যাইবে, পথে ঘাটে এত নীতির উপদেশ দিতে হইবে না, সবাই আপন মনের স্বাধীনতা লইয়া সংযত হইয়া চলিতে পারিবে যেদিন, সে দিনই আমাদের সকল দিক দিয়া পরিপূর্ণ সার্থকতা!

সংশয়ীর সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি, দুর্ব্বলের অসহিষ্ণু ভাবের অত্যাচার ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিবিহীন মানবের শাস্ত্রোপদেশ দেবার অসামান্য প্রলোভন যে দিন কমিয়া আসিবে, সে দিনই ব্যক্তিগত—সমষ্টিগত ভাবে আমাদের চরম উন্নতি হইবে।



আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।"

—ঋগ্বেদ সংহিতা

জগতে যে যত বড় অধিকারী, দুঃখও অর্থাৎ উন্নতির বাধাও তার তত বিরাট্। শক্ত বা সমর্থ বলেই ভগবান্ তাকে মহা বিপদে ফেলে আরও যোগ্য বা বড় করে নেন। যুদ্ধের সম্ভাবনায় যেমন বীর সৈনিকের রক্ত নেচে ওঠে, তেমনি বাধা বিপত্তির যতই সম্ভবনা হয়, সাধকেরও তত জেদ্ বা আত্মশক্তি বেড়ে যায়। কাজেই পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাতেই বা ভয় কি? পিছনে যে মহা শক্তি আছে, তার জোরে সর্ব্ব বাধাতেই সাধকের সমান জোর আসে।

* * *

শত্রুর বিচার আমাদের উপর কঠোর হলেও নিজের সংশোধনের পক্ষে তা খুব উপযোগী। নিজের যে খুঁতগুলো আমাদের দেখ্তে না পাবার আশঙ্কা রয়েছে, সেই গুলো সম্বন্ধে তারা আমাদের দৃষ্টি খুলে দেয়।

* * *

একজন মহৎ লোকের চেষ্টা আর সফলতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—"আপনি এত করে ফেলেন কেমন করে?" "কেননা, আমি এক সময়ে একটা কাজই করি, আর একবারেই তা সম্পন্ন করে ফেল্তে চেষ্টা করি।"

* * *

কল্পনায় যদি তিনি ফুটে ওঠেন—তবে তাঁকে অবিশ্বাস করব কেন? কেননা কল্পনার অতীত যে আনন্দ স্বরূপটা, সেটা তো তখন প্রত্যক্ষ! তাই তাঁর আসায় আর সংশয় থাকে না—কল্পনা যদি তাঁর বলে হয়, তবে তাকেই আমি চাই।

* * *

জগতের সবাই বলেছে—"ওরে মানুষ! তুই গতি-হীন, তুই কীটের কীট, তোর আর উপায় নেই।" আর শুধু আমার ভারত বলেছে—"মানুষ! তুমিই সেই, তুমিই সচ্চিদানন্দ ময়।" মানুষের এত বড় পূজা, এত বড় সম্মান আর কোনও জাতি করেনি।

* * *

উপনিষদ্ তাঁকে বলেছেন—'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' কিন্তু সে উদ্যত বজ্রও শান্ত হয়ে আসে, যদি আমার প্রিয়তমের হাত আমার হাতে থাকে। মানুষের দুর্ব্বলতার জয় এখানে, ভোগের তৃপ্তি এখানে, ত্যাগের ঔদাসীন্য এখানে—এই প্রেমের রাজ্যে।

* * *

এ জগৎকে উড়িয়ে দিও না। কিন্তু তাঁকে এর মূলে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁকে ছেড়ে যেন জগৎকে ভোগ করবার অধিকার তোমার না হয়।

* * *

আমার আমি খুঁজে পাই তখনি, যখনি দেখি নিজকে ভস্ম করেছি, মদনকে ভস্ম করেছি। উঃ কি তীব্র আকর্ষণ থেকে নিজকে বাঁচাতে হবে! বাসনা—এ যেন রাক্ষসী মায়া!

* * *

তবে যিনি নিশ্চল—লীলাতে তিনিই উন্মুখ—তিনিই জননী।

* * *

যে টুকু অনভিব্যক্ত বা অসিদ্ধ, ঐটুকুই মায়া। বৌদ্ধ বলছেন—'শূন্য'। প্র্যাক্‌টিকেলি বড় বিশেষ তফাৎ হচ্ছে না।

সাংখ্যের তত্ত্বগুলো ধাপের মত। জানতে হলেই তা হয়ে যেতে হবে—অর্থাৎ শক্তি চাই। সাংখ্য শুধু শক্তি চালনার ফলটা বলছেন, কিন্তু কে যে চালাচ্ছে, তা বলছেন না। বলেন "অব্যক্ত", সকলেরই শেষ কথা অকারাদি। বেদান্তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে সর্ব্বসমঞ্জস—"অনির্ব্বচনীয়" "অদৃষ্ট" ইত্যাদি। কোনটাই এত রসাল নয়।

* * *

কাউকে কিছু দিয়ে আনন্দ হচ্ছে—এই তো আমাতে তাঁর হ্লাদিনীশক্তির বিকাশ! এ তো পাওয়ার আনন্দ নয়—দেওয়ার আনন্দ। অর্থাৎ পাবারও, দেবারও।

* * *

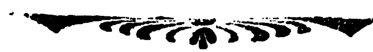
যে মূল থেকে ভাব এসেছে, সেই মূল থেকেই রূপ এসেছে। ভাব আর রূপ মূলে একই তত্ত্ব। সূক্ষ্মের এই নিদর্শন। সূক্ষ্ম আর কিছুই নয়—স্থূলেরই ব্যাপক ভাব।

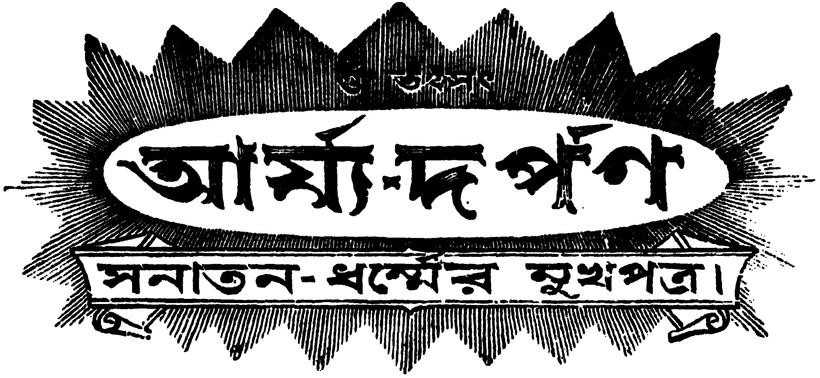
* * *

ব্যস্ত হয়েই মানুষ সব মাটী করে, নইলে তার জন্য সব তিনি পর পর সাজিয়ে রেখেছেন। হিসাব-নিকাশ, বিচার-তৌল তো তখন থাকবে না—কাজেই তিনি যদি খুদ-কুঁড়োও দেন, পড়ে পাওয়া রাজৈশ্বর্য্যের চেয়েও তা মধুর লাগবে। চাইবার নাই বলে অগত্যা মধুর নয়—বাস্তবিকই মধুর।

* * *

গুণাতীত আদর্শ নয়, সে তো শুদ্ধ সত্ত্বের বিশ্রামভূমি! আপনি হবে, হয়েই আছে। হতে হলে চাই শুদ্ধ সত্ত্ব সাত্ত্বিক-জ্ঞান। সাত্ত্বিক জ্ঞানীর লক্ষণ কি?—"ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ"—ধৈর্য্য আর উৎসাহের যাঁতে সমন্বয় হয়েছে। ধৃতি আছে, উৎসাহ আছে যার—সে-ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।





২৪শ বর্ষ | ১ম খণ্ড

ভাদ্র—১৩৩৮

সমষ্টি সং ২৫৬ | ৫ম সংখ্যা

বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া

হে দেবি, তুমি দৃষ্টিমাত্রেই সমুদয় অসুর-কুলকে ভস্ম করিতে পারিতে, যেহেতু তাহারা দেবগণের ন্যয্যাধিকার ও ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত করিয়াছিল। তোমার ক্ষমতা অসাধারণ, কিন্তু তুমি তাহা না করিয়াও দৈত্যগণকে যে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলে, দৈত্যগণকে তোমার সম্মুখীন হইবার অবসর দিয়াছিলে, তাহা তোমার তাহাদের প্রতি কৃপামাত্র; কারণ তুমি বৈরীর প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাক। যুদ্ধে দুর্নিরীক্ষ্য খড়্গপ্রভাসমূহে এবং শূলের অগ্রভাগের জ্যোতিঃসমূহে যে অসুরগণের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয় নাই, তাহাও তোমার সুস্নিগ্ধ কিরণমালা-মণ্ডিত অর্দ্ধচন্দ্র-সমন্বিত সুধাময় মুখমণ্ডল-প্রভাবে। অর্থাৎ

তোমার বদনমণ্ডলের সুস্নিগ্ধ-প্রভায় দুঃসহ শস্ত্রতেজও অপেক্ষাকৃত সুসহ হইয়াছিল। হে দেবি, পাপাত্মাদিগের পাপনাশ তোমার স্বাভাবিক গুণ; তোমার রূপ অন্যের চিন্তাতীত এবং অতুলনীয়; উহা সর্ব্ব-সৌভাগ্য ও সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আধার; তোমার বীর্য্য দেব-বল-পরিভবকারী, দৈত্যদিগের নাশক; তবুও যে তুমি তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়াছ, ইহাতে তোমার দয়াই প্রকটিত হইতেছে।

হে মাতঃ, দৈব ও আসুর দ্বিবিধ সম্পদ্‌ই তোমার। দু'য়ের সামঞ্জস্যই সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে অনুকূল। যখনই সৃষ্টিতে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই তোমাকে কঠোর হস্তে সাম্যতা আনয়ন করিতে হয়। কিন্তু এই বৈষম্য ত তোমার সৃষ্টিতে—তোমার সন্তানে কাজেই কঠোরতার মধ্যেও তোমার স্নেহ বা দয়ার অপলাপ হয় না। তাই তুমি কঠোরা হইতেও কঠোরা আবার কোমল হইতেও কোমলা; ভীষণাদপি ভীষণা, প্রেম-ফুল্লাননা।

তোমাকে না বুঝিয়া, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া, গুরুতর অন্যায় করিয়াও যে তোমার ক্ষমা পাওয়া যায়, ইহাই তোমার বিশিষ্ট-রূপ। জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব তোমার নিকট কতই না অপরাধ করিতেছে, কতই না তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে! কিন্তু মাতঃ, তুমি যদি এই সব ক্ষমা না করিয়া সন্তানকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে, তাহা হইলে জীবের আর উদ্ধারের উপায় থাকিত না। হে মাতঃ, তুমি এমনি সদয়া যে, সন্তান কোন অবস্থায়ই তোমার স্নেহ দৃষ্টির অন্তরাল হইতে পারে না।

অয়ি জগন্মাত! সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী শক্তি একমাত্র তোমাতেই রহিয়াছে, অথচ এই তিনের সামঞ্জস্য তুমিই বিধান করিয়া থাক। এই সৃষ্ট জগৎ তোমারই স্বরূপের দ্যুতি লইয়া অভিব্যক্ত হইতেছে। তুমি বরাভয় করা, অথচ শত্রু-ভীতি প্রদানার্থ নানা প্রহরণ-ধারিণী। হে মাতঃ, তোমার এই বিশিষ্ট রূপকে নমস্কার!

সৃষ্টিতে যদি তোমার এই উভয়রূপ প্রকটিত না হইত, তবে সৃষ্টি পরিপালন করা অসম্ভব হইত। তোমার ভয়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি তাঁহাদের যথা নিযুক্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, দেবতাগণ স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন; তোমার প্রভাবে অসুরগণের প্রবল প্রতাপ দমিত ও শমিত হইয়া থাকে, সৃষ্টিকার্য্য ও তাহার সৌকর্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

দেবতাগণ যেমন তোমার অসীম মহিমময়ী শক্তিতে আবিষ্ট, প্রণত ও স্তুতি পরায়ণ, অসুরগণও তদ্রূপ তোমার বীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও প্রতাপের নিকট দমিত-শমিত ও আকৃষ্ট। হে মাতঃ, তোমাকে সকলেই চায়, সুতরাং তোমার সর্ব্বপ্রভাব-পরাভবকারিণী বিশিষ্ট-রূপকে নমস্কার!

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ॥

প্রার্থনা

—(*)—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবির্ম্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌॥

অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া চল, অসত্যের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে সত্যের আলোক দেখাইয়া দাও। অসত্যের কবলিত হইয়া আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, অসত্য যাহা—অল্প যাহা—তাহারই মায়ায় ভুলিয়া সংসার সমুদ্রে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি। অসত্যকেই সত্য বলিয়া জোর করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছি, মরিচীকাভ্রান্ত মৃগের মত তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি,— সত্য হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। আমি চাহিয়াছিলাম শান্তি, চাহিয়াছিলাম তৃপ্তি! কিন্তু জানিনা কাহার কুহকে মজিয়া আজ সব হারাইয়া বসিলাম, চির পোষিত আশা-ভরসা আজ হতাশার দীর্ঘশ্বাসে পর্য্যবসিত হইল!

জাগতিক সুখকে, জাগতিক তৃপ্তিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম, তাই বার বার তাহার পেছনেই ছুটিয়াছি। ছুটিতে ছুটিতে দেহ শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, চিত্ত অবশ হইয়া আসিয়াছে, প্রাণ-শক্তি স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। আর তো এই অসত্যের কঠোর বাঁধনে বাঁধা থাকিতে পারিতেছি না, এ জ্বালা যে বড় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এত দিনের বদ্ধ-প্রাণ আজ সব ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছে, কিন্তু উপায় কই? অসত্যের পাশে পাশবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব আমি এই অসত্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ক্ষমতা আমার কোথায়? তাই জীবনের এই সঙ্কট সময়ে ত্রাণকর্ত্তা তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম* হে রুদ্র, হে গুরো! হে দেবতা! তুমি আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া চল, অসত্যের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও। তাই প্রপন্ন হৃদয়ে তোমার শরণ লইয়া আবার বলি—**অসতো মা সদ্‌গময়।**

তুমি আমাকে আঁধার হইতে আলোকে লইয়া চল, অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে জ্যোতিঃসমুদ্রে টানিয়া লও। অজ্ঞান-আঁধারে আমার দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, সত্যের পথ তো আর খুঁজিয়া পাইতেছি না! অন্ধকারে দিশে হারা হইয়া শুধু বিপথেই ঘুরিয়া মরিতেছি। তোমারই দেওয়া ইন্দ্রিয়ের সম্পদে এত দিন নিজকে খুব বড় মনে করিয়াছিলাম, তোমারই দেওয়া ধনে ধনী হইয়া তোমাকেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দু'টী ক্ষুদ্র অক্ষিগোলক পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, আমি সব দেখিতেছি, আমার অগোচর তো কিছুই নাই; দু'টী শ্রবণ কুহর পাইয়া ভাবিয়াছিলাম বিশ্বের সমস্ত সংবাদই ইহার ভিতর প্রবেশ করিতেছে, আমার অজ্ঞাত তো কিছু নাই! এমনি করিয়া ক্ষুদ্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, আমি বিশ্বের যাবতীয় গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি, রসনেন্দ্রিয় পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, বিশ্বের যাবতীয় রস ইহা দ্বারা আস্বাদন করিতেছি, স্পর্শেন্দ্রিয় পাইয়া ভাবিয়াছিলাম বিশ্বের সমগ্র স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতেছি। এই ইন্দ্রিয়রাজির কুহকে পড়িয়া আমি আপনাকে কত মহান্‌ ভাবিয়া

ছিলাম, অহঙ্কারে আমার চিত্ত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। নিজকে ছাড়া কাহাকেও স্বীকার করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। যাহাদিগকে আমি অতি আপনার বলিয়া ভাবিয়া ছিলাম, আমার আমিত্ব টুকু পর্য্যন্ত যাদের পায়ে বিকাইয়া ছিলাম, তাহারা যে আমাকে বৃহৎ হইতে বঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্রে আবদ্ধ রাখিবে, আলো হইতে দূরে সরাইয়া এমনি করিয়া আঁধারে ঘুরাইয়া মারিবে, তাহা তো স্বপ্নেও ভাবি নাই। আজ দেখিতেছি তাহারা আমাকে আঁধারে ফেলিয়া রাখিয়াছে, তোমার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাকে অন্নে মজাইয়া রাখিয়াছে। আমার এমন শক্তি নাই যে ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাই, আমার এমন ক্ষমতা নাই যে এই আঁধারের মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সত্যের আলোকে চলিয়া যাই। আঁধার হইতে আলোর মাঝে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ আজ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; তাই হে রুদ্র, হে দেবতা, কাতর-কণ্ঠে তোমায় ডাকিতেছি, তুমি—**তমসো মা জ্যোতির্গময়।**

তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল, মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও। এ বিশ্বে দেখিতেছি শুধু মৃত্যুরই তাণ্ডব লীলা! প্রলয়েরই প্রলয়-গর্জ্জন! কাল যাহা ছিল, আজ তাহা নাই; আজ যাহা আছে, কাল তাহা থাকিবে না। প্রতি মুহূর্ত্তে এ বিশ্বের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে একের স্থান অপরে অধিকার করিতেছে। বিশ্বের বুকে মৃত্যুর এই প্রলয়-লীলা দেখিয়া ভীত-সঙ্কুচিত চিত্ত আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে, ভাবি-মরণের আশঙ্কায় দুর্ব্বল হৃদয় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এত দিন যাহাকে আমি আমার অতি আপনার বলিয়া অতি নিবিড় ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিয়া ছিলাম, কোন্ দিন কোন্ মুহূর্ত্তে যে সে দেহের লয় হইয়া যাইবে তাহা কে জানে? এই দেহ যে আমার বড় আপনার, এই দেহ ছাড়া যে আমার "আমিত্ব" কিছু আছে এত দিন ধরিয়া তো তাহা জানিলাম না—বুঝিলাম না। এই দেহ পাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার "আমি" টুকুরও যে নাশ হইয়া যাইবে! আমার নাশ আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব?

বাস্তবিকই কি আমি বিনশ্বর? প্রকৃতই কি দেহের সঙ্গে সঙ্গে আমারও বিনাশ ঘটিবে? বলিয়া দাও দেবতা! কেমন করিয়া আমি এ মৃত্যুর হাত হইতে ত্রাণ পাইব, বলিয়া দাও গুরো! কিরূপে আমি দেহাত্ম-বোধ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্বে প্রবেশ করিব। মৃত্যু ভয়ে ভীত ক্ষুদ্র জীব আমি, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, ক্ষুদ্র জীবত্বের নিরসনে তুমি আমায় শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া চল—**মৃত্যোর্মামৃতং গময়।**

এতদিন শুধু নিজকে লইয়াই নিজে মরিয়াছি, আত্মস্বার্থ লইয়াই এতকাল কাটাইয়া আসিয়াছি। আপনাকে ছাড়া আর কিছু জানিতাম না, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও মানিতাম না। তোমার সিংহাসন হইতে তোমাকে দূরে সরাইয়া তাহার স্থলে আমার ক্ষুদ্র অহমিকাকেই বসাইয়া ছিলাম। আজ আমার সে অহমিকা চূর্ণ হইয়াছে, তুমি ছাড়া আমার যে কোন স্বাতন্ত্র্যই নাই, তাহা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। হে দেবতা! আমার অহমিকাকে বিদায় দিয়া তোমার সিংহাসন তোমারই তরে রিক্ত করিয়া রাখিলাম: তুমি এস, আবির্ভূত হও, হৃদয়-সিংহাসন অলঙ্কৃত কর। তুমি নামিয়া এস আমার মনে, নামিয়া

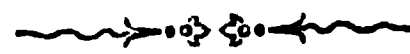
এস আমার প্রাণে, নামিয়া এস আমার বুদ্ধি-অহঙ্কার-ইন্দ্রিয় ও দেহে। আজি সবই তোমার তরে রিক্ত করিয়া দিলাম, আমার "আমি"কে আজ বলি দিয়া তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িলাম। তুমি এস, আবির্ভূত হও, আমার মধ্যে প্রকাশিত হও! তুমি যন্ত্রী, আমি তোমার যন্ত্র; তোমার ইচ্ছা এই দেহ-মনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠুক, দেহ-মন তোমার পরশে ধন্য হইয়া যাক্। আমি আমাকে ছাড়িয়া দিলাম, তুমি আসিবে বলিয়া সব রিক্ত করিয়া রাখিলাম। এস দেবতা, আবির্ভূত হও—

আবিরাবির্ম্ম এধি।

জগতের কাছে লাঞ্ছিত হই ক্ষতি নাই, জগৎ আমার উপর অসন্তুষ্ট হউক তাহাতেও ক্ষতি নাই। তুমি শুধু আমার উপর প্রসন্ন থাক দেব! তাহা হইলেই জগতের বিদ্রূপ কটাক্ষ, কুটিল দৃষ্টিপাত, বিরুদ্ধ সমালোচনা, সবই আমি হাসিমুখে সহ্য করিয়া যাইতে পারিব। তুমি যদি বিমুখ হও দেবতা, তাহা হইলে আর আমার দাঁড়াইবার স্থান কোথা? এতদিন তোমাকে ডাকি নাই, তোমাকে খুঁজি নাই। শুধু জাগতিক মানবের মন যোগাইয়া চলিয়াছি, তাহাদের মুখের একটু প্রসন্ন হাসির জন্য আপনাকে পর্য্যন্ত বিকাইয়াছি। কিন্তু আজ আমার সে ভুল ধরা পড়িয়াছে, বুঝিলাম এত দিনের প্রয়াস সব ব্যর্থ হইয়াছে। জগতের ব্যবহারে নিপীড়িত-দলিত-চিত্ত আমি আজ তাই জগৎ হইতে মুখ ফিরাইয়া তোমার পানে তাকাইলাম, তুমি আমার প্রতি দক্ষিণ হও প্রসন্ন হও; তুমি শুধু হাসিমুখে একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমার ওই প্রসন্ন আস্য—দক্ষিণ মুখ আমার পথের সকল বাধা দূর করিয়া দিবে, সংসারসমুদ্র হইতে আমাকে ত্রাণ করিবে।—

আমার এমন কোন সম্পদ্ নাই যাহা দিয়া আমি তোমার প্রসন্নতা আনয়ন করিতে পারি, আমার এমন কোন সম্বল নাই যার বলে তোমার কৃপা আকর্ষণে সমর্থ হই। নিঃস্ব দীন আমি আজ তাই তোমার প্রসাদের ভিখারী হইয়া শুধু কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছি—**রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।**

দুঃখ-নিবৃত্তির ধারা



সাংখ্যের গোড়ার কথাটাই হল দুঃখ দূর করা। দুঃখ-নিবৃত্তির স্থূল উপায় গুলিই আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে পড়ে, কিন্তু সেটি বাস্তবে পরিণত করতে গিয়ে যে আরও কত দুঃখের সৃষ্টি করে বসি, সেদিকে আমাদের খেয়াল থাকে না। কারণ যখন যে দুঃখটা এসে সবচেয়ে বড় বলে আপনা হতে আমাদের মনকে পীড়া দেয়, তখন সেটার নিবৃত্তির জন্যই আমাদের মন-প্রাণ উধাও হয়ে যায়—আর কোনও দিকে নজর দিবার অবসর তখন আমাদের থাকে না। কাজেই দুঃখ-কর অন্যান্য বিষয়গুলি তখন গা-সহা হয়ে পড়ে। বিধাতার এই যে সহ্য-শক্তি প্রদান, আমাদের পক্ষে তা এক দিক দিয়ে যেমন সান্ত্বনাকর, আর এক দিক দিয়ে তেমনি তাঁর মহামায়ার অবিদ্যা-

শক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আমাদের পরম অজ্ঞানের অবস্থা। কারণ, দুঃখকে তীব্র ভাবে অনুভব করে যে যত তার সূক্ষ্ম ভাবে নিবৃত্তির কারণ চিন্তা করতে পারবে, সেই তত দুঃখনিরোধে সক্ষম হবে। নতুবা ইতর জন্তুর মত কেবল নীরবে দুঃখ সয়ে যাওয়াটাই পৌরুষের কাজ নয়। সহ্য-শক্তি একটা বড় শক্তি বটে, কিন্তু তার সুষ্ঠু উপায়ে প্রতিবিধানের ক্ষমতাই হল সব চেয়ে বড় কথা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির বর্ত্তমান অবস্থার তারতম্য বিচার করতে গিয়ে অনেকেই প্রাচ্যকে এই বলে গাল দেন যে, প্রাচ্য তার দর্শন-পুরাণ নিয়ে আলোচনা করতে করতে দিন দিন চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ছে—ক্রমশঃ জড় হয়ে যাচ্ছে, আর পাশ্চাত্য সেই দর্শন-পুরাণের গোড়ার কথা দুঃখ দূর করার উপায়টা বাস্তবে পরিণত ক'রে, দিন দিন সুখী ও জগতে বরেণ্য হয়ে উঠছে। হিন্দুর দর্শন-পুরাণ শুধু পুঁথি-পত্রেই নিবদ্ধ, বাইরের জগতে সে সব apply করে জগৎকে উন্নত করতে পারেনি। আর পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান তার যত কিছু আবিষ্কার, সমস্তই বাস্তবে প্রয়োগ করে জগৎকে দিন দিন নূতন রূপ দিচ্ছে। তারা দুঃখ পেলে তার প্রতিকারে যথাসর্ব্বস্ব পণ করে, শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত দান করেও যদি তাতে সফলকাম না হয়, তবে তার পুত্র আবার সেই Research এ লেগে যায়। এমনি ক'রে ক'রে বহুপ্রাণ নষ্ট হলেও শেষে যে বস্তু আবিষ্কার হয়, তা সমস্ত জগৎকে সুখলাভের—আনন্দলাভের নূতন উপাদান প্রদান করে, সমস্ত লোক সেই মহাদান উপভোগ করে সেই সমস্ত আবিষ্কর্ত্তাদিগকে ধন্য ধন্য করতে থাকে। ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান্-মূর্খ সকলেই সেই দানের ফল ভোগ করতে পারে, জন সাধারণ ক্রমশঃ পদে পদে তার উপকারিতা বুঝে।

আর হিন্দু দুঃখনিবৃত্তির যে উপায় বের করলেন, বহুকাল চোখ বুজে থেকে, অতল গুহায় সমাধিস্থ হয়ে যে উপায়টা এনে জগতের সমক্ষে ধরলেন, তার অধিকারী হল মুষ্টিমেয়। চিত্তের বহু উচ্চ গুণ থাকলে তবেই সেই সমস্তের অধিকারী হতে পারা যাবে, অথবা সেই সমস্ত গুণ আয়ত্ত করতে শাস্ত্র-দৃষ্ট উপায়ে যদি প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে হয়ত জন্ম জন্মান্তরই কেটে যাবে শুধু প্রথম ভূমিকায়! কাজেই কবে যে সর্ব্বোচ্চ শেষ ভূমিকায় আরোহণ হবে, তার ইয়ত্তা নাই। অতএব তোমাদের সেই সমস্ত ঋষি প্রণীত শাস্ত্রকে আবার ফিরে সেই অতল গর্ভেই পাঠাও! জগতে তার প্রচার আপনি কমে আসছে—উপকারিতার অভাবে দিন দিন তা অতলেই তলিয়ে যাচ্ছে।

এদেশের নব্যপ্রাণ আধুনিক এই সমস্ত freethinker বা স্বাধীন চিন্তাকারী (?) দিগকে গোঁড়া হিন্দুর মুখপত্র হয়ত একধার থেকে শুধু গালই দিয়ে যাবেন, আর অপর পক্ষও ক্রমশঃ উদ্ধত হয়ে উঠবেন। কিন্তু গভীর ভাবে একে অপরকে বুঝবার বা বুঝাবার লোক খুবই কম; তাই দেশে দিন দিন পাশ্চাত্যের বিষময় বিকৃত সভ্যতার আকর্ষণে আমাদের মন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহ উন্নতির উল্টো পথে যাচ্ছে। এদেশের লোক ব'লে গৌরব ক'রে দেশাত্মবোধ জাগবার সু-যুক্তি অনেকেই খুঁজে পায় না। তাই এদেশের জাগরণের জন্য দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহাত্মার প্রাণ কাঁদলে কি হবে? আসলে আমাদের দেশ যে অন্তরের চোখ বন্ধ করে বাইরে হাঁ করে প্রসাদ ভিক্ষার আশে শুধু পশ্চিমের পানে চেয়ে আছে!

ইংরাজী ভাষা শিক্ষার দোষে নয়—যথার্থ স্বাধীন-

চিন্তার অভাবেই আমাদের মন বা চিন্তা-শক্তি পারিপার্শ্বিকের অহরহ বিকৃত অবস্থা গুলিকেই পরম হিতকর বলে বুঝে নিতে চায়। এর বিপরীত দিকটা বুঝিয়ে দিবার মত, পারিপার্শ্বিকের মোহ-ময় আকর্ষণ হতে রক্ষা করে যথার্থ সত্যের দিকে—উন্নতির দিকে আকৃষ্ট কর্‌বার মত শক্তিশালী এমন কেহ নাই, যিনি এই মরণের পথ রোধ করে আমা-দিগকে টেনে নিতে পারেন। যদিও বা থাকেন, তবু এখনও আমরা তাঁদের সে আকর্ষণ বুঝ্‌তে পারিনি। সত্যিকার দেশাত্মবোধ যে দিন প্রাণে জাগ্‌বে, যে দিন আমাদের দেশের সত্যিকার গৌরবের বস্তু কি তার পরিচয় পাব বা সেজন্য উৎকণ্ঠিত হব, সে দিনই হয়ত প্রকৃত ব্যাখ্যাতার আদর হবে—তাঁদের সে আকর্ষণ সবারই বুকে সাড়া তুল্‌বে। নতুবা শুধু তাঁরা টান্‌লেও আমাদের অসাড় মন সাড়া দিবে না।

কিন্তু ব্যাখ্যাতার কথা বাদ দিলেও আমরা দেখ্‌তে পাই যে, আধুনিক যে সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তি আমাদের মনে ওঠে, হিন্দুর প্রায় শাস্ত্রেই—বিশেষতঃ দর্শন শাস্ত্রে সে সমস্ত প্রশ্ন "পূর্ব্ব-পক্ষ" রূপে ঋষি আপনিই তুলছেন, আবার নিজেই তার সমাধান করে দিয়েছেন। এখন যেমন 'বেদ মানি না' বলে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করে, পূর্ব্ব-কালেও তেমনি বেদের মন্ত্র সম্বন্ধে "নিরর্থকা মন্ত্রা ইতি কুৎসঃ" এইরূপ বেদ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতের অবতারণা করা হয়েছিল। কিন্তু নানা যুক্তিতর্ক-সহায়ে আবার সে মতের নিরসনও করা হয়েছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে সব যুক্তি তোলা হয়, শাস্ত্রের পূর্ব্ব পক্ষীয় যুক্তির তুলনায় সে গুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎ কর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলে, তা নিজে জানার মত সংস্কৃত বিদ্যা হয়ত অনেক ব্যক্তিরই নাই—কারণ সংস্কৃত বর্ত্তমান রাজভাষা তো নয়ই, বরং মুসলমান রাজত্ব কালে যেমন পার্শী, উর্দ্দু বা আরবীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতেরও প্রগাঢ় চর্চ্চা থাকাতে ভাষাটী সজীব ছিল, এখন তাও নাই। এখন একবাক্যে সংস্কৃতকে বলা হয় Dead language বা মৃত ভাষা। কিন্তু আমরাই যে তাকে মৃত করে অর্থাৎ জ্যান্তে মেরে রেখেছি, সেদিকে কারও খেয়াল নাই। নতুবা রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান রাজত্বকালের উর্দ্দু-পার্শীর মত বা বর্ত্তমানে ইউরোপে গ্রীক লাটিনের মত সংস্কৃত ভাষাও গৌরবের ভাষা রূপে সর্ব্ববাদি-সম্মত বলে গৃহীত হ'ত। এজন্য যাঁরা এটিকে এখনও সজীব রাখ্‌তে চান, তাঁরা ইংরাজী শিক্ষিতের তুলনায় তেমন সম্মানিত হন না। অথচ এঁরা না হলে এই ভাষা আরও দিন দিন লোপ পাবে।

এই রক্ষণশীলদলের মধ্য হতেই শাস্ত্রের রক্ষা-কল্পে কিরূপ বিরুদ্ধ-যুক্তি ও তার নিরসন হয়েছিল, তার একটু নমুনা সাংখ্য-সূত্রের অনিরুদ্ধবৃত্তি হতে দিচ্ছি। দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে যখন শাস্ত্রদৃষ্ট উপায়কে প্রধান বলা হচ্ছে, তখন পূর্ব্বপক্ষ হয়ে ঋষি আপত্তি তুলছেন :—

"ভবতু দুঃখনিবৃত্তিঃ পরম পুরুষার্থঃ তথাপি লৌকিকাদেব সুকরোপায়াৎ তৎসিদ্ধেঃ শাস্ত্রসাধ্যে দুষ্করোপায়ে অনেক জন্ম পরম্পরায়াসসম্পাদ্যে চিত্ত-নিরোধাদৌ কঃ স্বস্থাত্মা প্রবর্ত্ততে? উক্তঞ্চ—"অর্কে-চেন্মধুবিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ? ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌকোবিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ-ইতি"। তথা চ শারীর-দুঃখ নিবৃত্তয়ে ঔষধাদয়ঃ সন্তি, মানসিক দুঃখ নিবৃ-ত্তয়ে প্রবরস্ত্রীমিষ্টান্নাদয়ঃ সন্তি, আধিভৌতিক দুঃখনিবৃ-ত্তয়ে নীতিশাস্ত্রবাদিভিঃ প্রোক্তাঃ নানা প্রকারাঃ সন্তি, আধিদৈবিক দুঃখনিবৃত্তয়ে শান্তিমণিমন্ত্রাদয়ঃ সন্তি। অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তি পরম পুরুষার্থ হউক, তবু

লৌকিক সুখকর উপায় হইতেই যথন তা সিদ্ধ হয়, তখন তোমার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দুষ্কর অনেক জন্মের আয়াস-সাধ্য চিত্তনিরোধ প্রভৃতি ব্যাপারে কোন্ সুস্থাত্মা ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিবে? লোকে বলে—

ঘরে যদি মধু মিলে, কেবা যায় পাহাড়ে?
যাহা চাই যদি পাই, কেবা খুঁজে তাহারে?

আরও দেখা যায়, শারীরিক দুঃখ দূর করার জন্য ঔষধ প্রভৃতি রয়েছে, মানসিক দুঃখ দূর করার জন্য প্রচুর ভোগ্য রয়েছে, আধিভৌতিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য নীতিবিদেরা কত কিছু বলে গেছেন, সে সব রয়েছে; আধিদৈবিক দুঃখ দূরের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, মণিমন্ত্র প্রভৃতি আছে; কাজেই এ সব থাক্তে কে যায় শাস্ত্র ঘাঁটতে?

এখানে লক্ষ্য কর্বার বিষয় যে, আধুনিক ভোগ-বাদ সর্ব্বস্ব জড়বিজ্ঞান দ্বারা এই সব ভোগেরই বৃদ্ধি চল্ছে। কিন্তু তাতে শেষ পর্য্যন্ত মানুষ তৃপ্তি পায় না; তাই যাঁরা ওদেশের আঁতের খবর রাখেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে, ওদেশে রাজস ও তামস-ভোগের অত্যন্ত বৃদ্ধির পরিণামে তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ওদেশের মনীষীরা অনেকেই দেশকে ধ্বংসের পথ হতে টেনে নেবার জন্য ভারতের শান্ত-শান্তিময় জীবনের আদর্শকে বিশেষ ভাবে মেনে নিচ্ছেন। এ বিষয়ে আধুনিক খ্যাত-নামা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের "বর্ত্তমান জগৎ" দ্বিতীয় খণ্ডে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা লিপি-বদ্ধ রয়েছে।

এই আসুরিক ভোগের পরিণামে অতৃপ্ত, এ কথা জেনেই ঋষি পূর্ব্বোক্ত যুক্তির উত্তরে সার-সংক্ষিপ্ত একটী কথায় সমস্ত খণ্ডন করে দিচ্ছেন, **"দৃষ্টাত্তদসিদ্ধির্নিবৃত্তেরপি অনুবৃত্তি দর্শনাৎ।"** দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে তাহা অর্থাৎ সেই দুঃখ নিবৃত্তি সাধিত হয় না, কারণ এক-বার নিবৃত্ত হলেও আবার সেই দুঃখ ফিরে আসে, ইহা দেখা যায়। কাজেই এমন উপায় খুঁজ্তে হবে—যাতে শুধু দুঃখনিবৃত্তি হয় না, দুঃখের আর উৎপত্তিই না হয়। ঔষধাদি দ্বারা উপরে যে নিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে, তাহাতে নিঃশেষ ভাবে কষ্ট নিবৃত্তি হয় না। যদি বা কখনও হয়, তবে পুনরায় আর হবে না, এমন কোনও প্রতিজ্ঞা নাই। এর পর অন্য যুক্তি আস্বে ও তা নিরসন হবে। কিন্তু এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু দু'দেশের জড় ও আধ্যাত্মিক দুই ধারায় দুঃখনিবৃত্তি দেখানো, তাই আজ এই পর্য্যন্ত!



সামঞ্জস্য

ঠাকুর বলেন—"ব্যস্ত হয়েই মানুষ সব মাটি করে, নইলে তার জন্য সব তিনি পর পর সাজিয়ে রেখেছেন।"

বিশ্বাস সুদৃঢ় না হলে মানুষ এ কথায় ভরসা পায় না। তারা মনে করে, অস্থির হয়ে উঠ্লেই বুঝি ভগবান্ করুণা কর্বেন। অস্থির হতে হবে কেন—তোমার প্রকৃতিই যে তোমাকে ঊর্দ্ধমুখী উন্নীত কর্বার দরুণ ব্যাকুল! তবে একটু রয়ে-সয়ে চল্তে হবে।

হিসাব-নিকাশ, বিচার-তৌল তো তখন থাক্বে

না। কাজেই তিনি যদি খুদ-কুঁড়োও দেন, পড়ে-পাওয়া রাজৈশ্বর্য্যের চেয়েও তা মধুর লাগবে। চাইবার নাই বলে অগত্যা মধুর নয়—বাস্তবিকই মধুর!

মানুষ আশঙ্কা করে—কামনা ছেড়ে দিলে পাব, সে কি কথা? তখন যে সখের কিছুই থাকবে না—সখ মিটবে কি করে? কিন্তু এই কামনাকে ছেড়ে দিতে পারলেই সব পাওয়া যায়। তোমার যা হক্, তোমার যা প্রাপ্য, তা কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না। কাজেই সিদ্ধি লাভ না হলে চঞ্চল হয়ে উঠতে নাই; হয়ত পথে বিঘ্ন রয়েছে, সব বিঘ্ন দূর হয়ে গেলে আপনি মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

না চেয়ে বেশী পাওয়া যায়, তার ওপর ভগবানের করুণা হয় বেশী। কেননা ভগবান্ বুঝেন, সে শুধু তাঁর ওপর সব সমর্পণ করেই নিশ্চিন্ত, সে আর কিছুই চায় না। বুকের মাঝে বল না পেলে, ভরসা না পেলে, মানুষ এত নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে না। তাই যে চায় না, বুঝতে হবে, সে যে পাবে এ ধারণায় তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দৃঢ়-বিশ্বাসেই কিন্তু ফলপ্রাপ্তি সহজ হয়ে আসে!

প্রাণে বিশ্বাস আসলেই তখন সুদূর ভবিষ্যতের আভাস-ইঙ্গিত স্পষ্টতঃ উপলব্ধির মাঝে পাওয়া যায়। এ সব দেখে শুনে বিশ্বাসের মাত্রা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়। আর বিশ্বাসী মাত্রেই স্থির-ধীর, তারা কোন কিছুর জন্যই অতিষ্ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠে না; কেননা তারা স্পষ্টতঃ দেখতে পায়, পর পর সব অবস্থাই আসবে, কাজেই উতলা হয়ে কি লাভ?

আমরা নিজেদের সম্বন্ধে কতটুকু জানি, কতটুকুই বা দেখি? এক দিক দেখতে গিয়ে অন্য দিক একদম বাদ পড়ে যায়। সুতরাং বিশ্বতশ্চক্ষু যিনি, তাঁর ওপর সকল ভার ন্যস্ত করাই সঙ্গত। আমরা একটা দিক দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠি, আবার ঠিক তার বিপরীতে যে নিরানন্দ হবারও কিছু তৈরী হয়ে আছে, তা দেখবার মত সেই অন্তর্দৃষ্টি কোথায়?

তাহলে নীরব হয়ে সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, সবই ভগবানের দান বলে মনে করে সয়ে যাওয়াতেই পরমানন্দ। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার ফলে অনেকের মাঝে তামসিকতা এসে প্রবেশ করে। এ জায়গায় সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন। এক দিন সব হবে, বা ভগবান্ স্বেচ্ছায়ই তো আমাদের যা প্রাপ্য তা দিয়ে দেবেন, এ কথা মনে করে যদি দিন দিন অন্তর তামসিকতার অমানিশায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে, তাহলে বুঝতে হবে—বিশ্বাসের মাঝে কোথায়ও গলদ রয়েছে।

ব্যস্ত হতে নাই, তা বলে যে অনির্ব্বাণ আকুলতাকে বিতাড়িত করতে হবে তারও কোন মানে নাই। অন্তর যদি তাঁর দরুণ অহনিশ জ্বলতেই না থাকল, তাহলে তাঁর কৃপা উপলব্ধি করব কেমন করে? ব্যস্ত হওয়া মানে একবারেই সব পেয়ে ফেলার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে বুঝাচ্ছে। এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকেই একটু দাবিয়ে রাখতে হবে। সর্ব্বাবস্থায় চিত্তকে প্রফুল্ল ও সুস্থ রাখতে হবে। মনই যদি বিগড়ে যায়, তাহলে কাকে নিয়ে কি হবে?

অনেকের মাঝেই আকুলতা বা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে দেখি, কিন্তু তারা সেই আকুলতাকে এমন ভাবে বাড়িয়ে তুলে যে, তার অবসাদকে অতিক্রম করে কার্য্যতঃ কোন একটা কিছু করা আর তাদের দিয়ে হয়ে উঠে না। এ ব্যর্থ চাঞ্চল্য নিয়ে, অনর্থক অশান্তি নিয়ে কাল কর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই হয় না। এইজন্যই বুকে তাপ

থাকা চাই, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে সে তাপে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট বা অতি চঞ্চল করে না তুলে।

মানুষ সংশয়ী; সংশয় তার উঠবেই না, এ কথা বলা অসম্ভব! কাজেই 'ব্যস্ত হয়ো না' এ কথা বললেও মানুষ ব্যস্ত হওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। সংশয় ভাল, যে সংশয় মানুষকে ওপরের দিকে টেনে তুলবার সাহায্য করে, ব্যাকুলতা ভাল, যে ব্যাকুলতায় ভগবান্ পরিতুষ্ট হন। যারা বিশ্বাসী, তারা যে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এ কল্পনা করা অন্যায়। বরঞ্চ বিশ্বাসীর জগতে বিপুল কর্ম্ম। তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট বলেই, বিচিত্র কর্ম্মের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নেই তাদের।

আমাদের মাঝেই একজন অতিষ্ঠ হয়ে এক দিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করলে—"কোদাল যে মারাচ্ছ ঠাকুর, তাতে কি হবে?"

ঠাকুর বললেন—"কোদাল মারার ফল যদি না দিতে পারব, তবে কোদাল মারতে বলছি কেন?"

চাই অকপট বিশ্বাস। একেই তো বলে বুদ্ধি জয়, প্রকৃতি জয়!

আসল কথা আমরা বিশ্বাসই আনতে পারি না. তাই কর্ম্মপ্রচেষ্টায় আনন্দের চেয়ে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিলাভ করে ফলপ্রাপ্তির আশাটাই আমাদের বেশী। সব জায়গাতেই ফাঁকি দিয়ে বৈতরণী পার হবার ফন্দী খুঁজি আমরা। যেখানে কর্ম্মের চাপ, যেখানে কর্ত্তব্যের কঠোর নিপীড়ন, সেখান থেকেই নিষ্কৃতি পাবার উপায় বের করে নিতে হবে; দর্শনের মাঝেও দেখি, যেখানে জ্ঞানে কর্ম্মত্যাগ না হয়েছে, সেখানে ফন্দী করে অর্থাৎ যুক্তির সাহায্যে কর্ম্মত্যাগ করতে গিয়ে এক মহা মুস্কিলেরই সৃষ্টি হয়েছে। এর চেয়ে ঈশোপনিষদের এই শ্লোকটাই তো বেশ ভাল যে, "কাজ করে এক শত বছর বেঁচে থাক, কাজ মানুষকে কিছুতেই বদ্ধ করতে পারে না।" মানুষ যখন কাজকে ফাঁকি দিয়ে কেবল মুক্তির অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠল, তখন থেকেই দেখি আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের চেয়ে মারাত্মক দুর্ব্বলতাই শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করল বেশী; জাতীয় জীবনের পতন আরম্ভ হল তখন থেকেই। ধর্ম্মের মাঝে সর্ব্বসামঞ্জস্যের একটা আশ্চর্য্য শক্তি রয়েছে কিন্তু। এটার অভাব হলেই বুঝতে হবে, কোন দিকের লোভটা অতিমাত্রায় বেড়ে উঠেছে। হয়ত মুক্তির প্রলোভন, নয় ত কর্ম্মের প্রলোভন।

ব্যস্ত হতে নাই বটে, তা বলে অলস হয়েও থাকবার বিধান শাস্ত্র কিম্বা মহাপুরুষেরা দেন না। কথা হচ্ছে—সামঞ্জস্য। রামকৃষ্ণদেব নাকি মায়ের দেখা পাবার দরুণ বালুতে মুখ ঘসতেন, কেঁদে রাতকে রাত কাটিয়ে দিতেন, এ সব কি খারাপ? চেয়ে কিন্তু আমরা নিজেরাই ঠকি বেশী। চাওয়ার লক্ষ্য বিষয়াবচ্ছিন্ন আনন্দ—ক্ষুদ্র সুখ; আর না চাওয়ার ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষ আনন্দ, অখণ্ড সুখ, তীব্র শক্তি, আত্মজয়। আমরা চেয়ে যা আদায় করি, তার চেয়ে তিনি নিজের খেয়াল খুসীতে যা দেন, তা আমাদের আশাতীত: আমরা কল্পনাও করতে পারি না, এমনি ভাবে তিনি তাঁর কৃপা ঢেলে দেন। দুয়েরই প্রয়োজন রয়েছে—সময়ে চেয়েই ক্ষুধা মিটাতে হয়, আবার সময়ে না চেয়ে তাঁর উপর জোর রেখে উপবাস করে বসেও থাকতে হয়। তিনি না দিলে কিছুই খাব না, এই দৃঢ় সঙ্কল্পে তিনিও বিচলিত হয়ে উঠেন; তখন বুঝি, তাঁর সঙ্গে আমাদের কিরূপ নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ। সামঞ্জস্যই সব চেয়ে সেরা কথা।

মুক্তির স্বরূপ ও তল্লাভোপায়

সাধারণতঃ সমাজে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও দেবপূজাদি ব্যাপার ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত আছে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গভোগ পর্য্যন্ত লাভই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহাদিগের প্রকৃত ভ্রম নিবারণ ও চরম ও পরম লক্ষ্য স্থির করণার্থ শাস্ত্রোপদেশ অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা সকলের সামর্থ্যে ও অবসরে সঙ্কুলান না হইতে পারে, এইজন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। পাঠকগণ এই প্রবন্ধ পাঠে অনুসন্ধিৎসু হইয়া শাস্ত্রাদি ও গুরূপদেশ অনুসরণ করিবেন।

এই সংসারে রোগে-শোকে, জরা-মৃত্যুতে, অভাব-দৈন্যে কাতর হইয়া অধিকাংশ মনুষ্যই কোনও একটি নিরাপদ-স্থানের অনুসন্ধান করে, যেখানে এইসব দুঃখ-কষ্ট ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসিতে পারে না। এইজন্য অতি পুরাকাল হইতে মনুষ্য সমাজে নানারূপ অনুসন্ধান ও গভীর গবেষণা চলিয়াছে; তপ, জপ, তপস্যা প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

শাস্ত্রে ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, অজ্ঞানেই বন্ধন আর জ্ঞানেই মুক্তি। এই জগৎ-তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বাদি আলোচনা দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, এই জগৎ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি মাত্র। এক ব্রহ্মবস্তুকে এই যে বহুরূপ জগদাকারে দেখাইতেছে, ইহার মূল কারণ মায়া বা অজ্ঞান; প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বিকারপ্রাপ্ত হন নাই। মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় মায়াচ্ছাদিত ব্রহ্মে নানা রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। এই নানা রূপ জীবের নিকটই, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের কোনই রূপান্তর হয় নাই। তবুও যে আমরা এক বস্তুকে ভিন্নরূপে—বহুরূপে দেখিতেছি, ইহাই মায়া বা অজ্ঞান। এই মায়া বা অজ্ঞানকে চিনিলেই প্রকৃত ব্রহ্মকে বুঝিতে আর কোন প্রকার প্রতিবন্ধক থাকে না। সেই এক ব্রহ্মবস্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া আমি তুমি, বৃক্ষ-লতা, গাছ পাথর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাধিধারণ করতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাবিত হইতেছে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, জরামৃত্যু-জ্ঞানও এইরূপে আপেক্ষিক হইয়া পড়িয়াছে। এই অজ্ঞানকৃত আপেক্ষিক জ্ঞান তিরোহিত হইলে একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই থাকিয়া যায়; সুতরাং তুমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি জীবজগৎ সকলই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের সুখ দুঃখ, ভাল-মন্দ, জরা-মৃত্যু বলিয়া কি থাকিতে পারে? সুতরাং তোমার অজ্ঞানতা দূর করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হও; দেখিবে তোমার দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, তোমার কোন প্রকার ক্ষয়-ব্যয় নাই। এইরূপে তুমি সকল দুঃখের পারে নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার অবস্থায় অবস্থিতি করিতে পার। এইরূপ ভাবনায় স্থিরচিত্ত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তাহাই জীবন্মুক্তের অবস্থা। যিনি এই জীবনেই এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, মৃত্যুতে তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ। কারণ, ইত্যাকার ভাবনাযুক্ত মনের অন্য-প্রকার জাগতিক সংস্কার না থাকায় তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিয়া জরামৃত্যুর অধীন হইতে হয় না।

যাগ-যজ্ঞ তপস্যাদির অনুষ্ঠান ও কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাস জনিত পুণ্যানুষ্ঠানে শাস্ত্রে যে মুক্তির উল্লেখ আছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্টকাল ব্যাপীই মুক্তির

অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র, প্রকৃত মুক্তি জ্ঞানেই হইয়া থাকে। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলেও অজ্ঞান, কাজেই তাহার ফল কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত ক্রিয়া-কাণ্ড দেখিয়াও যেমন আনন্দ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু কখনই মুগ্ধ হন না, সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞানলাভের ফল যে মুক্তি, সে মুক্তিতে পুনরায় বন্ধনের কারণ থাকে না। কাজেই তাহার ফল অনন্তকাল ব্যাপী। এক ব্রহ্মবস্তু ছাড়া জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু নাই—ইত্যাকার যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, তিনি কর্ণযুক্ত হইয়াও কর্ণহীন, চক্ষুষ্মান্ হইয়াও চক্ষুহীন, মনোযুক্ত হইয়াও মনঃশূন্য, প্রাণযুক্ত হইয়াও প্রাণশূন্যের ন্যায় অবস্থান করেন। তিনি জাগ্রৎ অবস্থাতে সুষুপ্তের ন্যায় বাহ্যবস্তুতে নির্লিপ্ত থাকেন এবং বাহিরে কর্ম্ম করিয়াও অন্তঃকরণে নিষ্ক্রিয় থাকেন।

এইরূপে তিনি প্রারব্ধ ভোগকাল তক্ নির্লিপ্ত ভাবে দেহে অবস্থান করতঃ ভোগাবসানে ব্রহ্মে বিলীন অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর দেহান্তর প্রাপ্তি হয় না।

সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্যভেদে মুক্তির আরও চারিপ্রকার লক্ষণ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণমুক্তি ব্যতীত এই সকল মুক্তির পক্ষপাতী নহেন; কারণ, তাহা কর্ম্ম দ্বারাই উপলব্ধ হইয়া থাকে ও তাহার ক্ষয় আছে, কিন্তু নির্ব্বাণমুক্তির কখনও ক্ষয়-ব্যয় নাই। এই নির্ব্বাণমুক্তিই পরম পুরুষার্থ! উহা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক জ্ঞানী মানুষের সবিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যজীবনে পূর্ণত্ব ও পরাশান্তি লাভ এই নির্ব্বাণমুক্তিতেই হইতে পারে, অন্য কোন প্রকারেই চরমশান্তি লাভ করা যায় না।

ঋষির দান

—*—

মহাভারত ব্যাস দেবের এক অতুলনীয় কীর্ত্তি, ভবিষ্য-বংশধরদের ভবিষ্যচ্চিন্তায় করুণা-বিগলিত হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব অবদান। প্রচলিত কথাতেও পাই—"যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে"। রাষ্ট্র নীতি, সমাজ-নীতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি যাহা চাহিবে, সবই এই মহাভারতের মধ্যে পাইবে। যা এই ভারতে নাই—তা আর ভারতের অর্থাৎ জগতের কোন গ্রন্থেই খুঁজিয়া পাইবে না। আজ রামায়ণ মহাভারতকে কবির অসম্ভব কল্পনা বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, সত্য বস্তুকে অনাদর করিয়া শুধু উপাখ্যান ভাগকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া পূর্ব্বোক্তির সমর্থন করা হইতেছে। আর আমরাও এমনি অন্ধ, এমনি পরবাক্যপ্রত্যয়ী যে, নিজেদের ঘরের খবর না লইয়া পরের মন্তব্যই সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতেছি, ঘরের খবর লইবার প্রবৃত্তিই আমাদের জন্মিতেছে না। তাই পরমুখাপেক্ষী হইয়া ভিক্ষার আশায় পরের দুয়ারে আমাদের দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছে, নিঃস্ব কাঙ্গাল রূপে আজ জগতের সম্মুখে আমরা প্রতিভাত হইতেছি। ভারতের ঋষি ভারতের অক্ষয় ভাণ্ডারে যে রত্ন স্তরে

স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, কোন দিন তাহার অনুসন্ধান করিলাম না, কোন দিন সে ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার প্রয়াসও পাইলাম না। আমরা এমনিই দুর্ভাগ্য!

আমরা শুধু রটনা করি—স্বার্থপর ব্রাহ্মণ আমাদের জন্য কিছু করে নাই, আমাদের জ্ঞান সঞ্চারের কোন পন্থাই উন্মুক্ত রাখে নাই। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি রচনা করিয়া সবই নিজেদের জন্য রাখিয়া দিয়াছে, স্ত্রী শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই, সাধারণের তাহাতে প্রবেশ নিষেধ!

কিন্তু কেন এই নিষেধ তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ হইতে বঞ্চিত করিয়া ভারতের ঋষি আমাদের জন্য কিছু সঞ্চিত রাখিয়াছেন কিনা তাহার সন্ধান আমরা লইয়াছি কি? প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগাবধি অধিকার ভেদ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুগেও দেখি এক বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে অপর বিষয় শিক্ষার অধিকার মিলে না, এক শ্রেণীর পাঠ্য আয়ত্ত না হইলে উর্দ্ধ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া যায় না। বহির্জ্জগতে কর্ম্ম বিভাগ লইয়া যেরূপ অধিকার ভেদ রহিয়াছে, সাধনজগতেও সেইরূপ অধিকার ভেদ বর্ত্তমান। বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বে পূর্ণ যে, তাহা অধিগত করা সাধারণ জড় বুদ্ধির সাধ্যাতীত। বেদ বেদান্ত উপনিষদে প্রবেশ করিতে হইলে, তত্তৎ শাস্ত্র প্রদর্শিত পন্থায় চলিতে হইলে চাই সত্ত্বগুণ সম্পন্ন দেহ-মন-প্রাণ, সূক্ষ্ম বিচারশীল অগ্র্য বুদ্ধি, দ্বন্দ্বাভিঘাতে অবিচলিত ধীর প্রশান্ত চিত্ত! অধিকারী না হইয়া শাস্ত্রে প্রবেশ বিফল। অধিকারী না হইয়া শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে গেলে অশুদ্ধ চিত্তে শাস্ত্রার্থ বিকৃত ভাবেই প্রকাশ পায়। তাই যাহাতে শাস্ত্রগুলি অনধিকারীর হাতে পড়িয়া বিকৃত ভাবাপন্ন না হয়, তার জন্যই প্রাচীন ঋষিদের এত অধিকার বিচার!

বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ হইতে সাধারণকে চিরতরে বঞ্চিত করা তো তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং অনধিকারী যাহাতে প্রকৃত অধিকার অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, সূক্ষ্ম শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য অতি সহজ সরল ভাষায় আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী ও শূদ্রগণ এই সমস্ত শাস্ত্রের অনুশীলনে ক্রমশঃ গভীর শাস্ত্রানুশীলনের অধিকারী হইতে পারিবে।

স্ত্রী-শূদ্র বলিতে সাধারণতঃ স্ত্রী জাতি ও শূদ্রবর্ণকে বুঝাইলেও তাহার একটা গভীর অর্থ সঙ্গোপিত রহিয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন—বেদে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। সে স্ত্রী ও শূদ্র কি? এখানে স্ত্রী বলিতে বুঝিতে হইবে যাহারা স্ত্রীভাবাপন্ন—আর শূদ্র বলিতে বুঝিতে হইবে যাহারা "শুচা দ্রবতে" অর্থাৎ শোকে দ্রবীভূত ও আচ্ছন্ন। নিজের পুরুষত্ব হারাইয়া, আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃতির কবলিত হওয়াই স্ত্রীত্ব, আর শোকে মোহে বিগলিত হইয়া তাহাদের অধীন হওয়াই শূদ্রত্ব। যাহারা প্রকৃতির কবলে কবলিত, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত, শোকে মোহে দ্রবীভূত, তাহারা কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণায় সমর্থ হয়? তাহারা কি কঠোর সাধনের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম মার্গে চলিতে সক্ষম হয়? তবে কেন বল ব্রাহ্মণ স্বার্থপর? তবে কেন বল ব্রাহ্মণেরা নিজেদের অধিকারে সমস্ত রাখিয়া, সাধারণকে সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন? বরং তাঁহারা যে বেদাদি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য পুরাণাকারে স্থূলে প্রকটিত করিয়া আপামর সাধারণের

জ্ঞান-সঞ্চয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের করুণাপ্লুত হৃদয়েরই নিদর্শন!

সমগ্র মহাভারতটাই দেখি কুরু পাণ্ডব যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়াই রচিত। কিন্তু ইহারই মধ্যে কথা প্রসঙ্গে যে কত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, কত পুরাণ-ইতিহাসের, কত প্রচীন-রীতি নীতির, ধর্ম্মের কত সুসূক্ষ্ম রূপের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও মহাভারতে যে সমস্ত মহাপুরুষের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাঁহাদের আদর্শ ধরিয়া চলিলে জীবনে কোন দিন অশান্তি বা হতাশা আসিতে পারে না। ক্ষুদ্র জীব আমরা, ক্ষুদ্র আঘাতেই বিচলিত হইয়া পড়ি, সামান্য দুঃখ কষ্টেই জর্জ্জরিত হইয়া জীবনধারণ বিড়ম্বনা মনে করি। কিন্তু আবাল্য রাজভোগে প্রতিপালিত হইয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যে দুঃখ কষ্টের হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, দুঃখের কঠোর পীড়নে পীড়িত হইয়াও তাঁহারা স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য যে হাসিমুখে সে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবনের বিষয়। তাঁহাদের দুঃখ কষ্টের তুলনায় আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা আর কতটুকু? অনেকে মনে করেন, সাধু গুরুর আশ্রয় লইলেই আর দুঃখ কষ্ট ত্রীসীমানায়ও পৌঁছিতে পারে না, নির্ব্বিবাদে বেশ সংসার-সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়। ইহা কিন্তু তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা। মহাভারতের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখি—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে পাইয়াও পাণ্ডবেরা ব্যবহারিক দুঃখ কষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সহায় রূপে বর্ত্তমান থাকাতে তাঁহারা সমস্ত দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়া সত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিয়া ছিলেন, আর তাহাদের এই অবিচলিত সত্য নিষ্ঠাই পরিশেষে তাঁহাদের শিরে বিজয় মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল। তেমনি সাধু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাংসারিক দুঃখের বোঝা না কমিলেও সে সমস্ত সহিবার শক্তি সঞ্চিত হইবে, সুখ-দুঃখ, ভাল মন্দ সবই তাঁর দান বলিয়া শির পাতিয়া গ্রহণ করিবার ভক্তির উদয় হইবে; আর পরিশেষে এই স্বধর্ম্ম নিষ্ঠাই মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। মহাভারত হইতে আমরা যে এই শিক্ষাটুকু পাই, ইহার তুলনা কোথায়?

এমনি ভাবে মহাভারতে লোক শিক্ষার জন্য যে কত চরিত্রের—কত আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে, সহজ সরল ভাবে ধর্ম্মের কত তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সমস্তের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কলিমল কলুষিত ভবিষ্যৎ-বংশধরদের ভাবি-পরিণামে বিগলিত চিত্ত ভারতের ঋষি তাহাদের জন্য যে কি অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই একটা দিগ্ দর্শন মাত্র এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মহাভারত যে শুধু কয়েকটী আখ্যায়িকার সমাবেশ তাহা নহে, মহাভারতে যে শুধু স্থূল ভাবে ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাও নহে। যে গীতা-শাস্ত্রের আজ এত আদর, যে গীতা-শাস্ত্র আজ নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে, সে গীতা-শাস্ত্র এই মহাভারতেরই একটী উজ্জ্বল অংশ বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সপ্ত শত শ্লোকে নিবদ্ধ অষ্টাদশাধ্যায়িনী এই গীতাকে মহাভারতের মধ্যে প্রচার করিয়া সাধারণের যে উপকার সাধন করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। বেদ-বেদান্ত উপনিষদের জটিলতার মধ্যে না পড়িয়া সহজ-সরলভাবে যাহাতে সর্ব্বসাধারণ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ অবগত হইতে পারে, তাহার জন্যই এই গীতার অবতারণা। গীতামাহাত্ম্যে পাই—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা, দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সমস্ত উপনিষদ্ ধেনুস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার দোহন-কর্ত্তা, পার্থ বৎস, সুধীব্যক্তি ভোক্তা এবং গীতারূপ অমৃতই তাহার দুগ্ধ। অন্য কোনরূপ শাস্ত্র না পড়িয়া যদি কেহ শুধু এই গীতার অনুশীলন ও অনুবর্ত্তন করে, তাহা হইলে সে ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবে। আর গীতার উপদেশের তুলনা নাই; কারণ অপরাপর শাস্ত্র যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নানা মতের—নানা পথের আবিষ্কার করিয়াছেন, গীতাশাস্ত্র তাঁহারই শ্রীমুখ-নিঃসৃত। তত্ত্বাজ্ঞান বিজৃম্ভিত শোক-মোহ বিভ্রংশিত-বিবেক, নিজধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্মাভিসন্ধিপর অর্জ্জুনকে, পরমকারুণিক ভগবান্ দেবকীনন্দন এই তত্ত্বোপদেশ দ্বারাই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ গুলিই সপ্তশত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া মহাভারতের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। এই উপদেশের অধিকাংশই শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত শ্লোকেরই পূর্ণ অভিব্যক্তি, মাঝে মাঝে কয়েকটি মাত্র শ্লোক শ্রীভগবানের উপদেশের আভাস লইয়া ব্যাসদেব স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর টীকায় পাই—"তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণ দ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোক শতৈরুপনিবদ্ধ। তত্রচ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখ নিঃসৃতানেব শ্লোকান্ অলিখৎ। কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ং ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতা মাহাত্ম্যে—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥"

স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত উপদেশের কি তুলনা আছে? গীতার উপদেশের মত এত ব্যাপক উপদেশ আর কোথাও পাই না। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির এমন সামঞ্জস্য আর কোন শাস্ত্রে নাই। যখনই তোমার চিত্ত সংসার-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা আসিয়া তোমাকে কর্ত্তব্য বিমুখ করিতে চাহিবে, তখন গীতার শরণ লইও; শোক মোহ দূর হইয়া যাইবে, হৃদয়ে অপরিসীম বল পাইবে। শোক-মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীত হইলেও গীতা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। এই গীতার উপদেশের মধ্য দিয়া শ্রীভগবান্ আজিও আমাদের সত্যপথে পরিচালিত করিতেছেন।

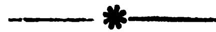
যখনই আমাদের চিত্ত দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যখনই আমরা পথের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত-কাতর হইয়া পড়ি, তখন যদি একবার গীতার সেই বজ্রনির্ঘোষ বাণী স্মরণ করি—

"ক্লৈব্যংমাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

তাহা হইলে কি আর আমাদের হৃদয়ে দুর্ব্বলতা স্থান পায়? তাহা হইলে কি আর আমরা দুঃখ-কষ্টে কাতর হইয়া পড়ি? তখন যেন আমরা নব-বলে বলীয়ান্ হইয়া যাই, অদম্য উৎসাহ হৃদয় অধিকার করে। এ হেন গীতাশাস্ত্র যাহার অঙ্গ অলঙ্কৃত করিতেছে, সে মহাভারত কি উপেক্ষার বস্তু? আমরা অন্ধ, তাই আমাদের শাস্ত্র-ভাণ্ডারে এমন অমূল্য সম্পদ্ থাকিতে আমরা অধিকার বিচার লইয়া মারা মারি কাটা কাটি করি, এমন অমূল্য শাস্ত্রে প্রবেশ করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া শুধু জটলা করিয়া মরি।

স্কুলে পঠিত—"রামায়ণ মহাভারত কবির কল্পিত অতি রঞ্জিত উপাখ্যান মাত্র"—এ ভ্রান্ত ধারণা আজ দূর করিয়া দিতে হইবে। চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে—মহা-

ভারত কবির কল্পনা নয়, তাহা বাস্তব; তাহাতে অবান্তর কোন বিষয়ের আলোচনা হয় নাই, সবই প্রয়োজনীয়। জ্যোতিষ, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি, শাস্ত্রনীতি, সমাজনীতি, দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার প্রভৃতি যাহা চাহিবে, সবই এই বিরাট গ্রন্থে পাইবে। জগতের কোন স্থানে কোন কালে কোন ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এমন সর্ব্ব-বিষয়-সমালোচিত গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই। অন্য সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া এই মহাভারতের শরণ গ্রহণ কর, অতুল জ্ঞানের অধিকারী হইবে; তোমার জানিবার কিছু থাকিবে না, বুঝিবার কিছু থাকিবে না। এই মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিবে কত অমূল্য রত্ন ইহার স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, কত গভীর জ্ঞানের কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ঋষিদের এই অতুল কীর্ত্তি দেখিয়া তখন তোমার ভক্তি-বিনম্র চিত্ত আপনি তাঁহাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িবে, তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ও অপরিসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া তোমার দেহ মন পুলক-কম্পিত হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে"—এ প্রবাদ বাক্যের যথার্থতঃ কোন সার্থকতা আছে কিনা!



আত্ম-হিত

যে পথেই চল না কেন, একটা প্রচণ্ড তেজ আপনার বুকে থাকা চাই। কি সংসারের পথে কি আধ্যাত্মিক পথে, নিজের প্রাণে জোর না থাক্‌লে কিছুতেই সব সময়ের জন্য জগতে এমন কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে পাবে না যে, সেই সহায়ে আপনাকে বলীয়ান্ করবে। যারা আস্‌বে তারা শুধু পথের বন্ধু, শেষ গন্তব্য পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকার মত সঙ্গী এজগতে পাওয়া যায় না বললেও চলে। কাজেই ওঠো বীর, আপনার অন্তরস্থ পার্থ-সারথিকে একমাত্র জীবনে মরণে সম্পূর্ণ সহায় ক'রে ছুটে চল জীবন-সংগ্রামে। বল, চাই জয়—"অথবা জীবন সঁপে দিব আজ মরণ মহোৎসবে। ক্ষয় ক্ষতি লাভ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে॥"

অতীতের পরাজয় কাহিনী স্মরণ পূর্ব্বক জীবনের অন্তরন্তঃ ব্যর্থতার কান্নায় জয়ের আশা নাই; তাতে পরাজয়ের সহায়ক দুর্ব্বলতা আরও বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। তোমার অনন্ত জীবনের কতটুকুই বা তোমার করায়ত্ত ছিল যে, তার অপচয়ে আজ কেঁদে বুক ভাসাতে বসেছ? যে গেছে, সে গেছে; তার চেয়ে অনন্ত গুণ বিস্তৃত তোমার বিপুল জীবন প'ড়ে আছে ওই ভবিষ্যতের জন্য। বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র জীবনটুকু শুধু তার মাঝে তোমার পরীক্ষা ক্ষেত্র রূপে চোখের সাম্‌নে এসেছে, আপন শক্তি সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে তার মাঝ হতে যে-টুকু জয় করতে পারবে, লাভের ফসল রূপে আজ তাই না হয় জমা থাকল। কিন্তু এখানেই তো জীবন ফুরিয়ে গেল না! মৃত্যুকে চোখের সাম্‌নে

পাহারা রেখে যদি যুদ্ধে জয়ই এল, বিজয়ের মহোল্লাসে রক্ত তেতে উঠে যদি মরণকে তুচ্ছ করতেই না শিখল, তবে সে দুর্ব্বলের জীবনে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" বাণীতে কাজ নাই। বরং তার চেয়ে জয়ের বিদ্যাকে, জয়ের অর্থকে মহান করে বল—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" সত্যিই প্রাজ্ঞব্যক্তি সাফল্যের আশাকে অমর করে রাখেন বলেই শেষ-জয়ে তিনি জয়ী হন।

মানুষের প্রাণে আশা-নিরাশার বিদ্যুদন্ধকার মিশ্রিত হয়ে রয়েছে; কিন্তু অন্ধকারের বিরাট আচ্ছাদন তখনই প্রগাঢ় হয়, যখন আশার বিজলী ক্ষণেকের তরে দেখা দিয়ে চিরতরে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবনে তা হয় না। জীবনের দুর্য্যোগ অন্ধকারের সাথে সাথে শ্রীভগবানের অপার করুণার দান আশার বিদ্যুৎও ঘন ঘন দেখা যায়। তাই সে আলোকে, সেই বিজন আঁধারের একলা পথিক পথ চিনে আপন গন্তব্য স্থানে যেতে সমর্থ হয়। তাই লোকে বলে, "যেখানে যত মুস্কিল সেখানেই তত আসান।" "There is the means where is difficulty." শক্তির উৎসও এই difficultyর মধ্যেই। কাজেই আশা-নিরাশার আলোক অন্ধকার মিশ্রিত হয়ে থাকলেও আশার কাছে নিরাশা বা আলোর কাছে অন্ধকার চিরদিনই হার মেনে আসছে ও আসবে। আর অন্ধকারের বুক চিরেই—সমস্যার জটিলতা হতেই আলোর উদ্ভব এবং সংশয়ের নিরসন চিরকাল হয়ে আসছে।

বাইরের মানুষ চায় সুখে অমৃত ভোগ করতে। কিন্তু সমুদ্র মন্থনে তোমার যে বিরাট প্রচেষ্টা, তার ভাগ নিতে কেউ চাইবে না। আবার অমৃত তুলেছ বলেই যে তোমার গরলের কথা সবাই ভুলে যাবে বা তার ভাগ নিতে আসবে তা ভেবো না। বরং সে সময়ে সেই একমাত্র মঙ্গলময়, অন্তর-বাহিরের একমাত্র ভরসাস্থল পরম-শিবই এসে সে গরলপানে নিজে নীলকণ্ঠ সেজে তোমাকে মরণের বা দুঃখের হাত থেকে নিস্তার করতে সমর্থ। কাজেই যদি স্তবে তুষ্ট করতে হয়, তবে সেই অন্তর্য্যামীকেই কর—বাহিরের ভূতকে করে কি হবে? এসব ভূত পিশাচের যিনি অধীশ্বর, সেই অন্তর দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে সবাই তুষ্ট থাকবে। আর তাঁকে ছেড়ে যতই ভূতের মন জুগিয়ে চল না কেন, সুযোগ পেলে কেউ রেহাই দেবে না।

কিন্তু মানুষের আবার জীবন-পথে শুধু অন্তর্য্যামীকে নিয়েই সংসার করা চলে না। অন্তরে তিনি হাল ধরে থাকলেও বাহিরে জীবন-তরী নানা দেশে, নানা উপকূলে বিভিন্ন স্বভাবের নানা প্রাণীর মধ্যে বিচিত্র অবহাওয়ার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। সুনিপুণ মাঝি থাকলেই সে সবার মাঝ দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে যাওয়া যায়। নতুবা কেবল আপন জোরে বিশ্বকে সহায় করে চললেও বিপদের হাতে নিস্তার পাওয়া যায় না। কাজেই শত সহায় এসে হাজির হলেও, সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্যগগনে বিরাজিত দেখেও আপনাকে ভাবতে হবে একক; সর্ব্বসম্পর্ক-রহিত কেবল একক। সেই মহা শূন্যের মাঝে একক হয়েও যে দিন প্রাণে ভয় থাকবে না—শান্তির বা আনন্দের প্রবহমান ধারাটী অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে, সে দিনই খাঁটী জিনিষ মিলবে।

আপন সত্তাকে বিশ্বময় প্রসারিত করে আপনার মাঝে সব কিছুর সম্ভাব্যতা সব সময়ে সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের প্রাণে সবার প্রাণ অনুভব করার মত উদার ভাবনা বহু উচ্চস্তরের কথা।

নিম্নাধিকারীকে সেই মহান্ ভাবের মহিমা শোনালে তার চিত্ত হয়ত ক্ষণিক-আবেগে স্পন্দিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তবের কঠিন নিষ্পেষণে তার সেই অশুদ্ধ চিত্ত আবার ক্ষণপরেই নিজের মাঝে গুটিয়ে আসবে। প্রথমেই বিশ্বপ্রেম হলে আত্মপ্রেমের অভাবে শীঘ্রই তার আবার বিশ্বদ্রোহের কারণরূপে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। কাজেই যতক্ষণ নিরাশায় দুঃখ-দৈন্য বা অভাবের নিষ্পেষণে অন্তর নিস্তেজ হয়ে পড়ে, ততক্ষণ তাকে যোগ্য প্রতিকার না দেখিয়ে অত্যুচ্চ ভাবের শিখরে তুলে কোন লাভ নাই। তাই বেদান্তের ভাস্বর-বাণী শোনাবার আগে চিত্তশুদ্ধির সাধন স্বরূপ সাংখ্যের নির্লিপ্ত হওয়ার—'কেবল' হওয়ার জন্য বিবেকখ্যাতির প্রয়োজন। বিশ্বপ্রেমের চরম আদর্শ বেদান্তকে যাঁরা জীবনের লক্ষ্য করবেন, বর্ত্তমান যুগে সাংখ্যের সাধনাই তাঁদের প্রথম চিত্তশুদ্ধির উপায়। নতুবা বৈদিক-যুগের মত স্বাভাবিক বিশ্বময় প্রাণের অভাবে সাধকের "সোঽহং" বলতে শেষে উল্টো পথে গিয়ে 'দেহসারসর্ব্বস্ব' হওয়া বিচিত্র নয়। অনেক বৈদান্তিকই দেহাত্মবাদী হয়ে পড়েন।

কাজেই সবচেয়ে আগে চাই আত্ম-হিত; বিশ্বহিত পরের কথা। আপনার প্রাণে অভাবের আগুণ ধিকি ধিকি জলছে, আর দিন দিন অন্তর পুড়ে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, অথচ মুখে বেদান্তের বা বিশ্বপ্রেমের লম্বা কথা! এই লম্বা কথা যাঁরা মুখে বলে জীবনে তা কাজেও দেখিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সেই সমস্ত কাহিনী আমাদের মনে থাকে না অর্থাৎ নিজের জীবনে সে সব প্রত্যক্ষ করতে চাই না, কিন্তু মুখে (পরকে উপদেশ দিবার ছলে) উপদেশগুলি আওড়ানো চাই। জীবনের সত্যিকার অবস্থার যোগ্য ব্যবস্থা না করে বড় বড় বচন দেওয়ার জন্যই সমগ্র ভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক-বাণী আজ জগতের কাছে শুধু কথার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যান্য দেশের মত জীবন দিয়ে বাণীকে মূর্ত্ত করে তুলবার লোক এ দেশে খুব কমই মিলে। আগে চাই এই শ্রেণীর লোক—যারা সর্ব্বস্ব পণ করে সত্যবাণী বস্তুজীবনে মূর্ত্ত করতে পারে। সেজন্য সাধনা চাই। সেই সাধনাই আত্মগঠন। প্রথমে আত্মগঠন,—তার পর বড় ভাব, বড় চিন্তা। অসংযত ভাবের আবেগে প্রবাহিত চঞ্চল মনে কিছুই 'চিরস্থায়ী' হয় না। তাই প্রত্যক্ষ এমন অনেক ভাবুক দেখা গিয়েছে, যাঁরা সাময়িক ভাবে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে একটা বড় কাজ হঠাৎ করে ফেললেও দৈনিক জীবনের সামান্য কর্ত্তব্যগুলিও সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়েন। এমনি ভাবে আকস্মিক বড়লোক কাগজে কলমে বড় বলে ঘোষিত হলেও বস্তুজগতে অনেকের প্রাণেই অশ্রদ্ধার কারণ হয়ে থাকেন। কাজেই আগে বড় বলে প্রচারিত হওয়া নয়, আগে চাই আত্মগঠন—আত্মহিত।

বিশ্বপ্রেমের ভাবের ঘোরে আপনার প্রকৃত অবস্থা (Real position) ভুলে গিয়ে হয়ত অনেকে আত্মগঠন বা আত্মহিতের কথায় কাহারো বচন তুলে বসবে—"আপনারে লয়ে বিব্রত থাকিতে আসি নাই কেহ অবনীপরে—ইত্যাদি।" অথবা বিশ্বহিতের অছিলায় আপনার অকর্ম্মণ্য জীবনকে দু'দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করে বড়াই করবে যে, পরের জন্য খাটতে পারলেই আত্মগঠন বা আত্মহিত হয়। কিন্তু চোখের সামনেই এমন অনেক ব্যাপার দেখা যায় যে, শুধু কতকগুলি অসংযত, অসহিষ্ণু চিত্তের একগুঁয়েমীতে বড় বড় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এক কথায় বিবেকানন্দ এ সমস্তের উত্তর দিয়েছিলেন যে—"চালাকী দ্বারা কখনও বৃহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না।" পরের কাজ করতে হলেও সে কাজ উদ্ধারের জন্য যদি নিজকে

যোগ্য করা না হয়, তবে তার পক্ষে আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকাই উচিত; কেননা তাতে শুধু সে-ই বিব্রত থাকবে, পরের কাজ পণ্ড করে পরকে আর বিব্রত করা হবে না। অবনীপরে এসে আপনাকে লয়ে বিব্রত হয়ে থাকাও যেমন অভিপ্রেত নয়, তেমনি নিজকে যোগ্য না করে পরের কাজে নামাও অভিপ্রেত নয়। মোট কথা পরের কাজ করতে হলেও যেমন আত্মগঠন প্রয়োজন, তেমনি আত্মহিতে যিনি সত্যই নিযুক্ত হন, তিনি শেষে পরহিতে আপনা হতেই নিযুক্ত হন। উপরোক্ত বাণীসমূহের অর্থ তখনই সুস্পষ্ট হয়।

আত্মহিত বলতে যার যেমন জীবনের লক্ষ্য শুধু সেই দিকে নিজকে চালালেই হবে না,—যথার্থ কল্যাণ তাতে হবে কিনা সে বিচার চাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিষ্পেষণে হয়ত এমন একটা জিনিষের অভাব জাগে যে, সেটা হলেই সেই পরিস্থিতির মধ্যে যোগ্য হয়ে থাকা যায়। তাই তেমন জিনিষ লাভই অনেকের জীবনের তখন আদর্শ হয়। এই হিসাবে বিভিন্ন মানুষের জীবনের লক্ষ্যও বিভিন্ন। সাংসারিক ব্যক্তিদিগের প্রায়ই যশ ও অর্থ কাম্য হয়। কিন্তু এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে অভাবজনিত যে সমস্ত আদর্শ, সে সব বাদ দিলে মানুষের এমন একটা অভাব দেখা যায় যে—যশ, অর্থ, ভোগ, পরিজন প্রভৃতি কিছুতেই সেই অভাব পূরণ করতে পারে না। এই জাতীয় অভাব জগতের সব চেয়ে সুখীর মাঝেও দেখা যায়। বুদ্ধদেবের এই অভাব জেগেছিল। এই হল সত্যের অভাব, যথার্থ শান্তির পিপাসা। আত্মার বা নিজের যথার্থ হিত হয় এই অভাব পূরণেই। বাইরের জগতে যে সব আত্মহিত আমরা বুঝে থাকি, সাধারণতঃ তাতে আমাদের বাইরের সামাজিক-জীবন বা পারিবারিক-জীবনের হিত হয় বটে, কিন্তু তাতেই যথার্থ আত্মহিত হয় না। আত্মহিত বলতে আত্মার বা নিজের যথার্থ সুখ বা শাশ্বত আনন্দ লাভ। সাংসারিক অভাবের প্রতিবিধানে অক্ষম হওয়াতে অনেকের মনে এই জাতীয় অভাব বা সত্যের পিপাসা জাগতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তা প্রায়ই অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়; তাই আমরা বলি "শ্মশান-বৈরাগ্য।" কিন্তু এই বৈরাগ্যকেই উপলক্ষ্য ধরে যদি মহাবৈরাগ্য এসে সংসারবন্ধন ছিন্ন করতে পারে, তবে তাই হবে খাঁটী বৈরাগ্য। অবশ্য শুধু সংসার ত্যাগ করলেই হয় না, এর পরেও সাধনা বাকী থাকে এবং এই বৈরাগ্যকে শাস্ত্রানুমোদিত দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়ক বশীকার বৈরাগ্যও সব সময়ে বলা যায় না। এ বৈরাগ্যের শুধু সংসারবৈরাগ্য আখ্যা দেওয়া যায়।

আপনার জন্য জগতের যে কোনও ভোগের আয়োজনে মানুষ যেমন পাগল হতে পারে, যথার্থ আত্মহিতের জন্যও তেমনি উদগ্র চেষ্টা চাই। নিজের জন্য কত কিছু জুটিয়েও মানুষ তৃপ্তি পায় না, আবার সব ত্যাগ করেও মানুষ মহা তৃপ্তিতে থাকতে পারে। আত্মহিত অর্থে শাশ্বত তৃপ্তি বলা যায়। সব ত্যাগ করে যে তৃপ্তি, তা আর হারাবার ভয় থাকে না, তাই তাকে শাশ্বত তৃপ্তি বলা যায়। আর বিষয়-ভোগে যে তৃপ্তি তা বিষয় যখন থাকবে না, তখন তৃপ্তিও থাকবে না, সুতরাং সে তৃপ্তি ক্ষণিক। সে তৃপ্তি যথার্থভাবে আত্মার হিত করতে পারে না। আপেক্ষিক তুলনায় জগতের অনেক বস্তুই আমাদের ক্ষণিক উদ্দেশ্যের হিতকারী, কিন্তু চরম হিত বা সর্ব্ব মঙ্গল যাতে হবে তা কখনও ভঙ্গুর বিষয়ে এনে দিতে পারে না। তবু যে মানুষ বিষয় চায়, সে শুধু ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ক্ষণিকতৃপ্তির

জন্য যে পরিশ্রম মানুষ করে, তাতে তার প্রাপ্য হয় প্রথমে ক্ষণিক সুখ, তারপর মহা জ্বালা। এ যেন জ্বররোগীর তেঁতুল খাওয়া। অপরে বল্লে আর কি হবে—রোগী নিজেই জানে তার পরিণাম, তবু সে নিবৃত্ত হতে পারে না। চিত্তের এই দুর্ব্বলতার সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করে, অভ্যাস বা বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তের অধোগামী ভাবকে দূর কর্‌তে হবে। ভোগের পরিণাম জেনেও যেমন মানুষ নিজকে তাতে ডুবিয়ে দেয়, আশেপাশে যে থাকে, তাকেও তেমনি সেই পঙ্কে টেনে আনে। ভোগের এমনি আকর্ষণ চারপাশে অহরহ টান্‌তে থাক্‌লে ক'জন তার মাঝে স্থির থাক্‌তে পারে?

তাই বল্‌ছিলাম, এ জগতে বন্ধু কেউ নাই, সহায়ক কেউ নাই, টেনে তুল্‌বার কেউ নাই। আছ তোমার কেবল তুমি, আর অন্তরে তোমার অন্তর্যামী। বৈরাগ্য যদি খাঁটী হয়ে এসে ভিতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবেই এই পিচ্ছিল পথে রক্ষা, নতুবা সাময়িক ভাবে সংসার-বৈরাগ্যে পরিবার-পরিজন ত্যাগ করেও নিস্তার নাই। কারণ, তাদের নাহয় ত্যাগ কর্‌লে, কিন্তু তোমার মন যাচ্ছে যে সঙ্গে সঙ্গে! দুদিনের বৈরাগ্য ঘুচে গিয়ে যদি পরিবার পরিজন হতে দূরে ব'সে বিন্দুমাত্র ভোগের বীজ দেখা দেয়, যাদের ছেড়ে আস্‌তে বাহবা পেয়েছিলে, শুধু ভোগের কামনায় তাদের জন্য আকুলতা আসে তবে তখন সে ত্যাগ হবে গলার ফাঁসী—অন্তর্বিদ্রোহের সে দাবানল শুধু তোমাকে পুড়িয়েই ছাড়্‌বেনা—পরিস্থিতির শান্ত শান্তিময় ভাবকেও ক্রমশঃ গ্রাস কর্‌তে চাইবে। এমন অবস্থায়ও যদি কেউ সাধুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তবে তার উচিত পরকে বিব্রত না করা, সে আগুণ বুকে করে নিজে সরে পড়া। পারিপার্শ্বিককে ভূতের মতন জ্বালাতন না করাই শ্রেয়ঃ। আপন বিষ আপনাতে থাক্—বিশ্বময় সে বিষ-নিঃশ্বাস যাতে ব্যাপ্ত না হয়, তা করাই সঙ্গত। অপরকে না পুড়িয়ে আপনি আগুনে আপনি পুড়্‌তে চাইলে তবু ভগবান্ সে অভাগার সহায় হন, কিন্তু পরকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালার সান্ত্বনা নাই কোথাও। শ্মশান-বৈরাগ্যের পরিণাম এমান রাবণের চিতা হয়ে অহর্নিশ জ্বল্‌তে খুবই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আত্মান্বেষীর বিচারশক্তি তীক্ষ্ণ হওয়া চাই। সুতীক্ষ্ণ বিচারশক্তি বলে আপনাকে চিরে চিরে প্রতিমুহূর্ত্ত খানা তল্লাস করা চাই। কোথাও একটু চোরাই ভাব না থাকে। হয়ত সেজন্যে সবার মাঝে মান বজায় রাখা চল্‌বে না—আপন অন্তরের দুর্ব্বলতাকে বাইরে চেপে গিয়ে যারা পরের দুর্ব্বলতার সুযোগ পেয়ে পর-নিন্দায় মুখর হয়, তাদের সে নিষ্ঠুরতার হাত থেকে নিজকে বাঁচাতে পার্‌বে না, কিন্তু তবু তোমার সান্ত্বনা থাক্‌বে যে তুমি সত্যান্বেষী। সত্যের অন্বেষণে নেমেছ বলেই এখনই সত্য-স্বরূপ হতে পার নাই;—কত হীনতা, কত দুর্ব্বলতা মনের মাঝে রয়ে গিয়েছে হয়ত—আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও হঠাৎ মাঝে মাঝে কি এক দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তে তারা মাথা উঁচু করে বসে আর তোমাকে লজ্জা দেয়; কিন্তু জেনো, তোমার যথার্থ সাধু প্রচেষ্টা এমন ভাবে লজ্জিত হলেও আর যদি কেউ যথার্থ সত্যান্বেষী থেকে থাকে, তবে সে তোমার দরদ আপন হৃদয় দিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে। এ জগতে জন্মলাভ করেই সবাই সাধু হয় না, হয়ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কত হীন ভাবের পর এ জন্মে সাধু হওয়ার ভাব, যথার্থ আত্মহিতের চিন্তা জেগেছে। আর অমনি যদি সাধু হতে না পার্‌লে, তাতে লজ্জা কি? যথার্থ সাধু হওয়ার প্রচেষ্টাও যে এ জগতে দুর্ল্লভ! তুমি সাধু হতে চলেছ বলে যারা তোমার দুর্ব্বলতাগুলি ঢক্কানিনাদে বিশ্বময়

রাষ্ট্র করে, তারা ভাবে না যে, তুমি সাধু হতে চাইলেও আসলে তুমিও তাদের মতই মানুষ—আজন্ম চীজ নও! তাদের নিষ্ঠুরতার দোষ দিও না; কারণ, ওরা যে নিজের দিকে চোখই ফিরায় না। তাই ওরা জানে না যে নিজেরা কি করছে! কিন্তু ওদের ঢক্কানিনাদে তোমার উপকারই হবে, তুমি আরও সাবধান হবে।

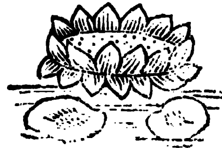
জগতে পরের হিত করার ইচ্ছাটা মানুষের মনে মূলে থাক্ বা না থাক্, বাইরে তা দেখাবার ভাব হয়ত অনেকের মাঝেই দেখ্‌বে। কিন্তু তাদের মাঝে আসল দরদী তোমার যে হবে, তার পরিচয় নিজের প্রাণেই পাবে। কিন্তু সাবধান! দরদী বা নিন্দুক কারও ব্যবহার যেন তোমার একান্ত চিন্তার বিষয় না হয়। যখন সবাইকে ত্যাগ করে আত্মনির্ভরের পথে চলেছ, তখন শান্ত মৌন হাসিতে আপনপর সবাইকে অভিনন্দিত করে তোমার পথে তুমি এগিয়ে যাও, সহায় হবেন সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার অন্তর-দেবতা। ওই যে পরম বন্ধুর বেশে অন্ততঃ দুটী মিষ্ট কথাও সে তোমার জন্য বলে গেল, তার মাঝেও যে সেই তোমার অন্তর্যামী ওই প্রেরণা দিয়েছেন, পরম শত্রু—তোমার অযথা নিন্দুকের মাঝেও তো তিনিই শক্তি দিচ্ছেন; কাজেই রাগ কর্‌বেই বা কার ওপর, ভালবাস্‌বেই বা কাকে? ভাল মন্দ যত দোষ, সবই সেই নন্দ ঘোষ! সে যে এমনি করেই তার লীলার আনন্দ ঘোষণা করে! কাজেই খুব করে অভিমান কর শুধু তার উপর; তাতে কোনও দোষ নাই। কেননা, যতই তার উপর রাগ করে থাকো, তাঁকে তুমি ছাড়তে পারবে না—তিনি তো ছাড়বেনই না! তাঁর সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ জড়িত রয়েছে বলেই এই জগৎ জুড়ে এত বিচিত্র ভাবের লীলা জমেছে। এমনটী না হলে, অর্থাৎ তাঁকে যদি বাদ দিয়েই চলা যেত, তবে এই মান-অভিমান সাধারণ প্রাকৃত অভিমানের মতই কুফল প্রসব করত। কাজেই যত রাগ দুঃখ সব তাঁকে নিয়ে হোক্।

দেহ যখন ধারণ করতে হচ্ছে, তখন যেখানেই থাক না কেন, যে কোন প্রকারে হোক্ সংসার পাতা হচ্ছেই। তবে পরিবার প্রতিপালন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ হয়ত তাদের মাঝে আসক্ত হয়ে পড়ে, আর গৃহত্যাগীর হয়ত তেমন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু মন যার বশ, তারও যেমন যথারণ্যং তথা গৃহং, মন যার বশ নয়, তারও তেমনি যথারণ্যং তথা গৃহম্। অর্থাৎ মন বশে থাক্‌লে ঘরে বসেও অরণ্যের সাধনাকে বশ করতে পারে, আর মন বশ কর্‌তে না পার্‌লে অরণ্যে গিয়েও প্রবৃত্তি বশে অধঃপাতের চরমে যেতে পারে। অরণ্যবাসী হলেই যদি ঋষি হওয়া যায়, তবে বনের গো মহিষ থেকে আরম্ভ করে হিংস্র জীব জন্তু প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই ঋষিপদবাচ্য। আবার গৃহে থাক্‌লেই যদি যথার্থ ধর্ম্ম পালন হয়, তবে গৃহপালিত বিড়াল, কুকুর হতে আরম্ভ করে চোর বদমায়েস্ সবাই মহাধার্ম্মিক। আসল কথা হচ্ছে এই যে, চিত্তের গতি ও লক্ষ্য অনুযায়ী যে যেমন পারিপার্শ্বিক ভাল বিবেচনা কর্‌বে, সে তাই বেছে নিয়ে থাক্। কবির ভাষায় বল্‌তে হয়—"দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান। খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান॥" তাতে সে অরণ্যই হোক্ আর রাজপ্রাসাদই হোক্। অরণ্যেও চিত্তের গতি অনুযায়ী কামনার ইন্ধন যোগাতে পারে। বরং সমাজের দুর্ভেদ্য শাসনের অভাবে অরণ্যে সে সুযোগ বেশী হয়; তাই যত সব চোর ডাকাত তারাও আড্ডা নেয় জঙ্গলে! তবে জগতের প্রলোভন দূরে রাখার অভ্যাসের পক্ষে বন কিছু

সহায়ক বটে। কিন্তু যোগ্য গুরুর খরদৃষ্টির অভাবে বিপদ্ সেখানেও কম নয়।

যে সাংসারিক ভোগোপকরণ দূরে ঠেলে যথার্থ আত্মহিতকারী প্রথমে সাধনা সুরু করে, সাধনার শেষে সেই সব দুষ্প্রাপ্য ভোগোপকরণ সাধকের কাছে আপনি এসে তখন হাজির হয়। যার সাধনার শেষ হয়ে গেছে, সিদ্ধ ভূমিতে যে পৌঁছেছে, সেই-ই তখন সে সব উপকরণ যথেচ্ছ ভোগ করেও স্থির থাকতে পারে। কিন্তু যার তেমন অবস্থা লাভ হয় নাই, তার পক্ষে মাঝ পথের এই ভোগোপকরণ, যতটুকু সে উর্দ্ধে উঠেছিল, তার চেয়েও তাকে বেশী নীচের দিকে ঠেলে নেয়। তাই যে যত উচ্চে উঠে, পতন-জনিত ভয়ের সম্ভাবনাও তার পক্ষে তত বেশী। এ পতন বাইরে থেকে প্রথমে মানুষ ধরতে পারে না, তাই বিধির অনুকম্পা-বশতঃ লোক লোচনের গোচরীভূত হতে না হতেই যে সাবধান হয়, তার বরং রক্ষা থাকে; নতুবা পরিণামে সে পতন সাধককে চুরমার করে দিয়ে যায়, তাকে সাধারণ মানুষেরও অধম করে তুলে।

কিন্তু পতন বা উত্থানে জীবনের যে কোনও সময়েই মানুষ নূতন করে জীবনের প্রভাতকে বরণ করতে পারে। মরণের দুদিন বাকী বলে কোন অবস্থাতেই তোমার হাল ছাড়ার অধিকার নাই—শুধু অনুশোচনায় কাল কাটাবার সময় নাই। ধরণীর অন্তরস্থ গভীর তলদেশে স্থিতি হলেও সেখান হতে জ্বলে ওঠ—আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়ে বিশ্বের বুকে বজ্রনির্ঘোষে ছড়িয়ে পড়। যত ময়লা মাটী সে অগ্ন্যুদ্গীরণে রসাতলে ডুবে যাক্—নূতন সৃষ্টির নূতন জীবনে আবার নূতন প্রভাতের নব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হোক্। কে তুমি কৃপণের মত শুধু কেবল হারানো দিন গুলি গুণে গুণে হয়রাণ হচ্ছ—আর আপনাকে তিলে তিলে পিষে মারছ? হবে না ওতে কিছু! শুধু কেঁদে কিছু ফিরাতে পারবে না। দশ জনের হিসাব ছেড়ে দাও;—ভাব, তোমার জগতে, তোমার জীবনে একা তুমি বিশ্বের সমস্ত শক্তির আধার হয়ে রয়েছ—আজ হতে তুমি যা ভাববে তাই হবে। ওঁ।



ঝুলনে

—*—

আজি ভাদ্রের ভরা বাদরে—
কেগো তুমি ভুলে, চিত্তের কূলে
সোণার তরীটী বাঁধরে।
কেগো তুমি কম শান্ত মনোরম
আপনার হতে আপনার সম
নীরব নিথর এ হৃদি-দুয়ারে
সাধের বাঁশীটী সাধরে ॥

আমিতো ডাকিনি কারে—
আপনার মনে অতি সঙ্গোপনে
আছিনু গভীর আঁধারে।
ভাবিনি কখন আছে হেন জন
যে মোরে করিয়া লইবে আপন,
এ চির সঞ্চিত ভ্রান্ত ধারণা
পাইল যে আজি বাধারে॥

যেদিন আসিল নামি—
অমানিশা ঘোর অন্তরে মোর
মনো বীণা গেল থামি।
সেদিন হইতে রুদ্ধ দুয়ারে
অতি নিরজন এ হৃদয়-পুরে
রয়েছি পড়িয়া ছিন্ন হইয়া
জগৎ হইতে আমি॥

সহসা আজি যে দেখি—
দীর্ঘ দিনের বন্ধ দুয়ার
আপনি মেলিল একি?
চির পুঞ্জীত আঁধার ভবন
প্লাবিত করিল জ্যোতির প্লাবন
নীরব বীণাটী সুরের লহরে
উঠিল যে ভরি সেকি?

বন্ধু তব শুভাগমনে।
সুপ্ত এ হিয়া উঠিল জাগিয়া
পুলক-শিহরণে।
দুলিল মন দুলিল প্রাণ
টুটিল মোহ ফুটিল জ্ঞান
নিথর এ মোর চিত্ত দোলাটী
দুলিয়া উঠিল কেমনে?

আসিয়াছ যদি তুমি,—
সিক্ত যদি গো করিয়াছ চির
তপ্ত—মরুভূমি।
যেও নাকো আর করিয়া আঁধার
এ হৃদয় মোর হে প্রিয় আমার
রহিব পড়িয়া জনম ভরিয়া
তব পদ রেণু চুমি॥

আজি এ ভাদ্র-ঝুলনে—
করিয়াছ যদি ধন্য এ হৃদি
চরণ পরশ দানে।
দোল দোল তবে চিত্ত দোলায়
এ সুখ রজনী যেন না পোহায়
বিরহের ব্যথা নাহি আসে যেন
বাঞ্ছিত এই মিলনে॥

———

অলৌকিক

—)•(—

বিষয় বিষে পাগল না হলে জগতের অনেক রহস্যই স্থির মনের কাছেই ধরা পড়ে। তোমরা ভাবছ—তোমাদের 'ক' বাবু একজন খুব বড় জ্যোতিষী বা Thougt reader. তা নইলে কি করে তিনি অপরের মনের কথা এমন ভাবে বুঝতে পারেন? বাইরে থেকে তোমরা তাঁর কত রকম বিভূতির কল্পনা করে তাঁকে এমন জায়গায় নিয়ে তুলেছ যে, যেন সে স্থান তোমাদের নিতান্ত অগম্য। আমার সঙ্গে 'ক' বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, তাই একদিন এসম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হয়, তার একটু পরিচয় দিচ্ছ; কথাগুলি একটু ধৈর্য্য ধরে শুনে নিয়ে আপন মনে তলিয়ে বিচার করে দেখো, সব জলের মত সোজা লাগবে। যে সব জায়গায় খটকা লাগে, আমাকে আবার জিজ্ঞাস্ করলেই বুঝিয়ে দেব।

সেদিনটা খুব মনে পড়ে, সারাদিন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, রাস্তা ঘাট সব কর্দ্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই রাস্তায় বেড়াতে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছিলনা, অথচ সারাটা দিন অতিষ্ঠ হয়ে ঘরে থেকেও কিছু করতে ভাল লাগছিলনা। তাই পাশের বাড়ীতে 'ক' বাবুর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। ইচ্ছা ছিল একটু খোসগল্প করে সময়টাও কাটিয়ে আসব, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও একটু refreshed হবে। কিন্তু ও হরি! তিনি যে বই থেকেই মুখ তুলছেন না—এ আবার কেমনতর সাধু! শুনলাম আবার অসুখেও ভুগছেন! তবে আর আমাদের চেয়ে ইনি বিশেষ কিসে? প্রথম সাক্ষাতের দিনে তাঁর 'সাধু' নামের ওপর এমনি একটা অশ্রদ্ধা এসেছিল। কিন্তু দেখলাম আমার চেয়ে বহুগুণে গণ্যমান্য লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করে; তাই আমিও মনটাকে কোনরকম বুঝিয়ে ধৈর্য্য ধরে কখন তিনি বই থেকে মুখ তুলবেন তার অপেক্ষায় রইলাম। খুব বেশীক্ষণ দেরী করতে হলনা; আমার অতিষ্ঠ মনের চঞ্চলতায় দেহটাও সুস্থভাবে বসে থাকার ক্ষমতা হারিয়েছিল, কাজেই আমার খুটখাট শব্দে তিনি হঠাৎ একবার মুখ তুলে চাইলেন। আমাকে দেখেই বুঝলেন যে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করব। ইঙ্গিতে বসতে বলায় তাঁর সামনের বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। এতক্ষণ চুপ করে থাকাটাই যথেষ্ট বাহাদুরীর কাজ করেছি, এখন আর কথা না বলে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দেবেন কি?"

ক বাবু—"বল না, আমার সামান্য শক্তিতে যা কুলায় চেষ্টা করা যাবে বই কি?"

আমি—"তেমন বিশেষ কিছু নয়—লোকে বলে আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমি জিজ্ঞেস্ করতে চাই, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় কি করে? একি কোন অনধিগম্য অলৌকিক শক্তি?"

তিনি একটু হেসে বললেন—"লোকে তাই বলে, কিন্তু আমি যদিও সর্ব্বজ্ঞ নই, তবু এটা একটা অনধিগম্য অলৌকিক কিছু একটা বলে মনে হয় না। স্বল্পাধিক পরিমাণে সব্বাই সর্ব্বজ্ঞ। তুমি কি কারও মনের কথা আঁচেও কিছু বুঝতে পার না?

আমি—"তা পারি বই কি!"

তিনি—"কি করে পার? সেটা কি কোন অলৌকিক শক্তি—না স্বাভাবিক intuition?"

আমি—"তা বই কি!"

তিনি—"এই intuitive power যদি বাড়ানো যায়, তবে অপরের কথা আপন মনে স্বাভাবিক উদয় হয় কিনা?"

আমি—"তা নিশ্চয়ই। কিন্তু সে শক্তি বাড়ানো যায় কি করে?"

তিনি—"আমাদের মনের স্বাভাবিক গতিই ব্যাপক। সেই শক্তি যদি একস্থানে centralised করা যায়, তবে তার শক্তি আরও বহু গুণে piercing হয়। এই কেন্দ্রীভূত করার নামই হ'ল সংযম। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে এই সংযমের বিশেষ বিষয়ানুযায়ী বিশেষ ফলের কথা রয়েছে। পরচিত্ত-জ্ঞান সম্বন্ধে পাতঞ্জল শাস্ত্র বল্‌ছেন—'প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।' ভোজবৃত্তি এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বল্‌ছেন—'প্রত্যয়স্য পরচিত্তস্য কেনচিৎ মুখরাগাদিনা লিঙ্গেন গৃহীতস্য যদা সংযমং করোতি, তদা পরকীয়স্য চিত্তস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে, সরাগমস্য চিত্তং বিরাগং বেত্তি। পরচিত্ত গতানপি ধর্ম্মান্ জানাতীতার্থঃ।' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মুখের হাবভাবের উপর সংযম কর্‌লে অপরের চিত্ত সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এর চিত্ত অনুরক্ত কিম্বা বিরক্ত তা বোঝা যায়, অপর চিত্তের ধর্ম্ম জানা যায়।"

আমি—"এ থেকে 'কেন' জানা যায়, তাতো কিছুই বোঝা গেল না। আর তা যে দুরধিগম্য নয়, তাই বা বুঝি কি করে? আমরা সাধারণে যা না পারি, তাই তো অলৌকিক।"

তিনি—"তা কেন হবে? সাধারণ মানুষ তো উচ্চ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানে না, তা বলে কি সে সবকে আমরা অলৌকিক বলি? সাধারণের কাছে যা দুরধিগম্য, তাই অনধিগম্য নয়। যদি রীতিমত চর্চ্চা করা যায়, তবে সংযমের অভ্যাস সবাই কর্‌তে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আগেই চায় ফলটা—তা কি হয় কখনো? সব কাজেরই একটা ধারা আছে তো!"

আমি—"এ শিখ্‌বার ধারা কি? প্রথমে কি শিখ্‌তে হয়? পাতঞ্জল কি কর্‌তে বলেন?"

তিনি—"পতঞ্জলি তাঁর দর্শনে যে সব বলেছেন, সে সবই বিশেষ করে মনের ব্যাপার। যোগ বল্‌তে সাধারণতঃ শারীরিক যে সব প্রক্রিয়ার কথা সাধারণে জানে, তার মধ্যে আসন ও প্রাণায়ামই বিশেষ করে শারীরিক প্রক্রিয়া। বাকী সমস্তই মনের কাজ। তবে হঠযোগ, যা নাকি বিশেষ করে গোরক্ষনাথের কৃপায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কারণ সকলের শরীর তার যোগ্য নয়। কিন্তু পাতঞ্জলের রাজযোগ সবার পক্ষেই খাটতে পারে—আর তা শ্রেষ্ঠযোগ বলেই তাকে রাজযোগ বলা হয়। যোগের প্রথম অঙ্গই হচ্ছে যম ও নিয়ম। পতঞ্জলি এই যম-নিয়ম সাধনেরও নানা অলৌকিক ফল বলেছেন।

আমি—"যোগের প্রথম থেকেই তো তাহলে অলৌকিকত্বের ছড়াছড়ি। তাই বুঝি সাধারণতঃ লোকে যোগের দিকে এত বেশী আকৃষ্ট হয়?"

তিনি—"সাধারণ লোকে তাই ভাবে বটে। কিন্তু প্রথমেই আভাস দিয়েছি, আবারও বলি, তোমরা যা নিয়ে deal কর্‌বে না, তাই শেষে তোমাদের কাছে অলৌকিক অদ্ভুত ইত্যাদি আখ্যা পাবে। নইলে culture কর্‌লে এসব কিছুতেই আশ্চর্য্যের কিছু নাই। এমন এক যুগ এদেশে ছিল, যখন সাধারণ লোকেও যোগের দু'চারটা প্রক্রিয়া জান্‌ত।"

আমি—"ইতিহাসে তার প্রমাণ কোথায়?"

তিনি—"কেন? বুদ্ধ জাতকে দেখা যায়, অনেক

শ্রমণই এসব কিছু কিছু জানতেন। তুমি হয়ত বল্বে যে, সে সব বৌদ্ধদের সাধন মার্গের প্রভাবে। কিন্তু বৌদ্ধদের সাধনার সঙ্গে পাতঞ্জলের আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য রয়েছে। তা ছাড়া বৌদ্ধযুগের পরেও যোগ শাস্ত্র যুগে যুগে এমন ভাবে সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে. এমন সম্প্রদায় খুব কমই পাবে, যাদের সাধন পন্থায় যোগের দু'চারটী অঙ্গ গৃহীত না হয়েছে। বর্ত্তমানে যাকে ইতিহাস বলে আখ্যা দাও, তাতে দেশের তাৎকালিক অবস্থা খুব কমই লেখা থাকে। শুধু রাজাদের সিংহাসনারোহণের ক্রম বা ধারাগুলিই তাতে পরিস্ফুট। দেশের ইতিহাস বল্লে তো তা বুঝায় না, সে যে হয়ে যায় শুধু রাজাদের ইতিহাস। দেশের ইতিহাস বল্তে দেশের অবস্থাই যদি বিশদ ভাবে বর্ণিত না হয়, তবে তাকে দেশের ইতিহাস না বলাই সঙ্গত। কে বলে আমাদের দেশের ইতিহাস নাই? আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি দেশের তাৎকালিক অবস্থা, আচার, রীতি-নীতি যেমন ভাবে বর্ণিত আছে, তাতে শুধু রাজার সিংহাসনারোহণের তারিখ নাই বলে ইতিহাস আখ্যা পায় নাই; নতুবা প্রকৃত 'ইতি হ আস' বল্তে যা বুঝায় তা এই গুলিই। দেশের প্রকৃত অবস্থার ইতিহাসই দেশের ইতিহাস।

"যাক্—আমাদের প্রকৃত বক্তব্যে আসা যাক্। যোগের মূল theory রয়েছে সাংখ্যে। সাংখ্যের theoryই বাস্তবে পরিণত করার এক প্রকার সাধনা হচ্ছে যোগ। যোগের সাধনায় সাধারণে অপ্রচলিত কিছু নূতন শক্তি লাভ হয়, তাকেই অলৌকিক বলা হয়। কিন্তু শুধু কেবল যোগের বর্ণিত সাধনাতেই অলৌকিক শক্তিলাভ হয় না—যে কোনও সাধন মার্গের উচ্চ স্তরে গেলেই কতকগুলি বিভূতি সাধকের আপনা হ'তে অধিগত হয়ে যায়।

"কিন্তু আগেও বলেছি আবারও বল্ছি, পাতঞ্জলের সাধনে শুধু মনঃসংযম দ্বারাই অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। শুধু যোগের প্রথম স্তর যম-নিয়ম দ্বারা যে অলৌকিক শক্তির উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায়, তাই অদ্ভুত। যেমন যম বল্তে 'অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহ' এই পাঁচটীর মধ্যে অহিংসার ফল হচ্ছে "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" সমস্ত প্রাণিগণের মাঝে কেহ তার শত্রুতাচরণ করবে না। শোনা যায় মুনি-ঋষিদের দেখে বনের পশু পক্ষীও হিংসা ভুলে যেত সে দিনও বিশ্ববরেণ্য রবিঠাকুরের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথা শোনা গিয়েছে যে, তাঁর গায়ের উপর পাখিগুলি খেলা করত—তিনি শান্তিনিকেতনে পরম শান্তির ধ্যানে নিমগ্ন থাক্তেন। লোকে হয়ত বল্বে, বুঝি তিনি যাদু জান্তেন। কিন্তু সে যাদু আর কিছু নয়—পাতঞ্জলের অহিংসা সাধন। বুদ্ধদেব এইটীর উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। যাঁর ভিতরে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় অর্থাৎ যিনি ভুলেও মিথ্যা বলেন না বা মিথ্যা আচরণ করে না, তাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে—"সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্"। সত্য যার মাঝে প্রতিষ্ঠিত, তিনি যাকে যা বল্‌বেন, সে সেই কাজ না করেও অর্থাৎ ফললাভের বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করেও সেই ফল লাভ করবে; যাকে যা বল্‌বেন, তা মিথ্যা হবে না—অসম্ভব বাক্য সম্ভব হবে। সত্য-প্রতিষ্ঠিতের মুখনিঃসৃত বলে অমাবস্যাতেও চাঁদ দেখা অসম্ভব হয়নি।

"এমনি ভাবে 'অস্তেয়' অর্থাৎ পরের দ্রব্যে যখন লোভ না থাক্‌বে, তখন তাঁর কাছে সমস্ত রত্নাদি আপনি এসে হাজির হবে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে হাজার হাজার টাকা আস্‌ছে, কিন্তু কত গৃহস্থ হাজার মাথা কুটেও উদরান্নের সংস্থান করতে পারে না—একি সন্ন্যাসীর ক্রিয়া

কলাপের কেরামতী? না তার অন্তের সাধনের ফল? এমনি ভাবে যোগের সমস্ত সাধনগুলিরই হঠাৎ ফলের কথা শুনলে, অলৌকিক বা সাধারণের অনধিগম্য একটা বাইরের কোনও শক্তির কল্পনা অনেকে করে ফেলে। কিন্তু স্থিরভাবে চিন্তা করলে এগুলিরও বেশ যুক্তিসঙ্গত (logical) কারণ পাওয়া যায়। মন যতই স্থিরভাবে অবস্থান করবে, বিশ্বের সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তার যে সুরে তার বাঁধা আছে, সেই ভাবের সুরটা তত স্পষ্ট ভাবে বেজে উঠবে।

"আমাদের প্রত্যেকের মনের বীণাটীই এমনি বিশ্বের সঙ্গে একই সুরে ঘাট বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। বিষয়ের কামনাতে মন যদি ছুটে না বেড়ায়, তবে তার সেই নিশ্চল অবস্থায় আপনি বিশ্বের শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। তখন সেই কেন্দ্রীভূত শক্তিকে যে দিকে নিয়োগ করা যায়, সে দিকেই তার অন্তরতম সূক্ষ্ম কারণ শুদ্ধ যোগীর কাছে ধরা পড়ে। এ যোগ ধৈর্য্য ধরলে সবাই করতে পারে। কেবল প্রাণায়ামই মন স্থিরের কৌশল নয়—যারা প্রাণায়ামের যোগ্য দেহ পায়নি, তারাও অন্যান্য বহু পন্থায় একই লক্ষ্যভূমিতে উপনীত হ'তে পারে। শুধু চাই মনটাকে নিঝুম করা—শ্রীগুরুর ধ্যানে সে শক্তি লাভ হয়।"

সে দিন এই পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তার পর তাঁকে নমস্কার করে চলে আসি।

ভক্ত ও ভগবান্

—)•(—

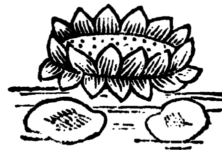
মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জ্বালা দুঃখময় সংসারে একটু পরিতৃপ্তির, একটু বিশ্রান্তির স্থান খুঁজিয়া পাইবার জন্য অহরহ ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাহার যেন সন্ধান করিয়া ফিরে, কোন্ যেন হৃত-ধন অনুসন্ধান করিয়া অন্তরে গুমরিয়া মরে। পুত্র বল, কলত্র বল, ধন বল—কিছুতেই পরিতৃপ্তি আসে না। কোন্ পিপাসায় আকুল প্রাণে হরিণীর ন্যায় এই সংসার-মরুতে মৃগতৃষ্ণিকার সন্ধানে ছুটিয়া মরে? সান্ত্বনার স্থান কোথায়, তৃপ্তির স্থান কোথায়, কে বলিয়া দিবে? সুখের আশায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, কামনা হইতে অন্য কামনার আশায় ছুটিয়া ছুটিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সাধু-গুরু-শাস্ত্রের কৃপায় যখন জ্ঞান হয় যে ভগবান্ ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু চরম পরিতৃপ্তিকর নাই, তখন মানুষ সব ছাড়িয়া সেই ভগবান্‌কে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সে বুঝিতে পারে, রাজৈশ্বর্য্যে সে সুখ নাই, পুত্র-কলত্র ধনজন গৃহাদিতে সে পরিতৃপ্তি নাই। বন্ধু বান্ধব, সুখ-সম্পদ্ সে আনন্দ দিতে পারে না। এই অভাবময় সংসারে ক্ষণিক সুখ ছাড়া চরম সুখের স্থান এক ভগবান্ ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু নহে। তখন জীব সকল আশা কামনা ছাড়িয়া সেই ভগবানের দিকেই ধাবিত হয়। তাঁহার লীলারসে মজিয়া, তাঁহার নাম গানে বিভোর থাকিয়া, তাঁহার সেবা পূজা করিয়া, তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াই কেবল পরি-তৃপ্তি লাভ করে। অন্য বিষয়ে আর আসক্তির

আকুল আকর্ষণ কার্য্যকরী হয় না। জীব তখনই ভক্ত-পদবাচ্য হয়। ভক্ত তখন ভগবানকেই আপনার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার জ্ঞানে, তাঁহার সেবায় তুষ্ট থাকিতে ভাল বাসে। ভক্তের সংসার ভগবান্‌কে লইয়া, তাঁহার নিকট বাহ্যসংসার লুপ্ত হইয়া যায়।

সাধারণ মানুষ সকল কার্য্যকে অহং মিশ্রিত করিয়া নিজের ভাবিয়া নিজ নিজ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু ভক্তের ভগবচ্চরণে আত্ম সমর্পণের ফলে কোন কর্ম্মই আর আপন কর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না, তিনি কোন কর্ম্মেই আর লিপ্ত বা আবদ্ধ হন না। এইরূপ ভগবচ্চরণে সমর্পিত প্রাণ ভক্তেরই নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম সম্পাদন করা সম্ভব। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ কেবল ভক্তের দ্বারাই সম্ভব, অন্যের দ্বারা নহে।

ভক্ত ভগবানের প্রতি এইরূপ অনুরক্তির ফলে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জলে-স্থলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, জীবে-শিবে সর্ব্বত্রই তাঁহার লীলাময় পরম-প্রেমস্বরূপ ভগবানের প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিতে থাকেন। জলে স্থলে, আকাশে-অরণ্যে তাঁহার শ্যামদ্যুতির আভায় নয়ন পরিতৃপ্তি করেন; তটনীকল্লোলে, পাপিয়া-কণ্ঠে বাঁশরীসুর শুনিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করেন। বন-উপবনে কুসুম-সম্ভার দেখিয়া তাঁহার প্রেমময় ভগবানের গলায় কুসুমহার দোলায়মান কল্পনা করিয়া থাকেন। এই বিশ্বরূপ তাঁহার লীলাময়েরই রূপ; চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র তাঁহার অঙ্গদ্যুতিতে উদ্ভাসিত। বন-উপবন, সাগর-পর্ব্বত সর্ব্বত্রই তাঁহার ভগবান্ লীলা করিতেছেন। এইরূপে ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া ভক্ত যখন ভগবান্‌কে আকুলভাবে আলিঙ্গন করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন, ভগবান্ তখন ভক্তের নিকট প্রকট না হইয়া আর থাকিতে পারেন না। তখন ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বসম্পদ্, সর্ব্ববিভূতি লইয়া ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া ভক্তকে আপনারজন-রূপে চির আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। ভক্ত তখন তদ্‌গত চিত্তে বলেন—"আমি জ্ঞান চাহি না, শক্তি চাহি না, মুক্তি চাহি না—চাহি কেবল তোমাকে, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি আমার বিশ্বের প্রাণ, তুমি এস, আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে উদিত হও! একবার বল, তুমি আমার, আমি তোমার!"

ভক্ত ভগবানে এইরূপ যে মধুর মিলন, তাহাই অনির্ব্বচনীয়। ভক্ত-ভগবানে তখন আর পার্থক্য জ্ঞান থাকে না, তখন ভক্ত ভগবানে ও ভগবান্ ভক্তে মিশিয়া যান। এই যে ভক্ত ভগবানের প্রেম, ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বৃন্দাবনলীলা, ইহাই ভাগবতের আদর্শস্থানীয়।



তীর্থ-রেণু

(শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ)

—*—

সিধা রাস্তা মনে করে অনেকখানি হেঁটে তারপর লোকে দেখ্‌তে পায়, রাস্তাটা বাঁকা; আবার সেই বাঁকা পথ ধরে চল্‌তে চল্‌তে দেখে—এ তো বাঁকা নয়; আরও খানিকটা চলে দেখে, হয় সেটা ডিম্বাকার, কি বর্ত্তুলাকার—কি দুটোর একটাও নয়। এমনি করে আগে থেকে যে হিসাব-নিকাশ বা আইন-কানুন করা থাকে, চল্‌তি-পথে তাকে ক্রমশঃই তা বদ্‌লাতে হয়। আমাদের যে সব সিদ্ধান্ত ও ধারণা, সে হচ্ছে যেন জগতের টাকা বা নোট; সময় বুঝে এবং সর্ত্ত বুঝে তবে তার দাম আছে—তার বেশী কিছু নয়।

সাধারণ লোকের মনটা হচ্ছে ছেলেমানুষ—এটা সেটার ওপর ভর করে তবে সে হাঁটে, সোজা হয়ে চল্‌তেও জানে না, একা একা দাঁড়াতেও পারে না। কত দিন তোমার মনকে এমনি শিশুর মতন ধরে রাখ্‌বে বল তো? মন বন্ধনমুক্ত হয়ে যাক্, নিঃসঙ্গ হয়ে যাও, এর-তার কাছে দৌড়াদৌড়ি করো না। মন আপন পায়ে দাঁড়াক—নিজের মাঝে ভারকেন্দ্র খুঁজে নিক্।

ছেলেরা বেশ! কিন্তু প্রকৃতি তো তোমায় চিরকাল ছেলেমানুষ করে রাখ্‌বে না। তার আইন শিখ্‌তেই হবে। হয় আইন ধরে চল—নয় নিপাত যাও!

মনের যে অবস্থায় পাপবোধ থাকে না, তাই হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যের বিশিষ্ট লক্ষণ; ইতিহাসে তার নজীর আছে। এইজাতীয় মানুষেরাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শিল্পের স্রষ্টা—যেমন আদিযুগের গ্রীকরা। ইংরেজীতে Health (স্বাস্থ্য) Holy (পবিত্র) আর Whole (সম্পূর্ণ) শব্দগুলির মূল এক। দেহে-মনে স্বাস্থ্যে ঐক্যই হল বেদান্ত। "চোখ যদি একটা হয় তো তোমার সারা দেহ হবে জ্যোতির্ম্ময়।"

যা কিছু কর, তার মাঝে নিজের যা কিছু তা ফুটিয়ে তোল। একটা ঘড়ি দিব্যি চল্‌ছিল, হঠাৎ চুম্বকস্পৃষ্ট হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তখন ওটাকে কিছুক্ষণ মাটীর নীচে পুঁতে রাখ, আবার দিব্যি চল্‌তে থাক্‌বে· তেমনি করে ব্রহ্মে আপনাকে নিমজ্জিত রাখ, সম্মোহনের ঝোঁক কেটে যাবে, আত্মার স্ফূর্ত্তি হবে।

দেহে রোগ হয় কখন? যখন ফোঁড়া বা অর্ব্বুদ হয়ে একটা উপাঙ্গই প্রধান হয়ে ওঠে, অথবা দেহময় বীজাণু ছড়িয়ে পড়ে অগণিত বংশ বিস্তার কর্‌তে থাকে, অথবা হঠাৎ একটা যন্ত্র বেয়াড়া রকম বেড়ে যায়। তেমনি মনের মাঝে একটা প্রবৃত্তিই যখন চিন্তা ও ক্রিয়ার স্বাধীন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, তখন মনেও রোগ ঢোকে। সমস্ত বাসনা-বেদনা ও উচ্ছ্বাসের সামঞ্জস্যেই মনের স্বাস্থ্য।

মানুষ হয় রাজা হবে, নয় তো তার মরণ ধ্রুব। জিহ্বোপস্থই যার সর্ব্বস্ব, তাকে মানুষ বলে কল্পনা করাই তো দুষ্কর! একটা উদর হেঁটে বেড়াচ্ছে শুধু, হাত-পা আর অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাকে এখান থেকে সেখানে বয়ে নিয়ে কেবল তার গিল্‌বার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ কর্‌ছে—তাকে কি বলি? —মানুষ বলি না, বলি শূকর! সমস্তটা জীবনই

হচ্ছে শক্তির অবিশ্রাম লীলা, একটা বিজয়াভিযান। তাই দিয়ে মানুষ বহিঃশক্তিকে আয়ত্ত করে খাটিয়ে নিচ্ছে, বা যা অনিষ্টকর তাকে অপসারিত করছে। সুস্থ গাছ-পালা বা জীবজন্তুর মাঝে দেখা যায়, দুষ্ট জীবাণু আক্রমণ করতে এলেই তাদের প্রতি-রোধ করবার ক্ষমতা তাদের আছে।

বই পড়া আর ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জ্জন করা এক কথা, আর সত্য লাভ করা আর এক কথা। সমস্ত শাস্ত্র তোমার কণ্ঠস্থ থাকতে পারে, তবুও তুমি সত্য ন-ও জানতে পার।

মাধবীলতা যেমন বটগাছকে জড়িয়ে থাকে, তেমনি ক্ষীণাঙ্গী সুকুমারী নারীও দৃঢ় করে পুরুষকে জড়িয়ে থাকে। বাস্তবিক এ যেন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হয় মাধবীর আলিঙ্গনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বটগাছকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হবে, নয়ত বটগাছের স্বাস্থ্য যদি অটুট রাখতে হয় তো মাধবীকে ধ্বংস করতে হবে।

বাঁধা পড়ো না। তোমার হৃদয়ের দখল যেন কেউ না পায়, তোমার অন্তরাত্মার কাছ ঘেঁষে কেউ যেন না বসে। আত্মাকে যদি স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহিমায় দীপ্ত দেখতে চাও তো তার স্ফটিকস্বচ্ছ জ্যোতির কাছে আর কোনও কিছুকে টেনে এনো না—তাহলে সে জ্যোতিঃ শবল হয়ে যাবে। তোমার আইন তোমারই সৃষ্টি হবে। অপরের আইন মেনে বা কথা শুনে চলবে কেন?

ভালবাসাটা কি? একবার পরখ করে দেখতে পার—কিন্তু জীবনে একবারই পরখ করো, রোজ নয়। একবার তার স্বাদ বুঝে তারপর ছেড়ে দাও। ও হচ্ছে একটা ঝড় বা জ্বরবিকার। যে নির্ব্বোধের দল এর খপ্পরে পড়ে নি, তারা এর ব্যাখ্যান করতে পারে, তা শুনে গলে যেও না। একবার যদি এর স্বাদ বুঝে থাক, এর জ্বলুনীতে পুড়ে থাক, তাহলে আর এর বিষয় কিছুই পড়ো না-প্রেমবিষয়ক সমস্ত সাহিত্য বর্জ্জন করে চলো। বাল্যশিক্ষার বই যেমন ছুঁড়ে ফেলে এসেছ, তেমনি এ সম্বন্ধে সব বালাই ঝেড়ে ফেল। ওতে জগৎ-রহস্যের মীমাংসা মিলে না। যে এর পাকে পড়েছে, সে জগৎকে বাঁচাও! তোমার দুর্দ্দশা দেখে ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার হাত থেকে জগৎ বেঁচে যাক্। তুমি জ্বলছ অপরকে জ্বলুনী থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় দেখাতে। যে ভাবে একে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে, তা তুমিই আবিষ্কার করেছ; সবাই এখন দেখে শিখুক। উটের পিঠে চড়ব, অথচ ঝাঁকুনি খাব না, তাও কি হয়? জলের ওপর দিয়ে ডোঙ্গাটা দিব্যি ভেসে চলছে—হেলছে-দুলছে না। কিন্তু তার আয়েসী চাল দেখে আমরা যদি তার ওপর চেপে বসতে যাই, তখন দেখি ভেসে যাওয়া বড় শক্ত—হয়ত দুজনাকেই ডুবতে হবে। Emerson প্রেম সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন, তা সত্য নয়। বেচারী লক্ষ্যভ্রষ্ট।

চাঁদের আলো উপভোগ করতে বেরুলেই আর উপভোগ করা যায় না; কিন্তু কাজের পথে চলতে চলতে, আশ-পাশ থেকে যে জ্যোৎস্না উঁকিঝুঁকি দেয়, তাতেই তাকে উপভোগ করা হয়। তেমনি আধ্যাত্মসাধনায় যখন জোরকদমে চলি, তখনই ভালবাসার মাধুর্য্য বুঝতে পারি।

পেট যে আছে, তা বুঝি যখন পেটের অসুখ হয়। তেমনি স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসা যখন কুশ্রী হয়ে ওঠে, তখনি তা বোধের এলাকায় আসে। নাক যে আছে, তা তো বোঝ না। তাহলে মায়িক সম্বন্ধগুলো বুঝতে চাও কেন? না বুঝলেও তো তারা চলে যায় না। যখন থেকে লজ্জার সৃষ্টি, তখন থেকে অধঃপতনেরও সুরু—Adam আর Eve এর গল্পে তাই আছে না?

যখন দেশে দুর্ভিক্ষ কি মহামারী সুরু হয়, তখন মানুষ এক জোট হয়ে যায়, রেষা রেষি থাকে না তখন। এক প্রাণ হওয়াই মিলনের পথ। সংসারও তেমনি সুখের হয়, যদি স্বামী-স্ত্রীর এক প্রাণ হয়। এই একপ্রাণতাই প্রেমের দৃঢ় ভিত্তি, উন্নতির যথার্থ সোপান।

বিজ্ঞানের পথ হচ্ছে গভীর পথ, অজ্ঞানের পথ। সমস্ত অপরা বিদ্যাই তাই—কেবল তর্কের চক্রকে ঘুরে মরা। বিজ্ঞানের দেখা হচ্ছে পাহাড় দেখার মত—এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এক এক রকম দেখা। একটু নড়্‌লে তো সব পাল্‌টে গেল! বিজ্ঞানে কতকগুলি জিনিষ খুঁটিয়ে বেছে আর সব থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এই যে আলাদা করে নিতে পার বলে মনে কর্‌ছ, এই তো তোমার গোড়ায় ভুল; এখন সিদ্ধান্ত ভুল হবে না কেন? বিরাট একটা বৃত্তের একটুখানি দেখে মানুষ তাকে সহজেই সরল রেখা মনে কর্‌তে পারে।

যারা মনোবেদনায় আর অন্তর্জ্বালায় জ্বল্‌ছে, তাদের বলি—দেহের পূজা যদি চাও তো দেহকে ক্রুশবিদ্ধ কর। আগে যদি পূজা খোঁজ, মরণ তার পেছনে আছে জেনো। খ্রীষ্ট, সক্রেটীস ও মহাপুরুষেরা আগে মরেছেন, তারপর পূজা পেয়েছেন।

চোখ যদি তোমায় প্রলুব্ধ করে তো চোখ উপ্‌ড়ে ফেল। বরং দেহ আঁধার হয়ে যাক, তবুও আত্মা যেন নরকের অন্ধকারে না ডুবে যায়।

প্লীহা যকৃৎ যে আছে, তা কখন বুঝি? যখন তাদের অসুখ হয়। তেমনি আত্মার যখন অসুখ হয়, তখন বুঝি যে আমার দেহ আছে।

কর্ম্মীর সব চেয়ে বড় বিশ্রাম কল্পনার আনন্দে, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে নয়। ভালবাসা আর কর্ম্ম এক সাথে চল্‌তে পারে না।

চাইব কেন গো? কাছে বা দূরে যা কিছু দেখ্‌ছি, সবই তো আমার আত্মার ক্ষুধা মিটাচ্ছে। আমি তাদের দুয়ারে বয়ে আন্‌লাম আমার প্রেম, আমার কৃতজ্ঞতা, আমার আনন্দ। জীবনকে বরণ করে নিলাম—নির্ভয়ে, পরিপূর্ণ বিশ্বাসে। সমস্ত ঘৃণা চিন্তা হতে নিজকে ক্ষালিত কর্‌লাম। সমস্ত দিনের খাটুনী আমার তাঁরই জয়গাথা। এই পৃথিবীকে বড় ভালবাসি—দেখি তার জীবন আমারই জীবনের এক অংশ যে! আমার আনন্দ, আমার প্রেম এই তো আমার চাওয়া। দূর-দূরান্তরের কোনো কিছুর ভরসা করে থাক্‌ব কেন?—দেখ্‌ছি এ জীবন আমার—প্রাণ-স্বরূপের সঙ্গে যে আমি এক!

ভালবাসা নিয়ে কারবার করায় বিপদ্ আছে। শুদ্ধ প্রেম বা ভাগবত ভাবও আছে—আবার কামও আছে। মানুষ হয় দুটাকেই ধরে, নয়ত দুটাকেই ছাড়ে। দুদিকেই ঝকমারি। কামকে কৃপার বায়ে উড়িয়ে দিতে হবে—রাখ্‌তে হবে প্রেম। চালের সঙ্গে তুষ খাওয়াও ভাল না, আবার তুষ উড়াতে গিয়ে চাল ওড়ানোও ভাল না।

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আরও ঘুমাব নাকি? যাই বল না কেন, আমি জেগে আছি। চুপ! যার ঘুম তাকে দিয়ে দিয়েছি—এবার ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।

মাতৃ স্নেহ আছে বলেই সন্তানের সত্তা আছে। জ্ঞানী জগন্মাতারই বিগ্রহ—তাই তাঁর প্রাণ সর্ব্ব ক্ষেত্রে প্রসারিত; সবাইকে যথা স্থানে রেখে জীবনকে তিনি পূর্ণ সমঞ্জস করে তুলেছেন।

মানুষ সম্মোহিত হয় কি করে জান? যে কথায় প্রাণে বিরুদ্ধ ভাব জাগে না, তা অমনি বিশ্বাস করে বসি; যা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, তাকে গ্রহণ করি না। ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণের সম্বন্ধে যদি

খুব হুঁসিয়ার না থাক তো রাগ-দ্বেষের মোহে ধাঁ করে পড়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগ্‌বে না। বিশ্বাসের অনুকূলে যে যা বলে, তাই আমরা মেনে নিই। কেউ যদি মুখে আমাদের সহানুভূতি বা আমাদের ধারণা অনুযায়ী কথা বলে, তাহলে তার ভাব আমাদের মাঝে ঢুকে পড়ে। আমাদের ভয়ের অনুকূলে যে যা বলে, আমরা তাও মেনে নিই। বার বার একই বিষয়ের অনুধ্যানে যা খুসী তাই ঘটানো যেতে পারে।

সত্য কঠিন, বুদ্বুদের মত ছুঁতেই তা ভেঙ্গে পড়ে না। সারাদিন ধরে ফুটবলের মত তাকে লাথিয়ে চল না কেন, সন্ধ্যাবেলাতে দেখ্‌বে, সে যেমন তেমনই আছে।

পাপের দরুণ আমরা সাজা পাই না—পাপাচরণই শাস্তি। অশুভ চিন্তা যে হৃদয় থেকে যাত্রা সুরু করে, সেই হৃদয়েই আবার চরমে ফিরে আসে। সারা জগৎ ঘুরে আজ হোক্, কাল হোক্ হয়ত মানুষ তার কথা ভুলে গেলে পরও সে এক আকারে না এক আকারে তার জনকের কাছে ফিরে আস্‌বেই।

ভগবানে বিশ্বাসই সত্যিকার ধর্ম্ম নয়; মানুষে যে শিবময় আছেন, তাঁকে প্রাণপূর্ণ শ্রদ্ধাই যথার্থ ধর্ম্ম।

যুক্তিকে মানুষের মাথার মুকুট বলা হয়; আমি বলি, ও হচ্ছে গোলামের গলার বেড়ি যুক্তি অপূর্ণতার চিহ্ন, অজ্ঞানের কবুল।

দর্শন বিজ্ঞানে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, সে কেমন জান? যেমন জুতা দেখে লোকের শ্রেণীবিভাগ করা। বৈজ্ঞানিকের ধাঁচ হচ্ছে মূলে অজ্ঞানীর ধাঁচ। দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিকেরা মইয়ে চড়েন—চুল আঁচ্‌ড়াবেন ব'লে! টাকা পয়সার স্তুপ করার মানে হচ্ছে, আকাশের তারার নাগাল পাবার জন্য ঘরের চালে ওঠা আর কি!

ইচ্ছা হতেই চিন্তার জন্ম। পোষাকের আগে যেমন দেহ, তেমনি চিন্তার আগে হচ্ছে অনুভব। এক জনের অনুভবের ধারা বদ্‌লে দাও, তার চিন্তারাজ্য ওলট পালট হয়ে যাবে। অনুভব হচ্ছে অন্তর্জীবন—চিন্তা হচ্ছে ভূষি, খোসা। খোসাটা অঙ্কুরকে রক্ষা করে বটে, কিন্তু অঙ্কুর তাকে ঠেলে বেরোয়। চিন্তাও তেমনি অনুভবকে জাগিয়ে রাখে, জীইয়ে রাখে; কিন্তু অনুভূতি প্রবল হলে চিন্তাকে শেষে দূরে ঠেলে দেয়। অনুভবকে পাল্‌টে দিলে যুক্তিও পাল্‌টে যায়। বিজ্ঞান আর অভিজ্ঞতার বনিয়াদ হচ্ছে বুদ্ধি, আর বুদ্ধির বনিয়াদ হচ্ছে বোধ। পরমাণুবাদ বা শক্তিবাদ যে সমস্যার মীমাংসা না কর্‌তে পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে, তার সমাধান কর্‌তে গিয়ে মানুষের হৃদয়ে অনুভূতির ক্ষেত্রে সন্ধান করা উচিত নয় কি?—সেই তো জ্ঞানের পরম নিদান, প্রত্যক্ষের মূল, আলোকের উৎস!

জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়ে চলে যাও—যেন নয়নাভিরাম পার্ব্বত্যভূমির ভিতর দিয়ে চলেছ। মানুষের ঈর্ষা-নিন্দা যেন পিচ্ছিল ভূমি বা গড়ানে পাথর। থাকুক্ না—তুমি দেখ আর আনন্দ কর! নির্লিপ্ত দ্রষ্টা তুমি—তোমার নাগাল পায় কে? লোকে বোঝেনা বলেই তো দুর্ব্ব্যবহার করে। একই অবিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরেছে বইতো নয়। অপরের মাঝে অবিদ্যা কোন্ আকারে আত্মপ্রকাশ কর্‌ল, সে খবরে প্রয়োজন কি?—তোমার আলো জ্বেলে তোল, দূর হয়ে যাবে সব।

যখন শিশু ছিলাম, তখন মাটি ছেড়ে উঠ্‌তে পার্‌তাম না। কিন্তু কালক্রমে যৌবনের শক্তিতে দৃপ্ত হয়ে পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ লঙ্ঘন করে যাই। মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে অতিক্রম কর্‌তে শিখ্‌লাম কি করে? সমান সমানেই ডিঙিয়ে যাওয়া যায়। কাজেই আমাদের ইচ্ছাশক্তি আর মাধ্যাকর্ষণের

শক্তিতে সগোত্রসম্বন্ধ—এমন কি তারা একই শক্তি। সঙ্গীতধ্বনি আর ভাবোচ্ছ্বাসের মাঝেও এইরকম সম্বন্ধ। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেও বাহ্য-জগতের এমনি আন্তরিক মিল আছে। অতএব সমস্ত প্রকৃতিতে অনুস্যূত ঐকাধারা আমিই।

অন্তরে একটা প্রকাশ আছে; বহির্জগতে যাকে আলোক বলি, সে তারই অপূর্ণ অভিব্যক্তি। ওই অন্তরের আলোতেই বস্তুর তত্ত্ব বুঝ্‌তে পারি—ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি বলে নয়। বিশ্বাবগাহী সহজ জ্ঞান ও সর্ব্বব্যাপিত্বের দরুণই এই অনুভব হয়, তাইতে আমরা যা দেখি, তাই হয়ে যাই। Mill বল্‌ছেন—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যা দেখি, সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ের অবকাশই থাকেনা। তা হলেই হল, ইন্দ্রিয়সহায়ে ক্ষণকালের জন্য যা দেখি, ক্ষণ-কালের জন্যই তার সম্বন্ধে সংশয় থাকেনা। আর বিশ্বব্যাপী নিত্য চেতনার সহায়ে যা দেখি, চিরকালের জন্য তারও সম্বন্ধে সংশয় থাকেনা।

সত্যলাভ করার পর জগতে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেল। একটা লোককে যদি সে সত্য দিয়ে যেতে পার—ব্যস্‌!

প্রাচীন ধর্ম্মবিধানে কতকগুলি প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। ভাবখানা এই—যে ঘোড়াটা বাগ মানে না, তার পিঠে চড়ার চেয়ে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা নিরাপদ। তোমার বাঁ পা (পাপ) থাক্‌বে, ডান পাও (পুণ্য) থাক্‌বে—তবে না খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারবে। মাছি খোলা ছেড়ে আকাশে উড়ে যায়।

আচারের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হতে পারি যখন, তখনই মানবজীবনের সত্যের সঙ্গে মুখো-মুখি হয়। আমরা অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এই অভিমান যখন ছাড়্‌তে পারি, তখন দেখি চারদিক থেকে জগৎ বন্ধু বেশে আলিঙ্গন কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। এমনি করেই স্বাধীনতা ও সাম্যের অনন্ত প্রবাহে আমরা ভেসে চলি। জিহ্বা যদি খাওয়ার সময় দেহের স্বাস্থ্যের দিকে নজর না রেখে কেবল স্বাদের দিকেই নজর রাখে, তাহলে দুদিনেই মুখের স্বাদ চলে যায়। সুস্থচিত্ত মানুষ তাই কেবল নিজের জন্য খাটেনা—পরের জন্য খাট্‌ছি বলেও বচন ঝাড়েনা। পরকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে সে কাজ করে যায়।

—*—

ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা

—*—

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে এবং ব্রহ্মেই লীন হইতেছে—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্‌।" বৃক্ষ, লতা, নদী-পর্ব্বত জীবজন্তু, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি ইতস্ততঃ যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, এই সকলের সত্তা এক ব্রহ্মবস্তুই, অন্য কিছুই নহে। এই সকল ব্রহ্ম হইতেই জাত,

ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেই লীন হইতেছে। এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই। এই ব্রহ্মই বিভিন্নরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছেন। ব্রহ্ম সত্ত্বারূপে অনাদি ও অনন্ত. সুতরাং তাহা ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুর সদ্ভাব হইতে পারে না। অন্যবস্তু সেই ব্রহ্মেই উৎপন্ন, সুতরাং অংশ ও বিকৃত মাত্র। ব্রহ্ম অনন্ত ও অনাদি. তাহা ছাড়া যাহা কিছু —শান্ত ও উৎপন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম যদি অনাদি ও অনন্ত হন, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মের শরীর ও রূপ। এই যে বিভিন্ন আকার. তাহা ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিলনা, তখন পরম ব্রহ্ম পূর্ণ রূপেই সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন— "অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।"— আমি বহু হইব। অর্থাৎ আমি জীব, জড় —চেতন অচেতন রূপে বহুভাবে প্রতিভাত হইব। ব্রহ্মের এই বাসনা বা মায়াই বহু হইবার কারণ হইল। যেমন ঐন্দ্রজালিক ইচ্ছা করিলেন, এক বস্তু অন্য বস্তু রূপে লোক চক্ষে পতিত হউক, আর তাহা তদ্রূপই হইল। এই মায়া জীবের উপরই প্রভাব বিস্তার করিল, ব্রহ্মের উপর নহে। যেমন মেঘ পৃথিবীর উপর ছায়া বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা। এই মেঘ যেমন আবার সূর্য্য হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে, সেইরূপ মায়া ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত হইয়া ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত জীবের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই জীব যখন মায়া প্রভাবে প্রভাবিত হইল, তখনই নিজকে স্বতন্ত্র ভাবিতে লাগিল। এইরূপে মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম ব্রহ্মভাব হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া নিজকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া জীবোপাধি প্রাপ্ত হইল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইল না। মায়াকৃত এই যে জীব-জ্ঞান, উহাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানেই জগৎ, তুমি-আমি, সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ দ্বন্দের কারণ হইল। এই ব্রহ্মই জীবাধারে জীবাত্মা, মন বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপে ভিন্নভিন্নাকারে ক্রিয়াপর হইল। যদি সেই ব্রহ্মচৈতন্য ক্রিয়াপর না হন, তাহা হইলে মায়া চৈতন্যে লয়প্রাপ্ত হয়। মায়া লয় পাইলে জগৎও লয় পায়। যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য না থাকায় এক চৈতন্যেই সমুদয় প্রসুপ্ত থাকে। যেমন মন লয় পাইলে জীবের নিকট জগৎও লয় পায়, তদ্রূপ মায়া বিলুপ্ত হইলে সৃষ্টিও বিলুপ্ত হয়।

এক ব্রহ্মচৈতন্য মায়াধিকৃত হইয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, মায়া বিমুক্ত হইলেই শিব। এই জন্য সাধনা সহায়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই মুক্তি সম্ভবে। ব্রহ্মের যে অংশে মায়ার কার্য্য নাই, সেই অংশ চিরবিমুক্ত। জীব চেষ্টা দ্বারা সেই বিমলিন অংশে লীন হইতে পারে। সেই বিমলিন অংশই জ্ঞান। এই জন্য জ্ঞানেই মুক্তি। অজ্ঞান প্রভাবে এই জীব জগৎ ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভাবে এই জগতে ক্রিয়া

করিয়া কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতেছে। এই অজ্ঞানতা দূর হইলে জীবের কর্ম্মক্ষয় হয়; সুতরাং জীব মুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়। একই আত্মা মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত, সুতরাং আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহ-পরিচ্ছদে নানা রূপে বিরাজ করিতেছেন। মন প্রতি শরীরে বিভিন্ন; সুতরাং সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতির অনুভূতিও বিভিন্ন। ব্রহ্ম অদ্বৈত হইয়াও কার্য্য-কারণ-ভাব জন্য দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই দ্বৈতভাব নিরাকরণের উপায় বিবে জীবের বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলে জীব ও ব্রহ্ম-রূপ উপাধির নাশ হইয়া কেবল শুদ্ধ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিবে।

পূর্ব্বে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু ছিল না। সেই ব্রহ্মই ইচ্ছা করিয়া নানা রূপ ধারণ করিলেন। এই জগতের কোন উপকরণই তিনি অন্যত্র হইতে গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার শক্তিতেই এই সকল উদ্ভূত হইল। তাঁহার শক্তিতেই এই সকল অবস্থান করিতেছে এবং অন্তে তাঁহাতেই লীন হইতেছে। তিনিই ইচ্ছা করিয়া সুখঃ-দুখ ভোগ করিতেছেন, আবার তিনিই মুক্তিপ্রয়াসী হইতেছেন। এই সকল কার্য্য কারণের মূলসূত্র একই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্মাংশের ক্ষয় ব্যয় নাই, সকল অবস্থাতেই তিনি পূর্ণ, সৎ ও অবিকৃত রহিয়াছেন। যাহা কিছু বিকার দেখা যাইতেছে, তাহা কেবল মায়া বা অজ্ঞানের প্রভাব মাত্র। এই মায়াও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। সৃষ্টি-প্রবাহের ব্যাখ্যা একমাত্র এই মায়া দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। যেমন রজ্জু বা শুক্তি ভ্রমক্রমে সর্প বা রজত বলিয়া প্রতিভাত হয়, আবার ভ্রম অপগত হইলে রজ্জু ও শুক্তিই থাকিয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়া। ভ্রমক্রমে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে মাত্র; মায়া বা অজ্ঞান দূর হইলে প্রতি জীবই ব্রহ্মকে ব্রহ্মস্বরূপেই দেখিবে; সুতরাং "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

এই গণেশজীকেই কেদারনাথের দ্বারী বলে এবং কেদারপুরীতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই প্রথমে গণেশজীকে পূজা করে যাওয়া বিধি। কিন্তু আমরা ত মনে করেছিলাম, গণেশজীর পূজারী-মহাশয় বোধ হয় গণেশজীকে স্থাপন করে কিছু হস্তগত করার পন্থা করে রেখেছে, কিন্তু বাস্তবিক

পক্ষে তা নয়। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ পূর্ব্বেই তুলে দিয়েছি। পাঠক! ওতেই বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছেন।

আমরা এখন কেদারনাথের পুরীর ভিতর প্রবেশ করলাম। আজ সঙ্গীয় সকলেই আমাদের ফেলে পূর্ব্বেই চটীতে চলে গেছেন। শুধু আমি ও হরিদাস ভায়া মন্থরগতিতে নানা আলোচনা করতে করতে তথা প্রকৃতির স্বরচিত উদ্যানের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি। আজ হৃদয়ের যে কি ভাব, কেমন করে পাঠকদের জানাব? ·······

মুণ্ডকাটা গণেশ হতে বের হয়ে এক মাইল খাড়া ক্রমোচ্চ পথে চড়াই করার পর আরও এক মাইল পথ সিধা ও সামান্য সামান্য চড়াই উৎরাই করে **গৌরীকুণ্ড** চটীতে যেয়ে পৌঁছি। শোনপ্রয়াগ হতেই ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আস্‌তে হয়েছে, পর্ব্বতগুলি নেড়া নয়—বেশ সজীব। ত্রিযুগীনারায়ণ হতে যেমন খুব খাড়া ভাবে তিন মাইল উৎরাই করে শোনপ্রয়াগে পৌঁছেছিলাম, তেমনি আবার আড়াই মাইল প্রায় খাড়া চড়াই করে গৌরীকুণ্ড পেলাম। গৌরীকুণ্ড চটী বেশ বড় চটী। রাস্তার দুধারে দ্বিতল বিশিষ্ট অনেকগুলি বড় বড় ঘর, তাতে উপরে থাকার জায়গা এবং নীচে দোকান। একটী ধর্ম্মশালাও আছে। বাবা কালী কম্বলীবালার সদাব্রত পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গীয় সকলেই একটি দ্বিতল বিশিষ্ট ঘরে জায়গা নিয়েছিলেন। এখানে থাকার বেশ সুবিধা। আমরা শোনপ্রয়াগ হতে বরাবর মন্দাকিনী গঙ্গার পাশ দিয়ে এসেছি, এই ভাবেই কেদারনাথ পর্য্যন্ত যেতে হবে। আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন-বাসিনী মাতাজীদের মধ্যে একজন গত বৎসর কেদার-বদরী এসেছিলেন। তিনি বল্‌লেন, গত বৎসর এ পথ খুবই খারাপ ছিল; বোধ

গৌরীকুণ্ড
২ মাইল

হয় এ বৎসর কুম্ভমেলার জন্য অনেক যাত্রী চলাচল করবে বলে পথগুলি বিশেষরূপে মেরামত করেছে। তাই গত বৎসরের মত এবার আর পথ মোটেই খারাপ নয়—তবে চড়াই বটে!

আমরা যে চটীতে আড্ডা নিয়েছিলাম, তার পাশেই একটি বড় মন্দির, তাতে শিব-দুর্গা বিরাজিত আছেন। তার পূর্ব্বদিকে পাশা-পাশি দুইটি বড় বড় কুণ্ড; একটি গরম জলের, অন্যটি শীতল জলের। কুণ্ড দুটির চারিদিক পাথর দ্বারা বাঁধান। মাটীর ভিতর দিয়ে কোথা হতে ঝরণার জল এসে অনবরত গরম জলের কুণ্ডে গরম এবং ঠাণ্ডাজলের কুণ্ডে ঠাণ্ডা জল পড়ছে, বিশেষ চিন্তার বিষয় বটে! আমরা খোঁজ করেছিলাম, কারণ উদ্ঘাটন করতে পারিনি। এ যেন ভগবান্ কেদারনাথের অহৈতুক দান! এরূপ শীত প্রধান স্থানে গরম জল পেলে তাতে স্নান করা যে কত সুখকর, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই বোধ হয় বুঝ্‌তে পারেন। কিন্তু বেশী সময় জলের মধ্যে থাকলে অতিরিক্ত গন্ধকের দরুণ মাথা ঘুরতে থাকে তথা গা বমি বমি করতে থাকে। যে স্থান দিয়ে জল এসে কুণ্ডে পড়্‌ছে, সে স্থানে পিতলের গোমুখাকৃতি এক একটি বড় নল লাগান আছে। আবার কুণ্ডে বেশী জল হলে তা অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে মন্দাকিনী গঙ্গায় যেয়ে পড়ার ব্যবস্থা আছে। কুণ্ড দুটির জল কটু স্বাদযুক্ত; স্থানীয় মৃত্তিকা কিন্তু সিন্দুর বর্ণ। ঠাণ্ডা জলের কুণ্ডটির জল হরিদ্রা বর্ণ। শাস্ত্রে আছে, পার্ব্বতী দেবী কার্ত্তিকের উৎপত্তির সময় সর্ব্বপ্রথম এই কুণ্ডে ঋতুস্নান করাতেই এই কুণ্ডের নাম **গৌরীকুণ্ড** তথা এর জল হরিদ্রা বর্ণ হয়েছে। এ সব তীর্থ মাহাত্ম্য স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কেদারখণ্ডের প্রথম ভাগের ৪২ অধ্যায়ে উক্ত আছে। যথা:—

ত্রিগব্যূতৌ মম স্থানাদ্দক্ষিণে শৃণু তীর্থকম্ ।
গৌরীতীর্থমিদং খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কম্ ॥

শিবজী পার্ব্বতীকে বল্‌ছেন, আমার স্থান (কেদারনাথ) হতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে যে তীর্থ আছে, তাকেই লোকে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গৌরীতীর্থ বলে থাকে।

যত্র ত্বয়া মহেশানি মন্দাকিন্যাস্তটে পুরা ।
ঋতুস্নানং কৃতং তদ্ধি গৌরীতীর্থমিতি স্মৃতম্ ॥

হে মহেশানি ! ওখানে মন্দাকিনী গঙ্গার তটে, যেখানে তুমি প্রথমে ঋতুস্নান করেছিলে, ঐ তীর্থকে নিশ্চয়ই গৌরীতীর্থ বলে জেনো।

মহাসেনস্য উৎপত্তৌ বিস্মৃতং কিং ত্বয়ানঘে ।
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি যেন তজ্জায়তে শুভম্ ॥

তুমি কি ভুলে গেছ যে, ঐ স্থানে মহাসেনা কার্ত্তিকের উৎপত্তির সময় তুমি প্রথমে ওখানে ঋতুস্নান করেছিলে ? আমি এখন ঐ স্থানের চিহ্ন তোমায় বল্‌ছি, যার দ্বারা ঐ মঙ্গলজনক স্থান ভালরূপে জান্‌তে পার্‌বে।

কটূষ্ণং তু জলং তত্র সিন্দূরাভা তু মৃত্তিকা ।
তৎস্থানং দেবদেবেশি ন ত্যজামি কদাচন ॥

হে দেবদেবেশি ! ঐ স্থানে এক কুণ্ডে গরম জল আছে, যার স্বাদ কটু এবং ঐ স্থানের মৃত্তিকা সিন্দুর বর্ণ ; আমি ঐ স্থান কখনও ত্যাগ করি না।

তত্র গৌরীশ্বরত্বেন খ্যাতোঽহং শিবলোকদঃ ।
স্নানং করোতি যস্তত্র মৃত্তিকাং শিরসা বহেৎ ॥
স বৈ মম প্রিয়তরো যথা ত্বং মম বল্লভা ।
যত্র যদ্ধি কৃতং কর্ম্ম তদ্ধি কোটিগুণং ভবেৎ ॥

ঐ স্থানে আমি শিবলোক-প্রাপ্ত-ফল দানকারী গৌরীশ্বর শিব (উমা মহেশ্বর) নামে বিখ্যাত হয়েছি। যে যাত্রী এই গৌরীতীর্থে স্নান করে এবং ঐ সিন্দুর বর্ণ মৃত্তিকা শিরে ধারণ করে, হে বল্লভে ! সে আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়—যেমন তুমি আমার অতি প্রিয়। তথা ঐ গৌরীতীর্থে যে কোন কাজ করা যায়, তার ফল কোটিগুণ অধিক হয়।

প্রথমে ঠাণ্ডা কুণ্ডের জলে স্নান করার পর সেই ভিজে কাপড় সহ গরম জলের কুণ্ডে স্নান করা বিধি। যথা :—

স্নানমাদৌ প্রকুর্ব্বীত শীতকুণ্ডে বিচক্ষণঃ ।
ততস্তপ্তোদকেনৈব স্নানং কুর্য্যাৎ সচেলকম্ ॥
তর্পণাদিকশ্রাদ্ধেন পিতৄন্সন্তর্পয়েৎ পুমান্ ॥

বুদ্ধিমান্ যাত্রী প্রথমে শীতল জলের কুণ্ডে স্নান করে ঐ স্নানের বস্ত্র সহ গরম জলের কুণ্ডে স্নান কর্‌বে। পরে তর্পণাদি শ্রাদ্ধ করে পিতৃপুরুষদের সন্তর্পণ কর্‌বে।

আমরা উপরোক্ত নিয়মানুসারে প্রথমে ঠাণ্ডা জলের কুণ্ডে স্নান কর্‌লাম। পরে সাধ্যানুযায়ী দক্ষিণাদি দান এবং গৌরীশ্বর শিব ও গৌরী দেবীকে দর্শন-প্রণাম আদি করে চটীতে ফির্‌লাম।

এর নিকটেই গোরক্ষনাথের সাধনার স্থান **গোরক্ষাশ্রম** বিদ্যমান আছে ; আমাদের দেখ্‌বার সুবিধা হয়নি। এই গোরক্ষাশ্রমে সাত দিন-রাত একাগ্রচিত্তে "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মহামন্ত্র জপ কর্‌লে মানুষ গোরক্ষনাথের সমতুল্য হবেন বলে শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা :—

তস্মাদ্দক্ষিণতো দেবি গোরক্ষাশ্রমরক্ষকম্ ।
যত্র সিদ্ধো মহাদেবি গোরক্ষো বসতেঽনিশম্ ॥
তত্র স্থিত্বা সপ্তরাত্রং তপদ্ধি শিবমুত্তমম্ ।
সিদ্ধো ভবতি দেবেশি যথা গোরক্ষ উত্তমঃ ॥

* * *

আমরা দ্বিপ্রহরে এখানেই আহারাদি করে বিকেলে আবার বের হয়ে পড়্‌লাম। এখন প্রায় সমস্ত পথটিই চড়াই। এখান হতে দেড় মাইল চড়াই করার পর **চীরবাসা ভৈরব** দর্শন কর্‌-

চীরবাসা ভৈরব ১॥ মাইল

লাম। এই চীরবাসা ভৈরবজীকে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা পূজা করার বিধি। নতুবা তিনি যাত্রীদের সমুদয় ফল অপহরণ করেন। যথা :—

গৌরীতীর্থাদূর্দ্ধভাগে পর্ব্বতে সৌম্যদিক্‌স্থিতে।
চীরবাসা ভৈরবস্তু ক্ষেত্রং রক্ষতি মামকম্॥
তস্মৈ চীরাদিকং দত্বা সর্ব্বং পুণ্যং লভেন্নরঃ।
অন্যথা তৎফলং সর্ব্বং হরতে ভৈরবঃ শিবঃ॥

হে দেবি! গৌরীতীর্থ হতে উর্দ্ধদিকে দুই মাইল দূর পর "চীরবাসা ভৈরব" নামক এক ভৈরব আমার কেদার ক্ষেত্রের রক্ষার জন্য বাস করেন। ঐ ভৈরবকে "চীর" (বস্ত্র) আদি দিলে যাত্রীর সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। যে যাত্রী ভৈরবকে চীর আদি না দিয়ে আমার ক্ষেত্র আসে, তার সমস্ত ফল চীরবাসা ভৈরবরূপী শিব হরণ করে থাকেন।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্পূজ্য ভৈরবং বিশেৎ।
কেদারং মামকং ক্ষেত্রং স বিঘ্নৈর্নাভিভূয়তে॥

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ভৈরবজীর পূজা করে আমার (কেদারনাথ) প্রিয় ক্ষেত্র কেদার ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি এই ভাবে যাত্রা করেন, তাঁর কোন বিঘ্ন বা ভয় থাকে না।

উক্ত চীরবাসা ভৈরবের উপরে দুঃসহা কালী বাস করেন; তাঁকেও প্রণামান্তর পূজাদি করে কেদারপুরী প্রবেশ করা বিধি। যথা :—

তস্মিন্নেব মহাশৈলে কালী বসতি দুঃখহা।
তাং নমস্কৃত্য গচ্ছেত পর্য্যঙ্কে নামকে শিবে॥

ঐ পর্ব্বতে সর্ব্ব দুঃখ হারিণী কালী বাস করেন। হে শিবে! তাঁকে প্রণাম করে আমার পর্য্যঙ্ক (ভীমসেনশীলা) নামক স্থানে যাবে।

আমরা আবার চড়াই করে আধ মাইল যাবার পর **স্বর্গ লছমী** নামক চটী পেলাম। এর অন্য নাম রাম চটী বা জঙ্গলা চটী। চারিদিক ঘোরতর মেঘাবৃত হওয়ায়, অতি শীঘ্র বৃষ্টির আশঙ্কায় আমরা আর

স্বর্গ লছমী
। মাইল

অগ্রসর হলাম না। বৃষ্টির ভয়ে এখানেই থাকা স্থির করে চটীতে আশ্রয় নিলাম, অতি সত্বরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। তা ছাড়া আমরা ক্রমশঃই কেদার পুরীর নিকটবর্ত্তী হচ্ছি, ক্রমেই শীতের প্রকোপ বাড়্‌ছে। আবার কেদারপুরী চির-বরফাবৃত স্বর্গারোহণ পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত।

সারদা ভায়া ও সরোজিনী মা আমাদের ফেলে আগেই রামবাড়া চটীতে চলে গেছে। এ পথে সেইটাই শেষ । তার পরই কেদার নাথ ধাম। আমাদেরও আজ সেখানে যেয়েই থাকার কথা ছিল, কিন্তু বৃষ্টি আসার জন্য যেতে পার্‌লাম না—কাজেই দুই দল হয়ে গেলাম। ওরা দু'জনে আমাদের ছেড়ে আজ রাত্রি সেখানে কাটালো। এখানে একটী মাত্র ছোট চটী। জলের খুব সুবিধা। গৌরীকুণ্ড ও এখানে জিনিষাদির দাম একরূপ। চাউল ৸৴৹ সের—মোটা; ডাল ৸৴৹ আনা, দুধ ।৹ আনা, ঘৃত ৩৲ টাকা, সরিষার তৈল ২৲ টাকা, আটা ৷৷৹ আনা সের। রাতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়্‌ছিল, স্থানটি বন জঙ্গলের ভিতর অবস্থিত।

১১ আষাঢ় ২৬ জুন রবিবার—

আজ আমাদের মহা সৌভাগ্যের দিন। এত দীর্ঘ দিন ধরে আমরা যাঁর দর্শন স্পর্শন লাভের আশায় নানা কষ্ট সহ্য করে আস্‌ছি, আজ আমরা আমাদের সেই আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীকেদার-নাথ জীকে দর্শন করে জীবন ধন্য করব। সেই আশায় রাত্রে ঘুম পর্য্যন্ত হয়নি। কাল সারদা ভায়া ও সরোজিনী মা আমাদের ছেড়ে উপরের চটীতে চলে যাওয়ায় তাদের জন্যও মনটি বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিল; কাজেই খুব সকালেই চটী হতে বের হয়ে পড়্‌লাম। ধীরে ধীরে ক্রমোচ্চ পথে

চড়াই করে যেতে লাগ্‌লাম। সোয়া মাইল যাবার পর **ভীমসেনশীলা** দৃষ্ট হল। এক খানা বড় পাথরে

ভীমসেনশীলা
:। মাইল

ভীমসেনের বিশাল মূর্ত্তি খোদিত আছে। পাণ্ডাগণ বলে থাকেন, পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান কালে এই স্থানেই ভীমের দেহ ত্যাগ হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাণ্ডবগণ এই পথেই মহাপ্রস্থান করেছিলেন এ কথা সত্য বটে, কিন্তু এখানেই যে ভীমসেনের দেহপাত হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নাই। যদি ভীমসেন এখানেই দেহত্যাগ করেন, তা হলে তাঁর দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী এই ভীমসেন শীলার অর্থাৎ ভীমসেনের দেহত্যাগের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছিলেন; অর্থাৎ বিবেচনা করে দেখ্‌লে মনে হয়, তা হলে উক্ত তিন পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে দেহত্যাগ করে থাক্‌বেন। যদি তাহাই হয়, তা হলে তাঁদের দেহত্যাগের স্থান কোথায়? সে সব স্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ আমি এর পর দেখাব, কেদার নাথে উপনীত হয়ে পাণ্ডবগণ কেদার নাথের পূজাদি করেছিলেন। সুতরাং এ স্থানে ভীমের দেহত্যাগ হতেই পারে না। পাণ্ডবগণ যে কেদার নাথের উপরে "স্বর্গারোহণ শিখর" নামীয় পর্ব্বতে আরোহণ করেছিলেন, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। সে পাহাড়টী চির-তুষারাবৃত (glacier) থাকায়, তাতে এঁদের দেহত্যাগ হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়। কারণ সে পথে যে কোন লোক যাবে, তিনি না ফির্‌লে তাঁর দেহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। কেদার নাথের উপরের সমুদয় পর্ব্বত শৃঙ্গ চির-তুষারে আবৃত। ঐ পাহাড়গুলি বাইশ হাজার ফুটেরও বেশী উঁচু। তবে একথা সত্য যে, এ তুষারাবৃত পাহাড়গুলি ডিঙ্গিয়ে যদি একবার তিব্বতে পৌঁছা যায়, তাহলে আবার দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ আদির মত স্থান পাওয়া যাবে। তারও আগে চলে গেলে আমাদের দেশের মতই স্থান পাওয়া যাবে, সে চীন দেশ। যাঁরা ভারতবর্ষ তথা চীন দেশের ম্যাপ দেখেছেন, তাঁরা আমার কথাগুলি বেশ বুঝ্‌তে পারবেন।

স্কন্দ পুরাণে উক্ত আছে, শিবজী বল্‌ছেন— বিষ্ণুস্থান (ত্রিযুগী নারায়ণ) হতেও এই ভীমসেনশীলা শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! ভীমসেন শীলা আমার পর্য্যঙ্ক। যথা:—

শিবস্থানমিদং প্রোক্তং বিষ্ণুস্থানমতঃ শুভম্।
ভীমসেনশীলা দেবি পর্য্যঙ্কং মম কীর্ত্তিতম্।

আজের পথ অতি মধুর এবং অতি আনন্দময়! যদ্যপি বিকট পথে চড়াই করে চলেছি, তথাপি বাঁ দিকের পর্ব্বতগাত্র অসংখ্য রং বেরংএর গাছে নানা প্রকার সদ্য বিকসিত কুসুম রাশির বিমোহন শোভায় তথা তার সুমধুর সুগন্ধে প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো। অদূরেই নানা প্রকার জঙ্গলী গাছে পাহাড়টী এমন সজীব করে রেখেছে এবং তার মাঝে মাঝে এমন সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে—জানি না, সংসারে কে এমন পাষাণহৃদয় ব্যক্তি আছে, যার হৃদয় প্রকৃতির এ মনমোহিনী মূর্ত্তি দেখে ভক্তিরসে অপ্লুত হয়ে না উঠে! ঠিক এরই অপর পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকস্থ পর্ব্বত শিখর গুলি ঠিক এরই উল্টো ভাব ধারণ করে রয়েছে। তাদের মাথা গুলি আবার চিরতুষারে আবৃত থাকায় মনে হচ্ছে, যেন ধবলেশ্বর নিজের ধবলরূপের প্রচারের জন্য তাদের শিরগুলিতে ধবল বর্ণের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। পর্ব্বতগুলি যেন জগৎ পিতার অমিয় মধুর স্নেহে আনন্দে গদ্‌ গদ্‌

হয়ে সদা ধবল বর্ণেরই অশ্রু বর্ষণ করছে; তাদের সেই অশ্রুকণা পর্ব্বত শিখর হতে ধীরে ধীরে নীচের দিকে পড়্‌বার সময় অতিরিক্ত ঠাণ্ডার দরুণ যেন পাহাড়ের বুকে জমে রয়েছে। এরূপ দৃশ্য একটি দুটী নয়—অসংখ্য। কে তার গণনা করে? শুধু যে তাদেরই অশ্রুকণা তাদেরই বুকে শোভা পাচ্ছে, তাও ত নয়! আবার কতগুলি অশ্রুকণার আনন্দাশ্রু এত গরম যে এত শীতেও তাদের জমাতে পারছে না; তারা যেন এলো মেলো ভাবে সুপবিত্র মন্দাকিনী মায়ের কোলে আশ্রয় লাভের আশায় পিতার স্নেহ উপেক্ষা করে ছুটে চলেছে। আহা, সে কি মনোরম দৃশ্য!! যাঁর হৃদয় আছে, তিনিই এ মহা মহিমাময়ের এ মহিমা উপভোগ করতে পারেন। লেখনীর শক্তি নাই, সে মনোরম দৃশ্যের বর্ণনা করতে পারে। আমরা যে পথে চলেছি, তাতে জলপ্রপাতের অন্ত নাই। আজ যেন আনন্দময় পরম ভোলা ভোলানাথ তাঁর সন্তানগণের সুখ বর্দ্ধনের জন্য এ বিকট পথে প্রকৃতিকে নানা ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। ধন্য প্রভু! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্!

এই ভীমসেন শীলা হতে আধ মাইল দূরেই **রামবাড়া** চটী। আমরা ভীমসেনশীলার বিশাল মূর্ত্তিকে প্রণামাদি করে আবার ক্রমোচ্চ চড়াই পথে রওনা হলাম। খানিক দূর যাবার পর আমাদের বদরী নারায়ণের পাণ্ডা রাম প্রতাপ নম্বর দারের ভ্রাতুষ্পুত্র বাঁকেবিহারী লালের সঙ্গে দেখা হল। দেব প্রয়াগ ছাড়ার পর অনেক দিন হয়ে গেল আমরা বদরী নারায়ণে না পৌছার দরুণ এঁরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চিন্তার বিষয়ও বটে! আমরা যেরূপ মন্থর গতিতে প্রকৃতির ক্রোড়ে লুটো পুটি করে খেলা করতে করতে চলেছি, সে খবর ত এঁদের নেই। সাধারণ যাত্রী,—শুধু সাধারণ যাত্রীই নয়, প্রায় সব যাত্রীই তীর্থের যাত্রা সম্পন্ন করে শীঘ্রই ঘরে ফিরে আসার জন্য ছুটে চলে। আমাদের ঘর কোথায়? কার মায়ায় মোহিত হয়ে এমন সাধের তপোবন, এমন পবিত্র সাধনভূমি, এমন দেবতাদের সুমনোরম লীলানিকেতন, প্রকৃতির এমন মন প্রাণ ভুলান শোভা ভুলে কার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে চলে আস্‌বো? সে সব স্থান যে কত মধুময়, কত আনন্দময়, কত শান্তিপ্রদ কেমন করে তা বুঝাব? যখনই সে সব রম্য নিকেতনের কথা মনে হয়, তখন রাজপ্রাসাদও যে অরুচিকর হয়ে ওঠে, আর হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করে অস্ফুট কান্না বের হয়ে পড়ে। জানি না, এ কান্না কার তরে এমন আকুল বেগে হৃদয় বেয়ে চলে যায়। এখনও বুঝতে পারিনি—একি আমার মায়া, না ভগবৎপ্রেম!

বাঁকে বিহারী লালের সঙ্গে আমাদের দেবপ্রয়াগে দেখা হয়েছিল। লোকটী খুব ভাল—অমায়িক। আমাদের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করেছেন। পাণ্ডা করতে হলে এমন সৎপাণ্ডাই করা দরকার। তিনি একজন বড় লোক যাত্রীর সঙ্গে কেদারনাথ হয়ে বদরীনারায়ণ যাচ্ছেন। সামান্য কথাবার্ত্তার পর বিদায় নিলাম। (ক্রমশঃ)

জন্মোৎসবে

——)•(——

বাইরে-ভিতরে যখন মানুষ কিছু পায়, তখনই তার আনন্দ উপচে পড়ে, আর সেই দিনটীকেই বলি উৎসবের দিন—আনন্দের দিন, যে দিন অতীতের একটী মাত্র ঘটনা বা স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করে আমাদের শিরায়-উপশিরায় একটা নিস্তব্ধ আনন্দের প্রবাহ বয়ে চলে। আনন্দ হয় কিসে—না, কেন আমরা আনন্দ করছি তা বুঝতে পাই ব'লে। আজ আমাদের একটা আনন্দের দিন—ঠাকুরের জন্মোৎসব ব'লে! পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে; কিন্তু কৈ, সকলের জন্মদিনটীকে তো হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা দিয়ে পূজা করতে আকাঙ্ক্ষা হয় না—জগতে সকলেই তো পূজার আসন পাবার যোগ্য নয়। কাজেই যে ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ দৈবশক্তি নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর জীবনেরই একটা গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে এবং সেই তাৎপর্য্যের দরুণই তাঁর জীবনের মূল্য এত বেশী! অন্তরঙ্গ পারিষদগণ যখন এই তাৎপর্য্যটী অনুভব করতে পারেন, তখনই তাঁদের আনন্দ, তখনই তাঁদের উৎসবের আনন্দ-কলরব! বিশেষ দিনে আমাদের সেই স্মৃতিই আরও উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে; আমাদের তখন মনে হতে থাকে, ঠিক এমন একটী দিনেই তো আমাদের দরুণ দেবলোক হতে তিনি নেমে এসেছিলেন—অথচ তার এতটুকু আভাসও তো আমরা তখন পাইনি। দিনে দিনে যতই তার পরিচয় পাই, অন্তর ততই তাঁর প্রতি সরস সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে!

জন্মোৎসবের দিনে প্রথম কাজই হল, যাঁর ভিতর থেকে আনন্দের কণা সংক্রামিত হয়ে আজ আমাদের এমন উৎফুল্ল সজীব করে তুলছে, তাঁর জীবন কাহিনী অর্থাৎ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা, দেশহিতকর কার্য্য, এক কথায় বলতে গেলে তাঁর জীবন যে একলা তাঁরই নয়, এর সঙ্গে কত শত লোকের জীবনের সুখ দুঃখের সূত্র জড়িত রয়েছে, আর তার দরুণই যে একলা আনন্দ পেয়েও নিজকে তিনি গোপন করে রাখতে পারলেন না—আনন্দ পেয়েছিলেন বলেই যে এত লোকের দুঃখ মোচনের ভার নিজ হাতে নিয়ে তাঁকে নির্ব্বিকল্প সমাধি থেকেও ফিরে আসতে হয়েছে, এ সব কথাই আজ আমাদের আলোচনার বিষয়। জন্মোৎসবের আনন্দ আজ আমাদের সার্থক হবে—যদি আমরা আমাদের জীবন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, ভাবে, ভাষায় সেই নিগূঢ় তাৎপর্য্যটীকেই ফুটিয়ে তুলতে পারি। তাই উৎসবের দিন নিছক আনন্দের দিনই নয়, এর মাঝে কঠোর দায়িত্বের কথাও রয়েছে। সেই দায়িত্ব ভুলে, উৎসবের আসল তাৎপর্য্যটাকে ভুলে গিয়ে আড়ম্বর করে উৎসবে মেতে গেলে উৎসব হবে বটে, কিন্তু উৎসবের সার্থকতা হবে না।

প্রথমেই দেখি মহাপুরুষের জীবন "বহুজনহিতায়"—তাই ইচ্ছা করেও তাঁরা নীরব হয়ে থাকতে পারেন না। বাংলায় যখন বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়িত হয়ে উঠেছে, সে সময় হিমালয়ের গভীর প্রদেশে সাধনায় সিদ্ধকাম হয়ে ঠাকুর তাঁর গুরুর কাছ থেকে স্বদেশ সেবার দীক্ষা গ্রহণ করছিলেন। তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেমের সাধন-রহস্যবিদ্ শিষ্যকে গুরু তখন শুনাচ্ছিলেন—"দেশে নব-যুগের সূত্রপাত হয়েছে, বহু কাজ সম্মুখে; লোক শিক্ষার

ব্রত নিয়ে তুমি আবার দেশে ফিরে যাও।"

এখানেই দেখি, মহাপুরুষদের জীবনের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য থাকে। নিজে সদ্ধকাম হ'তে পারলেই তাঁদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা হয় না, আরও দশজনকে উন্নতির পথে টেনে নিতে না পারলে, সৎ-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে, তাঁরা যেন স্থির হয়ে একজায়গায় বসে থাকতে পারেন না। রামকৃষ্ণদেব যে ছাদের উপর উঠে আকুল হয়ে অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকতেন "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়" (একদিন নরেনের (বিবেকানন্দের) বাড়ীতে গিয়েই হাজির। —এই যে প্রাণের নিদারুণ আকুলতা, অপরকে দিব্য প্রেরণা দিয়ে কাছে টেনে আনার অদম্য আবেগ, এ হয় শুধু মহাপুরুষদের মাঝেই, কেননা নিজের মুক্তিটাকেই তাঁরা বড় বলে মনে করেন না, যে পর্য্যন্ত আরও দশজনকে মুক্ত করতে না পারেন। একদিন বুদ্ধদেবের ভিতরও এ প্রশ্ন জেগেছিল। সিদ্ধিলাভ করার পর তাঁর ভিতরও সেই অমূল্য ধন বিতরণের আকাঙ্ক্ষা জাগল, তিনি ভাবতে লাগলেন— কাকে এই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করবেন, কে এই গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম। শেষে সারনাথে উপস্থিত হয়ে পূর্ব্বের সেই পঞ্চ অনুগত শিষ্যকে দেখতে পেলেন এবং তাদেরই উপযুক্ত দেখে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করলেন এই উপলক্ষ্যে তিনি তাদের যে উপদেশ প্রদান করেন, তাই ধর্মচক্র-প্রবর্ত্তন সূত্র নামে জগতে প্রসিদ্ধ।

ঠাকুরও সিদ্ধিলাভের পর গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে লোকশিক্ষার ভার নিয়ে যখন ফিরে এলেন, এসেই দেখেন আর্যসত্যসমূহ ধারণা করবার মত যোগ্য আধারই নেই, তাই প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্যানুকূল নিয়ম সংযম দ্বারা কয়টী তরুণ প্রাণকে উপযুক্ত করে তুলবার স্পৃহা তাঁর ভিতর জেগে উঠল, আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রহ্মচর্য্য বইখানা লিপিবদ্ধ করলেন। ক্রমশঃই যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এই ব্যভিচার-অনাচারের যুগেও কতক লোকের প্রাণে ভাল হবার একান্ত ইচ্ছা আছে, তখনই তাদের দুঃখে করুণার্দ্র হয়ে আস্তে আস্তে প্রাঞ্জল-ভাষায় আরও কয়টী পুস্তক প্রণয়ন এবং আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করলেন। আজ তো তাঁর কত শিষ্য ভক্ত এবং বাংলার পাঁচ বিভাগে পাঁচটী আশ্রমও গড়ে উঠেছে।

দেশকে অনুপযুক্ত দেখেও তাঁর মহৎ সঙ্কল্পের গৌরব প্রাণ থেকে মুছে যায়নি—এইটীই তাঁর অসাধারণ মহত্ত্ব। আর আমাদেরও ভাগ্য বলতে হবে, গোড়া থেকেই তাঁর শুভ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়েও আজও তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হইনি। আমরা বলে আসছি—না, আমাদের দিয়ে কিছু হয়ে উঠবে না; আর আমরা যতখানি নিরাশ হয়ে এ কথা বলছি, তার চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহ দিয়ে তিনি বলছেন না, তোদের দিয়েই হবে। এখানেই বুঝি তাঁর ভিতর সঙ্কল্পের জোর কত প্রবল! যোগ্য করে তুলতে পারবেন এ আশা রয়েছে বলেই অযোগ্যতাকে তিনি ততটা বড় করে দেখেননি। এ তো নিজেদের জীবন দিয়েই বুঝতে পারছি. উপযুক্ত আধার পেলে আরও কত সহজে তিনি জগৎকে যা দিতে চেয়েছিলেন, তা দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু প্রথমে এসেই এ জায়গাতেই তাঁকে আঘাত পেতে হল, কিন্তু তাতে তিনি নিরস্ত হয়ে যাননি, বরঞ্চ দেবার আকুলতাটা বাধা পেয়ে আরও বেড়ে উঠল, তাই নিজ হাতে আধার তৈরী করতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

ঠাকুরের বিশেষ বিশেষত্ব এ জায়গাতেই—ভাবে কর্ম্মে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য! সব জায়গাতেই তাঁর আত্মশক্তির মহিমাই দেখতে পাই। সিদ্ধিলাভ করলেন এ-ও আত্মশক্তিতেই, আবার সাধনলব্ধ সত্য দিতে চাইলেন, এখানেও আত্ম-শক্তিতেই

আধার তৈরী করতে হল। শুধু ভাববাক্যে বিচরণ করে তিনি সত্য প্রচার করেননি; যা করেছেন, নিজকেই হাতে কলমে সব দেখিয়ে দিতে হয়েছে। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্য মহাপুরুষদের সঙ্গে ঠাকুরের বিশেষত্ব রয়েছে বই কি? যোগ্য আধার পেলে ভাব সংক্রমণে বিশেষ বেগ পেতে হয় না কিন্তু ঠাকুরের আগাগোড়া কেবল সংগ্রাম করেই চলতে হয়েছে তাই সিদ্ধ হলেও ঠাকুরকে এদিক দিয়ে সাধকই বলা যেতে পারে। কেননা এখনও তিনি আধার তৈরী করবার দরুণ আপ্রাণ সচেষ্ট। এক সঙ্গে ভাব সংক্রমণ এবং আধার শুদ্ধি করে তোলা—এ বড় সহজ কথা নয়। আত্মশক্তির কতখানি অমোঘ প্রভাব থাকলে মানুষ এমনভাবে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করেও সত্যপ্রতিষ্ঠা করতে পারে, তা ভাববার কথা বটে!

আমাদের দায়িত্ব আরও বেশী বলেছিলাম এ দিক দিয়ে—আমরা আশ্রিত সেবক আমাদের তৈরী করবার দরুণই তিনি এত কাছে আমাদের আকর্ষণ করে এনেছেন, তাঁর অন্তর্নিহিত মহৎ ইচ্ছার সার্থকতা আমাদের জীবন দিয়েই প্রতিপন্ন হবে বলে আমাদের শিক্ষা দীক্ষার ভার তিনি নিজ হাতে নিয়েছেন। সত্যি সত্যি যদি আমরা আমাদের জীবন দিয়ে তা প্রতিপন্ন করতে না পারি তবে যে আমাদেরই জবাবদিহী হতে হবে প্রথমে, দেশের লোকের কথা তো পরে। আত্মসমর্পণের কথা শুনে আমরাই প্রথমে তাঁর চরণতলে ছুটে এসেছিলাম তিনি চেয়েছিলেনও কয়েকটী সমর্পিত জীবন, যাতে তারা তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে তুলতে পারে। স্বেচ্ছায় আমরা সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম—এখন যদি তার পরিচয় দিতে না পারি, তবে আমাদের জীবনই যে ব্যর্থ! আজ ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিনে সকলকেই এ কথাটি ভাবতে অনুরোধ করি, কে কতদূর তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল ভাবে জীবনকে গঠিত করে তুলেছেন। ফুল বেলপাতা দিয়ে আশ্রম সাজানো, আর ভোগের আড়ম্বর হলেই জন্মোৎসব ঠিক ঠিক হল না আমি তো বুঝি নিজেরা তৈরী না হলে, ঠাকুরের জন্মের গভীর তাৎপর্য্য বুঝবার যোগ্য না হলে জন্মোৎসবের আড়ম্বর করা বৃথা।

ঠাকুরের জীবনের গভীর তাৎপর্য্য নিজেই বুঝে ফেলতে পারব, এতদূর স্পর্দ্ধা করি না—কিন্তু এটুকু ভরসা আছে, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝি, সমর্পিত জীবনেরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, আর সে উদ্দেশ্য তিনি কৃপা করবেন বলেই সফল হয়ে উঠবে। উপযুক্ত আধার পেলেন না বলে ঠাকুরের মনে যে দুঃখ হয়, আমরা ঠিক ঠিক উপযুক্ত হয়ে যদি তাঁর সেই দুঃখের স্মৃতিকে অপসারিত করে দিতে না পারি, তবে আর আশ্রিত জীবন কর্ত্তনে কি লাভ? তাই বলছি, কেবল বাইরের আনন্দ নিয়ে মেতে পড়লে চলবে না, কে কতদূর উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হয়ে গড়ে উঠেছেন—সমাহিত হয়ে, জন্মোৎসবের দিনে আজ কেবল সেই কথাটীই ভাবুন।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।"

—ঋগ্বেদ সংহিতা

নিবৃত্তিটা ঠিক প্রবৃত্তির মতই স্বাভাবিক; তাতে তো তোমার কোন বাহাদুরী নাই সবই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে উজান বওয়ানোটা শক্তির কাজ বটে!

* * *

ব্যাপ্তিবোধ ঠিক ঠিক হ'লে ঔদাসীন্য থাকতে পারে না। আত্মা যত উজ্জ্বল হবে, ঔদাসীন্য ততই কমবে।

* * *

যার যাতে রুচি নাই, তাই যে তার পক্ষে অমঙ্গল, এমন নয়। পরম হিতকর জেনেও মানুষ তা চক্ষুলজ্জার খাতিরে গ্রহণ করতে পারে না। অথচ অবৈধ কার্য্যে চক্ষুলজ্জার বাধাকে এড়ানো যায়, কিন্তু বৈধ কার্য্যেই যত যুক্তি-তর্কের বাড়াবাড়ি!

* * *

বীর যদি হও—যা সত্য বুঝবে, তার দিকে রুখে পড়বে। ঢেকে ঢেকে চলে সমাজভয়ে ভীত যে—দুর্ব্বল সে। বিচারের ঠাকুরে যা টিকবে, তা গ্রহণ করতে আনচান্ কেন?

* * *

জানা কথাই বেশী করে শুনতে হয়। যদি এমনি ভাবে শুনতে শুনতে প্রাণে দাগ লেগে যায়—নতুবা নূতন কথা তো বোঝাই দায়। বুঝলেও প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকতে পার কই? কথা পুরাণো, কিন্তু অর্থ নূতন হয়ে প্রাণে বেজে উঠুক।

চিন্তাধারাকে সংযত করলে তা ওর মূল উৎসেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখন অধ্যাত্ম-সম্পদ্ খুলে যায়। যিনি মনকে সংযত করেছেন, তিনিই প্রকৃত ধনী এবং প্রকৃত বীর।

* * *

তুমি আমি, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, নদী পর্ব্বত সকলেই আমরা জগৎ নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছি, আর আমরা আপন আপন অংশ সুন্দর ভাবে অভিনয় করছি ব'লে নাটকটী সুন্দর ভাবেই অভিনীত হচ্ছে।

* * *

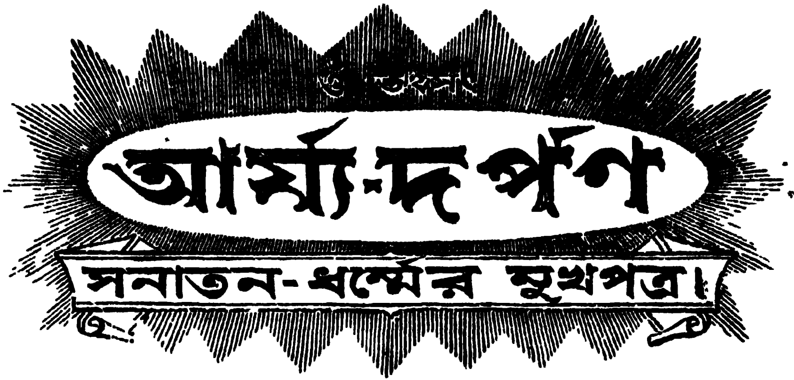
সত্যকে মিথ্যারূপ সংস্কারের আবরণে কতক্ষণ ঢেকে রাখা যায়? মাণিককে যতই গভীরতম অন্ধকারগর্ভে নিপাতিত কর না কেন, তার ঔজ্জ্বল্য ঢাকবার উপায় নাই।

* * *

দম্ভ অহঙ্কারের বশীভূত হ'য়ে অহমিকাকে যতই প্রতিষ্ঠিত করতে যাওয়া যায়, আত্মাকে ততই খর্ব্ব করা হয়। কুকুরের স্থানে ঠাকুরকে বসালে ঠাকুরের আর মর্য্যাদা থাকে না।

* * *

মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরিয়ে যে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বাহাদুরী অর্জ্জন করতে প্রয়াস পায়, আর এই অবসরে স্বকার্য্যসাধন-তৎপর হয়, তার চেয়ে প্রবঞ্চক, আত্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী আর কে থাকতে পারে?



২৪শ বর্ষ
সমষ্টি সং ২৫৭

আশ্বিন—১৩৩৮

১ম খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী-স্তোত্রম্

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

——:(*):——

ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্নবদনৈঃ,
প্রজানামীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ॥

চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি নহে ক্ষম স্তবিতে তোমায়,
পঞ্চানন, ষড়ানন সকলেই সামর্থ্য হারায়।
সহস্রবদন শেষ, তাহারও ত্যো মাগো সেই দশা,
হে ভবানি, তব স্তবে কার বল জুয়াইবে ভাষা?

ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুমধুরিমা কৈরপিপদৈ-
র্বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ।
তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ,
কথঙ্কারং ব্রুমঃ সকল নিগমাগোচরগুণে॥

ঘৃত ক্ষীর দ্রাক্ষা মধু বাক্যাতীত এদের মাধুরী;
ভাষা নারে প্রকাশিতে, অনুভব্য যথা রসনারই।
তোমার সৌন্দর্য্য তথা পরেশেরই দৃষ্টির বিষয়,
কেমনে বর্ণিব তাহা নিগমেরও গোচর যা' নয়॥

মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা,
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎ কাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী,
ভজাম স্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্॥

বদনে তাম্বূল তব, নেত্রযুগ শোভিত কজ্জলে,
ললাটে কুঙ্কুম লেপ, মুক্তাহার বিভূষিত গলে।
দীপ্ত কাঞ্চী স্বর্ণশাটী কটিদেশে শোভিত তোমার,
অয়ি গৌরি! নগরাজকন্যা তোমা নমি বার বার॥

বিরাজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী,
ননদ্বীণানাদশ্রবণবিলসৎকুণ্ডলগুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গী রুচির গতিভঙ্গী ভগবতী,
সতী শম্ভোরম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্বিজয়তে॥

মন্দার কুসুম হার শোভে তব স্তনযুগ তটে,
ঝঙ্কৃত বীণার তানে স্ফূর্ত্ত ওই কর্ণভূষা ঘটে
নতাঙ্গী মাতঙ্গী তুমি, গতি অতি মনোহর;
শিবসতি! সরোজাক্ষি! ভগবতি জয় হোক তোর॥

নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈ-
র্ব্বৃতাঙ্গী সারঙ্গীরুচিরনয়নাঙ্গীকৃতশিবা।
তড়িৎপীতা পীতাম্বরললিতমঞ্জীর সুভগা,
মমাপর্ণা পূর্ণা নিরবধি সুখৈরস্তু সুমুখী॥

অরুণাভ স্বর্ণমণি বিভূষিত করে তব কায়া,
হরিণীনয়না পূর্ণা তড়িতাভা ওগো শম্ভুজায়া।
পীতবাসে সু-নূপুরে আরো তোমা করেছে সুন্দর,
হে অপর্ণা, হে সুমুখি, সুখ মোরে দাও নিরন্তর॥

হিমাদ্রেঃ সম্ভূতা সুললিতকরৈঃ পল্লবযুতা,
সুপুষ্পা মুক্তাভির্ভ্রমরকলিতাচালকভরৈঃ।
কৃতস্থাণুস্থানা কুচভরনতা সূক্তিসরসা,
রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা॥

হিমাদ্রি-সম্ভূতা তুমি কম-কর পল্লব তোমার,
কুসুম মুকুতারাজি, অলিকুল অলকার ভার।
আশ্রয় তোমার স্থাণু রসময়ী কুচভারানতা;
রোগহন্ত্রী সর্ব্বত্রগা বিরাজিছ চিদানন্দলতা॥

সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ,
শ্রয়ন্ত্যন্যে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি।
অপর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ পরিবৃতঃ,
পুরাণোঽপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্যপদবীম্॥

অনেকে আশ্রয় করে স্বল্পগুণা সপর্ণা ব্রততী,
সমাদরে হেথা দেবি! মোর কিন্তু এই হয় মতি।
অপর্ণা তুমিই সেব্যা একমাত্র বিশ্বে সকলের,
পরিবৃত হয়ে যাহে দেয় স্থাণু ফল কৈবল্যের॥

বিধাত্রী ধর্ম্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী,
ত্বমর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াঙ্ঘ্রিকমলে।
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে,
সতাং মুক্তের্ব্বীজং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী॥

ধর্ম্মের বিধাত্রী তুমি, তুমি বেদসমূহ-প্রসূতি,
অর্থমূল তুমি মাগো, পদে তব নত ধনপতি।
সর্ব্বকামনার আদি কামজিতা তুমি গো জননি!
সাধুদের মুক্তিবীজ, তুমি পরব্রহ্মের ঘরণী॥

প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-
স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহমধুনা।
পয়োদঃ পনীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে,
ভৃশং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ॥

যদিও প্রভূত ভক্তি নাহি দেবি চঞ্চল আমার,
চাহিতে হইবে তবু মোর প্রতি সদয়ে এবার।
মেঘ ঢালে মধু-বারি পিপাসিত চাতক-বদনে;
দৈববশে এই মতি জন্মিয়াছে বুঝি মনে মনে॥

কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে,
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি ভরণদীক্ষামুপগতে।
নচেদিষ্টং দদ্যাদনুপদপরিমহো কল্পলতিকা,
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ॥

কৃপার অপাঙ্গ দৃষ্টি ত্বরাকরি কর বিতরণ,
সাধুশীলে! আশ্রিতেরে নহে যুক্ত উপেক্ষা কখন।
অভীষ্ট পূরণ যদি নাহি কর তুমি কল্পলতা,
সাধারণ লতা হ'তে কোথা তবে তব বিশিষ্টতা?

পূজা

—::(০)::—

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা!
তথা হি ত্বৎপাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে,
স্থিতা হ্যেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ ॥

আকুল হৃদয়ে যদি পূজি তোর ও রাঙ্গা চরণ,
ত্রিগুণ ত্রিদেবতার পূজা তবে হবে অকারণ;—
তারা তো রয়েছে মাগো মণিময় তব পাদপীঠে,
ঠেকায়ে মুকুটখানি চিরকাল কৃতাঞ্জলিপুটে!

সত্ত্ব, রজঃ, তম এ তিনগুণ এবং তিনগুণের অধীশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবাই তো মা তোরই চরণাশ্রিত, তোরই শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন করছে! তাহলে আর তাদের পূজা কেন—তোরই রাঙ্গাচরণে ভক্তিপ্রণত হয়ে প্রণাম করব। যারা জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা তারাও যখন মা কৃতাঞ্জলিপুটে তোরই চরণতলে আশ্রয় নিয়েছে, তখন আমরা আর যাব কোথা মা! তোর এই অধম সন্তানদের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর মা—আমরা অবুঝ, তাই যাঁর চরণে আশ্রয় নিলে কোন কামনা, কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকে না, তাঁর কাছথেকেই দূরে সরে পড়েছিলাম! এবার ভুল ভেঙ্গেছে—তুই ছাড়া যে আমাদের আশ্রয় কেউ নাই মা, তা আজ প্রাণের প্রত্যেক তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করেছি। আজ আকুল হৃদয়ে, ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে তোরই পূজায় বিভোর হয়ে যাব মা! আমার মাঝে যখন যে গুণের প্রয়োজন, তুই-ই মা সেই গুণ দ্বারা আমাকে চালিত করিস্। আমি তোর সেই অবুঝ ছেলেই থেকে গেলাম।

মানুষ অহঙ্কারী জীব, মোহে অন্ধ; তাই প্রতি পদে পদে তার ভেদ-জ্ঞান। কিন্তু সকল ভেদকে পদতলে রেখেই যে মা আমার মণিময় আসনে আসীনা! তাই ভেদকে অতিক্রম করতে না পারলে তো মায়ের দেখা মিলবে না, মায়ের স্নেহমাখা কোলে আশ্রয় নিতে পারব না! সকল ভেদ যাঁর পায়ে মাথা নত করে আছে, তাঁকেই আজ আমাদের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই প্রথমেই প্রার্থনা করছি, আমাদের ভেদ-দৃষ্টি বিলোপ করে দাও মা! এ-ও তো ভুল—তোকে দেখলে, তোর চরণতলে আশ্রয় নিলে তবেই না ভেদ লোপ পেয়ে যাবে!

বহুর পূজায় কালাতিপাত করেছি, কিন্তু প্রাণে

তো শান্তি পাইনি কখনো ; আজ তোর স্মৃতিতেই কেন মা আমার ক্ষুদ্র আধারে আর আনন্দের সঙ্কুলন হচ্ছে না। বুঝেছি—বুঝেছি, যাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে মানুষ অমর হয়, শাশ্বত-আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তাঁকেই এতদিন ভুলে ছিলাম আমরা। আমরা নানা দেবতার পূজা ক'রে আসল ইষ্টদেবীর চরণেই অঞ্জলি দেইনি, তাই তো আমাদের পূজা এতকাল ধরে সার্থক হ'ল না।

তুই যে মা বিশ্বজগতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী, এ কথা তো আমরা জানিনি—তাই তোরই শক্তিতে শক্তিমান্ দেবগণেরই আরাধনা চরম মনে ক'রে এতকাল কাটিয়ে এসেছি! আজ তোরই ক্ষণিক কৃপাদৃষ্টির অমোঘ প্রভাবে আমাদের জ্ঞাননেত্র খুলে গিয়েছে। আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি—তুই-ই জগতের সর্ব্বে সর্ব্বা, জগতের সমস্ত শক্তি তোরই পাদপীঠে বিলুণ্ঠিত। তোর শক্তিই দেবে-দানবে-মানবে সঞ্চারিত। তুই ছাড়া কারও কোন সম্বল নাই মা! তুই মা রাজরাজেশ্বরী, আর তোরই শক্তিতে তোর সন্তানগণ গর্ব্বিত। কিন্তু সেই গর্ব্ব যখন আমাদের অন্ধ করে রাখ্‌তে চায়, তখনই মা তুই শক্তি সংহরণ করিস্, আমরা তখনি বুঝ্‌তে পারি, আমাদের গর্ব্ব করার মূলধন কার কাছে?

কেন মা তুই অনধিকারীকে তোর অমূল্য ধন দিয়ে রাখিস্? বুঝ্‌তে পারে না বলেই যে সেই ধনকে অবমাননা করে তোর সন্তানগণ। সব কেড়ে নে মা, কারও যেন কোন আশ্রয়, কোন সম্বল না থাকে, তবেই না মা তোর প্রতি আকুলতা আস্‌বে, প্রাণের টান হবে! শক্তি দিয়ে রেখেছিস্ বলেই তো অন্ধ হয়ে আছি, আসল শক্তির উৎস যে তুই একথা বুঝ্‌তে পারি না। দীনতাই ভাল, রিক্ততাই ভাল—আমরা তোকে দেহে-মনে-প্রাণে, প্রত্যেক তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব কর্‌তে চাই, বিশেষ কোন শক্তির আতিশয্যে তোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তির যে সন্ধান পাই না মা! তাই বলি—দু'দিনের যে সঞ্চিত ধন, মান, অভিমান, গর্ব্ব, যশোলিপ্সা সব কেড়ে নে মা—আমরা মহাশ্মশানে মহাশূন্যে পড়ে একবার তোর বিরাট শক্তির অনুভূতি পাই!

তোর কাছে না গেলে তো বুঝ্‌তে পার্‌ব না মা, কি করে সকল ভেদের প্রবাহ এসে তোর চরণ তলে আত্মসমর্পণ করেছে। দূর থেকে সন্দেহ কেবল বেড়েই চলে—কোথায়ও শান্তি পাই না খুঁজে; যার কাছে যাই, সে-ই ভুল পথ দেখিয়ে দেয়। এমনি করে ভুল পথে চল্‌তে চল্‌তে আজ এত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমার এই অবসাদপূর্ণ নিরাশ দৃষ্টিতেই বুঝি তোর স্নেহের ভাণ্ড উথ্‌লে উঠ্‌ছে। আয় মা, একবার কাছে আয়—মা বলে ডেকে তোর চরণতলে আশ্রয় নিই।

আমাকে নিয়ে তোর যা খুসী মা তাই কর, আমি আর 'আমার' ভার সইতে পারি না! সকল বোঝা আজ তোরই পায়ে সঁপে দিলাম। পূজা-অর্চ্চনা, জপ তপ অনেক করেছি, কিন্তু কোন কিছুতেই তৃপ্তি পেলাম না, আজ সব সেই জন্যই তোর পায়ে সঁপে দিলাম। আমার ভাবনা আমি আর ভাব্‌ব না, এতকাল ভেবে ভেবেও তো কোন ফল হ'ল না। দেখি, আজ সমর্পণে কি মাধুর্য্য রয়েছে!

আর দ্বারে দ্বারে ঘুর্‌তে পার্‌ব না মা! বহু ঘুরেছি, ঘুরেও ব্যর্থ হয়েছি, এখন বলে দে কার কাছে গেলে প্রাণ জুড়াবে। তোকে পূজা কর্‌লেই যদি মা সবের পূজা হয়, তা'হলে প্রতি জীবে জীবে এই ভেদজ্ঞান দিয়ে রেখেছিস্ কেন মা! তা'হলে স্বেচ্ছায় তুই তোর সন্তানদের আশ্রয়হারা করে আনন্দ উপভোগ কর্‌ছিস্—তা'হলে তুই পাষাণী, নির্দ্দয়া!

তোকে ভুল্‌তেও পার্‌ছিনা, আবার তোকেই

গালিবর্ষণ কর্‌ছি ; এই গালি তাহলে নিশ্চয়ই তোর প্রাণে লাগ্‌বে ! অবোধ সন্তানের এই আকুল ক্রন্দন তাহলে ব্যর্থ হবে না ? ভুল কার—আমার, না তোর ? আজ আমি দিশেহারা—তাই সমর্পণেই আমার ইষ্টসিদ্ধি, আমার যে আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

তুই যে দীক্ষায় মন্ত্র দিয়েছিলি মা, তা-ই ভুলে গিয়েছিলাম। সাধে এত শত্রুর উপদ্রব—সাধে বিপদে পড়ে নিরাশ্রয় হয়ে কেঁদেছি ! তোর যে মা এক মন্ত্র—সেই মন্ত্রের সাহায্যেই যে ভক্তেরা তোকে অবাধে পায়। ভুল আমারই হয়েছে, আমিই সমর্পণের মাধুর্য্য ভুলে গিয়ে, আত্ম প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছি, তবুও তো সহজে ভুল ধরা পড়্‌তনা, যদি তুই এসে প্রাণে চেতনা জাগিয়ে না দিতিস্‌ ! তোকে ছেড়ে যখন পদে পদে ভুল হয়, ভুল করি, তখন আর অবুঝ ছেলেকে তোর কাছ-ছাড়া করিস্‌নে মা ! আমি তোর মাঝে আমাকে হারিয়ে ফেলি—তবেই তো আমার চরম নিষ্কৃতি, চরম আনন্দ ! এ আনন্দ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?

অহং যদি জাগেই, অহং এর হাত থেকে যদি কিছুতেই আমাকে নিষ্কৃতি না দিস্‌, তা'হলে মা সেই অহং যেন তোর দাস হয়েই থাকে। যখন মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইবে—তখনই যেন তোর রাঙ্গা-চরণে গিয়ে ঠেকে। তোর পাদপীঠে ঠেকে ঠেকে যদি আমার অহং চূর্ণ বিচূর্ণও হয়ে যায়, তা'হলেও সে আমার পরম গৌরব। আমার বল্‌তে যে আর কিছুই থাক্‌বে না, তখন সবই তোর।

এই তো মায়ের পূজা—আত্মবলি ! এই বলি-দানেই তো মা পরিতুষ্টা ! আমরা ভুল করি, নিজের মাঝে পশু থাক্‌তে বাইরের পশুকে ধরে বলি দিই। মা তো এই বলিদানে সন্তুষ্ট নন ! মায়ের হস্তে অসি কেন ?— আমাদের অহংএর শিরশ্ছেদের দরুণ। একদিকে মা পাষাণী—ভয়ঙ্করা, কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝি, মা কত স্নেহময়ী—কল্যাণদায়িনী !

—:।:*:।:—

মা

—*—

দুঃখের ডাক, অভাবের আর্ত্তনাদ বেশী ক'রে মায়ের প্রাণে বাজে, তাই বুঝি আজ সকাল থেকেই পূর্ব্ব গগনে সোনালী আভায় মা আনন্দময়ী হাসির ফোয়ারা ঢেলে দিয়েছে। আজ তো আর নিরানন্দে থাক্‌তে পারব না ! মা যে নিজে আনন্দ-ভরে আনন্দ সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন। সেই আনন্দের স্তব্ধ নীরব অনুভূতিতে আজ আমার বুক জুড়িয়ে গেছে। মায়ের পূজার উপকরণ আজ মা-ই হাতে ধ'রে দিয়ে গেলেন,--আর তো আমাদের দুঃখ নাই, নিরানন্দ নাই, শোক নাই, ভয় নাই। এসো ভাই, আজ মায়ের পূজায় সকলে তন্ময় হয়ে যাই।

মা তো আজ কেবল বাইরের পটেই বিরাজিতা নয়, ধনীর সুসজ্জিত হর্ম্যতলেই অধিষ্ঠিতা নয়! তবে মায়ের অধিষ্ঠান কিসে?— আমারই মাঝে, আমারই চেতনায়। তাই তো বলি মাকে চৈতন্য-রূপিণী!

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চৈতন্যেত্যভিধীয়তে!

—কেবল আমার মাঝেই নয়, জীবে জীবে চেতনা-রূপে মা বিরাজিতা। মা যে আছেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—আমাদের আভ্যন্তরীণ চেতনা। অজ্ঞানতায়, বিমূঢ়তায় যখন আচ্ছন্ন হয়ে যাই, তখনই মায়ের কৃপালাভে বঞ্চিত হই! চেতনা যখন উজ্জ্বল থাকে, তখনই চিন্ময়ী মায়ের কৃপা অনুভব হয়। চেতনা রূপে মা আমাদের মাঝে নিত্য বিরাজিতা, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির অভাবে মায়ের অনুভূতি হৃদয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি কর্‌তে পারি না। ব্যষ্টি বুদ্ধি দিয়ে চাই মাকে বুঝ্‌তে। ব্যষ্টি বুদ্ধির দৌড় আর কতখানি? কতদূর অগ্রসর হয়েই অব্যক্তের রাজ্যে পড়ে, তখন সব ঘুলিয়ে যায়। আর তা যাবেই না কেন? মা যে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।

—মা কি কেবল তোমার আমার বুদ্ধির মাপ কাঠিতেই শেষ হয়ে যান? সকল জীবের মাঝেই যে মা বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা! সমষ্টি বুদ্ধির ধারণা কর্‌তে পার্‌লে তবে মায়ের সঠিক অনুভূতি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ব্যষ্টি আধারের যোগ্যতা কতখানি তাও দেখতে হবে! তবে ব্যষ্টি বুদ্ধিকেও তো অবহেলা কর্‌তে পারি না। আমাকে মায়ের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে কে? আমার বুদ্ধি, আমার প্রকৃতিই তো আজ মায়ের অব্যক্ত রাজ্যের দিকে আমাকে টেনে নিয়ে চল্‌ছে। তা হলে কেমন করে বলি—আমার বুদ্ধির কোন মূল্য নাই? কিন্তু মানুষ গর্ব্বে অন্ধ হয়ে যায়। এই বুদ্ধি কোথা থেকে এল, কে আমাদের মাঝে সেই শুভ বুদ্ধির উন্মেষ করিয়ে দিলে, সে কথা আর মানুষ ভাবে না; তাই নিজেকেই কর্ত্তা বলে মনে করে, বিশ্ব-শক্তির কণা পেয়েই মনে করে এই বুঝি শক্তির শেষ! এখানেই মা এসে ঘাড় চেপে ধরেন, মানুষের ভিতর এই যে দুষ্ট মহিষাসুরটা রয়েছে একেই মা কৃপা ক'রে সন্তানের কল্যাণের দরুণ নিধন করে যান। তখন আবার অহঙ্কারী মানুষেরও প্রকৃতি বদ্‌লে যায়। তখন বুঝ্‌তে পারি, আমার বুদ্ধি তো তোমারই দেওয়া; তবে না আমি ঠিক পথে চল্‌তে পার্‌ছি! চোখের সাম্‌নে কত জন তো বিপথে ঘুরে মর্‌ছে দেখ্‌তে পাই; এতেই তো মনে হয়, মানুষের বুদ্ধিকেও নিয়ন্ত্রিত কর্‌ছে এমন এক মহা-শক্তি মূলে রয়েছে। যে প্রাণেপ্রাণে তাকে চায়, সে শক্তি তাকে এমনি এসে ধরা দেয়। নিজের অহংকে, নিজের দুষ্ট বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিতে হবে, তবেই না মায়ের প্রেরণায়, মায়ের ইঙ্গিতে ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে! বুদ্ধিরূপে যিনি সংস্থিতা, তাঁকে আবার বুদ্ধি দিয়ে পাব কেমন করে? তাইত উপনিষদ্ বল্‌ছেন,— তর্কে নয়, বুদ্ধিতে নয়, বহু শ্রুতিতে নয়, তিনি যাকে কৃপা করেন, সে-ই ধন্য হয়ে যায়! তবে যে আমাদের এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি, এ যেন মহা সাগরের মাঝে এক একটী ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্। ভেঙ্গে গেলে দেখ্‌ব, এক মহা বুদ্ধির মহাসাগর থেকেই এই অসংখ্য ক্ষুদ্র বুদ্ধির সৃষ্টি! তবু যে গর্ব্ব করি, এ আমাদের মূঢ়তা! আবার ভাবি, এ গর্ব্বের তরঙ্গও তো সেখান থেকেই এসেছে, তবে গর্ব্ব কর্‌বই না বা কেন? গর্ব্ব করা ভাল, কিন্তু গর্ব্বের মূল যিনি তাঁকে ভুলে গর্ব্ব কর্‌লেই বিপদ্। শক্তি লাভ ক'রে শক্তিময়ী মাকে ভুলে গেলে চল্‌বে কেমন করে? এক এক সময় মায়ের দরুণ বুক ফাটা কান্না আসে, প্রাণের এই সতৃষ্ণ আবেগকে কিছুতেই

প্রশমন করতে পারি না। অশ্রু-সজল আঁখিতে তখন যেন দেখ্‌তে পাই, মা-ই তো সকল তৃষ্ণার মূল!

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা!

—এই অভাবের তৃষ্ণা তো তুমিই জাগিয়ে দিয়েছ মা, কেননা মূলে যে তুমিই তৃষ্ণারূপে বিরাজিতা! তাহলে মানুষের ভিতর যে অভাব জাগে, নিদারুণ আকুলতা আসে, সতৃষ্ণ আবেগে মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়, তার সবার মূলেই তোমার অধিষ্ঠান। মানুষের ভিতর ধর্ম্মপিপাসা, সত্য লাভের পিপাসা সেই আদি তৃষ্ণা থেকেই বুঝি জাগে মা! তা'হলে তোমাকে পাবার উপায়ও তো তুমিই বলে রেখেছ। মানুষ ভুল বুঝে তোমাকে অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে; কিন্তু বুকের হাহাকার, প্রাণের পিপাসা যখন কিছুতেই মিটে না, তখনই নিরুপায় হয়ে শক্তিময়ী মায়ের আশ্রয় লয়। বড় মজা তো তা'হলে—সবার মূলেই যদি তুমি থেকে থাক মা, তা'হলে আমার আমির মূলেও যে তুমি! এমনি করে আমার ভিতর যা জাগ্‌ছে, তার মূলেই যে তোমাকে অনুসন্ধান করে পাই। তাহলে কোন কিছুই মিথ্যা নয় মা! আমার সকল বৃত্তির মূলেই তুমি প্রেরণারূপিণী, সব বৃত্তি তোমা থেকেই মা আমার মাঝে জাগ্‌ছে--

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা!

এই যে বৃত্তির তরঙ্গ, তাও আস্‌ছে তোমা থেকেই। মূলে যে তুমিই বৃত্তিস্বরূপা হয়ে বসে আছ! এমনি করে বাইরের উপাধির ভিতর দিয়ে যখন তোমাকেই দেখ্‌তে পাই, তখনি উপাধি খসে পড়ে যায়, আর তুমিই কেবল জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে আমাকে উদ্ভাসিত করে তোল! অমঙ্গলের মাঝে, অকল্যাণের মাঝে, সব কিছুর মাঝেই যখন তোমার সাড়া পাই, তখন অমঙ্গল, অকল্যাণ অপসারিত হয়ে যায়, আর আমি কেবল তোমাকে পেয়ে শুদ্ধ চিত্তে সরল শিশুর মত তোমার পানেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। তখন আমার কি বৃত্তি জাগে, বৃত্তি থাকে কি না থাকে, তা তুমিই জান; আমি তখন তন্ময়। তবে মাঝে মাঝে অনুভবের স্মৃতি যখন ফিরে আসে তখন মনে হয়, তোমাকে যখন সত্যিকার উজ্জ্বল অনুভূতিতে পাই, তখন আর বৃত্তির তরঙ্গ থাকে না, শ্বাস প্রশ্বাস আপনি নিরুদ্ধ হয়ে আসে। এতেই মনে হয়, যা থেকে যার উদ্ভব, সে তার কাছে গিয়ে এমনি করে লজ্জায়, সরমে, অমঙ্গলতায় আত্মবিসর্জ্জন করে অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষ বৃত্তি-নিরোধ কর্‌তে গিয়ে বাইরের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, কিন্তু তোমার দিকে যে নাকি একবার তন্ময় হয়ে ফিরে তাকাতে পেরেছে, তার যে মা সকল বৃত্তি আপনি নিরুদ্ধ হয়ে যায়।

তোমাকে ভুল্‌ব কেমন করে মা! তুমি যে স্মৃতিরূপে সংস্থিতা, এই জন্যই বোধ হয় বেশীদিন তোমাকে ভুলে থাক্‌তে পারি না।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা!

—তুমি স্মৃতিতে জাগ্রত হয়ে উঠ বলেই তো ভুলের মাঝে, ঘুমের মাঝে আচম্‌কা চেতনা ফিরে আসে। তোমার স্মৃতিই তো আমায় তোমার দিকে অনবরত আকর্ষণ কর্‌ছে। তোমাকে অস্বীকার করে যে মা থাক্‌তে পারি না—স্মৃতিই যে তাতে বাধা দেয়। এমনি ভাবে আমার চিন্তায়, ভাবনায়, বুদ্ধিতে, বৃত্তিতে তুমি অনুস্যূত হয়ে আছ বলেই তোমাকে কিছুতেই ভুলে থাক্‌তে পারি না। তুমি যে আছ—তার নিদর্শন আমার জ্বলন্ত স্মৃতি। ভুলে যখন যাই, স্মৃতিই তখন এসে তোমার কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায়। আবার ভাবি, ভুলে যে থাকি, তা তুমি ভুলিয়ে রাখ বলেই; তুমি যে ভ্রান্তিতেও রয়েছ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ! —আমার ভ্রান্তির মূলেও যে তুমি ! তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, আবার ভুলও ভেঙ্গে দিয়েছ তুমিই। ভুল করেও যে তোমাকেই পাই। বড় মজা তো ! এমনি করে আমার জীবনের প্রত্যেকটী কর্ম্মের পিছনেই যে তুমি আড়াল হয়ে আছ। যখন যার মোহ ভেঙ্গে যায়, তার বাইরের আবরণ খসে পড়ে, আর তার মাঝে তোমাকেই দেখ্‌তে পায়—জ্যোতিতে চরাচর উদ্ভাসিত করে রয়েছ ! তাহলে মা ভুল কিসের—ভ্রান্তি কিসের ? সবার মাঝেই যে তুমি ! শত্রুরূপে, মিত্ররূপে, শান্তশিষ্ট ছেলে হয়ে, অপগণ্ড মূর্খ হয়ে, কোন মতেই দেখ্‌ছি মা তোমার হাত থেকে নিস্তার নাই ; যে দিকেই যাই, সেই দিকেই তোমার রাজ্য।

তোমার আবার আলাদা পূজা কিসের ? আমি তো দেখ্‌ছি বিশিষ্ট কোন জায়গাতেই তোমার রূপের অন্ত হয় না। তোমার বিরাট মূর্ত্তির কল্পনা করেও যে মন-বুদ্ধি থ' বনে যায়। মানুষ তোমার পূজা করে বলে যে গর্ব্ব প্রকাশ করে, তা বৃথা ! তোমার আসল পূজারী হচ্ছে সরল শিশু। সে তো আর কিছু জানে না, আর কিছু চায়ও না, স্তব্ধ হয়ে শুধু তোমার মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে আনন্দোল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে যায়। শিশুকে যে মা তুমি এত ভালবাস তার কারণ কি ?—না শিশুর অকৃত্রিমতা। সে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন বলে, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই তার, সে যেন তোমার মাঝেই সব পেয়েছে। এমন করে বুকে জড়িয়ে, প্রাণের রক্ত জল করে যাকে তুমি মানুষ করেছ—সে আবার তোমার পূজা করে কেমন ক'রে ? তবে কৃতজ্ঞতায় যদি পূজা হয়, তাহলে আজ তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দেবার কিছু আছে। আমি তোমার কাছে চিরঋণী—এই আমার পূজার মন্ত্র।

বল্‌বার কিছুই নাই মা আমার, আমি কি-ই বা জানি, আর কি-ই বা বল্‌ব তোমায়। শুধু আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দাও মা ! চোখ থেকেও যে তোমাকে দেখ্‌তে পাই না, এই নিদারুণ জ্বালায় আমার বাইরের চোখ অন্ধ হয়ে যাক্ মা ! কেন, তোমার সঙ্গে আমার কৃত্রিমতার প্রয়োজন কি ? তুমি সযত্নে যে হৃদয় গড়ে তুলেছ, যে কোমল প্রাণটীকে তোমার সস্নেহ দৃষ্টিতে পোষণ করেছ, আজ তারি মাঝে তোমার আগমনের সাড়া পড়ে গেছে। চোখ তো বাইরের বস্তু, সে তো অনেক পরে—প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ; তার আগে কি আমি তোমায় দেখিনি মা, তখন যে তুমি আমায় সস্নেহে কোলের মাঝে কত আদরে রেখেছিলে, সে কথা কি আমি ভুলে গিয়েছি ? আজ আমার বাইরের চোখকে অন্ধ করে দেল মা, তার পরিবর্ত্তে সেই ছোট বেলাকার অবুঝ প্রাণের ব্যাকুলতাভরা অন্তর্দৃষ্টি খুলে দাও। তখন যে আমার ভাল করে চোখও ফুটেনি, তবু যে মা আমি তোমায় দেখ্‌তে পেতাম। আবার সেই সত্যদৃষ্টি আমার মাঝে জেগে উঠুক ; উপাধি বিহীন আনন্দে, বাল্যের সেই অভ্রান্ত আনন্দের স্মৃতিতে যৌবনের চাঞ্চল্য প্রশান্ত হয়ে যাক্ ! আমি চোখ খুলে তোমায় দেখ্‌তে পাই না, তাই আমার বাইরের শত্রুকে নির্ম্মূল করে ফেল মা ! তোমাকে পেলে, তোমার অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্‌লে, তখন যে মা আমার সকল চাঞ্চল্য পলায়ন করে। তুমি যাকে কোল দিয়ে অভয় দিয়ে শান্ত কর, সে আবার চঞ্চল হয়ে উঠে কেমন করে ? আমাদের সকল অস্থিরতা, চাঞ্চল্য যে মা তোমারই দরুণ। মাতৃগতপ্রাণ সন্তানের মাতৃহারা হয়ে থাকা যে কি দুঃসহ যাতনা, তা তো মা তুমি জানই।

আজ তোমায় পেয়েছি, দিকে দিকে আমার অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। বাইরের মাঠে ঘাটে আকাশের গায় আজ তোমার স্বর্ণকান্তির জলন্ত উজ্জল আভা বিস্ফুরিত হচ্ছে। আর একি আশ্চর্য্য, আমিও যে আর আমি নাই! তোমার সেই স্বর্ণ আভা আমার মাঝেও যে প্রতিফলিত হয়েছে— আমার আমিও আর এক রং ধরে উঠেছে! এমনি করে তোমার বল্‌তে যা কিছু সম্পদ রয়েছে, সবই তো মা তুমি সন্তানের মাঝে ঢেলে দাও। এত অনিবার্য্য উল্লাস আসে কোথা থেকে?

মা, তুমি কোথায়ই বা নাই? ব্যষ্টি আধারের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বলে উড়িয়ে দিতাম, যদি তোমার রূপ এক জায়গাতেই কেবল প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌ত! আনন্দচ্ছলে মাঠে ভ্রমণ কর্‌তে এসেও যে দেখি আকাশের গায় বিরাট রূপে তুমি হরিতাল বর্ণে আপন রূপরাশি ঢেলে দিয়ে স্তব্ধনেত্রে জগতের পানে চেয়ে আছ। মিথ্যা আমার গর্ব্ব, আমি তো কিছুই পাইনি! আমার আগে পেয়েছে ওরা— ওই কচি কচি ধানের চারাগুলি, অদূরের সেই মূক বৃক্ষশ্রেণী! নীরবতায়ই তো তাদের অব্যক্ত আনন্দ ধরা পড়েছে। আমরা মনে করি, যাদের ভাষা নাই, বল্‌বার ক্ষমতা নাই, তারাই বুঝি তোমার রূপা লাভ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তাদের আজ স্বচক্ষে দেখে সকল ভ্রম অপসারিত হয়ে গেল। তোমার স্নেহাশীষ থেকে কেউ যে বঞ্চিত নয় —এই জ্ঞান লাভ হ'ল।

সবার প্রাণেই যে সমান অনুভূতির ঝঙ্কার! কাকে অবজ্ঞা কর্‌ব? কাকে অশ্রদ্ধা কর্‌ব? একটি তৃণ গুল্মকেও তো আজ তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পার্‌ছি না— বরঞ্চ তাদের আবেগের মাঝেও সংযম-শক্তি দেখে আরও বেশী তাক্ লেগে গিয়েছে আমার! হাঁ, তাই তো, তা না হলে তোমায় জগন্মাতা বল্‌বে কেন লোকে? তুমি যে তোমার করুণা থেকে কাউকে বঞ্চিত রেখে তৃপ্তি পাও না। সকলকে বুকে ধরে রয়েছ বলেই তুমি বিশ্ব-মাতা, জগদ্ধাত্রী!

ঐ যে আকাশের গায় জ্যোতির্ম্ময় পথ! মা এই পথেই সকলকে আহ্বান কর্‌ছেন— দূর থেকে মায়ের ইসারা দেখ্‌তে পাচ্ছি। কে বলে মাকে পেতে হ'লে দুঃখের মাঝ দিয়ে, বিভিষীকার ভিতর দিয়ে যেতে হয়? এসব মিথ্যা। কোথায়ও তো অন্ধকার নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের রাজ্যে যাবার পথও যে জ্যোতির্ম্ময়! সে পথে কাউকে দিশেহারা হ'তে হয় না।

কিন্তু সাবধান, তুষ্টি যেন এসে না পড়ে। পথেরও কিন্তু প্রলোভন আছে। অনেকেই এই সোনালী পথের মায়ায় আসল লক্ষ্য ভুলে যায়। এ জ্যোতিঃ, এ আলো মায়েরই অঙ্গের জ্যোতিঃ— আংশিক। আমরা মাকেই চাই— ঐশ্বর্য্য নয়, বিভূতি নয়; এ কথাটী সব সময় মনের মাঝে উজ্জ্বলভাবে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে।

*** *** ***

আজ তোমায় নিবিড়ভাবে গাঢ় শ্যামলিমায় পেয়েছি। এত সুন্দর মাঠের দৃশ্য! ধান গাছ গুলোর মাঝে যে সবুজ প্রাণের নেশা অবলোকন কর্‌ছি। তারা যে আনন্দে, পূর্ণ হৃদয়ে অবনত হয়ে পড়েছে। আচ্ছা, তুমি যাদের এমন পূর্ণ করে তোল মা, তারা কি এমনি অবনত হয়েই সুখ পায়? কৈ আমার মাঝে তো ঐরূপ আনন্দের দীনতা এল না, আমি তো ওদের মত নিঝুম হয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না। আসুক, আমার প্রাণে সেই নিস্তব্ধ অনুভূতিই আসুক— কেমন সুন্দর সারা মাঠময় একটী অপূর্ব্ব সবুজ সুষমা!

বেশী খেলে যেমন ঘুম পায়, তেমনি বেশী পেলেও বুঝি ঝিমুনী আসে। আজ যেন আমার মনে হচ্ছে হিমালয়ই তোমাকে বেশী নিবিড়ভাবে পেয়েছে, তাই তার বাইরেও একটা কেমন যেন পূর্ণতার তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেশ! তাকে আজ ভোর বেলায় দূর থেকে দেখে দেখে মনে এই কথাই জাগ্‌ছিল মা!

তোমার সেই অব্যক্ত অনুভূতিকে কি বাইরে রূপ দেওয়া চলে, ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পারা যায়? যে যায় ফুটাতে, সে অমনি নিজকে নিস্তব্ধতার আবরণে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌তেই ভালবাসে। তার প্রাণ-মন স্তব্ধ হয়েই আনন্দ পায়। কিছু না বলেই সব চেয়ে বেশী বলে। আজ একটী ধানের চারা গাছকে দেখে, একটী পাহাড়ের শৃঙ্গ দেখেও আমার মনের দোল দুলে উঠ্‌ছে। এ অনুভবের অদৃশ্য সঙ্কেত তাদের নিস্তব্ধতা থেকেই পেয়েছি। তারা বুক চিরেও যে আজ কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না, যা দিয়ে তোমার করুণার কথা—স্নেহের কথা ব্যক্ত কর্‌বে। অনন্ত তাদের ব্যাকুলতা, অসীম তাদের বিরহ-যন্ত্রণা, তাই তো তারা স্থির হয়ে আছে। তারা তো অচল নয়; বেশী ব্যথায়, বেশী অনুভবে স্তব্ধ হয়ে আছে। আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আমি তাদের সঙ্গে মিশে যাই; শিখে আসি তাদের কাছ থেকে, কি করে প্রাণের ভিতর নিদারুণ ব্যাকুলতার তরঙ্গ নিয়েও এমনি করে প্রশান্ত হয়ে থাকা যায়।

মাগো! তোমার অনুভূতিতে আমার সকল ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যাক্। 'স্থিরমিন্দ্রিয়ধারণম্'—একেই তো বলে যোগ! তোমার চিন্তায় যখন তন্ময় হয়ে যাই, তখন যে যোগ আপনি হতে থাকে। আজ দেখ্‌ছিও তো তাই, ইন্দ্রিয়ের দিক থেকেও তো কোন অভাবের কৈফিয়ৎ শুন্‌তে হচ্ছে না মা আমাকে! তোমাকে পেলে যখন নির্ব্বিবাদে সকলের সকল রকমের অভাবই মিটে যায়, তখন কেন আর নূতন পথ বাছাই করে নিয়ে নিজের খেয়ালে চলা? আমি তো মা সকল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দিতে পারি না, দিবারাত্র কেবল তাদের অভাবের আর্ত্তনাদই আমাকে শুন্‌তে হয়। সবাই কেবল বিবাদ করে—আমি অমুক ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হয়ে চলি, অমুককে বেশী অনুগ্রহ করি। বরাবর তাদের সঙ্গে আমার এই ঝগড়া চলে আস্‌ছে। কিন্তু আজ তো সকল ইন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়ে গেল মা! কৈ, কোথায়ও তো অভাবের আর্ত্তনাদ নাই। বুঝেছি, তোমাকে পেলে আর কারও অভাব থাকে না মা, কেন না তুমি যে পূর্ণানন্দময়ী! তুমি যে সকলকে একই আনন্দের ফোয়ারায় ভাসিয়ে নিয়ে যাও, এই জন্যই বিরোধ আর তখন স্থানই পায় না।

লড়াই করে, সংযম করে কত ভাবেই তো দেখেছি, দুর্দ্দমনীয় রিপুর সঙ্গে তো পেরে উঠিনি কোন দিন। আজ কেমন করে তাদের সনাতন বিরোধ, আমার প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার রোষানল নির্ব্বাপিত হয়ে গেল— সব শান্তমাধুরীতে পর্য্যবসিত হল! বুঝেছি, তোমার অহেতুক স্নেহই শত্রু মিত্র সকলকে এক করে দিয়েছে।

আমার সজল চক্ষু যেন প্রতীক্ষার বেদনায় এমনি ভাবে স্পন্দনহীন হয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে মা! তোমার অনুভূতি নিয়ে, আগমনের সাড়া পেয়ে তারপর যেন পুলকে স্পন্দিত হতে থাকে। বৃথা তাদের অহঙ্কার কর্‌তে দিও না মা—কেননা তার কর্ম্মফল যে আমাকেই ভুগ্‌তে হয়!

মাগো! আমার চঞ্চল মনে অচঞ্চল অনুভূতি-রূপে তুমি নেমে এস। আমাকে আজ সব দিক দিয়ে বদ্‌লে ফেল। চঞ্চলতার মাঝে আশা নাই, ভরসা নাই, বিশ্বাস নাই—আছে শুধু একটা উগ্র উত্তেজনা। আজ আর লাফালাফি, উত্তেজনা ভাল লাগ্‌ছে না; মনে হচ্ছে আর কিছু যদি আমার না

থাক্‌তো, শুধু হৃদয়টি নিয়ে শান্তশিষ্ট বালকটীর মত তোমার পাশে বসে বসে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পার্‌তাম, তবেই যেন জীবন-ধারণের একটা সার্থকতা হ'ত!

অবসাদের কথা নয়, এ আমার অনুভূতির বাণী। মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি বলেই আজ নিঃসঙ্কোচে সকলের কাছে প্রাণ খুলে বল্‌তে পার্‌ছি।

আমি চাই জীবনটাকে নূতন করে অনুভব কর্‌তে। লাফানো-ঝাঁপানোর আস্বাদন তো পেয়েছিই। তবে আর কেন পুরাতনের স্মৃতি? উত্তেজনার আঘাতে পদে পদে ব্যর্থ হয়ে জীবন আজ বিষময় হয়ে উঠেছে। আর উত্তেজনা চাই না মা! চাই শুধু অমৃত সুধা,—যাতে প্রাণ জুড়াবে।

প্রথম যৌবনের অনিবার্য্য উত্তেজনায় কত ভাবেই না মা তোমায় জ্বালাতন করেছি। কেবল এটা না ওটা, এমনি করে রুচির পরিবর্ত্তন, মতের পরিবর্ত্তন, কেবল একটা অস্থিরতা নিয়েই চারিদিক থেকে তোমায় আহত ও ব্যাকুল করে তুলেছি। কিন্তু তবু দেখ্‌ছি, আমার অস্থিরতায় তুমি অধৈর্য্য ক্ষুব্ধ হওনি। আমার পানে তুমি সেই স্নেহমাখা দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছ। সাধে কি মা আজ আমার প্রাণ থেকে এত কথা বের হচ্ছে? বলেও যে মা আমি ফুরাতে পারব না। তোমার আমার মধুর সম্বন্ধ যে অনাদি অনন্ত কাল ধরে, তাই কত-সুখ-দুঃখ-বেদনার স্মৃতি আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে রয়েছে মা! আজ আমার সেই শুভ দিন এসেছে; না বলে যে আজ থাক্‌তে পারি না, যতটুকু পারি ভাবে ভাষায় আজ তাই বলে যাব।

মাগো! বল্‌তে গিয়েও পদে পদে অপরাধ করব। কেননা আমার বলার পরও যে অন্তরে তোমার করুণার স্মৃতি অব্যক্ত ভাবে থেকে যাবে, তাদের তো আমি ভাষার সাহায্যে বাইরে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারব্‌ না। তাহলে কিছুতেই তো আমার বলা আর শেষ হবে না! এই ভাল, তোমায় আমায় আজীবন এই অফুরন্ত প্রাণের অনুভূতির কথা চল্‌তে থাকুক্!

দুরন্ত মনের পাল্লায় পড়ে কত সময় অসুরের মত অবজ্ঞার ভাব এসেছে কিন্তু কৈ এ ভাবেও তো বেশী দিন চল্‌তে পার্‌লাম না। কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য দৈবী মায়ায় আমার জীবনের প্রত্যেকটী প্রতিদ্বন্দ্বী আজ এত সহজে পরাজয় স্বীকার কর্‌ল। মাগো! আমি তোমার কাছে পরাজিত, অবনত; এই আমার অতুলনীয় গৌরব। আমি যেন চিরকাল তোমার কাছে ছেলের মত আব্দার করে সহজ ভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।

তোমার কাছে এলে যে মা আমি আত্মহারা হয়ে যাই, কি বল্‌তে গিয়ে কি বলে ফেলি। এই ভাবই যেন আমার কাছে সবচেয়ে মধুর লাগে মা! ছেলে যখন যায় মায়ের ভালবাসার পরিচয় দিতে, তখন বোধ হয় সে আমার মতনই অমন অসম্বদ্ধ প্রলাপই বক্‌তে থাকে।

ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, স্পর্দ্ধায়-গৌরবে নিজকে তোমার কাছ থেকে কতবার ছিনিয়ে এনেছি মা, কিন্তু কৈ তোমা ছাড়া তো জীবনের অমন নির্দ্দিষ্ট নির্ভর স্থল খুঁজে পেলেম না! তোমার বিপরীতে গিয়েও দেখেছি, তুমি আমার প্রতি লক্ষ্যহারা হওনি।

আজ আমার কত গৌরব, কত দুঃখ; আমার সকল দর্প চূর্ণ হয়েছে। দুঃখই বা কিসের? তোমার দেওয়া শক্তিতেই তো আমার বুক ফুলে উঠেছিল, আমি গর্ব্ব করেছিলাম কি সাধে? আজ আমার শক্তির উগ্র রূপ নাই, তুমি যেন এসে কি এক নব-শক্তি সঞ্চার করে গেলে! জীবনের এই রূপান্তর কি করে ভুল্‌ব মা বল তো দেখি?

বাঙ্গালী সাধকের প্রাণ নিছক তত্ত্বের মাঝেই তৃপ্ত নয়; তাই তান্ত্রিক মায়ের কৃপায় এবং নিজ শক্তি-বলে সেই তত্ত্বকেই রূপের মাঝে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে। বাঙ্গালীর মজ্জায় মজ্জায় তাই রূপের সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। তারা তত্ত্ব বুঝে না, চিন্ময় রূপের কথায় তারা আত্মহারা। ভাবময়ী মাকে যে তারা রূপের মাঝে আবির্ভূত করতে পেরেছে, এতে কি মায়ের কম করুণা বর্ষিত হয়েছে? আর সাধক তান্ত্রিকেরই কি কম গৌরবের কথা?

অরূপা মায়ের রূপ ফুটল কেমন করে? না—প্রাণের সতৃষ্ণ আবেগে। বাঙ্গালী দেখিয়েছে তার প্রাণে একাগ্রতা কত! সে সবই করতে পারে, কেননা অঘটনঘটনপটিয়সী মা যে তার সহায়! আজ আমার কত গৌরব—আমি বাঙ্গালীর সন্তান! আশা আছে, আমিও আজ তত্ত্বময়ী মাকে রূপের মাঝে প্রত্যক্ষ করতে পারব। আর পারবই বা বলছি কেন—এই তো আজ প্রাতেই যে মায়ের ভুবন-মোহিনী রূপ প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম।

বাঙ্গালী খুঁজেছে নিছক প্রাণের আবেগ নিয়ে, তাই অরূপা মা-ও রূপে ধরা দিয়েছেন। এই যে সত্যসঙ্কল্প, প্রাণের সচেষ্ট আবেগ, মা আছেন জেনে তাঁকে একেবারে স্থূল জগতে নামিয়ে আনা—একি বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা?

নিছক তত্ত্বের দরুণ নয়, বাঙ্গালী সেই রূপের সন্ধানই পেয়েছিল একদিন; তাই আজ গৃহে গৃহে প্রতিমা পূজা। এই সমগ্র দৃষ্টি বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি। নিছক তত্ত্বানুসন্ধান করেও তার আকুল প্রাণের নিদারুণ পিপাসা মিটেনি, তাই বাঙ্গালীর প্রাণ এত রূপাভিলাষী! প্রতিমা পূজা প্রবর্ত্তনের মূল প্রেরণাও আসে এই সিদ্ধ তান্ত্রিকের হৃদয় থেকেই। কিন্তু মা তো নিছক মাটীর প্রতিমাই নয়—মায়ের দিব্যরূপ রয়েছে। সেই রূপের বিসর্জ্জনই নাই। সংস্কার বর্জ্জনের ছলে মায়ের প্রতিমাকে মানুষ বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু মায়ের সংস্কার যে অস্থি মজ্জায় জড়িত—তাই তান্ত্রিকের কাছে মায়ের নিত্যরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই রূপ শাশ্বত রূপ। হৃদয়ানুভূতিতে গদগদ হয়ে, ভাবে আত্মহারা হয়ে মাতৃ সাধক মায়ের সেই অপরূপ রূপ সন্দর্শনে ভাব সমাধিতে ডুবে যায়।

আমি সেই চিন্ময়ী জননীর চিন্ময় সন্তান। স্থূলের ভিতর দিয়েও মা আজ আমার সেই দিব্য রূপের সন্ধানই দিয়ে গেলেন। মাকে বিসর্জ্জন করা হল নদীর জলে—কিন্তু আমার চোখের জলের স্বচ্ছ ধারার মাঝে আবার আমি মায়ের সেই দিব্য রূপই দেখতে পাচ্ছি। আজ আর আমার শোক নাই—মায়ে ছেলেতে যে নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে, তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি পেলাম আজ!

——:(।):*:(।):——

স্বার্থক পূজা

——:(*):——

সেদিন মায়ের পূজার বোধন সারাদিন ভরা বৃষ্টি,
দুয়ারের কাছে বসে আছি একা নয়নে উদাস দৃষ্টি।
সকলের মনে কত আনন্দ ভুবন হাসিতে ভরা,
ভুবনমোহিনী মা'র আগমনে উজল নিখিল ধরা।
নিরন্ন এই ফকিরের মুখে শুধুই নাহিক হাসি,
শূন্য হৃদয়ে দাঁড়াবে কেমনে মায়ের দুয়ারে আসি ?
মায়ের পূজার যোগ্য বস্তু নাহিত তাহার কিছু,
মায়ের চরণ ভাবিছে একাকী মাথাটী করিয়া নীচু।
হেন কালে এক বালিকার বেশে মা বুঝি ভবানী এলো,
সুধাল আমায় চোখে নিয়ে জল "ঠাকুর, মা কোথা গেলো ?"
অনিমিষে আমি চেয়ে তার পানে ভাবি কি ছলনা এই—
কোন্ মা'র কথা সুধায় আমায়, এল কি ভবানী সেই ?
নীরব আমারে দেখিয়া আবার সুধাইল পুনঃ একই কথা,
চেয়ে দেখি তার চোখে ভরা জল, না জানি তাহার প্রাণে
কি ব্যথা !
সুধাইনু ফিরে "কেন মা খুঁজিছ, কেন গো এমন চোখেতে জল ?"
বসিল কাঁদিয়া তখনি অমনি দেহে নাই তার তিলেক বল।
বলিল—"ঠাকুর, কে দিবে খাবার, কাপড় পরণে নাই যে মোটে,
এই দিক দিয়ে মা গেল খুঁজিতে—যদি একখানি কাপড় জোটে।"
ভিক্ষায় পাওয়া পয়সা ও চাল যে কয়টী ছিল সে কুঁড়ে ঘরে,
ক্ষুদ্র সে পুঁজি রেখেছি যতনে পূজিব মায়েরে পরাণ ভরে।
ভাবিনু বুঝিবা অন্তর হতে কুণ্ঠা আমার জানিতে পেয়ে,
এসেছে জননী লজ্জা ঘুচাতে কৈলাস হতে আপনি ধেয়ে।

তাই হোক্ তবে মায়ের পূজার এইত যোগ্য প্রতিমাখানি,
ভিখারীর দ্বারে ভিখারিণী বেশে এইত জননী ভবানী !
তণ্ডুল ক'টী নৈবিদ্ করে দিয়ে তার কাছে কহিনু হাসি—
"আসিতেছে মা, ব'স মা আমার, যাবৎ আমি ফিরে না আসি।"
ছুটিয়া চলিনু বাজারের পথে, বস্ত্র আনিনু কিনে—
সঁপিলাম তাহা মায়ের চরণে পুষ্প-অর্ঘ্য বিনে।
প্রাণের প্রণাম মনে মনে করি, সুধানু—'কি তোর নাম ?'
হাসিয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিল—"ভবানী, কৈলাস ধাম।"
স্তব্ধ হইয়া ধ্যান করি মনে ভাবিব মায়ের রূপ—
একি ! কেন ওই জ্যোতির্ম্ময়ী বালা ভাসে হৃদে অপরূপ !
মায়ের পূজার তিন দিন মোর জানিনা কেমনে গেল—
তাঁরি রূপে ছিল বিভোর পরাণ সেই যে মা-রূপে এল।

——(:০:)——

শক্তি-প্রসঙ্গ

——*——

মায়ের কথা কিছু লিখ্তে বলেছ। মায়ের নাম নিয়ে লিখ্তে বসেছিলাম, কিন্তু লিখ্তে গিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেছি! ভাব্ছি, কোন্ কথাটাই বা মায়ের কথা নয় ? যা অব্যক্ত, তাকে যদি ব্যক্ত করতে যাই, তবে সে তো মায়েরই লীলাকে প্রকাশ করা হয়। শুধু একটী ভাব, একটী সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে কি তাঁর প্রকাশ ? হাঁ, গোড়াতে একটা কিছু নিয়ে সুরু করি বটে, কিন্তু শেষে তো আর কূল পাই না। —তখনি রামপ্রসাদের কথা মনে পড়ে যায়—"তারা পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।"

শক্তি উপাসনায় কথা শুনি, শক্তি মতে কথাও শুনি। আবার শুনি কালের গজকাঠিতে মাপা তার নাকি একটা ইতিহাসও আছে। অর্থাৎ অমুক শতাব্দী হতে ভারতবর্ষে শক্তি পূজার প্রচার ইত্যাদি। আমার কিন্তু ভাই একটু খট্কা লাগে। যদি শক্তিকে নিত্য বলে মানি, আর উপাসনাকে যদি সনাতন মানব ধর্ম্ম বলেই স্বীকার করি, তাহলে বিশিষ্ট সন তিথি ধরে শক্তি পূজায় প্রচার হল, এ কথাটা কেমন ঠেকে না ?

হয়েছে কি, আমরা হ'লাম নাম-রূপের ভক্ত। শক্তি নাম দিয়েছি, মা নাম দিয়েছি, মেয়ের রূপে

তাঁর প্রতিমা গড়েছি—কাজেই এই নামরূপের ভিতর দিয়ে তাঁর পূজাকেই শক্তিপূজা বলে মনে করি, আর সেই ধারণা অনুযায়ী ইতিহাসের নজীর খুঁজি, কিন্তু নামরূপের পরেও তো কথা আছে। সেই কথাটাই একটু বলি।

বেদের যুগ থেকেই সুরু ধরি। যদি বলি, সে যুগেও শক্তি উপাসনা ছিল—তবে আজ কালকার নামেও নয়, আজ কালকার রূপেও নয়। কর্ম্ম-কাণ্ডের কথাই ধর। যাগযজ্ঞগুলি কি?—বেদের মন্ত্রগুলি কি? কেবল ছেলের আব্দার, বিশ্ব-শক্তির কাছে মানব শিশুর চিরন্তন প্রার্থনা—অর্গলা স্তোত্রে যেটা ফুটে উঠ্‌ল—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" কর্ম্মকাণ্ডে দেবতাও আছেন, দেবীও আছেন; নামরূপে লিঙ্গভেদ হচ্ছে বটে, কিন্তু মূলে তত্ত্বটা একই—সেই শক্তিতত্ত্ব! আরও কি মনে হয় জান? শক্তির ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্য দুই রূপেই পূজা আছে ওতে! পণ্ডিতেরা ঠাউরিয়েছেন, সৌন্দর্য্য পূজাটা Greek ধাতে আছে, Indian ধাতে নাই। Maxmuller তো বলেই বস্‌লেন, বেদে প্রকৃতিপূজা আছে বটে, কিন্তু তাতে ঐশ্বর্য্যেরই পূজা—সৌন্দর্য্যের পূজা নাই; হিন্দুর সৌন্দর্য্যবোধ তেমন বিকশিত হয়নি। কথাটা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না। হয়েছে কি, ওঁরা Greece এর রূপের পূজা দেখে aesthetics এর শাস্ত্র গড়েন, কিন্তু এ দেশের ভাবের পূজা তো দেখেন না। রূপের সৌন্দর্য্যই তো একমাত্র সৌন্দর্য্য নয়—ভাবের সৌন্দর্য্য যে রূপের বাড়া! বেদের মাঝে শক্তির এই ভাবরূপ দেখতে পাই। তাই সে যুগে পূজার মূর্ত্তি গড়ে উঠ্‌ল না—তার জায়গায় ধ্যানের মন্ত্র ফুটে উঠ্‌ল। রূপের চেয়ে ভাব বড় হয়ে ওঠাতেই প্রত্যেক দেবতা হয়ে উঠ্‌লেন অনন্ত; আর সেই অনন্তকে পরবর্ত্তী যুগে রূপ দিতে গিয়ে হিন্দুর অন্তর্মুখী art এর সৃষ্টি হল, যাতে Perspective আর anatomyর মর্য্যাদা তো রইল না—Symbolism এরও আর সীমা পরিসীমা রইল না!

একটা কথা মেনে নিতে রাজী আছি, বৈদিক ঋষি শক্তিকে প্রকৃতি (nature)-রূপেই পূজা করেন। ও দেশের পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন—তার মূলে ভয়! আমরা বলি, না, তার মূলে ভালবাসা। তাকেই বলেছি, অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য্য-বোধ। যে মায়ের সৌন্দর্য্যের কথা বল্‌তে গিয়ে চণ্ডী বল্‌ছেন, "সৌম্যা সৌম্যতরা হি ত্বং সুন্দরীষ্টাতিসুন্দরী," —সে মায়ের রূপ বৈদিক ঋষিরও মন ভুলিয়েছিল। Subjective experiance ছাড়া এর প্রমাণ দেওয়া শক্ত। Racial psychology ঘেঁটে দেখ, ভয়ের পূজায় কখনো কোনো জাত বড় হতে পারেনি। ভয় কখনো জীবনী-শক্তিকে বিকশিত হতে দেয় না। ঋষির প্রকৃতি পূজা আর সাঁওতালের প্রকৃতি পূজায় আকাশ পাতাল তফাৎ। বৈদিক যুগের ওই অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস ভয়ের সৃষ্টি নয়—ভালবাসার সৃষ্টি! ওকেই বলি ভাবুকতা—অন্তরের সৌন্দর্য্য বোধ। সে যে কেমন জিনিষ, তা রামকৃষ্ণদেবের জীবন থেকে বোঝানো যেতে পারে। ছ'বছরের ছেলে আলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে কালো মেঘের কোলে বকের সার উড়ে যেতে দেখে ভাবে বাহ্য চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। তাঁর জীবনে এই নাকি প্রথম ভাব সমাধি! The whole race repeats itself in the individual. আমি বলি, এ আর্য্যজাতির জীবনে প্রথম ভাব সমাধিরই অনুলিপি! বেদ সূক্তের মূলে এই ভাব সমাধির প্রেরণা। এই সমাধির শক্তি ছিল বলেই বেদমন্ত্রে সৃষ্টি হত বলে প্রবাদ আছে। আমাদের মাঝে

এই ভাবের স্পন্দন ক্ষীণ হয়ে গেছে, যদিও লুপ্ত হয়নি। এমনি করে অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য্য বোধকে একটা religious culture এর মর্য্যাদা দেওয়া আর বোধ হয় হয়ে উঠ্‌বে না। এ যুগে তাই দুটী একটী Wards worth বা রামকৃষ্ণে সেই আদি-যুগের একটু স্মৃতি জেগে ওঠে—আমাদের কাছে তা phenomenal বলেই মনে হয়। কিন্তু আমি বলি, মা ত্রিপুরসুন্দরী বৈদিক ঋষির হৃদয়ে বসেও পূজা নিয়েছেন—জাতির জীবনে শক্তি-সঞ্চার করেছেন।

জ্ঞান কাণ্ডে এসে মনে হয়, মাকে বুঝি হারিয়ে ফেল্‌লাম। কই, উপনিষদে শক্তির স্থান কতটুকু? এক কেনোপনিষদে হৈমবতী উমার কথা আছে; কিন্তু সমস্ত উপনিষদব্যাপী জ্ঞান চর্চ্চার মাঝে তার গুরুত্ব কতটুকু? ওতে প্রমাণ হয় না যে উপনিষদের ঋষি স্বভাবতঃই শক্তি পূজক! কিন্তু কি জান, নাম-রূপের মোহে পড়েছি বলে এখানেও মাকে চিন্‌তে পারিনি। জ্ঞান কাণ্ডর ঋষি মৃণ্ময়ীর পূজা করেন না—তিনি পূজা করেন চিন্ময়ীর। তিনি **প্রাণের** উপাসক। উপনিষদের এই প্রাণ আর শক্তি এক কথা। প্রাণোপাসনা যে উপনিষদের কতখানি জুড়ে আছে, তা কারু অজানা নাই। আর একটী জিনিষ আছে উপনিষদে, সে হচ্ছে আনন্দের পূজা! আবার দেখ মাকেই ফিরে পেলাম—তার ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌ল ঋষির প্রাণোপাসনায়, আর সৌন্দর্য্য ফুটে উঠ্‌ল আনন্দের কল গানে! এইতো চিন্ময়ীর রূপ—**প্রাণের আনন্দ!** ওই প্রাণের আনন্দ হতেই সৃষ্টি—তাইতো শক্তির মাতৃরূপ! গুহাহিত পুরুষ প্রাণের আনন্দে বলে উঠ্‌লেন—অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়। অরূপ বিশ্বরূপা হয়ে দেখা দিলেন।

জাতির শক্তির উৎস—প্রাণ আর আনন্দ! যারা প্রাণের উপাসক, আনন্দের উপাসক—তারাই শক্তির পূজারী।

সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের দুটী মীমাংসা শাস্ত্র আছে—তাতে সহস্রবর্ষব্যাপী জাতীয় সাধনার সার নিষ্কর্ষটুকু পাওয়া যায়। তার মাঝেও দেখ্‌বে এই শক্তি পূজার বাণী। পূর্ব্ব মীমাংসার প্রথমেই হল—অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা—চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ—ধর্ম্মের লক্ষণই হচ্ছে চোদনা—প্রেরণা! ধর্ম্ম সাধনা নির্জ্জীবতার সাধনা নয়, মতলববাজীও নয়—তার মূলে আছে অব্যক্ত প্রেরণা—যা নাকি প্রাণেরই সঙ্গীত—শক্তির বহিস্ফুরণের প্রচেষ্টা। এইখানে দেখি মায়ের ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তির প্রকাশ। আবার দেখ, উত্তর মীমাংসার গোড়াতেই পাই—অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা—জন্মাদ্যস্য যতঃ। যা হতে প্রপঞ্চের জন্ম হচ্ছে, স্থিতি হচ্ছে, লয় হচ্ছে, তিনি কে? বলে দিতে হবে যে তিনি আমার মা আনন্দময়ী? ব্রহ্মানন্দে শক্তির মাধুর্য্যের বিকাশ! আবার মাকে ফিরে পেলাম বৈদিক দর্শনের মূলে জাতীয় শক্তির উৎস-রূপে। মায়ের একরূপ ধর্ম্ম বা প্রাণের প্রেরণা, এই তাঁর ঐশ্বর্য্য! আর একরূপ মোক্ষ বা আনন্দ চেতনা—the birth right of Freedom এই তাঁর মাধুর্য্য! আজ আমাদের মোক্ষের সাধনা আছে, কিন্তু ধর্ম্মের সাধনা নাই। জাতির জীবন তাই শ্রীহীন—মাতৃ পূজা অর্দ্ধেক হচ্ছে মাত্র।

শুধু দুটী মীমাংসাতেই জাতীয় সাধনার ইতিহাস সমাপ্ত হয়নি। হিন্দুদের আরও চারটী দর্শনের কথা প্রসিদ্ধ। জাতির জীবনে দুটো স্রোত বয়—একটা faith আর একটা reason. Faith এ পাই religion, reason এ পাই philosophy. দুটী মীমাংসার মূল হচ্ছে faith. ওরাই হিন্দুর সনাতন

ধর্ম্মের বনিয়াদ। আর ৪টী দর্শন faith কে intellect দিয়ে কাঁচিকাটা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে—ওদের মূল হচ্ছে reason. কিন্তু জাতির এই rationalityর চরমে দেখ্‌ছি—শক্তিবাদ! সবগুলি দর্শনই ওই একটী তত্ত্বের নিরূপণে নিঃশেষ হয়ে গেল।

সাংখ্যের কথাই ধর, যা নাকি most rational philosophy. আগাগোড়াটা প্রকৃতিরই বিশ্লেষণ অর্থাৎ শক্তিতত্ত্বেরই মীমাংসা। কিন্তু তাঁর শেষ রায় হ'ল—প্রকৃতি অ-ব্যক্তা, সমাধিগম্যা! অর্থাৎ intellect দিয়ে পাওয়া যাবে না, analytic method এ বোঝা যাবে না—চাই synthesis —গুণসাম্য!

তারই practical side দেখাতে এলেন পাতঞ্জল দর্শন। তাতে পেলাম, বিশ্বের শক্তি মানুষের জীবনে কতটুকু ফুটতে পারে—শক্তির সাধনার কথা, বিভূতির কথা, ঐশ্বর্য্যের কথা! পতঞ্জলির নূতনত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণে। সাংখ্য শক্তিকে প্রাণহীন করে রেখেছিলেন—সাংখ্যের Scheme এ প্রাণ প্রকৃতিতে অনুস্যূত থাক্‌লেও তত্ত্ব হিসাবে তার মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। তাই সাংখ্যে প্রকৃতি-পুরুষে "কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।" পতঞ্জলি ঈশ্বরতত্ত্বে সে ন্যূনতাটুকু পূরণ করলেন; ব্যাসভাষ্যে দেখো, ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও পুরুষের মাঝখানে **শুদ্ধসত্ত্ব** ভূমিতে এমন একটী অনির্ব্বচনীয় স্থান দেওয়া হয়েছে যে, এই ঈশ্বরই যে আমার চিন্ময়ী মা, তা বুঝ্‌তে একটুকুও গোল থাকে না।

ন্যায়দর্শন এলেন জগৎ-রহস্য বোঝাতে। শোনা যায়, এঁরা স্বভাববাদী, শক্তি মানেন না। কথাটার তাৎপর্য্য আছে। ন্যায় বড় Common sense এর ভক্ত। স্থূলের মূলে বড় জোর সূক্ষ্ম মান্‌তে পারেন—কিন্তু সাংখ্য যাকে কারণ বলেন, তা তাঁর কাছে দুর্ব্বোধ্য! অথচ এই কারণই তো শক্তি, মা যে কারণরূপিণী! ন্যায় কারণ মানলেন না, অথচ কর্ম্ম মান্‌লেন। কিন্তু কর্ম্ম দাঁড়ায় কিসের ওপর? জগতের নিয়ামক কোথায়? চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ সেজে ন্যায় বল্‌লেন—সে **অ-দৃষ্ট**! ঠিক সাংখ্যেরই **অ-ব্যক্ত** নয় কি? হাঁ, Common sense এর তর্কের কাছে মা আমার অদৃষ্টাই বটে! ন্যায় অন্ততঃ negatively তাঁকে প্রমাণ করলেন, তার মোক্ষপদও তো negative কিনা!

তারপর এলেন জড়বাদী বৈশেষিক। জড় জগতের মূলে তিনি আবিষ্কার করলেন পরমাণু। পরমাণুটী এক আজব চিজ্—না idea না matter. তা হতে জগৎ সৃষ্টি করতে গিয়ে দার্শনিক মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন—"মেরু সর্ষপয়োস্তুল্যতাপত্তিঃ" হয়ে পড়ে যে! মায়াবাদী হয় ত হেসে বল্‌তেন—"তার জন্য ভাবনা কি ভাই! অঘটনঘটনপটীয়সী সব করতে পারেন তো।" কিন্তু সে তো faith এর কথা—reason যে চাই। অগত্যা "বিশেষ" পদার্থের আবির্ভাব, অর্থাৎ principle of differentium স্বীকার করতেই হবে—নইলে জগৎ আর সৃষ্টি হয় না।

মনে পড়ে উপনিষদের সেই "নানা" বাদের কথা—সেই "বহুস্যাং" এর কথা। পরমাণুর **বিশেষ** ধর্ম্মে মা আবার সিসৃক্ষারূপে দেখা দিলেন, বৈশেষিকেরও জগৎ সম্বন্ধে চরম কথা হল ওই "বিশেষ" টুকু।

এমনি করে দেখ, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড— ষড়্দর্শনে কোথায় শক্তির কথা নাই? ধর্ম্মে দর্শনে জাতিটা কেবল শক্তিরই চর্চ্চা করে এসেছে। এ পর্য্যন্ত গেছে শক্তির idealism, তারপর এল শক্তির realism—তন্ত্রে আর বৈষ্ণব দর্শনে। এখানে তো আর মাকে চিন্‌তে গোল হবে না? তবে আর কি ভাই—এখানেই বিদায় হই, মায়ের ছেলে মায়ের কোল জুড়ে থাক।

—পথিক বন্ধু।

মাতৃ-সাধক

(সত্য ঘটনা)

বেশ বিখ্যাত একটী গ্রামে উচ্চ বংশে মাতৃসাধক বসন্তের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন মোক্তার, মোক্তারীতে বেশ পসারও জমিয়েছিলেন, কিন্তু এই মোক্তারী ব্যবসাতেই তাঁর তুষ্টি এসে পড়্‌ল না! সংসারের কর্ত্তব্য সম্পাদনের পর, তাঁর একটী অতি আদরের ছেলে যোগেন্দ্রকে নিয়ে শ্লেট-পেন্সিলে রোজই মায়ের গান রচনায় অনেক সময় অতিবাহিত কর্‌তেন। তিনি এমনি করে আবেগের ভাষায় তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করে ফেললেন! ওঃ—গানের ভিতর দিয়ে মায়ের দর্শন লাভের দরুণ যে তাঁর ভিতর কিরূপ অসীম জ্বালা হ'ত, তা তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন। তাঁর দুটি চোখ সর্ব্বদাই অশ্রু-সজল হয়ে থাক্‌ত। মায়ের প্রসঙ্গ উঠ্‌লে, মায়ের নাম শুন্‌লে তাঁর দু'চোখ বেয়ে দরদর করে বুক ভেসে অশ্রুর বন্যা বয়ে চল্‌ত! দিবারাত্র কান্নার ফলে তাঁর চোখ দুটী অন্ধ হয়ে গেল। এ কিন্তু মায়েরই কৃপা, এতে তাঁর দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল! বাইরের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায়, অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অসাধারণ ভাবে বেড়ে উঠ্‌ল! খেতে বস্‌তে শুতে সব সময় তিনি মাকেই দেখ্‌তেন। দেহত্যাগের সময় মা এসে তাঁকে কোলে করে নাকি দিব্যধামে নিয়ে গিয়েছেন।

একদিনকার একটী সত্য ঘটনা বলি। মোক্তারী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, স্বগ্রামে ফিরে এসে তিনি একটী দোকান দিয়েছিলেন। দোকানে তৈল, ডাল, লবণ ইত্যাদি মুদি জিনিষ ছিল, গ্রামের লোক এ দোকান থেকেই সব জিনিষ পত্র ক্রয় কর্‌ত। কেননা দোকানটী তিনি গ্রামের লোকের উপকারার্থে এবং সদুদ্দেশ্য নিয়েই করেছিলেন। দোকানের জিনিষ ফুরিয়ে যাওয়ায় একদিন নৌকা করে জিনিষ আন্‌বার দরুণ একটী নদীতীরস্থ বাজারে তিনি গিয়েছিলেন। উক্ত বাজারে যেতে হ'লে একটী নদী পার হয়ে যেতে হয়। সকালে খাওয়া দাওয়া করে নৌকা নিয়ে তিনি বাজারভিমুখে রওনা হ'লেন। জিনিষপত্র খরিদ করে সেইদিনেই কিন্তু আসার কথা। ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল তার উল্টো! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিছু রাত্রও হল, তবু তাঁর আসার খবর নেই। এদিকে বাড়ীর লোক চিন্তায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে—না জানি পথে কি হয়েছে! কেননা আগরাত্রে বেশ একটু ঝড়ও হয়েছিল, হয়ত বা নৌকাখানি মালসহ জল-মগ্নই হল—আত্মীয় স্বজনদের মাঝে এরূপ নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা চল্‌ছে। এদিকে রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। এমন সময় একজন প্রতিবেশী শূদ্রশ্রেণীর লোক এসে খবর দিল, আপনারা কোন চিন্তা কর্‌বেন না, ঠাকুর কর্ত্তা [মাতৃসাধক বসন্ত] একটী গান গেয়ে গেয়ে আস্‌তেছেন। গানটি বড়ই সুন্দর, এখনো আমার কানে লেগে রয়েছে—

যদি মায়ের দেখা পাই, সংসারের দুঃখে
কি মা কখনো ডরাই।
যদি থাকি মায়ের কোলে, ভালবাসি
গাছের তলে ··· ··· ইত্যাদি।

এই লোকটি চলে গেলে, পর পর আরও দু'টি লোক বলে গেল যে ঠাকুর কর্ত্তা মাঠ দিয়ে নৌকা করে গান গেয়ে আস্‌তেছেন, আপনারা কোন চিন্তা কর্‌বেন না। বাড়ীর সকলেই তো তাদের কথা শুনে বেশ আশ্বস্ত হল, এবং সকাল বেলা দোকান ঘরের কপাট খুলে দিল। ওমা, একি তাজ্জব ব্যাপার! সকাল গেল, বেলা ১১টা বেজে গিয়েছে, তবু ওঁর আসার খবর নেই। আস্‌তে আস্‌তে বেলা হয়ে গেল ৩টা। সকলেই তো এ ব্যাপারে অবাক্! তিনি এসে পৌঁছাবা মাত্রই সকলে উক্ত কাহিনী তাঁর কাছে বর্ণনা কর্‌লেন। যারা তাঁর গানটি শুন্‌তে পেয়েছিল, নৌকার ঘট্‌ঘট্ শব্দ শুনেছিল, তারাও এসে সব দেখে শুনে অবাক্! তারা বল্‌লে, একি কর্ত্তা, আপনি না খুব সকালে একটি গান গেয়ে আমাদের বাড়ীর পাশের খাল দিয়ে এলেন? ঠাকুরকর্ত্তা তো এ সব শুনে অবাক্। তিনি বল্‌লেন— সকাল বেলা তো আমি সেখান থেকে রওনাই

হইনি। জিনিষপত্র কিন্‌তে কিন্‌তে' দেরী হয়ে যাওয়ায় কাল আর আসা হয়নি—আজ ১০টার সময় ওখান থেকে রওনা হই।

* * *

এ সব কথা শুনে তিনি আর কাউকে কিছু বলেননি, অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি কর্‌লেন মায়ের অহেতুক করুণা। এর পর থেকে মাতৃ নামে তিনি পাগলের ন্যায় হয়ে গিয়েছিলেন। মা এসে ওঁর সঙ্গে কথা বল্‌তেন। সুখ-দুঃখ যত কিছু আছে, সব তিনি শিশুর ন্যায় মায়ের কাছে প্রাণ খুলে কেঁদে কেঁদে বলেই যেন সুখ পেতেন! জগতের আর কারও উপর ওঁর ভরসা ছিল না, তিনি মাতৃগত প্রাণ শিশুর ন্যায় মায়ের কাছে সব নিবেদন কর্‌তেন। তাঁর জীবনে আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে—সে সব কথা দু'একটি অন্তরঙ্গ লোক ছাড়া আর কাউকে তিনি কিছু বলেন নি।

দেহত্যাগের দু'একদিন পূর্ব্বে তিনি অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন, অমন সময় দেখেন— জগদুদ্ভাসিত জ্যোতিঃ বিকীরণ কর্‌তে করতে এসে মা তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন—"বসন্ত, এবার তো তোর যাবার সময় হ'ল, এখন চল।" এই বাণী শুনতে পেয়ে অমনি তিনি বিছানা হতে এক লাফে উঠে তাঁর প্রিয়তম ছেলেকে ডাক দিলেন শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে আস্‌তে; ছেলে আসা মাত্রই গুণ গুণ করে তিনি গাইলেন—

মা এসেছে আমায় নিতে
চেয়ে দেখ্‌না তোরা ভাই।
তোরা দে সকলে আমায় বিদায়
আনন্দে মায়ের কোলে যাই......ইত্যাদি!

ঠিক দু'দিন পর হঠাৎ তিনি সকলের মায়া পরিত্যাগ করে দিব্যধামে চলে গেলেন। অসুখ-বিসুখ কিছুই নয়, হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন—আমার যেন শরীরটা কেমন কেমন করছে রে! এ কথা বলার ২।৩ মিনিট পরই—মা কালী, কালী, কা—লী—ই...... বল্‌তে বল্‌তে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ছেড়ে চলে গেলেন!

* * *

জীবিতাবস্থায় তাঁকে বড় কেউ চিনেননি—কিন্তু উনি মাতৃ-বিষয়ক যে সব সঙ্গীত রচনা করে রেখে গিয়েছেন, সে সব পড়ে কিম্বা গেয়ে দেখ্‌লেই বুঝা যায়, তিনি কত উঁচু দরের সাধক ছিলেন।

—:০:*:০:—

জয় মা আনন্দময়ী।

——(০)——

জয় মা আনন্দময়ী! আনন্দের জয় সর্ব্বত্র। আর সকলের জগতে পরাজয় রয়েছে, কিন্তু আনন্দের পরাজয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই থাকে না, থাকে কেবল আনন্দ। সুখ-দুঃখ বা সেই সবের উপকরণ চিরস্থায়ী নয়; তাদিগকে কেউ চায়, কেউ চায়না; কিন্তু আনন্দ চায় সবাই। সুখ কখনো সুখ বলে গণ্য হত না, যদি তার মাঝে আনন্দ না থাক্‌ত। দুঃখকে কেউ চায় না কেন? আনন্দ নাই ব'লে। যে দুঃখের মাঝেও আমরা আনন্দ পাই, সে দুঃখ ভালই লাগে। প্রিয়জনের সুখের জন্য নিজের সামান্য সুখেচ্ছা ত্যাগ করতে পারা যায়; কেননা তাতে বেশ আনন্দ আছে। আনন্দের উপকরণ ব্যক্তি ভেদে নানা প্রকার ও চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন আধারে হলেও মূলতঃ আনন্দ চিরদিনই আছে। কারণ, জগতের মূল সৎ+চিৎ+আনন্দ। তার মাঝে আনন্দের প্রাচুর্য্য স্বাভাবিক। মূলে আনন্দের দ্যোতনা ও চৈতন্যের দ্যোতনা রয়েছে, আর তা চিরদিন থাক্‌বে। অসতের ধ্বংস আছে কিন্তু যাহা সৎ তাহা চিরদিনের। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যময় না হলে, জড় হলে, জগতে চিরনিদ্রার বাহিরে জাগ্রত প্রাণের আনন্দ থাক্‌ত না। জড়ের আনন্দ বা দুঃখ নাই কেন?—তার মাঝে চৈতন্য নাই বলে। দুইটি জীবন্ত প্রাণীর মাঝেই আনন্দের বিকাশ, দুইটি মৃত প্রাণ বা শবদেহের আনন্দ নাই। অবার শুধু সৎ ও চিৎ থাক্‌লেও জগৎ মধুর হয় না, যদি তার মাঝে আনন্দ না থাকে। মোট কথা ব্রহ্মের এই তিনটী বিভাবের একটি না হলেও জগৎ চলে না।

আনন্দের বিকাশ যেখানে বেশী, সেখানেই প্রাণের লীলা। শক্তির স্ফূরণও সেই খানে। আনন্দের ভিতর যদি শক্তির প্রভাব না থাকে, তবে তাতে চৈতন্যের বিকাশও কম হবে এবং তার স্থায়িত্বও স্বল্পক্ষণ। এই জন্য দুর্ব্বলের হীনবিষয়ক আনন্দ সবলের উচ্চবিষয়ক আনন্দের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী। প্রাণবন্তের মধ্যেই শক্তি এবং আনন্দের সমধিক বিকাশ। জয়লাভ করে শক্তিমান্‌ই। যার শক্তি কম, তারই হারিবার সম্ভাবনা। আনন্দ বা প্রাণশক্তি প্রচুর না হলে জয়ের আশা দুরাশা। কাজেই যে কোনও সংগ্রামে, জগতে যা কিছু সংগ্রহে, রক্ষণে এবং তৎকল্পে প্রয়োজন মত বিনাশ সাধনেও চাই প্রাণ ও শক্তির স্ফূরণ। প্রাণই আনন্দ, শক্তিই আনন্দ! প্রাণ-শক্তির অভাবে আনন্দ দুরাশা। আনন্দ পেতে হলে প্রাণের ও শক্তির যাতে আরও বিকাশ হয়, তাই করতে হবে। আনন্দ চাই, অথচ সে আনন্দ যাতে হয় তা করব না—এ হলে তারপক্ষে আনন্দ লাভ হবে না। আবার কিছু করতে হলেই চাই শক্তি, শক্তি সংগ্রহে চাই দুর্দ্দম প্রাণ! শুধু জড়ের মত বসে থেকে শক্তির কল্পনা করলেই শক্তি আসে না।

মহাশক্তিকে আহ্বান করতে হ'লে আগে প্রাণের উদ্বোধন চাই। ঘুমন্ত প্রাণে কি শক্তির উদ্বোধন হয়? বোধন পূজা হোক্, তারপর শক্তি পূজা; আগে নয়। আগে সে জন্য তৈরী হওয়া চাই। প্রাণ তৈয়ারীর চেষ্টা ভিন্ন শুধু আশার কল্পনায় শক্তির বিকাশ ঘটে না। সুতরাং জয় ব্যাপারটী সহজ নয়।

জয় হোক্, আনন্দ হোক, কিন্তু মা কেন? বিশেষ ক'রে নারী কল্পনা কেন? মায়ের মূর্ত্তি না হয়ে বরং শক্তির কল্পনায় পুরুষ মূর্ত্তি হলেই তো ঠিক মানায়! পুরুষেরই জয় ও তজ্জনিত আনন্দে বিশেষ অধিকার। সুতরাং কমনীয় মায়ের মূর্ত্তি কেন?—কারণ আছে। শক্তির প্রকাশ উচ্ছৃঙ্খল ও বিনাশক হয় যদি তার মাঝে রক্ষাকারিণী মায়ের হাত না থাকে। শক্তিকে আয়ত্বে রেখে, সুশৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনা ক'রে, পরিণামে সে আনন্দের বিকাশ সাধনে কল্যাণরূপিণী মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা। পুরুষের চেয়ে নারীর মাঝে আনন্দের প্রাবল্যও বেশী। ব্রহ্মের তিনটী বিভাবের ভিতর পুরুষের মধ্যে চৈতন্য ও নারীর মধ্যে আনন্দের ভাগ বেশী। (যে সমস্ত পুরুষের মাঝে আনন্দের বিকাশ বেশী, তাদের মধ্যে নারীসুলভ অনেক গুণই বেশী। আবার অনেক নারীর মাঝেও অবশ্য পুরুষের ভাব বেশী হতে পারে। কিন্তু এ সবই হল exceptional case. সাধারণতঃ নারীতে আনন্দ ও পুরুষে চৈতন্যের প্রকাশ বেশী। এজন্য পুরুষে জ্ঞান এবং নারীতে ভক্তি স্বাভাবিক। মানুষের মাঝেও জ্ঞানী বা যুক্তি-পক্ষপাতী, ও ভক্ত বা স্বাভাবিক আনন্দের পক্ষপাতী, এই দুই শ্রেণীর লোক রয়েছে। নির্গুণ ও সগুণ এবং নিরাকার বা সাকার প্রভৃতি বাদ ও ভিন্ন ভিন্ন সাধন পন্থা, এইরূপ মানুষের বিভিন্ন স্তরানুসারেই হয়েছে।) সর্ব্বত্র আনন্দ অনুস্যূত থাকলেও বিশেষভাবে নারীর মাঝে আনন্দের প্রাবল্য বেশী বলেই এবং পুরুষের শক্তির পিছনে নারীশক্তি অলক্ষ্যে থেকে তাকে সুসমঞ্জস রাখে বলেই শক্তি ও আনন্দের মূর্ত্তি কল্পনায় নারী-মূর্ত্তি কল্পিত হয়েছে। (বস্তুতঃ তিনি দুই-ই)।

আবার নারী শক্তিরূপিণী হলেও মাতৃরূপে যেমন সর্ব্বমঙ্গলা, নারীরূপে সব সময়ে তেমন মঙ্গল-সাধিকা হয় না। অক্ষমতায়, দুর্ব্বলতায় মানুষ কোনও দিন তার মার কাছে ঘৃণ্য হয় না। 'কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়।' দুর্ব্বল মানবের পক্ষে শক্তি ভিক্ষার ও ভরসার স্থল মা ভিন্ন আর কে আছে? রোগে দুঃখে-শোকে সান্ত্বনার, সুখে আনন্দ করিবার, মানুষের এমন জন আর কেউ নাই। নারীরূপে এমন সর্ব্বাবস্থায় সকল মানুষকে সে রক্ষা করে না, বা আনন্দ দানে সমর্থ হয় না। তাই শক্তিদায়িনী, রক্ষারূপিণীর এই পরিপূর্ণা মূর্ত্তির মাতৃরূপই উপযুক্ত। মহাশক্তির কাছে পুত্ররূপে শক্তিভিক্ষা করাই দুর্ব্বল মানবের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। অবশ্য সাধনার স্তরভেদে মহাশক্তিকেও নারীরূপে ভজনা করে—এমন শিবস্বরূপ বীরসাধক আছে, কিন্তু স্বভাবতঃ দুর্ব্বল মানুষের মধ্যে তেমন অধিকারী খুবই কম। মহামায়ারই কৃপাতে যিনি সমস্ত প্রকার দুর্ব্বলতাকে পরাস্ত করে, সমস্ত কামনার উর্দ্ধে গিয়ে, মহাতেজস্বীরূপে স্বমহিমায় প্রশান্ত ভাবে বিরাজ করতে সক্ষম, একমাত্র তেমন পরম বৈদান্তিক, ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ, পরম শিব-স্বরূপের পক্ষেই তেমন ভাব সম্ভব। নতুবা সাধারণের পক্ষে মাতৃভাবই প্রশস্ত।

কাজেই বল—জয় মা আনন্দময়ী। তিনি আনন্দময়ী, কেবল ব্রহ্মময়ীই নন। তিনি যদি শুধু ব্রহ্মময়ী হয়েই থাকতেন, আনন্দময়ী না হতেন,

তবে হতাশ, ব্যথিত, নিরানন্দময় আমাদের মত দুর্ব্বল সন্তানের আনন্দ যোগাত কে? শক্তির সঙ্গে আনন্দ দিয়ে জগৎকে, জীবনকে এমন মধুময় করে তুলত কে? "ভক্তানা বাঞ্ছাসিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" তিনি শুধু অরূপ হয়ে ব্রহ্মময়ী থাক্‌লেই আমার চলে না। আমার তৃষিত প্রাণকে স্তন্যপীযূষধারায় সন্তৃপ্ত কর্‌তে, আমাকে শক্তির আনন্দময় সাগরে নিমগ্ন কর্‌তে যে তাঁর রূপ পরিগ্রহ করা প্রয়োজন। শুধু কি আমারই প্রয়োজন তাঁকে—আমিও কি তাঁর প্রয়োজনীয় নই? আমার কামনা-বাসনান্দোলিত দুর্ব্বল মনের সকল সাধ পূর্ণ কর্‌তে পারে এমন্ জন আমার সেই আনন্দময়ী মা ভিন্ন আর কে আছে? আবার তাঁরও স্নেহভরা বুকখানি সন্তানের জন্য যে আপনি কেঁদে ওঠে! সন্তান নইলে সেই অমৃত পীযূষবাহিনী পয়োধরার পয়ঃপান করে কে? কে তাঁর বুক জুড়ানো ধন হয়ে তাঁর বুক আলো করে? আমিও তাঁর, তিনিও আমার। আমার সমস্ত ন্যূনতা, দুর্ব্বলতা পূরণ ক'রে আমাকে অপূর্ণ জীবনের মর্ম্মদাহী জ্বালা থেকে উদ্ধার ক'রে পরিপূর্ণ আনন্দে ভরা জীবনের স্বাদ তিনি বিনে আর কে দেবে? প্রাণ খুলে আমার সমস্ত দৈন্য, লোকচক্ষুর অন্তরালের সমস্ত কলুষকালিমা তাঁর ঐ রাতুল চরণে ঢেলে দিয়ে প্রাণ ভরে 'মা—মা' বলে অপূর্ণ অশান্ত এই প্রাণ মনকে পূর্ণ ও শান্ত করে তুল্‌ব। তিনি যে "ভক্তানাম্ অভয়ায়চ।" ভক্তের ভীত প্রাণকে পরম ভরসা, চরম সান্ত্বনা দিয়ে অভয়বাণী শুনাতে তিনি ছাড়া অর যে কেহ নাই! মা আমার অভয়া থাক্‌তে মা-হারার মত পরের দ্বারে যাব কেন? জীবন-যুদ্ধে শ্রান্ত-ক্লান্ত-মলিন-নিরানন্দ প্রাণকে আনন্দময় করে তুল্‌তে মায়ের আমার আনন্দময় রূপ কল্পনা চাই। তাই শুধু ব্রহ্মময়ী হলেই আজ চল্‌বে না।

—৩৪

জগৎ আনন্দময়—কেন? তাঁর লীলায়। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্। তাঁর লীলা যে এই লোক পালনের জন্যই। জগতের পালন হয় আনন্দে! এই জগৎ শুধুই বেঁচে নাই, আনন্দে বেঁচে আছে। তাঁর আনন্দেই জগৎ বিধৃত! তুমি-আমি যদি ব্যক্তিগত দু'একটী দুঃখ শোকে মুখ মলিন ক'রে ঘরের কোণে বসেও থাকি, তবুও এই বিরাট জগতের আনন্দলীলার বাধা হয় না। ঊষা ও সন্ধ্যা তাঁদের মোহন মূর্ত্তি ধারণ ক'রে প্রভাতে সন্ধ্যায় দেখা দিতে বাধা কর্‌বে না, নূতন শিশুর নবীন প্রাণের প্রাণ-মন-বিমোহন নির্ম্মল হাসির ব্যত্যয় ঘট্‌বে না—কমনীয় প্রকৃতির রমণীয় লীলাভিনয়ের বিরতি দেখ্‌বে না। কেননা, জগৎ যে সেই আনন্দময়ীরই রূপ, কাজেই সে চিরানন্দময়—চিদানন্দময়।

সেই সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের আগমনে চির-বিচিত্রময়ী প্রকৃতির আজ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! প্রতিবৎসর এম্‌নি ভাবেই চির আনন্দের বার্ত্তা বহন করেও এমন দিনে পবন যেন নূতন ক'রে মায়ের আগমনীর নূতন সংবাদ এনে দেয়। রবিকরোজ্জ্বল স্নিগ্ধ ধরণীর মোহন শ্যামলিমা ঐ নীলাকাশের অপূর্ব্ব মাধুরীতে মিশে গিয়ে যেন সমস্ত ধরাকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। বেছে বেছে ষড়ঋতুর শরৎ ও বসন্তে—মনের স্বাভাবিক আনন্দের দিনে আনন্দময়ী মায়ের আগমন। তাঁর আগমনে, তাঁর পূজার মাহিমাতেই কি এই দু'টী ঋতু এত মধুময় এত সুন্দর! শরতের শস্যমধু ও বসন্তের পুষ্পমধু বুঝি আনন্দময়ী মায়ের স্পর্শেই অমন মধুময় হয়। কিন্তু তার মাঝেও আবার ষড়ঋতুশালিনী বাংলা, মমতাভরা মায়ের বুকে বিশেষ ক'রে শরৎকালেই আশ্রয় লয়। প্রিয়জন বিরহকাতর, তৃষাতুর বাঙ্গালীর প্রাণ

সমস্ত বছরের মধ্যে এমন সময়েই মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে প্রিয়জন দর্শনজ আনন্দের আশায় পুনরায় একবৎসরের জন্য বুভুক্ষিত প্রাণে শক্তি সঞ্চয় করতে মায়ের কোলে ফিরে আসে। বর্ষার ক্লেশক্লিষ্ট দরিদ্র কৃষকের প্রাণে আনন্দের ঢেউ তুলে শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর অঞ্চলপ্রান্তে যখন শরতের স্নিগ্ধ কিরণ দেখা দেয়, মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল প্রান্তর যখন শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়, বিশেষ ভাবে সেই সময়টাতে বাঙ্গালী মায়ের পূজা বেছে নিলে। হৃদয়বান্ বাঙ্গালী হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রেখেই তাঁর পূজা, উৎসব ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা করেছে।

হিন্দুস্থানের অযোধ্যার রাম করলেন অকাল-বোধন বা শরতে পূজা, আজ তাতে উদ্বুদ্ধ দেখি বাঙ্গালীর প্রাণ! হিন্দুস্থানী বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর এই শারদীয়োৎসব এমন ভাবে স্থূলে সূক্ষ্মে, কাজে ও ভাবে, বাস্তবে ও কল্পনায় গ্রহণ করতে পারেনি। এখানেই আসে আবার সেই বাঙ্গালীর বিশেষ করে প্রাণের কথা। প্রাণবন্ত এই বাঙ্গালী বুঝেছে যে প্রাণের উদ্বোধন ভিন্ন মহাশক্তির বোধন হয় না। তাই প্রাণের সঙ্গে তারা বাস্তব রাজ্যের সমস্ত দুঃখ দৈন্য ঘুচিয়ে শক্তির অবতারণায় মায়ের এমন পূজার অনুষ্ঠান করেছে। যেমন শুধু মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে পূজা করে বলে বিধর্ম্মীরা হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে গাল দেয়, তেমনি এক বাঙ্গালী দেখিয়েছে যে, কেমন করে সেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে চিন্ময়ী করে তুলে তাঁর পূজায় দেহে মনে প্রাণে সবদিক দিয়ে উন্নতি করা যায়। আজ যে ভেতো বাঙ্গালী জীবনের সমস্ত দিকে অভাব পূরণ করতে এমন মরিয়া হয়ে লাগতে চাইছে, কে বলবে তা সেই আনন্দ-ময়ীর অভয় বরে পূর্ণ হবে না? বাঙ্গালী আজ জগদ্বরেণ্য শুধু মায়ের বরে। তার জয় শুধু মায়ের জয়ে। এস ভাই প্রাণ খুলে বলি, ঐক্যপ্রাণের আহ্বানে মাকে মূর্ত্ত করে বলি—**জয় মা আনন্দময়ী!**

ভাবত্রয়

তন্ত্রে তিনটী ভাবের কথা রয়েছে—যথা, পশু-ভাব, বীরভাব, দিব্যভাব। কিন্তু সদাশিব পার্ব্বতীকে পশুভাব এবং দিব্যভাবের কথা বিশেষ ভাবে বারণ করে দিয়েছেন। যথা:—

পশুভাব-দিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ।
কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতোভবেৎ॥

পশুভাব এবং দিব্যভাব কলিতে নাই। পশু-ভাবই যখন নাই, তখন আর দিব্যভাব কি প্রকারে থাকতে পারে? পশুভাবাবলম্বীদের কর্ত্তব্য হল এই যে—তারা পত্র জল ফল স্বয়ংই আহরণ করবে, শূদ্র দর্শন করবে না এবং মনদ্বারাও স্ত্রী স্মরণ করবে না। দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তির কথা বলতে

গিয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলছেন :—

দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূতসমঃ ক্ষমী॥
কলিকল্মষযুক্তানাং সর্ব্বদাস্থিরচেতসাম্।
নিদ্রালস্য প্রসক্তানাং ভাবশুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ

দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি দেবতুল্য, শুদ্ধান্তঃকরণ-বিশিষ্ট, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, বাসনারহিত, সর্ব্বভূতে সমভাব-বলম্বী। কিন্তু এখনকার কলিযুগের লোক পাপ-যুক্ত, সর্ব্বদা অস্থির চিত্ত, নিদ্রা ও আলস্যে: প্রসক্ত। সুতরাং এদের ভাবশুদ্ধি হবে কেমন করে ?

তন্ত্রের এই ভাবত্রয়ের সঙ্গে বৈদিক আশ্রমের বেশ সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে। **১ম পশু-ভাব**—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন, নিয়ম সংযমের ভিতর দিয়ে জীবনগঠন করে তোলা। **২য় বীরভাব**—ভোগে অটলথেকে এগিয়ে যাওয়া, প্রলোভনের মাঝে থেকেও প্রলুব্ধ না হওয়া, এ হচ্ছে গার্হস্থ্য। **৩য় দিব্যভাব**—সন্ন্যাস, সত্য-প্রতিষ্ঠা! তখন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি।

এই ভাবত্রয়ের ভিতর দিয়েই জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন আমাদের দেশ পশুভাবের সাধনায়, অর্থাৎ অটুট ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতে অপারগ, অথচ বীরভাবেই জগতের অধিকাংশই চল্‌ছে। মূলে যে শক্তি থাক্‌লে বীরভাবে চলা সম্ভব সেই শক্তিই নাই, সুতরাং বীরভাবের মাঝে কেবলই ভোগের ব্যভিচার চল্‌ছে। কলিযুগের লোক ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল বলেই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে পশুভাব এবং দিব্যভাবের কথা নিষেধ করেছেন। একমাত্র বীরভাবের কথাই অনুমোদন করেছেন। কিন্তু অনুমোদন করলেও, বীরভাবের আসল যে বীরত্বটুকু-তা না থাকায়, গার্হস্থ্যাশ্রমও পশু হয়ে যাচ্ছে! ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করলে বীর্য্যবস্তু হওয়া যায় না, আর বীর্য্যবস্তু না হলে জ্ঞানেরও বিকাশ হয় না।

দুর্ব্বল জাতির পরিত্রাণের নিমিত্তই তন্ত্রের উদ্ভব! মানুষ যখন ভোগে লোলুপ হয়ে উঠ্‌ল, কিছুতেই তাদের ভোগ থেকে প্রতি-নিবৃত্ত করা যাবে না দেখা গেল, তখনই তন্ত্র মতের সৃষ্টি! প্রকৃতিকে যখন এড়িয়ে চলা যাবে না, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গেই প্রকৃতি জড়িয়ে থাকুক—এই হল তান্ত্রিকের মত! তন্ত্রের সমস্ত চিহ্নই এই ভাবের দ্যোতক। এর মাঝে অনেক গুপ্ত রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে। বেদকে সহজ এবং বিস্তারিত করেছে এই তন্ত্র। তন্ত্র একটা এত বড় প্রভাবশালী Culture যে বৈদিক সমস্ত অনুষ্ঠানের সমানে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান টেক্কা দিয়ে চলেছে! সন্ধ্যা, তর্পণ, মন্ত্র, দশকর্ম্ম ইত্যাদি তন্ত্রের।

কিন্তু তন্ত্র এই ভোগের কথা বলেও, তন্ত্রের লক্ষ্য রয়েছে refined ভোগ! কাজেই মূলে পশু-ভাবকে স্বীকার না করে উপায় নাই। পেছনে একটা দৃঢ় শক্তি না থাক্‌লে, মানুষ প্রলোভনের মাঝে পড়ে সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে যায়। ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর, গৃহী হলে ভোগের দিকে মন গেলেও তখন মন কিছুতেই অসংযত ভোগে প্রবৃত্ত হতে পারে না। কেননা ব্রহ্মচর্য্য পালনের শক্তিতেই তখন তাকে সেই পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

পুরুষের মাঝে পৌরুষত্ব থাকা চাই—বীরভাব পুরুষেরই উপযুক্ত! কিন্তু সর্ব্বত্রই আত্মরক্ষার কবচ সঙ্গে থাকা প্রয়োজন, তা না হলে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে মানুষ জীবনের মহৎ লক্ষ্য ভুলে যায়। সংযত ভোগে মানুষের সর্ব্বনাশ হয় না; মানুষ মরে ব্যভিচার করে! গীতাতেও ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামকে

অনুমোদন করেছেন। কাজেই নিয়ম সংযমাধীন জীবন যাপনই ঠিক আদর্শ জীবন-যাপন প্রণালী!

তন্ত্রের মাঝে 'শুদ্ধি' কথাটার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তন্ত্রের ভোগবাদের মূলেও রয়েছে কঠোর নিবৃত্তির সাধনা! পশুভাবে সিদ্ধ না হয়ে, বীরভাবে জীবন যাপন করলে, তাতে গলদ আসা স্বাভাবিক। পৌরুষভাব না থাকলে, প্রকৃতির কবল হতে নিস্তার পাওয়াও কঠিন। এই জন্যই দেখি পৌরুষত্বের অভাবে, পুরুষ সংসারে প্রকৃতির কবলিত! এটা কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের পুরুষের আদর্শ জীবন নয়! পুরুষ হবে স্বতন্ত্র, স্বাধীন—তার জীবন অবশের মত হস্সে চল্‌বে কেমন করে? এখন পুরুষের এই পৌরুষত্ব বা স্বাধীনতার বীজ পশুভাবের মাঝেই উক্ত রয়েছে। পুরুষ সংযমী না হলে, প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌তে গিয়ে তাকে নাকাল হতেই হবে। আজকাল নারী পুরুষের স্ব স্ব কর্ত্তৃত্ব নিয়ে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। আমি বলি, নারী পুরুষ কেউ আত্মস্থ নয় বলেই এই বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। নারী পুরুষ উভয়েই যদি সংযমী হ'ত, তাহলে উভয়ে মিলেও যার যার কর্ত্তৃত্বের মহিমা উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হ'ত না। পুরুষ পশুভাবের সাধনায় মোটেই সিদ্ধ নয়, অথচ এই দুর্ব্বলতা নিয়েই চায় সে নারীর উপর প্রভুত্ব জারী কর্‌তে। কিন্তু একি কখনো সম্ভবপর হতে পারে? দুর্ব্বলতাকে সকলেই ঘৃণা করে। সংযমী আত্মরতিপরায়ণ পুরুষের কাছে নারী আপনি অবনমিতা। স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ আর স্বপ্রতিষ্ঠা নারীর মাঝে কোন বিরোধ নাই। তাদের মিলন দুর্ব্বলতার মিলন নয়, এই জন্যই কেউ কারও দোষ বা গলদ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে না।

গার্হস্থ্য জীবনের আসল লক্ষ্যও ছিল এই। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে উন্নত হবে। কিন্তু যেখানে গলদ, সেখানেই ক্ষোভ, সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়ে পারে না। পুরুষ উদাসীন বলেই প্রকৃতি তার দরুণ এত সচেষ্টা, এত ব্যাকুলা! কিন্তু পুরুষের কিছুমাত্র কামনা বা চাঞ্চল্য দেখ্‌লে প্রকৃতি পুরুষের দরুণ এত ব্যস্ত কিনা সন্দেহ। কাজেই যার যার পদ মর্য্যাদা রক্ষা করে চল্‌লে তখন আর সম্মান, প্রতিপত্তির কথা নিয়ে এত ঝগড়া ঝাটি হতে পারে না।

শ্রদ্ধা-ভক্তি এ সব অন্তরের জিনিষ। অপরের কাছ থেকে জোর করে এদের আদায় করা যায় না। আজ যদি নারী পুরুষকে মান্‌তে না চায়, তাহলে পুরুষকে একবার অন্তরের মাঝে তলিয়ে গিয়ে দেখ্‌তে হবে, তার মাঝে এমন কোন জিনিষের উদ্ভব হয়েছে কিনা যাতে করে তার নিজেরে মহিমাও ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং নারীরও শ্রদ্ধার মূল শিথিল করে দিচ্ছে! গভীর ভাবে অনুসন্ধান করেও যদি কোন গলদ ধরা না পড়ে, তাহলে পুরুষের আত্মস্থ হয়ে থাকাই উচিত! একদিন চঞ্চলা প্রকৃতি তার নিজেরে চাঞ্চল্য উপলব্ধি করে নির্ব্বিকার উদাসীন পুরুষের কাছে আত্ম-সমর্পণ কর্‌বেই কর্‌বে। এই সমর্পণ প্রকৃতির দুর্ব্বলতা নয়—প্রকৃতির মহত্ত্ব!

দিব্য ভাবেই প্রকৃত মিলন। সে মিলনে কোন আসক্তি নাই! উভয়ের ভাব শুদ্ধি না হলে এ মিলন হতে পারে না! এই জন্যই পশুভাব, বীর ভাবকে অতিক্রম করে এলে পর দিব্য ভাবের অধিকারী হওয়া যায়! নিম্নের দুটী ভাবকে অবজ্ঞা করে দিব্য ভাবে আরোহণ করা অসম্ভব। আসল কথা হ'ল—তপঃশক্তি! নারী পুরুষ উভয়ের তপঃ-শক্তিতেই দিব্য ভাব আসে! কাজেই জীবনে শোধন চাই, শুদ্ধি চাই, রূপান্তর চাই! ভোগের দিকে মন গেলেই দোষ, দ্বন্দ্ব লেগে উঠে আর, নিবৃত্তির দিকে গেলেই শান্তভাবে জীবন যাপন

করা যায়। কাজেই নিবৃত্তির সাধনাতেই মানুষের সুখ শান্তি।

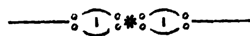
শান্তিই যদি জীবনের কাম্য হয়, তাহলে স্থূল কামনা বাসনাকে তপস্যার আগুনে বিদগ্ধ করতেই হবে! নারী পুরুষ উভয়ই যদি সংযত না হয়, তপস্বী না হয়, তা হলে পাশ্চাত্যের আদর্শানুযায়ী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও প্রকৃত শান্তি আস্‌বে না। কিম্বা কাজে কর্ম্মে যদি নারী পুরুষের অংশীদারই হয়, তাহলেও বড় কিছু এগুবেনা। আসল কথা হ'ল—ভাবশুদ্ধি।

নিরোধের সংস্কার না নিয়ে স্থূলে নেমে এলে বড়ই বিপদ হয়। আজকাল সংসারে যে লীলা চল্‌ছে! জীবনটাকে কেবল স্থূলে আস্বাদন করা নয়; সূক্ষ্মে কারণেও আস্বাদন কর্‌বার ঝোঁক থাকা চাই। তবেই স্থূল ভোগের প্রতি একটা বিতৃষ্ণ ভাব আপনি এসে উপস্থিত হয়। ভোগেরও তো উৎকর্ষ রয়েছে! কেউ খেয়ে সুখ পায়, কেউ বা খাইয়েই সুখ পায়। যে খাইয়ে সুখ পায়, সে কি নিজকে বঞ্চিত কর্‌ল বল্‌তে হবে?

পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাব এই ভাবত্রয় ক্রমোন্নতির সোপান। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য তারপর সন্ন্যাস—এই হ'ল স্বাভাবিক পন্থা। মূলে পশুভাব বা ব্রহ্মচর্য্যকে বাদ দিয়ে বীরভাবের বা দিব্য ভাবের সাধন কর্‌তে গিয়েই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা! সংযম বিহীন ভোগেই মানুষকে পশুতে পরিণত করে, আর সংযত ভোগ দ্বারাই মানুষ দিব্য ভাবের অধিকারী হয়। লাফ্‌ দিয়ে গাছের আগায় উঠতে গেলে, কপালে দুর্গতি ঘটবেই।

আমাদের নারী পুরুষ সকলেরই লক্ষ্য হওয়া চাই এই দিব্য জীবন। কাজেই পশুভাব, বীরভাব এই উভয় ভাবকেও অতিক্রম করে যেতে হবে। আর একথা সত্যি যে, মূলে গলদ না থাকলে অর্থাৎ পশুভাবে সিদ্ধ হতে পার্‌লে, স্বাভাবিকই জীবনের গতি উর্দ্ধমুখী হয়। তখন গার্হস্থ্যাশ্রম পালন করেও নারীর মুখ দিয়েই একথা বের হয়—"যেনাহং নামৃতাস্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌।"

এখন এই দিব্য জীবন লাভ কর্‌তে হলেই—সাধনা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই পশুভাব বীরভাবেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে! কিন্তু একথা মনে রাখ্‌তে হবে—দিব্যজীবন লাভ কর্‌তে না পার্‌লে চরম শান্তি নাই।



দেশ ও বন্যা

দেশ কহে বান মোরে কেন ভাসালি।
বান কহে এ কথায় মোরে হাসালি।
ডুবে আছ পাপে তুমি নামে মাত্র ভাসি'—
আঁখিজলে ধুয়ে তব ফুটাইব হাসি।



শক্তি পূজা

—:—

থাক্ তোর ওই কান্না আজিকে
শোন্ দেখি পেতে কান—
শক্তি পূজার ডঙ্কা বাজিছে
শক্তির আহ্বান!
রক্ত চাহিছে—অসুরের বলি,
কোথায় পশু-রুধির—
আপনার বুকে দৈত্য পুষিয়া
ভাবিছ হবে সুধীর?
নহেরে জৌলস,—বলি চাই তার
দুর্দ্দম সবাকার—
পূজিলে তাহারে পূজার অর্ঘ্যে
করে সব ছারখার!
শক্তি পূজার তাই উপাদান
রক্ত-বক্ষ-চীর—
দুর্ব্বল কভু নহেরে শাক্ত
সে যে হবে মহাবীর!
বাজুক বাদ্য নাচুক ধমনী
ছুটুক ধারা লহর
মায়ের চরণ ধোয়াইতে চাই
টাট্কা প্রাণ বহর!
কান্নায় তাই হবেনা—হবেনা
ওরে ওঠ্ শোন্ হাক্—

মায়ের দুয়ারে বলি চাই, বাজে
ডঙ্কা-কাঁসর-শাঁখ!
শক্তি ক মী এ পূজার যোগ্য
দুর্ব্বল ম্রিয়মাণ—
শক্তি বিনে কি শক্তের হাতে
দুর্ব্বল পায় ত্রাণ?
শক্তিরে তাই পূজিছে বাঙালী
খুলে গেছে তার দিল্—
ফুটিছে পদ্ম হৃদয়ে তাহার
ছিল যেন যাহা বিল!
আজি মন তার বিল নহে আর
সমুদ্র সে সুগভীর—
কম্বু নিনাদে ডাকিছে সঘনে
এস মায়ে পূজ ধীর!
মত্ত আজিকে আকাশ বাতাস
শুনি সেই আহ্বান—
তুই কেন শুধু গৃহকোণে আজ
লুকিয়ে আপন প্রাণ?
মায়ের চরণে দাও প্রাণ বলি
যদি পাবে খাঁটী ত্রাণ—
এক প্রাণে তবে শত প্রাণ পাবে
সার্থক বলিদান!



সঙ্ঘশক্তি

—(:)—

দেবাসুর সংগ্রামে অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবতারা পরাজিত হইলেন। আসুরিক শক্তির কাছে দেব-শক্তি ক্ষণিকের দরুণ বিধ্বস্ত হইল। তখন পরাজিত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া শিব ও বিষ্ণুর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ মহিষাসুরের আচরণ, দেবগণের অভিভব, সব কথা বর্ণনা করিলেন। এই সব কাহিনী শুনিয়া ব্রহ্মা ও শিব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কোপপূর্ণ বদন হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ অপরাপর দেবগণও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের শরীও হইতেও সুমহৎ তেজ নির্গত হইল। সর্ব্ব-দেব শরীর জাত অতুলনীয় তেজ ঘনীভূত হইয়া নারীরূপ ধারণ করিল। এই নারীই মহাশক্তি, সন্তানের অভয়দাত্রী মা! এই মা আবির্ভূত হইয়াই সকল আসুরিক শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া পুনঃ শান্তি স্থাপন করিয়া গেলেন।

আমরা এক হইতে পারি না বলিয়াই মায়ের দর্শন পাই না। এক মন, এক প্রাণ লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যেখানেই উপাসনা করা যায়, সেইখানেই মহাশক্তির উদ্ভব না হইয়া পারে না। ব্যষ্টি সাধনায় মহাশক্তির উদ্ভব হয় না; এই জন্যই দেখি পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া তন্ময়চিত্তে যেখানে প্রার্থনা করি, সেইখানে আমাদের ধারণার অতীত এক মহাশক্তির সৃষ্টি হয়। সেই শক্তিদ্বারা পরি-চালিত হইয়া কর্ম্ম করিলে সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। দেবতারা স্ব স্ব বিচ্ছিন্ন শক্তিদ্বারা অসুরদিগকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, সকলে একত্রে সম্মিলতি হইয়া যখন পুঞ্জীভূত শক্তির প্রয়োগ করিলেন, তখনই পাশবশক্তির পরাজয় হইল।

সম্মিলিত শক্তির যে কি প্রচণ্ড তেজ, দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের জয়লাভেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। সকলের এক লক্ষ্য—এক ইষ্ট যেখানে, সেইখানে সম্মিলিত শক্তির আকর্ষণেই ইষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ব্যষ্টি শক্তিতে মানুষকে গর্ব্বিত করিয়া তুলে, কিন্তু সমষ্টি শক্তিতে যেখানে মায়ের মহাশক্তির আবির্ভাব, সেই মা সকলেরই মা, কাজেই সেখানে হিংসা-দ্বেষ, মান-অভিমান কিছুই থাকিতে পারে না।

ঋষিদের মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রার্থনার প্রথা ছিল। এখনো মুসলমানেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই প্রার্থনার দ্বারা যে মহাশক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সকলে একত্র হইয়া উপাসনার একটা মহৎ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। ঋষিরা এই জন্যই বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া উপাসনা প্রার্থনাদি করিতেন। মহদ্‌ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, ব্যষ্টি মানবের ক্ষুদ্র প্রার্থনায় তেমন কিছু হয় না, কিন্তু সমষ্টি মানবের প্রার্থনায় একটা বিরাট শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে।

বিপদাপদের সময় সকলই নিজ নিজ স্বার্থ ভুলিয়া মহান্ উদ্দেশ্যের দরুণ আত্মত্যাগ করিতে পারে। জনসাধারণের এই আত্মত্যাগে যে এক মহান্ শক্তিরূপ পরিগ্রহ করে, সেই শক্তির প্রভাবে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যায়। সমষ্টি মানবের মুক্তি-পিপাসার অদম্য আবেগ আজ গান্ধীর মাঝে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, এইজন্যই মহাত্মা শক্তিধর জগদ্বণ্যে মহাপুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলের এক ইচ্ছা, এক কামনা হইলে, অভীষ্ট সিদ্ধির পথে যতই কেন বিঘ্ন থাকুক না, সেই দুনিবার শক্তির অমোঘ প্রভাবেই সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া যায়।

কাজেই আসল কথা হইল আমাদের ঐক্য নিয়া, আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া যখন বিরাট উদ্দেশ্য সিদ্ধির যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে পারি, তখনই দেখি, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক, বিঘ্নবিরহিত হইয়া আসে। আমাদের যাহা কাম্য, তাহাকে মন-প্রাণ দিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা হইলেই পরের কাছে ভিক্ষা মাগিয়া ইষ্টলাভ করিতে যাইতে হইবে না। আত্মিকশক্তির উদ্বোধনে কাম্যবস্তু সহজ লভ্য হইয়া উঠে।

আমরা মাকে হারাইয়াছি নিজেদেরই দোষে—মায়ের অভিশাপে নয়। যে দিন হইতে পরস্পরের মাঝে ভেদটাই প্রবল হইয়া দেখা দিল, সেই দিন হইতেই কেবল আত্মকলহ, অশান্তিই দেখা দিয়াছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বিভিন্ন হইয়া যাওয়ায় শক্তির মাঝে ক্রমশঃ দৈন্য দেখা দিল। পাঁচজন একত্র হইয়া মা বলিয়া ডাকিলেই যে মা আসিয়া দেখা দেন, সেই কথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি তাই দেখি শক্তিপূজা লইয়াও আজ নিজেদের মাঝে এত বিরোধ, এত অশান্তির সূত্রপাত!

পাশ্চাত্যের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকৃত প্রভাবে আমাদের নিষ্ঠার মূল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনাকে বিদ্রূপ করি। পাঁচজনে মিলিয়া একের শরণাগত হইয়া কাজ করিতে পারিলে বলি, দাস মনোবৃত্তি ইত্যাদি। কাজেই একরূপ সমালোচনার বুদ্ধির উদ্ভব হইয়া, আজ প্রত্যেকেরই বুকে এক অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিচ্ছিন্ন হইয়াছি বলিয়াই যে মহাশক্তির কৃপা হইতে আমরা বঞ্চিত, এই কথা ভাবিয়া দেখি না। আমরা চাই স্ব স্ব কৃতিত্ব জারী করিতে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিমানে, আজ সকলই মহাশক্তির কৃপা বঞ্চিত।

আত্ম সমর্পণের কেন্দ্রেই মহাশক্তির উদ্বোধন। অভিমান-বিরহিত সাধকের ভিতর দিয়াই মহাশক্তির লীলা চলিতে থাকে। তখন সাধক যন্ত্রবৎ—যন্ত্রী তাঁহার মহাশক্তিকে খেলাইতে গিয়া কোন বাটাই প্রাপ্ত হয় না, এই জন্যই নিরভিমানী সাধক দিয়াই জগতের বেশী কাজ হয়। আমাদের আজ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, মহাশক্তি স্ফুরণের স্বচ্ছ আধারেই পরিণত হইতে হইবে। শক্তির অভাব নাই, আসল অভাব আধারের। যাহাকে অবলম্বন করিয়া শক্তির বিকাশ সাধন হইবে।

এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য লইয়া জীবনটাকে অকাতরে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে, এমন পাঁচটী সাধকও যেখানে একত্রিত হইয়াছে, সেইখানেই দেখি শক্তির কি প্রচণ্ড লীলা। তাঁহাদের শক্তিতে জগৎ আলোড়িত হইয়া উঠে। তাঁহারা না করিতে পারে, তাঁহাদের অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। বিবেকানন্দ প্রভৃতি যে কয়জন সত্য লাভেচ্ছু সাধক পরমহংসদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই জীবনের লক্ষ্য এক ছিল, এমন সুন্দরভাবে মিলিতে পারিয়াছিল বলিয়াই

এই মুষ্টিমেয় কয়টী সাধকই সমগ্র জগতে এক আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইতে পারিয়াছিল। পরমহংসদেবের ইষ্টদেবী—মহাশক্তির লীলা এই কয়টী স্বচ্ছ আধারের ভিতর দিয়াই প্রকটিত হইয়া উঠিল।

চিত্তকে ঐক্য প্রবণ, পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করিবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিলে—আপনি তখন স্ব স্ব প্রকৃতির দুর্ব্বলতা—ব্যাধির প্রতিকার হইয়া থাক। এইজন্যই এক ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতে পারিলে, ব্যক্তিগত চরিত্রের ন্যূনতা আপনি কমিয়া আসে। সম্মিলিত হইতে না পারিলে কোনও মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না। রাশিয়ায় আজকাল যে আন্দোলন চলিয়াছে, তাহাতে সমষ্টি মানবের সহানুভূতি, হৃদয়, কর্ম্মপ্রচেষ্টা পূরাপুরি রহিয়াছে, তাই তাহারা এত দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। একজনের চেষ্টায়, একজনের আকাঙ্ক্ষায় এত বড় পরিবর্ত্তন কিছুতেই সম্ভবপর হইত না—যদি না তাহাতে সমষ্টি মানবের উদ্বুদ্ধ-চেতনা যোগ দিত।

দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সমষ্টি মানবের প্রাণ যেখানে উদ্বুদ্ধ সজাগ হইয়া উঠে, সেখানে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে বেশী দেরী হয় না। মা আমাদের মাঝে এই ঐক্যই চান, আমরা পাচটী ভাই একত্র হইয়া যেখানে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, সেইখানেই মা—মহাশক্তির অহেতুক কৃপা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। আমাদের তেজ, আমাদের অক্লান্ত চেষ্টা, আমাদের বল-বীর্য্য যেখানে সংহত হয়, সেইখানেই এক মহাশক্তির উদ্ভব! সেই শক্তিদ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়।

সর্ব্বত্রই সঙ্ঘশক্তির জয়—ঐক্যবদ্ধ মানবের মাঝে এক দুর্নিবার শক্তির উদ্বোধন হয়। আমরা আজ সেই সংঘবদ্ধ ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই আমাদের দুর্গতির আর অবধি নাই। আমাদের চেষ্টাকে, মনকে, প্রাণকে, এক উজ্জ্বল লক্ষ্যের দিকে প্রচোদিত করিতে হইবে। কিছুতেই আমরা দমিব না, অবসাদগ্রস্ত হইব না—এই সুদৃঢ় পণ লইয়া চলিতে পারিলে তবেই একদিন আমাদের সুদিন আসিবে। আমরা মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই, আমাদের চলায়ও কোন বিশেষত্ব নাই। গতি আছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ নাই!

স্ব স্ব শক্তিকে কেন্দ্রীকৃত করিয়া এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেই মহাশক্তি—মায়ের অতুলনীয় রূপ দর্শন করিতে পারিব। আমাদের স্ব স্ব শক্তির উদ্বোধনে এবং সম্মিলনেই মহাশক্তি মায়ের আবির্ভাব। এইখানেই আমাদের যত গলদ। আমরা নিজেরা থাকিব আচ্ছন্নতার মাঝে অচৈতন্য হইয়া, কাহারও ছায়া কাহারও সহ্য হইবে না, কাজেই মহাশক্তির উদ্ভব হইবে কেমন করিয়া?

বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা শক্তির যে রূপ দর্শন করি, সেই রূপে মোহ থাকে, মায়ের দর্শন পাইয়াও পরস্পরের বিরোধ তিরোহিত হয় না। এই জন্যই মহাশক্তির দর্শন পাইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আমাদের মিলিতে হইবে। এই মিলনের অভাবেই মায়ের কৃপালাভে বঞ্চিত আমরা!

সকলের মন প্রাণ এক না হইলে মায়ের আবির্ভাব সত্য হয় না। শক্তি-সাধক বাঙ্গালীর মাঝে আজ এত বিদ্বেষ, এত কলহের সৃষ্টি হয় কেন? তাহার প্রধান কারণ, আমাদের ইচ্ছার মাঝে—লক্ষ্যের মাঝে অনৈক্য রহিয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া একেকে পাইতে চাই না। একে পাইয়া সকলকে বঞ্চিত করিতে চাই।

কলিযুগের মানুষ স্বভাবতঃই স্বল্পায়ু দুর্ব্বল,

এই জন্যই 'সঙ্ঘ শক্তি কলৌঃ—কলিতে সঙ্ঘ-শক্তিরই জয় গান করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বল জাতির অভিমান থাকে সব চেয়ে বেশী, আমরা যে মিলিতে পারিতেছি না, ইহার প্রধান কারণই হইল স্ব স্ব দুর্ব্বলতা, আর মান-অভিমানের বালাই !

সকল ক্ষেত্রেই আজ বিরোধ এবং অসামঞ্জস্যই আমাদের মাঝে প্রবল। দু'টী প্রাণীও একত্রে কাজ করিতে পারি না, দু'জনেরও মত এক হয় না। কাজেই যে মায়ের উদ্ভব সকলের ঐক্যবদ্ধ মন-প্রাণের কেন্দ্রে, তাঁহাকে আমরা পাইব কেমন করিয়া ?

বিজয়ী হইতে হইলে আমাদের মিলন চাই সর্ব্বাগ্রে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার রস একবার অনুভব করিতে পারিলে, তখনই বুঝিতে পারিব সঙ্ঘ শক্তির কি অমোঘ প্রভাব ! দেবতারাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই বিজয়ী হইয়াছিলেন, আমাদেরও বিজয়ী হইতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।



মায়ের ছেলে

—:(*):—

১

"দিদি, মা নাকি আস্‌বেন ?" "হাঁ, ভাই, কেন ? মায়ের কথা বল্‌ছ কেন ?" অজিত—"হাাঁ দিদি, মা এলে না কি খুব আমোদ হবে, নূতন কাপড় দিবেন, আচ্ছা দিবেন না ?" চোখের প্রান্তে আসন্ন এক ফোঁটা জল আঁচলে মুছে নিয়ে চিন্ময়ী বল্লে, "হাঁ ভাই দিবেন বই কি, এখন তুমি একটী দৌড়ে দেখে এস ত তোমার মিনু কি করছে ?" "মিনু, মিনু ?"—বলে চার পাঁচ বছরের ক্ষুদ্র বালক মিনুর সন্ধানে বাড়ীর অপর প্রান্তে ছুটে চল্‌ল।

সে অনেক দিনের কথা নয়, যেদিন চিন্ময়ী এসে এ বাড়ীতে বড় গিন্নীর পায়ের উপর ঢিপ করে এক প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন প্রাণের আকুল আবেগ এসে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছিল, কথা বল্‌তে দেয়নি। কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে জলভরা চোখ দুটী একবার বড় গিন্নীর পানে তুল্‌তেই আবার নামিয়ে নিয়েছিল। বড় দুঃখে সময়েই বড় গিন্নী গ্রামস্থ এই বাল-বিধবাকে স্বীয় ভবনে স্থান দিয়েছিলেন। আজ তাঁর স্মৃতিখানি এসে চিন্ময়ীকে আকুল করে তুল্‌ল।

এই আকুল করার মূলে ছিল ওই বালক অজিত। মোহনপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার কিশোরীবাবু যখন চিন্ময়ীর পিতার ক্ষুদ্র বাসভূমিটুকু নীলামে তুল্‌লেন, তখন চিন্ময়ীর মা বেঁচে নাই, বাবাও প্রায় ছ'মাস ধরে দারুণ ব্যাধিতে শয্যাগত। উপার্জ্জনের দ্বিতীয় কেহ নাই। তিন বছরের মধ্যে উপর্য্যুপরি কয়েকটী শোকে বৃদ্ধ রামতনু মুখুয্যের শরীরে আর কিছু ছিল না! তিন বছর হল সামান্য মুহুরীগিরির ৮৲ টাকা বেতনের চাকুরীটীও নাই। পূর্ব্বের দু একটী বন্ধুবান্ধবের কৃতজ্ঞায় এই ছমাস ধরে তাঁর ও চিন্ময়ীর একবেলা আহার জুটে। এমন সময়ে তিন বছরের খাজানার দায়ে যখন বাস্তু-ভিটাটুকুও নীলামে উঠ্‌ল, তখন আশ্রয়হীন রামতনু অনন্যোপায় হয়ে এমন আশ্রয় গ্রহণ করলেন যে তাঁকে আর জগতের আবিলতাপূর্ণ কোনও ব্যাপারই স্পর্শ করতে পারল না। জমিদারের প্রচণ্ড শাসনে তাঁর কড়া হুকুমের নড়চড় হবার যো নাই। আগামী কল্যই পিতৃ-পিতামহের পরম আদরের কত স্মৃতিময় এই ক্ষুদ্র বাসভূমিটুকু ছাড়তে হবে—এই চিন্তায় যখন পিতা-পুত্রীর হৃদয় আকুল হইতেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে রামতনু নশ্বর কলেবর ত্যাগ করেন। বালবিধবা চিন্ময়ী তাহার একমাত্র স্নেহনীড় হতে বঞ্চিতা হয়ে প্রথমে কতক্ষণ মুহ্যমান অবস্থায় পড়েছিল। তারপর গ্রামস্থ দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বিজয় মুখুয্যে খবর পেয়ে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে যখন দাসীকে দিয়ে চিন্ময়ীকে তাঁর বাড়ী ডেকে পাঠালেন, তখন তাঁর হুস্ হল। চেয়ে দেখেন, উদারহৃদয় প্রৌঢ় বিজয়বাবুর ব্যবস্থায় সমস্তই সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে; দাসী তাকে বিজয়বাবুর বাটীতে যাবার জন্য বার বার মিনতি করছে। একে এইরূপ অবস্থা, তার উপর জমিদারের অনুগ্রহে গৃহখানি অপরের কবলিত, সুতরাং একরূপ বাধ্য হয়েই সে দাসীর পিছনে চল্‌ল। সে বেশ জানত যে এর পিছনে বড় গিন্নীর হাত রয়েছে।

২

তারপর সুদীর্ঘ তিন বছর সে বিজয়বাবুর মাতৃ-সম্বোধনে, বড় গিন্নির অকৃত্রিম স্নেহে কিছুদিনের জন্য নিজের জীবনটাকে একরূপ ভুলেই ছিল। তারপর হঠাৎ বিসূচিকা রোগে বিজয় বাবু ইহধাম পরিত্যাগ ক'রে দশদিনের মধ্যে বড় গিন্নীকেও অমরধামে টেনে নিলেন। তখন অজিতের বয়স মাত্র তিন বৎসর। পরিজনের মধ্যে রইল শুধু চিন্ময়ী, অজিত, পুরাতন ভৃত্য বিহারী ও অজিতের মাতুল নিঃসন্তান বৃদ্ধ হরদয়াল। বলা বাহুল্য, চিন্ময়ীর শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্ক স্বামীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। 'এমন অপয়া বধূকে ঘরে রাখ্‌লেও দোষ'—এই অজুহাতে একে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে দীর্ঘ পনের বৎসরের মাঝে আর তাঁরা কোনও খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এদিকে মরণকালে বিজয় বাবু তাঁর কন্যাস্থানীয়া চিন্ময়ীর নামে সম্পত্তির এক আনা লিখে দিয়েছিলেন। এবং বড় গিন্নীও মরণ সময়ে অজিতকে চিন্ময়ীর হাতে সঁপে দিয়ে তাঁর স্ত্রীধনের কিছু ভাগ চিন্ময়ীকে দিয়ে যান। তা থেকেই এ যাবৎ চিন্ময়ীর চলে আস্‌ছে। বিজয় বাবুর সম্পত্তি ক্ষুদ্র হলেও এই ক'জনের তা দিয়ে বেশ চলে আস্‌ছিল। কিন্তু এবার বুঝি আর চলে না।

৩

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বান ডেকে নদীর জলে সমস্ত ক্ষেত ডুবিয়ে দিল; কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়ে বস্‌ল। বন্যায় অন্যান্য অঞ্চলে শুধু ক্ষেত ডুবিয়েই ছাড়েনি—বহুলোকের প্রবল বন্যাস্রোতে ঘর বাড়ী ভেসে গিয়েছে। চারদিকে কেবল

বন্যার্ত্তের সংবাদ! জিনিষপত্র অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হচ্ছে। বিশেষতঃ কার্ত্তিকের প্রথমে পূজা ব'লে কাপড়ের কথা মনে ক'রে অনেকেই কপালে হাত দিচ্ছেন—মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারের ত আর কথাই নাই।

চিন্ময়ীর একবেলা আহারও কাল জুটে নাই। বিহারী দু'দিন হল হরদয়ালের সঙ্গে যদি কিছু আদায় হয়, তারই চেষ্টায় গিয়েছে। শুধু অজিতের দু'বেলা দুটী অন্ন এখনও বন্ধ হয়নি। সে তার কাঠের বিড়াল মিনির সন্ধানে গিয়ে কল্পনার মৎস্য চুরির জন্য নানারূপে তাকে ভর্ৎসনা করছিল। কখন যে চিন্ময়ী এসে পিছনে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখ্ছিল, সে তা টের পায়নি। হঠাৎ যখন লাঠির সন্ধানে পিছনে ফির্‌ল, অমনি চিনুদিদির কাছে তার মিনির মৎস্য চুরি ব্যাপার বর্ণনা সুরু কর্‌ল। চিন্ময়ী বল্লে, "তাইত, এমনভাবে চুরি কর্‌তে আছে, ছি! মিনি বড় দুষ্ট হয়ে উঠেছে, আচ্ছা, এখন তাকে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এস ত। দেখ না রাত্তির হয়ে যাচ্ছে—এখন খেয়ে দেয়ে না ঘুমুলে মামাবাবু এসে রাগ কর্‌বেন।"

৪

অজিত মামাবাবু বৃদ্ধ হরদালকে বড় ভয় কর্‌ত। নিঃসন্তান বৃদ্ধের বুকখানা অপত্যস্নেহে এক এক সময়ে কোমল হয়ে উঠলেও সাধারণতঃ তাহা কঠোর ছিল। তার কঠোর শাসনে শিশু অজিতের সমস্ত নালিশ ও আদর-আব্দার চল্‌ত তার একমাত্র চিনুদি'র কাছে। তাই আজ হরদয়াল বাড়ী না থাকৃতে তার শিশু-হৃদয়ের সমস্ত চপলতা পরিপূর্ণ-রূপে প্রকাশ পাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ভাষায় চিনুদি'র কাছে কোথায় কে কি বলেছে ইত্যাদি সমস্ত মনের কথা বাঁধন আল্‌গা করে খুলে দিয়েছে। চারদিকে পূজার হাওয়া লেগে গেছে। প্রতিমা দেখার জন্য ছেলের দল বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রতিমার সম্মুখে ভিড় কর্‌ছে। অজিত যদিও কারও সঙ্গে বেশীদূর যায় না, তবু আশেপাশের বাড়ীতে দিনের মধ্যে দশবার দিদিকে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া আসা কর্‌তে ছাড়ে না। তারি মধ্যে কখন কার মুখে শুনে এসেছে যে মা আস্‌ছেন। হয়ত চিন্তাভার-ক্লিষ্ট কোনও বৃদ্ধের এবার পরিবারস্থ সকলের বস্ত্র-সংস্থান হবে কি ক'রে সেই দুঃখ প্রকাশ কর্‌তে আর একজন বলে উঠেছে যে ভয় কি, মা-ই কাপড় দিবেন। বালক অজিত সেই কথা শুনে এসেছে, আর মাঝে মাঝে যেই মনে হচ্ছে অমনি দিদিকে বল্‌ছে—মা নাকি আস্‌ছেন? আমাল্ কাপর্ দিবে না? মাতৃহারার ব্যথাতুর প্রাণের সমস্ত কথা যেন ওই একটী বাক্যে নিবদ্ধ রয়েছে। সে যে আর ওর চেয়ে মার অভাবের কথা প্রকাশ কর্‌তে পারে না! চিন্ময়ী আপন প্রাণে তার ব্যথা অনুভব করে যতই সে প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়, সে থেকে থেকে ততই একই কথার অবতারণা করে।

চিন্ময়ী এবার জিজ্ঞাসা কর্‌ল— কেন তুমি বার বার মার কথা বল্‌ছ? তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে?

অজিত মাথা নেড়ে বল্‌ল—হুঁ কলে। (অর্থাৎ মাকে তার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।)

চিন্ময়ী হেসে বল্‌লে—আচ্ছা, মা আর কয়েক দিন পরেই আস্‌বেন, তখন খুব করে দেখো। মাকে দেখে তাঁর কাছে তুমি কি বল্‌বে অজিত? তুমি মাকে চিন্‌বে?

অজিত—কেন, তুমি চিনা'য়ে দেবে। মাকে দেখে আমি তাল কোলে উঠ্‌বো।

চারি বৎসর বয়স হলেও অজিত এখনও

কয়েকটী বর্ণ উচ্চারণ কর্‌তে পারে না। দিদির কাছে শুয়ে শুয়ে তাই প্রায়ই এই উচ্চারণের পরীক্ষা দেয়। কিন্তু আজ আর সে সব কথা হচ্ছে না। শুধু মায়ের কথা বলে ও শুনেই উভয়ে আজ নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়টুকু অতিবাহিত কর্‌ল।



পরদিন হরদয়াল বিহারীকে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। তেমন বেশী আদায় না হলেও তবু যা হয়েছে, তাতে কার্ত্তিক মাসের খরচটা কোনও রকমে চলে যাবে। এই মাসের খরচটাই বেশী ভাবনার বিষয় ছিল, কারণ একে খোরাকের খরচ ত আছেই, তার উপর বাঙ্গালীর প্রথা অনুসারে ও প্রয়োজনানুসারেও বস্ত্র না কিন্‌লেই চল্‌বে না; অন্ততঃ চিন্ময়ীর ও অজিতের দু'জোড়া বস্ত্র না হলেই নয়; তার উপর মায়ের পূজায় প্রতিবৎসর একটা করে পাঠা দিবার নিয়মটীও বজায় রাখা চাই। নিজেদের বাড়ীর পূজা সম্পূর্ণ নিজেরা বহন কর্‌তে অক্ষম হয়ে পাশের বাড়ীর পূজায় একটী করে পাঠা দিবার ব্যবস্থা কয়েক বছর ধরে চলে আস্‌ছে। এবার যেমন জিনিষ পত্রের দর, তাতে পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঠা ও বস্ত্রাদি কিন্‌তে গেলে হয়ত দর আরও বেড়ে যেতে পারে, তাই শীঘ্রই গ্রামের হাট থেকে আবশ্যকীয় সব দ্রব্যাদি কিন্‌বার কথা।



আজ রবিবার। মোহনপুরের ক্ষুদ্র হাট খানিতে আজ মানুষের চলা দুষ্কর। আসে পাশে আর হাট না থাকায় ও ৺পূজা নিকটবর্ত্তী বলে হাটে বিস্তর লোক। দু'হাত দূরে যেতে যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত, এমনই ভীড়। আমাদের হরদয়াল ও বিহারীও হাটে এসেছে। বিহারী প্রবীণ, সুতরাং উভয়ে পাঠা কিন্‌তে গিয়ে হরদয়াল যেই দর করেন, বিহারী অমনি অজপুঙ্গবের মেরুদণ্ড ধ'রে এক হাতে তুলে পরীক্ষা করে, অর্থাৎ বলির পরে কত সের মাংস ও কত জনের ভোজ্য হবে তার হিসাবটা মনে মনে আওড়িয়ে নেয়। মাংসের দোকানে কাটা মাংসের ওজনের জন্য বড় দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থার মতন জ্যান্ত জানোয়ারের ওজনের জন্য প্রত্যেক হাটে ব্যবসায়ীরা কেন কোন ব্যবস্থা করে না, এই দুঃখে বিহারী যখন ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে একটা আত্মীয়তাসূচক সম্বন্ধের উচ্চারণ কর্‌ছিল, এমন সময়ে হরদয়াল একটী জীব পছন্দ ক'রে টাকা দিতে যাচ্ছেন দেখে বিহারী তাড়াতাড়ি গিয়ে সেইটী ওজন ক'রে দেখে মুখ কালী করে ফেল্‌ল। অর্থাৎ মোটেই তার মনোমত হয় নাই—এতে আর ক'জনের চল্‌বে? যদিও এতক্ষণ ধ'রে ওজন ক'রে ক'রে তার হাত বিষুচ্ছিল, তবু শেষে যে এমন একটী অপগণ্ড বাচ্চা নিয়ে যেতে হবে, তা সে মোটেই ভাবেনি। তাই মনে মনে বাবুর উপর বিরক্ত হচ্ছিল। কিন্তু কি করা! কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম! যা হোক্, বাবু খরচের দিক দিয়ে অনেক বুঝিয়ে বিহারীকে শান্ত করে কাপড়ের দোকানে গেলেন। সেখানে গান্ধিজীর মহিমায় পিকেটারের অভাব নাই। তাই বাধ্য হয়ে চিন্ময়ীর কাপড় জোড়া স্বদেশী কিন্‌লেও পিকেটারদের চোখ ভুলিয়ে অজিতের কাপড় সুন্দর দেখে বিলাতীই কিন্‌লেন। কেননা দামে সস্তা! পথে এক ভদ্রলোক দেখ্‌তে পেয়ে লজ্জাজনক কথা বল্‌তেই হরদয়াল তাকে আর্থিক দৈন্যের অজুহাত ও খদ্দরের কাপড় টিকে কম, পরিষ্কার করা কষ্ট, প্রভৃতি নানাকথা বলেও ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট কর্‌তে না পেরে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে গিয়ে অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনে চাকরের মাথায় দিয়ে নিজে স্বদেশী কাপড় জোড়া নিয়ে বাড়ী এলেন।

৭

"অজিত তোমার কাপড় দেখেছ ?" "কই, কই, দিদি, আমাল কাপল্ কই, দেখি ?" হরদয়াল বল্লেন, "ছিঃ চিনি, তোমার কি একটুও বুদ্ধি নেই, এখনও পূজার তিন চার দিন বাকী, এখনই ওকে কাপড়েব সন্ধান দিলে আর কি এ কাপড় ভুলে রাখ্তে পার্বে ? এখনই ওকে নামিয়ে দিতে হবে, প'রে কোথায় যাবে, দে'খে কে কি গোল বাধিয়ে বস্বে ঠিক নেই।" চিন্ময়ী এতক্ষণে সেই কাপড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝ্লেন, আসল গলদ কোন্খানে! কিন্তু কি করা। মনে মনে বিরক্ত হলেও হরদয়ালের উপর কথা বলার যো নাই। ওদিকে দেখ্তে না দেখ্তে অজিত ছুটে এসে ছোট কাপড় খানিই তার এই সিদ্ধান্ত করে কাপড় খানি এর মধ্যেই আপন অঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। দিদি যে পরিয়ে দিবে, তার আর তর সহে নাই। হরদয়াল অমনি বল্লেন "দেখ্লে যা বলেছি—এখন আর কিছু না ঘটলে হয়।" ওদিকে "নতুন কাপল্ নতুন কাপল্" বল্তে বল্তে অজিত আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাস্‌ছে আর দিদির মুখপানে চাইছে। ইচ্ছা যে দিদি কাপড়খানা একবার পরিয়ে দেয়—আমি একবার এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে সবাইকে দেখিয়ে আসি।............

৮

এদিকে দিদির প্রাণতো আতঙ্কিত!—কখন এ কাপড় নিয়ে কোথায় যায়, আর কে কি বলে ? শেষে তাই হল—হঠাৎ অজিত কখন বেরিয়ে গেছে! কিছুক্ষণ পরে ঘুরে বেড়িয়ে যখন বাড়ী এল, তখন ছেলের মুখ ভার। চিন্ময়ী জিজ্ঞাসা কর্লেন—"কিরে অজু, কি হয়েছে ? মুখ অমন করেছিস কেন ?" আর যায় কোথা ? বর্ষণোন্মুখ মেঘখানা বুঝি এতক্ষণ এই বাতাসটুকুরই অপেক্ষা কর্ছিল! যেই বাতাস পাওয়া, অমনি গর্জ্জনের সঙ্গে বর্ষণ আরম্ভ হল। কাপড় ছুড়ে ফেলে অজিত বল্ল "—নাও ও কাপল—আমি চাইনা, ওলা...।" চিন্ময়ী —"কি ওরা কি বল্ছিল, কি হয়েছে ?" অজিত—লগারা (ওরফে নগেন প্রভৃতি) বয়ে ও কাপল্ বিয়তি—থু থু !" চিন্ময়ী—ওঃ এই কথা, আচ্ছা থাক্ আমি ওদের ব'কে দেব। এখন তুমি এস দেখি! অজিত—"না, আমি ও কাপল পল্‌বনা —না না না।" চিন্ময়ী হেসে বল্লেন—"বেশ তো, তাই হবে, আর কেঁদনা লক্ষ্মী আমার, ওকাপড় আজই বদলে আন্‌ব। বলা বাহুল্য, চিন্ময়ী বিবেকের বিরুদ্ধে যে ব্যাপারে চুপ করেছিল, অজিতের কান্নায় আর চুপ করে থাক্‌তে পারলে না। গোপনে বিহারীকে দিয়ে কাপড়খানা বদলিয়ে আন্‌লে।

৯

অজিতের কদিন ধ'রে আর কোনও দুঃখ নাই। খদ্দরের ছোট্ট কাপড় খানি পরে দিন রাত আপন মনে অজপুঙ্গরের সঙ্গে খেলা করে, কথা বলে। তাকে পাতা খাওয়ায়—তার ক্ষিদে তেষ্টা সবই নাকি অজিত বেশ সময় মত বুঝ্‌তে পারে। তাই অজিতের নিজের আনুমানিক সময়ে যদি পাঠা বেচারী জল খেতে অস্বীকার করে, তবে আর রক্ষা নাই; প্রীতির পীড়নে সেই মূক বেচারীকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অগত্যা সে উচ্চৈঃস্বরে ভ্যা ভ্যা রবে প্রতিবাদ জানায়। তখন চিন্ময়ী ছুটে এসে অজিতের হাত হ'তে তাকে নিস্তার দেয়।

১০

দেখ্তে দেখ্তে সপ্তমী পূজা হয়ে গেল। অতি প্রত্যুষে পূজা সারা হয়ে গেল। অজিত

তার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে, দিদির সঙ্গে প্রতিমা দেখ্‌তে এসে নানা প্রশ্নে তাদের অতিষ্ঠ করেছে। তবু মা হয়েও কেন তাকে কোলে নিচ্ছে না, তার সঙ্গে কথা বল্‌ছে না, অজিতের মনেএই মহাসমস্যা! ষষ্ঠীর দিন পর্য্যন্ত সে ভাল ক'রে প্রতিমা দেখ্‌তে পায়নি। কারণ, সে গেলেই কুম্ভকারেরা বলত যে সে নাকি ছেলে মানুষ! তাই তার কথায় প্রতিমার আবরণ উন্মোচন ক'রে দেখাতে তাদের মহা আপত্তি! পাছে সে কিছু ভেঙ্গে ফেলে! অভিমানী অজিতও তাদের তোষামদ না ক'রে দিদির কোলে বসে সব দেখে নিবে, এই গর্ব্বে বুক ফুলিয়েছিল। কিন্তু এখন দিদির কোলে বসে দেখেও তার মন উঠ্‌ল না। তার ধারণা, মা তার দিকেই চেয়ে আছে, সে যদি তাঁর কাছে একবার যেতে পার্‌ত, অমনি নিশ্চয়ই মা তাকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিত। যে মাকে সবাই এত ক'রে পূজা কর্‌ছে, ভক্তি কর্‌ছে, তার কাছে গিয়ে তার কোলে উঠ্‌তে পার্‌লে না জানি কি আনন্দ, কত মজাই হবে। অজিত ভাবল্—কাউকে সে বল্‌বে না, একবার যেমন করেই হোক্ যখন কেউ থাক্‌বে না তখন সেই ফাঁকে একবার মায়ের কোলে একবার উঠে বস্‌তে পারলে আর কথা কি? তারপর যা করবার মা-ই কর্‌বে, আমি শুধু মায়ের বুকে চোখ বুজে থাক্‌ব।

১১

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় বালকের ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকে না—অজিতেরও সুযোগ মিল্‌ল। পূজার ঘণ্টা চারেক পরে মন্দিরের দরজার অর্দ্ধভাগ আবৃত করে সকলে এদিক ওদিকে চলে গেছে। অনুসন্ধানী অজিত বুঝ্‌ল এই সুযোগ। সে যে কোন্ ফাঁকে গিয়ে মণ্ডপে ঢুকেছে, তা কেউ জান্‌তে পারল না। কিন্তু ঢুকেও তো হচ্ছে না—প্রতিমা যে তার চেয়ে ঢের উঁচু! কিন্তু ভরসা আছে যে, সে যে এখন মণ্ডপের ভিতর তা কেউ জানে না, সুতরাং মন্দিরের এক কোণে যে একটা টুল রয়েছে, সেটা প্রতিমার কাছ পর্য্যন্ত আন্‌লে ক্ষতি কি! যেই বুদ্ধি সেই কাজ। মনে শুধু এক লক্ষ্য—মার কোলে উঠা চাই-ই! মার সঙ্গে কথা বলা চাই। ভয় কি? চোখ ইসারায় মা তো তাকে ডাকছেনই। সুতরাং আস্তে আস্তে টুলের উপর উঠে যেই অনায়াসে মার বুকের সমান হল, অমনি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে মনের আবেগে ও অভিমানে নানা কথা বলতে লাগ্‌ল। সে শুন্‌ল যেন মা বল্‌ছেন—"আচ্ছা, তোর যখন এত ইচ্ছা, তখন আমার কাছেই তোকে রাখ্‌ব।"

১২

এদিকে সরল প্রাণের এটুকু খেয়াল নেই যে বার থেকে তার কথা কেউ শুন্‌তে পাচ্ছে! সে জানে, তার আর তার মায়ের কথা শুধু তারা দুজনেই শুন্‌ছে। এদিকে চিন্ময়ী তখন সবেমাত্র ঘাট থেকে স্নান সেরে ঘরে এসেছে। এসেই দেখে অজিত ঘরে নাই। অমনি উতলা হয়ে প্রতিমা দেখ্‌তে যেতে পারে ভেবে যেই মণ্ডপের কাছে এসেছে, অমনি একা একা অজিতের কথা শুনে মন্দিরের দরজা খুলেই দেখে সেই দৃশ্য! দেখে চিন্ময়ীর দুই চোখে ধারা বহিতে লাগ্‌ল। স্বর্গীয় ভাবের সঙ্গে স্থূলের এই মোহন দৃশ্য তাকে সত্যই চিন্ময়ী করে তুল্‌ল। চিন্ময়ী কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান হারাইলেন। যখন হাঠৎ চমক ভাঙ্গিল

তখন মনে হইল, এ অবস্থায় আর কারও চোখে না পড়লে না জানি কি ব্যাখ্যা হয়। এই কথা মনে হওয়া মাত্র ছুটে গিয়ে অজিতকে নামিয়ে কোলে তুলে মণ্ডপের বাইরে এলেন। আসার সময়ে টুলটাও সরিয়ে রেখে এলেন। যখন বাড়ীর ভিতর যাচ্ছেন, তখন তার মণ্ডপ হতে অজিতকে নিয়ে বেরিয়ে আসা একজনের চোখে পড়তে তিনি উচ্চৈঃস্বরে মন্তব্য করলেন—"ছেলের দিন দিন গুণ বাড়ছে বুঝি, চাইলেই তো হত—খাওয়ার কি আর আছে—ইত্যাদি।" চিন্ময়ী অজিতকে কোলে নিয়ে মুখ বুজে সে স্থান অতিক্রম করে গেলেন।

১৩

পরদিন মহাষ্টমী। অষ্টমী পূজা নির্ব্বিঘ্নে সমাপন হল। পূজার সময়ের যাবতীয় কৃত্য যথা-যথ রূপেই সমাপ্ত হল। তার বর্ণনা অনেক কবি হয়ত অনেক রকম করেছেন বা করবেন! আমরা কবিও নই, সে বর্ণনা করার প্রয়োজনও বোধ করি না। আমরা দেখি, আমাদের অজিতের তারপর কি হল? অজিত সেই মায়ের কোল থেকে নেমে অবধি আর তেমন কথা বলে না—বেশী হাসেনা—যেন আপন মনেই কি বলে! যদিও হাসে, আপন মনেই হাসে—নিজের কথা কি সে নিজেই শোনে বা অপর কাউকে শোনায়, তা বোঝার যো নেই। এমনি ভাবে অষ্টমীর দিন কেটে গেল। সন্ধিপূজার সময়ে অজিতের সেই পাঠা বলি দিবার কথা। অজিত কোনও দিনই পাঠা বলি দেখত না। সুতরাং সন্ধিপূজার সময়ে তার ঘুম ভেঙ্গে তাকে তুলে আনার কথা কারও মনে উঠে নাই। বিশেষতঃ তার প্রিয় পাঠাকে বলি দিতে গিয়ে তাকে জাগানো কেহই যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। কিন্তু অন্তর্য্যামী রূপে যিনি অন্তরে রয়েছেন, তিনি সময় মত সবাইকে জাগিয়ে দেন। ঠিক সময়ে অজিতকেও তিনি নিজে জাগিয়ে দিলেন। যেই পাঠা উৎসর্গ ক'রে হাড়ি কাঠে চাপানো হল, অমনি তার উর্দ্ধস্বরে সে যেন অজিতকে 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে ডাকতে লাগল। অজিত সে চীৎকারে 'আমাল পাঠা কই' বলতে বলতে চীৎকার করে ছুটে এল। কিন্তু সে আসতে আসতে কর্ম্ম সারা হয়ে গেছে। পাঠা বলি হয়ে গেছে দেখে অজিত মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

১৪

আজ মহা নবমী। কিন্তু কারও মনে আনন্দ নাই। অজিত সেই যে মূৰ্চ্ছিত হয়েছিল, তারপর হতেই জ্বর এবং উন্মত্তবৎ অনবরত প্রলাপ। সেই প্রলাপের মধ্যে অধিকাংশই তার মায়ের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা এবং দিদিকে পাঠাবলির রক্ত দেখে অনবরত তিরস্কার ভিন্ন আর কিছুই নয়। অমনি অবস্থায় নবমী পর্য্যন্ত কাটল। প্রতিমার বিসর্জ্জন-মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অজিতও "যাই মা আসছি" ব'লে এই জগতের সমস্ত কালিমা হৃদয় হতে বিস-র্জ্জন দিয়ে মায়ের ছেলে মায়ের সঙ্গে যাত্রা করল। তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্ময়ীও মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। অজিতকে কোলে করে চিন্ময়ী সেই যে মূৰ্চ্ছিতা হয়ে থাকলেন, প্রতিমা বিসর্জ্জন করে সবাই এসে দেখে, ঘরের মধ্যেও সেই স্বর্ণ প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়ে গেছে।

১৫

পূর্ণিমার দিন হরদয়াল তন্দ্রার মাঝে দেখলেন যেন লক্ষ্মীপূজার বিচিত্র আলপনার মাঝে অজিতকে কোলে নিয়ে চিন্ময়ী বলছেন—মামা, আমাদের

জন্য শোক করবেন না। এই দেখুন, অজিত আমার কোলে। আমরা উভয়েই পরমানন্দে মায়ের আদরে আছি। মায়ের সন্তান মায়ের কোলে এসে আজ আমরা যথার্থ আনন্দের সন্ধান পেয়েছি!

——:(*):——

প্লাবনে

ঘন বরষার প্রলয় প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে দেশ,
বাঙ্‌লা মায়ের নাই আর সেই স্নিগ্ধ মোহন বেশ।
　　আজি আর তার শ্যাম অঞ্চল,
　　দোলেনা অনিল পরশে চঞ্চল,
দোলায়না চিতে হরষের বায়ে সকলি হয়েছে শেষ,
বাঙ্‌লা মায়ের নাহিক আজিকে শ্যামল শোভার লেশ॥
যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ সব সকলই আজিকে সারা,
ধুয়ে মুছে তার নিয়েছে সকলি চণ্ড-প্লাবন ধারা।
　　পড়ে আছে শুধু শূন্য প্রান্তর,
　　নাহিক শস্য নাহি পর্ণ ঘর,
বস্ত্র নাহিক অঙ্গে তাহার সকলই ছন্ন ছাড়া,
অন্নদা আজি কাহার কুহকে হইল অন্ন হারা!

*　　*　　*

কে আছ মায়ের সত্য সাধক, এসহে আজিকে ছুটি,
দেশ-মাতৃকার চরণ কমলে পড়গো আসিয়া লুটি।
　　বিতর অন্ন বদনে তাহার,
　　অঙ্গে তুলি দাও বস্ত্রের ভার,
গৃহহীনা মায়ে তোল আজি গৃহে মুছাও চক্ষু দুটি—
সেবা-অধিকার লভিয়া তোমার চিত্ত উঠুক ফুটি॥
চিত্ত উঠুক ফুটিয়া আজিরে জাগিয়া উঠুক প্রাণ,
বাহুতে শক্তি হৃদয়ে ভক্তি হউক অধিষ্ঠান।
　　দীর্ঘ দিবস আয়োজনে তব,
　　সঞ্চিত যত পূজা বৈভব,
বাংলা মায়ের সেবায় আজিকে করগো সকল দান,
সার্থক হোক্ হে পূজারী তব পূজার অনুষ্ঠান।

——(:০:)——

শক্তি-পরীক্ষা



শক্তিকে যে প্রয়োজনে খাটাতে পারে না, তার শক্তি থেকেও নাই, আমি তাকেই বলি শক্তিহীন। যে নাকি বাহুতে শক্তি পেয়েছে, প্রাণে বল পেয়েছে, সে যদি সমাজের, দেশের দুরবস্থা দেখেও অচল হয়েই বসে থাকে, তাহলে কেমন করে বল্‌ব তাকে শক্তিধর? মা ছেলের দুঃখ-দৈন্যে শক্তিসঞ্চার করে যান, আমরাও যদি সেই শক্তিকে অপরের দুঃখে সঙ্কটে বিচিত্র উপায়ে সার্থক-সঞ্চারিত কর্‌তে না পার্‌লাম, তাহলে শক্তিময়ী মায়ের প্রাসাদের মূল্য রইল কি?

আজ দেশ রোগে, শোকে, দুঃখে, বন্যায়, রাষ্ট্র-বিপ্লবে সব দিক দিয়েই মর্ম্মাহত; এ সময় যার প্রাণে বিন্দুমাত্র বল রয়েছে, শক্তি রয়েছে, সামর্থ্য রয়েছে, সে-ও যদি কৃপণের ধন সঞ্চয়ের ন্যায় নিজের শক্তির মিথ্যা গর্ব্বের উপর বসে বসে তা' দিতে থাকে, তাহলে তাকে কেমন করে শক্তিমানের তুল্য মনে কর্‌তে পারি? কিন্তু দেশ আজ পরস্পরের সুখে দুঃখে ব্যথায় সমভাগী হবার দরুণ সচেষ্ট ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, এর দরুণই প্রাণে আশা হয়, শক্তিময়ী মায়ের কৃপাদৃষ্টি বোধ হয় সত্যি সত্যি আমাদের উপর এখন বর্ষিত হচ্ছে!

শক্তি আছে বল্‌লেই শক্তির প্রমাণ হয় না, সময়ানুযায়ী শক্তির পরখও দিতে হয়। এ সময়ই সাঁচ্চা মেকী শক্তিধরদের ভাল করে চেন্‌বার সুযোগ উপস্থিত হয়। আমাদেরও আজ সেই পরীক্ষার দিনই উপস্থিত হয়েছে, কাজেই যাঁরা শক্তিধর বলে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁদের আজ শক্তি পরীক্ষার স্থলে নির্ভীকভাবে দাঁড়াতে হবে।

দেশের এই করুণ আর্ত্তনাদ শুনেও যাদের প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠে না, যারা পরস্পরের সাহায্যের দরুণ প্রাণে বল পায় না, তারা নিতান্তই দুর্ভাগা বল্‌তে হবে, কেননা শক্তিময়ীর সন্তানের পরীক্ষা শক্তির পরিচয় প্রদানে! মা আমাদের বারণ কর্‌বার দরুণই আজ চারিদিকে এত বিভিন্ন শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র খুলে দিয়েছেন, আজ আমাদের শক্তির পরিচয় দিতে হবে। যারা সত্যি সত্যি মায়ের করুণা লাভে ধন্য হয়েছে, তারা আজ কিছুতেই নীরব মূঢ় নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না!

সে দিন আমায় কে জানি বলেছিল, মা যে আছেন তার প্রমাণ কি? আমি বল্‌লাম, তারও আবার প্রমাণ লাগে? মা যে আছেন তার একমাত্র প্রমাণ—আমাদের বুকের বল, বাহুর শক্তি! এই বল, এই শক্তি আমরা পেলেম কোথা থেকে? পারিপার্শ্বিকের দুঃখে-দৈন্যে কেন আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠে, যদি মা আমাদের বুকে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠা না কর্‌তেন! মা কিন্তু আমাদের বুকেই রয়েছেন, কিন্তু শক্তির চর্চ্চার অভাবে আমরা সে কথা ভুলে যাই। আমরা যতই নিজেদের শক্তিকে প্রয়োজনে খাটাই, অপরের সুখে-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করি, ততই দেখি আমাদের মাঝে শক্তিময়ী মায়ের উজ্জ্বল বিকাশ হয়। মানুষ নিজে-

দের স্ব স্ব শক্তিকে প্রয়োজনে খাটায় না বলেই চারিদিক অন্ধকার দেখে!

শক্তিময়ী মায়ের কৃপা যারা লাভ করেছে, তারা যে কেমন করে বিনা কাজে সময় কাটাতে পারে, তাই এক এক সময় ভাবি! আচ্ছা, আমি বলি—মা কেন শক্তি-সঞ্চার করেন, তার উদ্দেশ্য কি? যারা মায়ের কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছে, তারাই যে শোকে-দুঃখে মূর্চ্ছিত কাতর বিপদাপন্ন ভাইদের হাতে ধরে তুলবে, এর দরুণই তো উপযুক্ত আধার বুঝে মা শক্তি সঞ্চার করেন! কেমন, তাই নয় কি? মা যেমন ছেলের দরুণ আকুল, তেমনি যে ছেলে মায়ের কৃপা লাভ করেছে, সে ছেলেও অমনি করে পতি-তের, দুঃখীদের শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন না করে থাকতে পারে না। এই জন্যই আমি বলতে চাই, যারা আজ বাস্তব ক্ষেত্রে শক্তির পরিচয় দিচ্ছে, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, জল প্লাবনে যেখানে লোক আর্ত্ত-বিপন্ন, তাদের সাহায্যে নিজেদের শক্তিকে উজাড় করে ঢেলে দিতে পারছে, তারাই মা-শক্তিময়ীর যথার্থ কৃপা লাভ করেছে। আমি তাদেরই বলি বীর—শক্তিময়ী মায়ের যোগ্য ছেলে।

এক এক সময় মা ছেলেদের আদর করে কোলের কাছে রেখেই স্নেহ করেন, এবং তাতেই সুখ পান। কিন্তু সেই মা-ই আবার কোন কোন সময় ছেলেকে কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের দরুণ দুরূহ কাজের ভার দিয়ে বিভীষিকার স্থলেও পাঠিয়ে দেন। মা তখন ছেলেকে যুদ্ধের মাঝে, সংগ্রামের মাঝে আত্মশক্তির পরিচয় দেবার উপযুক্ত স্থলে পাঠিয়েই বেশী গৌরব অনুভব করেন। আজ আমাদের সেই দিন উপস্থিত, কোলের কাছে আদুরে ছেলের মত নিশ্চিন্তে ঘুম পাড়বার দিন আর নেই! মা আমাদের শক্তি দিয়ে উদ্দীপিত করে তুলেছেন। মায়ের প্রাণের অসহ্য জ্বালা আজ আমাদের প্রাণের ভিতরও বিদ্যুতের মত চমক মেরে যাচ্ছে—আমরাও আজ স্বার্থপর ধ্যানের মাঝে কোন বিশেষ সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছিনা, এর চেয়ে বাস্তবক্ষেত্রে প্রাণ ঢেলে দিয়ে, যাদের দুঃখ, যাদের শোক, তাদের একটু পরিত্রাণ দেবার দরুণই প্রাণ আমাদের বেশী করে কেঁদে উঠেছে!

মাকে চাই মানে—মায়ের শক্তি চাই। যারা আজ সেবাকার্য্যে নেমে প্রাণে অফুরন্ত বল অনুভব করছে, আমি তো বলব তারাই মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছে। এর চেয়ে স্থূলভাবে মা আর কি করে ধরা দেবেন? তবু কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন জীবের মোহ কাটে না! তারা বলবে, এই কি মায়ের রূপ?

শক্তি সঞ্চয়েরও একটা সময় আসে, এখন অমাদের সে সময় নয়! কেননা সঞ্চয়ের চিন্তা তো আমাদের করার কোন প্রয়োজন নাই, মা নিজেই যে নেমে এসেছেন আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে। কাজেই প্রাণ-সঞ্চয় নয়, প্রাণ বিতরণ করতে হবে আমাদের। এখন আমাদের এই কাজ—এই লক্ষ্য।

উত্তেজনা নিয়ে নয়—উদ্দীপনা নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হবে! আর তাই বা ভাবি কেন, আমাদের উত্তেজনাই বা আসবে কেন? আমাদের শক্তির মূলে যে শক্তিময়ী মা স্বয়ংই রয়েছেন, কাজেই শক্তির আতিশয্যে তো আমাদের আচ্ছন্ন করে দেবে না! যার যার আধার অনুযায়ী শক্তি সঞ্চার ক'রে সেই অনুযায়ী মা আমাদের কর্ম্ম প্রবৃত্তি বা কর্ম্মপ্রেরণা দেবেন। কাজেই আমরা সেবক হয়ে, মহাশক্তির আধার হয়ে নীরবে কাজ করে যাব, এই তো আমাদের ওপর মায়ের আশীর্ব্বাণী!

নিজে সাধন করে শক্তি-সঞ্চয় করতে বহুদিন, বহু তপস্যার প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমাদের আজ কত সৌভাগ্য, আমাদের ব্যক্তিগত সাধনার কোন প্রয়োজনই হবেনা— চাই কেবল উৎসর্গ, আত্ম সমর্পণ! তাহলেই বিশুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়ে শক্তির বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে যাবে! এই ভাবেই তো আমরা নিরভিমানী হয়ে শক্তিময়ী মায়ের শক্তির লীলা উপভোগ করে যাব! এর চেয়ে জীবনে আর বড় লক্ষ্য কি থাকতে পারে?

অফুরন্ত শক্তির অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে—শুধু শুদ্ধ আধারের অভাবে। কাজেই এখন তেমন সাধকেরই প্রয়োজন, যাদের জীবনের লক্ষ্য হবে চিত্ত শুদ্ধি, আর কোন বাসনাই তাদের চিত্তকেও কলুষিত করতে পারবে না! এত বিরোধ, এত অসামঞ্জস্য, শক্তির এত অপব্যয় হচ্ছে কেন? দেশে আজ কিসের অভাব? শক্তিময়ী মাকে আমরা দোষ দিব, না নিজেদেরই চিত্তশুদ্ধির অভাব বলে মায়ের কাছে দীনতা প্রকাশ করব? খাঁটী সত্য কোনটা?

পাঁচজনে একত্র হয়ে আমরা কাজ করতে পারি না, পাঁচজনের মতের মিল হয় না, কিন্তু আমি বলি—যারা শক্তিময়ীর কৃপালাভে যথার্থ শক্তির সন্ধানপেয়েছে, তারা কি কখনো আত্ম-প্রতিষ্ঠা, বা আত্মাভিমানের দরুণ আসল কাজ পণ্ড করে দিতে পারে? পরিপূর্ণ শক্তির উন্মত্ততায় মানুষ নীরব কর্ম্মী হয়, তখন অপরের পানে চেয়ে কাজকর্ম্মের হিসাব নিকাশ করার সময়ই যে পায় না তারা! শক্তিবন্ত জাতির মাঝে যে বিরোধ হয় না তা নয়—কিন্তু তাদের আসল লক্ষ্যের দিকে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি। সে সময় সকলেই এক—সকলের মুখেই এক কথা, সকলের প্রাণেই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ অক্লান্ত উত্তম দেখা দেয়। আমরাও ক্রমশঃ শক্তিময়ী মায়ের সেই সার্ব্বভৌম শক্তির সন্ধানই পাচ্ছি—এবং ক্রমশঃ আমাদের মাঝেও মিলনের সুর বেজে উঠছে। কিন্তু বড় আস্তে বড় ধীরে আমাদের চেতনা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে আমাদের আরও দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলা প্রয়োজন।

আজ সব দিকেই শক্তি পরীক্ষার দিন এসে পড়েছে। আমরা শক্তি সঞ্চার করিনি—আমাদের ভাণ্ড রিক্ত—শূন্য, তাই মনে হয় মা শক্তিময়ীর আবির্ভাবে আমাদের শূন্য ভাণ্ডারও পূর্ণ হয়ে উঠবে। শক্তিসঞ্চয় করবার সেই তপোবল আমাদের নাই; তবে এইটুকু বুঝি, প্রাণ যেন এক এক সময় কেঁদে উঠে। হয়ত সমষ্টি মানবের আকুল বেদনাতেই মায়ের কোমল প্রাণ গলে গিয়েছে। তাই মা আজ দুর্ব্বল জাতির প্রাণেও অফুরন্ত শক্তির ফোয়ারা ঢেলে দিয়েছেন। আমাদের ভাববার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা যোগ্য কি অযোগ্য সে কথা চিন্তা করে দেখাও কোন প্রয়োজন নাই। আজ আমাদের উৎসর্গ-জীবনের প্রদীপ্ত মহিমাতেই উদ্বুদ্ধ শক্তিমন্ত হয়ে উঠতে হবে। মা যেখানে শক্তির সঞ্চার করছেন, সেখানে শক্তির পরীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হবার কি হেতু রয়েছে?

আমরা নিঃস্ব, আমরা দুর্ব্বল; অপরের সঙ্গে বড়াই করতে পারি, অমন প্রচুর আয়োজন নাই আমাদের। কিন্তু একদিকে আমরা প্রাণ শক্তিতে পূর্ণ। আর কিছু দিতে না পারি, প্রাণ ঢেলে দেবার, প্রাণ উৎসর্গ করে দেবার নির্ভীকতা এবং শক্তি মা আমাদের নিজে হাতে ধরে দিয়েছেন। আজ শুধু আমাদের সেই পরীক্ষাটুকুই দিতে হবে।

——:০:*:০:——

সংবাদ ও মন্তব্য

জন্মোৎসব

বিগত ১০ই ভাদ্র ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে—কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের সার্ব্বভৌম জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে! এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, হোম, আরতি, বেদপাঠ, ব্রহ্মনামযজ্ঞ, কীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। পূজান্তে কীর্ত্তনাদির পর সমাগত ভক্তমণ্ডলী যজ্ঞীয় তিলক ধারণ ও লুচি মিষ্টান্নাদি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হঠাৎ শরীর অসুস্থ হওয়ায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ উৎসবের সময় গুরুধামে পদার্পণ করিতে পারেন নাই।

২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হুগলী, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, নদীয়া, জমসেদপুর, কটক, দ্বারভাঙ্গা হইতে ভক্তসমাগম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ভক্তবৃন্দও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা ৭টার পর শ্রীমৎ চিদানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। সভায় কুতবপুর ও অন্যান্য স্থানের ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত হন। প্রথম—আবাহান গীত, দ্বিতীয়—শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ অসুস্থতাহেতু আসিতে না পারায় তাঁহার আশীর্ব্বাদী চিঠি পাঠ, তৃতীয়—বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ, চতুর্থ—জন্মোৎসব ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও ব্যাখ্যা হয়।

নিগমানন্দ স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র সেন, রাধাশ্যাম মিত্র, সুধাংশু বাগচী, তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধন জীবন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন ও শ্রীমৎ রামানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া একটী অভিভাষণ পাঠ করেন।

রাত্রি ১১॥০টার সময় সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উক্ত তিথিতে উচালন সারস্বত সঙ্ঘেও পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, গীতাপাঠ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, চণ্ডী পাঠ, হোম, আরতি যথারীতি সম্পন্ন হয়। পূজান্তে প্রায় ৪০০।৫০০ লোককে খেচরান্ন, মিষ্টান্ন, পক্কান্ন ইত্যাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভিন্ন গ্রাম হইতেও গুরুভ্রাতাগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

আর্য্য-গৌরব—সম্পাদক শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী। ইহা কলিকাতা আর্য্যসমাজের মাসিক মুখপত্র। মূল্য বার্ষিক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৵১০ পয়সা। পত্রিকাখানির প্রথম বর্ষ চলিতেছে, আমরা মাত্র দুই সংখ্যা (ভাদ্র এবং আশ্বিন) প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত দুই সংখ্যার প্রায় প্রত্যেকটী প্রবন্ধই বেশ গভীর চিন্তা এবং নিরপেক্ষ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছে। পত্রিকাখানির নামকরণ ঠিকই হইয়াছে। আশাকরি 'আর্য্য-গৌরবে' আর্য্য-ঋষিদের নিরপেক্ষ উদার মত সুষ্ঠুভাবেই পরিকীর্ত্তিত হইবে।

——::০::——

সাহায্য প্রাপ্তি

(শ্রীশ্রীগুরুধামে জন্মোৎসব উপলক্ষে)

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ২৫৲, পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ৫৲, দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ৫৲, মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ৫৲, পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ৩৲, উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ৩৲, জলপাইগুড়ি সারস্বত আশ্রম ২৲।

নদীয়া ঃ—

দুই টাকা করিয়া— শ্রীযুক্ত :— জলধর পাল, কালী নাথ দাস, প্রিয় নাথ ভৌমিক। এক টাকা করিয়া ঃ— রাম কৃষ্ণ পাল, রাম চাঁদ পাল, রাম ব্রহ্ম পাল, কানাই পাল, ফকির পাল, গোপী পাল, যোগেন পাল, হরিবোল পাল, পঞ্চানন পাল, রাজ কৃষ্ণ পাল, গৌর চন্দ্র কর্ম্মকার, ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জি।

চট্টগ্রাম ঃ—

শ্রীযুক্ত :— হেমন্ত কুমার ও জয়ন্ত কুমারর ঘোষ ৫৲। দুই টাকা করিয়াঃ— আমিলাইস মহিলা সঙ্ঘ, নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এক টাকা করিয়াঃ—. চন্দ্র নাথ ভৌমিক, শ্রীমতী শুভাননী, প্রসন্নকুমার কর্ম্মকার বিভু ভূষণ কর্ম্মকার, গগন তারা কর্ম্মকার, নগেন বালা, সরমা সুন্দরী, কামিনী সুন্দরী, কুমুদিনী কর্ম্মকার, সারদা চরণ দাস, মহিম চন্দ্র দাস, বরদা চরণ দাস। জগদীশ্বরী, ॥০ আনা, ভারতেশ্বরী ।০ আনা, প্রেমলতা ।০ আনা, কুঞ্জ ভূষণ কর্ম্মকার ।০ আনা, অশ্বিনী কুমার কর্ম্মকার ।০ আনা, কিরণ বালা ৵০ আনা।

বৰ্দ্ধমান ঃ—

উচালন সঙ্ঘ ১২৲, নলিনী মোহন বানার্জ্জী ২৲, নগেন্দ্র নাথ দত্ত ১৲, প্রতাপ চন্দ্র চাটার্জ্জী ১৲।

হুগলী ঃ—

এক টাকা করিয়া :—ননীগোপাল চাটার্জি, শীতলচন্দ্র পাত্র, নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, প্রাণকৃষ্ণ সেট, বৈদ্যনাথ দেবশর্ম্মা ॥০, আশুতোষ দাস ॥০, বিনয়ভূষণ চাটার্জ্জি ৪৲ টাকা, যতীন্দ্রনাথ হাজরা ২৲।

ঢাকা ও ফরিদপুর ঃ—

দুই টাকা করিয়া :—নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য। এক টাকা করিয়া :—শশধর চক্রবর্ত্তী, আদিত্যনাথ সূত্রধর, শঙ্করী দেবী, কুমদিনী কান্ত সাহা।

বরিশাল ও খুলনা ঃ—

এক টাকা করিয়া :—কালীনাথ রায়, হরষিত চন্দ্র রায়, রমেশচন্দ্র মণ্ডল।

বাঁকুড়া ঃ— অবিনাশ চাটার্জ্জী ৫৲।

জমসেদপুর ঃ— পূর্ণশশী দেবী ১০৲।

বগুড়া ও জলপাইগুড়ি ঃ

এক টাকা করিয়া :—হরপ্রসাদ রায়, ললিতচন্দ্র গুহ, সুরেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত। কুমার গুরুচরণ দেব ২৲, গোবিন্দ চন্দ্র পূততুণ্ড ॥০, হরিনাথ কর ॥০ আনা।

আসাম ঃ—

এক টাকা করিয়া :—কুরমু কিসান, গিরিশচন্দ্র, রুহিদাস, কৈলাসচন্দ্র সরকার, বসন্তকুমার দত্ত, মণীন্দ্রকুমার দে। আট আনা করিয়া :—তনু দাস, গুহিরাম দাস। মহেন্দ্রদাস ১০৲, তারানাথ দাস ৫৲, কার্ত্তিক রুহিদাস ৩৲, চুনারাম ও সুদন রুহিদাস ২॥০, সন্ন্যাসী পঞ্চানন ২৲, বিন্দুচরণ দাস ২৲।

(ক্রমশঃ)

ভক্ত সম্মিলনী

(সপ্তদশ-বার্ষিক অধিবেশন—১৩৩৮)

আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ এই দিবসত্রয় দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত- সম্মিলনীর সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ ভক্ত-সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শিষ্যভক্ত এবং আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকগণকে উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

সম্মিলনীতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ সম্মিলনীর পূর্ব্ব অধিবেশাবলীর নিয়মানুযায়ী সম্মিলনীর ব্যয়ভার নির্ব্বাহকল্পে জন প্রতি ৫৲ টাকা হিসাবে দেয় চাঁদা অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই আশ্রমপরিচালকের নিকট নিম্নঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের নাম তালিকা-ভুক্ত করিবেন। নচেৎ তাঁহাদের সংস্থানের জন্য পরে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইতে। সঙ্গে স্ত্রীলোক আসিলে স্বতন্ত্রভাবে তাহার উল্লেখ করিবেন। শিশু ও বালক-বালিকা ব্যতীত আর সকলেরই এই চাঁদা অবশ্য দেয়। টাকা পাঠাইবার সময় প্রেরকের নাম ঠিকানা এবং যে কয়জনের চাঁদা পাঠাইতেছেন তাহা সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

ভক্ত-সম্মিলনীর সাহায্যার্থে স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। মনি-অর্ডার কুপনে "সম্মিলনীর সাহায্যার্থে দান" এই কথাটী উল্লেখ করিবেন।

"দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম" প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের হালিসহর ষ্টেশন হইতে আড়াই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। জিনিষ পত্র সঙ্গে লইয়া এই ষ্টেশন হইতে আসার কোনই সুবিধা নাই। সুতরাং ভক্তগণের সুবিধার্থে জানাইতেছি যে তাঁহারা সকলেই যেন নৈহাটীর টিকিট কিনিয়া তথায় নামেন। নৈহাটী হইতে আশ্রম ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সেখান হইতে আশ্রমে আসার জন্য মোটর বাস্ কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী সকল সময়েই পাওয়া যাইবে। মোটর বাস্ কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী একেবারে আশ্রমের পাশেই আসিয়া লাগিবে। নৈহাটী হইতে নৌকা পথেও আশ্রমে আসার সুবিধা আছে। তাহাও আশ্রমের অতি নিকটেই আসিয়া লাগিবে।

ভক্তগণ নিজ নিজ বিছানা পত্র ও আলো সঙ্গে আনিবেন। অন্য কোন বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

টাকাকড়ি ও পত্র পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীমৎ জিতেন ব্রহ্মচারী—

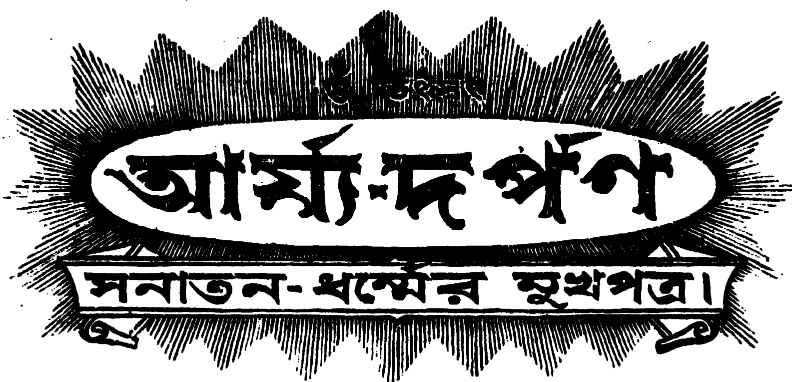
আশ্রম পরিচালক—দক্ষিণ-বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম পোঃ হালিসহর, জিঃ (২৪ পরগণা)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্যে দেশ আজ বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত! প্লাবন ধারায় শস্য সম্ভার ধুইয়া মুছিয়া সে ক্ষান্ত হইল না, দেশবাসীকে গৃহান্নশূন্য করিয়া—পথের ভিখারী করিয়াও তাহার ক্ষুধা মিটিল না, তাই আজ মহামারীরূপে চণ্ডা প্রকৃতির লেলিহান জিহ্বা চারিদিকে লক্ লক্ করিয়া প্রধাবিত হইয়া সহস্র নিরাশ্রয় নরনারীর প্রাণ সংহার করিতেছে। দেবভাবানুপ্রাণিত কয়েকটী সঙ্ঘ এই রাক্ষসীর গতিরোধ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সারস্বত-সঙ্ঘ ধনবল ও জনবল উভয় প্রকারেই দুর্ব্বল বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। তবে তাহার যতটুকু শক্তি আছে, সেই ক্ষুদ্র শক্তিটুকু কোন মহৎ শক্তির সহিত মিশাইয়া দেশ-সেবার গৌরব অর্জ্জনে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাই সঙ্ঘস্থিত সমগ্র ভক্তমণ্ডলীর সমীপে নিবেদন, সকলেই আর্ত্তসেবায় যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ ও শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নঠিকানায় তাহা পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও বিপন্ন সেবায় ব্যয়িত হইবে। দাতার নাম ও দানের পরিমাণ এই পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশিত হইবে।

অধ্যক্ষ—সারস্বত মঠ

পোঃ—কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)



২৪শ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৩৮ | ২য় খণ্ড
সমষ্টি সং ২৫৮ | | ১ম সংখ্যা

শ্রেয়শ্চ-প্রেয়শ্চ

কঠোপনিষদ্ ৩।১।২

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ,
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মানুষের কাছে সমুপস্থিত হয়। জ্ঞানী শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া প্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়ঃই গ্রহণ করেন। আর অল্পবুদ্ধি মানব বিচার শক্তির অভাবে যোগক্ষেমের নিমিত্ত (অর্থাৎ শারীরিক বৃদ্ধি ও পরিরক্ষণোদ্দেশ্যে) প্রেয়ঃ বস্তুকেই প্রার্থনা করে।

মূলেই বিবেক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, আর এই বিবেকজ্ঞান দ্বারাই মানুষ ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝিতে পারে। কিন্তু অবিবেকীর কাছে তো সব সমান, কাজেই ভাল-মন্দের বিশেষত্ব বোধ তাহার মাঝে মোটেই নাই।

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ই জ্ঞানীর কাছেও আসিয়া হাজির হয়, কিন্তু জ্ঞানীর বিশেষত্ব হইল এইখানে যে, তাঁহার ভিতর বিবেক-জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত, বিবেকরূপ আলোর সাহায্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য স্পষ্ট তাঁহার কাছে প্রতীয়মান হয়।

শ্রেয়ের পথ নিবৃত্তির পথ, আর প্রেয়ের পথ ভোগের পথ। ভারতের জ্ঞান গরিষ্ঠ ঋষিদের আদর্শ হইল শ্রেয়ের পথ। গভীর ধ্যানের ভিতর তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, মানুষ প্রেয়ঃদ্বারা কখনো শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। বিত্ত দ্বারা যে মানুষের তৃপ্তি আসিতে পারে না, ইহা অনেক দিন আগেই ঋষি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; তাই তাঁহাদের অনুবর্ত্তীদের কল্যাণের নিমিত্ত ঋষিরা বার বার সাবধান করিয়া গিয়াছেন যে মনুষ্যত্ব লাভের পথ ভোগের পথ নয়—ত্যাগের পথ, ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যায়।

শত নির্য্যাতন ও পারিপার্শ্বিকের অমোঘ প্রভাবের মাঝে পড়িয়াও আমাদের শুভানুধ্যায়ী ঋষিদের প্রচারিত আদর্শের কথাই মনে রাখিতে হইবে। ভোগে যে শান্তি নাই, এ কথা আজ ভোগবাদী পাশ্চাত্য জাতির মুখ দিয়াও বাহির হইতেছে। ঋষিদের প্রবর্ত্তিত আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াই আমাদের কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ঋষিদের বাণী চরম উপলব্ধির বাণী, তাহাতে আর সংশয়ের বিন্দুমাত্র স্থান নাই। জীবনকে উন্নত করিতে হইলে কেবল তাঁহাদের আদর্শ ধরিয়া চলিলেই হইবে। আমাদের অন্য জাতির ন্যায় ঘন ঘন আদর্শ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবে না, কেননা ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা নিব্যূঢ় সত্য। নিষ্ঠার সহিত আদর্শকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

অপরের নিকট হইতে আদর্শ ধার করিয়া না আনিলেও ভারতের মানবের কোন অকল্যাণ হইবে না। ভারতে যাহা আছে, ভারতের ঋষি যে চরম আদর্শের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কাছে সকলকেই একদিন অবনত হইতে হইবে।

আদর্শ আছে বলিয়া গৌরব করিলেই চলিবে না, আদর্শকে জীবনে রূপ দিতে হইবে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের দু'টী একটী আদর্শের রূপ দিয়াই মহাত্মা আজ জগদ্বাসীর কাছে পূজিত! ত্যাগ এবং অহিংসা দ্বারা তিনি জগতের সকল লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভোগে মানুষকে অর্থগৃধ্নু পিশাচে পরিণত করে, কিন্তু ত্যাগ দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করে। প্রেয়ের পথে যে শান্তি নাই, তাহা আজ প্রেয়ের উপাসকরাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। জীবন তাহাদের কাছে দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহাদের জীবনে শান্তির চেয়ে বিপ্লবই বেশী!

হয়ত প্রলয়কালই সমুপস্থিত, তাই এখনো জগৎ এক অন্ধ মোহ দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে, ইচ্ছা করিয়া মানুষ আদর্শচ্যুত হইয়া সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই বিপ্লবের সময়, এই বিমূঢ়তার যুগে এমন কয়েকটী লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা নিছক আদর্শের দরুণ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত! অতীতের ঋষিদের জীবনের আদর্শের কতখানি শক্তি, তাহা বোধ হয় কাহারও আর বুঝিতে বাকী নাই।

দুইটী জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন;—একটী হইল আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, আর একটী বিবেকজ্ঞান। বিবেকজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলে, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পরিলে, পারিপার্শ্বিকের উচ্ছৃঙ্খল প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে।

আমাদের আজ এত দুর্দ্দশা কেন? ইহার একমাত্র কারণ নিজেদের ধাতের বিরুদ্ধজনক আদর্শ গ্রহণ! পাশ্চাত্যের ভোগবাদের আদর্শ আমাদিগকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বেশীদিন থাকা গেল না। আবার তাই প্রত্যেকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও আস্থাসম্পন্ন হইয়াছে।

ভারতের ঋষিদের কাছেও শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ই উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা বিচার করিয়া ঋষি প্রেয়ের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং ঋষির জীবনের আদর্শ হইল শ্রেয়ো লাভ। মানুষ যাহাতে শ্রেয়োলাভ করিয়া কলুষ-বিহীন আনন্দে অভিষিক্ত হইতে পারে, তাহারই পথ দেখাইয়া গেলেন ঋষি!

শ্রেয়ের ঋষি হইলেন ধ্যানস্থ, আর প্রেয়ের আদর্শ গ্রহণ করিলেন

যিনি, তিনি হইলেন চঞ্চল—অস্থিরচিত্তসম্পন্ন। একজন ধ্যানস্থ হইয়া চরম শান্তির নিদান আবিষ্কার করিলেন, আর একজন বহির্ম্মুখীনতায় কেবলই ব্যস্ত-চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখি সেই আত্মস্থ ঋষির কাছেই সকলে আসিয়া হাজির! কাজেই জগতে যতই কেন অত্যাচার, যতই কেন উৎপীড়ন চলুক না, ত্যাগের আদর্শের মহিমায় সত্যি সত্যি যাঁহাদের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের অমর আত্মার প্রভাবে সকলেরই একদিন জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া উঠিবে। তখন প্রেয়ের উপাসকও বুঝিতে পারিবে, শ্রেয়ের মাঝে কি পরম কল্যাণ নিহিত! আদর্শ হইতে বিচলিত হইলেই আজ আমাদের সত্যিকার মৃত্যু হইবে, তাহা না হইলে আদর্শ রক্ষা করিয়া মরিতে পারিলে যে অমর হইয়া থাকিতে পারিব! ভুল জানিয়াও ভুল পথে চলিলে, জানিয়া শুনিয়া আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।

জগৎ একদিকে, আর আমার বজ্রদৃঢ় সত্যসঙ্কল্প একদিকে। জগৎ টলিয়া যায় তো যাক্, আমি কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হইব না, এই সুদৃঢ় পণ থাকা চাই! বেশী নয়—সত্যের দরুণ, আদর্শ রক্ষার দরুণ ৪।৫টী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষই ঢের, তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্ব দ্বারা সকলেই একদিন অনুপ্রাণিত হইবে, ইহা কল্পনা নয়—অনুভূতির কথা।

অনেক জাতি রহিয়াছে যাহারা এখনও পর্য্যন্ত একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শে পৌঁছিতে পারে নাই। আমাদের কিন্তু সেই দিক দিয়া ভাগ্য খুবই বড়, আমাদের আদর্শ বা লক্ষ্যের দরুণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতে হইবে না। লক্ষ্য এবং আদর্শ উভয়ই আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট, এখন কেবল সেই লক্ষ্য এবং আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনটাকে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে মাত্র।

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের মাঝে কোনটা কল্যাণপ্রদ, তাহা আর আমাদিগকে চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে না, ঋষিরা শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই প্রেয়ের দিক হইতে বিমুখ হইয়া শ্রেয়ের পথে চলিবার দরুণ আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

এখন মহা সঙ্কট সময় উপস্থিত! শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের মোহানায় পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যদি প্রেয়ের পথ অনুসরণ করিয়াই চলি, তাহা হইলে আর দুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। প্রশান্ত চিত্তে, দুঃখ-নির্য্যাতন সহ্য

করিয়াও আমাদিগকে শ্রেয়ের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। ভোগ বা প্রেয়ের পথ আপাত মনোরম, কিন্তু শ্রেয়ের পথ কণ্টকিত হইলেও পরিশেষে তাহাতেই প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়। এই নিদারুণ সঙ্কট কালে আদর্শকে উজ্জ্বল এবং নিষ্ঠাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিতে পারিলেই কল্যাণ, তাহা না হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।



খাঁটী কথা

——)০(——

সত্যলাভ এত সহজ নয়, তার দরুণ অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ বুক পেতে সহ্য করে নিতে হয়, তারপর একদিন সত্যের বিমল জ্যোতিতে চিত্তের সকল গ্লানি দূরীভূত হয়ে যায়। নিশ্চিন্তে খেয়ে দেয়ে আরাম করেই যদি দিনটা কেটে যায়, তাহলে কে আর সত্য লাভের দরুণ প্রাণপাতী তপস্যা করতে যায়, এরূপ ধারণা অনেকের মনেই বদ্ধমূল হয়ে আছে। সুতরাং প্রকৃত সত্যান্বেষীর চেয়ে তৌষ্টিকের দলই জগতে বেশী। তারা অপরের চিন্তা বা গবেষণা দ্বারা যে সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়, তাই আরাম করে উপভোগ কর্‌বার দরুণ লালায়িত, কিন্তু নিজের এতটুকু চেষ্টা বা উদ্যমও তাদের নাই। নিজে চিন্তা কর্‌তেও তারা রীতিমত ভয় পায়, এইজন্যই গতানুগতিক পন্থাতেই তাদের চরম তৃপ্তি, ভুলেও একদিন তাদের মনে সংশয় কিম্বা প্রশ্ন জাগে না। জগতে এ সব লোকের সংখ্যাই বেশী, সুতরাং এদের সত্যলাভ দ্বারা জাতীয় জীবনে প্রাণ সঞ্চার হয় না, বরঞ্চ এদের নিশ্চেষ্ট অলসভাব সংক্রামক ব্যাধির মত সকলের মাঝে সঞ্চারিত হয়ে পড়ে।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার আকুলতা বড় কারও মাঝে দেখা যায় না, এতেই সুস্পষ্টরূপে তৌষ্টিকতার প্রমাণ হয়। কিছু না জেনেও যে অভিজ্ঞ লোকের মত নিশ্চিন্ত ভাব, এটা পূর্ণ তামসিকতার লক্ষণ। যাদের মাঝে একটু আধটু আকুলি বিকুলি দেখা যায়, তারা তাদের কাছে অবিশ্বাসী এবং অস্থির চিত্ত বলে পরিগণিত! চিত্তে কোন প্রশ্ন জাগ্‌লে বা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলেই, তাদের মতে তার পতনের সূচনা দেখা দিল। কাজেই সকলের সঙ্গে মিলে মিশে যদি আত্ম বিলোপ ঘটানো যায়, তাহলেই তাদের মতে তা চরম উন্নতি হ'ল। কিন্তু এরূপ আধ্যাত্মিক জড়তায় যে কত ক্ষতি কর্‌ছে দেশের, তা আর বল্‌বার নয়।

সত্যলাভ কর্‌তে হ'লে, ইন্দ্রিয়, দেহ, মন,

বুদ্ধি সকলেরই প্রয়োজন হয়। কাউকে ফাঁকি দিয়ে সত্যলাভ করা যায় না। কাজেই নিজের স্বাধীন দেহ-মন-বুদ্ধিকে খাটানোরও যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। 'কি জানি কেমন করে কি হয়ে গেল'—এসব কথা সাত্ত্বিকের উক্তি নয়। তামাসিকতায় যারা অচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাদের কাছে সবই একটা অলৌকিক তাৎপর্য্য নিয়ে উপস্থিত হয়। অথচ বিশুদ্ধ মন-বুদ্ধি দিয়ে কিন্তু এরও বেশ একটা সহজ অর্থ বুঝা যায়।

যথার্থ কৃপা যারা উপলব্ধি করেছে, তারা ভগবানের শক্তিবিকাশের যথাযোগ্য আধাররূপে পরিণত হয়। তাঁদের জীবন দিয়ে আরও দশ-জনের জীবন উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু অনেক কৃপাবাদীর ঢুলু ঢুলু আঁখি দেখে মনে হয়, জড়ত্ব দ্বারা তাদের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত! এদের মুখ দিয়ে যখন কৃপার ব্যাখ্যা হয়, তখন কৃপাবাদের বেশ সুন্দর ব্যাখ্যাই হয়। নিজেদেরর ভবিষ্যৎ-জীবন তো ওদের অন্ধকার সমাচ্ছন্নই, অপরের জীবনকেও ওরা বিষাক্ত করে তুলে।

আমি বলি, যারা সত্যান্বেষী, তাদের এত ঘুম, এত জড়ত্ব, এত নিশ্চেষ্ট ভাব আসে কেমন করে? প্রাণের হাহাকার যাঁদের মিটে গিয়েছে, যাঁরা অকূল সমুদ্রে কূল পেয়েছেন, তাঁদের কথা আলাদা; কিন্তু সাধনার প্রথমাবস্থায়ই যাদের চেষ্টা-উদ্যমে জড়ত্বের ঘুণে ধরে বসে আছে, তারা কী সত্যলাভ করবে জীবনে? প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংখ্যাই বিরল, এই জন্যই সত্য সম্বন্ধে নিজের অনুভব, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বড় কেহই বলে না, সবাই চর্ব্বিত চর্ব্বণেই পরিতুষ্ট!

শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেই যেমন মরণ অবশ্যম্ভাবী, তেমনি আমাদের দর্শনাদিরও প্রকৃত আলোচনা চর্চ্চার অভাবে মরণ ঘনিয়ে আসছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে মানুষটা জীবিত, তেমনি দর্শনাদিরও প্রাণ আছে, আলোচনা চর্চ্চার অভাবে তার মাঝেও মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন একদিন ছিল, যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মোটেই অভাব হ'ত না, তাঁরা তাঁদের প্রাণের অদম্য আকুলতা নিয়ে এক আচার্য্যের কাছ থেকে অন্য আচার্য্যের কাছে ঘুরে বেড়াতেন যে পর্য্যন্ত তাঁদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসা না হ'ত। আচার্য্য-শিষ্যের মাঝে বেশ একটা ঔদার্য্য ছিল তখন। যিনি যতদূর জানতেন, তা বলা শেষ হয়ে গেলে বেশ ভদ্রভাবে শিষ্যকে বলতেন যে, আমি এর বেশী আর জানি না—তবে অমুক ঋষি রয়েছেন, তিনি এর চেয়েও বেশী কিছু জানেন বলে শুনেছি। কি সুন্দর সহজ সরল উক্তি! যাদের তৃপ্তি হয়ে গিয়েছে, তারা আর দ্বারে দ্বারে ঘুরেনি; আর যাদের তৃপ্তি হয়নি, তারা আবার সেই ঋষির অনুসন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ছুটত। এই ছিল ঋষিযুগের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।

অধিকারিবিচার সর্ব্বত্রই রয়েছে। ভাল ছেলেকে অধ্যাপকের বেশী সাহায্য করতে হয় না। আত্মচেষ্টা দ্বারা, নিজের মন বুদ্ধিকে খাটিয়ে তারা অনেক খানি নিজে নিজেই অগ্রসর হয়ে যায়। এরূপ ছাত্রকে শিক্ষা দিতে অধ্যাপকেরও খুবই কম বেগ পেতে হয়। এই যে স্বাধীন চেষ্টা, নিজের মন বুদ্ধিকে খাটিয়ে অনেক খানি অগ্রসর হয়ে যাওয়া, এটা কি ঔদ্ধত্য, না অধ্যাপকের প্রতি সম্মানের অভাব? আজকাল পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শীকার করবার লোকই যথেষ্ট, কিন্তু নিজকে বিন্দু-মাত্র কষ্ট দিতেও তারা নারাজ। অথচ উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করবার উদগ্র ব্যাকুলতা কিন্তু ওদেরই বেশী।

আলোচনা-চর্চ্চার অভাবে মন বুদ্ধির মাঝেও যথেষ্ট মালিন্য সঞ্চয় হয়, অথচ এই অবিশুদ্ধ মন-বুদ্ধি

নিয়েই তৌষ্টিক যায় অপরকে উপদেশ শুনাতে। এর পরিণামেই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা! এত বড় ধর্ম্মপ্রাণ জাতির মেরুদণ্ডে যে কি করে এরূপ মারাত্মক দুর্ব্বলতা প্রবেশ করল, তা আর বুঝতে আজকাল বেশী বেগ পেতে হয় না।

ধর্ম্মতত্ত্ব—এসব উপলব্ধির কথা; দৈনন্দিন সাধনা ব্যতিরেকে কেহই এর সম্বন্ধে একটা নির্ভুল মত ব্যক্ত করতে পারে না। নিজের জীবন-প্রবাহ হয়ত একদিকে বয়ে চলেছে, কিন্তু উপদেশ দেবার বেলায় দেখি তিনিও একজন আধ্যাত্মিক নীতি-বিশারদ! এরূপ সম্বন্ধবিহীন সম্পর্কবিহীন উপদেশে কাজ না হয়ে, বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ পণ্ডই হয়।

চর্চ্চা দ্বারা বড় কোন জিনিষ লাভ হোক্ বা না-ই হোক্, মন-বুদ্ধি যে বিশেষরূপে পরিমার্জ্জিত হয়, এতে আর কোন সন্দেহ নাই। আর আধ্যাত্মিক জীবনে মার্জ্জিত মন-বুদ্ধি যে অনেকখানি সাহায্য করে, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করতে পারবে না।

জ্ঞান জিনিষটী এত সহজে আয়ত্ত হয় না—এর দরুণ অভ্যাস, প্রযত্ন, নিয়মিত চর্চ্চার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর এ জায়গাতেই মস্ত বড় গলদ থেকে যায়। অমার্জ্জিত মন-বুদ্ধি নিয়ে বিরাট ব্রহ্মের আলোচনায় ব্যাপৃত হলে, অনেকেরই দেখি মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। মুনি ঋষিদের প্রবর্ত্তিত চতুরাশ্রমের মূল্য এখানেই বেশ বুঝা যায়। জ্ঞানলাভের অধিকারী কারা, তা-ও শাস্ত্রকার বলে গিয়েছেন। জ্ঞান গাছের ফল নয়, একে আয়ত্ত করতে হলে বহু সাধ্য সাধনার প্রয়োজন হয়। একদিনের চেষ্টা, একদিনের আকুলতায় কিছুই আসে যায় না। দৈনন্দিন সাধনার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা যাদের রয়েছে, তারাই চরমে জ্ঞানলাভের অধিকারী হতে পারে।

আমাদের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ সবই রয়েছে—এ তো গৌরবের কথা! কিন্তু শাস্ত্রে যা আছে, তা জীবনের অনুভূতির সঙ্গে সমন্বয় করে নিতে হবে, এতেই শাস্ত্র বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। শাস্ত্রে অনেক কথাই আছে, কিন্তু চর্চ্চার অভাবে আমাদের কোন কথাতেই তেমন প্রাণের জোর নাই। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আমরা একটী কথাও বলতে পারি না।

ভারতে যথেষ্ট মূল্যবান্ মণিমুক্তা রয়েছে, কিন্তু সে সব মণিমুক্তা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে। চর্চ্চার ফলে, তীব্র অনুসন্ধিৎসার ফলে ক্রমশঃ যখন সে আবরণ উন্মোচিত হয়ে যায়, তখন খাঁটী জিনিষের সন্ধান মিলে। আমাদের শাস্ত্রেও বহুমূল্য উপদেশ রয়েছে, কিন্তু সে সব বুঝবার মত বুদ্ধির বৈশারদ্য আসেনি এখনো। আর না আসার একমাত্র কারণ চর্চ্চার অভাব।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা বা মূলানুসন্ধানই দর্শন শাস্ত্রের নিদান। বড় বড় দার্শনিক এমনি অনেক মতবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসা বড় কাহারো মাঝে জাগে না। জগতের মূল কারণের অনুসন্ধান পাওয়া শুধু পুস্তক দ্বারা হয় না, এই জন্যই তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেরই সাধক হওয়া প্রয়োজন। আত্মোপলব্ধির চেয়ে বড় জিনিষ আর নাই, আর সে উপলব্ধি হয় সাধনার দ্বারাই।

দর্শনাদির আলোচনা অনেকেই করে থাকেন, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসা সকলের মাঝে জাগে না। তা যদি হ'ত, তাহলে দার্শনিক মাত্রেই তত্ত্বজ্ঞ মহা-পণ্ডিত হতে পারতেন। তবু মনে হয়, দর্শনাদির এরূপ বহিরঙ্গ আলোচনাতেই একদিন তত্ত্বজিজ্ঞাসার ভাব উদয় হবে, কিন্তু মোটেই যেখানে চর্চ্চা বা

আলোচনা হয় না, সেখানে ব্রহ্মজ্ঞান কি করে আস্‌বে ?

আজকাল দর্শনাদির একদিক দিয়ে আলোচনা হচ্ছে বটে, কিন্তু এতে মাত্র বুদ্ধির কারসাজিই প্রকাশ পাচ্ছে; তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় হৃদয়ে এখনো তেমন আকুলতা আসেনি। এইজন্যই বড় বড় দার্শনিকের কাছে গিয়ে যে তৃপ্তি না পাই, দার্শনিক পরিভাষানভিজ্ঞ অন্তর্দর্শী সাধকের কাছে গিয়ে এর চেয়ে বেশী তৃপ্তি লাভ করি।

কিন্তু সব দিক বিচার-বিবেচনা করে দেখ্‌লে মনে হয়, এখন দর্শনাদির বহিরঙ্গ আলোচনা দ্বারাই বুদ্ধির জড়ত্বকে অপসারিত করে দেওয়াটা অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বুদ্ধি ক্রমশঃ মার্জ্জিত হ'লে, তখন স্বভাবতঃই তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগ্‌বে। ভিতরে যে কোন প্রশ্ন জাগে না, জান্‌বার রুচিতে যে অম্বল রোগে ধরেছে, এ কিন্তু মারাত্মক আশঙ্কার কথা! এই নিদারুণ জড়ত্বের জগদ্দল পাথরটাকে যে কোন রূপেই হোক্ সরাতে হবে, তা না হলে আর কল্যাণের আশা নাই।

যারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, তারা যদি দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ কর্‌ত, তা'হলে আশ্বাসের কথা ছিল; কিন্তু সামান্য কারণে তাদের যেরূপ উত্তেজনা, ক্ষোভ দেখা যায়, তাতে তাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌লাভও যে কতখানি হয়েছে তার বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়।

নিজকে ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। যারা নিজকে ফাঁকি দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছে, তারা তাদের আসনে থেকে মর্য্যাদা রক্ষা করুক—কিন্তু প্রকৃত সত্যান্বেষীর আদর্শ যেন তারা কিছুতেই না হয়। আধ্যাত্মিক জগতে তৌষ্টিকের অখণ্ড প্রতাপ এখনো বর্ত্তমান, তাই ধর্ম্মে ক্রমশঃই অবনতি ঘটাচ্ছে।



শক্তির লীলা

প্রকৃতির দুই অবস্থা—সাম্যাবস্থা এবং বৈষম্যাবস্থা। আমরা প্রকৃতির নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পরিণাম দেখিয়াই বলি, প্রকৃতি চঞ্চলা, তাঁহার স্থৈর্য্য নাই। কিন্তু এই চঞ্চল রূপ বাহিরের, প্রকৃতির নিভৃততম প্রদেশে যে নীরব নিস্তব্ধ সাধনা চলিতেছে, তাহার রহস্য আবিষ্কার করিতে হইলে নিজকেও বুদ্ধি-অভিমানের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সমাধিতে মগ্ন হইতে হয়। প্রকৃতির নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিজের চঞ্চল প্রকৃতিকে নির্ব্বাসন করিয়া স্তব্ধ শান্ত হইতে হইবে। প্রকৃতির অনন্ত

বৈচিত্র্যের মূলে যে কিরূপ আশ্চর্য্যজনক সাম্যাবস্থা বিরাজমান, তাহা বাহির হইতে বুঝা দুষ্কর। এই জন্যই প্রকৃতিকেও সমাধিগম্যা বলা হইয়া থাকে।

আমরা বিচার করি ব্যক্তাংশ নিয়া, কিন্তু প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থাও রহিয়াছে। সেই অব্যক্ত রাজ্যের সন্ধান নিতে হইলে, ব্যক্ত জগতের স্মৃতি বা সংস্কার নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মূলে কতখানি সংযমশক্তি থাকিলে পর যে অনন্ত বৈচিত্র্যের ধাত্রী হওয়া যায়, তাহা আমরা বাহির হইতে অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারি না। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত বৈচিত্র্যের জননী হইয়াও প্রকৃতির মাঝে কেন ক্লান্তি আসে না, অবসাদ আসে না, প্রকৃতির এই সৃষ্টিশক্তি সৃজন করিয়াও কিরূপে অব্যাহত থাকে, তাহা বুঝিতে হইলে বুদ্ধিকে উস্কাইয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন হয় না, বরঞ্চ বুদ্ধির মরণ হইলেই সেই দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা আভাসে ইঙ্গিতে অনুভবের মাঝে ধরা দেয়।

চাঞ্চল্য আসে উত্তেজনা হইতে, বিক্ষোভ হইতে; সুতরাং প্রকৃতির মাঝেও ক্ষোভ সঞ্চার হইলে তবেই প্রকৃতি সৃষ্ট্যুন্মুখ হয়। কিন্তু এই গুণ-বিক্ষোভ প্রকৃতির একাংশে, আর বাকী তিন অংশই মুক্ত থাকে, কোনরূপ কল্মষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রকৃতির মাঝে এই উর্দ্ধ পরিণাম রহিয়াছে বলিয়া, সৃষ্টি করিয়াও, অনন্ত বৈচিত্র্যের জননী হইয়াও প্রকৃতি অকলঙ্কা! বাহিরের দিক হইতে দেখিলে প্রকৃতির আসল পরিচয় পাওয়া যায় না, ভিতরের দিক হইতে দেখিলে তবেই প্রকৃতির মহত্ত্বের লীলা বুঝা যায়। এইজন্যই প্রকৃতির তত্ত্ব জানিতে হইলে, এক এক করিয়া সবকে গুটাইয়া অন্তর্মুখী হইয়া যাইতে হইবে, তবেই প্রকৃতির আসল তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে।

নিত্য-নূতন সৃষ্টি করিয়াও প্রকৃতি কেন অবসাদ-গ্রস্ত হইতেছে না, ইহাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাহা হইলে প্রকৃতির মাঝেও অনন্ত অফুরন্ত শক্তির উৎস রহিয়াছে। মূলে সেই শক্তির উৎস রহিয়াছে বলিয়াই একাংশের গুণ-বিক্ষোভ দ্বারা প্রকৃতি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হয় না। পুরুষ এইখানেই প্রকৃতির কাছে হার মানিয়া যায়—এই অনির্ব্বচনীয় রহস্যের মর্ম্ম কিছুতেই সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

আমরা শুধু বর্ত্তমানের ধ্বংসলীলা দেখিয়াই শিহরিয়া উঠি। কিন্তু এই ধ্বংসের ভিতর দিয়াও যে সৃষ্টিরই লীলা অব্যাহতভাবে চলিয়াছে, তাহা স্থূলবুদ্ধি নিয়া কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব ? এক-দেশদর্শী বলিয়া সহজেই আমরা চঞ্চল হইয়া উঠি, বা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠি। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার মোটেই তাড়াহুড়া নাই, চাঞ্চল্য নাই;—তিনি নির্ব্বাক-বিস্মিত হইয়া প্রকৃতির অনন্ত লীলাভিনয় দেখিতেছেন।

তরঙ্গ উপরেই উঠে, তরঙ্গের মূল বেশীদূরে ব্যাপ্ত নয়, অথচ আমরা উপরের তরঙ্গ দেখিয়াই গোটা সমুদ্রকেই ক্ষুব্ধ বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু সাহস করিয়া এই তরঙ্গকে অতিক্রম করিয়া যদি আমরা সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলেই দেখিয়া অবাক্ হইব যে, সেখানে কিরূপ শান্ত-সাম্যভাব বিরাজমান! স্থিরসমুদ্রের অনুপাতে এই তরঙ্গ-ভঙ্গী কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র!

পুরুষকে তাঁহার মনের সাধ মিটাইয়া কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারিতেছে না বলিয়াই প্রকৃতির এই চাঞ্চল্য। পুরুষ এই নিত্য নূতন আয়োজনের আড়ম্বর দেখিয়াই বিস্মিত-মুগ্ধ! এত করিয়া নিজকে বিলাইয়া দিয়াও যাহার মনে তৃপ্তি আসে না, সে যে কত বড়, কত মহৎ, তাহা ধারণার অতীত। এই অনবরত চাঞ্চল্যের ভিতরও প্রকৃতির লক্ষ্য ঠিক

রহিয়াছে বলিয়া চাঞ্চল্য প্রকৃতিকে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রকৃতি জগতের পানে নিমেষের দক্ষিণ তাকাইয়াই আবার আত্মস্থ হইয়া যায়। তাহার নিজের সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টার প্রতি তাহার নিগূঢ় ভালবাসা। এই জন্যই সৃষ্টিতে তাঁহার সুখ নাই, স্রষ্টার সন্তুষ্টিউৎপাদনই তাহার চরম লক্ষ্য।

নিছক পরকে তুষ্ট করিবার দরুণ যে আবেগ, তাহাই প্রকৃতির চাঞ্চল্য। এই চাঞ্চল্যের অবসান হয় না কিছুতেই। প্রকৃতির ভাঙ্গন-গড়ন লীলা দিবারাত্রই চলিতেছে। সংস্কারদুষ্ট মানুষ প্রকৃতির এই বহির্বিক্ষোভ দেখিয়া বলে, এই বুঝি প্রলয়ের কাল সমুপস্থিত, কিন্তু অন্তর্দর্শী মনীষী ইহার বিপরীত অনুভূতি লইয়া আত্মস্থ হইয়া যান।

সাধনার বিরাম নাই কোথায়ও। ভাঙ্গার বা প্রলয়ের মূলেও রহিয়াছে সাধনা, আবার গড়া বা সৃষ্টির মূলেও রহিয়াছে সাধনা। সর্ব্বত্র শক্তিরই লীলা চলিয়াছে। আমরা বিচার করি শুধু বাহির টুকু নিয়া, কিন্তু দৃষ্টির পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিতে পারিলে তখন দেখিব কল্যাণ ছাড়া তো অকল্যাণ কিছুই ঘটিতেছে না। যাহা হইতেছে, যাহা ঘটিতেছে, তাহার মূলে নিবিষ্ট-চিত্তের সাধনা রহিয়াছে। কাজেই তাহাতে তো অকল্যাণ হইতে পারে না।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই ত্রিবিধ রাজ্যে অক্লেশে প্রবেশাধিকার থাকিলে তবেই রায় দেওয়া চলে। আমরা অনেক কথাই বলি গায়ের জোরে, অনুমানে; এই জন্যই আমাদের রায় চরম রায় নয়। শক্তির রূপেরও অন্ত নাই। একদিকে শক্তি নিষ্ঠুরা, পাষাণী; কিন্তু আবার অন্যদিকে এই শক্তিই বরাভয়দাত্রী, স্নেহের—কল্যাণের উৎস স্বরূপিনী।

শক্তিতত্ত্ব বুঝিতে হইলেই সমাধির প্রয়োজন, তেমনি শক্তির অনন্ত লীলারহস্য বুঝিতে হইলেও সমাধির প্রয়োজন। এই শক্তিতত্ত্বের রহস্য আবিষ্কার করিতে গিয়াই ভোলানাথ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানসমাহিত হইয়াছেন। শক্তির এই অফুরন্ত লীলার রহস্য চরম করিয়া বুঝা আর বোধ হয় হইয়া উঠিবে না, তাই ভোলানাথের ধ্যানের নেশাও আর কিছুতেই ছাড়িতেছে না।

তত্ত্বাবিষ্কার করিতে হইলে স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মেই আমাদের অবতরণ করিতে হইবে। কাজেই কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইলে চলিবে না। চলিয়া যাইতে হইবে মূলে,—সেইখানের অনুভব, সেই খানের বাণীই অধিক মূল্যবান।

প্রকৃতিকে বুঝিতে হইলে, মন-বুদ্ধিকে ধরিয়া স্থূলে নামিয়া না আসিয়া তাহাদিগকে স্ব-কারণে লয় করিয়াই আসল তত্ত্বে পৌছিতে হইবে। আজ যে বৈষম্য দেখিয়া আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি—ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় গভীর সাম্যভাবই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারিব। কাজেই তত্ত্ব বা লীলা বুঝিতে হইলে ধ্যানস্থ ও তন্ময় হইতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। ভোলানাথ ধ্যানস্থ বলিয়াই শক্তিতত্ত্বের অনেক রহস্য অবগত হইয়াছেন।



প্রাণের বল



উপনিষদে আছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" দুর্ব্বল কখনো আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইলে বলেরও প্রয়োজন, শক্তিরও প্রয়োজন। শক্তি-উপাসকের শক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন, তাহা না হইলে শক্তিকে আয়ত্ত করিবে কেমন করিয়া? রামপ্রসাদ ছিলেন যথার্থ শক্তি-উপাসক, তাই তাঁহার গানের এক একটী পদেও তাঁহার নির্ভীকতা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাছোড়বান্দা রামপ্রসাদ একজায়গায় গাহিয়াছেন—

দেখি মা কেমন করে আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব মাগো, খুঁজে খোজ নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥

আত্ম বিশ্বাসের কি জলন্ত দৃষ্টান্ত! মা ছেলেকে ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে রামপ্রসাদ মহা শক্তিবান, তাই মায়ের অদর্শনেও তাঁহার চাঞ্চল্য নাই। তিনি জানেন, মায়ের সঙ্গে তাঁহার নাড়ীর যোগ বর্ত্তমান, সুতরাং তাঁহাকে সন্তানের কাছে আসিতে হইবেই।

নাছোড়বান্দা ছেলেকে জগন্মাতায় ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কেননা সে যে মা ছাড়া আর কাউকে জানে না। এই মায়েরই শক্তিতে, মায়েরই বলে বলীয়ান হইয়া সে যে মৃত্যুকেই শাসন করিতে উদ্যত হয়। তাই রামপ্রসাদ একস্থলে গাহিয়াছেন—

মন কেনরে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত!
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয় ব্রহ্মময়ীসুত?

রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ীর সুত। সুতরাং কালের ভয়ে তাঁহাকে বিচলিত করিবে কেন? এইজন্যই নিজকে নিজেই বলিতেছেন, ওরে তুই যে ফণী, তোর আবার ভেকের ভয় কিসের? কালকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সেই শক্তিই যে তোর জননী, সুতরাং তোর আবার ভয় কিসের?

প্রকৃত ভক্তের ভগবানের উপর অসীম জোর, কেননা ভক্তের তো অহংবোধ থাকে না। সুতরাং ইষ্টের শক্তি, ইষ্টের ভাবই ভক্তকে নাচায়, কাঁদায় হাসায়—এই ভাবে বিচিত্রলীলা করে। রামপ্রসাদ একান্ত মাতৃভক্ত, তাই মায়ের শক্তির বিকাশ বিচিত্ররূপে তাঁহার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অহংএর সম্পূর্ণ বিলয় না হইলে, ভক্তপ্রাণে অমন জোর, অমন আবেগ সঞ্চয় হইতে পারে না। রামপ্রসাদের প্রাণে এত জোর কি সাধে? রামপ্রসাদ যে ব্রহ্মময়ীর বেটা! ইহা শুধু অহঙ্কার অভিমানের বৃথা আস্ফালন নয়—মাকে রামপ্রসাদ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক তন্ত্রীতে

শক্তিরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তাই মা ছাড়া যে তাঁহার কোন সত্তাই নাই, এই সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ে তিনি অটল ছিলেন।

ভিতরে বল থাকা চাই। সর্ব্বদা এই সংস্কারকে জাগ্রত উদ্বুদ্ধ রাখিতে হইবে যে, আমি ব্রহ্মময়ীর সন্তান, আমি মহাশক্তির সন্তান, সুতরাং আমার মাঝে কোনরূপ দুর্ব্বলতা বা হীন কামনা বাসনা প্রশ্রয়ই পাইতে পারে না। এই সংস্কারে সিদ্ধ হইয়া যাইতে পারিলে তখনই মহাশক্তির রূপা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে। দুর্ব্বল ভাবিতে ভাবিতেই আমরা দুর্ব্বল হইয়া যাই, মহাশক্তির বিদ্যুৎ বুকে আছে জানিয়াও আমরা বাস্তবজগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিমূঢ় অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া থাকি। কিন্তু একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই সেই মহাশক্তির বিরাট লীলা বুঝিতে পারা যায়।

রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন, অজ্ঞানীর ঈশ্বর **হোথা হোথা,** আর জ্ঞানীর ঈশ্বর **হেথা হেথা।** উপনিষদেও আছে—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥

সত্য যদি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এইখানেই, এবং এই খানেই এই জগতে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আর এই খানেই যদি সত্যলাভ না হয়, তাহা হইলে পরে গিয়া কি হইবে কে জানে?

কাজেই সাধকের তীব্র সংবেগ দ্বারাই ইষ্ট বস্তু আসন্ন হয়। রামপ্রসাদ এই মনের জোরেই অরূপা মাকে রূপে নামাইয়া আনিয়া ছিলেন। আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, চাই তীব্র সংবেগ বা একাগ্র শক্তি! এই একাগ্র শক্তি দ্বারা তত্ত্ব এবং রূপ উভয়েরই বেশ নিগূঢ় দ্যোতনা পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ মাকে তত্ত্বরূপেও পাইয়াছিলেন বলিয়া স্থূল মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার আসক্তি বা সংস্কার জন্মিয়া যায় নাই। রামপ্রসাদের একটী গানে আছে—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না—
কালী কেমন তা চেয়ে দেখ্‌লে না।
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তাও জান না?
তুমি মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে তাঁরে কর্‌তে চাওরে উপাসনা॥
ত্রিজগৎ সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
তুই, সেই মাকে সাজাতে চাওরে, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা।
তুমি, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাও তাঁয় আলোচাল আর বুট ভিজানা॥

মানুষ রূপ গড়িয়া পূজা করে, কিন্তু সেই রূপে কি কখনো অরূপা মা ধরা দেন? ত্রিভুবনই যে মায়ের মূর্ত্তি! কাজেই মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার অনন্ত রূপের কি পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে? অরূপা মায়ের রূপ গড়িতে যাওয়াও ধৃষ্টতা। কিন্তু তবু তো ভক্তের প্রাণ এই তত্ত্বের কথায় পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সে মাকে স্থূলেও পাইতে চায়, স্থূলে না পাইলে যেন তাহার প্রাণের হাহাকার মিটে না।

একটা প্রচণ্ড জেদ থাকা চাই ভিতরে। ইচ্ছার মন্দ গতিতেই আমাদের ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তিতে এত বিলম্ব হয়। তাহা না হইলে ভিতরে জোর থাকিলে সব কিছুকেই অনায়াসে করায়ত্ত করিতে পারা যায়। সাধকের প্রাণের অদম্য তেজ বা বলই সাধককে ইষ্টলাভের পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়। সংসারেও দেখি একজেদী ছেলের আবেদন মা কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। শান্ত-শিষ্ট ছেলেকে মা প্রবোধ দিয়ে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু অভিমানী, জেদী ছেলের কাছে মায়ের আর কিছুতেই অব্যাহতি নাই। যাঁহাকে না পাইলে

আমাদের প্রাণ শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না, তাঁহাকে পাইতে গিয়া হেলায়, ঔদাসীন্যে সময় নষ্ট করিলে তাহার মত বড় অপব্যয় আর নাই। এইজন্যই ইষ্টবস্তু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের প্রাণে সমভাবে আকুলতার উত্তাপ থাকা প্রয়োজন। এই উত্তাপই সাধককে সচেষ্ট-জাগ্রত-উদ্বুদ্ধ রাখে, তাহা না হইলে অবসাদে, আচ্ছন্নতায় সাধকের জ্বলন্ত আদর্শও স্তিমিত হইয়া পড়ে।

প্রাণে অটল বিশ্বাস থাকা চাই। যাঁহাকে প্রাণ চায়, তাঁহাকে পাইবই, এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে পাওয়ার ধন ক্রমশঃই দূরে সরিয়া পড়ে। পাতঞ্জল দর্শন "তীব্র সংবেগ" কথাটীর উপর খুব জোর দিয়েছেন এইজন্যই। শত শত জন্ম ঘুরিয়াও মানুষ জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়, আবার জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে তীব্র সংবেগ দ্বারা মানুষ একজন্মেই চরম জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। কাজেই মনের বল, প্রাণের অটল বিশ্বাসই মানুষকে মুক্তিপথেও দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়। মানুষ পিছাইয়া পড়ে ইচ্ছা করিয়া। ইচ্ছার জোরে কি না হইতে পারে? কাজেই মাকে যে আমরা পাই না, তাহা মায়ের নিষ্ঠুরতা নয়, আমাদেরই ইচ্ছার দৌর্ব্বল্যের দরুণ মা আড়ালে পড়িয়া যান।

অবিশ্বাসে মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, কাজেই সে যাহা চায়, তাহা পাওয়া তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। পায় না কিন্তু সে নিজেরই দোষে, কিন্তু দোষ দিবে সে দৈবের উপর। এইভাবেই দুর্ব্বল জাতি, দুর্ব্বল মানুষ নাস্তিক হইয়া পড়ে। যাঁহাকে পাইতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে আস্তিক্য-বুদ্ধিই হইল পাওয়ার প্রধান উপায়। নাস্তিকতার ভাব লইয়া যাঁহাকে চাই, তাঁহাকে পাইব কেমন করিয়া? কাজেই ডাক দিয়া সাড়া না পাইলেই, মনটাকে উত্তেজিত না করিয়া বেশ প্রশান্ত চিত্তে প্রাণে দ্বিগুণ বল সঞ্চয় করিয়া, যাঁহাকে চাই তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তখন সে সাড়া না দিয়া থাকে কেমন করিয়া, তাহা বুঝা যাইবে।

মায়ের দিকে যাঁহারা অগ্রসর হন, মা-ই তাঁহাদের প্রাণে বল সঞ্চার করিয়া কাছে টানিয়া লন। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ প্রাণে এত বল পাইতেন কোথা হইতে?— শক্তিময়ী মায়ের সেই অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে।

'মায়ের শক্তিতেই আমি শক্তিবন্ত'—এই ভাব থাকিলে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। আর প্রত্যেক সাধকের প্রাণেই এই বলটুকু থাকা প্রয়োজন। অহং এর অভিমানে মানুষের পতন হয় বটে, কিন্তু শক্তিলাভ করিয়া যদি শক্তিময়ী মায়ের কথা ভুলিয়া না যাই, আর শতমুখে মায়েরই শক্তির গুণগান করি, তাহা হইলে তাহাত:উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় না। কৃপা এবং আত্মশক্তি—দু'টারই প্রয়োজন হয় সাধক-জীবনে।



আনন্দ-বার্ত্তা



একশ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে সাধারণ লোকে বলে সদানন্দময়; তারা গেয়ে বাজিয়ে, যখন যে কোনও রকমে স্ফূর্ত্তি করে কাল কাটিয়ে সবাইকে আনন্দময় করে তুল্‌তে চায়। ইংরেজী ভাষায় এদের বলা যায় Jolly men. আমাদের দেশে পূর্ব্বে রাজাদের যে বিদূষক থাকৃত, তারা এই শ্রেণীর লোক। তবে একটু পার্থক্য এই যে, বিদূষক বা ভাঁড়দিগের ওইরূপ করা জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা উপায়, আর সাধারণ স্ফূর্ত্তিবাজ লোকের স্বভাবই স্ফূর্ত্তি করা। যে কোনও কাজেই তাহারা নিযুক্ত থাক্, স্ফূর্ত্তি করবেই। কাজ কঠিন বা সহজ হোক্, তাতে তাদের আনন্দ বাধা পায় না, প্রাণ তাদের সজীব ব'লে কাজের চাপে নির্জীব হয়ে পড়ে না। আপনাকে আনন্দ দেওয়াই তাদের জীবনের সব সময়ে একমাত্র লক্ষ্য; কাজেই নীতির চাপে জীবনকে পীড়িত করা তাদের পক্ষে মহা অসম্ভব! খাওয়া পরার স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও তাদের স্ফূর্ত্তি বাদ হয় না। বরং পারিবারিক দুঃখানটন যে কোনও উপায়ে আনন্দ করে ভুলে থাকৃতেই তারা ভালবাসে। তারা এই যুক্তি দেখায় যে, মানব-জীবন যখন দুদিনের, তখন খাও দাও স্ফূর্ত্তি কর—আনন্দে ফুরিয়ে দাও—বাস্! এই কথাগুলিই সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করে চার্ব্বাক বলেছিলেন—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ॥

আধুনিক অনেকের মনেই কথাটা খাটী বলে মনে হয়। দেহাবসানের পরে কি হবে না হবে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, বর্ত্তমান জীবন যাতে সুখের হয় তাই কর আগে, শেষে যা হয় হবে। বলা বাহুল্য, এদের পক্ষে কোনও কু-কার্য্যই অসম্ভব নয়। আনন্দদায়ক বলে যে কোনও পথে মন ধাবে, সেদিকেই প্রবৃত্তিবশে ছুটে চল্‌বে। কিন্তু পরিণামে 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কর্ম্মাকর্ম্ম-শুভাশুভম্।'

অনেক সময়ে দেখা যায়, কেউ হয়ত নানা কুকার্য্য করেও আনন্দে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। তার উপর ভগবান যেন সদাই তুষ্ট, ধনে-জনে তাকে পূর্ণ করে অতুল আনন্দে রেখেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নীতির দোহাই দিয়ে প্রতি পাদক্ষেপে অত্যন্ত হিসাব করে চলেন, কিছুতেই ধর্ম্মের পথ ছেড়ে চল্‌তে রাজী নন, তারই উপর যেন ভগবানের যত রাগ! যত রাজ্যের অমঙ্গল তার ঘাড়ে চাপিয়ে দুর্দ্দশার একশেষ করেন। দুর্য্যোধন শঠতা কপটতাদ্বারা পূর্ণ হয়েও মহাসুখে সারাজীবন রাজত্ব করে যায়, আর ওদিকে যুধিষ্ঠির সারা জীবন সত্যের আরাধনা করে ধর্ম্মরাজ আখ্যা পেলেও সারাটা জীবন তাঁকে একপ্রকার বনে জঙ্গলে নানা

অশান্তি-দুঃখেই কাটাতে হল। এমন কি সর্ব্ব-সুখাধার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থেকেও সে দুঃখ হতে তাঁকে পরিত্রাণ করেন নাই। এমনি অতীতে ইতিহাস-পুরাণে এবং বর্ত্তমানে নিজেদের চোখের উপরও হয়ত কত উদাহরণ মিল্‌বে। অধিক কি, স্বয়ং ভগবানই নাকি বলেন, 'যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।' কিন্তু পরের কথাটাই চমৎকার, যথা—'তবু যে না ছাড়ে পাশ, তার হই দাসের দাস।'

এতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। অনেক মা আছেন, অপরের ছেলের সাথে নিজের ছেলের ঝগড়া হ'লে পরেরটাকে মিষ্ট কথায় বিদায় দেন, আর যত নির্য্যাতন, শাসন, তা হয় নিজের ছেলের উপর। তাতে কি তাঁর নিষ্ঠুর বিচারহীন নির্ম্মমতা প্রকাশ পায়? —না সে সন্তান পরিণামে মায়ের মঙ্গলেচ্ছার ফললাভ করে ধন্য হয়? এক জায়গায় মিষ্টকথা পেয়ে যে বিদায় হয়ে গেল, যথার্থ অন্যায়কারী হ'লে সে আর একজায়গায় গিয়ে তার প্রতিফল পাবেই। তখন মনে হবে যে, মায়ের মা'র বরং ভাল, কেননা তাতে স্নেহ-ভাবের অভাব নাই, কিন্তু অপরের মার যে শুধুই বেদনাদায়ক, পাপের শাস্তিরূপে পরিগণিত, তাতে একান্ত প্রাণের স্নেহ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কোথায়? যেমন এইরূপ শিশুর বেলায়, তেমনি বৃদ্ধ মানবশিশুর বেলাতেও। প্রত্যেকের পক্ষেই "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কর্ম্মাকর্ম্ম শুভাশুভম্।" বিশ্বতশ্চক্ষুকে এড়াতে পারে না কেউই!

এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কারও নাই। যতই বাহির থেকে কাকেও সুখের আধার হয়ে জীবন কাটাতে দেখা যায়, তার অন্তরতমদেশে প্রবেশ করলে দেখ্‌বে, কি ভীষণ অন্তরবহ্নি তার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করে দিন দিন বিভীষিকাময় করে তুল্‌ছে। বাইরের হাসিই যদি অন্তরের হাসিরূপে সব সময়ে প্রকাশ পেত, তবে আর জগতে দুঃখ ছিল কি? কাতুকুতু দিলেও তো লোকে হাসে, কিন্তু এ হাসি তো অন্তরের হাসি নয়!! প্রাণ তাতে খোলে না। তাই বিদূষক বা ভাঁড়ের কথায় মানুষ সাময়িক হাসে বটে, কিন্তু অন্তরের দীপ্তি তাতে হয় না। তাই যদি হত, তবে ভাঁড়ের জীবন সকলের আদর্শ হত। কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বিদূষক গোপালভাঁড় তাহলে ঋষির চেয়েও উচ্চ আনন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ পেয়েছেন বল্‌তে হবে।

Joker সত্যি খুব বড় হত, যদি সমগ্র মানব-জীবনটাকে সত্যই সে হেসে খেলে উড়িয়ে দিতে পার্‌ত। কিন্তু তাতো সে পারে না—পরকে হাসিয়ে-রসিয়ে জীবনের নিভৃতে যে প্রাণমন তার ভারী হয়ে ওঠে! নিরালায় আপন মনে তার ক্রন্দন উত্থিত হয় কেন? কাজেই আনন্দ তো তার খাটী রূপ নয়—ও শুধু তার বাইরের খোলস্ বা পোষাক মাত্র। পোষাক খুলে আসল মানুষটার চেহারা দেখ, সে কত ক্ষীণ! দেহলতা তার দুঃখ-বাত্যায় কত আন্দোলিত! কাজেই চাই দৃঢ় মহীরুহ, যে আনন্দকে আশ্রয় করলে দেহলতা কাঁপবে না, সেই স্থির নিশ্চিত আনন্দ চাই। সাময়িক হাসির চেয়ে বরং সাময়িক দুঃখ-কান্নাও ভাল, তাতে সাময়িক বিমর্ষভাব কেটে গেলে স্থায়ী হর্ষের আশা হয়, কিন্তু সাময়িক হাসির পর যে অনভিলষিত দুঃখই এসে পড়ে। কাজেই সাময়িক দুঃখই কাম্য, সাময়িক সুখ চাই না।

তবে দু'রকম লোক দেখা যায়; একদল স্থায়ী বড় কিছুর আশায় জীবনে সব রকম কষ্ট স্বীকার করতেও রাজী, বর্ত্তমানের নিঃস্ব অবস্থায় তারা কুণ্ঠিত নয়। আর একদল চায়, বর্ত্তমানে হাসি-বাঁশী-রসনচৌকীতে জীবন আনন্দে যেতে উঠুক

তারপর কাল যদি সব সঞ্চয় ফতুর হয়ে যায়, ক্ষতি নাই। এই উভয়কেই বীর বলি, যদি তাঁরা জীবনের নিঃস্ব অবস্থাতেও প্রাণের বল ও আনন্দ অক্ষত রাখ্‌তে পারেন। চার্ব্বাক মত যদি যথার্থ-ভাবে অনুসরণ করতে হয়, তবে মনের প্রচণ্ড তেজ চাই—যে তেজ পাপকে গ্রাহ্য করে না, সে পাপের শাস্তি এসে যখন ঘাড়ে পড়ে, তখনও যে তার কাছে নিভে যায় না! পাপানুষ্ঠানে তেজ, তার ফলগ্রহণে নিস্তেজ, এমন দুর্ব্বল মনের পরিণামই ভয়াবহ নরক! পরিণামের বিভীষিকাতেও যার তেজ অক্ষত, সে-ই প্রকৃত তেজীয়ান্।

এমনি ধরণের তেজীয়ান্দের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যে, "তেজীয়সাং ন দোষায়"—তেজীয়ানদের কিছুতেই দোষ নাই। মনের প্রচণ্ড তেজ নিয়ে যদি পাপ পথেও যায়, তবু আশা থাকে যে এই তেজের গতি বিপরীত দিকে নিতে পারলেই ধাঁ ধাঁ করে আপন জোরে সে উপরে উঠে যাবে। আর মরার মত চিত্তের জোর শূন্য হয়ে ধর্ম্মকাজ করলেও তার ফল বহু পরে সে পায়। চিত্তের জোর চাই সব সময়ে সকল কাজে। পতঞ্জলি বলেছেন—"তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ।" তীব্র সংবেগশালী ব্যক্তিদিগের সিদ্ধিলাভ আসন্ন, অর্থাৎ অতি কাছে। কেন কাছে, তার কারণ হচ্ছে এই যে, শুধু কর্ম্মের উপর নির্ভর করেই তাদের ফললাভ হয় না, কর্ম্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ভাব বা মনের আবেগ প্রবাহিত হয়, সেই আবেগের টানেও সিদ্ধি নিকটে আসে। সেই প্রবাহের প্রবল আকর্ষণ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যত সত্বর গিয়ে কাম্য বস্তুকে টেনে নিয়ে আস্‌তে পারে, মরার মত দুর্ব্বল কর্ম্মে তা পারে না। সকল কাজেই তাই পাতঞ্জলোক্ত তীব্র সংবেগ চাই। সেই প্রচণ্ড তেজ স্বাভাবিক হয় কার পক্ষে? তেজীয়ানের পক্ষে। সে খেয়ে যত শীঘ্র হজম করতে পারে, অর্থাৎ যা করে সে মনের আনন্দ অক্ষত রাখ্‌তে পারে, পরিণামের বিভীষিকায় স্থির থাকতে পারে, তুমি আমি তা পারি না। আমাদের ততদূর না হওয়ার জন্যই বেশীদিন ধরে হরিশ্চন্দ্রের মত মধ্যপথে ঝুল্‌তে হয়। এই দোলখাওয়ার ভাব নিয়ে কোনও কাজে নেমেই আনন্দ নাই।

জীবনের উপর নির্ম্মম না হতে পারলে তেজীয়ান্ হওয়া যায় না। তেজীয়ান্ ভিন্ন দুর্ব্বলের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। বীরের পক্ষে যুদ্ধে মরণও আনন্দদায়ক, যশস্কর; আর দুর্ব্বলের বেঁচে থাকাও মরণের সমান; কেননা সে ত প্রতিপলেই মরছে—মরার ভাব অবলম্বন করে বেঁচে আছে। জীয়ন্তে মরা হয়ে থাকার চেয়ে বীরের মরণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কাজেই কি হবে না হবে সেই চিন্তায়, পাছে অমঙ্গল হয় এই ভয়ে প্রতিপদে পিছিয়ে যাওয়ার চেয়ে লাভালাভের উপর নির্ম্মম হয়ে কাজে লেগে যাওয়া চাই। ব্যর্থতাকে যদি বুক পেতে সহ্য করে নিয়ে কাজে না লাগ্‌তে পারি, তবে আর বুকের জোর কোথায়? উদ্দেশ্য মহৎ, উপায় সুচিন্তিত, তারপর কর্ম্মে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাতেও যদি বিফলতা আসে, তাকে বুকটান করে মেনে নিয়ে নূতন উপায় অবলম্বন করতে যেন দেরী না হয়। অনুতাপের হাত এড়াতে গিয়ে যেমন কর্ম্মে না নামাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তেমনি ব্যর্থতার আঘাত সইতে না পারাও বীরত্বের অভাব। অক্ষয় বীর্য্যের বর্ম্ম যার রয়েছে, তার কাছে জগতের কোনও আঘাতই নিদারুণ মর্ম্মভেদী হয় না। হিন্দুর যত শাস্ত্রনিয়মাদি—সে সবই চিত্তকে এমনি বর্ম্মাবৃত করার জন্য। তেজীয়ান্ বৈরাগীর দীপ্ত বৈরাগ্য জগতের উপর উদাসীনতা এনে সাধককে তমোগ্রস্ত ক'রে—ঘুম পাড়িয়ে রাখে না—ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত

ক'রে তাকে মরণযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত তেজ দান করে। সেই তেজস্বী প্রাণের আনন্দই জীবন-মরণে মানুষকে শান্তি দিতে পারে।

সে আনন্দের কাছে সংশয় তিষ্টিতে পারে না। গীতাতে একটা কথা আছে—"ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।" সত্ত্বসমাবিষ্ট ত্যাগী মেধাবী ও সংশয় রহিত হন। আনন্দ কর্‌তে পারে ত্যাগী, কারণ তাঁর সংশয় আসে না—মেধা দ্বারা তিনি তাঁর পন্থা উজ্জ্বল ভাবে চিন্‌তে পেরেছেন; আর ভোগীর পদে পদে যে সংশয় ও ভয় আসবেই, কাজেই আনন্দ স্থায়ী হয় কই? ভোগের আনন্দ প্রথমে ও অনুবন্ধে, অর্থাৎ শেষে মানুষকে যদি ভুলিয়েও রাখে, তবু তার মধ্যে বিচাররূপ আত্মবোধনের অভাবে সেই মোহময় অবস্থা তামস-সুখ নামেই অভিহিত হয়। পরিণামে বিষ, প্রথমে অমৃত তুল্য অনন্দও রাজস-সুখ মাত্র। যথার্থ তেজীয়ানের আনন্দ-সাত্ত্বিক আনন্দ। তা একদিকে যেমন মানুষকে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ শূন্য করে, তেমনি আর একদিকে তাকে মৃত্যুৎসাহ-সমন্বিত করে। আনন্দ উচ্ছ্বাসময়ও হবে না—আবার মোহগ্রস্ত ঘুমের মতও হবে না। চিত্তকে জাগ্রত ও দীপ্ত করে, কিন্তু উচ্ছ্বসিত করে না—শান্ত এক মহান্ প্রসন্নভাবে সর্ব্বকর্ম্মে নিযুক্ত রাখ্‌তে পারে, এমন আনাবিল আনন্দ চাই। সে আনন্দ দেবভাবপূর্ণ—অসুরের অট্টহাসি নয়!

আনন্দময়ীর সন্তান আমরা, আনন্দ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র কাম্য। মায়ের আমার সোনার প্রতিমার মুখচ্ছবিখানি যেমন চিরপ্রশান্ত হাসি-বিজড়িত, দৈত্যনাশের দশপ্রহরণ ধারণ ক'রেও, দৈত্যনিধন কালেও (বুঝি আমাদের তরেই বরা-ভয়করা) চিরপ্রসন্ন, তেমনি ভাবেই মায়ের আমার চির উজ্জ্বল আনন্দের আদর্শ ধরেই জীবন অতি-বাহিত কর্‌তে হবে। সুখে-দুঃখে, জয়ে-পরাজয়ে, সন্ধি-বিগ্রহে সর্ব্বাবস্থায় চিরমধুর হাসিটুকু বজায় রাখা চাই। বরং বাহিরের তুচ্ছ-বিষয়-জনিত আনন্দের কবল থেকে নিজকে উদ্ধার ক'রে বিষয়-নিরপেক্ষ আত্মার যে স্বাভাবিক আনন্দ, তাই পেতে প্রাণ আকুল হবে, কিন্তু তবু সাময়িক ইন্দ্রিয়োত্তেজক আনন্দে যেন মন না টলে। আনন্দময়ীর সন্তান আমরা, আনন্দে যে আমাদের জন্মগত অধিকার! আনন্দের অংশ আমাদের মাঝে স্বাভাবিক বেশী হবে, যদি মায়ের যথার্থ পূজায় আমরা প্রাণ-মন উৎসর্গ করি। সে পূজা আর কিছু নয়—শুধু হৃদয়-মনে অসুরের স্থান না দেওয়া; অসুরকে পরাস্ত করে পশুবলি দিয়ে হীন আনন্দকে পরম আকর্ষণের বস্তু না ভেবে, হৃদয়কে দেবভাবে—মায়ের ভাবে পূর্ণ করা।



যাবন্নাধিগতং



কেবল শাস্ত্রের উপদেশেই লোকের কৃতকৃত্যতা হইতে পারে না, শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক অনন্য-চিত্তে বিচার করতঃ যে পর্য্যন্ত প্রকৃত তত্ত্বের অধিগম করা না যায়, সেই পর্য্যন্ত জ্ঞানোদয় সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন—

স্বয়মেব বিচারেণ বিচার্য্যাত্মানমাত্মনা।
যাবন্নাধিগতং জ্ঞেয়ং ন তাবদধিগম্যতে ॥

'অধিগত' কথাটী দ্বারাই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে। অধিগত হইল—নিজের করিয়া লওয়া। কাজেই শাস্ত্রোপদেশকে বিচার দ্বারা, মনন দ্বারা নিজের করিয়া লইতে হইবে। এখানেই সাধনার প্রয়োজন। শাস্ত্র শুধু মুখে মুখে জানিলেই প্রকৃত জ্ঞান হয় না, শাস্ত্রকে অনুভূতির সাহায্যে অধিগত করিতে হইবে। শাস্ত্রকে মুখে মুখে আয়ত্ত করিলে তাহাতে জীবনের কোন উপকার হয় না। জীবনকে প্রকৃত ভাবে গঠন করিতে হইলেই শাস্ত্রকে অধিগত করিয়া লইতে হইবে। পড়াশুনা-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সাধনা না থাকিলে শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। আর ঠিক ঠিক একটা বিষয় বুঝিতে হইলে, তাহার ধ্যানে তন্ময় হইয়া না গেলে, তাহার স্বরূপও অবগত হওয়া যায় না।

পাণ্ডিত্যবুদ্ধি দ্বারা আমরা শাস্ত্রোপদেশকে জানি মাত্র, কিন্তু তাহাকে অধিগত করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। পূর্ব্বে ঋষিরা বিদ্যাকে অধিগত করিতে গিয়া ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতেন এইজন্যই। একটা বিষয়কে নিজের করিয়া লইতে হইলে তাহাকে নিজের সত্তায় সত্তায় অনুভব করিতে হইবে। আর বিদ্যা অধিগত না হইলে কার্য্যকরী হয় না। আজকাল আমরা এক এক বিদ্যায় এক একজন পারদর্শী, কিন্তু সেই বিদ্যা আমাদের জীবনে অধিগত নয় বলিয়াই আমাদের জীবনোন্নতির পক্ষে তাহা কোন সাহায্যই করে না।

পূর্ব্বে অধিগত বিদ্যা ছিল ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা। এই বিদ্যা গুরুপরম্পরায় অধিগত হইয়া আসিত। এইজন্যই এই পরাবিদ্যাকে জানিতে হইলে গুরুসন্নিধানে গমন করিতে হইত। শুধু শাস্ত্রোপদেশে সেই বিদ্যা অধিগত করা যাইতে পারিত না বলিয়াই গুরুর নিকট গিয়া সেই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত।

ব্রহ্মকে ঋষিরা অধিগত করিয়া ফেলিতেন—অর্থাৎ নিজের মাঝে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। এইজন্যই ঋষিদের ভাষায় এত জোর, প্রাণে এত বল! মুখে মুখে তাঁহারা 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' বলেন নাই, ব্রহ্মকে অধিগত করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মই হইয়া যাইতেন। অধিগত বিদ্যার পরিচয় জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

শাস্ত্রকে জানে অনেকেই, কিন্তু অধিগত করিতে পারে কয়জন? গীতা আমাদের নিত্যপাঠ্য, কিন্তু সেই গীতাকে অধিগত করিতে পারিয়াছি আমরা কয়জন? অধিগত বলিতে মুখস্থ করাকে বুঝায় না

গীতা অধিগত মানে, জীবনে গীতাকে মূর্ত্ত করিয়া তোলা। গীতাতে আছে, আত্মা অজর অমর। কিন্তু আমরা তো মরণের ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড়! তাহা হইলে গীতার উপদেশ অধিগত হইল কেমন করিয়া? গীতার উপদেশ যথার্থভাবে অধিগত হইলে সত্য সত্যই মৃত্যুভয় চলিয়া যাইবে।

অধিগত করার অর্থ প্রাচ্য একরূপ বুঝিয়াছে, আবার পাশ্চাত্য অন্যরূপ বুঝিয়াছে। অধিগত করিতে গিয়া প্রাচ্যের ঋষি ধ্যান-নিরত, আর পাশ্চাত্যের মনীষী বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। এই খানেই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাকে অধিগত করিতে গিয়া ঋষি ধ্যানে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, ইহার কারণ বিদ্যাকে নিজের মাঝে নিগূঢ় ভাবে অনুভব করা। নিজের মাঝে প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যা অধিগত হইয়াছে, এই কথা ঋষি কখনো স্বীকার করিতেন না।

উপদেশ জানা, আর উপদেশকে নিজের জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া এক কথা নয়। আমরা জানি অনেক কিছু, কিন্তু অধিগত নয় বলিয়াই তাহা আমাদের জীবনের কোন কাজে আসে না। একটী কথা, একটী আদর্শকে জীবনে অধিগত করিতে পারিলে কত কাজ হইয়া যায়।

অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় না। সচরাচর আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা ওপরভাসা জ্ঞান মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান মানে—ব্রহ্মানুভূতি, ব্রহ্ম শব্দটাকে জানা নয়। নামে মাত্র জ্ঞানী সবাই, কিন্তু সেই জ্ঞানে জীবনের উন্নতির বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। দর্শনে, বিজ্ঞানে এক একজন মস্ত মস্ত উপাধি লাভ করিয়াছেন-- কিন্তু দর্শনের আদর্শে জীবন গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন কয়জন? জ্ঞানলাভ বলিতে কেবল কতকগুলি মত জানাকে বুঝায় না। মত জানাতে বুদ্ধির তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান লাভ হইলে সকলের আপ্যায়ন হয়। কাজেই নিছক বুদ্ধির যে তৃপ্তি, তাহা জ্ঞানের অংশ মাত্র!

এক একটী শব্দ প্রয়োগের মাঝেই কি সুন্দর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে! 'অধিগত' কথাটী দ্বারাই বিদ্যাকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়াকে বুঝায়।

আজকাল আমরা বিজ্ঞান পড়ি, শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু বিজ্ঞানকে শাস্ত্রকে অধিগত করিতে পারি না। অধিগত বিদ্যা—কার্য্যকরী বিদ্যা, অর্থাৎ জীবনের কাজে লাগে সেই বিদ্যা। দর্শনে-পুরাণে যে সব কথা রহিয়াছে, তাহা অধিগত হইলে জীবন কত মহৎ, কত শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইতে পারে! দর্শন তো পড়ে সবাই, কিন্তু দর্শন অধিগত করেন কয় জন?

আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ কি? একমাত্র অধিগত কথার সঙ্কেত না জানা। আমরা পড়ি মাত্র, কিন্তু অধিগত করিবার সঙ্কেত ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা না হইলে ভারতের দর্শনে-পুরাণে যে সব উচ্চ উচ্চ আদর্শের কথা রহিয়াছে, তাহা অধিগত করিতে পারিলে আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা?

যে পর্য্যন্ত আমরা বিদ্যাকে অধিগত করিতে না পারিব, সেই পর্য্যন্ত আমাদের শোচনীয় দশার মোচন হইবে না। আমাদের বেদ-বেদান্ত হইতে আদর্শ লইয়া ইমার্সন, থরো প্রভৃতি মনীষীরা কত উন্নত হইয়া গিয়াছেন! তাঁহারা প্রকৃতই উপনিষদকে অধিগত করিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্যই উপনিষদ তাঁহাদের জীবনে বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত শিষ্য গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিত না— ইহাই ছিল ঋষিযুগের আদর্শ। আবার ব্রহ্মকে অধিগত করিয়া পুনঃ সংসারে প্রবেশ করিয়াও ঋষিরা নির্লিপ্ত থাকিতে পারিতেন এইজন্যই।

বিদ্যাকে অধিগত করিতে হইবে—জীবনে

ফলাইয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রকৃত জ্ঞান হইল! শুধু দর্শনের মত জানিয়া কোন লাভ নাই, সেই জানায় জীবনের কোন হিত হয় না।

—ওম্—



প্রেম মহাবল

—)০(—

প্রেমের মাঝে, ভালবাসার মাঝে মহাশক্তি, মহাবল নিহিত রহিয়াছে। এইজন্যই দেখি যাঁহারা ভগবানের প্রতি অনুরক্ত, তাঁহাদের হৃদয় এবং প্রাণের বল অসাধারণ। তাঁহারা ভগবানের দরুণ সবই করিতে পারেন। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ পরম বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল,
যে বলে আমায় করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকা যে প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব হইয়াও রাধিকার প্রেম দ্বারা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই রাধিকার প্রেমের বল কতখানি তাহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভক্তের আকুল আহ্বানে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও সাকার রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন। এই যে শক্তি, এই যে বল, ইহার উৎপত্তি হইল ভালবাসা বা ভগবানের প্রতি অনুরাগ হইতে। কাজেই প্রেমই মহাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। খাঁটী ভালবাসা যেখানে, সেইখানেই এক আশ্চর্য্য শক্তির উদ্বোধন হয়। সেই শক্তি দেখিয়া ভক্ত, ভগবান্ উভয়েই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

গীতাতে আছে, "তেষাং সততযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—যাহারা আমার প্রতি সতত যুক্ত, তাহাদের যোগক্ষেম আমিই বহন করিয়া থাকি। —ইহা ভগবানেরই বাণী। কাজেই প্রকৃত ভালবাসায় মানুষের মাঝে অসাধারণ শক্তি এবং ত্যাগ দেখা দেয়। ভগবানকে পাইতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, ভগবানই আসিয়া মহাশক্তি-রূপে তাহার নির্দ্দেশ দিয়া যান। তখন ভক্ত আত্ম-বলের মহিমায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। ভক্তের প্রাণে তখন অসাধারণ বল নামিয়া আসে।

প্রকৃতই ধার্ম্মিক জাতির এত দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে হয়, ধর্ম্মের মাঝে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় গলদ রহিয়াছে। ধর্ম্ম তো নির্জীব নয়—ধর্ম্ম হইল আধ্যাত্মিক অনুভবের বিদ্যুৎ। কাজেই ধার্ম্মিক

জাতির কোন দিক দিয়াই দুর্ব্বলতা আসিতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মের প্রভাবে জাতির প্রাণ এক নবশক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই ধার্ম্মিক জাতির ইতিহাস পাই ঋগ্বেদে! তাঁহারাই যথার্থ ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের স্তোত্রে, গাথায়, সর্ব্বত্রই একটা শক্তির সাড়া অনুভব করি। ধর্ম্ম করিয়া তাঁহাদের প্রাণ মরিয়া যায় নাই, বরঞ্চ ধর্ম্মের শক্তিতেই তাঁহাদের অসাধারণ তেজ, বীর্য্য, বল দেখিতে পাই। ভগবান্‌কে ডাকিতে গিয়া তাঁহাদের ভিতর হইতে কোনরূপ দৈন্যোক্তি বা কাতরতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই; যথার্থ ভালবাসা আছে বলিয়াই ভগবানের প্রতি তাঁহাদের এত নিঃসন্দিগ্ধ জোর!

প্রেমিক জাতির মাঝে শক্তির আবেশ নামিয়া আসিবেই! এই প্রেমের অসাধারণ শক্তিতেই নদীয়ার পূর্ণচন্দ্র মহাপ্রভু সারা দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী, তাঁহাদেরও গাম্ভীর্য্য কোথায় ভাসিয়া গেল, তাঁহারাও মহাপ্রভুর সঙ্গে উদ্দণ্ড নৃত্যে বিভোর! এই যে আত্মভোলা-ভাব, অহর্নিশ পণ্ডিত-মূর্খ সকলের এই উদ্দণ্ড নৃত্য, ইহার কারণ কি? না মহাপ্রভুকে সকলে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া। এই ভালবাসার দরুণই তাঁহাদের ভিতর এক দৈবীশক্তি নামিয়া আসিয়াছিল। তাহারা সেই প্রেমেই অহর্নিশি বিহ্বল হইয়া থাকিত। কাজেই প্রকৃত ভালবাসায় দেখি, আপনি শক্তির জোয়ার ঠেলিয়া বহিতে থাকে। প্রেমে দেশ উৎসন্ন যায় না, কেননা যথার্থ প্রেমেই মানুষকে সকল রকম দুর্ব্বলতা হইতে পরিত্রাণ করে। প্রেমিকের দেশকে শক্তির দেশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই প্রেমের ভিতর দিয়া মহাপ্রভু যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এক দুর্লভ জিনিসই বটে! দেশ তখন আত্মত্যাগের এক উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মের দরুণ ধন, প্রাণ, মন সকলই অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে শিখিয়া ছিল। ইহা কি জাতির পক্ষে কম গৌরবের বিষয়?

ভালবাসার এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তির কাছে স্বতন্ত্র-ভগবানও পরতন্ত্র। এই জায়গায় ভগবান নিজেরই শক্তিতে, নিজেরই মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এই খানেই ভগবান অতীব বিস্ময়ের সহিত বলিতে থাকেন—"না জানি ··· প্রেমে আছে কোন্ বল।" স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত আচম্বিত হইয়া যান, শক্তির এই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ায়।

যাহাকে মন প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তাহার শক্তি নিঃশব্দে নিজের মাঝে সঞ্চারিত হইতে থাকে। ভালবাসায় অজ্ঞাতে মানুষ অপরের শক্তিকে উজাড় করিয়া ফেলে। যেখানেই ভালবাসা, সেই খানেই দেখি এক আশ্চর্য্য শক্তির বিকাশ! বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে ভাল বাসিয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার ভিতর জগজ্জয় করিবার শক্তি নামিয়া আসিয়াছিল। এই ভালবাসাতেই রামকৃষ্ণের শক্তি বিবেকানন্দে সঞ্চারিত হইয়াছিল। অপরের শক্তি নিজের মাঝে আকর্ষণ করিয়া লইবার একমাত্র উপায়ই হইল—ভালবাসা। এই ভালবাসা দ্বারা একে অপরের মন প্রাণ সমস্ত ধন কাড়িয়া লইতে পারে।

ভগবান্‌কে যাহারা ভালবাসিয়াছে, ভগবানের দরুণ সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিবার শক্তিও তাহারা নিজেরই বুকের মাঝে অনুভব করিতে থাকে। প্রেমে, ভালবাসায়ই মানুষ যথার্থ উন্নত হয়। ত্যাগ-ধর্ম্মের উদ্ভবই তো হইল এই ভালবাসা বা প্রেম হইতে। কাজেই প্রেমিক জাতির মত অমন নিঃস্বার্থ ত্যাগ আর কে করিতে পারে?

ভালবাসা না জন্মিলে মানুষ ত্যাগ করিতে পারে না, আর ত্যাগ করিতে না পারিলে মানুষ মহত্বও হইতে পারে না। সুতরাং ভালবাসাই হইল সকল উন্নতির মূল। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার দরুণ সব করিতে পারি, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি—ইহাই হইল ভালবাসার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর আশ্চর্য্য এই যে, প্রকৃত ভালবাসায় যে কোথা হইতে ধারণাতীত শক্তি আসিয়া দেখা দেয়, তাহা কেহই অনুমান করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আজ দেশের দরুণ যাঁহারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, তাঁহাদের সকলের পন্থা আদর্শ স্থানীয় না হইলেও, তাঁহারা যে এক দুর্জ্জয় শক্তির মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দুর্জ্জয় শক্তির উদ্বোধন হইল কেন—না ভালবাসায়। কাজেই প্রেম বা ভালবাসায় মানুষের ভিতর এক আশ্চর্য্য শক্তির স্ফুরণ হয়।

ভগবদ্ভক্ত প্রেমিক ভগবানের নামে যেরূপ ত্যাগ করিতে পারে, অন্য কিছুর দরুণই তেমন ত্যাগ সম্ভবপর নয়। ভগবানকে ভালবাসিয়া প্রেমিক ভক্ত ত্যাগের যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা মানুষ নিজের চেষ্টায় বা শক্তিতে কিছুতেই দেখাইতে সক্ষম নয়। কাজেই প্রেমিকই শক্তিজয়ী পুরুষ। প্রেমিকের কাছে শক্তি অনুগত। কেননা, প্রেমিক প্রেমকেই জানেন, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তি না আসিয়া থাকিতে পারে না। প্রেমিকের কাছে শক্তি আনুসঙ্গিক মাত্র, মুখ্য জিনিষ হইল প্রেম, সুতরাং অভিমানের অভাবে প্রেমিকের জীবনে শক্তির ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় না। কিন্তু এই কথা মনে রাখিতে হইবে, প্রেম যেখানে মানুষকে দুর্ব্বল করে, সেইখানে প্রেমের মাঝে কোথাও না কোথাও গলদ রহিয়াছে। প্রেম যে মহাবল—মহাশক্তি! যাহার হাতে ভগবান পতাকা দেন, তাহাকে আবার সেই পতাকা বহন করিবার শক্তিও প্রদান করেন। ভগবানকে যাহারা ভালবাসে, ভাগবানকে পাইবার পথে যে দুরূহ বাধা-বিঘ্ন দেখা দেয়, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার মত শক্তি সামর্থ্যও আবার ভগবানই তাহাদের প্রদান করেন। কাজেই প্রেমের সঙ্গে সঙ্গেই অটল বীর্য্য দেখা দেয়। সেই বীর্য্যই দুর্নিবার শক্তির কেন্দ্র।

ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গেই যদি শক্তি না আসিত, তাহা হইলে ভালবাসার পথের এত নির্য্যাতন সহ্য করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইত। মানুষ ভিতরের শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে বলিয়াই, জগতের লোকের কুৎসা-নিন্দা তখন কানেই আসে না। তখন মন শুধু সেই প্রেমিক মহাজনের দিকেই পড়িয়া থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতকার অন্য এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, সেই প্রেমের আস্বাদন কিরূপ? না তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের ন্যায়: মুখ জলে, তবু ত্যাগ করা যায় না। এখন এই যে জলুনি সহ্য করা, ইহাতে কি কম শক্তির প্রয়োজন হয়? তারপর আর এক জায়গায় বলিতেছেন:—

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করায় যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহারে কহি যে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥

অতএব কাম, প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥

—প্রেম হইল মহাবল—মহাশক্তি, এবং তাহার তাৎপর্য্য হইল ইষ্টসুখ। এখন এই ইষ্টসুখের পথে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা যে সহ্য করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু প্রেমিক ভক্তের মন সবকে উপেক্ষা করিয়া আপন লক্ষ্যের দিকে অপ্রমত্ত চিত্তে অগ্রসর হইতে পারে, অমন শক্তি তাঁহার মাঝে রহিয়াছে। কাজেই প্রেমিকের বল যে মহাবল, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, সেই বলের কাছে আর সকল বল পরাহত।

মহাপ্রভুর সময় অনেক ভক্তেরই আবেশ হইত। আর সেই আবেশের সময় এক একজনার কি হুঙ্কার! ইহার কারণ---প্রেমে এক একজনের ভিতর এক এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইত। শক্তির এই আবেশ লইয়া তাঁহারা এক একজন এক এক মহৎ কার্য্য উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

শক্তির আবির্ভাব ভালবাসায় বা প্রেমেই হয়। রাধার ভিতর এত শক্তি আসিত কেমন করিয়া? শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন বলিয়া। আমরা শক্তি-উপাসক, আমাদের মাঝে শক্তির ক্রিয়া অব্যর্থ-ভাবেই হওয়া উচিত। কিন্তু শক্তির ন্যূনতা দেখিয়া মনে হয়, এখনো আমরা প্রকৃত ভালবাসার সন্ধান পাই নাই। যথার্থ প্রেমের মাঝেই শক্তি অনুস্যূত। কাজেই প্রেমিক জাতির ভিতর বীর্য্যের—শক্তির স্ফুরণ না হইলে বুঝিতে হইবে, সেই জাতি প্রেমিকই নয়। প্রেমে, ভালবাসায় মানুষ দুর্ব্বল অন্ধ হয় না। প্রেম মানুষকে বীর্য্যশালী করিয়া তুলে—কেননা প্রেম যে মহাবল-স্বরূপ। প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর, সুতরাং প্রেমে মালিন্য নাই, তমোগুণ নাই। প্রেমিক জাতিকে আজ মনে রাখিতে হইবে—প্রেমের মাঝে জগজ্জয়ী শক্তি নিহিত!

তীর্থ-রেণু

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

কামনাই বল, আর মন মাতানো সুন্দর জিনিষই বল, ওরা হচ্ছে ভূতের মত—মানুষকে পেয়ে বসে যেন। ভূত ছাড়ানো অর্থ কি জান?—ওই কামনার কামড় থেকে মানুষকে মুক্ত করা। তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে সব চেয়ে বড় সরষে-পড়া।

সন্ন্যাসীকে বলছি—

(১) প্রেমের সাহিত্য পড়োনা—উপন্যাস একদম ছোঁবে না।

(২) কাউকে খুব বেশী কাছে ঘেঁস্‌তে দিও না।

(৩) আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। তুমি তো কচি খোকা নও যে হাত ধরে চল্‌বে এখনো! চলার পথে আবার নিঃসঙ্গ মনে করা কেন নিজকে? একলা থাক্‌বে যখন, তখন নিজের মাঝে ডুবে থাক্‌বে।

(৪) কুমার গড়্‌ছে—আবার ভাঙ্গ্‌ছে। এমনি করে সুখ দিয়ে দুঃখ দিয়ে জীবন গড়ে উঠ্‌ছে।

(৫) চাইতে যদি হয় কিছু তো শুধ্ অন্তর-পুরুষকে। ওগো, তুমিই যে আলো ছড়িয়ে সবাইকে সুন্দর করে তুলছ গো!

(৬) যখন উপদেশ দিতে হবে, তখনই লোকসঙ্গ করবে। অন্য সময় কারু সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে হলে সাধারণ ভাবে কর্‌বে। একা একজনের সঙ্গে কখনো দেখা কর্‌বে না। তোমার সাম্‌নে যেন কেউ কোনো ব্যক্তিগত চর্চ্চা না করে। বাজেকথা নয়; খবর-কাগজের ধার দিয়েও নয়। লঘু-প্রকৃতির লোকের সঙ্গ নয়।

(৭) বিশেষ করে একটাকে সুন্দর বলে আহা-ম্মকেরা। সৌন্দর্য্য-স্পৃহা একেবারেই ছেলে-মানুষী। সব ফাঁকা আওয়াজ শুধ্! জ্ঞানীর চোখে সবই সমান সুন্দর।

(৮) সৌন্দর্য্য যদি একটা শক্তি হয়, তাহলে জ্ঞান তার চেয়ে বড় শক্তি নয় কি? জ্ঞানই তো আসক্তির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে আত্মাকে মুক্ত, বিবিক্ত করে।

(৯) মানুস অন্ধ হয়ে ছুট্‌ছে, তাই দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে মাথা ভাঙ্‌ছে তাদের।

(১০) যা অস্বাভাবিক, যা আধ্যাত্মিকতার বিরোধী, —যাকে ভালবাস, তার ঘাড়ে তা কখনো চাপিও না।

(১১) মনকে সর্ব্বদা কর্ম্মে নিযুক্ত রাখ্‌বে। তাকে বিশ্রাম দেবে না। কামনার জর হতে বাঁচবার এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়।

(১২) কামের নিদান হচ্ছে:— (ক) গরহজম (খ) মানসিক নিশ্চেষ্টতা (গ) বিষয়-সঙ্গ।

(১৩) ভগবান্ সবাইকে ভালবাসেন।

(১৪) জলের কলের কাছে কাকুতি মিনতি কর্‌লেও সে জল দেবে না। তার মাথায় যে প্যাচটা আছে, তা ঘুরিয়ে দাও—জল আপনি পড়্‌বে।

(১৫) সমুদ্রের একটা ঢেউ ছুঁলেই কি সমস্ত সমুদ্রকে ছোঁয়া হল না? তোমার পা ছুঁলে সমস্তটা দেহই কি ছোঁয়া হল না? তেমনি তোমাকে দেখ্‌লেও আমি ভগবান্‌কেই দেখি।

(১৬) ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। "অহং সর্ব্বত্র।" সমস্তটা জগৎই আমার। অতি হীন লম্পটও আমার পরম প্রীতির পাত্র।

(১৭) নিজেরা যে ছোট ছোট জগৎ সৃষ্টি করেছ, সেগুলো ভেঙ্গে চুরে গেল। প্রত্যেকটা বাড়ীই যেন একটা জগৎ!

(১৮) দূর কর সব ক্ষুদ্র সংসার! "বান্ধবাঃ শিব-ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবন ত্রয়ম্!"

যম এসে জিজ্ঞাসা করবে না—"তোমার কি আছে?" বল্‌বে—"তুমি কে?" জীবনের এই প্রশ্ন—"আমি কি?" "আমার কি আছে"—ও কথা নয়।

ভগবানে বিশ্বাসই সত্যিকার ধর্ম্ম নয়। মানুষের মাঝে যে শিবময় রয়েছেন, তাঁহার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরই হচ্ছে ধর্ম্ম।

রাস্কিন (Ruskin) বল্‌তেন—"মানব-মনের চাঞ্চল্যের দুটী হেতু। যা আছে, তার পরেও আরও কিছু চাই। যেখানে আছি, সেখান থেকে আরও কোথায়ও যেতে চাই।"

———

বোধি (Intuition)—বোধি হতে প্রজ্ঞা (Reason) আর প্রজ্ঞা হতে সংস্কার (Instinct)—এই হচ্ছে জ্ঞানের পথ। বোধি আর সংস্কারলব্ধ জ্ঞান প্রজ্ঞাজাত জ্ঞানের মতই নিশ্চয়াত্মক, বরং ওতে ভুলের সম্ভাবনা কম।

———

আত্মস্বরূপকে "জান্‌বার" "বুঝ্‌বার" চেষ্টাটা কি রকম জান?—আয়নার সামনা আর পেছনটা একসঙ্গে দেখার মতই আর কি!

———

"ঠিক কর্‌ছি তো?" —নিজকে এই প্রশ্ন করাটাই বেঠিক।

———

অভ্যাসেই ভেদের সৃষ্টি—নানাত্বের ভ্রান্তি! নইলে আকাশে যে উড়্‌ছে, জলে যে সাঁতার কাট্‌ছে, আর ডাঙ্গায় যে দুপায়ে হাঁট্‌ছে, সবই সেই মানুষ!

———

মানুষ ধৈর্য্য ধর্‌বে না। তাড়াতাড়ি গঙ্গায় একটা ডুব দিতে পার্‌লেই তার শুদ্ধি হয়ে যাবে যেন!

———

বড় লোকের দান আর বদান্যতা কেমন জান?—হাঁড়ির বাইরটা মেজে ঘসে ঝক্‌ঝকে করা হল বটে, কিন্তু ভিতরে যত রাজ্যের জুলুম আর বাড়াবাড়ি!

———

"ভালবাসার অর্থই হচ্ছে পূর্ণ মানবের জন্য ব্যাকুলতা—তাই নয় কি?" —হাঁ, কতকটা তাই বটে। সমে সমে আকর্ষণ—পূর্ণ স্বরূপের অনুসন্ধান।

———

কোথায়ও ব্যক্তিত্ব নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই, দায়িত্ব নাই। সবারই অন্তরে সেই এক মহাশক্তি; আর—"সোঽহম্!"

———

গানের প্রত্যেকটা পর্দ্দাকে তুলনা করে বুঝ্‌লেই রাগিনী বোঝা হয় না; কিন্তু হৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ ওঠে—স্বর শুনে, তাই ধরে রাগিনী বোঝা যায়। তেমনি কতকগুলি আইন খাড়া কর্‌লেই প্রকৃতিকে বোঝা যায় না—প্রকৃতিকে বুঝতে হয় তার পরিণামশক্তি (Becoming) দিয়ে—তার সৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে। মানুষের দেহটা তার অন্তরেরই অপরূপ প্রকাশ ও প্রতীক। সুরের এই পর্দ্দাটা হতে ওই পর্দ্দাটার উৎপত্তি, এ কথা বল্‌তে পারি না; কিন্তু এমন বল্‌তে পারি, যে ভাবের প্রেরণা হতে সুরের উদ্ভব, তার সঙ্গে প্রত্যেকটা পর্দ্দার কার্য্য-কারণ সম্পর্ক আছে বটে। আসলে ওই ভাবটাই হচ্ছে আদি ও অন্ত, ও হতেই সুরের উদ্ভব; আর সুরের সার্থকতাও শ্রোতার হৃদয়ে ওই ভাব সৃষ্টিতে। একটা বাড়ীর একতালাটা দোতালার কারণ নয়, বা দোতালাটা একতালার কারণ নয়। কিন্তু এই সব বাস্তব জগতের জিনিষ হলেও সমস্তটা ঘরের মূল হচ্ছে মনের একটা কল্পনা; তার সঙ্গেই এর সত্যিকার সম্বন্ধ। অথচ সে কল্পনা বাস্তবও নয়, সমভূমিতেও নয়।

———

জগতে যাঁরা নূতন বাণী নিয়ে আসেন, তাঁদের প্রতি গোঁড়াদের মনোভাব কি রকম জান?—

"ডাক্তারকে মেরে ভিজিটের টাকাটা রোগকে সেলামী দাও।"

গাছে যখন একটা পাতা বা কুঁড়ি মেলে, বসন্তে যখন একটী অঙ্কুর মাটী ঠেলে উঠ্‌তে চায়, তখন জান্‌বে, আশেপাশে অমনি লক্ষ লক্ষ অঙ্কুর প্রকাশের ব্যাকুলতা নিয়ে প্রতীক্ষা কর্‌ছে। একজন মানুষ যদি একটা নূতন সংস্কারের উন্মাদনা হৃদয়ে অনুভব করেন তো জান্‌বেন, তাঁর অজ্ঞাতসারে তখন শতসহস্র জন ওই বাণীর জন্যই উন্মুখ হয়ে আছে।

হৃদয়ে নবীন ভাবের জন্ম বড় পবিত্র—মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মতই পবিত্র। সে ভাবকে লুকিয়ে রাখা বিধাতারই অবমাননা। গতানুগতিকতার চেয়ে সাহস বড় জিনিষ।

বড় লোকরা হল যেন ডাঁশ, শূদ্র জাতি হল ঘোড়া, আর রাষ্ট্র হল যেন গাড়ী। মাছিটা ঘোড়ার পেছনে বসে কসে কামড় দিচ্ছে, আর ভাব্‌ছে—"আমি না হ'লে গাড়ী চল্‌ত নাকি?" তা বেশীক্ষণ ভাব্‌তে হল না,—ঘোড়ার লেজের একটা দাপট পেয়েই ভাবনার ইতি হয়ে গেল!

সমুদ্র বিশাল বটে; কিন্তু তাই বলে মাছের মত, ব্যাঙের মত মানুষ সমুদ্রে গিয়ে বাসা বাঁধে না। সভ্যতার লোনা জলে বাসা বেঁধে জীবনকে তিক্ত করার কোনও প্রয়োজন আছে কি?

আরব দেশে ধর্ম্মান্ধ লোকের নাকি অভাব নাই। তার কারণ আছে। জীবনটা তাদের নিতান্তই সাদাসিধা বলে স্বর্গটা বড় বেশী দূরে ঠেকে না, কিন্তু সভ্য মানুষ বড় হুঁসিয়ার—ধর্ম্মের বালাইকে সে কাছে ঘেঁস্‌তে দেবে না কিছুতেই। আত্মরক্ষার নানা ফন্দীই আছে তার। চোখের সাম্‌নে তুচ্ছ ব্যাপারের এমন ধূলাই সে পেঁটিয়ে তুল্‌বে যে আর কিছুই দেখাই যাবে না। যদিই বা ধূলা একটু কম্‌লো তো খবরের কাগজ তোমার চোখের সাম্‌নে উঁচিয়ে ধর্‌ল; কাজেই স্বর্গ হতে রথ যদি নেমেও আসে আমাদের দরুণ, তাকে দেখ্‌তে পাব, সে ভরসা বড় কম।

সভ্যতার আওতায় থেকে বেদান্তের সাধনা করা হচ্ছে, গামলা ভরা জল নিয়ে হাঁটার মত। জলটা নিশ্চল থাকুক, তাই চাই বটে, কিন্তু মানুষের জালায় তা হবার যো কি!

প্রকৃতি ব্যবসা করে না। মানুষের সত্যিকার স্বভাব হচ্ছে সূর্য্যের মত ছড়িয়ে দেওয়া। দিতে গিয়ে মানুষের চিত্ত উদার হয়, বন্ধন-মুক্ত হয়। আর নেবার বেলায় মানুষ হয়ে যায় ছোট—তার সমস্ত ভাবনা গুটিয়ে আসে ক্ষুদ্র অহং-এ। তখন তার ভাবনার আর সীমা নাই—দুঃখের আর অন্ত নাই।

যথাস্থানে থাক্‌লে পর সবই সুন্দর দেখায়। একটা জাহাজের পাল, মাস্তল, রশারশি, গলুই—সবই সুন্দর। অথচ এর কোনটাই সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার জন্য নয়। প্রয়োজনের তাড়নায় এসবের সৃষ্টি। এই যে কাছিটা, এর অন্য কোনও উদ্দেশ্যই নাই—এর চেয়ে সরু হলেও এটা চল্‌ত না, মোটা হলেও না। এই প্রয়োজনের তাগিদেই সবশুদ্ধ জাহাজটাকে সুন্দর করেছে। বড় লোকের অনুকরণ করে বাড়ী-ঘর পোষাক-আশাক সুন্দর

কর্‌তে পার্‌বে না—বরং তোমার পক্ষে ওটাই হবে অস্বাভাবিক। একটা দামী আসবাব কিনে তোমার গরীবের ঘরের মাচার ওপর রাখ্‌লে তা কখনো মানাবে না। কিন্তু সরল সাধুভাবে জীবন যাপন কর্‌লে ওই গরীবের ঘরই আলো হয়ে ওঠে—তোমার ছোট সংসারে যতটুকু দরকার ততটুকু পেলেই সংসারের শ্রী ফুটে ওঠে। তোমার যা বাস্তবিক দরকার, তাই ঘরে তোল। ওই হচ্ছে আর্ট! অপরের রুচির অনুকরণের মত কদর্য্যতা আর নাই।

সান্ধ্যগগনে বাহু মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে তরু শ্রেণী, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধবে মাটীর'পরে যে শিলাসন রচনা করেছি, পর্ব্বতে পর্ব্বতে যে স্বচ্ছন্দচারী পশুযুথ, এরা সব **আমার**, কেননা এরা আমারই সন্তান! শুধু তোমার একার দরুণ যদি এদের অপহরণ করো তো জেনো, তোমার প্রতি আমার অভিশাপ উদ্যত হয়ে আছে!

আইনের স্বত্ব হচ্ছে 'নেতি'র বিচার। এই স্বত্বের জোরে অপরকে তোমার সম্পত্তিতে ভাগ **দিচ্ছ না**—এই মাত্র। একজনের খুব ভাল একটা দূরবীণ আছে, কিন্তু সে সেটা ব্যবহার কর্‌তে জানে না, অপরকে সে তা ব্যবহার কর্‌তে **দেবে না!** আইনতঃ এই অধিকার তার আছে বটে। জমীজমা সম্বন্ধেও তাই। যদি সদ্ব্যবহার করার ইচ্ছা ও শক্তি থাকে, তাহ্‌লেই বলি **বিষয়**, নইলে ও হচ্ছে **বিষ!**

———)০(———

পূজান্তে

—*—

পূজা শেষ হইয়া গেল! কত উৎসাহে কত আনন্দে বাঙ্গালীর প্রাণ বর্ষব্যাপিয়া যে কয়টী শুভদিনের প্রতীক্ষায় ছিল, তাহা চকিতে আসিয়া চকিতেই মিলাইয়া গেল। ভাবিয়াছিল মাতৃহারা সন্তান, মায়ের স্নেহ-শীতল চরণ পরশে, মায়ের স্নেহ-স্তন্য পানে তাহারা তৃষিত প্রাণ শীতল করিবে, মায়ের চরণে আর্ত্তি জানাইয়া তাহার হৃদয় জোড়া হাহাকারের প্রশমন করিয়া লইবে। কিন্তু দৈবের একি বিড়ম্বনা। অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস! চিরপুঞ্জীভূত আঁধার হৃদয় ক্ষণিকার ক্ষণিক চমকে আলোকিত হইতে না হইতেই আবার তাহা আঁধারেই ডুবিয়া রহিল, এতদিনের আশা ভরসা সব হতাশার দীর্ঘশ্বাসে পর্য্যবসিত হইল!

বোধন হইতে বিসর্জ্জনে, আগম হইতে বিদায়ে, এই দিবস চতুষ্টয় সুদূর-

স্তিমিত স্মৃতির ক্ষণিক স্মরণে চাহিয়াছিল বাঙ্গালী সেই হাসি আপন মুখে ফুটাইয়া তুলিতে, চাহিয়াছিল সেই আনন্দ আপন বুকে অনুভব করিয়া আত্মহারা হইতে। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস, ওগো ব্যর্থ প্রচেষ্টা। প্রাণহীন দেহে কবে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে? শ্মশানে কবে সোনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়? দুঃখত্রয়াভিঘাতে যাহাদের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ, ত্রিতাপ জ্বালায় যাহারা অবিরত দহ্যমান, তাহাদের মুখে কি হাসি ফুটিতে পারে, তাহাদের বুকে কি আনন্দের সঞ্চার হইতে পারে? তা কি কখনও সম্ভব?—মৃতকঙ্কালের মুখে হাসির রেখা, এ যে বড় ভীষণ!

ছিল এক দিন, যখন বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দের সুধা-ধারায় পূর্ণ হইয়া বাহিরেও উপচিয়া পড়িত, ভিতরের আনন্দ উথলিয়া উঠিয়া বাহিরের জগৎকেও আনন্দময় করিয়া তুলিত। ছিল তখন সে শক্তির পূজারী, ছিল তখন সে আনন্দের দিশারী। ভিতরে বাহিরে তখন সে পূর্ণ ছিল, দৈন্য বলিয়া কিছু ছিল না, অভাব বলিয়া কিছু ছিল না। শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া আনন্দের পসরা জগৎকে বিলাইবার অধিকার লাভ একদিন সে করিয়াছিল, ভারতের পূর্ব্ব গগনে এইরূপে একদিন সুখ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল। সে যে বহু দূরে, ওগো বহুদূরে। আজ আর সে দিন নাই, আজ তাহা স্বপ্নবৎ! ভবভূতির ভাষায়—"তে হি নো দিবসা গতাঃ!"

বলিতে ছিলাম, মৃতের মুখে হাসির রেখা বড় ভীষণ। তাই ভীষণ আকারেই দেখিলাম শারদোৎসবে বাঙ্গালীর মুখে হাসি! পেটে তাহার অন্ন নাই, পরিধানে তাহার বস্ত্র নাই, মনে তাহার আনন্দ নাই, প্রাণে তাহার শক্তি নাই। কেমন করিয়া, ওগো কেমন করিয়া বল তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে? তথাপি যে পূজার সময় তাহার মুখে হাসি দেখিলাম, এ শুধু বাহিরের কৃত্রিম রূপ, এ হাসি অন্তরের হাসি নয়, হাসি দিয়া অন্তরের জ্বালা নিবারণের এ নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। নতুবা অন্তরে যে তাহার হাসির লেশ মাত্র নাই! অন্তরের অনির্ব্বাণ জ্বালাকে সে চাহিয়াছিল বাহিরের হাসির প্রলেপ দিয়া ঢাকিতে, বারিকণা নিক্ষেপে সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে।

চিরন্তন প্রথানুযায়ী মায়ের বোধন হইল, প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল না; প্রাচীন যুগের ঋষিদের আদর্শে মায়ের পূজা হইল, পূজার ফল লাভ হইল না। সন্তান যে আঁধারে ছিল, সেই আঁধারেই রহিয়া গেল। মা আসিল না, সন্তানের তপ্ত-অশ্রু স্নেহকর-স্পর্শে মুছাইল না। অবিশ্বাসী বলিয়া উঠিল—মা নাই!

সন্তান জানিত, মা আসিলেই তাহার সকল অভাব মিটিবে, মায়ের স্নেহ-শীতল

স্পর্শে তাহার ব্যথা বেদনা সব ঘুচিয়া যাইবে। তাই সে বাহিরের মাটী দিয়া মায়ের মূর্ত্তি গড়িয়া ছিল, বাহিরের মন্ত্র পড়িয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, বাহিরের পশু আনিয়া মায়ের চরণে বলি দিয়াছিল, আবার গতানুগতিক প্রথায় বাহিরে ঘটা করিয়া মায়ের বিসর্জ্জন দিয়া ভাই ভাই আলিঙ্গন করিয়া বাহিরে মিলনের অভিনয় দেখাইয়া ছিল।—প্রাণ তাহাতে জাগে নাই, হিংসা দ্বেষ তাহাতে বিদূরিত হয় নাই, প্রেমের বন্ধনে সকলকে বাঁধে নাই।

—যাহা বাহিরের তাহা বাহিরের। আমরা বাহির দিয়া মাকে চাহিয়াছিলাম, বাহিরেই মাকে পাইয়াছি, অন্তর দিয়া চাই নাই, তাই অন্তরে পাই নাই। অন্তরের ধন তাই অন্তর হইতে আরও অন্তরে—ওগো আমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মা কি আমাদের অন্তর হইতে অন্তরে চলিয়া গিয়াছেন, না আমরাই মাকে ছাড়িয়া, আত্মাকে ভুলিয়া, অন্তর হইতে বাহিরে বাহির হইতে আরও বাহিরে ছুটিয়া চলিয়াছি, ওগো মাতৃসত্তায় অবিশ্বাসী সন্তান! তোমার উদ্দাম গতি ক্ষণেকের তরে স্থগিত রাখিয়া স্থির চিত্তে একটু সেই কথাটাই ভাব।

আমরা নাকি শক্তিময়ীর সন্তান, আমরা নাকি শক্তির উপাসক! কই গো আমাদের শক্তি কই! আমাদের দেহে শক্তি কই, আমাদের মনে শক্তি কই, আমাদের প্রাণে শক্তি কই? নাই নাই ওগো কিছুই নাই। আমরা যে সকল রকমে কাঙ্গাল! শক্তিময়ীর সন্তান হইয়া আমরা পরের দুয়ারে শক্তিভিক্ষা করি, আনন্দময়ীর আনন্দের দুলাল হইয়া বাহিরে আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াই! এই কি শক্তিময়ীর সন্তানত্বের পরিচয়?

কেন এমন হইল! শক্তি-সাধক কেন শক্তি হইতে বঞ্চিত হইল? —ক্ষুদ্রত্বের অভিমানে ও বৃহত্তের বিস্মরণে! শক্তিময়ী মা আমাদের যে টুকু শক্তি দিয়া কারবার করিতে দিয়াছিলেন, সেই শক্তিতে অন্ধ হইয়া আমরা শক্তির উৎসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন শক্তির অভিমানে মত্ত ছিলাম, তাই আমাদের শক্তির ভাণ্ডার দিন দিন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, আমরা রাজরাজেশ্বরীর সন্তান হইয়াও আজ পথের ভিখারী হইয়াছি।

কি বাহিরে, কি অন্তরে, সর্ব্বত্রই দেখি আমাদের শক্তির অভাব। বাহিরে রাষ্ট্র-বিপ্লব, প্রলয় প্লাবন, মহামারীর প্রলয় নর্ত্তন দেশগত সমষ্টি জীবনকে বিধ্বস্ত করিতেছে, আর ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের অত্যাচার, হিংসা-দ্বেষের প্রবল উৎপীড়ন, কাম-কাঞ্চনের প্রবল আসক্তি আমাদের ব্যষ্টি জীবনকে সত্যালোক হইতে বঞ্চিত করিয়া আঁধার হইতে আঁধারে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

ওগো মাতৃঅঙ্কচ্যুত, মোহমদিরাগ্রস্ত

বিশ্বজননীর সন্তান! শক্তিময়ীর সন্তান হইয়াও তোমাদের মাঝে শক্তির স্ফুরণ হইতেছে না কেন, অসুর নাশিনীর আদরের ছুলাল হইয়াও ভিতরে বাহিরে তোমাদের উপর অসুরের অত্যাচার প্রশমিত হইতেছে না কেন?—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মাটী দিয়া "মা"–টীকে গড়িয়া তোমরা ভাবিতেছ, আমরা মায়ের উপাসক, শক্তির পূজারী। কিন্তু এদিকে যে তোমরা ভিতরে বাহিরে সর্ব্বাবস্থায় শক্তি শূন্য হইতে চলিয়াছ, তাহার খবর রাখ কি? হায় বাহ্যপূজাসক্ত সাধক! তুমি শুধু মাটীর পেছনেই ছুটিলে, মা-টীকে তো দেখিলে না; কেমন করিয়া মাকে পাওয়া যায়, কেমন করিয়া মায়ের শক্তি সন্তানে সঞ্চারিত হয়, তাহার খোঁজ করিলে না; কেমন করিয়া পুত্র-স্নেহাতুরা মা অসুরকুল ধ্বংস করিয়া অসুর নিপীড়িত সন্তানদের নির্ভয় করেন, তাহার সন্ধান লইলে না, অথচ তোমরা শক্তি-উপাসক! ওগো, শক্তি তো জড় নয়, সে যে নিত্য চৈতন্য-ময়ী! তোমরা দিন দিন জড়ত্বের মোহেই ডুবিয়া পড়িতেছ, ইহাতে কি বুঝিব না তোমরা জড়েরই উপাসনা করিতেছ, চৈতন্য-ময়ীকে চাও নাই! যাহাকে চাও নাই, তাহাকে পাও নাই যাহা চাহিয়াছিলে, তাহাই পাইয়াছ। তাই দিন দিন জড়ত্বের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া চৈতন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াই চলিয়াছ।

এই যে আমরা ভিতরে বাহিরে নির্জ্জিত নিপীড়িত হইতেছি, তাহা কি প্রকৃতই আমাদের অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা কি বাস্তবিকই আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে? আমরা কি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছি যে বাস্তবিকই আমরা নিপীড়িত! না—কখনই না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আর আমরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। এই মর্ম্মন্তুদ ব্যথায় অধীর হইয়া সম্মিলিত প্রাণে শক্তিময়ীর চরণে লুটাইয়া পড়িতাম, সমবেত কণ্ঠে—"পরিত্রাহি" বলিয়া পাষাণীর পাষাণ-হৃদয় গলাইয়া দিতাম। মা-ও "মাভৈঃ বৎস!" বলিয়া ছুটিয়া আসিত, আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইত।

কিন্তু সে বোধ এখনও আমাদের জাগে নাই, আমরা যে প্রকৃতই নির্জ্জিত—তাহা আজিও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বাহিরে রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কত নির্য্যাতন, ভিতরে ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবল উৎপীড়ন প্রভৃতি দ্বারা মা আমাদের উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগকে মোহঘোর হইতে চিরতরে উদ্ধার করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্রা হইয়া উঠিয়াছেন। ওগো, এ নির্য্যাতন, এ অত্যাচার অমঙ্গল প্রসূত নয়, মঙ্গলময়ী মা আমাদের উপর করুণাধারা ঢালিবেন, ইহা তাহারই পূর্ব্ব-নিদর্শন। এততেও কিন্তু আমরা জাগিতেছি না, জাগিয়াও আবার

ঘুমাইয়া পড়িতেছি। জানিয়া রাখিও জড়তমোগ্রস্ত মুগ্ধ সন্তান। তোমার এ সুখের মোহ থাকিবে না, তোমার এ সুখের মেলা থাকিবে না। শক্তিময়ীর প্রবল আঘাতে সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে—মায়ের আমার দিব্য অঙ্গচ্ছটায় মোহ কুহেলী চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। সে দিন দেখিবে কেউ নাই, জগতে তোমার আপন বলিতে কেউ নাই; যাহাদিগকে তুমি এতদিন অতি আপনার বলিয়া ভাবিয়াছিলে, তাহারাই তোমার কত পর, তোমার আপনার হইতেও আপনার জনকে তাহারা ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, আলো হইতে বঞ্চিত করিয়া তোমাকে আঁধারে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। যেদিন তোমার দৃষ্টি খুলিবে, বাহির হইতে মুখ ফিরাইয়া সেদিন তুমি অন্তর্ম্মুখী হইবে, সেই দিন তুমি দেখিবে, জ্যোতির্ম্ময় মাতৃঅঙ্কেস্থিত তুমি জ্যোতির্ম্ময় সন্তান!

তোমরা যে সত্যই নির্জ্জিত, উৎপীড়িত, প্রথমে তাহাই অনুভব করিতে চেষ্টা কর, তোমাদের সকলের লক্ষ্য এক হউক, তোমাদের সকলের পথ এক হউক। তখন তোমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জিত হইবে, তোমরা এক সমভূমিতে দাঁড়াইবে, তোমাদের মন এক হইবে, তোমাদের প্রাণ এক হইবে। সেই সম্মিলিত প্রাণ-মনের অনির্ব্বাণ আকুলতাই মায়ের যথার্থ রূপ দিবে, তখন দেখিবে, মাকে মাটী দিয়া গড়া যায় না, মাকে গড়িতে হয় মন-প্রাণ দিয়া। ব্যষ্টিত্বের মায়া ছাড়িয়া সমষ্টিতে তাহা বিসর্জ্জন দিলেই মহাশক্তির উদ্ভব হয়।

অসুরদের প্রবল উৎপীড়নে দেবতারাও নির্জ্জিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও পুনঃ-পুনঃ স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে হইয়াছিল। যতদিন তাঁহারা স্ব স্ব ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া অহমিকার প্রভাবে অসুর-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, আপন আপন ব্যষ্টি অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতেই একা একা সচেষ্ট হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা অসুরদের নিকট পরাজিতই হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু যখনই সমবেতভাবে এ নির্য্যাতন তাঁহাদের সমষ্টি প্রাণে আঘাত দিল, যখনই তাঁহারা ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিতে আহুতি দিলেন, যখনই তাঁহারা বহু ছাড়িয়া এক হইলেন, তখনই তাঁহাদের মাঝে মহাশক্তির আবির্ভাব হইল—বিন্দুর সমষ্টিই যে সিন্ধু, শক্তির সমষ্টিই যে মহাশক্তি! দেবতারা আপন আপন ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া এইভাবে মহাশক্তিকে গড়িয়া তুলিলেন, আপনার বলিতে যাহা কিছু ছিল নিঃশেষে সব তাঁহাতে ঢালিয়া দিলেন। এই দেবীই অবশেষে শত্রু নির্জ্জিত করিয়া দেবতাদের স্বাধিকারে স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই তো মায়ের বোধন, এই তো মায়ের পূজা, এই তো ক্ষুদ্রত্বের বিসর্জ্জন! যেদিন

আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রত্বের বিসর্জ্জন দিতে পারিব, সেইদিন আমরা বি-মল হইয়া ভাই ভাই পরমানন্দে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইতে পারিব। ইহার পূর্ব্বে—আলিঙ্গন আলিঙ্গন নহে, মৃত প্রথার অনুসরণে সত্যের অপলাপ মাত্র।

যেদিন আমাদের ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জিত হইবে, যেদিন আমাদের মন-প্রাণ এক হইবে, সেইদিন গড়িয়া উঠিবে মায়ের রূপ। এই মায়ের চরণে আমাদের ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন দিয়া আমরা চাহিয়া লইব রূপ, চাহিয়া লইব যশ, চাহিয়া লইব জয়। যতদিন না নির্জ্জিত দেবতাদের মত আমাদের মন প্রাণ এক হইবে, যতদিন না আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ দমিত হইবে, ততদিন আমরা কি ভিতরে, কি বাহিরে অসুর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইব না।

তাই বলি, এস সাধক, এস বন্ধু, এস ভাই, আমরা পরস্পর হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া, আমরা যে একই মায়ের সন্তান এই বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া মহা প্রাণের—মহাশক্তির উদ্বোধনে সচেষ্ট হই। আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া মহাপ্রাণের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। যাহা কিছু আছে, সু-কু সব তাঁর চরণে উপহার দিয়া তাঁহার পূজা করি, তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যাই! তাহা হইলেই আমরা বিজয়ী হইব, বিজয়া মায়ের বিজয়-বার্ত্তা বিশ্বে বিঘোষিত করিতে পারিব।— এস আজ সমবেত কণ্ঠে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলি—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তি হারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

——(০)——

লক্ষ্মী পূর্ণিমায়

—•—

উৎসব হয় বিশেষ উপলক্ষ নিয়ে, তাই উৎসব নিত্যিকার নয়—বিশিষ্ট দিনের! উৎসব করি আমরা আনন্দের ব্যাপার নিয়ে, শুভ বিষয়কে উপলক্ষ করে। আবার উৎসব একলার নয়, উৎসবের আনন্দ একা সম্ভোগ কর্‌বার জিনিষ নয়—দশজন মিলে-মিশে যে আনন্দ, তাই উৎসবের আনন্দ। হিন্দুর এমন কতকগুলো পূজা আছে, যা সকলে করে না; বিশিষ্ট সমাজের মাঝেই তা আবদ্ধ। আবার এমন কতকগুলো পূজা আছে, যা নির্ব্বিশেষে প্রায় সকলের মাঝেই প্রচলিত। উৎসব হয়, আনন্দ পাই আমরা সে মহাপূজার দিনেই, যাতে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার নয়—সবাই

আনন্দে অবাধে যোগদান করতে সক্ষম হয়। গুটি-কতক লোক নিয়ে যে আনন্দ সঞ্চার হয়, তাকে বলে উৎসব, আর বহুলোকের সমাবেশে যে অব্যক্ত আনন্দের সৃষ্টি হয়, তাকে বলে মহোৎসব। এমনি সব ব্যাপারে; সাহিত্যেও রয়েছে, কাব্য আর মহাকাব্য। আজ যাঁর পূজোপলক্ষে আমরা সকলে একত্র হয়েছি, এ-ও বলতে গেলে একটা সার্ব্বভৌম উৎসব। মনে হয়, প্রায় সকল জাতির মাঝেই যেন এ পূজার প্রচলন আছে। আজ ঘরে ঘরে যাঁর আবাহন হয়েছে, এ আমাদের মা লক্ষ্মী বিষ্ণুর বিক্ষেপ শক্তি, অথচ জগৎ-স্থিতির হেতু। আয়োজনের আড়ম্বরে, বাহুল্য কথায় যেন আজ বিশেষ অনুষ্ঠানটীর কথা বাদ না পড়ে। আনুসঙ্গিক অনেক কথাই হয়ত এসে পড়বে, কিন্তু বৃথা বাক্যজালে যেন উৎসবের মূল কারণটীকে আবৃত না করি। মোট কথা, লক্ষ্যের প্রতি সচেতন থাক্লেই পথভ্রষ্ট হবার কোন আশঙ্কা থাকে না, অথচ চলি কিন্তু পথ দিয়েই।

চণ্ডীতে পেয়েছি, লক্ষ্মী, শ্রী, কান্তি এ সবই সেই মহাশক্তিরই আংশিক বিকাশ। আজ যাঁর পূজায় সকল ভক্তই নিরত, সে-ও মায়ের এক শক্তিরই বিকাশ। শক্তিকে যখন ভক্তির আবেগে রূপের মাঝে ফুটিয়ে তুলি, তখনই তাঁকে এক এক নামে ভূষিত করি। যাঁর পূজা-অর্চ্চনা নিয়ে আজ সকলেই ব্যস্ত, তিনি হচ্ছেন আমাদের ঐশ্বর্য্যময়ী মা লক্ষ্মী। জগৎ সংসারের ভ্রান্তির মূল কারণই হচ্ছেন ইনি! ইনি আছেন বলেই জগৎও আছে। কেননা মানুষ বেঁচে আছে ধন-জন-টাকা-কড়ির আশায়—সবাই এ সবের মোহে আবদ্ধ। ঘুম ভেঙ্গেছে আর কয়জনার? গর্ব্বের কারণ যে ধন-সম্পদ, এ আস্ছে কোথা থেকে?—মা লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে।

ধন-সম্পদ্ পেয়ে বিলাসী হয়ে পড়ি আমরা। এ পথ প্রবৃত্তির পথ, ভোগের পথ; এতে মুক্তি নাই। তাই আর্য্য ঋষিদের চাওয়ার মাঝে প্রবৃত্তির তাড়নার চেয়ে, নিবৃত্তির স্বচ্ছ উদ্দীপনাই দেখ্তে পাই বেশী। তাঁরা ঋষি হয়েছিলেন ত্যাগ করে—ভোগ করে নয়। তাই তাঁরা বল্তেন,—"আত্মানং বিদ্ধি"---আত্মাকে জান, যাঁকে জান্লে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, ছুটাছুটির প্রবৃত্তি দমে যায়। বিলাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীর ও আত্মত্যাগী বীরপুরুষেরও অভাব না ঘটে, তাহলেই জাতি টিকে থাক্তে পারে, সবদিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চল্তে পারে। তা না হলে কেবল ব্যভিচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, জাতির মরণ সন্নিকটে। পাশ্চাত্য জাতি যে এখনো প্রবল বিক্রম নিয়ে টিকে আছে, তার কারণ, তাদের মাঝে এ সামঞ্জস্যটুকু আছে বলে।

যেমনি তারা বিলাসী—তেমনি নিষ্ঠাবান্। এরা আমাদের মত লক্ষ্মীর শক্তিতেই বিমুগ্ধ নয়, লক্ষ্মীকে জান্তে চেষ্টা করছে—যেখান থেকে সমস্ত সম্পদের উদ্ভব; এই টুকুনই ওদের নিষ্ঠা! এরা চায় চিরপ্রভুত্ব, তাই বিলাসে মগ্ন হয়ে সমস্ত শক্তির অপব্যয় করে শক্তিহীনের মত বেঁচে থাক্তে চায় না। মরে মরে যে বেঁচে আছি, এটাও যেন আমাদের গর্ব্ব করার বিষয়। দুর্ভিক্ষে আমরা হাহাকারে প্রাণত্যাগ করছি—কেন? আমাদের কিসের অভাব? ভারতে কি জায়গার অনটন হয়েছে, এখনই কি আমাদের দেশের ভূমির উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস হয়ে গিয়েছে? যেমন তেমন করে বীজ ছড়িয়ে দিলেও যে আমরা গোলাভরা ধান পাই। ক্ষুধা-টাকে ভুল্তে পার্লে, না খেতে হলে, নিষ্ক্রিয়তা সাজ্ত, কিন্তু দুর্ব্বল জাতির পেটে যে প্রচণ্ড ক্ষুধা!

মূর্ত্তি গড়ে একটা লোক দেখানো বা চিরপ্রচলিত

আচার রক্ষার জন্যই আমাদের পূজা। শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমরা এর দরুণই। আমাদের ফসল হচ্ছে না, গোলা শূন্য, পুকুরে মাছ নেই, পরবার কাপড় নেই, গাভীর দুগ্ধ হতে বঞ্চিত—এই কি শক্তি-উপাসক জাতির পরিচয়? উপাসনা যদি সঠিক হয়, তাহলে ইষ্টের শক্তি সাধকের মাঝে আপনি সঞ্চারিত হয়। লক্ষ্মীর পূজাতে আমরা সম্পদ্‌শালী হয়ে উঠ্‌ব, তবে না বুঝ্‌ব পূজা আমাদের ঠিক ঠিক ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে?

লক্ষ্মীর পূজক বল্‌তে গেলে আজ পাশ্চাত্য জাতি। তারা মূর্ত্তি গঠন করে না বটে, কিন্তু সত্যিকার ভাব তাদের মাঝেই ফুটে উঠেছে। কি বলিষ্ঠ দেহ, উল্লসিত মুখ, কি কর্ম্মতৎপরতা! লক্ষ্মীবন্ত জাতির পরিচয়ই বটে। নির্গুণ সাধনার চেয়ে সগুণ সাধনাই আমাদের বিশেষ প্রায়োজন হয়ে পড়েছে আজ। এখন আমাদের ঐশ্বর্য্যময়ী মা লক্ষ্মীর উপাসনাই কর্‌তে হবে। ধন-জন, সহায়-সম্পদ আমাদের বেড়ে উঠুক, তবে না ত্যাগ! লক্ষ্মীর বাহন হচ্ছে পেচক। এতে মা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কুৎসিত জিনিষকেও অবজ্ঞা কর্‌তে নেই। লক্ষ্মীবন্ত সংসারে এতটুকু জিনিষেরও অপব্যয় হয় না। অনেকে একে কৃপণতা বলে আখ্যা প্রদান করেন, কিন্তু আমি মনে করি, জাতির মাঝে অন্তঃসারশূন্য উদারতার চেয়ে একটু আধটু বরং কৃপণতার ভাবই আসুক। মাকে পেতে হলে নিষ্ঠার প্রয়োজন, অনাবশ্যক আড়ম্বরের উচ্ছেদ চাই। মা লক্ষ্মী যে সংসারে আবির্ভূতা হন, সে সংসার ধনে জনে, মানে-গৌরবে সব দিক দিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে। যে পর্য্যন্ত আমাদের দারিদ্র্য-দুঃখ অপসারিত না হবে, সে পর্য্যন্ত মা লক্ষ্মী এসেছেন, মায়ের পূজা আমরা আন্তরিকভাবে করছি, এ সবই মিথ্যা।

লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাত্রে ছেলেরা বিচিত্র রকমের সাজ পোষাক পরে আনন্দ প্রকাশ করে, পেট ঠাণ্ডা থাকে বলে। দিন দিন যে আহারের সংস্থানই হয়ে উঠ্‌ছে না আমাদের, আনন্দ আস্‌বে কেমন করে? সবাই আজকাল পল্লীগ্রাম ছেড়ে সহরবাসী, পল্লী আজ শ্রীভ্রষ্ট! শস্য রোপন করে কে? অগ্রহায়ণ পৌষের সোনালী রংএর মাঠের দৃশ্যই বা কে রচনা করে? আজ সবাই বাবু, কে যাবে মাঠে লাঙ্গল ধর্‌তে?

মাকে তো আমরা চাই না, তাই পাই না। এখন আর পল্লীতে, সারাদিন মাঠে খেটে এসে যে কৃষকের সান্ধ্য-মজলিস্‌, নানা পুরাণো গল্প কথন এ সব আনন্দের ব্যাপার সবই উঠে গিয়েছে। ঘরে খোরাকী না থাকায়, ক্লান্তিতে অবসাদে সবাই আচ্ছন্ন।

মাকে আন্‌তে হলে, আমাদের ভিতর চেষ্টা উদ্যমকে উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌তে হবে। দুর্ব্বলের কান্না শুনে এ মায়ের হৃদয় গলে না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে খাট্‌বে, তার বাড়ীতেই মা লক্ষ্মীর আগমন! ভাবুকতায় যেদিন থেকে বাঙ্গালী ঢ'লে পড়েছে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের বিরোধ বাধিয়ে বসেছে—সেদিন থেকেই মা লক্ষ্মী অন্তর্ধান হয়েছেন। শত সমুদ্র পার হয়েও আজ শুধু প্রাণের টানে, কর্ম্মপ্রচেষ্টা, উদ্যম-উৎসাহ দেখে মা পাশ্চাত্য জাতির মাঝে দেখা দিয়েছেন। মা লক্ষ্মী নাকি চঞ্চলা—নিরাশ হবার কি আছে? তোমরাও উৎসাহ-সহকারে কর্ম্মে লেগে পড়—আবার মায়ের আগমনে সব দিক্ পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে।

কল্পনাকে আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, তা না-হলে যে দুর্দ্দশা হয়েছে আমাদের, এতে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। বাংলার মাঠে সোনার ধান, পুকুরে মাছ, ঘরে ঘরে অপর্য্যাপ্ত দুধ—এসব গেল

কোথা ? আজ মাকে দেখ্‌ছি না কেন ? আর দেখবই বা কেমন করে উদ্যমবিহীন ? জাতির মাঝে মা লক্ষ্মী কেমন করে থাক্‌বেন ? আমরা নির্গুণ সাধক—কিন্তু পেটে শতগুণ ক্ষুধা ! ক্ষুধা আছে, কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করতে গেলেই তো সকাম কর্ম্ম হবে—সুতরাং পরের কৃপাপ্রার্থী হয়ে দিন কাটানোই আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়।

বিদেশী আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারে অযোগ্য-বলে মনে করে ; তারা ভাবে, এবং স্পষ্ট বলেও— We are too good for this world ! সাধারণ লোকের উপরই এ বদ্‌নাম, আর স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীদের তো কথাই নাই ! কিন্তু আশার কথা, আজকালকার সাধু সন্ন্যাসীরা শুধু Idealistic নয়, শুধু abstract idea নিয়েই তাঁরা বন-জঙ্গলে বসে থাক্‌ছেন না। তাঁরাও বের হয়ে এসে জন-হিতকর কার্য্যে বাকী জীবন নিয়োজিত করছেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভাবের সঙ্গে কর্ম্মের কোন অসামঞ্জস্য দেখেন না, তাই আজকালকার সঙ্ঘ, মঠ, সবের মাঝেই একটা ক্রিয়াশীলতার ভাব ফুটে উঠেছে। তাঁরা নিজ হাতে কোদাল ধর্‌ছেন, লাঙ্গল চালাচ্ছেন। তাঁরা প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন, লক্ষ্মীকে আনা, শ্রী ফুটিয়ে তোলা—সবই আমাদের নিজের হাতে। ইহজীবনবিমুখতার ভাব আর নাই। কিন্তু এখনো যথেষ্ট গলদ রয়েছে। নিষ্কাম ভাবে, অভিমান শূন্য হয়ে কর্ম্ম করার লোক খুবই অল্প-সংখ্যক। এই বিরাট দেশের তুলনায় খেটে-খুটে একটা কিছু দাঁড় করাবার মত লোক microscopic minority—মানে এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাদের দেখ্‌তে হয়। জাতিকে লক্ষ্মীবন্ত করে তুলবার মত নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর সংখ্যা এখনো খুব কম।

উদ্দেশ্য ও উপায়ের মাঝে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা চাই—তবেই সিদ্ধকাম হওয়া যায়। যে যা হতে চায়, বাল্যকাল থেকেই সে তার পথ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে দেয়। ইউরোপ চায় স্বাধীনতা, তাই তাদের পাব্‌লিক স্কুলে, ক্রিকেট খেলায়, রণজয়ের চর্চ্চা করে লক্ষ্যের পথে দিন দিন তারা অগ্রসর হয়ে চলছে। তারা দরিদ্র হয়ে থাক্‌তে চায় না, পরের দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে অসম্মানী হয়ে ফির্‌তে চায় না, তাই ধনের জন্যও দিবারাত্র তারা পরিশ্রম করে মর্‌ছে। তাদের জীবনটা ব্যক্তিগত নয়, সমাজের দরুণ, দেশের দরুণ তাদের প্রাণ কাঁদে বেশী। দেশের প্রতি কি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাদের !

আমাদেরও এমন একদিন ছিল, যখন, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে কোন দিক দিয়ে আমাদের গলদ বা দুর্ব্বলতা ছিল না। বড় বড় যজ্ঞ করে কত ঘি-ই না ঢাল্‌তেন ঋষিরা, আর কত পুরোডাশই না তৈরী কর্‌তেন। লক্ষ্মী তখন ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই, পূজায়, অনুষ্ঠানে কোন দিক দিয়েই অর্থে, সামর্থ্যে কার্পণ্য প্রকাশ পেত না। সব জিনিষেরই প্রাচুর্য্য ছিল, তাই ব্যয় করতেও আর হিসাব নিকেশের এত প্রয়োজন হ'ত না।

জাতি যখন সবল থাকে, তখন তার সব দিক্ দিয়েই সবলতা প্রকাশ পায়। এভারেষ্ট উল্লঙ্ঘন কর্‌বার জন্য কত ইউরোপীয়ান বৎসর বৎসর প্রাণ-ত্যাগ কর্‌ছে—কিন্তু কিছুতেই তো তাদের হটাতে পার্‌ছে না। বিলাসী জাত বলে তাদের গাল দিই, খেটে খুটে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাক্‌বে, এতে হিংসা করে মর্‌লে তাদের কি হবে ? দুর্ব্বলের মনে সর্ব্বদাই দারুণ নিরাশা লেগে আছে, আর সবল অজস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনায় উদ্বেলিত। সব নিয়ে গেল, পাশ্চাত্য সভ্যতায় সকল সভ্যতাকে গ্রাস করে বস্‌ল—এ চিৎকার করে কি হবে ? যার শক্তি আছে, সে অনেক কিছুই এমনি বেমালুম আত্মসাৎ

করে নিতে পারে—তার দরুণ বসে বসে গালে হাত দিয়ে দুঃখ করলে কি হবে? লক্ষ্মী যাদের সহায়, অপরে চুরি করে আর কত ধন নিবে তাদের? আমাদের যে দুর্দ্দশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে মা লক্ষ্মী ভারতে আছেন—এ কথা মনেই হয় না। তবে একটু একটু ক্ষীণ আশার রেখা প্রাণের মাঝে বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে যাচ্ছে, কেননা অনেক বড় বড় লোকের পল্লীগ্রামের দিকে নজর পড়েছে, তাঁরা কৃষির উন্নতি কিসে হয় সে চিন্তায় ব্যস্ত—অনেকে লোকশিক্ষার্থ নিজ হাতে হালচাষও আরম্ভ করেছেন।

মা লক্ষ্মী কল্পনায় তুষ্ট নন, যে জাতি প্রাণপণে খেটে মরছে, তাদের মাঝেই মায়ের আবির্ভাব! মা কারও একলার সম্পত্তি নন, যে প্রাণ দিয়ে খাটবে, সে-ই মা লক্ষ্মীর প্রিয়-পুত্র হতে পারবে। 'আত্মানং বিদ্ধি' এ তো বড় কথা, আত্মারাম ঘটে থাকলে তবে তো আত্মাকে জানা! অভাবে-অনটনে প্রাণ যায় যায় হয়েছে। কিন্তু তবুও কারও মাঝে সচেষ্ট ভাব আসছে না। ফকিরি যুগটা কিন্তু জাতির দুর্ব্বল অবস্থায় উদ্ভব হয়েছে—ঋষি-সমাজে এ ভাব আদপে দেখতে পাই না। ঋগ্বেদের প্রার্থনার মন্ত্রে যে কেবল অসংখ্য কামনার কথা! আমাকে বেশী করে ধন দাও, টাকা দাও, অশ্ব দাও, গাভী দাও, যাতে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হতে পারি।

Tit for tat—এই ধর্ম্ম। অবশ্য কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অর্জ্জুনের মত ধুরন্ধর যোদ্ধার মনেও দুর্ব্বলতা এসেছিল, শ্রীকৃষ্ণের মত বীর্য্যবান গুরু পেছনে ছিলেন বলেই রক্ষা, তা না হলে তো অর্জ্জুনও পরম বৈষ্ণব সেজেছিলেন আর কি! পরের অত্যাচার সহ্য করেও নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হবে আমাদের—এটা মেয়েলী ভাব, কিম্বা গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছলে নাকি মানুষের এইরূপ নির্ব্বিকার ভাব আসে। বলতে গেলে, গৌরাঙ্গদেবের যুগে যে প্রবল ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে সঙ্গেই অবসাদপ্রসূত দুর্ব্বল-ভাবুকতারও সৃষ্টি হয়। হরিদাস প্রভু ২২ হাজার বেত্রাঘাত নীরবে সহ্য করে গেলেন। একজন, দু'জন এরূপ ক্ষমার বা সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখালে ক্ষতি নাই—বরঞ্চ একদিক দিয়ে ইহা গৌরবের বিষয়, কিন্তু সমস্ত জাতিই যখন দয়াপরবশ হয়ে নিজের ভাণ্ডার অবাধে অপরের হাতে দিয়ে ভিক্ষুক সেজে বসে, নীরবে অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করতে থাকে, তখন থেকেই জাতির অধঃপতন, লক্ষ্মী তখন সেখানে তিষ্ঠিতেই পারেন না। ভাবে-কর্ম্মে যেদিন থেকে আমাদের মাঝে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হল, সেদিন থেকেই আমরা ৺মাকে হারিয়েছি। সাধু হলে কর্ম্মের সঙ্গে অহিনকুল সম্পর্ক হবে—এ কু-ধারণা যেদিন থেকে মাথায় ঢুকল, সেদিন থেকেই সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতিও সবের একটা অবজ্ঞার ভাব এসে গেল। তা না হলে সন্ন্যাসীরাই যে রাজগুরু, রাজ্য চালনার scheme যে রাজারা তাঁদের কাছ থেকেই গ্রহণ করতেন। গুরু রামদাসের আদেশ উপদেশ গ্রহণ করে তবে শিবাজী রাজ্য পরিচালনা করতেন। তোমার আমার মত ভিখারীকে ত্যাগী বলা ভুল; ত্যাগী ছিলেন বুদ্ধদেব—রামচন্দ্র। যার কিছু নাই, সে আবার ত্যাগী হয় কেমন করে?

ছোট বড় নির্ব্বিশেষে অসময়ে পেন্সন নেবার দাবী—কেউ খাটার সময় খাটবে না, অথচ লক্ষ্মী আমাদের ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিক—এই আমাদের কামনা। কত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে—টিকছে কয়টা? কেবল বসে বসে খাওয়ার লোকই বাড়ছে অথচ earning member দিন দিন কমে যাচ্ছে। যথা সময় ঘণ্টা পড়ছে, আর কেবল খাওয়ার হট্ট-গণ্ড

গেল। হয় ত দু'একটী লোকের অসম্ভব খাটুনীতে কতদিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকে, তারপর যেমন তেমনি—মানে অব্যক্তে লীন! কেন, এরূপ হবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, যোগ্য-লোকের অভাব।

আমরা এখনো পূজার অধিকারী হইনি, আধার শুদ্ধি করার দরুণ এখনো আমাদের অনেক সাধনার প্রয়োজন; তারপর যদি ৺মা লক্ষ্মীকে আবাহন কর্‌বার যোগ্য হই। অতীতের আদর্শ মানুষকে উদ্দীপিত করে তুলে, আশা হয় এ ভরসাটুকু আছে বলেই। আমাদেরও এমন যুগ ছিল, যখন কোন দিক্ দিয়ে আমাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়নি। আজ পূর্ণিমার মন ভুলানো জ্যোৎস্নার মাঝে বসে বসে কেবল অতীতের গৌরবময় যুগের কথাই মনে উদিত হচ্ছে। আমরা কি ছিলাম, আর এখনি বা কি হয়েছি! যা দু'চারটা কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার মাঝেও উদাসীর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু অতীতে তো আমাদের অমন ছিল না। ঋষি-সঙ্ঘের মাঝে কর্ম্ম-তৎপরতা ছিল না, এ কথা কে বলতে পার্‌বে?

৺মা লক্ষ্মী চঞ্চলা নয়—আমরাই ভাবুকতায় চঞ্চল। স্বাধীনতার পিপাসা আমাদের মাঝে জেগেছে—কিন্তু নির্ভয়ে, অক্লান্ত উদ্যমে দেশের জন্য খেটে মর্‌বার, প্রাণ দিতে প্রস্তুত এমন কয়টী লোক পাওয়া যাবে? আমরা যে বৈদিক ঋষির বংশধর, তাঁদের তেজ-বীর্য্য যে আমাদের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত! মৃত্যুকে অতিক্রম করার পন্থা, ভয়কে অনায়াসে তাচ্ছিল্য কর্‌বার ক্ষমতা যে তাঁদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছিল—কোন কিছু কর্‌তে গেলেই যে প্রাণে একটা ভয়-সঙ্কোচের ভাব আসে, একি আমাদের সরলতার পরিচয়?

৺মাকে পেতে হলে, ভাবুকতাকে নির্ব্বাসিত কর্‌তে হবে, তবে যদি মা সম্পদশালী করে তুলেন আমাদের। মায়ের রাজ্যে—অলস, নিরুৎসাহী, নিছক ভাবুকের স্থান নেই! মা চান্ কর্ম্মী ছেলে। যে যা চায়, সে তার জন্য প্রাণ দেয়—মায়ের জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হবে। একবার এক ইংরেজ বলেছিলেন—"বাঙ্গালী যে স্বাধীনতা চায়, কই তাদের সাহিত্য পড়ে তো তা মনে হয় না।" মা লক্ষ্মীকে যে আমরা চাই-ই, তার পরিচয় দিতে হবে আমাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে। অলক্ষ্মী ঢুক্‌লে নাকি সংসার ছারেখারে যায়, কেবল অশান্তির অনল জ্বল্‌তে থাকে। গৃহবিবাদ দেখে তো এ আশঙ্কার কথা মনে জাগে। কারও মতের সঙ্গে কারও মতের মিল নাই—কেবল অনৈক্যেরই সৃষ্টি! ভাই ভাই যখন আলাদা হয়ে যায়, তখনি লোকে বলে ও সংসারে অলক্ষ্মী ঢুক্‌ল। আমরাও যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, সঙ্ঘের মাহাত্ম্য ভুলে গিয়েছি—তাই অলক্ষ্মীই আমাদের উপর অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করে দিয়েছে। আগে তো অলক্ষ্মী দূর করে সবের মাঝে মিলন ঘটাতে হবে—তবে তো ৺লক্ষ্মী মায়ের পূজা।

ব্যাপ্তিবোধ জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। সমাজের কাছে, দেশের কাছে যে আমি ঋণী, এ কথা আমার বিশেষ করে স্মরণ রাখ্‌তে হবে। লক্ষ্মী আবির্ভূতা হলে, বিলাসিতায়, আড়ম্বরে মন যাবে না। তখন সকলের মাঝে সংযম-নিষ্ঠার স্বাভাবিক উদ্বোধন হবে। মানুষের মূল্য ভিতরের পবিত্রতা দিয়ে, কেননা পবিত্রভাবেই ৺মায়ের সত্যিকার সাড়া পাওয়া যায়। জাতির দৈন্য যেদিন থাক্‌বে না, দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি যখন মোটেই শুন্‌তে পাব না, সেদিন বুঝ্‌বে ৺মা লক্ষ্মী এসেছেন—আমাদের পূজা সার্থক হয়েছে।

——ওম্——

এস

—:*:—

এস শ্যামা নৃমুণ্ডমালিনী,
এস ভীমা শ্মশানবাসিনী ;
এস ওগো ভীষণ দর্শনা,
প্রলয়ের প্রকট মূর্চ্ছনা ॥
নহে আজ সুধাশ্রাবী বাঁশী,
মর্ম্মভেদী চাহি অট্টহাসি ।
নহে আজ সৌন্দর্য্যের দিন,
সব হোক্ আঁধারে বিলীন ॥
নাহি কাজ নন্দন কাননে,
নাহি কাজ অলির গুঞ্জনে ;
নাহি কাজ স্নিগ্ধ পূর্ণিমার,
গ্রাস তায় করুক আঁধার ।
সব আজ হউক শ্মশান,
সম্মিলিত ভীষণের স্থান ॥
স্নেহ প্রেম প্রীতি ভালবাসা,
হৃদয়ের যত মৃদু ভাষা,
ধুয়ে মুছে যাক্ সব আজ ।
তাহাদের নাহি কোন কাজ ॥
পরিবর্ত্তে এস গো তাহার,
নির্ম্মমতা হে প্রিয় আমার ;
এস তুমি ওগো কঠোরতা,
ছিন্ন করি যত কোমলতা,
পর গলে তাহাদের মালা,
শান্ত হোক্ তপ্ত হৃদি-জ্বালা ॥
আজি হতে হৃদি-রণাঙ্গনে,
দেখি যেন প্রলয়-নর্ত্তনে,
নৃত্যপরা অসুরনাশিনী,
বিভীষণা কালী কপালিনী ॥
এস তবে চণ্ডী চণ্ডানন ;
দোষহন্ত্রী করাল দশনা ;
এস তবে বাঞ্ছিতা ভীষণ,
তব অঙ্কে লভি গো শরণ ॥

শক্তিময়ী

—*

শক্তিপূজা ভিন্ন শক্তিলাভ হয় না। শক্তির পূজা অর্থাৎ সশ্রদ্ধ প্রাণের একান্ত নিবেদন চাই, তবেই শক্তিলাভ হয়। বঙ্কিম বাবু আনন্দমঠের গোড়ায় সিদ্ধিলাভের দরুণ ব্যাকুল প্রাণ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগেচ্ছুকে শুনালেন—'প্রাণ ত অতি তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে, চাই ভক্তি!' এই ভক্তিলাভের কথা বল্‌তে গিয়ে ভক্তি কি, তার সংজ্ঞার ভাষা এক এক মুনি এক এক রকম করেছেন। এই বিভিন্ন রকমের মধ্যে একটা কথা আছে, 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' পরমেশ্বরে যে

পরম শ্রেষ্ঠ চরম অনুরক্তি, তাই ভক্তি। এই ভক্তিদ্বারা শক্তিলাভ হয় কি ক'রে? না—সেই পরমেশ্বরের কৃপায়। শক্তিলাভের নানা উপায়ের মধ্যে ভগবৎকৃপা বা ভগবৎকল্প মহাপুরুষদের কৃপাও অন্যতম। বরং একেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলা যায়, কারণ যতই উপায় বের কর না কেন, তাঁর কৃপার যোগ না হলে কিছুই ফলপ্রসূ হবে না। শক্তির চর্চ্চা করতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করলে অবশ্য দেবতার কৃপা হয়, সিদ্ধিলাভও ঘটে, কিন্তু শুধু আত্মাভিমানে দৃপ্ত হ'য়ে হাত পা ছুড়লেই সে চেষ্টার প্রকাশ হয় না। আত্মচেষ্টা ও দেবতার কৃপাভিক্ষা দুই-ই চাই। দেবতার কৃপা বলতে উর্দ্ধশক্তির জন্য আকুল আগ্রহ। সেই আগ্রহের ফলেই দেবতা প্রসন্ন হন, অভীষ্ট বর দান করেন। নতুবা শুধু দেহাভিমান নিয়ে আপন চেষ্টা চির জাগ্রত রাখা দুরূহ। কারণ বাইরে দেহদ্বারা কাজ না হয় করা গেল, কিন্তু অন্তরে যে শুভ ইচ্ছার প্রবল প্রেরণা ভিন্ন কর্ম্মে সেই আত্মনিয়োগ করতে পারে--না, সেই প্রেরণা দিবে কে? তা দিবেন সেই অন্তর্য্যামী দেবতা। তাঁকে ছেড়ে প্রবল চেষ্টাও বিনাশের কারণ হয়, তাই কর্ম্মসমর্পণ চাই।

দেবাসুর উভয়েই সাধক, উভয়েই মহাতেজীয়ান্। সাধনার সোপানে বরং অসুরকেই যেন বেশী তেজোদীপ্ত মনে হয়, কিন্তু পরিণামে দেখা যায় তার নিধন আর দেবতার জয়। অসুরের প্রবল তেজে দেবতারাও আশু নিষ্প্রভ হয়ে, পরাজিত হয়ে, ভয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন, কিন্তু অসুরের সে তেজ যতই দীপ্ত হোক, শীঘ্রই তা দেবশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে। কেন? এত তীব্র তপস্যা, আত্মচেষ্টার এমন মূর্ত্ত প্রতীক বিনষ্ট হয় কেন? তার একমাত্র কারণ—অভিমান। অভিমানে দীপ্ত সেই রাজসিক ভাব নিরভিমানের সাত্ত্বিক তেজে প্রদীপ্ত দেবভাবের কাছে বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। যত বড় এবং যত প্রচণ্ড শক্তিই লাভ হোক্ না কেন, যদি তার স্থায়িত্বই না থাকে, তবে তার গৌরব আর কতদিন? অভিমান-পাপের প্রতিক্রিয়া এসে ধ্রুব তাকে বিনাশ করবে। বলতে পার যে শক্তির সঙ্গে অভিমান আসা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহলে মরণও তার শীঘ্র বলতে হবে।

তাই শক্তির পূজা চাই, অভিমান শূন্য হয়ে প্রাণমন উৎসর্গ ক'রে শক্তির আরাধনা চাই। অসুরের অত্যাচারে প্রত্যেকের হৃদয়ই এক সময়ে না এক সময়ে পীড়িত হয়ে থাকে। আপনার হৃদয়ের দেবশক্তি তখন পুনঃ পুনঃ অসুরের কাছে পরাস্ত হতে থাকে। নিষ্প্রভ হৃদয়কে জাগ্রত করতে তখন চাই শক্তিময়ীর একান্ত শরণ। সে শরণে উচ্ছৃঙ্খলতার লেশ নাই, শক্তিচর্চ্চার দম্ভের পরিবর্ত্তে প্রপন্ন হৃদয়ের একান্ত চেষ্টাই সেখানে ফুটে ওঠে। তাই সত্য, পবিত্রতা ও সংযমের সুষমায় হৃদয় তখন দেবভাবে পূর্ণ হয়। শক্তির উপাসনায় যখন হৃদয় এম্‌নি দেবভাবে পূর্ণ হয়, তখনই শক্তির সাত্ত্বিক বিকাশ ঘটে। নতুবা শক্তির উচ্ছৃঙ্খল চর্চ্চায় ক্ষণেকের জন্য শক্তির রাজসিক বিকাশ ও উত্তেজনা আসলেও তার ফল শুভ হয় না। সে আসুরিক শক্তি জগতের উপর যদিও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে, তবু তার নিধন করতে স্বয়ং শক্তিময়ীর আবির্ভাব হয়। কাজেই আজ যে হৃদয়ে অসুরের তাণ্ডব লীলা চলছে এবং দেবভাব কেঁদে ফিরছে, এভাব চিরদিন থাকবে না। যদিও মনে হতে পারে যে, কোনও শক্তি তো চিরস্থায়ী নয়—দেবশক্তিও তো একদিন বিনষ্ট হয়। কিন্তু তা নয়। দেবশক্তির প্রভাব চিরকালই বেশী থাকে। মাত্র মাঝখনো

দুদিনের জন্য অসুরের হঠাৎ অভ্যুত্থান হয়ে আবার দুদিন যেতে না যেতেই বিনষ্ট হয়। তা না হলে জগৎ রসাতলে যেত।

জগতের সৎ থেকে উৎপত্তি হয়, আবার তা সতেই বিলীন হয়ে যায়। মাঝের এই অনিত্যতা শুধু লীলার জন্য। আর সেই সময়েই সব অসুরের উত্থান পতন। হিন্দুর শাস্ত্রে অনন্ত স্বর্গ অর্থাৎ মরণের পরে উর্দ্ধে অনন্ত গতি রয়েছে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মের মত অনন্ত নরক কল্পিত হয় নাই। ভোগের কাল সুনির্দ্দিষ্ট বলে নরকে অনন্ত কাল পচে মরতে হয় না। তাই দুঃখ দৈন্যের দিন আনন্দের দিনের তুলনায় বেশী নয়। কিন্তু আমরা দুঃখ দৈন্যকেই খুব বড় করে দেখি ব'লে তার প্রভাব চিরস্থায়ী বলে মনে হয়। নতুবা শাস্ত্রের কথা **"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, সং প্রিয়ন্তে বিলীয়ন্তেচ।"** আর এই অখিল বিশ্বপ্রসবিনী যে স্বয়ং মা আনন্দময়ী! তাই জগতে দুঃখ ব'লে, অসৎ ব'লে কিছু নাই; তবু যে দুঃখ আমরা পাই, সে কেবল আমাদের ব্যবহার দোষে। যেটাকে যেই ভাবে গ্রহণ করা, ব্যবহার করার বিধি, তার বিপরীত ভাব করতে গিয়েই আমরা মরণকে বা দুঃখকে টেনে নিয়ে আসি। 'ধর্ম্মেব ধার্য্যতে জগৎ' তিনি কখনও আমাদের দুঃখের বিধান করেন না—তা-হলে তাঁর এই জগৎ-লীলায় নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ হত বেশী, চিরমঙ্গলদায়িনী জননীরূপে কল্পিতা হতেন না। তিনি করুণারূপিণী চিরমঙ্গলবিধায়িনী বলেই মানুষ আপন কর্ম্মফলে দুঃখভোগ করেও যখনই তাঁর দিকে মুখ তুলে প্রাণের আকুলতায় "মা" বলে একবার ডাকে, অমনই তিনি তার অতীতের সমস্ত কলুষ ভুলে গিয়ে তাঁর বরাভয়প্রদ মঙ্গলহস্ত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন, আর সেই অত্যাচারী অসুরের নিধনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

কিন্তু 'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ'—মুখে মা মা বলে ডাক্‌ব, বাইরে ভক্ত নাম রটাব, অথচ অন্তরে সেই অসুরেরই পূজা ক'রে অনাচার ব্যভিচারে দুশ্চরিত্রতার একশেষ করব, তা হলে চল্‌বে না। দুশ্চরিত্রতা থেকে বিরত না হ'লে তার ডাক মায়ের কানে যায় না। যদি বল, 'তাই-ই যদি পার্‌ব, তবে আর ডাকা কেন?' তার উত্তর হচ্ছে এই যে, পার বা না পার, প্রাণপণ চেষ্টা চাই। প্রাণ উদ্বুদ্ধ না হ'লে, অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত না হ'লে, তার কাছে মায়ের শক্তি-মাহাত্ম্য বিকাশ হবে কেমন ক'রে? আকুল হ'য়ে প্রাণপণে তাঁকে চাইলে তবে গিয়ে তাঁর কৃপা প্রকট হয় এবং সে মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু যার তেমন প্রয়োজন-বোধই নাই, তার কাছে সে কৃপা আস্‌বে কেন?

প্রাণপণে চাওয়া কিসে? শুধু কি কেবল কাঁদ্‌লে? কিছু না ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে শুধু কাঁদ্‌লেও তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না—শক্তি আসে-না। কারণ নিশ্চেষ্ট যে হয়, তার প্রাণে আকুলতাও থাকে না, সুতরাং কান্নার মাঝে যে প্রাণের আবেগ, তাও প্রকাশ হয় না। সে কান্না শুধু লোকের কাছে ভক্ত সাজার জন্য লোকদেখানো মায়া-কান্না। তাতে দু'একটী লোক ভুল্‌লেও দেবতা তাতে ভোলেন না—অন্তর তাঁর কাছে ধরা পড়ে-যায়। প্রকৃত ভক্ত লোকের দৃষ্টি চাহে না।—সে চাহে দেবতার দৃষ্টি।

আসল কান্না কি শুধু চোখের জলেই প্রকাশ হয়? শক্তির অভাবে হৃদয় যাঁর বিদ্ধ হয়েছে, তাঁর টান বুকে যাঁর বেজেছে, প্রাণ যাঁর যথার্থ কেঁদেছে, তাঁর দেহের প্রত্যেকটী অণু-পরমাণু অভীষ্টের দরুণ কেঁদে আকুল

হয়—তার প্রত্যেকটী অঙ্গ দিয়ে যেন বেদনা সূচিত হয়, তার প্রত্যেকটী ক্ষণ সেই কামনায়, প্রত্যেকটী প্রয়াস তাঁরই সন্ধানে কেটে যায়। সে কি আর নিশ্চেষ্টভাবে অলস হ'য়ে শুধু ব'সে কাঁদ্‌তে পারে? ইষ্টপ্রাপ্তির যত প্রকার উপায় তার জানা আছে, বা নূতন জান্‌তে পারে, তৎসমস্ত সে প্রয়োগ ক'রে দেখ্‌তে ব্যগ্র হয়। একে একে সমস্ত উপায় পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় তার আকুল হ'য়ে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করে,—যদি তাঁর করুণাসিন্ধুর এক-বিন্দু দানে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। জগতের কোনও দুরূহ কার্য্যই সেই অনন্যমনা প্রচণ্ড সাধকের কাছে কঠিন মনে হয় না। অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুল্‌তে তাঁর মনে তিলেকের জন্যও সংশয় আসে না। সন্দেহের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে সে মায়ের পূজায়, শক্তির সাধনায় ব্রতী হয় না। "আমি যা চাই, তা আমি নিশ্চয় পাব—জগতের কোনও প্রতিকূল শক্তিই আমায় তা থেকে বঞ্চিত করতে পার্‌বে না—যদি পর্ব্বতাকার বাধার রূপ ধরে সেই প্রতিকূল শক্তি আসে, তবুও মহাশক্তিরূপিণী মায়ের প্রসাদে তা আমি পরাস্ত কর্‌তে সমর্থ।" এই মহাবিশ্বাসে শক্তিকামী মায়ের পূজায় ব্রতী হয় ও আপনার তীব্র চেষ্টাকে তাঁরই শক্তিতে আরও সুতীব্র করে তোলে।

আজ বিশ্বজুড়ে শক্তির পরখ চল্‌ছে। যার শক্তি বেশী, সেই অপরকে নিস্তেজ করে নিজের অধীনে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু রাজসিক শক্তির সে উৎপীড়ন সহ্য ক'রে কে কত দিন থাক্‌তে পারে? অসুরের অত্যাচারে স্বর্গভ্রষ্ট হয়েও দেবতারা আবার শক্তিপতির আশ্রয় নিয়ে অসুরকে পরাস্ত কর্‌তে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। সেই সমবেত দেবশক্তির প্রবল ইচ্ছাশক্তিই মূর্ত্তিমতী হয়ে দুর্গারূপে দেবতা-গণের দুর্গতি হরণ করেছিলেন। জীবন যুদ্ধে পরা-জিত আমরা অসুরের অত্যাচারে মরণাপন্ন হয়েছি, আমাদের দেহের বল, মনের স্ফূর্ত্তি, সমস্ত আনন্দের উপকরণ সে জয় করে নিয়ে দেবাধিকারে আমাদিগকে বঞ্চিত করেছে। হৃদয়ের উচ্চভাবরূপী দেবতারা আজ কোথায় সরে গিয়েছে, অসুরের রাজত্বে আশ্রয় নিয়েছে যত হীনতা, কাপুরুষতা, ঘৃণ্য নানা আবিলতা। আজ এলিয়ে পড়া দেহে তিলেক বল নাই, মনের সাহস ও আনন্দ কোথায় লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু হীন কর্ম্মের ইন্ধনে কোথা হ'তে পশুবল এসে হাজির হয়। আজ এমনিভাবেই অসুরের কবলিত জীবন কাটাতে হচ্ছে।

এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণের উপায় কি? কি হলে আবার এ রাজ্যে বল-পুষ্টি-কান্তি-শান্তি ও আনন্দ ফিরে আসে? সেজন্য চাই তীব্র ইচ্ছা-শক্তি। যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁদের স্বাধিকারে অসুরের হস্তে ছেড়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে ফির্‌ছেন, তাদিগকে আজ সমগ্রভাবে মিলিয়ে এক ক'রে বলাতে হবে, 'আমরা চাই না এই রক্তশোষক অসুরের রাজত্ব। আমরা চাই স্বাধিকার।' ইন্দ্রিয়েরা কোন অসুরকেই আমল না দিলে, মনের সেই একাগ্র ইচ্ছাতে এমন শক্তি লাভ হবে যে, তার কাছে তখন আর কোনও দুষ্ট শক্তি তিষ্ঠিতে পারবে না। অশুভ শক্তি এমনই ভাবে যদি পরাস্ত হয়ে যায়, তবে সেখানে শুভশক্তির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হবেই। কারণ এই মনরূপ বিস্তৃত রাজ্য কোনও দিন খালি পড়ে থাকে না। কেহ না কেহ ইহার উপর রাজত্ব কর্‌বেই। যাকে আমল দিবে, সে-ই তোমাকে পেয়ে বস্‌বে। কাজেই সাবধান, ওই অসুরের কোনওরূপ প্রবেশাধিকার দিলেই কালে সে সবটুকু রাজ্য অধিকার কর্‌বে।

দনুজদলনী মায়ের কাছে শক্তিভিক্ষা করার সময় এসেছে আজ। তমোশক্তির

মোহাবরণে চিরাচ্ছন্ন দেহমনকে সত্ত্বস্বরূপিণী মায়ের পূজার যোগ্য কর্‌তে হলে, শক্তিলাভ কর্‌তে হলে, আজ নিজের উপর নির্ম্মম হয়ে আরাম নিদ্রার অবসান কর। তোমার চোখের সামনে তোমারই মত রক্ত মাংস দেহধারী কত ভাই তোমাব বিভিন্ন-ভাবে মায়ের পূজা ক'রে শক্তিলাভ করেছে, তারাও একদিন তোমারই মতন মোহনিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু মায়ের শুভ প্রেরণায় তারা জেগে উঠে মহা-শক্তির আবাহন করেছে, তাই তারা আজ জগজ্জয়ী। আজ তোমারও মায়ের কাছ হ'তে ঐ ডাক এসেছে —মা তোমার দ্বারদেশে শুভক্ষণে তাঁর মোহন মূর্ত্তি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। শক্তিলাভের এই শুভ অবসরে শক্তিময়ীকে প্রাণের শক্তির অর্ঘ্যদানে পূজা কর—শক্তির চর্চ্চায় দেহ প্রাণ নববলে বলীয়ান হবে—শক্তিলাভে জীবন ধন্য হবে।

ভাব্‌বার কথা

বীর্য্যের অভাবে, বিশ্লেষণ বুদ্ধির অভাবে, অনেক সময় আমরা সাধারণ অনুভূতিকেও অতি উচ্চ আসন দিয়ে থাকি। ভাবি—না জানি তার মাঝে কি আছে! আর আমাদের অনেকেরই ধারণা, ধর্ম্মানুভূতির কোন বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—অনুভূতি চিরকাল অব্যক্ত-রহস্যময়। এই রহস্যের দরুণ অনেকে ধর্ম্মানুভূতির উচ্চ শিখরে আরোহণ না করেও, ধার্ম্মিক বলে নিজকে জাহির কর্‌তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। আর সাধারণও বেশ দু'দিনের মাঝেই তাকে 'অবতার' বানিয়ে তুলে। এই রহস্যবাদে (Mysticism) যে আধ্যাত্মিক জীবনে কি মারাত্মক দুর্ব্বলতা নিয়ে এসেছে তা আর বল্‌বার নয়। মন-বুদ্ধিকে একটুকুও না খাটাবার ফলে, যত সব আজগুবী অনুভূতি এসে মাথায় কিল্‌বিল্‌ কর্‌তে থাকে। সেই জন্যই এত অনুভূতি পেয়েও বাহিরে আমাদের বীর্য্যের প্রকাশ দেখা যায় না। তারও উত্তর—'আরে, ধর্ম্ম কি বাহিরে দেখাবার বস্তু, আমার ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা তুমি কি করে বুঝবে ?'

এ জায়গাতেই বিবেকানন্দ এসে জোর দিয়ে একটী কথা বলেছেন। তাঁর মত হল এই যে—'Religion, if it is a true religion must be practical.' আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিগূঢ় বিষয় হলেও, স্থূলে তারও একটা বিকাশ রয়েছে। সাত্ত্বিক মানুষ অলস নয়, অকর্ম্মা নয়, তাঁর জীবনের কর্ম্মোদ্যম দেখে শত শত ভগ্ন মনোরথ মানবের প্রাণ আশায়, আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে। কাজেই ধর্ম্ম জিনিষটা অন্তর এবং বাহিরের উভয় দিকেরই। আমরা সাধারণতঃ যে ধর্ম্মের বড়াই করি, তা প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মই নয়। তাকে অধ্যাত্ম-সুপ্তি বল্‌লেই প্রকৃত নামকরণ করা হয়।

অনুভূতিবিহীন নির্জীব ধর্ম্মপ্রেরণার কোন মূল্যই নাই। এই জন্যই ধার্ম্মিক হয়েও আমরা আজ এত লাঞ্ছিত।

সম্প্রদায় পরম্পরা বজায় রাখ্‌বার দরুণ আমাদের নিরর্থক অভিমান রয়েছে বটে, কিন্তু সে বীর্য্য, সে তপস্যা, সে অনুভূতির তীব্র স্ফূর্ত্তি নেই আমাদের। সুতরাং মূল উৎস শুকিয়ে যাবার দরুণ চিন্তানির্ঝরিণীও শুকিয়ে গিয়েছে। আমাদের চিন্তার মাঝেও মারাত্মক দুর্ব্বলতা এবং ভণ্ডামী রয়েছে।

আধ্যাত্মিক প্রেরণায় জীবন গঠিত হয়ে উঠ্‌লে, তার মাঝে ভণ্ডামী-প্রবেশের পথই যে থাক্‌তে পারে না। ধর্ম্মানুভূতিতেই যে মানুষকে খাটী বীর করে তুলে। কিন্তু জীবনে কোন গভীর অনুভূতি না পেয়ে, অনুভূতির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করেই আমরা অভিমানের সহিত ধর্ম্মোপদেষ্টার আসনে বসে যাই, এই জন্যই প্রকৃত কর্ম্মীর চেয়ে উপদেষ্টার সংখ্যা এত বেশী।

আধ্যাত্মিক জীবনের অনুভূতিগুলিকে বেশ systematically explain করা কি অসম্ভব? জীবনের গভীর তত্ত্বগুলি সবই কি রহস্যময়—কুহেলিকা ময়? তাহলে আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাঝে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া কঠিন—আর ধারণাই যদি অস্পষ্ট থেকে যায় তাহলে সে জীবন দিয়ে দেশের, দশের হিত সাধিত হবে কেমন করে?

আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেলে বাইরে ভিতরে একটা সামঞ্জস্য আসে। ভিতরে এক আর বাইরে সম্পূর্ণ তার বিপরীত এ কি আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ নিদর্শন? কোন বিষয় সম্বন্ধেই যে আমাদের সুস্পষ্ট একটা ধারণা নাই, বিশ্লেষণ করে দেখবার ঔৎসুক্য নাই, এই জন্যই ভাল মন্দ সব কিছুই আমাদের কাছে এত রহস্যময়। চিন্তাশক্তির অভাবে, বিশ্লেষণের অভাবে, যেখানে কিছু নাই, সেখানেও কিছু আছে বলে দুর্ব্বল শ্রদ্ধার অতি মাত্রায় উন্মেষ হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ব্বলতাকে আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই বিকাশ বলে অনেক সময় অপরের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্‌বার দরুণ আমরা অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠি। কিন্তু দুর্ব্বলতা নিয়ে কি আধ্যাত্মিকতার বড়াই কর্‌লেও বড় কিছু আসে যায়? দু'দিন পর যে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যায়। জীবনকে পূর্ণভাবে গঠিত করে তুল্‌বার আগেই মহাপুরুষত্বের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল কি না তার দরুণ আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি? এই জন্যই আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমশঃই আমাদের কাছে অলৌকিক এবং জটিলতা পূর্ণ হতে থাকে। অথচ সহজ সরল পবিত্র ভাবে জীবন যাপনেও যে একটা আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়, তা কিন্তু আমরা মোটেই ভেবে দেখি না।

সকল দিক ভেবে চিন্তে দেখেছি, আমাদের পুনঃ ঋষিদের মত সরল অকপট হ'তে হবে। ভণ্ডামী কর্‌তে কর্‌তে ভণ্ডামীই সত্যের আসন অধিকার করে বসে আছে। আপাততঃ না হয় মান সম্মান একটু খসেই গেল, পুনঃ সত্যপ্রতিষ্ঠ হয়ে সত্যের মহিমায় স্বভাবতঃই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্‌তে পার্‌ব আরও বেশী। তবে ভিতরে এই দৃঢ়পণ থাকা চাই, মিথ্যা বল্‌ব না, অভিনয় কর্‌ব না, যা পেয়েছি তা বাড়িয়ে বলবার বাতিক সৃষ্টি কর্‌ব না ইত্যাদি।

সেবক জীবন বড় কঠিন পরীক্ষার জীবন। সব সমর্পণ করে যদি নিজের জীবনের আদর্শই স্তিমিত অস্ফুট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেই সমর্পণের মাঝে গলদ আছে বুঝ্‌তে হবে। অনেককেই জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, তাদের জীবনের

লক্ষ্য কি, তারা কি চায়, কিন্তু প্রত্যুত্তরে একটা অস্পষ্ট জড়িত ভাবই ব্যক্ত করেছে তারা। এখানেই আমার নিদারুণ সন্দেহ—মনে হয় তারা নির্ভরতার নামে স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে। সমর্পিত জীবনের সেই প্রদীপ্ত মহিমার সন্ধান এখনো পায়নি তারা। জীবনকে পুড়ে, বিশুদ্ধ করে, কি করে আবার দৈবী জীবন লাভ করা যায়, সে পথের সন্ধান তারা এখনো পায়নি। সুতরাং তাদের গতি কি হবে এ কথা ভেবে আমার দুঃখ হয়।

অনেকের কাছ থেকেই উত্তর পেয়েছি—ও সব পরের কথা চিন্তা করে কি লাভ? পথে চল্‌ছি, তার পর যা হয় হবে, সে সব চিন্তা আমরা করি না। কথাগুলি যদি খাঁটা বিশ্বাসীর কথা হত, তাহলে কিন্তু তাদের জীবনের বহির্বিকাশের মাঝে একটা মহিমামণ্ডিত ভাব ফুটে উঠ্‌ত, কিন্তু তাদের অবসন্ন অবসাদগ্রস্ত মুখের বিভীষিকায় যে আমাদেরও প্রাণ কেঁদে ওঠে। তারা নিজেদের জীবন দিয়ে পরকে উদ্বুদ্ধ কর্‌বে কি, অন্যেরই যে দুঃখ হয়, করুণা হয়, তাদের মিথ্যা অভিমানের বালাই দেখে।

রহস্যের জাল ভেদ করে, দৈনন্দিন জীবনের কোন একটা সুস্পষ্ট প্রেরণা নিয়ে চল্‌লে জীবন আপনি আদর্শ জীবনে পরিণত হবে। আর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উত্থান পতন দিয়েই শেষ ফল গিয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যতদূর শক্তি জীবনকে পবিত্র নির্ম্মল রেখে চল্‌লে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির দরুণ আলাদা সাধনার কোন প্রয়োজনই হয় না। রোজের পড়া রোজ শিখে রাখ্‌লে, পরীক্ষার আগে প্রদীপ জ্বেলে রাত্রি জাগরণ করে সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নির্জ্জনে পড়াশুনা করে রাত্র কাটাবার কোন প্রয়োজনই হয় না। বিবিক্ত সাধনাই আদর্শ সাধনা নয়, এইজন্যই বেদান্তের তুলনায় সাংখ্য পাতঞ্জলের সাধনা অনেক নিম্নে।

বাইরে ভিতরে যখন এক সুর বেজে উঠ্‌বে, তখনই জীবন পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে। আধ্যাত্মিক জীবনকে রহস্য জাল দ্বারা আবৃত করে, নিঃসঙ্গ, কেবল হয়ে থাক্‌লে, তখন ঘুমই বেড়ে যায়, না চেতনার উচ্চ শিখরেই আরোহণ করে থাকে মানুষ, তা অনুসন্ধনীয়।

উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করেছে যারা বলে, তাদের ঔদাসীন্য, জড়ত্ব দেখে তাদের অনুভূতি গুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়। জড়ত্বই যদি আধ্যাত্মিক অনুভূতির নিদর্শন হয়ে থাকে, তাহলে আমরা ধার্ম্মিক এতে আর কোন সন্দেহ-নাই, তা নাহলে এখনো আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন লাভ কর্‌তে হলে বহু সাধনা, বহু তপস্যার প্রয়োজন রয়েছে।

কাম ও প্রেম

প্রেম কহে কাম তুমি দূরে সরে যাও,
পাশে আসি কেন মোর কলঙ্ক রটাও?
কাম কহে আমি যে গো তোমার নিদান,
তোমারি স্বরূপ রচি করি আত্মদান॥

---*---

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

মন তোমাকে নীচের দিকে টান্‌বেই কিন্তু তোমার তাতে সায় দিলে চলবে কেন? তুমি কি সেই অজর অমর আত্মা নও? কিসে তোমায় টলাতে পারে? কিসে তোমায় নামাতে পারে? সর্ব্বংসহ অসীম তুমি—জগতের কোন্ শক্তি তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌বে ভাই?

*

তুমি দীন—তুমি হীন—তুমি কাঙ্গাল—এই ভেবেই না তুমি সঙ্কীর্ণতার মোহ জালে দিন দিন জড়িয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ছ— আর তার ফলস্বরূপ জালা-যন্ত্রণা অভাব-অশান্তি শত দিক থেকে এসে তোমাকে গ্রাস করতে আরম্ভ করেছে? কেন তুমি মিছামিছি এত কষ্ট পাচ্ছ? ভাব না তুমি রাজাধিরাজ—ভাব না তুমি বিশ্বরাজ—ভাব না তুমি সচ্চিদানন্দময় অসীম আত্মা? কোথায় থাকে দুঃখ—অভাব—অশান্তি—জালা?

*

এই দৃশ্যময় জগৎ তো ব্রহ্মেরই বিলাস! ব্রহ্ম থেকেই যা বিকশিত, যা ব্রহ্মেই অবস্থান করছে ও চরমে যা ব্রহ্মেই লীন হয়ে যাবে, তা ব্রহ্ম ছাড়া আর কি হতে পারে? তুমি যা ভাব বা যা দিয়ে ভাব—তুমি যা দেখ বা যা দিয়ে দেখ—তুমি যা শুন বা যা দিয়ে শুন—সবই যে সেই আনন্দময় ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। তবে আর ভয় কি বন্ধু! এই ব্রহ্মকেই মনে প্রাণে জেনে তুমি নিশ্চিন্ত মনে চিরদিনের জন্য নির্ভয় হয়ে যাও।

কে তোমায় দুঃখ দেয় ভাই? কেউ-ই নয়—সে তো তোমারই ঐ অবিদ্যাকলুষিত মোহগ্রস্ত মন? ঐ মনই তো তোমার ঘাড়ে এমন করে অশান্তির বোঝা তুলে দিয়ে কোন্ স্মরণাতীত কাল হতে তোমায় তাড়িয়ে তাড়িয়ে ফিরছে?—আর তুমি তারই ছলনায় মুগ্ধ হয়ে দিন দিন আসক্তির জালে জড়িয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ছ? কিন্তু আজ থেকে সাবধান হও, আর যেন মনের প্ররোচনায় ভুল না—আর যেন তার মিথ্যা ছলনায় প্রলোভিত হয়ে পড় না—আজ থেকে তুমি নিজের অসীমত্ব স্মরণ করে সিংহ-বিক্রমে মনের এ জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়।

*

মন থেকে আসক্তির রেখা নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়ে শুধু সাক্ষীভাবে উদার দৃষ্টি নিয়ে জগতের পানে চেয়ে দেখ, দেখবে—কি সুন্দর এ জগৎ! দেখবে—ব্রহ্ম-সমুদ্রের জলে ভাসমান এ-একটী সুন্দর সহস্রদল কমল—যার প্রতিদল হতে অনন্ত আনন্দ-রেণু অবিরত চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আনন্দের কাঙ্গাল তুমি—কিন্তু তা কি তুমি এই ক্ষুদ্রত্বে পাবে মনে করেছ? ভুলে যাও ভাই তোমার এ ক্ষুদ্রত্বের কল্পনা! ভুলে যাও তোমার এ ব্যক্তিত্ব—জড়ত্ব! ভাব তুমি মহান্—ভাব তুমি বিশাল—ভাব তুমি অসীম! উপনিষদের সেই বজ্র নির্ঘোষ বাণী স্মরণ কর—**ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।**

ভক্ত সম্মিলনী

(সপ্তদশ-বার্ষিক অধিবেশন—১৩৩৮)

স্থান ঃ—দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর, ২৪ পরগণা।

দিন ঃ—১০ই পৌষ শনিবার হইতে ১২ই পৌষ সোমবার পর্য্যন্ত।

আগামী ১০ই ১১ই ও ১২ই পৌষ, ইং ২৬শে ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর এই দিবসত্রয় দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ ভক্ত-সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শিষ্যভক্ত এবং আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকগণকে উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

সম্মিলনীতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ সম্মিলনীর পূর্ব্ব অধিবেশনাবলীর নিয়মানুযায়ী সম্মিলনীর ব্যয়ভার নির্ব্বাহকল্পে জন প্রতি ৫৲ টাকা হিসাবে দেয় চাঁদা অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই আশ্রমপরিচালকের নিকট নিম্নঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের নাম তালিকা-ভুক্ত করিবেন। নচেৎ তাঁহাদের সংস্থানের জন্য পরে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। সঙ্গে স্ত্রীলোক আসিলে স্বতন্ত্রভাবে তাহার উল্লেখ করিবেন। শিশু ও বালক-বালিকা ব্যতীত আর সকলেরই এই চাঁদা অবশ্য দেয়। টাকা পাঠাইবার সময় প্রেরকের নাম ঠিকানা এবং যে কয়জনের চাঁদা পাঠাইতেছেন তাহা সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

ভক্ত-সম্মিলনীর সাহায্যার্থে স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। মনি-অর্ডার কুপনে "সম্মিলনীর সাহায্যার্থে দান" এই কথাটী উল্লেখ করিবেন।

"দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম" প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের হালিসহর ষ্টেশন হইতে আড়াই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। জিনিষ পত্র সঙ্গে লইয়া এই ষ্টেশন হইতে আসার কোনই সুবিধা নাই। সুতরাং ভক্ত-

গণের সুবিধার্থে জানাইতেছি যে তাঁহারা সকলেই যেন নৈহাটীর টিকিট কিনিয়া তথায় নামেন। নৈহাটী হইতে আশ্রম ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সেখান হইতে আশ্রমে আসার জন্য মোটর বাস কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী সকল সময়েই পাওয়া যাইবে। মোটর বাস্ কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী একেবারে আশ্রমের পাশেই আসিয়া লাগিবে। নৈহাটী হইতে নৌকা পথেও আশ্রমে আসার সুবিধা আছে। তাহাও আশ্রমের অতি নিকটেই আসিয়া লাগিবে।

ট্রেণের সময় নির্দ্দেশ ঃ—

উত্তর বাঙ্গালা ও আসাম অঞ্চলের ভক্তগণের ঃ— ডাউন আসাম মেল ধরিয়া আসাই সুবিধা জনক। উহা বেলা ১ টার সময় নৈহাটী পৌঁছে। উক্ত মেল লালমণিরহাট, কাউনিয়া, পার্ব্বতীপুর, সান্তাহার, ক্রমান্বয়ে রাত্রি ২-৫৮, ৩-৫৩, প্রাতঃ ৫-৫০, ৭-৪৫ এ পৌঁছে। যাঁহাদের যে স্থানে উক্ত মেল ধরার সুবিধা তাঁহারা যথা সময়ে সেই স্থানে উক্ত মেল ধরিতে পারেন। ইহা ছাড়া পার্ব্বতীপুর অথবা সান্তাহারে তাঁহারা নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরিয়াও আসিতে পারেন। উক্ত এক্সপ্রেস যথাক্রমে রাত্রি ৭-৫৮ ও ১০-৫৬ মিঃ এ পার্ব্বতীপুর ও সান্তাহার হইয়া শেষ রাত্র ৪-৪৩ মিঃ এ নৈহাটী পৌঁছে।

মধ্য বাঙ্গালার ভক্তগণ ঃ— যাঁহাদের বাহাদুরাবাদ ঘাট দিয়া আসা সুবিধা জনক, তাঁহারা বগুড়া দিয়া সান্তাহারে আসাম মেল বা নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরিবেন। যাঁহাদের গোয়ালন্দ দিয়া আসা সুবিধাজনক, তাঁহারা ঢাকা মেল ধরিয়া আসিবেন। ঢাকা মেল শেষরাত্রি ৪-১২তে নৈহাটী পৌঁছে। যাঁহাদের সিরাজগঞ্জ হইয়া আসার সুবিধা, তাঁহারা সিরাজগঞ্জ পেসেঞ্জার ধরিয়া আসিবেন। উক্ত পেসেঞ্জার প্রাতঃ ৬-২৯ এ নৈহাটী পৌঁছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের ভক্তগণের ঃ— চিটাগাং মেইল ধরিয়া আসাই সব দিক্ সুবিধা জনক। উক্ত মেল নৈহাটী সন্ধ্যা ৭-৮ মিঃ এ পৌঁছে।

পশ্চিম বাঙ্গালার ভক্তগণ ঃ—কলিকাতা আসিয়া কলিকাতা হইতে যে কোন ট্রেণে নৈহাটী পৌঁছিতে পারেন।

নৈহাটী জংসন কলিকাতা হইতে মাত্র ২৪ মাইল উত্তরে মেইন লাইনের উপর অবস্থিত। সকল ট্রেণই নৈহাটীতে ধরে। কয়েকটী স্থান হইতে নৈহাটী পর্য্যন্ত নিম্নে একটী আনুমানিক তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

বগুড়া	হইতে	নৈহাটী	৩॥০	চাঁদপুর হইতে	নৈহাটি	৪॥/১০
লালমণিরহাট	,,	,,	৪৸৶১০	লাকসাম ,,	,,	৫।/০
কুচবিহার	,,	,,	৫।৶১০	কুমিল্লা ,,	,,	৫॥৶০
শিলিগুড়ি	,,	,,	৫॥/০	ঢাকা ,,	,,	৫৵১০
চট্টগ্রাম	,,	,,	৭/০	ময়মনসিংহ (তিস্তা হইয়া)		৫।৶১০

মোট কথা, ভাড়া সম্পর্কে উত্তর, পূর্ব্ব ও মধ্য বাঙ্গালার ভক্তগণের কলিকাতার ভাড়া অপেক্ষা ।৶০ কম লাগিবে, আর পশ্চিম বাঙ্গালার ভক্তগণের কলিকাতার ভাড়া অপেক্ষা ।৶০ বেশী লাগিবে।

সম্মিলনীর তারিখ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় অনেকেই এবার উইক্‌এণ্ড রিটার্ণ টিকিটের সুবিধা টুকু উপভোগ করিতে পারিবেন। বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২ টার পর হইতে উক্ত টিকিট মিলে, আবার মঙ্গলবার রাত্রি ১২ টার মধ্যে **journey** শেষ করিয়া **starting station** এ ফিরিয়া আসিতে হয়। উপরে যে ভাড়ার হার দেওয়া গেল তাহা এক **triff** এর। যাঁহাদের উইক্‌এণ্ড রিটার্ণ পাইবার সুবিধা আছে তাঁহারা ঐ ভাড়ার সহিত আর ⅓ অংশ দিলেই যাতায়াতের টিকিট পাইবেন। এই দারুণ অর্থ কৃচ্ছ্রতার দিনে এটুকুও কম সুবিধা নহে।

ভক্তগণ নিজ নিজ বিছানা পত্র ও আলো সঙ্গে আনিবেন। অন্য কোন বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

টাকাকড়ি ও পত্র পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—

শ্রীমৎ জিতেন ব্রহ্মচারী—

আশ্রম পরিচালক—

দক্ষিণ-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, পোঃ হালিসহর,

জিলা (২৪ পরগণা)



২৪শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৩৮ | ২য় খণ্ড
সমষ্টি সং ২৫৯ | | ২য় সংখ্যা

তল্লাভোপায়াঃ

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্ততস্তু
তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

পরমাত্মা চক্ষুর দ্বারা গ্রাহ্য নহেন— যেহেতু তিনি অরূপ; বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, যেহেতু তিনি অনির্ব্বচনীয়; ইন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারাও তাঁহাকে জানা যায় না, তপস্যা কিম্বা যাগ-যজ্ঞ দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া দুষ্কর। তাহা হইলে তাঁহাকে জানার উপায় কি? উপায়— নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ধ্যানযোগ দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা।

নিছক শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, জ্ঞানের মাঝে প্রসাদগুণ থাকা চাই। প্রসাদযুক্ত জ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। কেবল জ্ঞান পণ্ডিতেরও আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই তো ব্রহ্মজ্ঞানী নয়। জ্ঞানের মাঝে প্রসাদগুণ আসে ভক্তিদ্বারা। কাজেই শুষ্ক জ্ঞানের ভিতর মাধুর্য্য থাকা চাই। পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়, কিন্তু জ্ঞানপ্রসাদ লাভ হয় না।

অন্তঃকরণটীও নির্ম্মল হওয়া প্রয়োজন। অন্তঃকরণের মালিন্য অপসারিত না হইলে পরব্রহ্মের দ্যুতি প্রকাশিত হয় না। বিশুদ্ধান্তঃ-করণে অরূপেরও রূপ ফুটিয়া উঠে। ভিতরের মালিন্য যত কমিয়া আসিবে, ভগবানের রূপও তত উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিবে। নির্ম্মলান্তঃকরণই ভগ-বানের শ্রেষ্ঠ আসন.

অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলেই শেষ হইল না। ইহার পর ধ্যান করিতে হইবে। সেই ধ্যানেই নিষ্কল ব্রহ্ম পরিপূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন।

ব্রহ্মকে জানিবার উপায় তাহা হইলে তিনটী। প্রথম— জ্ঞানপ্রসাদ, দ্বিতীয়—বিশুদ্ধসত্ত্ব, তৃতীয়— ধ্যান। সহজ করিয়া বলিতে গেলে— প্রথমতঃ জ্ঞান থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ অন্তঃকরণটী বিশুদ্ধ হওয়া চাই, তৃতীয়তঃ ধ্যান করিবার ধৈর্য্য এবং ক্ষমতা থাকা চাই।

জ্ঞান স্বভাবতঃই আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, কিন্তু তাহা হইলেও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি প্রভৃতি দোষ বশতঃ মলিন দর্পণের ন্যায় এবং কলুষিত জলের ন্যায় জ্ঞান অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার ফলেই নিত্য-সন্নিহিত আত্মাকে সে উপলব্ধি করিতে পারে না। আদর্শ ও সলিলের ন্যায় সেই জ্ঞান আবার যখন বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিত রাগাদিমলোৎপন্ন কলুষতা শূন্য হইয়া প্রসন্ন, নির্ম্মল ও শান্তভাবে অবস্থান করে, তখনই জ্ঞানের প্রসাদ বা প্রসন্নতা হয়। কাজেই যথার্থ জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সুনিশ্চিত। জ্ঞান প্রসন্ন হইয়া না উঠিলে সেই জ্ঞানদ্বারা সন্নিহিত ব্রহ্মের

বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া যায় না। বিষয়াসক্ত, রাগ-দ্বেষ-অভিমান দ্বারা জর্জ্জরিত পণ্ডিত ব্যক্তির জ্ঞানে প্রসাদ নাই। শুষ্ক জ্ঞানে কথায় আচরণেও নীরস শুষ্কভাব আনয়ন করে। এই জন্যই নিছক জ্ঞানচর্চ্চা লইয়া যাহারা দিবারাত্র ব্যস্ত, তাহারা মানুষের নৈতিক-অধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোন কথা বলিতে পারে না।

আত্মচেষ্টাদ্বারা জ্ঞানে সম্যক্ প্রসাদ আসিতে পারে না। এইজন্যই তাঁহার কৃপায় যখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তখনই প্রকৃত জ্ঞানপ্রসাদ লাভ হয়। নামে জ্ঞানী হইতে পারে সকলেই, কিন্তু জ্ঞানপ্রসাদ সকলে লাভ করিতে পারে না। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জ্ঞান সার্থক হইয়া উঠে; জ্ঞানের এই সার্থকতার নামই জ্ঞানপ্রসাদ। যাঁহার বিষয় লইয়া চর্চ্চা করি, তাঁহার বিন্দুমাত্র আভাস ইঙ্গিতও যদি হৃদয়ে না পাই, তাহা হইলে সেই চর্চ্চার মূল্য কি? জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াও যে সকলে তাঁহার বিষয়ে অনুভূতি লাভ করিতে পারে না, তাহার একমাত্র কারণ অন্তঃকরণের মালিন্য। এইজন্যই জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণকেও মার্জ্জিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই জ্ঞানদ্বারা যাঁহার চর্চ্চা করিতেছি, তিনি অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে নিবিড় অনুভূতি লাভ করিতে হইলে—ধ্যানের বিশেষ প্রয়োজন। তখন এক তত্ত্বে মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষ্য—একেকে জানা। কাজেই প্রকৃত জ্ঞান চর্চ্চায় স্বভাবতঃই মানুষকে একের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। ধ্যানে সেই **একই** বিশুদ্ধান্তঃকরণে নিবিড় ঘনীভূতরূপে আবির্ভূত হন। তখনই উপনিষদের ঋষি বলেন—"**ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং, যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।**" সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া যিনি বর্ত্তমান, ধ্যানে তাঁহারই স্বরূপ উপলব্ধি হয়। উপরোক্ত তিনটী উপায় দ্বারাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর।

যোগো ভবতি দুঃখহা



মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সংযম-নিষ্ঠা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে স্বাভাবিকই অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। একরাত্রে যিনি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারই যত সব অদ্ভুত-উৎকট উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপ অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বনের ফল কিছুতেই কল্যাণপ্রদ হয় না। অনেকে হয় ত একটা কিছু পাইয়া ফেলেন বটে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞান-বিকাশের পরিবর্ত্তে বিভূতি-ঐশ্বর্য্য এই সব আসিয়া দেখা দেয়। শেষে জীবনের চরম লক্ষ্য যে আত্মজ্ঞান তাহা ভুলিয়া গিয়া মানুষ নাম-যশ-প্রতিপত্তির দিকেই আশ্চর্য্যরূপে ঝুঁকিয়া পড়ে। এইজন্যই গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যপন্থারই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

পেটুকের যোগ হয় না কোনো দিন, আবার একান্ত অনাহারীও যোগের অক্ষম। অতি নিদ্রাশীল ও অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ সম্ভবপর নয়। তবে যোগের উপযুক্ত অধিকারী কে? না, যাঁহার আহার-বিহার নিয়মিত, যিনি কর্ম্মে নিয়মিত নিষ্ঠাবান এবং চেষ্টাশীল, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত। এইরূপ অধিকারীর যোগই প্রকৃত দুঃখনিবর্ত্তক হইয়া থাকে।

দৈনন্দিন-জীবনকে সংযম নিষ্ঠার সহিত পরিচালিত করিতে পারিলে, আধ্যাত্মিক-জীবনের যে ক্রমোন্নতির স্তর রহিয়াছে তাহা মানুষের জীবনে স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। তিল তিল করিয়া সাধনা করিয়াই মানুষ একদিন সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অসংযমী লোভী মানুষ ফললাভের পথে যে কত নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট পাইতে হয়, কত সংগ্রামের ভিতর গেলে পর যে পরিপূর্ণ শান্তির অধিকারী হওয়া যায়, সে সব কথা মনে স্থানই দেয় না, সুতরাং তাহাদের নিকট হঠাৎ একদিন বড় হইয়া যাওয়াটাই সব চেয়ে বড় কথা। কিন্তু এই বড় হওয়ার মূলে যে কত আত্মত্যাগ, কত সাধননিষ্ঠা সঙ্গোপিত রহিয়াছে, তাহার খবর রাখে কয় জন?

এক তালে, এক সুরে জীবনটাকে পরিচালনা করিতে হইলে, নিজের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা চাই। কতদিকের প্রলোভন, কত উত্তেজনা আসিয়া নিয়ত আমাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টানিয়া লইয়া যাইবার দরুণ সচেষ্ট, কিন্তু এই সব অহিতকর আকর্ষণের হাত হইতে নিজকে বাঁচাইয়া চলিতে পারিলে, তবে জীবনের পরম সার্থকতার দিকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমরা এক এক সময় হয় ত খুব কর্ম্মী হইয়া উঠি, এক এক সময় যোগী হই, এক এক সময় ভক্তির আতিশয্যে কত কিছুর অভিনয়ই না করিয়া থাকি, কিন্তু কোন ভাবই স্থায়ী হয় না। কতক দিন হয়ত নিজের উপর সুতীক্ষ্ণ নজর রাখিয়া চলি, আবার কতক দিন

নিজকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিই। এই জন্যই আমরা ঠিক ঠিক ফললাভের অধিকারী হইতে পারি না। নিয়মিত চেষ্টা, নিয়মিত সাধনের যে কি শক্তি, তাহা আজ আমরা মহাত্মা গান্ধীর জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তিনি জঙ্গলে গিয়া হেঁটমুণ্ড হইয়া কোন সাধনাও করেন নাই, অথচ তিনি যে যোগশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া কে না বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতেছে? উপরোক্ত গীতার শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝিয়া জীবনটাকে সেইভাবে পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যটাই মানুষকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অনাড়ম্বরভাবে, অথচ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত হইয়া তিনি বরাবর কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী কর্ম্ম নিয়মিত, তাহার মাঝে কোনরূপ উত্তেজনা নাই যে পরে অবসাদ আসিবে। নিঃশব্দে প্রবাহের মত তাঁহার জীবন চলিতেছে। তিনি আমাদের, স্বাভাবিক নিয়মিত চেষ্টা-উদ্যমেরও যে কিরূপ অসীম শক্তি রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলিয়াছিলেন—"Great occasions rouse even the lowest of human beings to some kind of greatness, but he alone is really the great man whose character is great always, the same wherever he be." এই কথাগুলোর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহাত্মার জীবন! যে কোন অবস্থাতেই তিনি পড়িয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য বা ক্ষোভ কোথায়ও প্রকট হইয়া উঠে নাই। এই ঠিক যোগীর লক্ষণ, সর্ব্বত্রই যোগ-যুক্ত হইয়া থাকা।

যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন, তাহাতে নিষ্ঠা থাকা চাই। এই নিষ্ঠাই মানুষের ভিতর অতুলনীয় শক্তির কেন্দ্র সৃষ্টি করে। নিষ্ঠা জিনিষটী জগতের কোন বাধা-বিঘ্নকে গ্রাহ্য করে না। আমাদের ভিতর আজকাল এই নিষ্ঠা জিনিষটীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ফাঁকি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার অদ্ভুত উপায়-কৌশল আবিষ্কারের দরুণ উৎকট যোগীর পেছনে পেছনে ফিরিতে হয়। স্বাভাবিক জীবনেরও যে একটা অমোঘ শক্তি রহিয়াছে, এই কথা মোটেই আমরা বিশ্বাস করিতে চাই না।

কোন একটা বিষয়েরই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারি না আমরা। একদিন হয় ত খুব আসন প্রাণয়াম ইত্যাদি করিলাম, আর দশ দিন হয় ত কিছুই না; একদিন হয় ত অনেক সময় ধ্যান করিলাম, আর একদিন হয় ত ধ্যানে এক মিনিট সময়ও বসিতে পারিলাম না। নিয়মের এই যে ব্যভিচার, এইজন্যই নিয়মের ঠিক ঠিক উপকারিতা এবং শক্তি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু নিয়মকে যাঁহারা মহানিয়মে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে কোন প্রতিবন্ধকই প্রতিবন্ধক নয়। অবিচলিত স্থৈর্য্য লইয়া সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াও নিয়মকে তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিয়া চলেন।

ব্যভিচার করিয়াই আমরা শক্তির অপব্যয় করি, তাহা না হইলে সংযতজীবন-যাপনে মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে। ভোগের ক্ষেত্রে পড়িয়া আমরা দিশেহারা হইয়া যাই বলিয়াই ভোগ আসিয়া আমাদের উপর এত প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হয়। গার্হস্থ্যজীবন অধঃপতনের হেতু নয়। কিন্তু সংযমের প্রতি নিষ্ঠা হারাইয়াই মানুষ পশুতে পরিণত হয়। তখন আর পরিমিত ভোগে মন তৃপ্ত হয় না—ভিতরে পাশবিক শক্তিই তখন অতি-মাত্রায় প্রবল হইয়া উঠে।

আধ্যাত্মিক জীবনটাকে আমরা সম্পূর্ণ অলৌকিক জীবন বলিয়া মনে করি; তাহার কারণ,

আমরা দৈনন্দিন সাধনার যে কতখানি শক্তি, তাহার সন্ধান রাখি না। সাধারণ লোক হইতে যিনি উন্নত—তিনিও মানুষই, তবে তাঁহার বিশেষত্ব হইল এই যে, তিনি কোন এক বিষয়ে হয়ত নিয়মিত চর্চ্চা করিয়া সাধারণ লোকের মন বুদ্ধির অগোচর এক অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। সাধারণ লোক কোন একটা বিষয়ই নিয়মিত চর্চ্চা করে না বলিয়াই হয়ত সে শক্তি লাভ করিতে পারে না। তখন মানুষ মনে করে সিদ্ধিলাভের বোধ হয় কোন এক অলৌকিক উপায় রহিয়াছে, তাহা একমাত্র যোগী ঋষিরাই অবগত আছেন।

সাধন-ভজনে নিষ্ঠা থাকিলেই সাধন-ভজনের যে একটা দৈবী শক্তি রহিয়াছে তাহা মানুষ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু নিষ্ঠা হারাইলে কোন কিছুই উপলব্ধিতে পাওয়া যায় না। এক দিনের একটুখানি প্রযত্ন-চেষ্টা-উদ্যমের কোন মূল্য নাই। নিয়মিত সাধনার দ্বারাই মানুষ সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইয়া থাকে।

উত্তেজনা এবং আবেগের আতিশয্য উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া বেশ প্রশান্ত চিত্ত লইয়া নিয়মিত সাধন করিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলেই অবসাদ বা ক্লান্তি আসিয়া চিত্তের প্রশান্তিকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। এইজন্যই গীতায় যুক্ত চেষ্টার এত প্রশংসা করিয়াছেন। উত্তেজনাবিহীন, অথচ হৃদয়ে পরিপূর্ণ উদ্যম যাঁহার রহিয়াছে—তিনিই প্রকৃত নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক কর্ম্মী। ঝোঁকে বা আবেগের বশে মানুষ অনেক কিছুই করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহার কোন স্থায়ী মূল্য নাই। পতঞ্জলিতে 'স্থিতি প্রবাহ' বলিয়া একটী কথা রহিয়াছে; আমাদের জীবনেও একদিকে স্থিতি থাকা চাই, অপরদিকে চেষ্টা-উদ্যমের ভিতর দিয়া প্রাণ শক্তিরও পরিচয় দিতে হইবে। সাময়িক উচ্ছ্বাসের পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে বরঞ্চ যতখানি আগাইয়া দেয়, পরিশেষে আবার ততখানি পিছাইয়াও দেয়। এইজন্যই সকল রকমের বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত গীতার শ্লোকটীতে প্রকারান্তরে 'নিষ্ঠা' কথাটীর উপরেই সমস্ত তাৎপর্য্য রহিয়াছে। সাধারণ লোকের মাঝে এই নিষ্ঠা জিনিষটারই বড় অভাব। এই বিষয়ে তাহারা মনের মাঝে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিতে পারে না। অথচ নিয়মিত সাধনা দ্বারাই যে মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হইতে পারে, এই কথা সাধারণ লোকদিগকে বুঝানোও অসম্ভব!

চতুরাশ্রমের মূল হইতে যিনি নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছেন, তিনিই ঋষিপদবাচ্য। ঋষি হওয়া মানে সকল রকমের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার দরুণ গুহা-গহ্বরে প্রবেশ করা নয়। অলৌকিক কোন উপায় আছে কিনা, ইহার অনুসন্ধান করে তাহারাই, যাহারা মূল হইতেই ব্যভিচারী। তাহা না হইলে হিন্দুর চতুরাশ্রমের ভিতর দিয়াই জীবন ক্রমশঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়। সংযম-নিষ্ঠার সহিত চলিলে কোন আশ্রমের প্রতিই অতিরিক্ত মায়া বা আসক্তির দরুণ আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না; পরিমিত আহার-বিহারে মানুষের মন চঞ্চল হয় না। লোভেই মানুষকে নরকের পথে লইয়া যায়। সংযতচিত্তে লোভের আধিপত্য নাই, এইজন্যই সংযমীই দেব-জীবন লাভ করিয়া মর্ত্ত্য সংসারে অনাবিল আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকে।

——:০:——

প্রণিধানের বিষয়

ক্ষোভ নিয়ে বা ঝোঁকের মাথায় যখন চলে মানুষ, তখন অনেক সময় পরিণামের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে, যা একবার ধরে বসেছে, তাই নিয়ে সে অনর্থক সময় নষ্ট করে। দেশ, কাল, পারিপার্শ্বিক কোন কিছুই অবজ্ঞার বিষয় নয়। সবল মানুষের ঘাড়ে কিছু বেশী বোঝা চাপিয়ে দিলেও বড় বেশী কিছু আসে যায় না, কেননা অতিরিক্ত বোঝার ভারটা সে সয়ে নিতে পারে, তার গায়ে তেমন লাগে না ; কিন্তু যে দুর্ব্বল, তার সম্বন্ধে বুঝে শুনে ব্যবস্থা না করলে তাকে মরার পথে জোর করে ঠেলে দেওয়া হয় শুধু। স্মুতরাং অবস্থা বুঝেও ব্যবস্থা করতে হয়। সেখানে গোঁড়ামি করলে প্রকারান্তরে অন্যায় অত্যাচারই করা হয়।

আত্মার সুষ্ঠু বিকাশ যাতে হয়, তার দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। সে বিকাশের পথে সবকেই একরূপ নিয়ম পালন করে চলতে হয় না। এক এক জনার ধাত এক এক রকম। সবল আত্মা স্বেচ্ছায় আচারের বিশাল বোঝা বহন করেও প্রফুল্ল থাকে, কিন্তু নানা কারণে আত্মা যেখানে ক্লিষ্ট, অবসন্ন, সেখানে অল্প বোঝা দিয়েই তাকে রেহাই দিতে হবে। আত্মার বলিষ্ঠ অনুভূতি লাভ করে স্বেচ্ছায় যদি কেউ আচারের বোঝা বহন করে, তাহলে সেখানে কোন ক্ষতির কারণ নাই, উৎপীড়ন করে বোঝা বহাতে গেলে যে তার মৃত্যুকে ডেকে আনা হয়।

পরিবর্ত্তনের দিকটা—লীলার দিকটা উপেক্ষার বিষয় নয়। পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই স্থিতিবাদী দুঃখ করলেও পরিবর্ত্তন হয়ে চলবেই। চিরকাল যে এক বিধান বা একরূপ নিয়মই কল্যাণপ্রদ হবে, তার কোন মানে নাই। একদল লোক আছে, তারা অতীতের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে বহুদিনের বিধি-বিধানেকেই নিষ্ঠার সহিত মেনে চলে, কিন্তু এই মেনে চলাতে কি ফল, বা কি লাভ সে সব তলিয়ে দেখবার দরুণ যেরূপ সচেতন-জাগ্রত মনের আবশ্যক, দিনে দিনে তারা সে অমূল্য-ধনকে হারিয়ে বসছে। কেবল মাত্র আচার রক্ষার দরুণ একদল লোকের প্রয়োজন থাকতে পারে বটে, কিন্তু তারাই সর্ব্বেসর্ব্বা নয়, এ কথাটী মনের মাঝে বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে।

কারও ব্যক্তিগত প্রভাবে হয়ত সকলেরই ভাল-মন্দ বিচারের কোন প্রয়োজন না-ও থাকতে পারে। কিন্তু সেরূপ শক্তিধর পুরুষের অভাব যেখানে, সেখানে পরিণাম-ফলাদির কথা বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আচার আত্মারই বাহ্যরূপ। কেবল মাত্র বাহ্যরূপের দিকেই অতি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়লে আসল দিকটা যে একেবারে বরবাদ পড়ে যায়। আমাদের জীবনের লক্ষ্য—আত্মার চরম বিকাশ ! আচার চরম কিছু নয়, আত্ম-বিকাশের অনুকূল বলেই আচারকে শ্রদ্ধা করা। কিন্তু মানুষ এ জায়গাতেই বড্ড ভুল করে বসে।

আত্মা অচল-অটল-নির্ব্বিকার বটে, কিন্তু

প্রকৃতি চঞ্চলা। এই চঞ্চল প্রকৃতিকে নিয়ে ঘর করতে হলে, একে উপেক্ষা করাও মুস্কিল, আবার সম্পূর্ণ এর অনুগত হয়ে চলাতেও বিপদ। সুতরাং নির্ব্বিকার পুরুষেরও একটা রফা করে চলা প্রয়োজন। আর জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে একটা রফা করেই চলেন।

সমস্যা না উঠলে কোন কথাই নাই, কিন্তু যেখানে সমস্যা উঠে গিয়েছে, সেখানে একটা সামঞ্জস্যজনক ব্যবস্থা করতেই হবে। অবজ্ঞা করে সুব্যবস্থা না করলে প্রচণ্ড ক্ষতি সহ্য করতে হয়।

মন বৈচিত্র্যেরই পক্ষপাতী, সুতরাং এক বকমের ব্যবস্থা তার কাছে বেশীদিন রুচিকর থাকে না, কাজেই মনের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থারও রদ-বদল অনেক সময় করতে হয়। ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে অনেক ক্ষেত্রেই অমঙ্গল না হয়ে মঙ্গলই হয়।

জ্ঞানের আলো পেছনে না থাকলে অনেক সময় না বুঝে, না দেখে আমরা অনেক আপেক্ষিক বিষয়ের প্রতি ধাবিত হই। জ্ঞানের অভাবে মানুষের বুদ্ধিও স্থূল হয়ে ওঠে, তখন দেবতার পূজা নিয়ে ভোগ নিয়ে মতামত ও দলাদলি আরম্ভ হয়। কিন্তু ঋষিদের আদর্শ যদি ধরে নিই, তাহলে আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতের চরম অনুভূতি লাভ করে গিয়েছেন - কিন্তু বিশিষ্ট দেবতার পূজা-ভোগ নিয়ে তাঁদের মাঝে বিরোধ, মতানৈক্য কোনদিন হয়নি। তাঁদের ভাব-ভক্তি সবের মূলেই উজ্জ্বল জ্ঞানের আলো রয়েছে। সুতরাং ভাবের মাঝে মালিন্য আসতে পারেনি, ভক্তির মাঝে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করতে পারেনি। তাঁরা সেই ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন—যে ঈশ্বর চরাচরে ব্যাপ্ত,—সুতরাং সে ঈশ্বর কারও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা নয়—সে ঈশ্বর বিশ্বসত্তা, বিশ্বভাব। ঋষিরা সেই ভাবেরই পূজারী ছিলেন। ভাব-জগতে বিরোধটা খুবই কম। কিন্তু ভাবজগতে প্রবেশ করতে হলে, মন-বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত সূক্ষ্ম হওয়া চাই। স্থূল মন-বুদ্ধি নিয়ে সে জগতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য!

যত স্থূলে নেমে আসি আমরা, ততই বিরোধের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে উন্নত হয়ে গেলে তখন আর তত বিরোধ থাকে না। স্থূলে নিজের স্বার্থটা কিছুতেই বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না, কিন্তু ভাবের সন্ধান পেলে স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দেওয়া তত কঠিন হয় না। এই জন্যই দেখি, যাঁরা নাকি ভাবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, তাঁদের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার লেশ থাকে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মায়ের উপাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি বহুজন্মের সুকৃতিফলে এবং সাধনা দ্বারা যে মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলেন, সে মা ভাবময়ী চিন্ময়ীজননী। সেই জন্যই মায়ের উপাসক হয়েও তিনি নিছক তান্ত্রিক হয়ে উঠেন নি। তিনি এক ভাবকে কেন্দ্র করে সকল ভাবেরই আস্বাদন করেছিলেন— সেই জন্যই তাঁর ভাব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এত সহজে। আসল জিনিষ না পাওয়া পর্য্যন্ত নকল নিয়েই মানুষ এমনি ভুলে থাকে।

মানুষ যখন অন্ধভাবে আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই মেতে থাকে, তখন তার আত্মজ্ঞানের বিকাশ মোটেই হয় না। জ্ঞান না এলে মানুষ কখনো উদার হতে পারে না। দেবতা নিয়ে, দেবতার ভোগ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি হয় অজ্ঞানীর মাঝেই।

—:০:—

নির্ব্বিকল্প সমাধি

—:—

চৈতন্যের প্রকাশাধিক্যে চেত্য অর্থাৎ বিষয় দর্শনের বিলোপ ঘটিয়া থাকে। চেতনার ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিলে তখন আর সাধারণের ন্যায় দৃষ্টি মলিন থাকে না, তখন সব চিন্ময়। পরমহংসদেবের প্রায়ই এই অবস্থা হইত। তিনি যখন সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহার কাছে এই জগতের তাৎপর্য্য অন্যরূপে প্রতিভাত হইত।

আমরা নির্ব্বিকল্প অবস্থার কথা মোটেই ধারণা করিতে পারি না। নির্ব্বিকল্প ভূমিতে যদি বিষয়ই না থাকে, তাহা হইলে ঘুম ছাড়া আর গত্যন্তর নাই, এই আমাদের ধারণা। নিরালম্ব হইয়া থাকিবার মত অবস্থা আমরা কোন দিন উপলব্ধি করি না, সুতরাং বিষয়শূন্য অবস্থা যে কি তাহা ধারণা করিয়া উঠা সাধারণ লোকের পক্ষে দুষ্করই বটে। কিন্তু নির্ব্বিকল্প অবস্থায় যদি আত্মা ঘুমে অচেতন হইয়াই থাকে, তাহা হইলে সমাধি ভঙ্গের পর মহাপুরুষরা অমন সুন্দর অনুভূতির বাণী প্রকাশ করেন কেমন করিয়া?

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর একটী কথা আছে। নির্ব্বিকল্প অবস্থা অচেতন অবস্থা নয়, বরঞ্চ নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারাই চৈতন্যের প্রকাশাধিক্য হয়। সেই অতি প্রকাশিত ঘন চৈতন্যই পরমপদ। এই অতি প্রকাশিত ঘন চৈতন্যকেই পরমহংসদেব চিন্ময়ী বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। কাজেই চৈতন্যের পরম প্রকাশ নির্ব্বিকল্প সমাধিতেই। সমাধিতে দেহ মন প্রাণের ক্রিয়া সমস্তই অন্তর্ম্মুখী হইয়া যায় এবং তখন এক অব্যক্ত জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের অনুভূতিতে সব স্তব্ধ হইয়া যায়।

নিছক চৈতন্যের প্রকাশ-শক্তিকে স্বচ্ছ আধার ছাড়া ধারণ করিয়া রাখা দুষ্কর! এইজন্যই তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন মানবের দেহ মন বুদ্ধিকেও পরিমার্জ্জিত করা অতি প্রয়োজন। বিষয়-বাসনাদ্বারা আমাদের চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কাজেই চেতনাকে সমুজ্জ্বল রাখিতে হইলে বিষয়বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্ম্মুখী হইতে হইবে।

চেতনা যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন বিষয়-জ্ঞান থাকে না, কিম্বা থাকিলেও সেই বিষয় চৈতন্য দ্বারা জড়িত হইয়া যায়। উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে— **"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।"** যাঁহারা এইরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে জগৎ আর জগৎ থাকে না। সর্ব্বত্রই যখন চৈতন্যের প্রকাশ, তখন চৈতন্য ছাড়া জগতে আর কিছুই থাকে না। তখন বাড়ী, ঘর, ঘট, পট— সবই চিন্ময় হইয়া যায়।

আমরা যা কিছু বলি, যা কিছু করি, সব এই থানের অভিজ্ঞতা দ্বারা; কিন্তু মহাপুরুষরা জাগতিক অভিজ্ঞতার উপরেও যে এক অনুভূতির রাজ্য রহিয়াছে, সেই অনুভূতির রাজ্য হইতে সমস্ত কথা বলিয়া থাকেন। সেইজন্যই স্থূল অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিরোধ ঘটিলেও পরিণামে তাঁহাদের বাণীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

দেহ-মন-প্রাণের মালিন্য হেতু আমাদের চেতনা প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। প্রতি পদে পদে বাধা

পাইয়া চেতনার উজ্জ্বল আলো আসিয়া আমাদের অন্তররাজ্যকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারে না। এই জন্যই আমরা জড়ত্বে আলস্যেই অনেক সময় কর্ত্তন করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহারা আভ্যন্তরীণ চেতনায় সমুজ্জ্বল। তাঁহারাই গীতার সাত্ত্বিক কর্ম্মী— ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিত।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যে চৈতন্যের প্রকাশাধিক্য হইয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ চিত্ত তখন নির্ব্বিষয়। বিষয়-বাসনা দ্বারাই মানবের চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে, কিন্তু চৈতন্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলে সর্ব্বত্রই তাহার ব্যাপ্তি হয়, এবং তাহাতেই প্রত্যেকের ভিতর রূপান্তর আসে।

আমাদের জ্ঞান অল্প কিন্তু জ্ঞেয় অনেক। মহাপুরুষদের কিন্তু ঠিক এর বিপরীত, তাঁহাদের জ্ঞানই বেশী, জ্ঞেয় অল্প। পাতঞ্জলদর্শনের কৈবল্য পাদে একটী শ্লোকই রহিয়াছে—

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ
জ্ঞেয়মল্পম্॥ ৩০

অর্থাৎ সেই সময়ে জ্ঞানের বা বুদ্ধিসত্ত্বের কোন প্রকার আবরণ থাকে না। আবরণ না থাকায় জ্ঞানের বা বুদ্ধিসত্ত্বের আলো অনন্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং জ্ঞেয় তখন অল্প হইয়া যায়। চিত্তের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ শক্তি রহিয়াছে, কিন্তু নানা আবরণ দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। আবরণ উন্মোচিত হইয়া গেলে তখন আর প্রতিবন্ধক না থাকায় চিত্তের যে স্বাভাবিক প্রকাশ-স্বভাব রহিয়াছে তাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আর এইজন্যই যোগীরা সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। একটা বিষয়কে বুঝিতে হইলে বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা দ্বারা যত সময় লাগে, অন্তরের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিভা দ্বারা বুঝিতে তাহার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। হাতে যদি আলো থাকে, তাহা হইলে চলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যায়। কাজেই তত্ত্ব অবগত হইবার দরুণ বুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধিসত্ত্বের প্রয়োজন বেশী।

নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থাও এইরূপ। অর্থাৎ তখন আর কোন বিষয়রূপ প্রতিবন্ধক থাকে না, সুতরাং চৈতন্যের প্রকাশে কোন বাধাই থাকে না। আর মানুষের চৈতন্য যদি সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকে, তাহা হইলে বিষয়াসক্তিতে মানুষ কখনো অন্ধ হইয়া পড়িতে পারে না। সাধারণতঃ আমাদের বিবেক এবং চেতনা অস্পষ্ট বলিয়াই বাহিরের উপদ্রব ও দৌরাত্ম্য আমাদের উপর খুব বেশী রকম ক্রিয়া করিয়া থাকে।

ঘুম— অবসাদ— জড়ত্ব, এই সবের উপদ্রব হয় অচেতন মানুষের উপরই বেশী। নির্ব্বিকল্প সমাধিপদারূঢ় ব্যক্তির চিত্ত নির্ব্বিষয় হেতু সর্ব্বদাই চেতনা দ্বারা প্রদীপ্ত। সুতরাং নির্ব্বিকল্প অবস্থায় মানুষ চির-প্রবুদ্ধ চির-জাগ্রত থাকে। কোন সময় যাঁহাদের চেতনা বিলুপ্ত হয় না, স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তি কোন অবস্থাতেই তাঁহারা অপ্রবুদ্ধ হইয়া পড়েন না। নির্ব্বিকল্প সমাধিকে অনেকটা সুষুপ্তির সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিপদারূঢ় ব্যক্তি এই সুষুপ্তির মাঝেও জাগ্রত!

অতি প্রকাশিত ঘন চৈতন্যই পরমপদ। আর সেই পরমপদ লাভ করিতে হইলে নির্ব্বিকল্প সমাধিই একমাত্র উপায়।



অভিজ্ঞতা

—(:০:)—

কেউ অধীন হয়ে থাক্‌তে চায় না— সকলেই প্রভুত্ব চায়। এতেই প্রমাণ হয়, প্রত্যেকের ভিতর সেই বিশ্ব-সম্রাট আত্মা রয়েছেন। অপরের আদেশ প্রতিপালন করে চল্‌তে হয় যেখানে, সেখানে সেই আত্মার কর্ত্তৃত্বকে যেন লাঞ্ছিত করা হয়—এইজন্যই একজন অন্যজনের আদেশ মেনে চল্‌তে গিয়ে অনেক সময় ক্ষেপে ওঠে। মূলের ভাবই স্থূলেও এসে ক্রিয়া করে। মূলে প্রত্যেকেই স্বাধীন বলে, অধীনতাকে সকলেই নিদারুণ অভি-শাপ বলে মনে করে।

দশজনকে পরিচালনা করতে গিয়ে দেখেছি, যখন তাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ আমাকে করে দিতে হয়েছে, তখন যেন নিরানন্দে, অনিচ্ছাসত্ত্বে তারা কোনমতে কার্য্য সম্পাদন করেছে। কিন্তু স্বাধীন ভাবে যখন তারা কর্ম্ম করে, তখন দেখি তাদের কর্ম্মে কি উদ্যম, আর অল্পে যেন বহু কাজ করে ফেলে!

আমি স্বাধীন— এই কথা মনে করে প্রত্যেকেই অপার আনন্দ অনুভব করে। আর এই আনন্দের শক্তিতেই স্বেচ্ছায় তখন মানুষ অসংখ্য কর্ম্ম-বন্ধনেও নিজকে জড়িত করে ফেলে সুখ পায়। স্বাধীন মানুষের কর্ম্মের ইয়ত্তা নাই। তাদের কর্ম্মের গ্লানি এক কথাতে মুছে যায়—আমি তো স্বাধীন! আমি যা করি—স্বেচ্ছায়, অপরের ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে নয়।

কিন্তু মানুষ বড় একদিকে ভীতু। তার মনে কেবল এই প্রশ্ন জাগে, হয়ত স্বাধীনতা পেয়ে ওরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ্‌বে, সুতরাং যত পার বাঁধন কষে দাও। এই করে করে আত্মা যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন আর ভিতরে কর্ত্তৃত্ব-শক্তি মোটেই থাকে না—সুতরাং বাধ্য হয়ে অপরের ইচ্ছায় মরার মত চল্‌তে হয়, তখনই কোন কোন নীতিবাগীশ লোক নিজের কৃতকার্য্যতার কথা মনে করে আশা-তীত আনন্দে মস্‌গুল হয়ে থাকে। কিন্তু মন-মরা মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করে মানুষ যে কি সুখ পায়, আর তাতে তার কি গৌরব বাড়ে, বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

মুক্তি না পেলে মানুষের ভিতর সত্যিকার কোন জিনিষই ফুটে উঠে না। অপরের ভয়ে প্রাণ যেখানে সঙ্কুচিত, সেখানে প্রাণের অফুরন্ত লীলা দেখা যাবে কেমন করে? মানুষ কিন্তু আনন্দই উপভোগ করতে চায়—কিন্তু অনেক সময় বিবেচনার অভাবে আনন্দের ঔৎসুক্যেই মানুষ অত্যাচার উৎপীড়ন ইত্যাদি আবর্জ্জনা দ্বারা ভরপূর করে ফেলে।

নিছক কাজ আদায় করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কড়া নিয়মের সার্থকতা আছে বটে, কিন্তু কাজ কর্ম্মের ভিতর দিয়ে যেখানে মানুষ নিজকেই অর্থাৎ স্বরূপকেই ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়, সেখানে কেবল নিছক আদেশ বা নিয়ম তেমন কার্য্যকরী হয় না। বরঞ্চ তাতে আত্ম-বিকাশের পথে বিঘ্ন উৎ-পন্ন হয়।

আদেশ করে অনেক জায়গায় অকৃতকার্য্য

হয়েছি, কিন্তু বিনা আদেশেও আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, অনেকবার এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। সুতরাং যেখানে পরিচালকের আদেশ করতেই হয় না, সে পরিচালকের ভাগ্য অতীব ভাল। আদেশকে যেখানে মানুষ অপমানের বিষয় বলে মনে করে, সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব খুবই প্রবল এই কথা মনে করতে হবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আদেশের চেয়ে বিনা আদেশে কাজ হয় ভাল।

কর্তৃত্ব খাটাতে পারলাম না বলে অনেক সময় আমরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। কিন্তু যেখানে বিনা-কর্তৃত্বে কর্তৃত্ব বোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে—সেখানে তো সবাই সমান। আর সকলই যেখানে সক্ষম, স্বাধীন—সেখানে বিরোধ হবে কোন্ দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করে? যেখানে রেষারেষি প্রবল, সেখানে নিশ্চয়ই কারও না কারও ভিতর মারাত্মক গলদ রয়েছে। কর্তৃত্বের লোভ আর কর্তৃত্বের শক্তি আয়ত্ত করা আলাদা। অনেক সময় আমরা ক্ষমতার বাইরে লোভ করতে গিয়ে নিদারুণ আঘাত পেয়ে থাকি।

শুধু কথায় মান-সম্মান আদায় করা যায় না। মান-সম্মান-শ্রদ্ধা এ সব অন্তরের জিনিষ; জোর করে আর সব আদায় করা সম্ভবপর, কিন্তু একজনের ভিতরের সম্মান-শ্রদ্ধা অন্যে জোর করে আদায় করতে পারে না।

আমাকে সবাই মেনে চলুক—এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যাতে মানুষ মানে তার দরুণ শক্তি-বিশেষে আমায় অধিকারী হতে হবে। তা না হলে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা কঠিন। অপরের দেওয়া সম্মানের পদবী লাভে কোন ফল হয় না। সম্মান পাবার যোগ্য নিজকেই হতে হবে।

অপরের উপর কর্তৃত্ব করতে গেলেই অপরের চেয়ে অনেকগুলি গুণে আমাকে গুণবান্ হতে হবে। গুণের আদর সর্ব্বত্র। কাজেই তখন বিনা আদেশে, বিনা-কথায় কর্তৃত্ব করা হয়ে যায়। একজন আমার উপর খুব রাগ করল, তাকে জয় করতে হলে আমাকে রাগের উপরে উঠে যেতে হবে। অর্থাৎ যে আমার উপর রাগ করল, সে যদি মোটেই আমার মাঝে রাগের বিন্দুমাত্র চিহ্ন না দেখে, তাহলে তার আক্রোশ আপনি প্রশমিত হয়ে যাবে। আমি যদি তার রাগকে আমার রাগ দিয়ে বর্দ্ধিত না করি, তাহলে একলার রাগ ইন্ধন না পেয়ে আপনি নিভে যাবে। নিরভিমানী, অমায়িক না হলে কর্তৃত্বে পরস্পরের মাঝে বিরোধের অনল জ্বলে ওঠে।

হীন হয়ে কেউ থাকতে চায় না, আর কাউকে হীন মনে করাও অন্যায়। কিন্তু সকলে কর্ত্তা হয়ে উঠলে কর্ম্ম করবে কে? এরূপ আশঙ্কা করেই আমরা মাটী করি। স্বাধীনতা নিয়ে কর্ম্ম করতে পারলে কর্ত্তাও কর্ম্ম করে অপমান বোধ করে না। সুতরাং কর্ম্ম করার লোকের অভাব তখনো থাকে না।

কারও মতকে উপেক্ষা করতে নাই। কেউ যদি বুঝল, কোন না কোনও দিক দিয়ে আমি উপেক্ষিত, তাহলেই তার ভিতর আগুন জ্বলে ওঠে। নিজকে অপমানিত হতে দেখে কেউ স্থির থাকতে পারে না। সুতরাং পরিচালককে সকলের কথা শুনতে হয়, সকলের মতকে শ্রদ্ধা সম্মান করতে হয়। অনেক সময় নিজের উন্নত আদর্শের কথ ছেড়ে দিয়ে লোকমতকেই গ্রাহ্য করে চলতে হয়। এই ভাবে চললে তবেই দশ রকমের মানুষ নিয়েও সঙ্ঘপরিচালনা সম্ভবপর, তা না হলে কেবল বিরোধই লেগে থাকে অনবরত।

অপরকে যে সম্মান দিতে জানে না, অপরের

কাছ থেকে সম্মানের প্রত্যাশা করাও তার পক্ষে অনুচিত। সকলের কথা, সকলের মত গ্রহণ করা সব সময় সম্ভবপর নয়, কিন্তু মতকে শ্রদ্ধা করলে মানুষ ক্ষেপে উঠে না।

প্রত্যেকের ভিতর একটী সদাজাগ্রত পুরুষ রয়েছেন। কাজেই কাউকে উপেক্ষা করে চললে সেই মহান্ পুরুষকেই অবমাননা করা হয়। তখন আত্মাই আত্মার শত্রু হয়ে ওঠে। নিজের শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস, আর অপরকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করলেই, সেই তুচ্ছ অবজ্ঞাত ব্যক্তির মাঝেই আবার দুর্দ্দান্ত শক্তির ক্রিয়া দেখা দেয়। কাজেই উপনিষদের ঋষির ন্যায় আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত। এ কথা মনে করতে হবে, ভগবান কাউকে ছোট করে সৃষ্টি করেন নি; সুতরাং মানুষকে ছোট নজরে দেখলে ভগবানের সৃষ্টিকেই প্রকারান্তরে অবজ্ঞা করা হয়।

আনন্দের শক্তি

—(:০:)—

আনন্দই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যে জাতির প্রাণে আনন্দ নাই, সে জাতির বাহুতেও শক্তি নাই। আনন্দেই মানুষকে পরিপূর্ণ শক্তিতে উচ্ছ্বসিত করে তুলে। ঋগ্বেদে ঋষিদের প্রার্থনার মাঝে আনন্দেরই অফুরন্ত উচ্ছ্বাস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জ্ঞানে-কর্ম্মে-শক্তিতে সামঞ্জস্যভাবে তাঁহাদের জীবন পরিচালিত হ'ত বলেই কোন দিকেই তাঁদের মনমারা ভাব ছিল না।

যে-কোন রকমের ভয় প্রাণে থাকলেই, দর্শনে কাব্যে সাহিত্যে সর্ব্বত্রই একটা দুর্ব্বলতার রেখা থেকে যাবেই, সেখানে ঠিক ঠিক প্রাণের কথা নিঃসঙ্কোচে খুলে বলা চলে না। কাজেই বাক্যে, চিন্তায় সংযম করে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াতে হয়। কি জানি কোন্ দিক থেকে কে এসে চেপে ধরে!

এইজন্যই মনের মাঝে ভয় বা সঙ্কোচ থাক্‌লে ঠিক ঠিক আনন্দ ফুটে না। শিশুর অনর্গল হাসির ফোয়ারার একমাত্র কারণই হল শিশু নির্ভীক, জগতের কারও সে তোয়াক্কা রাখে না। নিজের স্বাধীনতার মাঝে শিশু এইজনাই অনন্দে সর্ব্বদা গদ গদ হয়ে থাকে।

আনন্দে-হাসিতে মানুষের প্রাণের দৈন্য, কুণ্ঠা, সঙ্কোচও অপসারিত হয়ে যায়। তখন মানুষের মাঝে যে মহত্ত্ব স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে, তা শতদলের ন্যায় তার সমস্তগুলি দল আস্তে আস্তে বিকশিত করে তুলে। এইজন্যই দেখি স্বাধীন জাতির সবই সুন্দর, তাদের প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কর্ম্মে অপরের মনকে আকর্ষণ করে। আর করবেই না বা কেন? প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত আকুল ইচ্ছাই যে হ'ল স্বাধীন হওয়া।

দুঃখের মাঝে পড়ে সাংখ্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু উপনিষদের প্রত্যেকটী বাণী আনন্দের উৎস থেকে জন্ম নিয়েছে। উপনিষদে এইজন্যই দেখি সর্ব্বত্রই অমৃতের কথা, অমৃতের সন্ধান দেওয়ার দরুণই ঋষির প্রাণের ব্যাকুলতা। উপনিষদ পড়ে যে প্রাণে

এক অব্যক্ত আনন্দের তরঙ্গ উঠে, এর একমাত্র কারণ, উপনিষদ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়— ঋষিরা খোলা প্রাণে আনন্দেরই অভিব্যক্তি করে গিয়েছেন। কোথায়ও সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী নাই, একটা স্বাধীন আনন্দের স্রোত নীরব নিথর গতিতে অবিরাম বয়ে চলেছে। আনন্দের দিক দিয়ে বল্‌তে গেলে, ঋষিরা সরল শিশুর মতই ছিলেন। এই শিশু-জনোচিত সারল্যের দরুণই ঋষির প্রাণ ভূমানন্দে সর্ব্বদা ভরপূর হয়ে উঠ্‌ত। নিজেদের প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ অনুভব করেই মর্ত্ত্যবাসী নরনারীকেও ঋষিরা অমৃতের সন্তান বলে সম্বোধন করে গিয়েছেন। আনন্দে থাকা, অপরকেও আনন্দ প্রদান করা, এই ছিল ঋষিদের জীবনের লক্ষ্য। তাঁরা যে কঠোরতা করেন নি তা নয়, কিন্তু সে কঠোরতার তাঁদের বলিষ্ঠ প্রাণ কিছুতেই অবদমিত হ'ত না। এই আনন্দ ছিল বলেই, রীতিমত সংসার করেও যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর্‌বার যথেষ্ট শক্তি পেয়েছিলেন।

প্রাণে আনন্দ থাক্‌লে কর্ত্তব্যের কঠোর নিপীড়নও বন্যায় খড় কুটার মত কোথায় ভেসে চলে যায়। সব চলে যায়, কিন্তু প্রাণ অফুরন্ত আনন্দে ভরপূর হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে গিয়ে বা প্রভুত্ব জারী কর্‌তে গিয়ে অপরের শক্তিকে জখম ক'রে দিই। আমি চাই অপরে আমার আদেশ প্রতিপালন করুক, কিন্তু আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে হলে কতখানি শক্তি এবং বল প্রাণে থাকা চাই সে দিকে মোটেই লক্ষ্য করি না; অপরের প্রাণকে কি করে তাজা রাখা যায়, সেদিকে মোটেই আমরা নজর দিই না; কিন্তু কর্ত্তব্য আদায়ের বেলা নিষ্ঠুর যমের চেয়েও এক ডিগ্রি চড়া!

মানুষের প্রাণ-শক্তিকে জখম করে দিলে তাকে দিয়ে আর কোন আশাই থাকে না। এ জায়গায় আমাদের মস্ত বড় ভুল। এইজন্যই অসহিষ্ণু, অপরিণামদর্শী মানুষের শক্তি পরিচালনায় দিন দিন বর্ব্বরতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের মনুষ্যত্বকে যে নাকি ছোট চোখে দেখে, তার মত বড় পাপী আছে বলে মনে করি না।

শিক্ষার প্রধান উপায়ই হল ছেলেকে এমন আবেষ্টনের মাঝে রাখা, যেখানে সে আনন্দ ছাড়া নিরানন্দের কিছুই দেখ্‌তে না পায়। এই আনন্দের ভিতর দিয়েই ছেলের মাঝে শক্তি এবং সৃষ্টি ক্ষমতা দুটো জিনিসই দেখা দেয়। নিরানন্দ-আবেষ্টনীর মাঝে থেকে থেকে মানুষের প্রাণশক্তি ক্ষয়রোগে ক্রমশঃ নষ্ট হতে থাকে।

আনন্দ থেকেই প্রাণ, আবার প্রাণ থেকেই আনন্দ। মানুষের রক্ত তাজা থাকে কখন?—যখন কোনরূপ দুর্ব্বলতা বা সঙ্কোচের বীজাণু শরীরে প্রবেশ কর্‌তে না পায়। বীজাণু প্রবেশ করে দুর্ব্বলের শরীরেই বেশী। এইজন্যই দেখি নিজের জীবনটা যারা অপরের আদেশে পরিচালিত একটা যন্ত্র বলে মনে করে, তাদের রোগে-শোকে-দুঃখে মুখখানা সর্ব্বদাই মলিন হয়ে থাকে। বাস্তবিকই পরাধীন মানুষের মুখ চোখ দেখে করুণা না হয় কার? অথচ মানুষই কিন্তু মানুষের উপর এরূপ নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করে! দোষ ভগবানের নয় কিম্বা আর কারও নয়— মানুষই মানুষের শত্রু, আবার মানুষই মানুষের মিত্র।

ঝিমুনী আসে বৃদ্ধের; কই যুবকের তো সময়ে অসময়ে এত আলস্য জড়তায় পেয়ে বসে না। এর কারণ কি? না, যুবকের প্রাণ শক্তি তাজা, কিন্তু বৃদ্ধের প্রাণ মরে এসেছে। মরে এসেছে বলাও

অন্যায়, মানুষই নিজকে নিজে মেরে ফেল্‌ছে। আত্মঘাতী মানুষের দরুণ কেউ দায়ী নয়।

আমি পরের দ্বারে ভিখারী মাত্র, আমার জীবন পরকে সুখী কর্‌বার দরুণই আমার অনিচ্ছাতেও উৎসর্গীকৃত, এই যদি ভাব্‌তে থাকে মানুষ অহরহঃ, তাহ'লে তাকে দিয়ে সমাজের দেশের কি হিত হবে কেউ বল্‌তে পার কি?

অনেক দিনের জীর্ণ চিন্তার জগদ্দল পাথরে মানুষের বুকটা যেন ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছে। এখন মানুষ যদি একটু নিষ্কৃতি পায়, কেউ যদি একটু নিষ্কৃতির পথ বলে দিতে পারে, তবেই যেন মানুষ আবার বেঁচে উঠে। মানুষকে বাঁচাতে এসে ছিলেন গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ এসব মহাপুরুষরা। দুঃখ-কঠোরতা সব নিজেরা সয়ে গেছেন, কিন্তু সমস্ত জগৎকে দিয়ে গিয়েছেন আনন্দ— আনন্দ! মানুষের যখন জ্ঞান ফুটে, তখন মানুষকে মানুষ উদ্ধারের পথ বলে দেবার দরুণই আকুল হয়।

স্বাধীনভাবে চিন্তা কর্‌লে আমরা তাকে বলি উচ্ছৃঙ্খল; তার সম্বন্ধে কত আলোচনা, কত বাগ-বিতণ্ডা হয়। কিন্তু সবাই যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, তখন কে কাকে উচ্ছৃঙ্খল বল্‌বে? কাজেই নিজে নির্য্যাতন সহ্য করেও যদি ভবিষ্যতের দরুণ একটা স্বাধীন পথ আবিষ্কার করে রেখে যাওয়া যায়, তাহ্‌লে এখন অভিশাপ বর্ষণ হলেও ভাবী মানব তাঁর স্বাধীন চিন্তার পুরস্কার না দিয়ে পার্‌বে না। ইতিহাসেও এর যথেষ্ট নজীর পাওয়া যায়।

আসলে মানুষ কিন্তু স্বাধীনতাই চায়, প্রাণে অফুরন্ত আনন্দের তরঙ্গ বয়ে চলুক এই চায়— কিন্তু চারিদিকের চাপে তার ভিতরকার মানুষটী এত ছোট হয়ে আসে যে, নিজে তো প্রাণের কথা বল্‌বার মত সাহসই পায় না, এমন কি অপরেও যদি প্রাণের সত্যিকার কথাটা বলে দেয়, তখন প্রাণে একরূপ সহানুভূতির ভাব থাক্‌লেও দশের সম্মুখে তীব্র প্রতিবাদ করে বসে। যে যত ভণ্ডামী করে চল্‌তে পারে, সে-ই যেন তত আদর্শ— তত বড়। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে দেখ্‌লে দেখা যায়, তাদের প্রাণ কি অসহ্য অতৃপ্তিকর বেদনায় জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে গিয়েছে। বাইরে তারা যা বলে, সব মনের দুঃখে, মনের আক্ষেপে। আসলে তারাও চায় জীবনটাকে বেশ সহজ স্বচ্ছন্দভাবে অনুভব কর্‌তে।

ভগবান্‌কে পেতে হলেই যে অদ্ভুত উৎকট কতকগুলি নিয়ম দিয়ে নিজকে ভারাক্রান্ত করে গৌরব অনুভব করে চল্‌তে হবে, তার কোন মানে নাই। অনেকের দেখেছি শেষে আচার বা অনুষ্ঠানটাই বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু আসল লক্ষ্য পড়ে যায় তার নীচে চাপা। তাদের সমাধি কি যোগ-সমাধি না যোগ-নিদ্রা কে জানে?

প্রথম বিরাগীর মনে সাধনার একটা উৎকট রূপ এসে দেখা দেয়। কেননা সে তো বিন্দুমাত্র জানে না সত্যের পথ কেমন? কাজেই প্রথম মনে করে জলের নীচে শ্বাস বন্ধ করে থাক্‌তে পার্‌লেই বুঝি চরম পুরুষার্থ লাভ হবে, মাথা নীচু করে পা গুলি উপরে তুলে ধর্‌লেই বুঝি বেশী আধ্যাত্মিক অনুভূতি পাওয়া যাবে ইত্যাদি। কিন্তু জীবনের এই প্রথম আবেগগুলি যদি মনের দিক দিয়ে—প্রাণের দিক দিয়ে খাটানো যায়, তাহলে মানুষ যে কত সহজে জ্ঞান লাভ কর্‌তে পারে!

মনটাকে তাজা রেখে তারপর বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তন। মনটাকে মেরে ফেল্‌লে বিধি-নিয়ম মেনে চল্‌বে কে? অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে মেরে ফেলেই আমরা মনুষ্যত্ব আদায় কর্‌তে চাই। কিন্তু অত্যাচারের একটা প্রতিক্রিয়াও আপনি দেখা যায়

কলির মানুষ এমনি দুর্ব্বল, তার উপর নানা কুসংস্কার, নানা দুর্ব্বল আদর্শ দ্বারা জন্ম-রোগীর ন্যায় দিন দিন মরবার পথে অগ্রসর হয়ে চল্‌ছে। এখন ওদের বাঁচাতে হলে প্রাণে আনন্দ-শক্তির সঞ্চার করতে হবে, জীবনের আর একটা দিক ওদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। প্রাণের মাঝে একটা স্বাধীনতার তরঙ্গ খেলিয়ে দিতে পারলে জীবনের তুচ্ছ সঙ্কীর্ণ দুর্ব্বলতাগুলি আপনি ভেসে যাবে। তখন এই রোগীই হ'য়ে উঠ্‌বে বলিষ্ঠ সুস্থ!

বৈদিক ঋষিরাই আমাদের জীবনের আদর্শ। তাঁদের মত সহজানন্দেই আমাদের জীবনকেও বীর্য্যবন্ত করে তুলতে হবে। সংস্কাররহিত হয়ে সরল শিশুর ন্যায় সদানন্দে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে হবে। দর্শন পুরাণ যাঁরা সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তাঁরা প্রাণের আনন্দ-সংবেগ ধরে রাখতে পারেন নি। এত লিখেও যে তাঁদের প্রাণের কথা ব্যক্ত হয় নি— অফুরন্ত আনন্দই হল তার মূল নিদান। সর্ব্বদা আমাদের আনন্দের উৎসের সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে হবে। মনকে মেরে ফেল্‌বার বিধি প্রবর্ত্তন করে যারা, তারা অপরকেও মারে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মরে। জাতিকে বাঁচাতে হলে এখন কয়-জন সদানন্দ মহাপুরুষের অব্যর্থ শক্তিসঞ্চারের ক্রিয়া চালানো প্রয়োজন। চাই আনন্দ— আনন্দের সঙ্গে শক্তি— তখন না এসে পারবে না।

অহঙ্কারের বৈশিষ্ট্য

—(:০:)—

বশিষ্ঠদেব কমললোচন রামকে উপদেশ দিতে গিয়া তিন প্রকার অহঙ্কারের কথা বলিয়াছেন। এই ত্রিভুবনে অহঙ্কার তিন প্রকার; তন্মধ্যে দুই প্রকার শ্রেষ্ঠ সুতরাং গ্রহণীয়, আর এক প্রকার নিকৃষ্ট অতএব ত্যাজ্য। "আমিই অখিল বিশ্ব, আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আমা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই"— এইরূপ অহঙ্কারকে উৎকৃষ্ট প্রথম অহঙ্কার বলে। এই অহঙ্কার বেদান্ত-সাধনায় লাভ হয়। আর সকল অহঙ্কার হইতে এই অহঙ্কারই শ্রেষ্ঠপদ-বাচ্য। আমিই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত— এই অনুভূতিই চরম অনুভূতি। এই অহঙ্কার মুক্তিরই কারণ, বন্ধের কারণ নয়। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিতেই এই অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে।

অহঙ্কার বন্ধনের হেতু বটে, কিন্তু এইরূপ অহঙ্কারে মানুষ মুক্তির দিকেই অগ্রসর হয়। সদা সর্ব্বদা এই অহঙ্কার বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলে আর কোন কথাই ছিল না। সুতরাং সাধারণ অহঙ্কারের ন্যায় এই অহঙ্কার পরিত্যাজ্য নয়। ভিতরে এই অহঙ্কার যত পোষণ করা যাইবে, ততই চিত্ত বলিষ্ঠ অনুভূতিতে দৃঢ় হইবে। এইরূপ অহঙ্কার দ্বারা ক্রমশঃ ভেদ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। সর্ব্বত্র আত্মাকেই উপলব্ধি করিতে পারিলে বিরোধ

হইবে কাহার সঙ্গে? কাজেই এইরূপ উৎকৃষ্ট অহঙ্কারের যিনি অহঙ্কারী, তিনি পরম ভাগ্যবান্।

"আমি নিখিল পদার্থ হইতেই ভিন্ন"—এইরূপ জ্ঞানই শুভপ্রদ দ্বিতীয় অহঙ্কার। ইহাই সাংখ্যের বিবেক-জ্ঞান। প্রকৃতি হইতে আমি পৃথক্, আমার সঙ্গে প্রকৃতির কোন সংস্পর্শ নাই। আমিত্বকে খুব সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হয় এই ভাবে। বেদান্তে যেমন ব্যাপ্তিবোধ বা প্রসারের কথা আছে, সাংখ্যে তেমনি সঙ্কোচের কথাই বেশী। সাংখ্য নিজকে ছাড়া আর সবকেই জড় প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জড় প্রকৃতির মাঝেও আত্মদর্শন করিবার ক্ষমতা সাংখ্যের পুরুষের মাঝে নাই। সেইজন্য সাংখ্যের কেবল পুরুষের অহঙ্কারকে দ্বিতীয় অহঙ্কার বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, আর বৈদান্তিকের অহঙ্কারকে প্রথম অহঙ্কার বলা হইয়াছে।

বৈদান্তিক সংশ্লেষণপন্থী— সুতরাং তাঁহার ভিতর বিবেকের চেয়ে সমন্বয়ের শক্তিই বেশী। তিনি নিজকে নিখিল পদার্থ হইতে বিবিক্ত করিয়া উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক নন, কেননা— তাঁহার আত্মজ্ঞান নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। জগতের সঙ্গে মিতালী করিয়া চলিতে পারেন একমাত্র বৈদান্তিক, কারণ বৈদান্তিকের কাহারও সঙ্গে বিরোধ নাই!

সাংখ্যবাদীর মত ঠিক এর উল্টো। সাংখ্য বিবেক-জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। নিজকে পাইতে গিয়া অনেক জিনিসকে তাঁহার প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপ্ত অনুস্যূত আত্মার উপলব্ধিতে তাঁহার মনস্তুষ্টি হয় নাই! নিজকে উপলব্ধি করিতে গিয়া অনেকের প্রতি তাঁহাকে বিমুখ হইতে হইল। এইজন্যই সাংখ্যবাদী অজ্ঞাতসারে অনেকের কাছেই অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু জীবন্মুক্তি-অবস্থা লাভ করিয়া যখন সাংখ্যের পুরুষ আবার নামিয়া আসেন, তখন আর কাহারও সঙ্গে বিরোধ থাকে না। অনেক সাংখ্যবাদী কৈবল্য দশা প্রাপ্ত হইয়াই তুষ্ট হইয়া পড়েন।

বৈদান্তিকের আর আলাদা করিয়া বিবেক-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কেননা বৈদান্তিক তো নিজকে ছাড়া জগতে আর কাউকে দেখেন না—সুতরাং বৈদান্তিকের অনুভূতি বিরাট আমিরই ব্যাপ্তিবোধ মাত্র।

সাংখ্যের এই বিবিক্ত জ্ঞানকেই দ্বিতীয় অহঙ্কার বলা হইয়াছে। এই অহঙ্কার কেশাগ্র ভাগ হইতেও শতগুণে সূক্ষ্ম। উহাও জীবন্মুক্তদিগের বন্ধনের নিমিত্ত না হইয়া মোক্ষেরই হেতু হইয়া থাকে। 'নেতি নেতি' বিচার দ্বারাও মানুষ মুক্তির পথেই ধাবিত হয়।

জাতির মাঝে যখন ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিল, তখনই সাংখ্য মতের উদ্ভব। সাংখ্যমত ঠিক বলিষ্ঠ হৃদয়ের পরিচয় নয়। জগতের সকলের সঙ্গে অসহযোগ করিয়া থাকিয়া মনের মাঝে ঠিক ঠিক আনন্দেরও বিকাশ হয় না। বৈদিক ঋষি আনন্দের কথা— বিরাট-মহান-ভূমা ব্রহ্মের কথাই বার বার বলিয়াছেন।

পারিপার্শ্বিকের দোষেও মানুষের মন অনেক সময় বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে। কাজেই এমন এক সময় হয়ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যখন বৈদিক ঋষির ন্যায় পত্নী-পুত্র সহ ধর্ম্মকর্ম্ম করা কঠিন হইত। সুতরাং স্বাভাবিকই মানুষের মনে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই বিতৃষ্ণ ভাবের দরুণই সাংখ্যমতের সৃষ্টি! কাজেই সাংখ্য মতটা ঠিক স্বাভাবিক সুস্থ সবল ঋষিদের সময় উদ্ভব হয় নাই। ঘরে থাকিয়া যখন ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপন্ন হইতে লাগিল, তখনই মানুষ

একটা নিরুপদ্রব জায়গার অনুসন্ধানে বাহির হইল। নানা কারণে পুরুষ বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ায় পুরুষের কাছে বিবেক-জ্ঞানটাই প্রবল হইয়া দেখা দিল। এতদিনকার ঘর কন্না করার সংস্কার যাইবে কোথা? সুতরাং পুরুষের মন যখনই আত্মীয় স্বজনের দরুণ কাঁদিয়া উঠিত, তখনই পুরুষ বিবেক-জ্ঞানের চাবুক মারিয়া নিজকে সেই ভাবনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। কাজেই সাংখ্যের বিবেক-জ্ঞানের মাঝে একটু জোর জুলুম রহিয়াছে বৈ কি? তাহা হইলেও বিশেষতঃ আজকাল মনকে শক্ত করিবার দরুণ সাধনার প্রথমাবস্থায় বিবেক-জ্ঞানের খবই প্রয়োজন।

তিন প্রকার অহঙ্কারের মাঝে উৎকৃষ্ট দুই প্রকার অহঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে। এখন নিকৃষ্ট তৃতীয় অহঙ্কার কি তাহাই বলা হইবে। "হস্ত-পদাদিতে যে আমি বলিয়া জ্ঞান, ইহাই লৌকিক তুচ্ছ তৃতীয় অহঙ্কার; ইহা মানুষের পরম শত্রু।"

কিন্তু পরম শত্রু হইলেও সাধারণ মানুষ এই নিকৃষ্ট অহঙ্কারেই চিরাভ্যস্ত। তাহারা আমি বলিতে এই স্থূল দেহকেই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ অহঙ্কার দ্বারা চিরকাল তাহারা অজ্ঞানতায়ই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ অজ্ঞানী "আমিই পরমাত্মা" এইরূপ ভাবনা করিতে রীতিমত ভয় পাইয়া থাকে। কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত শিষ্ট অহঙ্কার দ্বয়ই একমাত্র সাহায্যকারী! তৃতীয় অহঙ্কারে মানুষ ক্রমশঃ বন্ধন দশাই প্রাপ্ত হয় শুধু।

সাধারণ স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে দ্বিতীয় অহঙ্কার অবলম্বন পূর্ব্বকই দেহাত্মবোধ বিনষ্ট করা সহজ। 'আমি দেহ নই' এই ভাবনা, এই অহঙ্কার হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতেই ক্রমশঃ দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব পর হইবে। কাজেই সাধারণ স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে 'আমি ব্রহ্ম'— এই উৎকৃষ্ট অহঙ্কার প্রথমেই অবলম্বন করা উচিত নয়। ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধি হইলে সেই উৎকৃষ্ট অহঙ্কারের অধিকারী হওয়া যায়। দেহাত্মবাদী মানবের পক্ষে দেহাদি বিবিক্ত জ্ঞানই পরম হিতকারী। উত্তম অধিকারীর পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রথম অহঙ্কারই অবলম্বনীয়, তাহাতে কোন অহিত হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইলে দ্বিতীয় অহঙ্কার অবলম্বন পূর্ব্বকই ভাবনা করিতে হইবে। যে অহঙ্কারে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, সেই অহঙ্কারের প্রতি মানুষের ভ্রূক্ষেপও নাই, অথচ যে অহঙ্কারে মানুষকে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়, সেই অহঙ্কারেই অধিকাংশ মানুষ বিমূঢ় হইয়া আছে। আসল অহঙ্কারে অহঙ্কারী হইতে পারিলে মানুষের আত্মজ্ঞানই বিকাশ হয়, খাটী অহঙ্কারে মানুষকে উন্নতির পথেই লইয়া যায়।



ব্রত-ভঙ্গ

—(:০:)—

"আচ্ছা প্রিয়ব্রত, তোমার এমন মতিবিভ্রম ঘট্‌ল কেন বলতো দেখি? আমি তো তোমাকে বরাবর ধীর স্থির সুবিবেচক বলেই জানি, তবু তোমার মাঝে এ খেয়াল চাপ্‌ল কেন বল্‌তে পার?"

"কেন জ্ঞানাঞ্জনদা, আমি এমন কি অন্যায় পন্থা অবলম্বন করেছিলাম, যার জন্যে আপনিও আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক ঠাউরিয়ে আমার কৃত কর্ম্মটাকে একটা পাগ্‌লামী বলে ধারণা করে নিয়েছেন? বাস্তবিকই কি আমি কোন শাস্ত্র বিগর্হিত কাজ করতে চেয়েছিলাম, যার জন্যে আপনি আমাকে অমন ভৎ‌র্সনা করে চিঠি দিয়েছিলেন? প্রকৃতই জ্ঞানাঞ্জনদা, আপনার চিঠি আমার প্রাণে বড্ড আঘাত দিয়েছিল।"

"এই আঘাতের ফল কি কিছু খারাপ হয়েছে প্রিয়? হয়ত আমার ভাষা তোমার মুখরোচক হয় নি, হয়ত তা তিক্ত ঔষধের মতই তোমার বিরক্তি উৎপাদন করেছে, কিন্তু তার ফলে তোমাকে যে আবার আমরা ফিরে পেলাম, এইটাই কি আমাদের পরম লাভ নয়? দেখ, যাঁরা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষীই, তাঁরা তোমার শত্রু নয়, তাঁরা চির দিন তোমার শুভ কামনাই করে আস্‌ছেন এবং চিরদিন তা কর্‌বেনও। তবে তাঁদের কাছ থেকে যে তুমি চিরকাল তোমার মনের মত ব্যবহারই পেয়ে আস্‌বে, তা মনে করো না কখনো। তুমি যদি পথ-ভ্রষ্ট হও, তুমি যদি অন্যায় আব্দার ধরে বসে থাক, তা হলে তোমার ভুল ভাঙ্গিয়ে পুনরায় তোমাকে সত্যপথে ফিরিয়ে আন্‌তে আঘাত দেওয়ার প্রয়োজন আছে বৈ কি? তা অস্বীকার কর্‌লে চল্‌বে কেন ভাই? পিতা মাতা সন্তানকে খুব ভাল বাসেন বলেই রোগগ্রস্ত সন্তানের রোগ মুক্তির জন্যে তার অপ্রিয়-কর হলেও জোর করে তিক্ত ঔষধ মুখে ঢেলে দেন, একি তাঁদের নির্ম্মমতার পরিচয় প্রিয়ব্রত?"

"বুঝি সবই জ্ঞানাঞ্জনদা, কিন্তু বুঝেও যে বুঝি না। বাস্তবিকই জানি আমি, আপনি আমার অতি বড় হিতাকাঙ্ক্ষী, তবু আপনার কঠোর ভাষা অন্ততঃ সে সময়ের জন্যেও আমার চিত্তকে বিদ্রোহী করে তুলে ছিল। আর বিশেষতঃ এ চিঠি তাঁরই অভিপ্রায়ানুযায়ী লেখা জানতে পেরে একটা প্রচণ্ড অভিমানও জেগেছিল প্রাণে।"

"তিনি তোমার হঠ-সঙ্কল্পের কথা জান্‌তে পেরে যে কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর প্রাণ যে কতখানি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তা আর ভাষায় কেমন করে ব্যক্ত কর্‌ব ভাই? সে দিনের তাঁর সেই করুণাপ্লুত মুখ খানা মনে পড়্‌লে আজও যেন বুকটার ভেতর কেমন কেমন করে ওঠে। তিনি আমাদের কত ভাল বাসেন, কত স্নেহ করেন, আমাদের ওপর কত ভরসা রাখেন, আমরাই তাঁর ভাব-গঙ্গার ভগীরথ হয়ে একদিন বিশ্বের অঙ্গনে তাঁর সঞ্চিত সম্পদ্ বিশ্ববাসীকে পরিবেশন কর্‌ব এই তাঁর আশা। তিনি এই আশা বুকে করেই আজ কত সুদীর্ঘ দিন ধরে বসে আছেন শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায়। তাঁর এই আশার মূলে কুঠারাঘাত

করা, তাঁর সেই স্নেহ-কোমল প্রাণে নির্ম্মম আঘাত দেওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য বলে মনে কর প্রিয় ?"

"ভুল বুঝ্বেন না জ্ঞানাঞ্জন দা, তাঁর প্রাণে আঘাত দেওয়া তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি যখন দেখ্লাম, তিনি আমাকে যতখানি ভালবাসেন, আমার ওপর যতখানি আশা পোষণ করেন, আমি তাঁর সে আশা-ভালবাসার বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা রক্ষা কর্তে পার্ব না, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই মহাজনানুমোদিত পন্থার অনুসরণ কর্তে হল। জান্তাম জ্ঞানাঞ্জন দা, আমার এ কঠোর প্রচেষ্টা তাঁর প্রাণে কঠোর ভাবেই আঘাত দিবে, তবুও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে—"

"কি, তুমি মৃত্যুকে বরণ কর্তে গিয়েছিলে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ? তোমার আমার ভবিষ্য-দৃষ্টি কতটুকু ভাই, যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটা আগাগোড়া দেখে ফেল্ব ? ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে তুমি এমন কি দেখ্তে পেয়েছিলে প্রিয়, যার জন্যে তোমাকে অমন দেহপাতী অনশন ব্রত গ্রহণ কর্তে হল ?"

"না জ্ঞানাঞ্জন দা, আমি সে ভবিষ্যতের কথা বল্ছি না। নিজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করে ভবিষ্যতে না জানি আরও কোন্ অতল তলে তলিয়ে যাব, শুধু এই ভেবে আমি জগৎ থেকে সরে পড়্তে চেয়েছিলাম। কর্ম্মের দিক্ দিয়ে— আমি চলে গেলে আমার স্থান অপরে পূরণ করবে, কিন্তু আমি থাক্লে তাঁর কাজের যেটুকু বিঘ্ন হত, তা আর হবে না, এইমাত্র লক্ষ্য করে আমি প্রায়োপবেশন ব্রত গ্রহণ করে ছিলাম : এর আর অন্য কোন হেতু ছিল না।"

"পাগল আর কি ! নিজের রোগ কি হয়েছে তা না বুঝে সুচিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে নিজেই তার ঔষধের ব্যবস্থা ! আচ্ছা প্রিয়, সমস্ত ঘটনাটা একটু খুলেই বল না। ২৫শে তারিখে আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলে, তাতে তো তুমি আত্ম শুদ্ধিকল্পে অনশন ব্রত গ্রহণ করেছ এইমাত্র জানতে পারি। যদিও আত্মশুদ্ধি কথাটা একেবারে অযৌক্তিক, নির্লেপ নিরঞ্জন আত্মার মালিন্য কল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তথাপি তোমার ওই আত্মশুদ্ধি কথাটাকে আমি চিত্তশুদ্ধি বলেই ধরে নিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার প্রভাবেই হোক্ অথবা প্রকৃতির তাড়নায়ই হোক্ তোমার শুদ্ধ সত্ত্ব কোন প্রকারে মালিন্য যুক্ত হয়েছে, আর সেই মালিন্য যুক্ত দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদনই তোমার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ছিল খুবই মহৎ আর তা সাধু মহাজন প্রশংসিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই তোমার চিঠি পেয়ে তোমার চেষ্টা ও উদ্দেশ্য যাতে সাফল্য মণ্ডিত হয়, তার জন্যে মনে মনে প্রার্থনা করে তোমার কথা তাঁর পায়ে সমস্ত নিবেদন করেছিলাম। তোমার সেই চিঠি পাওয়ার তৃতীয় দিনে নিরালায় বসে তাঁর উপদেশবাণী লিখ্তে বসেছি, কিছুটা লেখাও হয়েছিল, এমন সময় হঠাৎ তাঁর ডাক পড়্ল। তিনি আমায় ডাকিয়ে বললেন—'জ্ঞানাঞ্জন, এইমাত্র প্রিয়ব্রতের একখানা চিঠি পেলাম, সে প্রায়োপবেশন ব্রত গ্রহণ করেছে। তার উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি নয়—আত্মহত্যা ! সে মৃত্যু পণ করে অনশন ব্রত গ্রহণ করেছে, তিলে তিলে সে মৃত্যুকে বরণ করে নিবে, মৃত্যু পর্য্যন্ত জল টুকুও স্পর্শ করবে না এই তার পণ ! তুমি এখুনি তাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দাও আমার নাম দিয়ে—সে অনশন ব্রত ত্যাগ করুক, তার মঙ্গল হবে। সে ভাল ছেলে, তার মনে যে এ খেয়াল চাপ্ল কেন তা তো বুঝ্তে পার্ছিনা কিছু। অতিরিক্ত কাজের চাপে কি সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ? যাক্—আর একটা কথা, আজ ৫দিন হল সে ব্রত গ্রহণ করেছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই

তার জেদও বেড়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই, আর ব্রতোদ্‌যাপনের শক্তিও পাচ্ছে যথেষ্ট। তুমি 'তার' করে দিয়ে এসেই একখানা চিঠি লিখে দাও খুব কড়া করে, যেন আর কোন দিন সে এমন খামখেয়ালী না করে বসে। সন্দেহ হয়, পাছে টেলিগ্রাম পেয়েও সে তার জেদ না ছাড়ে, ব্রত সমাপনের জন্য মরিয়া হয়ে বসে, তাই চিঠিতে বিস্তারিতভাবে বেশ কোমল-কঠোর ভাবে তাকে শাসিয়ে লিখ, টেলিগ্রাম পেয়েও যদি ব্রতভঙ্গ না করে থাকে, তবে এই চিঠি পাওয়া মাত্রই যেন সে অনশন ত্যাগ করে, নতুবা আমাদেরও কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে হবে বাধ্য হয়ে। তোমাকে আর বিশেষ কি বলব, তুমি তো তার সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছ, তাকে ভাল করেই বোঝ, দেখে শুনে তোমার অভিজ্ঞতাও হয়েছে যথেষ্ট, কাজেই তদনুযায়ী কাজ করো। যাও আর দেরী করো না, এখুনি 'তার' করে এসে চিঠি লিখে দাও, চিঠি আজের ডাকেই যাওয়া চাই।'......... ওঃ সে দিন যে তিনি প্রাণে কি আঘাত পেয়েছিলেন—!"

"আমি তো বলেছি জ্ঞানা ন দা, তাঁর প্রাণে আঘাত দেওয়া আমার কোন দিনই উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি আমার ওপর যতখানি আশা করেন, আমি তাঁর সে আশা পূরণ করতে পারব না বলেই তো এই ব্রত গ্রহণ করেছিলাম। সত্যি জ্ঞানাঞ্জন দা, প্রথমতঃ আমি চিত্ত শুদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই অনশন-ব্রত গ্রহণ করি, তার পর যখন দেখ্‌লাম আমার এ প্রচেষ্টা বন্যার মুখে ধূলির বাঁধের মত কোথায় ভেসে চলেছে, তখন বাধ্য হয়ে এই দেহধ্বংসী ব্রত গ্রহণ করতে হল। আমার একটা ধারণা জন্মে গিয়েছে জ্ঞানাঞ্জন দা, চিত্ত শুদ্ধি না হলে জীবন-ধারণই বৃথা। আমরা চাই তাঁর কাজ করতে, আমাদের শুদ্ধ দেহ মনের ভিতর দিয়েই তো তাঁর ভাব বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে, আর তিনিও তো আশা করেন তাই। বড় আশায় বুক বেঁধে চিত্তের দিকে যখন মুখ ফিরাই—দেখি তা শুধু আবর্জ্জনায় ভরা, নানা বাজে চিন্তার তরঙ্গে চিত্তসায়র সব সময়েই উদ্বেলিত, সব সময়েই দোলায়মান। চিত্তের এই রূপ দেখেই তো আমি অস্থির হয়ে পড়ি, এর শুদ্ধির আশা চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়ে বসি। আমার মাঝে কামের প্রভাব বড়ই বেশী, হয়ত বা এই কামই আমার সাধন-পথের প্রধানতম অন্তরায়। এই রিপুর জ্বালাতনে আমি যত জ্বলে মরি, অন্য কোন কিছুর তাড়নায় এত অস্থির হয়ে উঠি না, আমার ব্যবহারিক জ্ঞানোন্মেষের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে ও আমাকে উদ্‌ব্যস্ত করে আসছে; এখন আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে ও আমার চির জীবনের সঙ্গী, হয়ত বা এমনি করে চিত্তের সঙ্গে জড়িত হয়ে মরণের পর পারেও আমার সঙ্গী হবে। এর তাড়না থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বরাবরই চেষ্টা করে এসেছি, কোনও দিন কৃতকার্য্য হতে পারি নি; হয়ত সাময়িক ভাবে দমিত হয়েছে একেবারে নির্ম্মূল হয় নি; অনুকূল আলো বাতাস পেয়ে তাই আবার গজিয়ে উঠেছে, চেষ্টা করে আবার দমন করেছি, আবার তা জেগে উঠেছে। এই ভাবে দুরন্ত রিপু আমাকে বরাবরই জ্বালাতন করে মেরেছে। তার পরই আমার ধারণা জন্মে গেল—কৈ, আমার দ্বারা তো কামজয় হল না, আমিই তার দাস হয়ে থাক্‌লাম, চিরকাল এইভাবেই বুঝি থাক্‌তে হবে। যৌবন চলে যায়, যে সময়ের শক্তিতে মানুষ শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে লক্ষ্যের পানে ছুটে চলে, সেই যৌবন কাল ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে চলেছে; জীবনের যে অংশে অদম্য শক্তির বিকাশ হয়, সেই যৌবনেই যখন পরাজয়ের কলঙ্ক শিরে শোভা পেল, তখন বার্দ্ধক্যের

কোলে ঢলে পড়্‌লে না। জানি কোন্ মর্ম্মান্তিক নাটকের অভিনয় হবে, না জানি কোন্ অতল তলে তলিয়ে যাব, এই ভেবেই জ্ঞানাঞ্জন দা, শুধু এই ভেবেই এই দেহ পাতের প্রচেষ্টা করেছিলাম। কোন দিন কোন অসদ্ গ্রন্থ পড়ি না, কোন দিন কোন অসৎ সঙ্গ করি না, নিয়ম-সংযমের ভিতর দিয়ে আজ দীর্ঘ কাল ধরে চলেছি, তবুও রিপুর অত্যাচার প্রশমিত হয় না কেন, কেন এরা বার বার আমায় পথচ্যুত করে দেয়, কেন আমায় বিপথে ঘুরিয়ে মারে, তা তো বুঝ্‌তে পারি না কিছুই! এত দুঃখ রাখার আর স্থান আছে কি? আমার হৃদয়ে কি যে ব্যথা, তা মুখ ফুটে এতদিন কাউকে জানাই নি, আমার প্রাণে কি যে বেদনা, এতদিন কারো কাছে তা প্রকাশ করি নি; আর আমার হৃদয়ের ব্যথা বেদনার কথা শুনবেই বা কে, বুঝ্‌বেই বা কে?' আজ আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার বুকের ব্যথা ঘুচাতে উন্মুখ হয়ে সব কথা জান্‌তে চেয়েছেন যখন, তখন স্থির হয়ে একটু শুনুন, আমি যতটুকু সংক্ষেপে পারি বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি। ধৈর্য্য ধরে আমার কথা কেউ শুনবে, এতদিন আমার সে ধারণা ছিল না, আপনাকে যখন বল্‌তে আরম্ভ করেছি, আর আপনিও যখন শুনতে চাচ্ছেন, তখন আর একটু বলেই শেষ করি। হাঁ, বল্‌ছিলাম আমার চিত্তে কামের ভাবই খুব বেশী, এর তুলনায় অপরাপর রিপু নগণ্য হলেও জীবনের উপর তাদের অত্যাচারও কম নয়। ক্রোধ, বিরক্তি আর অভিমান এই তিনের সংমিশ্রণে এক অপরূপ বস্তুর সৃষ্টি হয়ে সময় সময় আমাকে অভিভূত করে ফেলে, পথচ্যুত করে দেয়। মাঝে মাঝে অভিমানের রূপটী বেশ প্রকট দেখতে পাই। কারো কোন কথা সহ্য হয় না, কেউ একটু বিরুদ্ধ ভাব দেখালেই বাইরে তার প্রতিবাদ না করে অন্তরে শুধু গুমরে মরি। কেমন যেন মুসড়ে পড়ি, আমার কথা বন্ধ হয়ে যায়, কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যখন চেতনা হয় তখন মনে মনে ডাকি—'অভিমান প্রভাব বিমর্দ্দক হে।'—

মোটামুটি আমার চিত্তের রূপ আপনার কাছে বর্ণনা কর্‌লাম জ্ঞানাঞ্জন দা, এর বিস্তার কর্‌লে একটা মহাভারতই হয়ে পড়্‌বে। এই চিত্ত দিয়ে কেমন করে তাঁর পূজা হবে বুঝি না আজও। কর্ম্মের স্ফুরণ নাই তাই দেহ জড়, জ্ঞানের প্রকাশ নাই তাই মন অন্ধকার, ভক্তির বিকাশ নাই তাই প্রাণ নীরস। এই দেহ মন প্রাণ দিয়ে কেমন করে দেবতার পূজা হবে বলুন তো? "তাঁর কাজ কর্‌ছি" এই ভাবে শুধু গতানুগতিকের মত কোথায় ভেসে চলেছি তার ঠিকানা নাই। এই ভাবে স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে চল্‌লেই কি লক্ষ্যে পৌছাতে পার্‌ব? আজ এই যৌবনের প্রাবল্যেই যখন আমার এই দশা, তখন না জানি অদূর ভবিষ্যতে জীবনের সাহাহ্নে কোন্ লীলার অভিনয় হবে? বরাবর ভাব-কর্ম্মের সামঞ্জস্য কর্‌বার চেষ্টা করে এসেছি, কোন দিন কৃতকার্য্য হতে পারি নি। কর্ম্মের মাঝে আত্ম নিয়োগ কর্‌লে স্বরূপ চ্যুতি ঘটে, সাধুত্বের অভাব হয়, আবার ভাব রক্ষা করতে গেলে—সাধুত্ব বজায় রাখ্‌তে গেলে কর্ম্ম পণ্ড হয়ে যায়। এই দোটানার মধ্যে পড়ে জীবনটা যেন আমার ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে জ্ঞানাঞ্জন দা! এই ছন্দহারা, দিশে হারা জীবনযাপন নিষ্ফল, একটা প্রচণ্ড অভিশাপ, এই মনে করে তিলে তিলে একে পাত কর্‌তে চেয়েছিলাম। আমি ঠিক জানি জ্ঞানাঞ্জন দা, দেহই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল, এই দেহ স্থায়ী থাকতে কারো অত্যাচার কম্‌বে না, কারো প্রভাব টুটবে না। তাই আমি তাদের বাসা ভাঙ্গতে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। আজও আমি বুঝ্‌তে পারি না, জ্ঞানাঞ্জন দা, এ প্রচেষ্টাকে কেন আপনি এত নিন্দা কর্‌ছেন; অন্যায়ের

প্রতীকার কল্পে একটা ব্রত গ্রহণ—তা কি নিন্দার্হ? আমি শুনেছি এবং পুস্তকে পড়েছিও, অনেক মহাত্মা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রায়োপবেশনে বা তুষানলে দেহত্যাগ করেছেন, তাতে কি তাঁরা নিন্দনীয় হয়েছিলেন?"

"একি প্রিয়, তুমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ? একসঙ্গে এত কথা বল্‌তে বল্‌তে যে তোমার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তোমার কথাই শুধু শুনে যাচ্ছিলাম এতক্ষণ, তোমার দিকে তো মোটেই লক্ষ্য করি নি। থাম, এখন আর কথা বলো না, একটু শান্ত হও, স্থির হও। তুমি যতখানি বলেছ তা থেকেই আমি তোমার ব্যথা-বেদনা সব বুঝ্‌তে পেরেছি ভাই, আর তোমাকে কিছু বল্‌তে হবে না। এখন স্থির হয়ে আমি যা বলি তাই শোন। নিজের জীবনটাকে এত হেয় জ্ঞান করো না প্রিয়, এর একটা মূল্য আছে। তুমি তোমার জীবনের মূল্য বোঝ না, কিন্তু যিনি বোঝেন তিনি বোঝেন। যে দেহটীকে তুমি মরণের কোলে দিতে চেয়েছিলে, সেই দেহটী গড়্‌তে প্রকৃতির কত দিন লেগেছে, কত কালের প্রচেষ্টায় এই সবল দেহ-মনের অধিকারী হয়েছ তুমি, তা বেশ ধীরভাবে বুঝে দেখ্‌বার চেষ্টা কর তো? এই দেহে বর্ত্তমান থাক্‌তে থাক্‌তে—তোমার ভাষায় তুমি যাদের দমন কর্‌তে পার নি, দেহ পাত কর্‌লে তাদের জ্বালাতনে আরও যে জ্বলে পুড়ে মরতে বেশী। দেহ হচ্ছে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র; এই দেহে থাক্‌তে থাক্‌তেই তাদের বশে আনা যায়, স্বাধীনে তাদের পরিচালনা করা যায়, কিন্তু বিদেহ-অবস্থায় তা অসম্ভব! স্বপ্নের কথা ভেবে দেখ দেখি? সে সময় যদি কোন কিছু হতে ভয় বা উদ্বেগ উপস্থিত হয়, তার প্রতীকারের কি আর কোন উপায় থাকে তখন? স্থূল দেহটী অবশ হয়ে পড়ে থাকে বলেই স্বপ্নাবস্থায় দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হয় আমাদের যথেষ্ট। ইন্দ্রিয় দমন করে জ্ঞানলাভ কর্‌তে হলে স্থূল দেহের নিতান্ত প্রয়োজন। দেবতারাও যদি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, জ্ঞানলাভের প্রয়াসী হন, তবে তাঁদেরও স্থূল জগতে নেমে স্থূল দেহ ধারণ কর্‌তে হবে। মনুষ্য-জন্ম বড় দুর্ল্লভ জন্ম। মনুষ্য-দেহ পাওয়া সুদুর্ল্লভ। তুমি হঠকারিতা বশে সেই দেহ পাত কর্‌তে বসেছিলে? এতে তো ফল কিছুই হত না ভাই, বরং আরও তা তোমায় নরকের দিকে—যন্ত্রণার দিকে টেনে নিয়ে যেত। আর তুমি এমন কি-ই বা অন্যায় করেছিলে, যার জন্যে তোমাকে আত্মহত্যা কর্‌তে হচ্ছিল? তোমার কথা, তোমার ভাব থেকে আমি ধারণাই কর্‌তে পার্‌ছি না, তোমার আত্মহত্যা করার সুষ্ঠু হেতুটা কি? আবার তুমি এই প্রচেষ্টাকে শাস্ত্রানুমোদিত বলে প্রতিপন্ন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছ? তুষানলে বা প্রায়োশবেশনে দেহ-ত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত জানি, এটা প্রায়শ্চিত্ত-বিধি তাও স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যেখানে বিধি আছে, সেখানে প্রয়োগ-বিধিও আছে নিশ্চয়ই। অপরাধবিশেষে প্রায়শ্চিত্তের বিধানও ভিন্ন। লঘু পাপে লঘু, গুরু পাপে গুরু-দণ্ডের ব্যবস্থা অর্থাৎ দোষের বা কৃত অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব নিয়ে প্রায়শ্চিত্তবিধান রয়েছে। কাজেই তুমি ঠিক জান কি, তোমার যা দোষ বা ত্রুটী তার বিধান তুমি নিজে যা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলে তাই ঠিক? নিশ্চয়ই তা নয়। শাস্ত্র-সম্মত বিধানে তুষানলে বা প্রায়োপবেশনে দেহ-ত্যাগের ব্যবস্থা অতি উৎকট পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপেই তাঁরা ব্যবস্থা করে গেছেন। অধুনাতন প্রায়োপবেশনে দেহ পাত কর্‌ছেন যাঁরা, তাঁরা শাস্ত্রের ধার ধারেন না, বিধি-নিষেধের ছায়া মাড়ান

না; ওটা একটা প্রাবাহিক ধারায় গা ঢেলে দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি জানি, এই রকম খামখেয়ালী প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। দেখ প্রিয়ব্রত, উত্তেজনা বশে বা কোন একটা অভিমান ভরে দেহত্যাগ করা বীরের লক্ষণ নয়। তুমিও তো সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই ছেলেটীর সঙ্গে যতীন দাসের মৃত্যু-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলে? আমি সেই কথাগুলি আবার তোমায় স্মরণ করতে বলি। ভাই, আজ ইচ্ছে করলে আমি কায়ার মায়া, দেহের বোঝা এড়িয়ে যেতে পারি, একটা উত্তেজনা বশে সবাই এই দেহটাকে ইন্দ্রিয়গুলোকে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু সেই কি আদর্শ বীর? না যে একটা idea ভাব বা সত্যের জন্যে তিলে-তিলে পলে-পলে ক্ষণে-ক্ষণে নিমেষে-নিমেষে সুদীর্ঘ জীবন ভোর এই দুর্দ্দমনীয় রিপুদলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিজের অচল অটল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকবার চেষ্টা পায়, সে বড় বীর? বীর অনেকেই হয়, শতেক বীরের মধ্যে হয় তো একজন শূর হয়, কিন্তু বীর শূর অথচ ধীর হওয়া খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তিনি চান তোমায় দেখতে শুধু বীর শূর নয়, তিনি তোমায় ধীরও দেখতে চান। জেনে রেখো প্রিয়ব্রত, কোন একটা আকস্মিক ব্রত গ্রহণে স্থায়ী ফল হয় না। সাময়িক উৎকট তপশ্চর্য্যার চেয়ে সুনিয়ন্ত্রিত দৈনন্দিন সংযম-তপস্যা স্থিরতর ফলদায়ী আর সে ফল সুদীর্ঘ কাল স্থায়ীও হয়। বলপূর্ব্বক উৎকট কোন বিধি অবলম্বন করে শরীরটাকেই ক্লিষ্ট আর শুষ্ক করা হয় শুধু। এতে তো প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। গীতার সেই শ্লোকটী মনে কর দেখি ভাই! ভগবান্ বলেছেন— 'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ' কিন্তু রসবর্জ্জং। ব্রত-ভঙ্গের পর আবার যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম সতেজ হয়ে উঠবে, তখন তাদের অত্যাচারও মাথা তুলে দাঁড়াবে। বরং তপশ্চর্য্যার ফলস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির লাবণ্য ও পুষ্টি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অত্যাচার আরো দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠে। কাজেই ঠিক ঠিক তাদের দান্ত শান্ত করতে হলে তিলে-তিলে পলে-পলে ক্ষণে-ক্ষণে তাদের হীনবীর্য্য করা উচিত। পাশবিক বল প্রয়োগে যে দমন বা পরাজয়, তা দমনই নয়। আজীবন মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে শত্রুর অবনমনকেই দমন বলে বলি। আমরণ এই শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, ভয়ে বা আশঙ্কায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে চলবে কেন? প্রবৃত্তির সঙ্গে চিরকাল লড়াই করেই চলব, মাঝে মাঝে পরাজিত হই তাও স্বীকার, তবু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করব না, এই তো আমাদের সাধনা! প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া, আর তার তাড়নায় দেহ পাতের প্রয়াস, এ দুটোকেই আমি এক পর্য্যায়ভুক্ত বলে জানি। গীতাকার কোনখানে এর সমর্থন করেন নি। তুমি তোমার চিত্তের যে রূপ বর্ণনা করেছ তা তো স্বাভাবিক। কাম, ক্রোধ, অভিমান, বিরক্তি প্রত্যেক মানুষেরই আছে, এগুলো তোমাতে কিছু নূতন নয়। আর তুমি বলছ—কোন অসৎসঙ্গ কর না, কোন কামনা মনে স্থান দাও না, তবু কেন অসদ্ভাব, বাজে কামনা প্রাণের মাঝে জাগে? ভাই, এখন না হয় তুমি সাধু হয়েছ, চিরকাল তো আর সাধু ছিলে না। কত শত জন্ম ধরে তোমার মন ওই সব ভাবনা চিন্তায় মগ্ন ছিল, কত শত জন্ম ধরে তুমি কত কামনা-বাসনার জাল বুনে এসেছ, আজ হঠাৎ তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে কেমন করে? তাদের সংস্কার যাবে কোথায়? এখন তোমার মাঝে রিপুর যে সমস্ত অত্যাচার প্রত্যক্ষ করছ তা সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের ফল। এরা

আস্‌বেই, এরা "আগমাপায়িনোঽনিত্যা" :—এদের শুধু 'তিতিক্ষস্ব'। তিতিক্ষা করে, সহ্য করেই এদের নির্জ্জিত কর্‌তে হবে। কত জন্মের পুঞ্জীভূত সংস্কার চিত্তের মাঝে জমে আছে, তার কি ইয়ত্তা আছে ভাই? সবে মাত্র তাতে সাধনার আগুন ছোঁয়ান হয়েছে, এখন তা থেকে শুধু ধুঁয়োই উঠ্‌ছে, এই ধুঁয়োতে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌বে, চোখের জলে বুক ভেসে যাবে, কিন্তু একে দেখে ভয় পেলে চল্‌বে কেন ভাই? প্রতীক্ষা কর, শুভ দিনের পানে তাকিয়ে থাক, আগুন যেদিন জ্বলে উঠ্‌বে, সেদিন সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এখন শুধু সহ্য করে যাও,—আজীবন এই কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করে যেতে হবে, সহ্য করে যাওয়াটাই যে মস্ত একটা সাধনা! গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন :—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবোদ্বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

শুধু ক্ষণকাল নয়, দেহান্ত পর্য্যন্ত যিনি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করে যেতে পারেন, তিনিই সুখী, তিনিই যোগী। এই কাম ক্রোধের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র মন। অর্জ্জুনের মত অমন বীর সাধকের মুখ থেকেও মনের চঞ্চলতা ও দুর্নিগ্রহতার কথা বের হয়েছিল। তোমার আমার আর কথা কি? তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথী বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥

শ্রীভগবান্‌ও সেই কথায় সায় দিয়ে আবার তার দমনের উপায়ও বলেছিলেন—

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

মন যে চঞ্চল তা সুনিশ্চিত, তবুও অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা তার উদ্দাম গতি রোধ করতে হবে। তিনি এমন কথা বলেন নি যে দেহপাত কর, তাহলেই সব চুকে যাবে। এর পূর্ব্বেই তো বল্‌লে—তুমি বার বার কাম দমনের চেষ্টা করে আস্‌ছ, কিন্তু কোন দিন কৃতকার্য্য হতে পার নি। এতে আর তোমার দোষ থাক্‌ল কোথায়? মনে প্রাণে চেষ্টাটুকু পর্য্যন্তই আমাদের কর্ত্তব্যের সীমা, তারপর চেষ্টার ফল, সাধনার ফল তাঁর হাতে। ভুলে যাও কেন ভাই—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে?" তবে চেষ্টার মাঝে কোথায়ও যেন গলদ না থাকে এইটেই বিশেষ করে লক্ষ্যের বিষয়। তুমি বল্‌ছ—যৌবনেই যখন পরাজয়ের কলঙ্ক মাথায় পেতে নিতে হল, তখন ভবিষ্যতে না জানি কি হবে? এস্থলেও আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পার্‌ছি না। যৌবনের অদম্য শক্তি আছে স্বীকার করি, কিন্তু রিপুর প্রাবল্যও আবার এই যৌবন কালেই। তোমার চেষ্টা, তোমার সাধনা ব্যর্থ যাবে না কোন দিনই। দিন দিন এদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু যতই দিন যাবে, যতই যৌবনের প্রভাব কমে আস্‌বে, ইন্দ্রিয়বর্গের তেজও তত হীন হয়ে আস্‌বে। শেষে এরা একেবারে তোমাতে আত্মসমর্পণ কর্‌বে, আর তখনই তোমার সাধনার ফলে চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হবে, হৃদয়ে সত্যের বিমল জ্যোতি ফুটে উঠ্‌বে। মাঝে মাঝে যে সাধকের পতন হয়, একে আমি অনিষ্টকর বলে কোন দিনই মনে করি না। আমি জানি, সাধকের উপর শ্রীভগবানের এগুলি করুণার ধারা। সাধক তো বরাবর শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে আস্‌ছেই, যদি হঠাৎ তার পদস্খলন হয়েও যায়, তাহলে তার সেই পদস্খলন তার অন্তরে অতিমাত্রায় চেতনা সঞ্চার করে তাকে অতি দ্রুত লক্ষ্যের পানে অগ্রসর করিয়ে দেবে। মুনি ঋষিদেরও পদস্খলন হয়, ছোট ছেলে পড়্‌তে পড়্‌তেই হাঁটতে শেখে, কাজেই সাধকের পতন পতনের নিদান নয়, উত্থানেরই হেতু। যাক্, এখন তোমার কোথায় ভুল হয়েছিল বলি।—রোগী যদি

নিজের রোগ প্রতীকারের বিধি-ব্যবস্থা নিজেই করে নেয়, অর্থাৎ ঔষধ পথ্য নিজেই নির্ব্বাচন করে, তাহলে তার ফল যা হয় তাতো তোমার জানাই আছে। অনেক সময় উৎকট ফল ফলাই সম্ভব। অসিতের কথা মনে পড়ে কি? অমলের ঘা ধোয়ানর জন্য যে কার্ব্বলিকঅ্যাসিড্ আনা হয়েছিল, সে নিজে নিজে তার পায়ের বেদনায় তা লাগিয়ে কি রকম কাণ্ড বাধিয়ে তুলে ছিল, আর সেই নিয়ে কতদিন ভুগ্‌ল তা মনে নাই কি? তাই বল্‌ছি—নিজের রোগ কি তা বুঝেও যে তার নিরোধাত্মক বা প্রতিশেধাত্মক ঔষধ নির্ব্বাচনে অশক্ত হয়, অথবা নির্ব্বাচন কর্‌লেও তার নির্ব্বাচন যদি পুনঃ পুনঃ ব্যর্থই হয়, তবে সেই রোগীর কর্ত্তব্য নয় কি কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া? তোমার রোগ আধ্যাত্মিকী। ঐ রোগ-প্রতীকারের স্ব-বৈদ্যও তুমি তো বহু জন্মের পুণ্যফলে অথবা তাঁর অহেতুক কৃপায় লাভ করেছ। তুমি সেই স্ববৈদ্যের পরামর্শ না নিয়ে, এমন কি রোগের বিষয় সুস্পষ্ট রূপে তাঁকে না জানিয়েই একটা উৎকট পথ্য অবলম্বন করেছিলে। এটা একটা মস্ত ভুল হয়েছিল তোমার। তুমি চাও সাধু মন, সাধু বুদ্ধি, সাধু চিত্ত, সাধু প্রাণ নিয়ে তাঁর কর্ম্ম কর্‌তে, তুমি চাও চিত্তবা অন্তর শুদ্ধ কর্‌তে। খুব সুন্দর কথা।—সাধুত্ব পিপাসী মাত্রেরই এরকম চেষ্টা প্রশংসাযোগ্য সন্দেহ নাই। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহ মন ইন্দ্রিয় চিত্তক্ষেত্র বুদ্ধিক্ষেত্রকে এমন ভাবে স্বচ্ছ নির্ম্মল করা, যাতে তারা শ্রীগুরুর স্বচ্ছ শুদ্ধ সুন্দর ভাবগুলি যথাযথ ধারণ কর্‌তে পারে, প্রকাশ কর্‌তে পারে। কাজও তাঁর, এ দেহ-মনও তাঁর; আমরা সংশোধন বা সংস্কারকামী। আরও জানি, তিনি ভিন্ন অথবা তাঁর কর্ম্ম ভিন্ন আর আমাদের কিছু লক্ষ্য নাই, সাধ্য নাই, সাধনা নাই। কিন্তু এই মলিন দেহ মন নিয়ে তাঁর কাজ হচ্ছে না, এই দুঃখ। আমরা চাই নিজেদের শুদ্ধ কর্‌তে, তাঁর ভাব ধারণের উপযোগী আধার তৈরী কর্‌তে, তাঁর কর্ম্মের যোগ্যতা লাভ কর্‌তে। এই যদি তোমার বা আমার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশের বা কর্ম্মসম্পাদনের অন্তরায় দূর কর্‌বার পন্থা বা উপায় আর কার কাছ থেকে জান্‌তে যাব? জান্‌তে হলে তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিতে হবে, অন্যের কাছে নিশ্চয়ই না। অন্যে কেমন করে বল্‌বে বল তো? কাজ তাঁর, তুমি কর্‌তে চাও তাঁর কাজ, তিনি করতে চান তোমার ভিতর দিয়ে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ, কাজেই তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত—'ওগো দেবতা! আমি কেমনটী হলে তোমার মনের মত হতে পারব, কেমনটী হলে এই দেহ দিয়ে মন দিয়ে তোমার কাজ কর্‌তে পার্‌ব, কেমনটী হলে তোমার ইচ্ছা প্রকাশের বাধা হবে না, তা বলে দাও।' —এই প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মত দুর্ব্বল অধিকারীর আর কি পন্থা আছে ভাই! প্রার্থনা যে মস্ত বড় সাধনা! যোগ-যাগ-তপস্যা যত কিছু বল, প্রার্থনার মত এত সহজ ফলপ্রসূ আর কিছুই নয়। প্রার্থনায় তোমার দেহের তেমন সামর্থ্যের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধির তেমন তীক্ষ্মতার আবশ্যকতা নাই, শুধু চাই বুক ভরা ব্যাকুলতা আর চোখ ভরা জল। প্রার্থনা ঠিক হৃদয়গত হলে অচিরেই তার ফল পাওয়া যায়। অশান্তির দাব-দাহে হৃদয় পুড়ে খাঁক্ হয়ে যাচ্ছে, হৃদয় খুলে শান্তির জন্যে প্রার্থনা কর, হৃদয় শান্ত হয়ে যাবে; রিপুর উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছ, নিজের অক্ষমতা নিবেদন করে নিঃশেষে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়, শত্রুর অত্যাচার প্রশমিত হয়ে যাবে। প্রার্থনা যে সকল সাধনার সেরা! তাই তো দেখি সমগ্র বেদ জুড়ে প্রার্থনারই মেলা! ঋষি-যুগের সাধনা তো ছিল

এই প্রার্থনাই। তাঁরা সরল দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সঙ্গে প্রাণ খুলে বিশ্বদেবতার পায়ে প্রার্থনা জানাতেন শুধু, এতেই তাঁরা ইহ জীবনে পরাশান্তি, পরজীবনে পরমাগতি লাভ কর্‌তে পারতেন। এখন হয়ে গেছে সকলের উৎকট সাধনার দিকে ঝোঁক, রাতারাতি তারা বড় লোক হতে চায়। এমন কি অনেক শাস্ত্র-পণ্ডিতেরও ধারণা, উৎকট সাধনা না কর্‌লে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব! কিন্তু যাঁরা সাধন-পণ্ডিত, সাধনার পরপারে গিয়েছেন, সত্য বস্তু লাভ করেছেন, তাঁরা উৎকট সাধনার মোটেই পক্ষপাতী নন। তাঁরা বলেন—চরম পদ পাওয়ার পথ কঠিন নয়, তা অতি সহজ, অতি সরল। বুদ্ধির কারসাজীতেই মানুষ শুধু সে পথকে অতি বিভীষিকাময় জটিল করে তুলে। প্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা করা, নিজের মঙ্গল—বিশ্বের মঙ্গল যাতে হয় তার জন্যে তাঁর পায়ে নতি জানান, এতেই সব হয়। বিশ্বাসই হচ্ছে মূল। * * * যাক্, বল্‌তে বল্‌তে দেখ্‌ছি অনেক কথাই বলে ফেল্‌লাম। এখন আর একটা কথা জান্‌তে আমার বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে। আচ্ছা প্রিয়, তুমি ৫ দিনের মধ্যে জলটুক পর্য্যন্ত স্পর্শ কর নি, এতে কি তোমার কোন যাতনা অনুভূত হয় নি? অন্তরাত্মা কি এতে ক্লিষ্ট হয় নি? আমি জানি, এক বেলার উপোসও তোমার শরীরে সহ্য হয় না, আর এই পাঁচ পাঁচ দিনের অনশন কেমন করে সইলে?"

"আমি স্তব্ধ হয়ে শুধু এতক্ষণ আপনার কথাই শুনে যাচ্ছিলাম জ্ঞানাঞ্জন দা। আপনার কথা আজ বাস্তবিকই আমার খুব ভাল ঠেকছে, আমার তো আর কথা বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। ইচ্ছে হচ্ছে শুধু শুনে যাই, শুধু শুনে যাই— আমার চোখ ফুটুক, আমি ডুবে যাই। তবু আপনার কথার উত্তর না দিয়ে তো পারছি না, কাজেই সংক্ষেপে দু'চার কথা বলেই শেষ করি, শুনুন। উপবাসের প্রথম তিন দিন তেমন বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি, এমন কি ঠিক পূর্ব্বের মত বাইরে গেছি, কাজ কর্ম্ম করেছি, লোক জনের সঙ্গে কার্য্য-প্রসঙ্গে আলাপ পরিচয়ও করে এসেছি, কিন্তু মুখের ভাব থেকে কেউই টের পায় নি যে আমি উপবাসী আছি। আমিও আমার দু'এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া এ বিষয়ে আর কাউকে কিছু জানাই নি, এমন কি তাদেরও আর কাউকে জানাতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহ-ইন্দ্রিয়ের বল থাকবে, যতক্ষণ আমি পারব, যতক্ষণ আমার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত না হবে, ততক্ষণ আমার ওপর তাঁর যে কাজের ভার ন্যস্ত আছে তা হাসিমুখে সম্পাদন করে যাব। তাই তিন দিন দুর্ব্বল শরীর নিয়েও ছুটাছুটি করেছি। চতুর্থ দিনে শয্যা গ্রহণ কর্‌তে হোল, তারপর ধীরে ধীরে যেন সব ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসতে লাগ্‌ল, গলা শুকিয়ে গেল, জিভ শুকিয়ে গেল। পেটে যে একটা কী অসহ্য যাতনা অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লাম জ্ঞানাঞ্জন দা, তা আর কি বল্‌ব? তবু জেদ, ব্রত গ্রহণ করেছি, ব্রত সমাপন পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা তো অটল রাখ্‌তেই হবে! এই জেদের বশেই জ্ঞানাঞ্জন দা, এত কষ্ট সহ্য কর্‌তে পেরেছিলাম। তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া যে কি যন্ত্রণাদায়ক তা এবার বুঝে নিয়েছি। কিন্তু আমি তাতে একটুও বিচলিত হই নি, যন্ত্রণার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয়েই মরণের প্রতীক্ষায় ছিলাম। তারপর একটা কথা,—আমি আমার এই সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে তাঁকেও তো চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, শুধু এ জীবনেই নয়, জীবনের পরপারেও। কাজেই পরপারেই যাচ্ছি যখন, তখন সে-সংবাদ তাঁকে দিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত, এই ভেবে তাঁকে এই

ব্রতের কথা জানিয়ে ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জেনেও ছিলাম, এই চিঠি পেয়েই তিনি বিহ্বল হয়ে উঠ্‌বেন, আর তাঁর যা বক্তব্য তাও সত্বর জানাবেন। তিনি যদি ব্রত ভঙ্গ কর্‌তে বলেন, তাহলে কি কর্‌বো? ·········স্থির কর্‌লাম, তিনিই যখন আমার ইহ-পরকালের গতি, তখন তাঁর আদেশই শিরোধার্য্য। তারপরেই তো তাঁর টেলিগ্রাম এল—"Be good, leave off fasting, letter follows." এই 'তার' পেয়ে তো আর আমি ব্রত ধরে থাক্‌তে পার্‌লাম না, অর্দ্ধ পথেই আমার **ব্রত-ভঙ্গ** হল। আমার আর মরা হল না জ্ঞানাঞ্জন দা, আবার আমায় বাঁচ্‌তে হল।"

"এ তোমার ব্রত-ভঙ্গ নয় প্রিয়ব্রত, ব্রতের সার্থকতা, তোমার নব জীবন লাভ! যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি দেহ পাত কর্‌তে চেয়ে ছিলে, তোমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, তুমি তাঁর অভয়বাণী পেয়েছ। ঐ যে তিনি অভয়বাণী দিচ্ছেন, তাঁর বরাভয়কর যে উদ্যত হয়ে রয়েছে। তিনি শিষ্যের হিত-সাধনে সদাই উদ্যত বলেই না তিনি গুরু! তিনি দখিন মুখ, সদাই প্রসন্ন। তুমি সৌভাগ্যবান্ যে তুমি তাঁর বাণী চাইবার পূর্ব্বেই তিনি তোমায় অভয়-আশীর্ব্বাণী প্রেরণ করেছেন। ৺বিজয়ার সেই আশীর্ব্বাদী চিঠি আমিই Post করে ছিলাম, তাতে তো তিনি স্পষ্ট লিখেছিলেন—"তোমরা আমার শুভ ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, ৺মায়ের কৃপায় তোমাদের চিত্তশুদ্ধি ও শুভবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হোক্, নূতন বৎসরে নূতন উদ্যম উৎসাহে গন্তব্য পথে অগ্রসর হও, পথের বিঘ্ন বাধা অপসারিত হোক্।" —এর থেকে আর কি বেশী আশীর্ব্বাদ, কি বেশী অভয়বাণী চাও ভাই? তাঁর অভয়বাণী দেওয়াই আছে, কিন্তু তাঁর অভয়বাণী গ্রহণ করার এতদিন চেষ্টা কর নি, অথবা সেই অভয়বাণী রুদ্র গম্ভীর নিনাদে তোমার কর্ণ-কুহর ভেদ করে হৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ কর্‌তে পারে নি। কতবার তাঁর অভয়বাণী শুনেছ, কতবার তিনি বলেছেন—'মৎকর্ম্মপরমো ভব, তোমরা শুধু আমার কর্ম্ম করে যাও, আমার এপারের কাজের চিন্তার ভার গ্রহণ কর, তোমাদের পরপারের চিন্তার ভার আমি নিলাম, তোমাদের মঙ্গলের ভার আমি নিজের হাতে গ্রহণ কর্‌লাম। আমায় নির্ভর কর, সব ভার দাও আমায়, আমি যা ভাল তা কর্‌বো। ছেড়ে দাও সব আমার হাতে। পাপ-পুণ্য, হিত-অহিত, ভাল-মন্দ, সু-কু সব দাও নিঃশেষে ঢেলে, সব সমর্পণ কর আমাকে, দেখ আমি কি করি তোমাদের জন্যে। তোমরা তোমাদের হৃদাধার শূন্য করে রাখ, আমি পূর্ণ করে দেব। রিক্ত হও, মুক্তি নাও।' —কতবার এ কথা শুনেছ ভাই, কতবার কত নবাগতকে এ অমৃতের বাণী নিজেও শুনিয়েছ! কিন্তু মনে থাকে কই, ভুলে যাও যে! তিনি তো বলেছেনই আমরা স্বভাবতঃই মুক্ত; তবু সেই একই কথা, সেই এক-ঘেঁয়ে কাঁদুনে সুর—'ওগো আমার কিছুই হল না, কিছুই হচ্ছে না, আমি কিছুরই যোগ্যতা রাখি না, জীবনটা শুধু বৃথায় গেল'—এমনিতর কতশত ভাবে, কতশত ছন্দোবন্ধে, রূপে ধাঁচে ধারায় সেই অবিশ্বাসের সুরটাই বেজে উঠ্‌ছে। সেই যে অনাদি কাল হতে প্রবহমান অজ্ঞানের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে অজ্ঞানতার অভিনয় করে, বদ্ধতার ভাণ করে আসছ, সেই পৌনঃপুনিক অভিনয়-ফলজাত সংস্কারের কবল হতে পরিত্রাণ পাওয়া এখন সব চেয়ে কঠিন হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। যে দিন শ্রীগুরুর যে কোন বাক্য জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ বলে একটা সরল সবল অভিব্যক্তি এনে দেবে, যখন সেই

বাক্য সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্ব উপদেশ, সর্ব্ব বাক্যের সার বলে ধারণা হবে, তখনই তা জীবন-তরণী ভাসিয়ে চলার ধ্রুবতারারূপে কাজ করতে থাকবে, দিশেহারা হবার আর আশঙ্কা থাকবে না। সাম্‌না দিকটা উজ্জ্বল সুস্পষ্ট থাকলেই আর কোন সংশয়ের লেশ উদয় হবার অবসরটী পর্য্যন্ত পাবে না। তখনই আমরা "নির্ভয় গত সংশয়ের" জীবন লাভ করে ধন্য হব। "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌" এই কথাতে যদি বিশ্বাস থাকে, যদি বুঝি যে—"গুরু সত্য সেবা সত্য, সত্য পরব্রহ্মতত্ত্ব গুরুনাম ভব কর্ণধার"—তাহলে কি আর কোন ভয় বা ভাবনা থাকে? তাহলে কি আর আমরা সংসার-বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হই? জেনে রেখো প্রিয়, শ্রীগুরুই আমাদের জীবন-তরণীর কর্ণধার, তিনিই আমাদের ইহ-পরকালের গতি। ভুক্তি মুক্তি-প্রদাতা একমাত্র তিনিই। আমাদের পথের বাধা তিনিই সরিয়ে দেবেন, আমাদের চলার শক্তি তিনিই দেবেন, আমাদের লক্ষ্যে পৌছিয়ে তিনিই দেবেন। আমাদের কিছু করতে হবে না,—আমাদের যা আছে সব নিঃশেষে তাঁর পায়ে ঢেলে দিতে হবে, আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে, তাহলেই আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ, সাধনার সমাপ্তি! এই কথা ক'টী আমি তোমাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখতে বলি প্রিয়,—

গুরুং বিনা ন কোঽপি জাড্যহন্তা,
গুরুং বিনা ন কোঽপি মার্গগন্তা,
গুরুং বিনা ন কোঽপি সৌখ্যকর্ত্তা,
গুরুং বিনা ন কোঽপি মুক্তিদাতা॥

এই কথা ক'টীর একটীতেও বিশ্বাস হয় যদি, এর একটীতেও দৃঢ় আস্থা স্থাপন করতে পার যদি, তা হলে আর কিসের দরকার হয় ভাই? তখন নিজেই নিজের রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টায় নিজেরই লজ্জা বোধ হয় না কি?"

"জ্ঞানাঞ্জন দা, আপনি যে আমাকে তন্ময় করে ফেল্‌লেন দেখ্‌ছি! আমার চিত্তে আজ এত বল কোথা হতে এল বলুন তো? বাস্তবিকই জ্ঞানাঞ্জন দা, আপনার কথায় আজ আমার চোখ ফুট্‌ল, ভ্রম ঘুচ্‌ল। এখন বুঝতে পার্‌ছি, এতদিন ঠিক ঠিক আত্ম-সমর্পণ করতে পারি নি, নিজের শক্তির ওপর ভর করে রিপু নির্জ্জিত করতে চেয়ে ছিলাম, তাই বার বার তাদের হাতে পরাজিত হয়েছি, বার বার পথভ্রষ্ট হয়েছি। আজ আর নিজের শক্তির অহঙ্কার নাই, অভিমানের বালাই নাই; আজ থেকে নিজের বল্‌তে আর কিছু রাখ্‌ব না, নিজের দিকে আর চাইব না; ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য সকলের সাথে আমার আমিকে পর্য্যন্ত আজ তাঁর পায়ে বিলিয়ে দিলাম। এ দেহ আর আমার নয়, এ মন আর আমার নয়, এ প্রাণ আর আমার নয়; আমি আজ রিক্ত, আমি আজ শূন্য! জ্ঞানাঞ্জন দা, এতদিন পরে যেন বুকের একটা বোঝা, একটা গুরুভার নেমে গেল, আজ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। উঃ—নিজের ভার কি ভীষণ! *** কোন দিন আপনার কাছ থেকে এত কথা শুন্‌তে পাই নি জ্ঞানাঞ্জন দা, আর শুন্‌তে চাইও নি। আজ বুঝি দয়া করে দয়াল ঠাকুর আমার আপনার মুখ দিয়ে তাঁর চিরন্তন সত্য-অমৃতবাণী শোনালেন। জয় হোক্ দেবতা, তোমারই জয় হোক্। আশীর্ব্বাদ কর যেন আজ হতে মুক্ত কণ্ঠে বল্‌তে পারি—'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী'—আজ হতে যেন জীবন-কুঞ্জে আমার রাগিণী না বেজে তোমারই রাগিণী বাজ্‌তে থাকে, এই আমার নিবেদন শুধু!"

"ধন্য প্রিয়ব্রত, তুমি ধন্য। তুমি তাঁর কৃপার অধিকারী হয়েছ বলে আজ আমার কথাগুলোর যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পার্‌লে। নতুবা কতদিন

তো তোমাদের সাম্নে এ সকল কথা বলেছি, কই এমন করে তো কোন দিন তা তোমার মর্ম্ম স্পর্শ করে নি। যাক্ তুমি তাঁর আশীর্ব্বাদ চেয়ে ছিলে, আশীর্ব্বাদ পেয়েছ, আমি তাঁর কাছ থেকে সে আশীর্ব্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছি। প্রিয়ব্রত! আমিও সৌভাগ্যবান্, তুমিও সৌভাগ্যবান্। একজন ধন্য তার স্নেহ-প্রতিম শ্রদ্ধার প্রতীক সন্তপ্ত তৃষিত শুষ্কপ্রাণ ছোট ভাইটীর জন্যে শ্রীগুরুর করুণা-বিগলিত স্নেহধারা শিরে বহন করে পৌছে, আর অন্যজন সেই অমিয় স্নিগ্ধ তুষার শীতল অমলধবল স্বচ্ছ সুমধুর স্বর্গীয় নির্ঝরিণীর ধারা পানে বিগত তৃষ্ণ হয়ে। নাও প্রিয়ব্রত তাঁর আশীর্ব্বাদ; হোক্ তোমার সব সুন্দর, দেহ সুন্দর, মন সুন্দর, প্রাণ সুন্দর। তুমি শুধু তাঁকে নির্ভর করে চল, মঙ্গল হবে, শুভ হবে। "শুভ হবে, মঙ্গল হবে" তাঁর এই আশী-র্ব্বাণীই তোমার জীবন-তরণী পরিচালনের দিক্ নির্ণয়ী যন্ত্র হোক্। আজ থেকে অশুভ তোমার দূরে গেল, অমঙ্গল অপসৃত হল, মালিন্য আর তোমার ত্রি-সীমায়ও আস্‌তে পারবে না। কারণ তুমি যে শিব-গুরুর মঙ্গল হস্তে পরিচালিত! অমৃতের সন্তান আমরা, অমর-পদ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে! পতনের—ধ্বংসের—বিনাশের ভয় কোথায়? ওগো অমর পথের পথিক! এস আমরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে গলা জড়াজড়ি করে পরম পিতার পরম ধামে চরম গতি পরম শান্তি লাভ করিগে। এস ভাই, এস যাই, তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁরই ছন্দো-বন্ধানুকরণে লীলায়িত পদ বিক্ষেপে সেই অমরধামে প্রয়াণ করি। তাঁর মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ আমাদের শিরে বর্ষিত হোক্, তাঁর শুভ ইচ্ছা আমাদের পথের বাধা অপসারিত করুক, হাস্‌তে হাস্‌তে সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করে আমরা জীবন-মরণের পরপারে চলে যাই। *** ঐ যে মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, এস আমরাও স্তিমিতনেত্রে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রদীপ জেলে বিশ্বেশ্বরের আরতি করি, আমাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দিয়ে তাঁকে ব্যজন করি, আর শেষে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে যুক্তকণ্ঠে বলি—

ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব,
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥

রাস-প্রসঙ্গে

আজ পূর্ণিমা; পূর্ণ শশধরের স্নিগ্ধ শুভ্র কিরণ ধারায় জগৎ পরিপ্লাবিত। এই জ্যোৎস্নাহসিত রজনীতে উদাস প্রাণে চাহিয়া আছি দিগন্তের পানে; দৃষ্টি উদাস, মন চিন্তাশূন্য। দেখিতে দেখিতে শূন্য চিত্ত চিন্তার জোয়ারে ভরিয়া গেল, শূন্য পূর্ণ হইয়া উথলিয়া উঠিল। মনে হইল কত দিন—কত যুগ পূর্ব্বে ঠিক এমনি একটী রাত্রিতেই অখিলাত্মার ঘন বিগ্রহ শ্রীভগবান্ মানুষ-দেহে মানুষের সঙ্গে কত লীলা-রঙ্গ করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁর বাঁশীর তানে যমুনা উজান বহিয়াছিল, রাস-রস-স্রোতে আরাধিকাদের সাংসারিক কর্ত্তব্য-জ্ঞান কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল।

হৃদয়ের মাঝেও যখন সত্যের বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, যখন অনাহত নাদে হৃদয়-পুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তখন এমনি করিয়াই চিত্ত-যমুনার স্রোত নিম্নগতি ছাড়িয়া উর্দ্ধগামী হয়, আনন্দ-প্লাবনে আসক্তির বন্ধন কোথায় ভাসিয়া যায়।

যেমনি যমুনার কূলে বাঁশী বাজিয়া উঠিল, অমনি সকলে ছুটিলেন তাহার পানে; ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্রস্ত হইয়া গেল, বেণীবন্ধ শিথিল হইয়া পড়িল। সকলেই ছুটিলেন বটে কিন্তু কেহ কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া, কেহ কাহাকেও এই অভিসারের বার্ত্তা না জানাইয়া প্রাণের ঐকান্তিক আবেগে! তাঁহাদের গৃহ-কার্য্য পড়িয়া রহিল প্রারম্ভাবস্থায়—অর্দ্ধসমাপ্তাবস্থায়।

এমনই হয়। যত দিন না তাঁহার আকুল আহ্বান প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়, যতদিন না তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা জন্মে, ততদিন কাহারও সংসার-বন্ধন শিথিল হয় না, কুল ছাড়িয়া কেহ অকুলে ভাসে না। বলিয়া কহিয়া এ আকুলতা কাহারও মাঝে জাগান যায় না, এ আকুলতা স্বতঃ স্ফূর্ত্ত! যখন মানুষ বুঝিতে পারে, সংসারকে ভালবাসিয়া সংসারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যতখানি সুখ, তাহার বহু বহুগুণ বর্দ্ধিত সুখ এই নিবৃত্তির পথে— ভগবৎ প্রীতির পথে রহিয়াছে, যখন প্রকৃতই তাঁর করুণা বাঁশরীর পাগল করা সুর কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, তখন সে আর তুচ্ছ বিষয়ে আনন্দ পায় না, তুচ্ছ বিষয়কে তুচ্ছ করিয়াই নিঃসঙ্গ হইয়া ছুটে সে তখন অনন্দের উৎসে অবগাহন করিতে। মানুষ ইহাদেরই বলে ব্যভিচারী, কর্ত্তব্যজ্ঞান শূন্য!

গোপীরা উপস্থিত হইলেন তাঁহার পাদমূলে অন্তরের বিরহানল প্রিয়তমের অঙ্গস্পর্শে প্রশমন করিবার অভিপ্রায়ে, কত দীর্ঘ দিনের আশা প্রিয়-সঙ্গে পূর্ণ করিবার আশায়। বড় আশা করিয়া তাঁহারা আসিয়াছেন, তাই চতুর শিরোমণি চাতুরালী করিয়া বলিয়া উঠিলেন— "ওগো তোমরা এই অসময়ে ঘোরা রজনীতে বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া এই ঘন বনে চলিয়া আসিলে কেন? তোমাদের কি কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই? তোমাদের কি স্বামী-পুত্র নাই? স্বামী-পুত্রের সেবাই যে তোমাদের পরম ধর্ম্ম। তোমরা সেই ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কুল ছাড়িয়া অকুলে ভাসিলে? তোমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।"

গোপীদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে প্রিয়তমের সঙ্গ-লালসায় তাঁহারা আজ কুল মান লাজ সব ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাদমূলে ছুটিয়া আসিয়াছেন, সে-ই কিনা আজ নিষ্ঠুরের মত—শত্রুর মত এই নির্ম্মম বাণী শুনাইল? অভিমানে তাঁহাদের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। কোন প্রকারে অশ্রুসম্বরণ করিয়া মৃদুভাষে বলিলেন—"ও গো প্রিয়, তুমিই যে আমাদের প্রিয়তম, তোমা ছাড়া আর তো কেহ আমাদের প্রিয়তম নাই! তোমার রূপ আমাদের বিহ্বল করিয়াছে, তোমার হাসি আমাদের পাগল করিয়াছে, তোমার বাঁশী আমাদের কুল ছাড়াইয়াছে। আমরা স্বামী জানি না, পুত্র জানি না, গৃহ-সংসার জানি না। আমরা জানি তুমিই আমাদের সব, তুমিই আমাদের সকল। ও গো, আমরা তোমার চরণ-রেণুর দাসী হইব বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি, আমাদের এ আশায় বাজ ফেলিও না নিষ্ঠুর! আমরা তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। ইচ্ছা হয় তুমি আমাদের নিষ্পেষিত করিয়া মার, তোমার চরণতলে আমারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তবু আর তো কুলে ফিরিব না।"

কোন্ সুদূর অতীতে যে লীলার অভিনয়

হইয়াছিল, আজও চোখের সম্মুখে তাহার স্নিগ্ধ জ্যোতির আভাস দেখিয়া চিত্ত আবেগে ভরিয়া উঠে। কত কুল-হারাকে অকূলের কূলদাতার পাদমূলে আসিতে দেখিলাম, আশায় উচ্ছ্বাসে আবেগে ব্যাকুলতায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া। শুনিলাম সেই চিরন্তন বাণী—"কেন আসিয়াছ গো কেন আসিয়াছ; ফিরিয়া যাও গৃহে—সংসার কর্ত্তব্য পালন কর গিয়া।" যাহাদের হৃদয়ে ততটুকু আকর্ষণ আসে নাই, যাহাদের ব্যাকুলতা চরমে পৌছায় নাই, তাহারা এই নিষেধাত্মক বাণী শুনিয়াই ফিরিল, আর যাহারা সব ছাড়িয়া সবকে ধরিতে আসিয়াছে, সবের মাঝে কিছুই নাই সবের মাঝেই সকল আছে ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহারা গেল না, দিশারীর পা জড়াইয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে চিরন্তন শরণাগত-বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমরা তো আর ঘরে ফিরিব না, ঘরে ফিরিব বলিয়া তো তোমার কাছে আসি নাই দেবতা! আমরা জনম ভরিয়া রহিব পড়িয়া তব পদ রেণু চুমি।"

স্থূলের খেলা সূক্ষ্মেও দেখি, বাহিরের লীলা অন্তরেও প্রত্যক্ষ করি। যখন ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি বহির্বিষয়ের সেবা ছাড়িয়া অন্তর-পুরুষের সেবায় নিযুক্ত হয়, যখন তাহাদের গতি বহির্ম্মুখীনতা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখী হয়, তখন চিত্তে একটা আন্দোলন, একটা সংশয় উপস্থিত হয়—কর্ত্তব্য কি? বিষয়ের সেবা না বিষয়ীর সেবা? এই সংশয়ান্দোলিত চিত্ত সংশয়-তরঙ্গ ভেদ করিয়া যখন বহুর সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এককেই পরমাশ্রয় বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে গ্রহণ করে, তখনই চিত্ত তাঁহাতে ডুবিয়া যায়, আপন হারা হয়।

গোপীদের এই ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাদের লইয়া নানাবিধ ক্রীড়াবিলাস করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহার সঙ্গ-কামনায় এতদিন তাঁহারা বিরহের আগুনে জ্বলিতেছিলেন, কত দীর্ঘ রজনী যাঁহার মননে যাঁহার ধেয়ানে বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়াছে, আজ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু মান লাভ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইলেন, তাঁহাদের চিত্ত গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল, তাঁহারা ভাবিলেন—জগতে আমাদের মত ভাগ্য আর কার আছে? অন্তর্য্যামী সব বুঝিলেন। তাঁহাদের এই গর্ব্ব এই অভিমান ভাঙ্গিবার জন্য তিনি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

সাধকও যখন কত তপস্যায়, কত ব্যাকুলতায় একটী লোভনীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করেন, তখন যদি তাঁহার চিত্তে অভিমান বা অহঙ্কারের রেখা ফুটিয়া উঠে, তখন যদি তিনি নিজকে খুব বড় মনে করিয়া ভাবেন যে "কোঽস্তি সদৃশোময়া" তাহা হইলে তাঁহার সে অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সাধক যতদিন না বুঝিতে পারেন যে তাঁহার শক্তিতে তাঁহার সাধনায় কিছুই হইতেছে না, সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাধীন, তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছাই তাঁহার সাধনাকে সার্থক করিয়া সিদ্ধিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, ততদিন তাঁহার কোন ভাবই—কোন অবস্থাই স্থায়ী হইতে পারে না, তাহা চকিতে আসিয়া আবার চকিতেই মিলাইয়া যায়। মঙ্গলময় তাই মাঝে মাঝে সাধকের মাঝে এক একটী অবস্থার সঞ্চার করিয়া আবার তাহা সরাইয়া লন। বিন্দুমাত্র গর্ব্ব-অহঙ্কারের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত সাধক-হৃদয়ে এইরূপ লুকোচুরী চলিতে থাকে। ইহাই হইল রাসমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান!

তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানে গোপীগণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের আনন্দের হাট অসময়ে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। ব্যাকুল ভাবেই তাঁহারা প্রিয়ের অনুসন্ধানে বনে

বনে ঘুরিতে লাগিলেন, যাহা কিছু চোখের সম্মুখে পড়িতে লাগিল—স্থাবর বা জঙ্গম—তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওগো, তোমরা কি আমাদের প্রিয়তমের সন্ধান বলিতে পার, সে নিঠুর কি এই পথ দিয়া গিয়াছে?" এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তাঁহারাও ক্লান্ত হইয়া পুনরায় যমুনাপুলিনে ফিরিয়া আসিলেন। যখন দেখিলেন সে নিঠুর আর কিছুতেই আসিতেছে না, খুঁজিয়াও কোন ফল হইতেছে না, তখন তাঁহারা তাঁহার আগমনে অভিলাষিণী হইয়া প্রিয়তমের গুণগানে ব্যাপৃত হইলেন এবং আকুল কণ্ঠে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ওগো বন্ধু! তোমাকে আমরা কত খুঁজিলাম, দেখা পাইলাম না, তোমার নাম ধরিয়া কত ডাকিলাম তুমি আসিলে না। তোমার বিরহে তোমার অদর্শনে আমাদের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে যে! আমরা তোমার কাছে কোন সম্পদের প্রত্যাশা করি না নিঠুর! আমরা চাই শুধু তোমাকে, তোমাকে দেখিয়া তোমাকে স্পর্শ করিয়া আপন হারা হইতে। ওগো প্রিয়, পাছে তোমার ব্যথা লাগে, এই আশঙ্কায় আমরা তোমার যে চরণকমল আমাদের কঠিন কুচতটে অতি সন্তর্পণে ধারণ করি, তুমি সেই পাদপদ্ম সুকঠিন মৃত্তিকায় ফেলিয়া কাননে কাননে ভ্রমণ করিতেছ? সূক্ষ্ম উপলখণ্ড, সুতীক্ষ্ণ দর্ভাঙ্কুর প্রভৃতি হইতে তোমার ব্যথা হইতেছে না কি প্রিয়তম? তোমার ব্যথার কথা ভাবিয়া আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে যে! এস এস বন্ধু ফিরে এস, কঠোর ধারিত্রীবক্ষ তোমার চরণ-স্থাপনের যোগ্য নয়,—এসগো তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার সুকোমল চরণ যুগল স্থাপন কর!"

গোপীদের আকুলতায়, প্রাণের ঐকান্তিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে গোপীমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন; গোপীদের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল, প্রিয়তমকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাদের মনোব্যথা দূরে গেল, শরীর পুলক-কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আবার ভগবান্ তাঁহাদের সহিত বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন, আবার তাঁহাদের সহিত লীলা-বিলাসে মগ্ন হইলেন। ইহাই পূর্ণ রাস, পূর্ণ বিহার, তাইতো ভগবান্ রাসবিহারী!

সাধকের চিত্তেও এমনি করিয়া রাস-লীলার লুকোচুরী চলিতে থাকে। ক্ষণেকে পাইয়া অভিমান অহঙ্কারের আবেগে যখন তাহা ক্ষণেকে হারাইয়া যায়, ক্ষণিকার মত চকিতে আসিয়া চকিতেই মিলাইয়া যায়, তখন সাধক বিহ্বল হইয়া পড়েন, আরূঢ় অবস্থা হইতে স্খলিত হইয়া আবার সেই অবস্থা লাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। কেমন করিয়া সেই অবস্থা লাভ হইবে, কেমন করিয়া আবার হারানো রতন ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, এই ব্যাকুলতা লইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, সাধন হইতে সাধনান্তরে তাঁহারা ঘুরিয়া মরেন। কিন্তু ঘুরিয়া বেড়াইলে কি হইবে? ঘুরিলে তো তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তাই গোপীদের মত আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়, যে স্থানে সে হারাইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া ব্যাকুলভাবে সেই অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতে হয়। যখন সাধক বুঝিতে পারেন যে নিজের চেষ্টায় তো কিছুই হইল না, এতদিন ধরিয়া যাহার জন্য কত পণ্ডশ্রম করিলাম, সে ফিরিয়া আসিল না তো! তাহা হইলে আমার শক্তির—আমার সাধনার মূল্য কতটুকু? তাহার যদি আসিবার ইচ্ছা না হয়,

তবে আমার চেষ্টায় আর কি হইতে পারে? এই ভাবে পূর্ণ হইয়া যখন সাধক একান্তমনে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার যে অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে—তাহা পূর্ব্ব হইতেও উজ্জ্বলতর—স্থিরতর!

কেন এমন হয়? যাহার জন্য প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, যাহার অদর্শনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি, সে কেন এমন নিষ্ঠুরের মত আচরণ করে, কেন সে এমন করিয়া চকিতে আসিয়া চকিতে মিলাইয়া যায়?

গোপীদের প্রাণেও এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইয়াছিল, তাঁহারা নিষ্ঠুরের ব্যবহারে নিপীড়িত হইয়া প্রশ্নই করিয়া বসিলেন—

"ওগো বন্ধু! তোমার রীতিটা কেমন বল তো? আমরা তোমার জন্য পাগল, আর তুমি আমাদের এমনি করিয়া কাঁদাইয়া দূরে দূরে সরিয়া থাকিতেছ? আচ্ছা বল দেখি প্রিয়, ভালবাসা পাইয়া তবে ভালবাসে কাহারা, ভালবাসা না পাইয়াও ভালবাসে কাহারা, আবার উভয়টীকে উপেক্ষা করিয়া নিরপেক্ষ থাকে কাহারা?"

শ্রীভগবান্ গোপীদের মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, গোপীদের ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া তিনি যে দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে ছিলেন, ইহা তাহারই কটাক্ষপূর্ণ অভিব্যক্তি। —ভগবান্ উত্তর করিলেন—"যাহারা প্রতিদান পাইবার আশা রাখে, যাহারা স্বার্থপর, স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বুঝে না, তাহারাই পরস্পর পরস্পরের ভালবাসার অপেক্ষা রাখিয়া ভালবাসে; সে ভালবাসায় প্রীতি নাই, সে ভালবাসায় প্রেম নাই। আর স্নেহে অন্ধ যাহারা, মমতায় মুগ্ধ যাহারা, তাহারা ভালবাসা না পাইয়া এমন কি উপেক্ষিত হইয়াও ভালবাসার জনকে ভালবাসে, ইহাতে ধর্ম্ম ও সৌহৃদ্য উভয়ই আছে। কিন্তু যাঁহারা আত্মারাম, আপ্তকাম, অথবা অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী তাঁহারা ভালবাসা না পাইলে তো কথাই নাই, ভালবাসা পাইয়াও কাহাকেও ভালবাসেন না। ওগো, তোমরা আমাকে এই শ্রেণীরই ধরিয়া লও। তবে আমি অকৃতজ্ঞ বা গুরুদ্রোহী নহি, আমি আত্মারাম—আপ্তকাম। আমি ভালবাসা পাইয়াও ভালবাসি না কেন জান? বেশী করিয়া ভালবাসা পাইবার জন্য। যাহারা আমাকে ভালবাসে, তাহারা তাহাদের সঞ্চিত ভালবাসার বিনিময়ে আমার ভালবাসা না পাইয়া আমাকে বেশী করিয়া ভালবাসিবার জন্য প্রস্তুত হয়, আমার অপ্রাপ্তিতে আমার বিরহে তাহাদের হৃদয় জ্বলিতে জ্বলিতে বি-মল হয়। আমিও তো তাই তোমাদের কাছ হইতে অন্তর্হিত হইয়া ছিলাম। তোমরা যাহাতে আরও ব্যাকুল হইয়া উঠ, তোমাদের চিত্ত যাহাতে আমার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়, সেইজন্যই তো আমি এমনি করিয়া তোমাদের চোখের অন্তরাল হইয়াছিলাম। আমার অন্তর্ধান সার্থক হইয়াছে, তোমাদের ব্যাকুলতায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের ভালবাসায় আজ আমি বাঁধা পড়িলাম।"

ভগবান নিষ্ঠুর নহেন, নির্ম্মম নহেন, তিনি বড় অভিমানী। তাঁহার ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কামনা-বাসনার লেশ হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন না, এমনি করিয়া গোপন ভাবেই থাকেন। যখন হৃদয়ের আবর্জ্জনা জ্ঞানের আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, যখন চোখের জলে ব্যাকুলতার বন্যায় সব ধুইয়া যায়, তখনই তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। সে আবির্ভাব ক্ষণিক নয়; নিত্য—স্থায়ী—চিরন্তন!

আত্ম-পরমাত্মার যে যোগ, ভক্ত-ভগবানের যে মিলন, সত্যের যে স্বতঃ প্রকাশ তাহাই তো রাস-লীলা! এই লীলা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সর্ব্বত্রই চলিতেছে।

অমাবস্যার ঘোর আঁধারের পর ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না ফুটিতে ফুটিতে যখন পূর্ণ চন্দ্রের বিকাশ হয় আকাশে, তখনই হয় রাসলীলা। রজস্তমো গুণ ধ্বংস হইয়া হৃদয়ে যখন শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়, তখনই সেই সত্ত্বপূর্ণ হৃদয়ে সত্যের বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। সূক্ষ্মের এই লীলা স্থূলেও আস্বাদ করাইবার জন্য দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় ঋষিদের আহ্বানে পূর্ণ-কাম পূর্ণরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে গোপীগণ তাঁহার দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গন পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা সামান্যা নারী ছিলেন না। আপ্তকাম সিদ্ধ মুনিঋষিগণই বহু বহু জন্মের তপস্যার ফলে, ভগবান অধোক্ষজে ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে ভগবানের ব্রজলীলার সহায়করূপে ব্রজগোপীদের দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

স্থূলে পরমাত্মাকে—ভগবান্‌কে আস্বাদন করাই চরম কথা। তাই মুনি ঋষিগণ সূক্ষ্মে তাঁহাকে পাইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, স্থূলে ভগবানের অঙ্গ-সঙ্গ কামনা করিয়া ছিলেন। তাই তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি সব বিসর্জ্জন দিয়া আভিরিণী গোয়ালিনী হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানাভিমান পরিত্যাগ করিয়া "সহজ-মানুষ" হইয়াছিলেন। সহজ না হইলে সহজের সন্ধান মিলে না, সহজ না হইলে সহজের প্রেম হয় না। যতদিন না বুদ্ধির মরণ হয়, যতদিন না জ্ঞানা-ভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সরল গোপী-হৃদয় লাভের সৌভাগ্য লাভ হয়, ততদিন সহজের দর্শন সহজের স্পর্শন মিলে না। যাঁহারা প্রেমের সাধনা করিতে চান, গোপীরাই তো তাঁহাদের আদর্শ, গোপীদের ব্যাকুলতাই তো তাঁহাদের সাধ্য! তাই প্রেমের সাধকদের কোন গোপীর অনুগ হইয়াই প্রেমের সাধন করিতে হয়। গোপীদের হৃদয়ানুরাগ, গোপী-দের সংসারবিরক্তি, গোপীদের ভগবৎপ্রীতি, এ সকলই সাধক মাত্রেরই অনুকরণীয়, গোপীদের পদাঙ্ক সকলেরই অনুসরণীয়, গোপীরা যে অবস্থা লাভ করিয়া পূর্ণ পুরুষের সহিত রাস-লীলার অধি-কারিণী হইয়াছিলেন, সে অবস্থাও সকলের কাঙ্ক্ষনীয়!

* * *

রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া অনেকে ইহার কত বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া বসেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি ভগবান্‌ই হইয়া থাকেন, তবে তিনি এমন ব্যভিচার করিলেন কেন, পরদার-সঙ্গ করিলেন কেন? "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই উপদেশানুযায়ী তো তবে ভগবানের আদর্শে সকলেই ব্যভিচারী হইয়া উঠিবে! এ কেমনতর লীলা—ইত্যাদি।

সংশয়ীর মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগে, প্রশ্ন জাগা অসঙ্গতও নয়। শুকদেবের শ্রীমুখ হইতে এই রাসলীলা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তরেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি স্পষ্টই শুকদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

> সংস্থাপনায়ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
> অবতীর্ণো হিভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
> সকথং ধর্ম্ম সেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
> প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্শনম্॥
> আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈজুগুপ্সিতম্।
> কিমভিপ্রায় এতংন সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥

এ প্রশ্নে বিদ্রূপ কটাক্ষের লেশ মাত্র নাই, ইহা যথার্থ জিজ্ঞাসু-প্রাণের সরল অভিব্যক্তি। এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব যে কয়টী কথা বলিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি পরীক্ষিতকে গোপীদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনে-সহস্রের গোলক-ধাঁধায় না ফেলিয়া স্পষ্টই ভগবানের ঐরূপ

আচরণের অ-দোষত্ব কীর্ত্তন করিলেন। তিনি বলিলেন—

ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥

যাঁহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপর ঈশিত্ব জন্মিয়াছে, যাঁহারা তাহাদের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহাদেরই প্রভু হইয়াছেন, মায়ার অধীন না থাকিয়া মায়াধীশ হইয়াছেন, এই প্রকার ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মাতিক্রম এবং সাহস দেখা গিয়াছে। তাহাতে তাঁহাদের পাপ স্পর্শ করে না, তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণ তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না। কেন এমন হয়? তাহার উত্তরেই শুকদেব বলিয়া উঠিলেন—**তেজীয়সাং ন দোষায়।** যাঁহারা তেজীয়ান্, প্রকৃতই যাঁহাদের অন্তরে জ্ঞানের বহ্নি জ্বলিতেছে, তাঁহাদের এই ধর্ম্মাতিক্রম দোষের হয় না, জ্ঞানাগ্নিই তাঁহাদের সকল কর্ম্ম ধ্বংস করিয়া দেয়, সুতরাং কিসে তাঁহাদের বন্ধন সম্ভবপর? অগ্নি সর্ব্বভুক্; ভাল-মন্দ, সু-কু সবই তিনি ভোজন করেন; তথাপি তিনি পাপী নন—পাবক, পাবনকারী, পবিত্রকারী। কেননা, তাঁহার কুকেও সু করিবার শক্তি রহিয়াছে, সকল হজম করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে।

কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর নহেন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে, তাঁহারা যেন কদাপি ঈশ্বরের আচরণ না করিয়া বসেন। এমন কি সে আচরণের কল্পনাও যেন তাঁহাদের অন্তরে স্থান না পায়। ভূতনাথ না হইয়া ভূত লইয়া খেলা করিতে গেলে ভূতেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেয়। রুদ্র যিনি, শিব যিনি, তিনিই সমুদ্র মন্থনোত্থ হলাহল পানে সক্ষম, অপরে তাহার আচরণ করিতে গেলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী!

শুনি নাকি অনেক স্থানে বৈষ্ণব বাবাজীরা গোপিনী সঙ্গে রাসলীলায় অভিনয় করিবা থাকেন, তাহাদের গূঢ় কৃষ্ণ-প্রেম শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহা যে কতদূর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অনিষ্টকর তাহা আর বলিবার নয়। তাই শুকদেব বলিতেছেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥

আবার অপর পক্ষে কত লোকের কাছে কত সিদ্ধ মহাপুরুষেরও নিন্দাবাদ শুনিয়া থাকি—'তাঁহারা সাধু হইয়াও কেন বিলাস ব্যসনে ডুবিয়া থাকেন, তাহাতে কি তাঁহাদের পতন হয় না ইত্যাদি।' কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান ভাগবতের বজ্রনির্ঘোষ বাণী—"তেজীয়সাং ন দোষায়"। তুমি আমি যে আচরণ করিলে পতনের চরমে গিয়া উপস্থিত হইব, যাঁহারা তেজীয়ান্ তাঁহারা সে আচরণ করিলে সেই আচরণজনিত দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না, বন্ধন করিতে পারিবে না, কারণ তাঁহারা যে মুক্ত! তাঁহাদের সকল আচরণ আমাদের আচরণীয় নহে, তাঁহাদের উপদেশবাণীই আমাদের প্রতিপালনীয়। এই কথার সমর্থন করিয়াই শুকদেব বলিলেন—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাং স্তৎসমাচরেৎ ॥

কেন তবে তাঁহারা এই ধর্ম্মাতিক্রম রূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়া থাকেন, কেন তবে তাঁহারা লৌকিক আচার উল্লঙ্ঘন করেন, এই সংশয় নিরসন কল্পে শুকদেব আবার বলিলেন—

এই যে তাঁহাদের আচরণ, ইহা তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত আচরণ। প্রারব্ধক্ষয় মাত্র মানসে তাঁহারা দেহ ধারণ করিয়া থাকেন শুধু। তাঁহারা স্ব স্বরূপে অবস্থান করিয়া আপন জীবনে প্রারব্ধের লীলা দেখিয়া যান। প্রারব্ধ বশে তাঁহাদের জীবনে সাধারণ দৃষ্টিতে যে সমস্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ভাব লক্ষিত হয়, তাহা তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না, কারণ তাঁহারা

এমন স্থানেই পৌঁছিয়াছেন, যেখানে পাপ-পুণ্যের শিখা পৌঁছিতে অক্ষম। মঙ্গল-অমঙ্গল তাঁহাদের নিকট সমান হইয়া গিয়াছে; পুণ্য করিলেও সেই পুণ্যের ফল তাঁহারা ভোগ করেন না, পাপ করিলেও সেই পাপের ফল তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না।

যাঁহারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এই প্রকার ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই যখন কোন কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, তখন যিনি তির্য্যক, মর্ত্ত্য ও দেবতা প্রভৃতি নিখিল জীবের ঈশ্বর, যিনি যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাঁহার কুশলাকুশলের সম্ভাবনা কোথায়?

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা।
যোগপ্রভাববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ॥
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা।
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥

যাঁহার চরণারবিন্দের মাত্র সেবা করিয়া জ্ঞানী-ভক্তগণ যোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধ বিদূরিত করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন, কোন কর্ম্মই আর যাঁহাদের বন্ধন করিতে পারে না, সেই সকল মুক্তাত্মাদিগেরও যিনি মুক্তিদাতা ঈশ্বর, তাঁহার বন্ধন কি প্রকারে সম্ভবে? যাঁহার নাম লইয়াই ভবসাগর পাড়ি দেওয়া যায়, তিনি কেমন করিয়া সেই সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারেন?

গোপীনাংতৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥
অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃশ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥

যিনি গোপীদিগের, গোপীর স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে আত্মারূপে বিরাজ করিতে-ছেন, যিনি বুদ্ধ্যাদিরও সাক্ষী, তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে দেহ ধারণ করিয়া জীবের হিতসাধন নিমিত্ত মানুষ-দেহে নানারূপ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই লীলা দর্শন যাহাদের ভাগ্যে না ঘটে, তাহারা তাঁহার লীলা শ্রবণ করিয়াই তাঁহার প্রতি আসক্তচিত্ত হয়।

এই রাস লীলার উদ্দেশ্যও তাহাই। এই লীলা শ্রবণের ফল কি, তাহাও শ্রীশুকদেব লীলাবর্ণনান্তে শ্লোকাকারে বলিলেন—

বিক্রীড়িতংব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ।
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ॥
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতি লভ্য কামং।
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই যে লীলা-বিলাস, ইহার কথা যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ ও বর্ণন করেন, তিনি ত্বরায় ভগবানে পরমাভক্তি লাভ করিয়া অবিলম্বে কামরূপ মানসিক পীড়া হইতে বিমুক্ত হন।

এখানে স্বতঃই প্রশ্ন হইতে পারে, রাস লীলা তো কামের লীলা, এই কামের লীলা শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে কামজয়ী হইতে পারা যায়?

তদুত্তরে বলি—বিষয়-সম্ভোগ-বাসনাই হইতেছে কাম, আর ঈশ্বর-সম্ভোগ-বাসনা প্রেম। ভালবাসা বা আকর্ষণ নিম্নগ হইলে কাম আখ্যায় অখ্যাত হয়, আবার উর্দ্ধগ হইলেই তাহা প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। রাসলীলা কামের লীলা নহে, প্রেমের লীলা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবান্ আপ্তকাম, তিনি স্বেচ্ছায় যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক দেহ ধারণ করিয়াছিলেন জীবগণকে রস আস্বাদন দিবার জন্য। কিরূপ ব্যাকু-লতা আসিলে সংসারবন্ধন শ্লথ হইয়া যায়, কিরূপ আকর্ষণ প্রাণে সঞ্জাত হইলে কর্ত্তব্যজ্ঞান লোপ পাইয়া যায়, কিরূপ ভক্তির আবির্ভাব ঘটিলে শ্রীভগবানকেই একমাত্র পরমাশ্রয় বলিয়া ধারণা জন্মে, কিরূপ নিরভিমান নিরহঙ্কার হইতে পারিলে ভগবানের অঙ্গস্পর্শের অধিকারী হওয়া যায়, রাস-লীলা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই লীলা শ্রবণ আলোচনায় স্বঃতই সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে,

সংসারাসক্তি কমিয়া আসে, আত্মারামে প্রকৃত রতি জন্মে, রতি হইতেই প্রেমের উদ্ভব হয়, তার পরই তো লীলা বিলাস—রসের রাসলীলা! এখানে আর কামের গন্ধ কোথায়? "যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম, যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম।" তাইতো জ্ঞানী-ভক্ত রাস বিহারীর উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকেন—

ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ় দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডনঃ॥

হিমাচলের পথে

[ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

ভীমসেন শিলা হতে আধমাইল যাবার পর **রামবাড়া** চটী পেলাম। ক্রমোচ্চ পথে ক্রমশঃ চড়াই করে এসেছি। রামবাড়া চটীই এ পথের শেষ চটী। এর পরেই কেদারনাথ ধাম। এ চটীটি বেশ বড় চটী এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেকগুলি বড় বড় দোকান আছে, তাতে আহার্য্য জিনিস মোটামুটি বেশ পাওয়া যায়। বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালাও আছে— সদাব্রত দেওয়ার ব্যবস্থাও বেশ ভাল, ধর্ম্মশালা হ'তে যাত্রীদের কম্বল কর্জ্জ দেওয়া হয়। উৎরাই করার সময় আবার কম্বল ফেরৎ দিয়ে আসতে হয়। নিকটেই পোষ্টাফিস। যাবার সময় বা আসার সময় প্রায় প্রত্যেক যাত্রীই এস্থানে বিশ্রাম করেন। কেদারনাথে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য অনেক যাত্রীই কেদারনাথ হতে নেমে এসে রাত্রিবাস এখানেই করেন। এখানে জলের খেলা অতি সুন্দর, —যা আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও দেখি নি। চটীগুলির ভিতর দিয়ে—এমন কি ঘরের ভিতর দিয়ে ড্রেণ করে জলের নহর নিয়েছে, সেই জলের নহরের উপর খাট পেতে আরামের সহিত জলের কলকল শব্দের সঙ্গে মন-প্রাণ মাতিয়ে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হওয়া যায়। আবার সাধকগণ ঐ শব্দের সঙ্গে অনাহত নাদ সংযুক্ত করতঃ মনঃস্থির করে সমাধির কোলে আশ্রয় নিতে পারেন, বা আত্মানন্দে বিভোর হয়ে সাংসারিক যন্ত্রণার হাত হতে ক্ষণকালের জন্যও মুক্ত হতে পারেন। এ চটীর মত এমন সুন্দর জলের খেলা হিমালয়ের আর কোথাও দেখি নি; খুব আনন্দের স্থান বটে— কিন্তু বিষম শীত! শুনতে পেলাম, অন্যান্য বৎসর এ পথে আসতে অনেক বরফ পার হতে হয়, কিন্তু এবার আমরা অনেক দেরীতে আসায় এ পর্য্যন্ত এ পথে বরফ পাই নি। এই রামবাড়া চটী হতে কেদারনাথ যেতে পথে এক জায়গায় মাত্র বরফ পেয়েছিলাম। যাঁরা বরফের ভয় করেন বা দারুণ শীতের হাত হতে সামান্য মুক্তিলাভ করতে চান, তাঁরা আষাঢ় মাসের শেষ হতে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এ পথে এলে মোটেই বরফ পাবেন না; তবে পাহাড়ের শীর্ষদেশে তখনও অচল, অটল বরফ জমে থাকে দেখতে পাবেন। পূর্ব্বে শুনেছিলাম, এই চটী হতে কেদারনাথ যেতে যাত্রীদের ভয়ানক কষ্ট হত— প্রথমতঃ চড়াই, দ্বিতীয়তঃ অপর্য্যাপ্ত বরফের উপর দিয়ে চলতে হত, তৃতীয়তঃ অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রায়ই পথ ভেঙ্গে যাওয়ায় পথের

রামবাড়া ॥ মাইল

কোনই চিহ্ন পাওয়া যেত না। চারিদিকে নদী, পর্ব্বত, রাস্তা, ঘাট শুধু বরফাচ্ছন্ন থাকায় এবং উত্তর দিকের সুশীতল বাতাসে হাত-পা অসাড় হয়ে চলৎ-শক্তি রহিত হয়ে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হত— সে সব আশ্চর্য্য নয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে এলে ঐরূপ দুর্দ্দশাতেই পড়তে হয় বটে! কিন্তু আমাদের কি সৌভাগ্য! শ্রীশ্রীগুরুদেবের কি অতুল স্নেহ! আমরা এ সব বিপদে মোটেই পড়ি নি। তবে এ পথটুকু— রামবাড়া হতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত পথটুকু কখনই বেলা ১২টার পর চল্‌তে নাই, বা যে দিন সকালে ঝড়-বৃষ্টি হবে, সে দিন যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

যাত্রীগণ রামবাড়া চটিতে ভারি জিনিষাদি বা অতিরিক্ত জিনিষাদি রেখে বোঝা হাল্কা করে যান। দোকানদারগণ যাত্রীদের জিনিষ যত্নের সহিত রেখে থাকে। কিন্তু এতেও একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, যে সব জিনিষ বিশেষ দরকারী— যেমন গরম কাপড়াদি, ঔষধপত্র, এ সব তো সঙ্গে রাখা বিশেষ দরকার। কখন কোথায় দরকার হবে, কিছুই ত নিশ্চয়তা নাই; তাই সেগুলি সদাই সঙ্গে রাখা উচিত। টাকা পয়সা ত সঙ্গে রাখা বিশেষ আবশ্যক। আমরাও সেই ভাবে প্রায় অর্দ্ধেক বোঝা স্বর্গলছমী চটীতেই চটীবালার কাঠের সিন্ধুকে তারই অধীনে রেখে এসেছি।

রামবাড়া চটীতে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই সারদা ভায়ার সঙ্গে দেখা হল, আমরা কাল না আসার জন্য ভায়া আমাদের যথেষ্ট বকুনিতে আপ্যায়িত করলে! ভায়া সত্য সত্যই আমাদের উপর বিশেষ স্নেহ রাখ্‌ত—এখনও রেখে থাকে। ভায়ার সঙ্গে আমাদের এমন একটি গাঢ় প্রণয় হয়ে গেছিল— যার ফলে আমাদের ছেড়ে থাকতে পারতো না, আমরা কোথাও গেলে আমাদের জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে চাতকের মত পথপানে চেয়ে থাকৃত। আজ মরুভূমির কোলে বসে এ স্থানটি লেখার সময় সেই অপূর্ব্ব স্নেহের কথা, ভ্রাতৃভাবের কথা, সেই উৎকণ্ঠার কথা, সেই একাত্ম-বোধের কথা ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করে সহানুভূতিতে হৃদয় প্লাবিত করে অশ্রু বয়ে যাচ্ছে। এরূপ কঠিনতম প্রদেশে যাত্রার কালে এরূপ বন্ধু যদি সাথী না হয়, তা হ'লে যাত্রাই যে বৃথা হয়ে যায়! শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা— যেন আবার একদিন আমরা ভায়ার সঙ্গে একত্রে সেই অতি কঠোর— কঠোরতম তীর্থ কৈলাসের পথে যেতে পারি। ....কাল আমরা না আসার জন্য ভায়া খুব মনঃকষ্ট পেয়েছিল। এরপর ভায়া আর কখনও আমাদের ছেড়ে আগে চলে যেত না, প্রায় সর্ব্বদাই সাথে থাক্‌তো—পাছে আমরা পেছনের চটীতে আড্ডা নেই। তবুও একবার আবার গোলমাল হয়েছিল— সে সময় মত বল্‌বো। ভায়ার ব্যবহারে আমরা বিশেষ মুগ্ধ হয়েছি।

আমরা সকলে একসঙ্গে রামবাড়া চটী হতে বের হয়ে ক্রমে চড়াই করতে লাগলাম; কাল রাত্রি বেলা অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় মাঝে মাঝে পথ সামান্যরূপ ভেঙ্গে গেলেও আমাদের কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। ক্রমশঃই আমরা উপরের দিকে উত্তর দিকে ক্রমোচ্চ পথে চলেছি। মাঝে একখানে সামান্য মাত্র বরফ পেয়েছিলাম। ধীরে ধীরে রামবাড়া চটী হতে সোয়া দুই মাইল চড়াই করে **দেবদর্শন** নামক স্থানে এসে পৌছ্‌লাম। এখানেই চড়াই শেষ হয়ে গেল।

দেবদর্শন
২। মাইল

আর আমাদের চড়াই করতে হবে না। এখান হতে কেদারনাথ ধাম মাত্র ১ মাইল। পথ প্রায়ই সমতল। সামান্য সামান্য চড়াই-উৎরাই আছে বটে! সে গ্রাহ্যের মধ্যে নয়। এখান হতে

শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দির-শিখরস্থ স্বর্ণকলস দৃষ্ট হয় বলে এস্থানের নাম "দেবদর্শন"। মন্দিরের চূড়া দর্শনে হৃদয়ে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল, আমরা সকলেই ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। সাধু, সন্ন্যাসী, যাত্রী বা পাণ্ডাগণ এই স্থানকে "**ভূ-কৈলাস**" নামে অভিহিত করে থাকেন। এর উপর আর গাছ-পালা, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ কিছুই নাই! রামবাড়া হতেই ধীরে ধীরে গাছ-পালা সব কম হয়ে আস্‌ছিল—এখন শুধু উন্মুক্ত প্রান্তর হলেও কিন্তু পর্ব্বতমালা কম নয়! সেই সব পর্ব্বতমালা, রৌপ্য-মুকুটসদৃশ বরফদ্বারা শিরাচ্ছাদন করে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে অনবরত রৌপ্য-সদৃশই আনন্দাশ্রুদ্বারা হৃদয় ধৌত করে শ্রীশ্রীকেদারনাথের স্তব-স্তুতি আরতিতে নিমগ্ন আছে বা ধ্যানাবস্থায় ভাবে বিহ্বল হয়ে সদাই আনন্দাশ্রু প্রবাহিত করছে। সে এক মনোরম দৃশ্য— ভাষায় অবর্ণনীয়! ভাবে গদ্‌গদ্ হয়ে উপলব্ধির বিষয়। হায়! কেমন করে সে মনোরম ভাব প্রকাশ করব? ....

আমরা সেই শোনপ্রয়াগ হতেই ক্রমশঃ চড়াই করে এসেছি। বাস্তবিক পক্ষে কেদারনাথের চড়াই সেই শোনপ্রয়াগ হতেই আরম্ভ হয়ে থাকে। শোনপ্রয়াগ হতে এ পথটুকু যেমনি চড়াই, তেমনি ভীষণ অরণ্যসমাকুল। এই ঘোর অরণ্যের ভিতর হিংস্রজন্তু বাস করলেও কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কারও অনিষ্ট করেছে শুনা যায় নি। ভীষণ অরণ্য ক্রমেই কম হতে হতে এই দেবদর্শনে এসে একদম শেষ হয়ে গেছে। এখান হতে— ঠিক এখান হতে নয়, সেই শোন প্রয়াগ হতে মন্দাকিনী গঙ্গার দুই পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড পর্ব্বতগুলি বৃহৎ প্রাচীরের মত ক্রমশঃ কেদাপুরীর উত্তরে যেয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। এখান হতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত সুন্দর উপত্যকা। উক্ত পর্ব্বতগুলির শৃঙ্গদেশ চির-তুষারে ভূষিত থেকে চির-তুষার বর্ণ শিবের ধ্যান করতে করতে যেন সকলেই শিবাকৃতি ধবল বর্ণ হয়ে গেছে! সেই সব ধবলাকৃতি শিখর হতে মাঝে মাঝে ঝর ঝর শব্দে ঝরণা প্রবাহিত হচ্ছে। সে ঝরণাগুলি আবার শিখর হতে নিম্নদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বরফ দ্বারা আবৃত থেকে, পরে জলাকারে পরিণত হয়ে ঝর ঝর শব্দে চিরপুণ্যশীলা মন্দাকিনী গঙ্গাতে যেয়ে আত্ম-সমর্পণ করছে। এস্থান হতে চারিদিকের মধুর দৃশ্যে প্রাণ কি যেন কি এক অজানা আনন্দের মোহে উতলা হয়ে উঠে! তখন মনে হয়, এ স্থান পৃথিবীর নয়— এ স্বর্গভূমি! আমরা যেন পাণ্ডবগণের মতই পৃথিবীর পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, মায়া-মমতা ভাল-মন্দ, শত্রু-মিত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে দেবতাদের আবাস-ভূমি স্বর্গভূমিতে এসে পৌছেছি। এ স্থান যেন ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, দেব-দেবী প্রভৃতি সূক্ষ্ম শ্রেণীর আত্মা দ্বারা প্রপূরিত!

অহো! কেমন করে এ স্থানের দৃশ্য প্রকাশ করবো? ভাষার কোন্ শক্তি এমন চিত্ত বিনোদন-কারী, এমন আনন্দময়ী প্রকৃতির লীলা প্রকাশ করত পারে? আমরা অবাক্ হয়ে এ স্থানের দৃশ্য দেখতে লাগ্‌লাম। প্রকৃতির এমন মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মোহিত হয়ে গেলাম এবং না জানি কেন কোন্ বৈষ্ণবী মায়ায় মোহিত হয়ে ভক্তিভরে শির আপনা আপনি. তাঁর শ্রীচরণে নুয়ে পড়লো! আমরা এ স্থানের দৃশ্য দেখে পথের সমুদয় ক্লেশ ভুলে যেয়ে শীঘ্রই উপাস্য দেবকে দর্শন করবার জন্য সকলেই আকুলপ্রাণে ছুটতে লাগলাম! আমাদের দলের মধ্যে আমি, বড়মা ও সারদা ভায়া,

এই তিন জনে মন্দাকিনী গঙ্গার উপরিস্থিত পুলটি পার হয়ে কেদারনাথ ধামে প্রবেশ করলাম। তখন বেলা ৯টা মাত্র।

পুলটির পাশেই একজন পাণ্ডা বসেছিলেন, তিনি বেশ ভাল বাংলা জানেন। আমাদের বাঙ্গালী দেখে বাংলা ভাষাতেই আপ্যায়িত করে নিয়ে হাওড়া পঞ্চানন তলা নিবাসী উমেশচন্দ্র দাস ও তাঁর পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী দাসীর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালায় জায়গা করে দিলেন। নামে ধর্ম্মশালা হলেও এবং উপরোক্ত ধর্ম্মাত্মাদ্বয় ধর্ম্মশালা হিসাবে ঘরটি তৈরী করে দিলেও কিন্তু এটী পাণ্ডারই সম্পত্তির মধ্যে গণ্য। পাণ্ডা নিজের যাত্রী ছাড়া কখন ভুলেও অন্য কোন লোককে শুতে থাকতে দেয় না। সুতরাং ওটী পাণ্ডার খাস বাটী বল্লেও চলে। এ ছাড়া আরও ১২।১৩টী বাঙ্গালীদের ধর্ম্মশালা আছে— যা ঐরূপ ভাবে পাণ্ডাকে দান করা হয়েছে। এ ছাড়া বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালা, পাঞ্জাবী ছত্রের ধর্ম্মশালা, ভবানীপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের পুত্র সিদ্ধেশ্বর সেনের ধর্ম্মশালা, কলিকাতার চাষা-ধোপাপাড়ার মুক্তকেশী দেবীর ধর্ম্মশালা, ইন্দোর - পাতিয়ালা— গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের মহারাজগণের ধর্ম্মশালা প্রভৃতিতে প্রায় ৪০।৫০টী ধর্ম্মশালা (বড় বড়) আছে। বদরীনাথে কিন্তু এত ধর্ম্মশালা নাই। বদরীনাথের পাণ্ডাগণও কেদারনাথের পাণ্ডাগণের চেয়ে অনেক গরীব। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে, প্রায় সব লোকই কেদারনাথে এসে পাণ্ডাদের কবলে পড়ে যা কিছু থাকে, প্রায় সব খোয়ায়ে বদরী নারায়ণ যায়, ওদিকে এখানকার পাণ্ডাদের অসৎ ব্যবহারে তাদের মনটি এমনই হয়ে থাকে যে, তারা বদরীনারায়ণ যেয়ে কিছুই দান করতে চায় না— হাত গুটিয়ে বসে। উপায় কি? ………

কেদারনাথ
১ মাইল

আমরা যে স্থানে জায়গা নিয়েছিলাম, তার পাশেই ডাকঘর। সুতরাং সর্ব্ব প্রথমে ডাকঘরে অনুসন্ধান করে প্রায় প্রত্যেকেরই নামে রাশি রাশি চিঠি পেলাম। চিদানন্দজী মহারাজ দুটী মণিঅর্ডার পেলেন। আমারও মণিঅর্ডার আসার কথা ছিল— কিন্তু দুর্ভাগ্য! এদিকেও আমি কপর্দ্দক শূন্য। অনেক দিন হল বৃন্দাবনবাসিনী মাতাজীর নিকট হতে ১০৲ দশটি টাকা হাওলাত করে এ কয়দিন অতি কষ্টে চালিয়েছি। এখন যে কেমন করে চালাব, বিশেষ চিন্তা হ'ল বটে! সঙ্গে এত লোক এবং তাদের নিকট যথেষ্ট টাকা থাকলেও কিন্তু তারা কর্জ্জ বা হাওলাত দিতে নারাজ। অথচ তারা নিজেরই ঘনিষ্টের মধ্যে হয়েও কিন্তু আমাকে হাওলাত না দিয়ে অন্য লোককে বেশ দিচ্ছে! সে অনেক ব্যাপার!!…………টাকা ছাড়া এ পথে পা বাড়াতে নাই। যাঁরা এ পথে যাবেন, তাঁরা বেশ বেছে বেছে সাথী করলেও কিন্তু তাদের উপর ভরসা না রেখে নিজের সম্বল ভালরূপ নিজের গাঁটে বেঁধে এ পথে পা দিবেন; নতুবা পদে পদে কষ্ট ভোগ করতে হবে। তবে যাদের প্রাণের মায়া নাই, যারা শুকিয়ে মরতে পারে, তারাই যেন বিনাসম্বলে এ পথের যাত্রী হয়।

বড় মা বাড়ীর চিঠি পেয়ে দুঃখে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তা' লিখবার নয়। তাঁর প্রথম পুত্র শ্রীমান্ রণজিৎ সিংহ এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল— পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াই একমাত্র দুঃখের কারণ। সে নাকি তার মাকে বলেছিল— "যদি আমি এবার গত বৎসরের মতই ফেল হই, তা হলে আজকালকার ছেলেরা

প্রায়ই যা করে থাকে, তাই করবো............ অথবা জীবনের মত সংসার ত্যাগ করে যাব, জীবনে আর আমার মুখ দেখতে পাবে না.........” ইত্যাদি। পত্রে আরও সংবাদ ছিল, “রণজিৎ ফেল হয়ে দুই-তিন দিন যাবৎ অনাহারে আছে, তার অবস্থা পাগলের মত।” এরূপ দুর্গম তীর্থ-স্থানে যে কেমন করে মানুষ এমন দুঃসংবাদ দিয়ে তীর্থযাত্রীকে দুঃখে অভিভূত করে দেয়, তা আর কখন শুনি নি। সেখান হইতে যদি আর কোথাও না যেয়ে বরাবর ঘরের দিকে রওনা হওয়া যায়, তা হ'লেও ত প্রথমে ১৪৪ মাইল পাহাড় পার হয়ে রেল ষ্টেশনে পৌছে, আবার ৯২২ মাইল পথ রেলে পার হয়ে কলিকাতা পৌছতে হবে। সে ত আর সোজা ব্যাপার নয়। বোধ হয় এটি তাঁরা ভেবে দেখবার সময় পান নি। যাক্ ......

মায়ের প্রাণ সদাই স্নেহে, বাৎসল্যে পরিপূর্ণ থাকে। ছেলে আত্মহত্যা করবে বা সাধু হয়ে বের হয়ে যাবে, এ দুঃসংবাদ পেয়ে কয়জন মা আছেন সংসারে জানি না, যাঁরা চিত্ত স্থির রাখতে পারেন। সুতরাং এ দুঃসংবাদে বড় মা যে ছেলের জন্য কেমন দুঃখে হতজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন— সে অবস্থা দেখলে পাষাণের প্রাণেও বোধ হয় ব্যথা লাগতো। কিন্তু আমরা এমনই অভাগা যে, লোকের দুঃখে সহানুভূতিটুকু প্রকাশ করতেও শিখি নাই। ...... সে অনেক ঘটনা ; থাক্ সে সব খবরে।

............প্রায় দুই ঘণ্টা অনবরত নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়ে অনেকটা সুস্থ করে তাঁকে মন্দাকিনীর জলে স্নান করাতে নিয়ে গেলাম। সে জলে স্নান করে কার সাধ্যি! বাপরে— কী ভীষণ ঠাণ্ডা !! সে যে খাঁটী বরফ গলা সদ্য ঠাণ্ডা জল !!! —গঙ্গোত্তরীর জলের বিষয় পূর্ব্বে যে ভাবে পাঠকদের জানিয়েছি ঠিক তেমনি।

মন্দাকিনীর বাঁধান ঘাট হতে কোনরূপে কাপড়াদি কেচে মাত্র ১ঘটী জল মাথায় দিয়ে কোন-রূপে কাক স্নান করে মন্দির বন্ধ হবার ভয়ে তাড়া-তাড়ি মন্দিরে যেয়ে উপস্থিত হলাম। স্নান ঘাটের পার্শ্বেই অন্নপূর্ণা দেবীর এবং অগ্নিকোণে ভৈরবজীর মন্দির অবস্থিত। ভৈরবজীর মন্দিরের ঈশানকোণে কেদারনাথজীর মোহন্ত রাবল সাহেবের বাসস্থান। পাণ্ডাকে পূজার উপকরণাদি পূর্ব্বেই জোগাড় করতে বলেছিলাম। পাণ্ডাজী সমুদয় উপকরণ জোগাড় করে রেখেছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করার সময় দুইপার্শ্বস্থিত সারি সারি ঘরের মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত রাস্তায় মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হলাম।

তিনদিকে দুরস্থ পর্ব্বতের কেল্লার ভিতর মন্দাকিনী গঙ্গার পূর্ব্বপাড়ে উপত্যকা ভূমিতে একটি সমতল ভূমির উপর শ্রীশ্রীকেদারনাথজীর মন্দির। মন্দিরটী উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মধুর।

মন্দিরাভ্যন্তরে

মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়াতে স্বর্ণ কলস ঝলমল করছে। কেদারনাথ ধাম—হরিদ্বার হতে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে সিধা পথে ১৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত। উত্তর দিকের পর্ব্বতমালায় নাম **স্বর্গারোহণ পর্ব্বত** বা **মহাপন্থা পর্ব্বত,** উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২২৮৫০ ফুট উচ্চশৃঙ্গ বিশিষ্ট তথা মন্দিরটী সমুদ্রবক্ষ হতে ১১৭৫৩ ফুট উচ্চে অবস্থিত। মন্দিরটী তিনটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দ্বাপরযুগের পাণ্ডবগণপ্রতিষ্ঠিত সুবিশাল কারুকার্যখচিত মন্দিরটী অদ্যাপিও বিদ্যমান থেকে পাণ্ডবদের ধর্ম্মপ্রাণতার প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বা সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখে শুনা যায়, মন্দিরটী শঙ্করা-চার্য্যের প্রতিষ্ঠিত, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের কোন সুযোগ দেখি নাই বা চেষ্টাও করি নাই, সঙ্কল্পও

নাই। মন্দিরের ভিতর প্রবেশের মুখে বিশাল পাথরে খোদিত নন্দীভৃঙ্গীগণ দ্বার রক্ষা করছে। শাস্ত্রেও পাওয়া যায়, যথা :—

নন্দিভৃঙ্গ্যাদয়ঃ সর্ব্বে দ্বারদেশে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ন জানন্তি মম স্থলম্।

হে দেবি ! এই কেদারনাথের দ্বারে নন্দীভৃঙ্গী-আদিগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে ; এটী আমার রহস্যস্থল, যাকে ব্রহ্মাদি-দেবগণও জানেন না।

উক্ত স্থানটি পেরিয়ে গিয়ে খোলা ফটকযুক্ত একটী বড় প্রকোষ্ঠ,—যার চারিদিকে দশ অবতারের মূর্ত্তি, পাণ্ডবগণ, নন্দীগণ, প্রমথগণ, দ্রৌপদী, কুন্তী-দেবী প্রভৃতি দেবদেবীগণ বিরাজ করছেন। সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি বৃষ বিদ্যমান এবং একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী-দেবী তথা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী বিরাজিত আছেন। তৎপর একটী খুব মোটা কাঠের দরজা পার হয়ে শ্রীশ্রীকেদারনাথের বিশাল পিণ্ডমূর্ত্তি ! এরই দর্শনাশে আমরা এতদিন এত অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছি। মন্দিরের ভিতর খুব অন্ধকার, একটি ঘৃতের প্রদীপ টিপ্‌টিপ্ করে জ্বলছে— তাতে অন্ধকার আরও জমাট বেঁধে গেছে। সামনের বৃহৎ দরজা হতে যৎসামান্য আলো এসে মাঝে মাঝে মন্দিরটী সামান্য আলোকিত করেই আবার অন্ধকারে পরিণত করছে ! ঘরের ভিতর কোনও জানালাদি নাই। উপর হতে টপ্‌টপ্ করে সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা জল ঝরে পড়ছে। আমরা বাংলায় যেরূপ শিবের লিঙ্গ-মূর্ত্তি বিরাজিত দেখি, ঐ মূর্ত্তির সঙ্গে তার কোনই সামঞ্জস্য নাই। বুড়াকেদারের মূর্ত্তিও অনেকটা এইরূপ বটে ! মূর্ত্তিটি একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের চাঙ্গের সদৃশ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট গৌরী পিঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। তলদেশ বেশ প্রশস্ত হলেও কিন্তু উপরি ভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। আমরা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করার পর পাণ্ডা মহারাজ আমাদের হাতে জমাট ভৈষা ঘি খানিকটা দিয়ে সেই বিশাল মূর্ত্তিতে মাখ্‌তে বল্লেন। শাস্ত্রেও তাই বিধি। যথা :—

কেদারেশ্বরলিঙ্গস্য ঘৃতাভ্যক্তম্ দৃগ্‌ভবম্।
অঙ্গমঙ্গেনসংস্থাপিস্পৃশন্‌প্রেম্নাসকৃৎপুমান্॥

হে দেবি ! কেদারেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গের উত্তর দিক হতে ঘী মেখে পরে নিজের অঙ্গদ্বারা প্রেম পূর্ব্বক স্পর্শ করবে অর্থাৎ আলিঙ্গন করবে।

আমরা তদনুসারে ঘী মাখিয়ে নানা প্রকার মেওয়া ও ছোলার ডালদ্বারা তাঁহার পূজা করতঃ আলিঙ্গন কর্‌লাম। পাণ্ডাগণ বলেন, এই বিশাল মূর্ত্তিতে ঘৃত মাখিয়ে আলিঙ্গন করলে মহাপাপ সকল হতে তথা মহাব্যাধি হতে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। কিংবদন্তীও এরূপ বটে !

মন্দিরের ভিতর সকলেই প্রবেশ করে জ্যোতির্ম্ময় কেদারনাথকে স্পর্শ করতে পারেন। পাণ্ডাগণ বল্লেন, এই কৃষ্ণবর্ণ পাথরের চাঙ্গরই সদা শিবের পশ্চাৎ ভাগ। আমি এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতরূপে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সহ জানাব। পঞ্চ-কেদারের দর্শন, স্পর্শন, পূজন মহা সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু তা' প্রায় অনেকের ভাগ্যেই ঘটে উঠে না। না হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু শাস্ত্রে লেখা আছে যে, মানব উক্ত পঞ্চ কেদার নিত্য স্মরণ মাত্রেই সম্পূর্ণ পাপ হতে মুক্তিলাভ করেন। যথা :—

কেদারং মধ্যম তুঙ্গং রুদ্রং কল্পেশ্বরং তথা।
কেদার পঞ্চকং নিত্যং স্মরেৎ পাপপ্রণাশনম্॥

আবার উক্ত পঞ্চ কেদারে যাঁরা ভক্তিপূর্ব্বক যেতে পারেন, তাঁদের সমান পুণ্যাত্মা নাই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যথা :—

পঞ্চ তীর্থানি যো দেবি গচ্ছতে ভক্তিসংযুতঃ।
নচৈতৎ সদৃশো দেবি পুণ্যাত্মা নাত্রসংশয়ঃ॥

উক্ত পঞ্চ কেদারের মধ্যে কেদারনাথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু পঞ্চ কেদারের মধ্যে তুঙ্গ নাথে তাঁহার বাহু, জটা পুজিত হয়ে থাকে। এখানে ত পৃষ্ঠদেশই রুদ্রনাথে মুখ, মধ্যমেশ্বরে নাভি এবং কল্পেশ্বরে পুজিত হচ্ছে। এ পৃষ্ঠদেশের গল্প পরে বল্‌বো।

—ক্রমশ

প্রতীক্ষায়

কোন সে অতীত যুগে কোন্ সে সুদূরে ওগো
ঘন—বন—পল্লব-চ্ছায়ায়,
কালো কালিন্দীর তটে রচি রস-রাস-কুঞ্জ
হে মায়াবি ! আপন মায়ায়,
মল্লিকা-সৌরভে ভরা শারদ পূর্ণিমা রাতে
ফুকারিয়া চিত-চোরা বাঁশী,
অবোধ আভীরা বৃন্দে পাগল করিয়া ওগো
ঘর—ছাড়া করিলে উদাসী।
কত লীলা প্রকটিলে সার্থক করিয়া সেই
শরতের পূর্ণিমা যামিনী,
গোপী-চিত্ত-স্রোতসহ যমুনাও সেই দিন
বয়েছিল উজান আপনি।
আজো আসে সেই নিশি পূর্ণ নিশাকর সহ
সৌরভিতা মল্লিকা-সৌরভে,
আজো বহে কলকলে কালিন্দীর কালো জল
পূর্ব্বস্মৃতি বহিয়া গৌরবে।
আছে শুধু স্মৃতিটুকু বেদনা-জড়িত চিতে
নাই প্রাণ নাই আর হাসি,
ভাসাইতে কুল-মান সুরের লহর তুলি
বাজেনাতো চিত-চোরা বাঁশী।
আছে সবি হে নিঠুর ! শূন্য রঙ্গমঞ্চ সম
লয়ে বুকে স্মৃতি বেদনার,
আছি তাই প্রতীক্ষায় কবে তব আগমনে
শূন্য পূর্ণ হইবে আবার।

——×——

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

আশা—আকাঙ্ক্ষা—আসক্তি—এরাই তো তোমাকে নীচের দিকে নামাতে চায়! ঝেড়ে ফেলে দাও ওদের মন থেকে। স্বমহিমায় জাগ্রত থেকে শুধু নিরপেক্ষভাবে বিশ্ব-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে যাও—এতেই তোমার হৃদয় ব্রহ্মানন্দে পরিপূরিত হয়ে উঠ্‌বে।

*

কতকাল ধরে কত কিছুই তো করলে, কিন্তু ক্ষুধা কি মিট্‌লো কোনদিন? আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি কি হলো তোমার? বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার মত এ যে দিন দিন বেড়েই চললো! কিন্তু কথাটা তো খুবই সত্যি যে, এ তো তোমার সামান্য ক্ষুধা নয়—এ যে তোমার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধাই বটে! সামান্য বস্তুতে তো এ ক্ষুধা মিট্‌বার নয়, এ ক্ষুধা মিটাবার জন্যে যে তোমাকে বিশ্বকেই গ্রাস করতে হবে—নিজে অসীম হয়ে সমগ্র বিশ্বকে বুকে পুরে না নিলে তো কিছুতেই এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার অবসান হবে না!

*

সঙ্কীর্ণতার বদ্ধজল যে কলুষ-বিষে ভরা গো! তুমি হয়ে যাও, অবিরাম গতি নদীর মত—মহাসমুদ্রের বিরাটত্বই তোমার লক্ষ্য হোক্। বরং পার তো —বদ্ধজলের কলুষরাশি ধুয়ে নিয়ে ঐ নদীরই মত তাদের মহাসমুদ্রের বিশালতায় বিসর্জ্জন দাও। তারাও ধন্য হোক্— তুমিও ধন্য হও।

*

মৃত্যু কোথায়? সে তো তোমার ঐ দেখারই দোষ। মৃত্যু তো নাই এ জগতে—এ যে শুধু আমার বিশ্বময়ী প্রকৃতি-জননীর নব নব মূর্ত্তি পরিগ্রহ! অনাদি অনন্তকাল হতে তাঁর মধুর ছন্দে প্রাণ মাতোয়ারা খেলা! আর খেলা—সে তো আনন্দেরই মেলা!

*

জড়ত্বের পঙ্কিল আবর্ত্তে ডুবে যেও না। বীর তুমি—বীরের মতই জড়ত্বের মোহ কাটিয়ে ওঠ। সচ্চৈতন্যময় আত্মা তুমি—তোমার তো জড়ের দাসত্ব শোভা পায় না ভাই! সকলের ঊর্দ্ধে নিজেকে টেনে তুলে স্ব-স্বরূপে অবস্থানই যে তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

মন যতই অপবিত্রতার ভারে জর্জ্জরিত হয়ে স্থূল হতে স্থূলতর হতে থাক্‌বে, ততই তার গতি মাধ্যাকর্ষণের অনিবার্য্য নিয়মানুযায়ী স্বভাবতঃই নীচের দিকে হবে। আবার যতই এই মন ক্রম-বিশুদ্ধিতার সাধনায় দিন দিন বাষ্পের মত হাল্‌কা হয়ে পড়বে, ততই সে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে স্বতঃই ঊর্দ্ধদিকে গতিশীল হবে। পবিত্র মনের গতি স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধদিকে—জ্যোতির্ম্ময় লোকে। তাই যে উপায়েই পার মনের এই বিশুদ্ধিতা অর্জ্জন কর—যেন এর গতি স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধদিকে হয়।

*

ফুলের মত পরকে আনন্দ দেওয়াই তোমার স্বভাব হোক্! ভালবাসাই স্বভাব কর। কে তোমায় ভাল বাস্‌ছে, কে তোমায় ঘৃণা করছে, সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করো না। মান-অপমান, নিন্দা-প্রশংসা, কলঙ্ক-খ্যাতি—সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত

হয়ে তুমি শুধু সকলকেই ভালবেসে যাও, দীন-দুঃখী-দরিদ্র-পাপী-তাপী সকলকেই বুকে তুলে নাও, তাদেরই সুখের জন্যে তুমি অম্লানচিত্তে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দাও। এই তোমার আদর্শ—এই তোমার আনন্দের পথ!

*

পরের ভালবাসা আদর-সোহাগ চেয়ে তুমি কেন মিছামিছি নিজকে খাটো করছ ভাই? এতে সুখ-সোয়াস্তি পেয়েছ কোন দিন? কতজনের সঙ্গেই তো আত্মীয়তা করলে, কিন্তু কেউ কি কখনও তোমার মনের মত হলো? তবে কেন ভাই তাদের খেয়াল খুসীর উপর তোমার নিজের সুখকে সীমাবদ্ধ রেখে অনর্থক দুঃখ পাও? কেন তুমি অনর্থক তাদের খেয়াল খুসীর অধীন হতে যাও? তুমি যে স্বাধীন! তোমার আর ভয় কি? স্বাধীনতার বিশাল ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিন্দুমাত্রও প্রতিদানের আশা না রেখে শুধু অহরহ ভালই বেসে যাও, কারও আদর-সোহাগের এতটুকুও আশা না রেখে কেবল ভালবাসাই তোমার স্বভাব কর—এই ভালবাসাই তোমায় সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে নিরপেক্ষ আনন্দের অসীমতায় ডুবিয়ে দেবে।

*

কিসে তোমায় বাঁধতে পারে ভাই? আর কিছুই নয়—শুধু তোমারই মনের মিথ্যা কল্পনা। কল্পনার ডুরিতেই না তুমি এ জগতের সঙ্গে বাঁধা—একে ছেড়ে কোথাও যেতে পাচ্ছ না! কিন্তু এ তো তোমার সত্য কল্পনা নয় ভাই, এ যে নিছক তোমার ভুলের কল্পনা! যা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা ভগবান্, তাকে যে তুমি তোমারই কল্পিত নাম-রূপে খণ্ডিত করে মিথ্যাজ্ঞানে প্রলোভিত হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ছ! দূর করে দাও এ কল্পিত মিথ্যাজ্ঞান, সমস্ত জগৎকে আজ মহান্ ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন কর। ভুলে যাও তোমার এ ক্ষুদ্র আমিত্ব—ব্যক্তিত্ব, ভাব তুমি চির মহান্। তা হলেই দেখবে ভাই, তুমি চির মুক্ত! তখন দেখবে—জগৎ নাই, আছে শুধু সেই—যার সাথে তোমার সকল জ্বালা দূরে-দেওয়া অনাদি মধুর অভেদ মিলন!

*

দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, জ্বালা-যন্ত্রণা ঘাত-প্রতিঘাত—এরা তো আসবেই, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য—ধৈর্য্য ও আনন্দ দিয়ে তাদের পরাজয় করা। তোমার প্রাণের অফুরন্ত আনন্দের পরশ পেয়ে তারাও তাদের স্বভাব ভুলে গিয়ে আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তখন কেবলই আনন্দম্—আনন্দম্—আনন্দম্!

*

সাধনায় আনন্দ পাচ্ছ না? কিন্তু সে তো তোমারই জন্ম-জন্মান্তরে কলুষ-কালিমাভরা অশুদ্ধ চিত্তের দরুণ ভাই! ঐ চিত্তই তো তোমার ও আনন্দের মাঝে বেড়া হয়ে তোমার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এখন তোমার কর্ত্তব্য—যে কোন উপায়েই হোক ঐ বেড়া-জালকে ছিন্ন করে ফেলা। তবেই সেই আনন্দ-জ্যোতিঃ মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃই হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে উঠবে—জীবন আনন্দের পরশ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে।

*

এতদিন "আমার" কর্ম্ম করে করে নিজে বদ্ধ পড়েছ, আজ থেকে তার ঠিক উল্টো পথ ধরেই "তাঁর" কর্ম্ম করতে করতে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে যাও।

সাহায্য প্রাপ্তি

(শ্রীশ্রীগুরুধামে জন্মোৎসব উপলক্ষে)

[আশ্বিন সংখ্যায় স্বীকৃতং অংশের পর]

কুমিল্লা ও ত্রিপুরা—

এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তা :—রাধানাথ দে, প্রসন্নকুমার সাহা, অশ্বিনীকুমার আদিত্য।

মুর্শিদাবাদ—

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বানার্জ্জি ১৲ টাকা।

শ্রীহট্ট—

শ্রীযুক্তা :—ব্রজবাসী কুরী (আজমিরীগঞ্জ ভক্তবৃন্দ) ৫৲, গগনচন্দ্র দেব ২৲, বিহারী চক্রবর্ত্তী ২৲, বসন্তকুমার দে ৷৷৹, ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৷৷৹ আনা। একটাকা করিয়া—অনুকূলচন্দ্র দত্ত, দ্বারিকানাথ দাস, বিজনবাসিনী রায়, মহেন্দ্র শর্ম্মা, ঈশানচন্দ্র দেব, হরিশ্চন্দ্র দেব, মহেন্দ্রকুমার দেব, তরণীকান্ত দত্ত।

কুচবিহার—

দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তা :—আদিত্যচন্দ্র কার্য্যী, রামচন্দ্র রায়। একটাকা করিয়া—কমলাকান্ত দলই, বিমলা দেবী। আট আনা করিয়া—চন্দ্রমোহন বর্ম্মা, গদাধর বর্ম্মা।

সন্দ্বীপ—

শ্রীযুক্তা বিজনবাসিনী গুহ (মহিলাসঙ্ঘ) ৩৲।

সাঁওতাল পরগণা—

শ্রীকরুণাসিন্ধু প্রামাণিক ১৲ টাকা।

পাটনা—শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু ২৲ টাকা।

মানভূম ও সিংহভূম—

শ্রীযুক্তা :—সচ্চিদানন্দ ভোগ ৫৲, সন্তোষকুমার দে ৷৷৹ আনা। একটাকা করিয়া—শ্যামসুন্দর দে, যতীন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, রামরঞ্জন গুহ, সতীনাথ মুখার্জ্জি।

কটক ও বালেশ্বর—

শ্রীযুক্তা :—পীতবাস মিশ্র ২৲, কৃষ্ণগোপাল মুখার্জ্জী ২৲, বৃন্দাবনচন্দ্র দে ১৲ টাকা।

হরিদ্বার—

শ্রীমৎ বিপুলচৈতন্য ব্রহ্মচারী ১৲ টাকা।

চব্বিশ পরগণা—

শ্রীযুক্তা :—ইন্দ্রনারায়ণ সাধু খাঁ ৫৲, প্রিয়নাথ হালদার ৩৲। দুই টাকা করিয়া—ভুবনেশ্বর বানার্জ্জী, শরৎচন্দ্র বানার্জ্জী, নারায়ণদাস নন্দী। একটাকা করিয়া—শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল চক্রবর্ত্তী।

হাওড়া—

শ্রীযুক্তা :—ফণিভূষণ মিত্র ৪৲, যোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জী ১৲ টাকা। দুইটাকা করিয়া—অবনীমোহন টাট, ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী, প্রমথনাথ মেঠা (নিগমানন্দ শান্তি-সঙ্ঘ), হেমচন্দ্র ঘোষ, অমল মুখার্জ্জী, গিরীন্দ্রনাথ দাস।

বেনারস—শ্রীগগনচন্দ্র গুপ্ত ২৲ দুই টাকা।

দ্বারভাঙ্গা—শ্রীগিরীন্দ্র মুখার্জ্জী ২৲ টাকা।

মেদিনীপুর—

বড়গোদা সারস্বতসঙ্ঘ ৫৲। আনন্দনগর সারস্বত-সঙ্ঘ ২৲ টাকা। দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তা :—পুষ্পরাণী দেবী, শরৎ মুখার্জ্জী, সুহাসিনী দেবী, সারদাপ্রসাদ পট্টনায়ক, মন্মথ বসু, ভীমাচরণ বসু, ভূপতিচরণ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, নারায়ণপ্রসাদ, মৃত্যুঞ্জয় জানা, শম্ভুনাথ দালাল। একটাকা করিয়া—বিন্দুভূষণ মাইতী, প্রফুল্লকুমার চাটার্জ্জী, মহীন্দ্রনাথ মাইতি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইতী, অতুলচন্দ্র রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র, মৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ মাইতী, কাদম্বিনী দাসী।

সংবাদ ও মন্তব্য

ভক্ত-সম্মিলনী

আগামী ১০ই, ১১ই ও ১২ই পৌষ, ইং ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর এই দিবসত্রয় যে হালিসহর দক্ষিণ-বাজার সারস্বত আশ্রমে সারস্বত মঠানুষ্ঠিত ভক্ত-সম্মিলনীর সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে, তাহা বিগত দুই মাস ধরিয়া "আর্য্য-দর্পণে" বিজ্ঞাপিত হইয়া আসিতেছে। আশ্রমের অবস্থিতি স্থান, পথের বিবরণ, আনুমানিক পাথেয় সংবাদ এবং সম্মিলনীতে যোগদানেচ্ছু ভক্তবৃন্দের অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় গত কার্ত্তিকের পত্রিকাতে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাই এই সম্পর্কে পুনরায় কার্ত্তিকের সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত "ভক্ত-সম্মিলনী"র প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রকৃত সহমরণ

সতী সাবিত্রীর দেশে যে এখনও প্রকৃত সতীত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ মাঝে মাঝে আমরা সহমরণের সংবাদ পাইয়া থাকি। এ সহমরণ আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশীবর্গের নিপীড়নে অনিচ্ছাকৃত দেহপাত নয়, সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষার ভয়ে গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ নয়, ইহা প্রকৃতই গাঢ় দাম্পত্য-প্রেমের সার্থকতাপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন।

সম্প্রতি নোয়াখালী—শ্রীপুর হইতে এই প্রকারের একটী সহমরণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ২০শে কার্ত্তিক শুক্রবার উক্ত গ্রাম নিবাসী জগবন্ধু দে নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী শোকে এতই অধীরা হইয়া পড়েন যে মৃত পতির দেহ দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে থাকেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে তিনি পতির পার্শ্বেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। তাঁহার এ মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না, সতীর আত্মা তৎক্ষণ পতির অনুগমন করিয়াছে। অতঃপর গ্রামবাসী সকলে হরি-ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া পতি-পত্নী উভয়ের দেহ একই চিতায় ভস্মীভূত করেন।

এই যে পতির মরণে সতীর প্রাণে এত ব্যাকুলতা, যে ব্যাকুলতায় তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া পতির অনুগমন করে, ইহার নিদান হইতেছে আবাল্য সঞ্চিত গাঢ় দাম্পত্য প্রেম। যে সকল দেশে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, যে সকল দেশে চুক্তি করিয়া পরিণয় হয়, যে সব দেশে দাম্পত্য-প্রেম বলিয়া কোন একটা জিনিষ নাই, তাহা যেন আকাশ-কুসুম! পাশ্চাত্য জাতি তাঁহাদের এই চিরন্তন প্রথার বিষময় ফলে জর্জ্জরিত হইয়া ভারতীয় আদর্শ গ্রহণের জন্য আজ এত ব্যাকুল! কিন্তু দুর্ভাগ্য, তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত ভারত-সন্তান পাশ্চাত্য আদর্শের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া আজ তাঁহাদের পরিত্যক্ত বিষে দেশের প্রাণকে জর্জ্জরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। ধ্বংসের অবস্থা আসিলে বুঝি এই প্রকারই হয়! সনাতনশাস্ত্রানুমত-বিবাহফলজাত গাঢ় দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ আদর্শ সতীর আত্ম বিসর্জ্জনের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আমাদের সমাজসংস্কারকগণের চোখ ফুটিবে না কি?

অখিল ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসঙ্ঘ

কলিকাতায় পঞ্চম অধিবেশন

অখিল ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসঙ্ঘ প্রায় তিন বৎসর হইল সংস্থাপিত হইয়াছে। ভারবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সনাতন ধর্ম্মানুরাগী স্বদেশভক্ত মনীষীবৃন্দ ও সারদামঠ, কুম্ভকোণম্, শঙ্কেশ্বরমঠের, রামানুজ-সম্প্রদায়ের ও নাথদ্বার প্রভৃতির সম্মানিত আচার্য্যগণের সহযোগিতায় এবং পণ্ডিতকুলচূড়ামণি কর্ম্মবীর স্বর্গীয় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রযত্নে এই বিরাট বর্ণাশ্রমী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে।

এই সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয় পুণ্যতীর্থ ৺কাশীধামে সংস্থাপিত, এবং ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই ইহার প্রাদেশিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিল্লী, লাহোর, প্রয়াগ ও জলগাঁও নগরে এই সঙ্ঘের কয়েকটী মহাসম্মেলনও হইয়া গিয়াছে।

এই "বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসঙ্ঘের" মূল উদ্দেশ্য—শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি প্রতিপাদিত চিরন্তন সদাচারসম্মত সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন এবং সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ্যলাভ ও তদনুকূল ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করণ।

বিগত বৎসরে জলগাঁও মহাসম্মেলনে বঙ্গীয় স্বরাজ্যসঙ্ঘের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক আগামী মহাসম্মেলন কলিকাতা মহানগরীতে আহূত হইয়াছে। এই মহাসম্মেলনটী যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং অভ্যাগত, আচার্য্য ও ভদ্রমহোদয়গণের যাহাতে উপযুক্ত অভ্যর্থনা হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা মহা-সম্মেলনের একটী "স্বাগত-কারিণী সভা" গঠিত হইয়াছে। "বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘের" সভাপতি বঙ্গদেশের প্রবীণ আচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয় এই সভার সভাপতি এবং বঙ্গীয় গভর্ণ-মেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী কুমার শ্রীযুত শিবশেখরেশ্বর রায় মহাশয় ইহার সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের সনাতন ধর্ম্মানুরাগী বহু মনীষী ও পদস্থ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এই সভায় যোগদান করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান কার্য্যালয় পি ১৩৪ নং সদানন্দ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে।

বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন হলে উক্ত মহাসম্মেলনের স্বাগত সমিতির একটী বিশেষ অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে। প্রথমে স্বাগত সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। আগামী মহা-সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অধিকাংশ প্রাদেশিক সঙ্ঘই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ নেতা বোম্বাইয়ের গোস্বামী শ্রীগোকুলনাথজী মহারাজের নাম প্রস্তাব করায় স্বাগত সমিতি তাঁহাকেই সভাপতিপদের জন্য নির্ব্বাচন করেন।

মহাসম্মেলন কোন্ স্থানে হইবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া অধিকাংশের মতে চিত্তরঞ্জন এভেনিউর উপরস্থ গিরিশ-পার্কে ঐ মহাসম্মেলনের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ, স্বাগত সমিতির স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে ধর্ম্মবীর দল নামে অভিহিত করা হইবে।



২৪শ বর্ষ পৌষ—১৩৩৮ ২য় খণ্ড
সমষ্টি সং ২৬০ ৩য় সংখ্যা

শ্রদ্ধা

—:(০):—

গুরুবেদান্তবাক্যেষু বুদ্ধির্যা নিশ্চয়াত্মিকা।
সত্যমিত্যেব সা শ্রদ্ধা নিদানং মুক্তিসিদ্ধয়ে॥

গুরুবাক্য এবং বেদান্তবাক্য সমূহ সত্য— এই যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তাহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই মুক্তিলাভের উপায়।

যথার্থবাদিতা পুংসাং শ্রদ্ধাজননকারণম্।
বেদস্যেশ্বরবাক্যত্বাৎ যথার্থত্বে ন সংশয়ঃ॥

সত্যবাক্যই মানুষের প্রাণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে। বেদ ঈশ্বরবাক্য, সেইজন্য বেদের যথার্থত্ব বিষয়ে কোন সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না।

বেদান্তবাক্য না হয় ঈশ্বরবাক্য, তাহাতে কোন সংশয় না থাকিল কিন্তু গুরুবাক্যে সংশয় না হওয়ার কারণ কি ?

মুক্তস্যেশ্বররূপত্বাৎ গুরোর্বাগপিতাদৃশী ।
তস্মাৎ তদ্বাক্যয়োঃ শ্রদ্ধা সতাং সিধ্যতি ধীমতাম্ ॥

মুক্তব্যক্তি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, এইজন্যই জীবন্মুক্ত গুরুর বাক্যও বেদ-বাক্যের ন্যায়ই যথার্থ হইয়া থাকে। সেই কারণে গুরু এবং বেদান্ত বাক্যের উপর বুদ্ধিমান সাধুগণের সমান শ্রদ্ধা হইয়া থাকে।

নানক গুরুর প্রতি খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, গুরুর মুখ হইতে যাহা বাহির হইবে তাহাই বেদবাক্য। জ্ঞানলাভের উপায় বলিতে গিয়া এইজন্যই গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের উপর সমানভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিতও গুরুবেদান্তবাক্যে সমভাবে বিশ্বাসের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

অধিকারী অনেক রকমেরই রহিয়াছে। উত্তম অধিকারীর শ্রবণ-মাত্রেই জ্ঞান হইয়া যায়। কাজেই গুরু যখন শিষ্যকে মহাবাক্য প্রদান করিয়া থাকেন, তখন যদি শিষ্যের গুরুবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা না হয়, তাহা হইলে সেই মহাবাক্যে কোন ফল হয় না। গুরু অনেককেই মহাবাক্য প্রদান করেন, কিন্তু সেই মহাবাক্যে কয়জনের ভিতর ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় ? গুরুর বাক্যে সম্যক্ বিশ্বাসের অভাবেই জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে এত বিলম্ব হয়। শ্রদ্ধা জিনিষ বড়ই দুর্ল্লভ। শ্রদ্ধা জন্মিতেও অনেক সময় লাগে, আর একবার শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেলে আর কোন চিন্তাই থাকে না।

তস্মাচ্ছ্রদ্ধা সুসম্পাদ্যা গুরুবেদান্তবাক্যয়োঃ ।
মুমুক্ষোঃ শ্রদ্ধধানস্য ফলং সিধ্যতি নান্যথা ॥

সেইজন্যই গুরুবেদান্তবাক্যে যাহাতে অচলা শ্রদ্ধা জন্মে তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য। মুমুক্ষু ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেই তাহার মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা মোক্ষলাভ হইতে পারে না।

কেবল মুমুক্ষু হইলেই চলিবে না, শ্রদ্ধাসম্পন্নও হওয়া চাই। মুক্তির পিপাসা লইয়া বেদ-বেদান্তাদি আলোচনা করিলেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না।

বেদ-বেদান্তাদি আলোচনা করিলে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কেবল আলোচনা দ্বারাই জন্মিতে পারে না। নিজে নিজে সব করিতে পারিলেও মনের সংশয়টা যেন ঠিক ঠিক নিরসন হয় না। এই জায়গায় একজন গুরুর প্রয়োজন— অর্থাৎ এমন একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন, যিনি অবিকম্পিত চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিজের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির কথা উপস্থাপিত করিয়া অপরের প্রাণেও শক্তি-সঞ্চার করিতে পারেন। অপরকে নিশ্চিন্ত নির্ভয় করিতে পারেন যিনি— তিনিই প্রকৃত গুরু। এইজন্যই কেবল বেদান্তাদি আলোচনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। বেদান্তবাক্য যে সত্য ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন— এমন গুরুরও প্রয়োজন। আত্মশক্তিদ্বারাও অনেকে নির্ভুল পথে চলিতে পারে বটে, কিন্তু অপর একজনও যদি আসিয়া বলে যে তুমি যে পথে চলিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল, তাহা হইলে বিশ্বাসটা আরও বাড়িয়া যায় না কি? গুরুর কাজ আর কিছুই নয়— এই বিশ্বাসের দিকে জোর দেওয়া। মানুষ মায়া-মোহে পড়িয়া স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। গুরু আসিয়া তাই শিষ্যকে নিজের প্রাণের বল সঞ্চার করিয়া স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করেন।

কাজেই ইহাতে আত্ম-সম্মানের বিন্দুমাত্র লাঘব হয় না। আজ কাল গুরু-শিষ্য সম্বন্ধকে অনেকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আসলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের মাঝে প্রভুত্বের কোন কিছু নাই, তাহাতে যে শিষ্যের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে এমনও নয়। পরস্পরের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিদ্বারা পরস্পরেরই উন্নতি হইয়া থাকে। উপযুক্ত গুরুদ্বারা যেম শিষ্য উপকৃত হয়, তেমনি উপযুক্ত শিষ্যদ্বারাও গুরু উপকৃত হন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ প্রভুত্ব-দাসত্বের সম্বন্ধ নয়। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের কোন বিশেষত্বই থাকিত না।

আজ কাল বিশ্লেষণ বুদ্ধির ফলে শ্রদ্ধা জিনিষটী অন্তর্ধান হইতে বসিয়াছে। বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস— তা কোন মতে স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইলে রীতিমত এর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার হওয়া প্রয়োজন। গুরুবাক্য যে বেদবাক্য ইহার প্রমাণ কি? ভিতরে প্রথম হইতেই এইরূপ অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস লইয়া যাহারা বিচার

করিতে বসে, তাঁহাঁদের আর জীবনে বিচারের শেষ হয় না— শেষে এইরূপ অশ্রদ্ধা সম্পন্ন কোন কোন নাস্তিকের মুখ দিয়াও অন্তিম সময়ে শ্রীগুরু বা হা ভগবান্ এইরূপ বাক্য শুনা যায়। অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাতে ভিতরে কোন দিন শান্তি আসিতে পারে না। তারপর—

দেবে চ বেদে চ গুরৌ চ মন্ত্রে
তীর্থে মহাত্মন্যপি ভেষজে চ।
শ্রদ্ধা ভবত্যস্য যথা যথাঽন্তঃ
তথা তথা সিদ্ধিরুদেতি পুংসাম্ ॥

ইষ্টদেবতা, বেদ, গুরু, মন্ত্র, তীর্থ, মহাপুরুষ, এবং ঔষধ এই সকলের উপরে লোকের যেরূপ বিশ্বাস হইবে, তেমনি ফলও উৎপন্ন হইবে।

কাজেই এ সব বিষয়ে নিজের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুযায়ীই ফল লাভ হইয়া থাকে। কোন বিচার না করিয়া সংশয় না করিয়া ইষ্টের প্রতি বা বেদ, গুরু, মন্ত্র, তীর্থ, মহাপুরুষ, ঔষধের প্রতি বিশ্বাস করিয়া চলিতে পারিলে অনর্থ বা অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই, বরঞ্চ তাহাতে ইষ্টই হইয়া থাকে। আমার ভিতর যদি যথার্থ শ্রদ্ধার উন্মেষ হয়, তাহা হইলে গুরুর ভিতর যদি প্রকৃত কিছু না-ই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমার শ্রদ্ধার প্রভাবেই গুরুর মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠিবে। শঙ্করাচার্য্য শ্রদ্ধার অর্থ করিয়াছেন —আস্তিক্য বুদ্ধি। কাজেই যাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব, তাঁহার ভিতর নিশ্চয় যে কিছু মহত্ত্ব রহিয়াছে ইহাতে তো আর কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না। গুরু বলিয়া যে কেহ রহিয়াছেন, ইহা তো কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কাজেই আদি গুরু বা সদ্‌গুরুর প্রতি অচল অটল বিশ্বাসেই লৌকিক গুরুর ভিতরও গুরুভাবের মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠিবে, ইহা কি অসম্ভব-কল্পনা মাত্র ?

অচল অটল নিষ্ঠা দ্বারা যে সব দুর্ল্লভ জিনিষ মুনি ঋষিরা আয়ত্ত করিয়া গিয়াছেন, আমরা তীক্ষ্ণধী বিচার-বিশ্লেষণকারী হইয়াও সে সব জিনিষ আয়ত্ত করা দূরে থাকুক, এমন কি ঋষিবাক্য ধারণা করিবার শক্তিটুকুও রাখি না। শ্রদ্ধাকে বিতাড়িত করিয়া তাহার স্থলে বিচার-বিশ্লেষণবুদ্ধি বাড়ানোর ফলে আধ্যাত্মিক জগতে আমরা বিশেষ উন্নত হইয়াছি এ কথা

বলিতে পারি না। কেবল মাত্র শ্রদ্ধা বা ভক্তি দ্বারা কোন কোন সাধক আধ্যাত্মিক জগতের যে সব দুর্লভ রহস্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র তাঁহাদের বিচারবিশ্লেষণহীন সংস্কার মাত্র, এই কথা বলিয়া আমরা কিছুতেই উড়াইয়া দিতে পারি না। সেই সব একনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন নিরক্ষর সাধু মহান্তদের কাছ হইতে আমাদের অনেক বিষয় শিক্ষণীয় রহিয়াছে।

শালগ্রাম শিলায় ভগবান্ রহিয়াছেন —এইরূপ একনিষ্ঠ শ্রদ্ধার ভাবে, শালগ্রামে ভগবান থাকুন আর না-ই থাকুন —ভক্তের হৃদয়ে যে ভগবানের অধিষ্ঠান হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইজন্যই বিচারাবিচার পরে, আগে শ্রদ্ধা ও আস্তিক্য বুদ্ধি জন্মানো চাই।

শ্রদ্ধা বিহীনস্যতু ন প্রবৃত্তিঃ
প্রবৃত্তিশূন্যস্য ন সাধ্যসিদ্ধিঃ ॥

যাহার ভিতরে শ্রদ্ধার উন্মেষ হয় নাই, তাহার ভিতর প্রবৃত্তিই বা জাগিবে কেমন করিয়া ? আর প্রবৃত্তিই যদি না জন্মে তাহা হইলে সাধ্য সিদ্ধি হইবে কেমন করিয়া ?

ভগবান্ আছেন এইরূপ আস্তিক্য বুদ্ধি জন্মিলে তবেই না ভগবৎপ্রাপ্তির দরুণ আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তি জাগিবে। কিন্তু যাহার ভিতর শ্রদ্ধা জাগে নাই, তাহার ভিতর ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও তো জাগিতে পারে না।

নিজের শ্রদ্ধা বিশ্বাসানুযায়ীই যখন ফল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তখন অশ্রদ্ধা করিয়া ফল লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়া কি প্রয়োজন ? আর বিশেষতঃ আত্মশুদ্ধি বা আত্মোন্নতিই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা বাড়াইয়া তো কোন লাভ নাই।

শ্রদ্ধা মানুষের সহজে আসিতে চায় না। আর একবার শ্রদ্ধা আসিয়া গেলে, তখন জগতের কোন কিছু আসিয়াই সাধককে লক্ষচ্যুত করিতে পারে না। আমি যাঁহাকে শ্রদ্ধা করি. তিনি আছেন,— এই উগ্রদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেলে জগতের সবাই যদি আমার সেই সত্য উপলব্ধির বিরোধীও হয়, তাহাতেই বা কি ? শ্রদ্ধা একবার জাগিয়াছিল ঋষি নচিকেতার প্রাণে, তাই

তিনি মৃত্যুকেও অবহেলা করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রদ্ধা মানুষের প্রাণের অটল কেন্দ্র স্বরূপ। কাজেই শ্রদ্ধা একবার জন্মিয়া গেলে মানুষের আর পথ ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভেচ্ছুর পক্ষে —গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই হইল প্রধান উপায়। গীতাকারও শ্রদ্ধার বিশেষত্বের কথা বলিয়াছেন। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" জ্ঞান লাভের প্রথম অধিকারীই হইল—শ্রদ্ধাবান। আমরা মুমুক্ষু, সুতরাং গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। গুরুতে বিশ্বাস না জন্মিলে — নিঃসংশয়িতরূপে জ্ঞান অর্জ্জন করা যায় না। সব আয়োজন-আড়ম্বর আমি করিতে পারি, কিন্তু গুরু আসিয়া যেই বলিলেন 'সত্যমিত্যেব' — তখন আমার আর কোন সন্দেহ থাকিল না। আমার আয়োজন উদ্যোগের এইখানেই হইল সার্থকতা।

ভক্ত ও ভগবান্

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে রাগ আর অনুরাগের লক্ষণ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। রাগের লক্ষণ, যথা :---

বহু যে দুঃখেতে সুখ করিয়া মানয়।
যাবৎ না টলে মন রাগ সেই হয়॥

দুঃখকেও সুখ বলে গ্রহণ করা কম কঠিন কথা নয়। ভগবানের উপর কতখানি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হ'লে যে এই দুর্লভ গুণ ভিতরে জন্মে, তা আর বল্‌বার নয়। দুঃখকে সুখ বলে অবিক্ষুব্ধ চিত্তে বহন করে চল্‌তে হলে মনের বল এবং শ্রদ্ধা অসীম থাকা চাই। ভগবানের প্রতি যাঁদের সত্যিকার রাগ-অনুরাগ হয়েছে, তাঁরা কঠোর দুঃখ কষ্টকেও সানন্দে বরণ করে নেন। তাঁদের কাছে সবই সেই প্রিয়তমের দান। ভগবানের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি মাত্রেই সদা সন্তুষ্টমানস। সুখকে জগতের সবাই গ্রহণ করতে উৎসুক, কিন্তু দুঃখকে সুখ বলে বরণ করে নেবার লোক জগতে ক'টা মিলে? কাজেই প্রকৃত অনুরাগী ভক্তও একান্ত বিরল।

সাধারণ লোক দুঃখে পড়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে, ভগবান্‌কে গাল দেয়, কিন্তু অনুরাগী ভক্তের লক্ষণ আলাদা। তাঁরা দুঃখের ভিতরই পরমানন্দের উৎসকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

সেইজন্যই ভক্তের কাছে দুঃখও পরমানন্দে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দুঃখ-কষ্টের ভিতরেও যাঁদের মন প্রফুল্ল থাকে, ভগবানের প্রতি অটল শ্রদ্ধা থাকে, তাঁরাই প্রকৃত ভক্ত। যদিও দুঃখ তাঁদের পরীক্ষা করতেই আসে, কিন্তু সে দুঃখকে তাঁরা প্রিয়তমের দান বলেই গ্রহণ করেন। এই জন্যই দুঃখ এসে তাঁদের পরাস্ত করে দিতে পারে না, বরঞ্চ দুঃখকেই তাঁদের কাছে পরাস্ত মানতে হয়।

দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে কয়জনের চিত্ত স্থির থাকে? দুঃখে যারা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, তাদের মনও সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে পড়ে। সুতরাং দুঃখের ভিতর পরম কল্যাণ সঙ্গোপিত— এই অনুভূতি যাদের না হয়েছে, তারা সেই দুঃখের দহনে স্থির থাকবে কেমন করে? ইষ্ট চিন্তায় যাঁরা বিভোর, তাঁদের কাছে তো দুঃখের জ্বালাই একান্ত হয়ে উঠতে পারে না। তাঁদের তন্ময়তার কাছে সকল বিরুদ্ধ শক্তিই পরাজিত। দুঃখ পেলে ইষ্ট চিন্তা আরও বেড়ে যায়— এইজন্যই দুঃখকে তাঁরা পরম বন্ধু বলে মনে করেন।

মনের স্বভাবই হল চঞ্চলতা। কিন্তু রাগের লক্ষণে পেয়েছি--- "ঈষৎ না টলে মন রাগ সেই হয়।" কাজেই ইষ্টের প্রতি যাঁদের যথার্থ রাগ জন্মেছে, তাঁদের চিত্ত স্থির হয়ে গিয়েছে; কোন কারণে তাঁদের মন বিচলিত হয় না। দুঃখের ভিতরও যাঁদের মন ঈষৎ বিচলিত হয় না, তাঁদের মন আর নিম্নভূমিতে বিচরণ করে না। মনের চঞ্চলতার রাজ্যও সীমাবদ্ধ--- এর উর্দ্ধে উঠে যেতে পারলে মনের ওপর তখন আত্মার জ্যোতি পড়ে, বাইরের আকর্ষণ মোটেই থাকে না, সুতরাং চঞ্চল মনেরও তখন পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। অভ্যাস এবং একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা মানুষ এই নিম্নাভিমুখী মনকেও ফিরিয়ে নিতে পারে। মন যখন ইষ্টের ভাবনায় লীন হয়ে যায়, তখন জাগতিক সুখ-দুঃখে ভক্তের ভিতর বিন্দু মাত্র ক্ষোভ জন্মাতে পারে না।

লক্ষ্য স্থির হয়ে গেলে মনের চঞ্চলতা আপনি কমে আসে। অন্তরে বাহিরে যাঁদের ইষ্টস্ফূর্ত্তি হয়, তাঁদের তো তখন আর চঞ্চলতার কোন হেতুই থাকে না। যাকে দেখলে মন স্থির হয়ে যায়, তাঁকে যদি সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করতে পারি, তাহলে আর মন চঞ্চল হবে কেমন করে? আমাদের চিত্ত চঞ্চল বলে কোন জিনিষেরই পরিণাম প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কিন্তু যাঁদের চিত্ত স্থির, তাঁরা পরিণামদর্শী। দুঃখকে আমরা দুঃখ রূপেই দেখি; কিন্তু সেই দুঃখের মাঝেও যে পরম কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে, সেই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের নাই। সেই জন্যই অপরিণামদর্শী মন উপস্থিত কারণেই এত চঞ্চল হয়ে উঠে।

মনকে যারা ইচ্ছামত যখন তখন ইষ্টে লীন করে দিতে পারেন, তাঁদের তো বাইরের শত্রুর কোন ভয় নাই। মন যেখানে থাকলে বাদ-বিসম্বাদের সম্ভাবনা, সেখানে যদি সেই মনই না থাকে, তাহলে ঝগড়া, উত্তর-প্রত্যুত্তর করবে কে? অনুরাগী ভক্তের বিশেষ শক্তিই হল এই যে, তাঁরা মনকে ইচ্ছামত উর্দ্ধভূমিতে তুলে নেবার সঙ্কেত জেনে নিয়েছেন। এইজন্যই ভক্ত ভগবানের সৃষ্টির কোন দোষ দেখেন না। সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা সব যেমন আছে তেমনি থাকুক কিন্তু আমি যদি ইষ্টচিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতে পারি তাহলেই হল। ভক্ত এইজন্যই নীরব কর্ম্মী, তাঁর ভিতর অহরহঃ অজপাজপ চলছে। আর সবাই জগতের উপর, সৃষ্টি কর্ত্তার উপর দোষারোপ করে থাকে, কিন্তু ভক্তের মাঝে কোন বিরুদ্ধ অভিমতের স্থান নাই। ভক্ত দেখেন, নিজে যদি ভাল হওয়া যায় তাহলে সকলই ভাল। জগতকে আমরাই কলুষিত করি বেশী কাজেই

আমাদের নিজেদের আত্ম-সংশোধনেই জগতেরও রূপান্তর হতে পারে।

রাগী ভক্তের লক্ষণ যা দিয়েছেন, তার মাঝে বিন্দু মাত্র সংশয়ের স্থান নাই। ভক্ত অসীম দুঃখের বোঝা নিয়েও চির-প্রফুল্ল! কতখানি আত্মশক্তি থাক্‌লে পর এত জঞ্জাল থাকা সত্ত্বেও নিজের লক্ষ্যের প্রতি—ইষ্টের প্রতি অবিচলিতচিত্ত থাকা যায়, তা অনুধাবন করে দেখ্‌বার বিষয়। এই তো গেল রাগের কথা, তারপর বল্‌ছেন অনুরাগের কথা। যথা—

প্রিয়-মুখকমল যে যখন দেখয়।
নূতন নূতন বুদ্ধি প্রতিক্ষণে হয়॥
দেখিয়াও দেখি নাই মনে উপজয়।
তৃপ্তি নাহি হয় অনুরাগের বিষয়॥

ইষ্টের প্রতি অনুরাগী ভক্তের নব নব বুদ্ধি প্রতিভার স্ফুরণ হয়। কাজেই ভক্তির পথে চল্‌লে ভক্তের যে জড়ত্ব কিম্বা আবেশেই আচ্ছন্ন করে রাখে তা নয়। খাঁটী ভক্তের বুদ্ধি-প্রতিভার দীপ্তি চিরোজ্জ্বল থাকে। অনেক ভক্তিবাদী এ জায়গায় মস্ত বড় ভুল করে থাকেন। তাঁরা ঠিক জড়ত্বকেই ভক্তির স্থানে বসিয়ে দেন। এইজন্যই তাঁদের বুদ্ধি-প্রতিভার তেমন বিকাশ দেখা যায় না। ইষ্টে মন সমর্পণ করলে বুদ্ধি-প্রতিভার দৈবী বিকাশ হয়। তখন ভক্তের মন-বুদ্ধির গতি উল্টোমুখী হয়ে যায়। মন-বুদ্ধির বিকাশ না হলে, জড়ত্বের প্রশ্রয়ে দিন দিন অবনতিই হয়। কিন্তু খাঁটী অনুরাগী ভক্তের তো ক্রমোন্নতিই হয়ে থাকে।

তারপর অনুরাগী ভক্তের আর একটী প্রধান লক্ষণই হল এই যে, তাঁদের মাঝে তুষ্টির স্থান নাই। এইজন্যই ইষ্ট দর্শনেও তাঁদের আবেগ কিছু মাত্র প্রশমিত হয় না। দেখেও যেন তাঁরা দেখ্‌তে পান না—এই চঞ্চল আবেগে নিয়তই তাঁরা উদ্বেলিত হতে থাকেন। আর এই অতৃপ্তির ভাব থাকে বলেই ইষ্টের অনন্ত রূপ তাঁদের কাছে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। শ্রীরাধার ঠিক এই ভাব হ'ত। শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পেয়েও তাঁর বিরহের অবসান হ'ত না। বাইরে পেলে ভিতরে পাওয়া যায় না, আবার ভিতরে যখন পাওয়া যায় তখন বাইরে পাওয়া যায় না। যুগপৎ অন্তরে বাইরে সমান অনুভূতি স্থায়ী থাকে না বলেই বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্বেই ভক্তের প্রাণকে একদিকে চির সঞ্জীবিত করে রেখেছে। ভক্তের মাঝে যখন খাঁটী অনুরাগের উন্মেষ হয়, তখন আর তাঁর আবেগের অবধি থাকে না। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার জ্বালাই হয় তাঁর বেশী, তাই এত পেয়েও ভক্তের দৈন্য ঘুচে না। ভগবান যে অনাদি অনন্ত, তার নিদর্শন ভক্তের অফুরন্ত ব্যাকুলতা। এত দিয়েও যিনি ভক্তের হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারেন না, তাঁর নিজেরও মাহাত্ম্যের অন্ত নাই, আর ভক্ত-প্রাণের অসীম ব্যাকুলতারও অবধি নাই।

প্রেম আস্বাদন করা নিদারুণ জ্বালা। এইজন্যই চরিতামৃতকার এক জায়গায় লিখেছেন—"সেই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।" একদিকে অতৃপ্তির জ্বালা, আর একদিকে অনিবার্য্য আকর্ষণ। কাজেই গভীর আনন্দ এবং গভীর দুঃখ উভয়ই রয়েছে।

আবেগ ক্ষণস্থায়ী, তাই এক এক সময় এক এক রূপ প্রত্যক্ষ হয়—এতে আরও জ্বালা বেড়ে যায়। মনে হয়, যিনি দেখা দিয়ে গেলেন তিনি তো আমায় ফাঁকি দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন; কাজেই তাঁকে আবার পাই কি করে? একদিকে অভাবের আতিশয্য, আর একদিকে প্রাপ্তির গভীর বেদনা, উভয়ই ভক্ত-প্রাণকে উদ্বেলিত করে তুলে।

অনুরাগীর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ভক্তমাল গ্রন্থ-প্রণেতা আর এক জায়গায় বলেছেন—

সখির সহিত, কহয়ে সুন্দরী,
কিশোরী অনুরাগিণী।
কি করিব সখি, কহ না উপায়,
কেমন করে পরাণী ॥
এক তিল প্রিয় — বদন মাধুরী
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হেরিয়াও মোর, না পূরয়ে আশা,
বাসনা নয়ানে ভরি ॥
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, নূতন যে হেরি,
যেন কভু দেখি নাই।
কি দিয়া বান্ধিল, পরাণ আমার
ভাবিয়া কিছু না পাই ॥
যে দিকে নিরখি, শ্যামল সুন্দর—
মোহন মাধুরী দেখি।
শ্যাম বহি আর, কিছু দেখি নাহি,
এ কি জ্বালা হৈল সখি ॥

এই ঠিক খাঁটী অনুরাগীর লক্ষণ! ইষ্টকে দেখেও যে দেখ্‌লাম বলে মনে হয় না, এর কারণ মন তখন প্রত্যক্ষ রূপকে অতিক্রম করে ভাব-রূপে আবিষ্ট হয়ে যায়। সম্মুখে পেয়েও যে মনে হয়, কই তাঁকে তো পেলেম না, তার মানে যা পেলাম তাকে উপেক্ষা নয়—অর্থাৎ মন তখন ভাব রাজ্যে বিস্তার লাভ করে, কাজেই ক্ষণেকের দরুণ যে বিশিষ্ট রূপ দর্শন, তাতে ভক্তের মনে তৃপ্তি আসে না। আবার নিছক ভাবরূপে পেয়েও স্থূলদেহ-সংস্কারবিশিষ্ট মানবের তৃপ্তি হয় না। কাজেই তখন ভাবকে স্থূলে মূর্ত্ত করে প্রত্যক্ষ কর্‌তে চায় ভক্ত! কিন্তু রূপ দেখে আবার ভক্তের প্রাণে নিদারুণ জ্বালা উপস্থিত হয়। কেননা ভাবরূপে যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তাঁকে তো বিশিষ্ট রূপের মাঝেই সম্যক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারা যায় না। কাজেই ভক্তের আর আকুলতার পরিসীমা নাই। দেখা-নাদেখার সমান মূল্য। বরঞ্চ না দেখা তাও যেন ভাল, কিন্তু দেখে আর ভক্তের আকুলতার—দৈন্তের অবধি থাকে না।

চৈতন্য চরিতামৃতাকারও এক জায়গায় বলছেন—

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে করে অনেক যতন ॥
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেবা করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥
অতৃপ্ত হঞা করে সবে বিধাতা নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥
কোটী নেত্র না দিলেক সবে দিল ছুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥

অনুরাগী ভক্তের তৃষ্ণার নিবারণ নাই! অহরহঃ তাঁর ভিতর নব নব ভাবের স্ফুরণ হতে থাকে। ভক্ত অভিমান করে ভগবান্‌কে দোষ দিয়ে থাকে, কেননা যিনি সর্ব্বব্যাপ্ত তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌বার উপায়স্বরূপ মাত্র ছুটী নেত্র আমাদের তিনি দিয়েছেন! চোখ দিয়ে দেখে তো রূপের অন্ত পাওয়া যায় না, এইজন্যই ভক্ত চোখকেও এক বিঘ্ন বলে মনে করে। তখনই বিধিকে দোষ না দিয়ে ভক্ত আর থাক্‌তে পারে না! কোটি নেত্রের জায়গায় ভগবান্ মাত্র আমাদের ছুটী নেত্র দিয়েছেন, ইহা তো বাস্তবিকই ভক্তের প্রতি ভগবানের নিষ্ঠুরতা!

ভক্তের মন চঞ্চল হয় কি সাধে? চৈতন্য-চরিতামৃতকার ঠিকই বলেছেন। কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল রয়েছে। তাতে ভক্তের প্রাণে অসীম বল সঞ্চার হয়। ভিতরে যদি এই বলের সঞ্চার না হ'ত, তাহলে এই অহরহ বিরহ ব্যথায় কখন ভক্ত মুস্‌ড়িয়ে পড়ে যেত। কিন্তু এই অসহনীয় বিরহ ব্যথা নিয়েও তো ভক্তের প্রাণে বিন্দুমাত্র অবসাদ বা ক্লান্তি দেখা যায় না। ভক্তের প্রাণে বল সঞ্চারিত না হ'লে, এত আবেগের উত্তাপ সহ্য কর্‌তে পার্‌ত ভক্ত কেমন করে? ভগবানের অনন্ত শক্তি—আর ভক্তের অফুরন্ত ব্যাকুলতা, কারও অবধি

পাওয়া দুষ্কর! শ্রীকৃষ্ণ নিজের অদ্ভুত শক্তি দেখে নিজেই বিস্ময়ান্বিত। আর নিজের এই অপ্রাকৃত মাধুর্য্য এবং তার অনুভবহেতু শ্রীরাধিকার যে সুখাতিশয়, তা উপলব্ধি করবার দরুণই তো শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভাব সমন্বিত হয়ে শচী দেবীর গর্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু বড়ই দ্বন্দ্ব—বড়ই সমস্যা! একদিক আস্বাদন করতে গেলে আর এক দিক বাদ পড়ে যায়। যুগপৎ বিষয় এবং আশ্রয়-জাতীয় সুখ উপলব্ধি করা কঠিন। কাজেই ব্যাকুলতা শুধু ভক্তের নয়—ভগবানেরও। ভগবান্‌কে ভাল-বেসে ভক্ত কি সুখ পায়, এর আস্বাদনের দরুণ ভগবান্ আবার স্বেচ্ছায় ভক্ত সাজেন। শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ করে বলছেন—

সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটী গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

যাঁতে প্রেম থাকে তিনিই প্রেমের আশ্রয়, আর যাঁর প্রতি প্রেম প্রযুক্ত হয় তিনিই প্রেমের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ হলেন রাধিকা-প্রেমের বিষয়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কেবল মাত্র বিষয়জাতীয় সুখেরই আস্বাদন হয়ে থাকে। কিন্তু আশ্রয়জাতীয় সুখ যে এর চেয়েও কোটী গুণে অধিক! এ জায়গায় কিন্তু ভগবানের চেয়েও ভক্ত বড়। স্বয়ং পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই কথা বলেছেন। এইজন্যই ভগবানের মাঝেও আবার আকুলতা আছে। ভক্ত যেমন ভগবানকে পেতে ব্যাকুল, তেমনি ভগবানও ভক্তকে দেখা দিতে ব্যাকুল। মায়ের প্রতি যথার্থ ভালবাসা ছিল বলেই, সাধকপ্রবর রাম প্রসাদ বলেছিলেন—"বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি মোর পাছে ধাবা।" বাস্তবিকই যথার্থ প্রেম, যথার্থ ভালবাসার উৎস যাঁদের মাঝে রয়েছে, তাঁরা পরম ভাগ্যবান্। তাঁদের দেখা দেবার দরুণ ভগবান ব্যাকুল। তাঁরাই যে যথার্থ প্রেম বা ভালবাসার আশ্রয়। কাজেই ভগবান ভালবাসার বা প্রেমের আকর্ষণে না এসে স্থির থাকতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করবার দরুণই ব্যাকুল—

এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্‌ধকী॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্ব মাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য্য, রাধা প্রেম, দুহে জোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে দোহে বাড়ে কার নাহি হারি॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে যদি দেখি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

উপরোক্ত এই কয়টী ছত্র অমূল্য সম্পদ্। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর মাঝে সার কয়টী কথা বলেছেন। তিনি দ্রষ্টা হয়েও নিজের মাধুর্য্য এবং রাধার প্রেমের অনন্ত মহিমায় বিস্ময়াভিভূত। নিজের মাধুর্য্য সম্বন্ধে যেমন তিনি সচেতন, তেমনি শ্রীরাধার প্রেম সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "শ্রীরাধার প্রেম নির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ, কিন্তু সেই দর্পণের স্বচ্ছতা অনুক্ষণ বেড়েই চলছে। আমার মাধুর্য্য বাড়বার অবকাশই পায় না। কেননা রাধার প্রেমরূপ দর্পণে তা আগেই প্রতিফলিত হয়ে

যায়।" ভক্তের হৃদয় যত স্বচ্ছ পবিত্র হয়, ভগবানের মহিমাও তাতে তত প্রকট হয়ে উঠে। খাঁটী ভক্ত আর খাঁটী ভগবান্ কেউ কারও চেয়ে কম নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—"আমার মাধুর্য্য এবং রাধার প্রেমে জিগীষা রয়েছে। ক্ষণে ক্ষণেই উভয়ই বেড়ে চলেছে, কারও হার জিত নেই। আমার মাধুর্য্য যতই নব নব হোক্ না কেন, শ্রীরাধিকার স্বচ্ছ প্রেম-রূপ দর্পণে তার আস্বাদনও নিত্যই নূতন। আমার মাধুর্য্য আমাতে যখন থাকে তখন তার এত মহিমা থাকে না, কিন্তু শ্রীরাধিকার হৃদয়দর্পণে যখন তা প্রতিফলিত হয়, তখন তার মহিমা আরও বেড়ে যায়।" এইজন্যই শেষে দ্রষ্টাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরও মন বিচলিত হয়ে উঠে। নিজেরই মহিমা যখন স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তখন তার গৌরব অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

> দর্পণাস্তে যদি দেখি আপন মাধুরী।
> আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥

এই খানেই অনির্ব্বচনীয় মায়ার খেলা আরম্ভ হয়। নিজেরই মাধুর্য্য দেখে নিজেই চঞ্চল। এইজন্যই হিয়া ধক্‌ধকি শুধু শ্রীরাধিকার নয়—শ্রীকৃষ্ণেরও হিয়া ধক্‌ধকির অন্ত নাই। নিজের মাধুর্য্যের চেয়ে শ্রীরাধিকার হৃদয়ের স্বচ্ছতা দেখে শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়াভি-ভূত হয়ে পড়েন। তখনই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠেন। যতই তিনি ব্যাকুল হন, ততই রাধিকার স্বরূপ প্রাপ্তির দিকে তাঁর মন প্রধাবিত হতে থাকে। রাধিকার স্বরূপ প্রাপ্তি হলে তখন আশ্রয়জাতীয় সুখই প্রবল হয়ে ওঠে, সুতরাং তখন আর স্বীয় মাধুর্য্যের কথা মনে থাকে না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাঝে এই দুইটী ভাবেরই সমন্বয় দেখ্‌তে পাই। একবার তিনি ভক্ত আবার তিনি ভগবান্। এই দ্বন্দ্ব নিয়েই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবন পূর্ণ!

ভগবান্ যেমন ভক্তের পবিত্র হৃদয়ের মহত্বে বিস্ময়াবিষ্ট, তেমনি ভক্তও ভগবানের অনন্ত মাধুর্য্য হেরে অবাক্ বিস্ময়াবিষ্ট! এইজন্যই শ্রীরাধিকার মাঝে দৈন্য দেখা যায়। কেননা শ্রীরাধিকার নিজের তো কিছু নাই, তাতে মাত্র ভগবানের মাধুর্য্য প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই যে প্রতিফলন, এ তো কম কথা নয়। মাধুর্য্য বাড়্‌বার অবকাশই যেখানে থাকে না, তার আগেই যেখানে হৃদয় দর্পণে নব নব রূপ ভাস্‌তে থাকে, সে হৃদয়-দর্পণ কত স্বচ্ছ—কত পবিত্র! যদিও শ্রীরাধার হৃদয়-দর্পণ স্বচ্ছ কিন্তু তাঁর স্বচ্ছতা ক্রমশঃই বেড়ে চলে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে প্রতিভাত হতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ যদিও শ্রীরাধিকার হৃদয়-দর্পণে নিজেরই মাধুর্য্য অবলোকন করেন, তথাপি তাঁর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কেননা দর্পণের স্বচ্ছতায় মাধুর্য্যও যেন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। তখন আর নিজের মাধুর্য্য বলে জ্ঞান থাকে না—ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ের মহিমায় ভগবানও বিস্মিত হয়ে যান। ভক্ত এবং ভগবানের মাঝে যখন এই অনির্ব্বচনীয় মায়ার খেলা আরম্ভ হয়, তখন ভক্ত-ভগবান উভয়েই বিস্ময়াবিষ্ট, ব্যাকুল হয়ে উঠেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বর এইজন্যই বলেছেন —

> "ভক্তের অধীন আমি চিরকাল —
> ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ।"

মাহেন্দ্রক্ষণে

জগতে দুইটী দিক রহিয়াছে, একটী প্রকাশের দিক, অভিব্যক্তির দিক; অপরটী অব্যক্তের দিক, প্রকৃতির গোপন রহস্যের দিক্। উভয় দিকেই সত্য নিহিত। জগতের প্রকাশ যতটুকু, অপ্রকাশও তাহার চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ বেশী। দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের প্রকৃতির মাঝেও এই দুই দিক্‌কার লীলা অনুভব করি। এক সময় ইচ্ছা হয় খুব লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কাজ করি, আবার আর এক সময় ইচ্ছা হয় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি। প্রকাশে-অপ্রকাশে, কাজে-অকাজে মিলিয়া তবেই মানব-জীবন পূর্ণ। কাজেই কোন দিকই উপেক্ষার বিষয় নয়।

প্রেরণা উভয় মুখী। কোন সময় প্রকাশের প্রেরণাই আসে বেশী, আবার কোন সময় ধ্যান-স্তব্ধতায় তলাইয়া যাইতেই ইচ্ছা হয়। সৃষ্টি এবং প্রলয়ের লীলা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এক এক সময় এক এক দিকের উদ্দীপনা জাগে।

কর্ম্মের ক্লান্তি দূর করিতে হইলে মাঝে মাঝে নিজের মাঝে ডুবিয়া আনন্দের উৎসে অবগাহন করিয়া আসিতে হয়। তাহা হইলে কর্ম্মশক্তি সমান অক্ষুণ্ণ থাকে। কাজেই কাজ করার যেমন উন্মাদনা থাকা আবশ্যক, তেমনি কাজ না করারও বাতিক থাকা প্রয়োজন।

*　　*

শ্বাস প্রশ্বাসের গতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্ম কেন্দ্রে মনকে নিয়োজিত করিতে হইবে। তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাস আপনি সংযত হইয়া আসিবে। নাক না টিপিয়াও শ্বাস নিরোধ করা যায়। তাহার উপায় শ্বাসের দিকে মোটে লক্ষ্য না করিয়া আত্মার দিকে বা ইষ্টের দিকে মনকে তন্ময় করিয়া দেওয়া। সে দিন ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথমে শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে ততটা লক্ষ্য না করিয়া নিজের মাঝে ডুবিয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। আশ্চর্য্য, মন যেই আত্ম কেন্দ্রে সম্পূর্ণ সংলগ্ন হইয়া গেল, অমনি দেখি শ্বাস প্রশ্বাস আপনি নিরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সম্পূর্ণ তন্ময় অবস্থা হইতে মনটা যখন বিষয়-জগতের দিকে নামিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন একবার নাকের অগ্রভাগের কাছে আঙ্গুল রাখিয়া দেখিলাম শ্বাস প্রশ্বাসের গতি মোটেই নাই। হঠাৎ এইরূপ চিত্ত স্থির করিবার সঙ্কেত পাইয়া বুঝিলাম —'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' বলিয়া যে গীতায় একটী কথা রহিয়াছে, তাহার মূল্য কতখানি! কৌশল জানিতে পারিলে অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হয়। আমরা কর্ম্মের কৌশল জানি না বলিয়াই বৃথা পণ্ড শ্রম করিতে হয় আমাদের।

●　　●

মনটাকে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার উচ্চ আসনে বসাইতে না পারিলে কোন বিষয়েরই সঠিক তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। একটা মনকে ঊর্দ্ধপ্রতিষ্ঠ করিতেই হইবে, তাহা না হইলে নিম্নগামী মনের গলদ ও অন্যায় ধরা পড়িবে কাহার কাছে? বাস্তব জীবন লইয়া যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মাঝে তিনিই ঠিক যথার্থ সাহিত্যিক যাঁহার একটী মন বাস্তব

জগতেরও অনেক উর্দ্ধে। এই উর্দ্ধপ্রতিষ্ঠ মনের প্রভাবেই নীচেকার মনটীও বাস্তব ক্ষেত্রে নামিয়া যথার্থ সত্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়। কেবল মাত্র স্থূল অভিজ্ঞতাই চরম নয়, ইহা হইতেও বড় জিনিষ স্বানুভূতি। সত্যিকার অনুভূতি স্থূল অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বড়, তাহার আসন বহু উর্দ্ধে। বস্তুর তত্ত্ব বুঝিতে হইলে অন্তরের আলোক থাকা চাই, দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া চাই। চোখ ছাড়া হৃদয় দিয়াই সব চেয়ে ভাল করিয়া দেখা যায়, বুঝা যায়। চোখ সবখানি দেখিতে সক্ষম নয়—কিন্তু হৃদয়ের অনধিগম্য স্থান নাই। মূলের ভাব স্থূলে আসিয়া সময় সময় বিভিন্ন আকার — বিকৃত রূপও ধারণ করে। সেইজন্যই বিচারক বাইরের সব দেখিয়া শুনিয়া নিজের মাঝে একবার তলাইয়া যাইবে। বেদনা সকলের ভিতরই আছে। কিন্তু সকলের তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। স্থূলে যাহা দেখি, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে, কিন্তু মূলে পৌছিতে পারিলে তাহার আসল ভাব অবগত হওয়া যায়।

* *

উদ্দীপনা বলি তাহাকেই, যে ভাবে মন উর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণ করে। উদ্দীপনা কখনই মানুষকে নীচে নামাইয়া আনে না। উদ্দীপনার পর যদি অবসাদ আসে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, কোথায়ও না কোথায়ও উত্তেজনার বীজ গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আজকাল অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন--sublimation of sexurge হইতেই নাকি মানুষের কাব্য-শিল্প-সঙ্গীত সব কিছুর সৃষ্টি! কিন্তু sublimation যদি উর্দ্ধমুখী না হয়, ভগবন্মুখী না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার মাঝে কাম-গন্ধ রহিয়াছে। সাত্ত্বিক রস প্রেরণার উৎসই হইল প্রেম; কাজেই প্রেম এক স্বর্গীয় বস্তু! মন যদি কিছুতেই আর নিম্নাভিমুখী না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে কাম বিদগ্ধ হইয়া প্রেমে পরিণত হইয়াছে। দেহের আকর্ষণ বা নিরেট বস্তুর আকর্ষণ প্রেম নয়, প্রেম ভাবে ভাবে সম্মিলন মাত্র! ভাবকে স্থূলে আরোপ করিয়া আস্বাদন করিতে হইলে অনেক বিঘ্নও আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রলোভনের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড় কঠিন। অনেকে মূল ভাবের বিশুদ্ধ ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া শেষে বস্তুগত বা বিষয়গত নীচেকার আকর্ষণেই আসক্ত হইয়া পড়ে। এইজন্যই sublimation ঈশ্বরাভিমুখী বা উর্দ্ধাভিমুখী হইলেই আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কান্তভাবে যদি সাধনা করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবান্‌কেই কান্তরূপে ভাবনা করা উচিত। নিজের দেহ-মন-বুদ্ধি সব ভাগবদ্ধর্ম্মে সম্পূর্ণ রূপে অনুভাবিত না হইলে আরোপসাধনায় মানুষের অধঃপতনের আশঙ্কাই বেশী! সাধ্যনির্ণয় প্রসঙ্গে রায় রামানন্দ অনেক গুপ্ত কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার অধিকারী খুব কম মিলে!

* *

আমাদের মন অহরহঃই কেবল উঠানামা করিতেছে। কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা মনকে যদি একবার সেই সঞ্চরণের পথ হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া লওয়া যায়, তাহাহইলে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি আসে! আনন্দের উর্দ্ধাভিমুখী প্রবাহে তখন নব নব অনুভূতি লাভ করা যায়। মাধ্যাকর্ষণের উর্দ্ধেই উপনিষদের সেই দিব্যধাম—আনন্দের রাজ্য! মানুষ সেই আনন্দ লাভ করিতে সচেষ্ট নয় বলিয়াই জাগতিক আনন্দ এবং প্রলোভনের মায়াই তাহাদের উপর ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে।

সৌন্দর্য্যে যেখানে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া উঠে, সেখানে দ্রষ্টা কিম্বা দৃশ্য উভয়ের কাহারও না কাহারও মাঝে গলদ রহিয়াছেই।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য পিপাসু এবং প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বস্তু কাহারও মাঝে চঞ্চলতা, লোলুপতা বা উগ্রতা নাই। নির্ণিমেষ নয়নে পরস্পর পরস্পরের পানে তাকাইয়াই তৃপ্ত! সৌন্দর্য্যানুভূতি লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হওয়া চাই। সুন্দরকে উপলব্ধি করিতে সুন্দর হৃদয়-মনের প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতীত; ইন্দ্রিয় দ্বারা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না।

সূক্ষ্ম ভোগে তৃপ্তি হয় সংযমীর; এইজন্যই সংযমীর আনন্দ খুব তুচ্ছ উপকরণ অবলম্বন করিয়াও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! কিন্তু অসংযমীর ভোগলালসা স্থূলের প্রতি; স্থূল ছাড়া আর কিছুই বুঝে না সে। ভোগ হইতে কেহই বঞ্চিত নয়, তবে সংযমীর ভোগে আর অসংযমীর ভোগে রাত দিন পার্থক্য!

* *

ভাবই সব চেয়ে বড় জিনিষ! চণ্ডীদাস রজকিনীর মাঝে তাঁহার অন্তরের ভাব-রূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার স্থূল রূপে তিনি মুগ্ধ হন নাই। এই ভাব রূপের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই আর কোন অশঙ্কা থাকে না। তাহা না হইলে স্থূলের আকর্ষণ বড় সাংঘাতিক। পুরীর জগন্নাথকে দেখিয়া নাকি মহাপ্রভু ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ণিমেষ নেত্রে তাকাইয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া উঠিতেন। তিনি সেই জগন্নাথের মাঝে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করিতেন, যাহা জগন্নাথের স্থূল কাঠামের চেয়ে অনেক বড় এবং মূল্যবান্। খাঁটী ভাবে কখনো ব্যভিচার আসিতে পারেনা। রজকিনীকে চণ্ডীদাস কখনো রজকিনী রূপে দেখেন নাই, তাহা হইলে যে ভাবেরই ব্যত্যয় ঘটে! কিন্তু ভাবকে সর্ব্বাবস্থায় একরূপে রাখা সহজ নয়। যাহাকে মা বলিয়া ভাবিয়াছি, তাহার প্রতি যদি মা ছাড়া অন্য কোন ভাব আসে, তাহা হইলেই ভাবের ব্যভিচার হইল! এই জন্যই ভাবের সাধনা করিতে গেলেও সংযমের খুবই প্রয়োজন। মোট কথা আত্মনিগ্রহ ছাড়া বিলাসের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না।

* *

খুব ঘুম পাইলেও যদি বাধ্য হইয়া জাগিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে যেমন পনের আনা মন ঘুমের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে, তেমনি অন্তর্মুখীনতার দিকে পনের আনা মনকে ঢালিয়া দিয়া আর বাকী এক আনা দিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে হয়। কাজ কর্ম্মের মাঝে মানুষের শান্ত-সমাহিত রূপের দৃশ্যও অস্পষ্ট আবছায়া হইয়া আসে; এইজন্যই মানুষ কাজ করিয়া অনেক সময় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, অতৃপ্তি প্রকাশ করে। কিন্তু মনটা যদি অধিকাংশ সময় যোগ-যুক্ত থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে মন কখনো উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে না।

কাজ ছাড়া মানুষ থাকিতে পারে না—কিন্তু কাজেও মানুষ লিপ্ত থাকিতে পারে আবার অকাজেও লিপ্ত থাকিতে পারে। আমার আত্মার বিকাশের অনুকূলেই আমাকে কাজ করিতে হইবে, তাহা না হইলে কতকগুলি কাজ করিয়া যাওয়াতেই কোন ফল নাই। আসল লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া অনেক কাজ করিতে পারিলেও সেই কাজে আত্ম চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় না। মানুষ ভূতেরই বেগার খাটিয়া মরে। মন শান্ত-সমাহিত না হইলে কর্ম্মজীবনের সূত্রপাতই যে হয় না!

পত্রের উত্তর

—(০)—

মানুষের শুধু পেটের ক্ষুধাই ক্ষুধা নয়, আরও অনেক রকমের ক্ষুধাই মানুষের মাঝে রয়েছে। সব ক্ষুধাকে মিটাতে পরিতৃপ্ত করতে পারলে— তবেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। Physical hunger, intellectual hunger, spiritual hunger —এই ত্রিবিধ ক্ষুধাতেই মানুষ নিয়ত চঞ্চল ব্যাকুল। পশুর শ্রেণীতে যে সব মানুষ রয়েছে, তাদের পেটের ক্ষুধাটাই সব চেয়ে প্রবল; অর্থাৎ এক অন্নময় কোষ ছাড়া তাদের আর কোন বিষয় ভাববার প্রয়োজন হয় না। পেটটা ঠাণ্ডা হলেই আর কোন নালিশ নেই তাদের। কিন্তু এর চেয়ে উন্নত যারা, যারা বুদ্ধিমান, যাদের বুদ্ধি প্রখর —তাদের বুদ্ধির ক্ষুধাটাই বেশী। এদের পেট ভরলেই ক্ষুধা মিটে না, বুদ্ধিকেও যথেষ্ট খোরাক দিতে হয় ওদের। এর চেয়েও উন্নত যারা — তাদের ক্ষুধা হল আধ্যাত্মিক ক্ষুধা; অর্থাৎ তাদের বুদ্ধির খোরাক জুটলেও তারা তৃপ্তি পায় না, তারা চায় আত্মার খোরাক। মানুষ যদি এই তিনটী স্তরের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণ খোরাক পেয়ে বেড়ে উঠতে পারে, তাহলে তাকেই বলি আমি পূর্ণ মানুষ! অর্থাৎ সে মানুষের মাঝে আর কোথায়ও খুঁৎ থাকে না। ভূমিকাতেই তিনটী কথা বলে নিলাম; এখন ভাই ধীরেন, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দিচ্ছি। তোমার চিঠির ভাবে বুঝলাম তুমি বৈচিত্র্যকে— শাস্ত্রকে স্বীকার করতে নারাজ। যে কয়টী ছেলে নিয়ে তুমি একটী আদর্শ বিদ্যাপীঠ গড়ে তুলতে চাচ্ছ, তাদের সকলে কেন এক তালে এক সুরে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে না এর জন্যই তোমার ক্ষোভ, নিদারুণ দুঃখ।

এই জায়গাতেই আমার অনেক কথা বলবার আছে। এ কথা মনে রেখো, সকল মানুষই এক স্তরের নয়, সকলের ক্ষুধা একরূপ নয়। মা পাঁচটী ছেলের কাছেই সমান, অথচ পাঁচ ছেলের রুচি অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকের দরুণ আলাদা ব্যবস্থা করে থাকেন। শুধু একটী ভাবকেই যদি ফুটিয়ে তুলতে চাও জীবনে, তাহলে আগ থেকেই সেইরূপ ছেলে বেছে নেওয়া উচিত ছিল তোমার! কিন্তু জ্ঞানে-কর্ম্মে-তপস্যায় বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সকল দিক দিয়েই যদি তুমি ছেলেদের পূর্ণ মানুষ করে তুলতে চাও, তাহলে তোমার অনেক আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারও বুদ্ধি প্রখর, কারও হৃদয়াবেগ অত্যন্ত বেশী, কারও বা উজ্জ্বল প্রজ্ঞা রয়েছে। কাজেই এদের প্রত্যেকের উন্নতির পথ আলাদা। হৃদয়াবেগের মাঝে কোনরূপে তলিয়ে যেতে পারলেই ভক্ত চরম মনে করে, কিন্তু জ্ঞানী কোন আবেগেই নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভাসিয়ে দিতে চায় না। যার ভিতর যে বীজ রয়েছে, সেই বীজকেই ফুটিয়ে তুলবার সাহায্য করতে হবে। সকলের ক্ষুধা বা রুচি যখন এক রকমের নয়— তখন বেশী কম নানা আয়োজনেরই ব্যবস্থা রাখতে হবে। যার মাঝে যে শক্তির বিশেষ বিকাশ, তাকে তারই চর্চ্চা করবার বেশী সুযোগ দিয়ে আর অন্যান্য কর্ম্ম আনুসঙ্গিক ভাবে রাখতে হবে। সবকে একাকার করে কীর্ত্তন খুব জমে উঠতে

পারে বটে, কিন্তু সুরের বিশেষত্ব বজায় থাকে না। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে দিয়ে সকল ছেলেকে তোমার আদর্শানুযায়ী ভাল করতে গেলে, লোক দেখানো আদর্শ হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে ছেলেদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে কাঁটা পড়ল এ কথা জেনে রেখো। অবস্থা বা গতি বিধির প্রতি লক্ষ্য করে ব্যবস্থারও অদল-বদল করতে হয়-সময় সময়। তাতে যদি তুমি মনে কর তোমার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে, তাহলে কিন্তু মস্ত বড় ভুলের পথ দিয়েই তুমি চলেছ।

কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অবশ্য সকলেরই পালনীয়, কিন্তু যেই ছেলের মাঝে আত্ম-সম্মান বোধ এবং আত্মজ্ঞান জেগে উঠ্‌ল, তখন ছেলেকে স্বাধীনতা দিতে হবে। এই স্বাধীনতা দিলেই তার আপন লক্ষ্যের পথ সে আপনি বেছে নিবে। কীর্ত্তনের মাঝে নিয়মিত ভাবে ঘুরে বেড়াইলেই বা শাস্ত্রাদি নিয়মিত চর্চ্চা করলেই যে মৌলিক ভক্তি বা জ্ঞানের বিকাশ হবে, এমন রায় তুমি কিছুতেই দিতে পার না। কাজেই ছেলেদের মাঝে ব্যতিক্রম দেখলেই যে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ, এটা কিন্তু তোমার নেহাৎ গোঁড়ামির ভাব। ছেলের কল্যাণ কামনা করে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে শেষে অকল্যাণ যাতে হয় তারই রীতিমত চেষ্টা করে অনেক মানুষ।

শিক্ষক হওয়া, গুরু হওয়া— ছেলে বা শিষ্যের উপর চিরকাল প্রভুত্ব করার দরুণ নয়। যিনি সেরূপ অন্যায় প্রভুত্বের দাবী করেন, তাঁর ভিতর গুরুত্বের মহত্ব নাই, প্রভুত্বের লোলুপতা রয়েছে মাত্র। আত্মজাগরণকে যিনি ভয় করেন, তাঁর মত বিমূঢ় অন্ধ ব্যক্তি আর নেই। এক এক দিকের বিশেষত্ব নিয়ে যদি প্রত্যেকটী ছেলে উন্নত হয়ে উঠে, আর তাতে তোমার আদর্শানুযায়ী দলের সংখ্যা বজায় না থাকে, তাহলে দুঃখ করবার কোন হেতু নাই, বরঞ্চ নিজের বৈশিষ্ট্য বা মহত্ব উপলব্ধি করে যদি পরস্পর মিলন হয়, তাহলে সে মিলনই সার্থক মিলন। খাঁটী ধর্ম্ম এক জিনিষ— আর ধর্ম্মের আচার অন্য জিনিষ; তুমি যেন ভাই শেষেরটীর প্রতিই অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছ!

বিশেষ করে কয়েকটী ছেলের কথা জানি, তাদের জীবনের লক্ষ্য খুব মহৎ এবং উঁচু দরের, তাদের সম্বন্ধে তুমি কি ব্যবস্থা করেছ বল তো দেখি? ওরা যখন ওদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করেছে, তখন নাকি তুমি তাদের অভিশাপ দিতে চেয়েছ, কিম্বা সন্তুষ্টচিত্তে ওদের যাতে কল্যাণ হয়— উন্নতি হয় সে আশীর্ব্বাদ করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছ— এ সব কি চিত্তের ঔদার্য্য বা মহত্বের লক্ষণ?

পরিপূর্ণ ভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশই যদি তোমার আদর্শ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি একথা বল্‌তে পারবে না যে দৈহিক কর্ম্মের ব্যবস্থা করেই আমি তাদের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এ বলেই তোমার নিষ্কৃতি নাই— তোমার দায় এতেই মিটে গেল না। কাজেই আদর্শানুযায়ী তুমি ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থাও করতে পেরেছ কি না তা একবার ভেবে দেখো।

কোন কিছুরই মোহ ভাল নয়। আদর্শেরও কিন্তু মোহ রয়েছে; আমার মনে হয় নিছক আদর্শের মোহেই তোমার চৈতন্য লুপ্ত! আদর্শেরও নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হওয়া চাই। তুমি জোর দিচ্ছ তোমার আদর্শের প্রতি— কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিকে নজর দেবার সময় কোথা? অর্থাৎ তাদের ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে দিকে তোমার মোটে লক্ষ্য নাই। যে-দিন তুমি দেখতে পাও সকলে এক তালে, এক সুরে চল্‌ছে, সে দিনই তোমার

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল বলে আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠ। যে মানুষকে নিয়ে তুমি আদর্শ গড়্‌তে চাচ্ছ সেই মানুষই হয়ে গেল তোমার কাছে তুচ্ছ, আর নিছক আদর্শটাই হয়ে উঠ্‌ল প্রকাণ্ড বড়! এ ভাবে কি তুমি তোমার আদর্শে সফলকাম হতে পারবে বলে ভেবেছ? এই জন্যই বলি, সর্ব্বত্রই নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসনে বস্‌তে না পারলে তুচ্ছ জেদটাই প্রবল হয়ে ওঠে। ছেলেদের প্রতি তোমার আর সে দরদ নাই, তোমার কর্ত্তব্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছে কেবল আদর্শ রক্ষা হয় কিসে, তারই পন্থা আবিষ্কারের কূট-নীতিতে। আমি কোন ক্ষোভ নিয়ে তোমায় এ কথাগুলি বল্‌ছি না— তুমি নিজেও একবার কথাগুলি তলিয়ে চিন্তা করে দেখো।

ধর্ম্ম ও পরমার্থ-জীবনে দেখ্‌ছি প্রকৃত জ্ঞানী-গুরু শিষ্যের কোন ক্ষুধাকেই চেপে যান না। বরঞ্চ ক্ষুধা যাতে মিটে তারই ব্যবস্থা করে দেন। সকলের জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ এক নয়, পাচটী ছেলে পাঁচ রকমের হবেই। এর দরুণ দুঃখ করে ছেলেদের অভিশাপ দিলে কি হবে?

দেখ ভাই ধীরেন, আমি আড়ম্বরটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। নিজের আন্তরিক সাধু প্রচেষ্টাদ্বার দু' একটী ছেলেকেই মানুষ করা যায়। কাজেই আলয়-মন্দে এক পাল ছেলে জুটিয়েই বা কি হবে? যদি সত্যিকার কাজ কর্‌তে চাও, আড়ম্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও— তাহলে একটু গুটিয়ে এস। আড়ম্বর করে জগৎহিতের প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন এবং পরিণামে তার কি ফল দাঁড়িয়েছে তাও বোধ হয় দেখেছ; কাজেই নামের প্রত্যাশা বা লোভ ছেড়ে দিয়ে নিজের শক্তি সামর্থ্য বুঝে খুব অল্প আয়োজনের মাঝেও কতটুকু সার্থকতা আন্‌তে পার তারই চেষ্টা কর। ছেলেকে পরিপূর্ণ ভাবে মানুষ করে তুল্‌তে হলে যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তা তোমার সম্পূর্ণ না-ও থাক্‌তে পারে। কাজেই এ জায়গায় গোঁড়ামি করে ছেলেকে উচ্চ জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত করো না। সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হলে দেখ্‌বে, ছেলে যদি খুব জ্ঞানীও হয়, তাহলেও তোমার কাছ থেকে যে জিনিষ পেয়েছে তার দরুণ কৃতজ্ঞ থাক্‌বেই। কাজেই তোমার নাম একেবারে লোপ পাবে না।

আজ এ পর্য্যন্তই। যা লিখ্‌লাম গভীর ভাবে এ সম্বন্ধে চিন্তা করে প্রত্যুত্তর দিও।— ইতি।

ভারতবর্ষ

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তবেই দেখা যাইতেছে কেবলমাত্র শান্তির ব্যবস্থা করিলেই যে ভারতের মুক্তি হইবে, তাহা নহে। ভারত যুগযুগান্তর ধরিয়া যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছে, কেবল বাস্তব সত্যেই তাহার খণ্ডন হইতে পারে। —ভারতবাসীদের আবার সত্যকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশের মানুষ প্রাসাদতুল্য গৃহাদিতে খুব জাঁকজমকের সহিত বাস করে, আর ভারতবাসী

কুঁড়েঘরে বাস করিয়া সাধারণভাবে জীবন যাপন করে বলিয়াই যে পাশ্চাত্য দেশের লোক ভারতবাসী অপেক্ষা খুব সুখী, তাহা নহে। অর্থ সম্পদে সুখ বৃদ্ধি করে— একথা বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। পাশ্চাত্যবাসী খুব সুখী, খুব উন্নত— একথা মনে করিয়া যদি ভারতবাসী তাহাদের অনুসরণ করে, তবে ভারতবাসীও ভুল পথেই পরিচালিত হইবে। কেবল বৈষয়িক উন্নতিতে বড় হইব এ আশায় সকলকেই বিফল হইতে হয়; কারণ কে না ইচ্ছা করে জগতের যতকিছু ধন সম্পদ তাহার কুক্ষিগত হউক, কিন্তু ক'জনের ভাগ্যে তাহা হয়? শ্রম ও প্রেম কিম্বা প্রেমযুক্ত শ্রমের দ্বারাই উন্নতিলাভ করা যায়। যে জাতি জগতে উন্নতি লাভ করিতেছে দেখিতেছ, তাহারাই জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক এই মূলধন হাতে লইয়াই অগ্রসর হইতেছে। —ইহাই হইতেছে বাস্তব বেদান্তের নিগূঢ় কথা! মূর্খ যাহারা তাহারাই গাছ না লাগাইয়া গাছের ফল খাইতে চায়। তথা কথিত রাষ্ট্রবিদ্‌রাই জাতীয় উন্নতির স্বপ্ন দেখে, তারা বুঝে না যে শক্তি ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। সে শক্তি— স্বাধীনতার উদ্দীপনা আর প্রেম। প্রত্যেক জাতিই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্তের এই মূল রহস্য ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছে। ভারতের মূলনীতি লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, ইহাকেই দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কি পরিবারে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মে, যেখানেই বল, বেদান্তের এই মূল নীতিকে অবলম্বন করিয়াই উন্নতি করা সম্ভবপর হয়।

ভারতের প্রধানতম বিশেষত্ব এইখানে যে— পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি যে কোন বিষয়েরই আলোচনা হউক না কেন, ধর্ম্মের নামে না করিলে কিছুতেই তাহা ভারতবাসীর হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না। কংগ্রেস প্রভৃতি যে কোনই সভা সমিতি যে সব ভারতের সংস্কারপ্রচেষ্টায় ব্রতী, তাহারা সর্ব্বসাধারণকে তেমন উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতেছে না, যে হেতু সেই সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালিত নহে। সুতরাং ভারতে বেদান্তকে জীবন্ত করিয়া তাহা জীবনে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াসই প্রকৃত প্রতিকারের একমাত্র পথ। আর বেদান্তকে ব্যবহারিক জীবনে পাইলেই তাহার ভিতরে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জ্ঞান, প্রেম সবই রহিল। আর তাতেই স্বাধীনতা বল, শান্তি বল, শক্তি বল, সাহস বল, প্রেম বল, সকল ফলই লাভ হইবে। হিন্দু তো শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রানুমোদিত পথেই চলিতে চায়, সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তকে পাইলেই তাহাদের প্রাণের বস্তুলাভ হইল। সুতরাং হিন্দুর সংস্কার করিতে হইলে বেদান্ত পথ যেমন অনুকূল, অন্য কিছুই সেরূপ নহে। শাস্ত্রের নাম করিয়া কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের বোঝা চাপাইয়া তাহাদের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিলে চলিবে না। তাহাদিগকে প্রকৃত জীবনের —প্রকৃত স্বাধীনতার—প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেমের সন্ধান দিতে হইবে। আচার অনুষ্ঠানের বোঝা ঘাড়ে লইয়া তাহার উপর পরাধীনতা-পাশে বদ্ধ থাকিয়া ভারতবাসী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃত জীবনের পথ বলিয়া দিতে হইবে, বেদান্তকে জীবনে ব্যবহারিক করিবার সন্ধান পাইলেই এই জাতি সব পাইবে। এই বেদান্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করিবে, যেহেতু পৃথিবীতে এমন কোন দর্শন বিজ্ঞান বা ধর্ম্মশাস্ত্র নাই যাহা বেদান্ত প্রতিপাদিত সত্যকে মানিয়া না লয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদান্তের মত প্রস্রবণ চিরবহমান, সেই হিন্দু কিনা তাহার অমৃত ধারা পান না করিয়া চাতকের মত

আকাশের পানে চাহিয়া রহিয়াছে! ভারতবাসীর মধ্যে খুব কম লোকই আজকাল এই বেদান্তের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম। আর যাঁরা এই বেদান্তের আলোচনা করিতেছেনও, তাঁহাদের অধিকাংশেরই পুঁথিগত বিদ্যা। অধিকাংশ পণ্ডিত—যাঁরা বেদান্ত আলোচনা করেন, তাঁহারা কর্ম্মজীবনে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারেন না। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই জাতীয়তা ও নিয়মানুষ্ঠানের দাস মাত্র— তাঁহারা প্রকৃত স্বামী বা প্রভু না হইয়া ক্রীতদাস সাজিয়াছেন। বাস্তবিকই ভারতে এমন সব শিক্ষক আছেন, যাঁরা ছেলেদের রসায়ন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি শিক্ষা দেন অথচ তাঁহারা জীবনে কখনও ঐ সব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বা হাতে কলমে করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু হে আমেরিকাবাসি, তোমাদের কাহারও কাহারও পুঁথিগত বিদ্যা না থাকিলেও হাতে-কলমে ভারতবাসী অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তোমাদের হাতে কলমে কাজ করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে, ভারতের বিজ্ঞদের সে জ্ঞান নাই। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে, তোমরাই কর্ম্মজীবনে বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং তোমরাই আবার ভারতকে প্রকৃত পথ দেখাইতে পারিবে। ভারতের স্বামীজি ও পণ্ডিতগণের দ্বারা ভারতের উদ্ধারের আশা নাই, কারণ তাঁহারা নিদ্রিত ভারতকে আরও নিদ্রিত রাখিবার জন্য ঘুম পাড়ানি মাসী পিসির গান ধরিয়াই আছেন।

প্রস্তাব চলিতেছে, শিল্প বিদ্যালয় খুলিলেই ভারতবাসীর উন্নতি হইবে। প্রকৃত পক্ষে কি তাহাই হইবে? রাম, বলেন "না", কারণ ঐ সব বিদ্যালয়ের দ্বারা সাময়িক বা আংশিক উপকার সাধন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত অভাব পূরণ হইবে না। বর্ত্তমানে ভারতীয় শ্রমিকগণ তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে কি পায়? ধর একজন কুম্ভকার সারাদিন পরিশ্রম করিয়া কুড়িটা হাঁড়ি গড়িল, কিন্তু তাহা বিক্রয় করিয়া কত পাইবে? না একটাকা। তাহাতে মজুরী পোষায় কি? আবার ধর উচ্চ শ্রেণীর ছেলেরা এম, এ পাশ করিল, তাহার মাহিনা কত, না— মাসে ৬০৲ টাকা। দিন মজুরী তার দুটাকা। এ টাকায় কি তাদের পোষায়? আর দেখ, আমেরিকায় তোমাদের শ্রমিকেরা কত উপায় করে! সাধারণ শ্রমিকেও তোমাদের দেশে ছ'টাকার কম উপায় করে না। তবেই দেখ, ভারতবাসীর উপায় কত অল্প! কাজেই তাহাদিগকে কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয়। তাহাদের খাওয়া-পরা বসবাস প্রভৃতি সকল রকমেই হীনভাবে অতি কষ্টে সঙ্কুলান হয়। কেন এমন হয়? দেশে টাকা (মূলধন) নাই বলিয়াই তো! কারণ দেশের অর্থ বৈদেশিক কর্ত্তৃক শোষিত হইতেছে। আমেরিকার দু'একটীর আদর্শে শিল্পবিদ্যালয় ভারতে খুলিলে কিছু উপকার অবশ্যই হইবে। কারণ তাহাতে লোকে কিছু কিছু শিল্প ও পরিশ্রমের কাজ করিতে শিখবে। কিন্তু কাহার জন্য এসব করা? এ সবই যে বিদেশী ধনীর অর্থ সংগ্রহে নিয়োজিত হইবে। বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য সবই যে বিদেশী বণিকের হাতে। দেশী ব্যবসায়ীরা ত তাহাদের দালাল মাত্র! তাহাদের লভ্যাংশ আর কতটুকু! তাহা হইলে শিল্পকলা শিখাইয়াই বা দেশবাসীকে আর্থিক উন্নতির কি সুযোগ দেওয়া যাইবে? লেখা পড়া শিখিয়া শিল্পকলা শিখিয়া এই হইবে যে ভারতের ধন বিদেশে চালাইয়া বিদেশীর মুখোজ্জল করিতেই নিয়োজিত হইবে। তবেই দেখিতেছ যে শিল্পকলা ও পরিশ্রম জনক কাজ কর্ম্ম শিখাইলেই ভারতের উন্নতি হইবে না। উহাদ্বারা ভারতের কখনই প্রকৃত বা স্থায়ী উপকারের আশা নাই। উহার দ্বারা ভারতের দুঃখ দৈন্যও কমিবে না,

দুর্ভিক্ষ মহামারীও লোপ পাইবে না। যদি তাহাই হয়, তবে প্রতিকারের উপায় কি? প্রতিকারের উপায় বহু প্রকারই আছে, তবে বর্ত্তমানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। অবশ্য শিল্পকলাও তাহার অন্তর্গত থাকিবে, কিন্তু শিল্পকলাকে মুখ্য স্থান দেওয়া চলিবে না। মোটের উপর ভারতের উন্নতিকল্পে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলন ও সুলভ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যাহাঁর দ্বারা ভারতের প্রকৃত উপকার হইবে সে শক্তির ক্রিয়া যে তথায় কিছু কিছু না হইতেছে এমন নহে। আমেরিকা হইতে প্রেরিত মিশনারীগণ কিছু কিছু কাজ করিতেছেন বটে, তাঁরা জাতির গণ্ডী ভাঙ্গিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁরা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের শিক্ষা দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর ভিতরও কলেজ স্কুল স্থাপন করিয়া উচ্চ শিক্ষার বিস্তার করিতেছেন, তজ্জন্য ভারতবাসী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু অন্যদিকে তাঁহাদের দ্বারা কিছু অনিষ্ট না হইয়াও যাইতেছে না। তাঁহারা যে আদর্শে এবং যে ভাবে গরীব ভারতবাসীর মধ্যে বাস করেন, তাহা মোটেই দেশবাসীর অনুকূল নহে। তাঁহারা আধিপত্য, পদ মর্য্যাদা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, এদিকে যাহাদের মধ্যে কাজ করেন তাহাদের পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে সহয়তা করেন আর বিবিধ অশান্তির সৃষ্টি করেন। তাঁহারা গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত আবার নূতন জাতি সৃষ্টি করিয়া কলহ বৃদ্ধি করিতেই সহায়তা করেন। একেই ত ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতি, আর তাদের ভিতর বৈষম্য লইয়া গণ্ডগোল, তাহার উপর আবার একটা নূতন জাতি গড়িয়া তুলিয়া ভারতের ভার বৃদ্ধি করিয়া কি উপকার হইবে? ভারতবাসীর মধ্যে যাহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা সাধারণতঃ হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া উঠে, তাহারাও হিন্দুদের সঙ্গে মিশেনা আর হিন্দুরাও তাঁহাদের সহিত মিশিতে চায় না। কাজেই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠে, এবং বৈষম্য তীব্রভাবেই দেখা দেয়। বালক বালিকারা তাহাদের পিতামাতা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, স্ত্রী স্বামীর গৃহে বাস করিতে চায় না। খৃষ্ট উপাসকেরা এইরূপে হিন্দু গোঁড়ামীর স্থলে খৃষ্টানগোঁড়ামী স্থাপন করিয়া বসে। তাঁহাদের দান এইরূপই হয়, যে তখন তাঁরা কেবল মন্দ দেখিতেই থাকেন আর তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁরা তখন ঘরের ছেলেকে ঘরছাড়া করিয়া আর একটা উপধর্ম্মের বাহ্য আচারের জোঁয়ালের নিকট তাদের কোমল স্কন্ধ জুড়িয়া দেন। এরূপ অবস্থায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আর হিন্দুর সহানুভূতি—প্রেম থাকিতে পারে না। আমি অবশ্য এখানে মন্দ দিকটাই দেখাইলাম। তবেই দেখিতেছ এইরূপেও আসল কাজ হইবে না। অবশ্য আমরা আমেরিকাবাসীর নিকট এ বিষয়ে কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁরা ভারতের জন্য এইরূপে সহস্র সহস্র মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতেছেন। রাম তোমাদের নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন যে প্রকৃত ঔষধ ঠিক নির্ব্বাচন করা হয় নাই।

আমরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট অনেক কারণে কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁহারা অনেকটা জাতির গণ্ডী ভাঙ্গিতে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁরা শিক্ষা বিস্তারের জন্যও অনেক কিছু করিয়াছেন, অনেক কলেজ স্কুল তাঁদের কৃপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁদের কৃপাতেই আজ হিন্দু যথার্থ রূপে নিজেদের শাস্ত্রাদি পঠন পাঠন করিতে পাইতেছে। এই টুকুই ভালর দিক, মন্দদিকও অবশ্য আছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের যথা সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছেন। তাঁহারা

ভারতবাসীকে ভাসা ভাসা শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে ভারতের হিত না হইয়া অহিতই হইতেছে। তাহাতে দেশের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইতেছে যে যদি অচিরেই এইরূপ ব্যবস্থার প্রতিকার না হয় তবে হিন্দুকে না খাইয়া মরিতে হইবে, অবশেষে ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

হে আমেরিকাবাসি! তোমাদের নিকট ভারতের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিলাম, এবং প্রতিকারের উপায়ও নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তোমাদের কি ভারতের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই? রাম সেই দেশের প্রতি তোমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছেন, যে দেশে ত্রিশ কোটী লোক আজ দীন দুঃখী, ত্রিশ কোটী লোক আজ অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে বিনা চিকিৎসায় রোগ ভোগ করিয়া অকালে কাল কবলে পতিত হইতেছে। যাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান একদিন পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, আজ তাহারা শিক্ষাভাবে জ্ঞানাভাবে ক্রীতদাসের ন্যায় পরাধীন থাকিয়া জগতের নিকট হীন হইয়া রহিয়াছে। এই ত্রিশ কোটী লোক জগতের মানব সংখ্যার অনুপাতে বিশিষ্ট অংশ। যদি এই ত্রিশ কোটী প্রজাকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় এবং তাহাদের শক্তির যদি সদ্‌ব্যবহার করা যায়, তবে কি তাহারা জগতের হিতে লাগিবে না? এই ত্রিশ কোটী লোক যদি তোমাদের সঙ্গে কাজ করে, যদি তাহারা তোমাদের চিন্তায় চিন্তিত হয়, যদি তাহারা তোমাদের সহযোগে মস্তিষ্ক পরিচালনা করে, তবে তোমরাও কি তাহাতে লাভবান্ হইবে না? যদি ভারতের শক্তি তাহাদের অভাব অভিযোগ ও দৈন্য দূর করিবার জন্যই নিয়োজিত হয়, তবে তাহাদের দ্বারা কোন আশা নাই; নতুবা তোমাদের দেশের সুবিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিন, এডিসনের ন্যায় মহামনস্বী সৃজন করিতেও তাহারা সক্ষম। তবেই দেখ, ভারতের শক্তির সদ্ব্যবহার করিলে জগৎ তাহাতে সম্পদশালীই হইয়া উঠিবে।

—(•)—

ধ্যানের প্রণালী

—•:•:•—

সারথিকে যদি রথচক্রের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে চক্রের গতির সঙ্গে তিনিও গতিশীল হন বটে, কিন্তু তাঁর তখনকার অবস্থাটা নিশ্চয়ই উপভোগ্য হয় না।

জীবনটা আমাদের কিন্তু এমনিই বিড়ম্বিত! চুপ করে থাকা অসম্ভব, কেননা, 'যৎকিঞ্চ জগত্যাং' তা সবই 'জগৎ'— অতএব চল্‌তে হবেই, অথচ চলায় বিড়ম্বনা পদে পদে।

রথচক্র অবিরাম আবর্ত্তিত হোক, কিন্তু সারথি যদি আপন আসনে স্থির হয়ে থেকে সেই দুর্ণিবার গতির রশ্মি ধরে থাকেন, তাহলেই তাঁর আনন্দ। এইটাই হচ্ছে উপনিষদের ভাষায়— "অনেজ্য

জবনো”— ব্রহ্ম নড়ছেন না, কিন্তু তবু ছুটছেন। জীবনের Synthesisও এই রহস্যের মাঝেই।

জগৎটা চলার উপরেই রয়েছে, সুতরাং চলবার সাধনা আর কষ্ট করে করতে হয় না। এই চলতি রথের মাঝে নিজের balance ঠিক রাখা এইটাই হল সাধনা। চলে আর নিশ্চলে জুড়ি মিলিয়ে তবে এই জগৎ। মনের মাঝেও এই দুটো principle— মনটা অচলও নয় একেবারে সচলও নয়। দুটোরই আইন্-কানুন আছে, বুঝে-সুঝে প্রয়োগ করতে পারলে জীবনটা সুখেরও হতে পারে।

উপনিষদ্ পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন— “ধ্যায়তীব”। নিবাত নিষ্কম্প তরু শ্রেণীর পানে তাকিয়ে ঋষি অনুভব করলেন, আমারও অন্তরাকাশে এমনি “বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ— তিষ্ঠত্যেকঃ।” এই স্তব্ধতা, এই ধ্যান— এ-ও জীবনের একটা দিক! ভারতবর্ষ চিরকাল বলে আসছে— এইটাই সব চেয়ে বড় দিক্, এই অমৃত অব্যক্ত হতেই ব্যক্ত মর্ত্ত্য জীবনের উদ্ভব।

প্রকৃতির গুণলীলাতেও ধ্যানের স্থান আছে— স্তব্ধতার প্রয়োজন আছে। প্রযত্নের পর দেখি অবসাদ, শ্রমের পর বিশ্রাম, জাগরণের পর নিদ্রা, জীবনের পর মরণ— রজো-বিকারের পর ঘোর তমঃ। এটা অধঃ পরিণামের কথা। ঋষি বলছেন উর্দ্ধ পরিণামের কথা— “তমসঃ পরস্তাৎ।” গীতাকার বলছেন— নিত্যসত্ত্ব ভূমির কথা। সে পথ ধ্যানেরই পথ— প্রকৃতির নিদ্রা নয়, পুরুষের আরাম!

এই আরামের একটা সাধনা আছে। এর একটা মস্ত বড় সার্থকতাও আছে। ভয়ে ভয়ে বলতে হয়, তবুও বলি— ভারতবর্ষ যে আজো বেঁচে আছে, এবং সম্ভবতঃ সভ্যতার তাণ্ডবনৃত্য শেষ হয়ে গেলেও বেঁচে থাকবে, তার মূলে হচ্ছে এই ধ্যানশক্তি। ধ্যান হতে যখন কর্ম্মশক্তি উৎসারিত হয়, তখন বিনা আড়ম্বরে তা হাজার প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে তোলে।

সভ্যতার menuতে ধ্যানের item টা যোগ করে দিলে কেমন হয়? প্র-সাধনে এবং অ-সাধনেও তো সময়ের অনেক অপব্যয় হয়, না হয় সাধনেও হল। দেহের যেমন কসরৎ, যেমন বিলাস, তেমনি মনেরও একটু কসরৎ, মনেরও একটু বিলাস! জীবন তাতে মোটের উপর আরো উপভোগ্যই হয়ে উঠবে।

মনে হয়, ধ্যান থাকলেই ধ্যেয় থাকবে। নাস্তিক বলবেন, “আমি কিছুই মানি না, ধ্যান করব আবার কার?” এদেশে সব রকম experimentই হয়ে গেছে। কিছু মানবারই বা দরকার কি? শূন্য ধ্যানও একটা মস্ত বড় art! গীতাও বলছেন “আত্ম সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।” Annihilation এর ভয় নাই। কেননা পূর্ব্বেই বলেছি, এ শুধু recreation ধ্যান যোগ তো নয়— ধ্যানের বিলাস!

পতঞ্জলি থেকে একটু নমুনা দেওয়া যাক্। অভ্যাসে হানি নাই, বরং আমোদই আছে।

মনটাকে স্থির করতে গেলে দেখা যায়, তাকে স্থির করা বড় সোজা নয়। বরং অমনি যদি তন্ময়তা একটু আধটু আসে তো স্থির করতে গেলে সেটা আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনকে ঘুম পাড়াতে হবে, ছোট ছেলের মত ভুলিয়ে-ভালিয়ে জোর করে তার চোক টিপে ধরলেই সে ঘুমোবে না, বরং আরো sensitive হয়ে উঠবে।

প্রথমতঃ একটা সহজ আসন দরকার— যার যাতে সুবিধা; মোট কথা মেরুদণ্ডটা সোজা থাকা চাই। তারপর মনটাকে ছেড়ে দাও— শুধু তার ওপর নজর রাখ; দেখ সে কি ভাবে, কি করে।

শাসনের কোন প্রয়োজন নাই, শুধু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখে যাওয়া, কোথায় কোথায় সে যায়। এমনি করে কিছুক্ষণ থাক্‌লে পরেই চিন্তাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে এবং ক্রমে একটা বোধ জন্মাবে যে সাক্ষী মন আর চিন্তক মন, দুটা আলাদা। সাক্ষী-মন যেন background, আর তার ওপর এই মনটার নানা রঙ্‌ ফলানো চল্‌ছে। দুটার মাঝে discrimination টা যতই পাকা হতে থাক্‌বে, ততই চিন্তক-মনের আস্ফালন আপনা হতে কমে আস্‌তে থাক্‌বে এবং আর কিছু না হোক্‌, একটা অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বোধ হবে, এই শান্তি ওই সাক্ষী-মনেরই ধর্ম্ম— চঞ্চল মনের নয়। অবশ্য একদিন দুদিনেই চঞ্চল মনের আড়ালে এই শান্ত মনের রূপটা ধরা পড়্‌বে না— কিন্তু তা বলে এরজন্য খুব বেশী বেগও পেতে হবে না। নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করে গেলে সাধারণতঃ দিন পনেরোর মাঝেই ওই discrimination বা বিবেকজ্ঞানটুকু জাগবে।

এখন একটা emotional ideaতে মনটাকে fix করা দরকার। শান্তির অনুভূতির সঙ্গে যে সুখের অস্পষ্ট আভাস জেগে উঠে, এই দুটাকে জড়িয়ে একটা concrete idea গড়ে তুলতে হবে। যেমন নাকি ভয়ের, রাগের, ভালবাসার একটা concrete ideal form আমাদের মনে আছে, যাতে **কল্পনাদ্বারাও** আমরা ওগুলি ideally represent কর্‌তে পারি, তেমনি শান্ত-সুখময় অনুভবের একটা concrete impression চাই। এই impression টা শুধু ব্যাপক অনুভব মাত্র— ওই চঞ্চল মনের এটা যেন background. আকাশে মেঘ আসে যায়— কিন্তু আকাশ তেমনি থাকে। মেঘে ঢেকে ফেল্‌লেও মনে হয়, আকাশেই মেঘ করেছে— আকাশই আধার। তেমনি অভ্যাস কর্‌তে হবে, **শান্ত-সুখময়** চিত্তই আধার— সেই আধারের ওপর চঞ্চল মনের নৃত্য চল্‌ছে। মাঝে মাঝে নৃত্যটা প্রচণ্ড হয়ে উঠ্‌ছে, আবার মাঝে মাঝে শান্তি সুখই নিবিড় হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে। এমনি করে দু'য়ের লীলা চলুক।

এই ভাবটা একটু আয়ত্ত হলে পর এর সঙ্গে আর একটা idea জুড়ে দিতে হবে— সেটা হচ্ছে idea of infinity in space— অনন্ত-সমাপত্তি বা ব্যাপ্তিবোধ। এইখানে সাক্ষী-মনের প্রতি egoর আরোপ করা চলে— ন্যায়ের অনুব্যবসায় বা self consciousness কে যোগ করে নিলে আরো সুন্দর হয়। অনুভবটা তখন এই আকার ধারণ করল— "**আমি** বিভু— আমি আকাশবং।"

এ পর্য্যন্ত সমস্তই ভাসা ভাসা রকমের ছিল, বিভুত্বের ভাবটা একটু আয়ত্ত হলে পর intensityর idea টা যোগ করে নেওয়া চলে। তখন শরীরের কোন কেন্দ্রে— হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে মনকে আবদ্ধ করে সেইখান হতে অনন্তে চিত্তকে radiate কর। যতক্ষণ পার, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইভাবে মনকে ধরে রাখ, কোন জবরদস্তি কর্‌বার প্রয়োজন নাই— বরং প্রযত্ন যত শিথিল হবে, ফল তত ভাল হবে। অর্থাৎ অনায়াসে, আনন্দে, স্বভাবের প্রেরণায় এইটা কর্‌ছি— এমনি একটা ভাব মনের মাঝে পোষণ কর্‌তে হবে।

এ Process টার এইখানেই ইতি করা যাক্‌। এর পরে কি আছে, তা আর বল্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁরা কোনো কিছুই মানেন না, তাঁদের পক্ষে এইটুকু পর্য্যন্ত guide করে তারপর তাঁদের নিজেদের রুচির উপরই নির্ভর করা উচিত। এই অবস্থা থেকে মনকে শূন্যবৎ করেও ফেলা যায়,

অথবা deeper realisation এর দিকেও নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু এর পর থেকে Psychologyর সঙ্গে Philosophyর ধুনটু সুরু হয়ে যাবে, সুতরাং সে গহনে আমাদের প্রবেশ না করাই ভাল। যাঁরা কোনো কিছুই মানেন না, তাঁরা যদি এমনি করে রোজ মনটাকে একটু অনুশীলন করেন, তাহলে তাঁদের লাভ বই কোন ক্ষতি হবে না।

যাঁরা আস্তিক, বিশেষতঃ রূপবাদী, ইষ্টধ্যানে যাঁরা মন বসাতে চান, তাঁদের দুটা একটা কথা বল্‌লে মন্দ হয় না! ধ্যানের গোড়াতেই সবাই একটা ভুল করে বসেন— সেটী হচ্ছে জবরদস্তি, চঞ্চল মনকে থাব্‌ড়িয়ে স্থির কর্‌বার চেষ্টা অথবা একেবারেই পরিপূর্ণ তন্ময়তা আন্‌বার ব্যর্থ প্রয়াস! যে মনটা নিয়ে আমরা ধ্যান করব, সেটা এই নীচেকার বিষয়াসক্ত মন। তার কতকগুলি আইন আছে, নিজস্ব একটা স্বভাব আছে। সেই স্বভাবের অনুসরণ করে, আইন ধরে চল্‌লে তাকে সহজে আয়ত্ত কর্‌তে পারা যায়।

মনোযোগটা গাঢ় হলেই ধ্যান হয়। Attentionএর যা law, ধ্যানেরও তা law. ইংরেজী করে বল্‌লে বলা যেতে পারে, ধ্যান হচ্ছে sustained attention! এখন এই sustained attention এর স্বরূপ কি? James বল্‌ছেন, "Sustained attention is nothing but the repetition of the process." অর্থাৎ attention এ কোনো ideaই linger করে না, repeated হয় মাত্র। কথাটা যে কেবল James বলেছেন তা নয়, বৌদ্ধ দর্শনে, পাতঞ্জল দর্শনেও ঠিক এই কথাটাই রয়েছে। পতঞ্জলি বল্‌ছেন, প্রত্যয়ের একতানতা ধ্যান। ভাষ্যকার ব্যাস বল্‌ছেন, এই প্রত্যয় "ক্ষণ-পরম্পরা মাত্র।" কথাটা অতি গুরুতর।

মস্তিষ্কে হাজার idea কিল্‌বিল্‌ কর্‌ছে, Association হাজার দিকে টান্‌ছে, এর মাঝে অতি সূক্ষ্ম বিবেক জ্ঞানদ্বারা একটী ideaকে বেছে নিতে হবে এবং সেই ideaর সূক্ষ্মতম ও সহজতম ক্ষণকাল স্থায়ী একটী please এর ওপর চিত্তকে ঢেলে দিয়ে বারবার ওইটাকে repeat কর্‌তে হবে। এমনি করে ক্ষণ-প্রত্যয় দ্বারা সমাধির কথা পতঞ্জলিও বলেছেন। কিন্তু Brain খুব clear না হলে এবং power of discrimination অত্যন্ত developed না হলে এটা সহজ সাধ্য নয়। সুতরাং সাধারণের জন্য এই intellectual পথ নয়; তার জন্য অন্য ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

Emotion এর দিক দিয়ে আর একটা পথ আছে। পূর্ব্বে বলেছি, sustained attention একটা repetition মাত্র। নইলে মনের স্বভাবই হচ্ছে এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময় মাত্র একটা বস্তুতে লগ্ন থেকে পর মুহূর্ত্তেই ছিট্‌কে পড়া। ছিট্‌কে পড়্‌বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই যদি পূর্ব্বের বস্তুটা ideally represent করা যায় এবং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই process কে repeat করা যায়, তা'হলে attention sustained হতে পারে; কিন্তু তার ফলে কখনো কখনো মন বিষয় শূন্য হয়ে জড়বৎ হয়ে যাবারও আশঙ্কা আছে। আর এ কথাও বলেছি, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ছাড়া এটা সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এই attention এর আর একটা law আছে। যদি একটা বস্তুকেই বৈচিত্র্য সহকারে represent করা যায়, তাহলে আবার attention sustained হয়। একটা কথা আছে— 'Monotony induces sleep'— এর মূলে ওই sustained attention এর law! আমরা এইটা বর্জ্জন কর্‌তে চাই।

যাঁরা ছোট ছেলেদের শিক্ষকতা করেন, তাঁরা জানেন, কোনো একটা বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌তে হলে— একভাবে নয়--- নানাভাবে তাকে repeat কর্‌তে হয়, নানা দিক থেকে সেটাকে উপস্থিত কর্‌তে হয়। তাহলে ওই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই মূল বস্তুর সম্বন্ধে একটা ধারাহিক প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়।

ঠিক এই নিয়মটী ইষ্টধ্যানের বেলাতেও আরোপ কর্‌তে হবে। ইষ্টের একটা idea হবে background ; তারপর সৃজনী প্রতিভা দ্বারা নূতন নূতন বিভাবের সৃষ্টি করে সেই idea র সঙ্গে যুক্ত রাখ্‌তে হবে। অর্থাৎ ধ্যানের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ভাবনা, ইষ্টের সঙ্গে বিলাস। পাষাণ প্রতিমার মত ইষ্টকে মনশ্চক্ষে দাঁড় করিয়ে রেখে তাকিয়ে থাকব— এ চেষ্টা প্রথমতঃ একেবারেই ব্যর্থ হবে। এইজন্য প্রথমতঃ কল্পনাদ্বারা ইষ্টের পরিচর্য্যা করে, নানা ভাবে তাঁকে দেখে হৃদয়ে emotion বা ভাব উৎপন্ন কর্‌তে হবে। এই ভাবে চিত্ত যখন বিগলিত হয়ে যাবে, তখন সেই সুখময় বিগলিত চিত্তে কখনো আমিত্বের কখনো বা ইষ্টের আরোপ করে দুয়ের অভেদসত্তা অনুভব কর্‌তে হবে। তখন মনে হবে, আমিই তিনি কিম্বা তিনিই আমি। — কখনো তিনি অন্তরে কখনো তিনি বাহিরে। এই জায়গায় আগেকার মত বিবেক-জ্ঞানদ্বারা যদি ভাবকে সংস্কারের আবর্জ্জনা হতে মুক্ত করে শুদ্ধ করে নেওয়া যায়— অর্থাৎ চিত্তে উদ্বেলিত ভাবকেই concrete রূপে ধারণা করার অভ্যাস করা যায়, তা'হলে ধ্যান আরো সহজে জমে যায়।

এইটুকু হলেই ধ্যাতার চোখ খুলে যাবে। তারপর কি কর্‌তে হবে না হবে, তার নির্দ্দেশ তিনি ইষ্ট-দেবতার কাছ থেকেই পাবেন।

নিষ্কাম কর্ম্ম

গুরুগৃহেই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর। ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কেবলমাত্র গুরুর প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম তাহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের আসক্তি থাকে না। কর্ম্মের মাঝে অভিমান সঞ্চিত হইলেই মুস্কিল ; —কিন্তু গুরু গৃহে প্রত্যেক কর্ম্মের পেছনেই একটা নিরহঙ্কার ভাব থাকিয়া যায়। 'আমি' 'আমার' এই সব দুরতিক্রমণীয় বন্ধন হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি যে, এত কর্ম্ম করিয়াও যে সর্ব্বদা একটা নিস্পৃহ নির্লিপ্ততার ভাব বজায় থাকে, তাহার কারণ আর কিছুই নয় — প্রতি কাজে সমর্পণের কথাই বেশী করিয়া জাগ্রত থাকে চিত্তে।

যাহা দিয়া কার্য্য করিব--অর্থাৎ কার্য্যের উপকরণ,

কার্য্যের ক্ষেত্র, সমস্তই শ্রীগুরুর, সুতরাং তাহাতে 'আমিত্ব' বা অহং বোধ কিছুতেই জন্মিতে পারে না। সুতরাং গুরু গৃহই একমাত্র সহজ ভাবে নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধনার প্রকৃষ্ট স্থল।

এইজন্যই প্রথমেই আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা। গুরুগৃহে সৎশিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিপালন এবং অফুরন্ত উদ্যম উৎসাহ লইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান— এই ত্রিবিধ বিষয়েই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

ব্রহ্মচর্য্য সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকই তেজ, বীর্য্য, উদ্যম, উৎসাহ দেখা দেয়। কাজেই প্রাণে অফুরন্ত আনন্দের উৎস লইয়া নিরভিমান হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে আর চাই কি? জ্ঞানের চেয়ে অভ্যাস আরও বড়। মনের মাঝে আমিত্বের ছাপ একবার পড়িয়া গেলে (আর বিশেষতঃ ছোট বেলা হইতেই যদি অহং বোধ প্রবল হইয়া উঠে) পরিশেষে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। কিন্তু বয়স যখন অল্প থাকে, তখন হইতেই যদি প্রচুর উদ্যম উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে সমর্পণের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহাহইলে ভবিষ্যতে তাহাতে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

কাজ করিয়া আনন্দ পাওয়া যায়, অথচ তাহাতে অভিমান থাকে না — ইহা বড়ই উপভোগের বিষয়। শৈশবে এই সমর্পণের দীক্ষায় যাহারা দীক্ষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহারা অনায়াসে কতকগুলি ভীষণ শত্রুর হাত হইতে সহজে নিস্তার পাইয়া যায়।

পূর্ব্ব-জীবনের স্মৃতি এখনো মনে আসে। এক এক সময় ভাবি, সাংসারিক জীবন যাপনে 'অহং' এর ভাব কত প্রবল থাকে। অথচ এখন যে গুরু গৃহে জীবন যাপন করিতেছি, তাহাতে যে নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছি তাহা নয়, কিন্তু কর্ম্ম করিয়াও এইরূপ মুক্তির আনন্দের হিল্লোল পূর্ব্বে উপভোগ করিতে পারি নাই। গুরু গৃহেও কর্ম্মময় জীবন — কিন্তু এই কর্ম্মের বোঝা যেন অতি হাল্কা! আমাদের কর্ত্তব্য, কর্ম্ম করিয়া যাওয়া — কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে শ্রীগুরুই সব জানেন। আমার মনে হয়, গুরুগৃহে অতি বড় একটা চিন্তার চাপ হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাই। কর্ম্মের ফলাফল ভাবনা করিতে হয় না বলিয়াই বোধ হয় কর্ম্মের বোঝা ভারী হইলেও হাল্কাই মনে হয়। আমরা শ্রীগুরুর মহৎ কার্য্যের সেবক মাত্র—আমাদের শুভাশুভ কল্যাণ-অকল্যাণের চিন্তা শ্রীগুরুর উপরই অর্পিত, সুতরাং নিরুদ্বিগ্ন মনে আমরা কাজ করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কাজের ফল নিয়াও যাহাদের বিচার-বিবেচনা করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া কাজ করা অসম্ভব! সুতরাং কাজ করার চেয়ে কাজের চিন্তাতেই তাহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়।

প্রকৃত সেবকের আত্ম-ভাবনা মোটেই নাই। এইজন্যই সেবক দ্বারা আশাতীত কর্ম্ম হয়।

ভাল-মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণের চিন্তা অপরের উপর ন্যস্ত থাকিলে অনেকেই সন্দেহ করেন, তাহা হইলে বুঝি নিজকে জড় বনিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত সেবকের জীবনে যে বিদ্যুন্ময় বীর্য্যের সঞ্চার হয়, তাহাতে তাঁহার জীবন আলস্য-জড়ত্ব-তন্দ্রা-অবসাদ হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তি লাভ করে।

সেবক কর্ম্মের ফলাফল নিয়া বিচার করে না বটে, কিন্তু প্রতি কর্ম্মেই শ্রীগুরু স্মরণ হয় সেবকের। যাঁহাকে স্মরণ করিলে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া যায়, তাঁহার স্মরণে জড়ত্বের প্রশ্রয় পাইবে কেমন করিয়া?

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব গিরীশ ঘোষকে মুক্তি লাভের একটী অতি সহজ পন্থা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেইটী আর কিছুই নয় — 'বকলমা'। এই বকলমার

অভ্যাসে গিরীশ ঘোষ অতি সহজে নিস্তার পাইয়াছিলেন।

গুরু গৃহে এই বকল্‌মাই প্রতি কাজে কর্ম্মে অতি সহজে অভ্যস্ত হইয়া যায়। অনাসক্ত হইয়াও যে কর্ম্ম করা যায়, আর সেই কর্ম্মে উদ্যম-উৎসাহ মরিয়া যায় না, একমাত্র গুরু গৃহের কর্ম্মানুষ্ঠানেই প্রত্যক্ষ তাহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছি। এক দিকে আমরা প্রচণ্ড কর্ম্মী— কিন্তু কর্ম্মের প্রচণ্ড অভিমানের স্থান একটুকুও আমাদের মাঝে নাই।

প্রতি কাজে কর্ম্মে সমর্পণের ভাব থাকিলে কাজের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। এমনও অনেক দেখিয়াছি, যাহারা একদিকে অক্লান্ত-কর্ম্মী কিন্তু তাহাদের অভিমানেই সব পণ্ড করিয়া দিয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতেই সমর্পণে যদি জীবন গঠিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবন খুবই শান্তিপ্রদ হইয়া থাকে। একদিকে বীর্য্য সংরক্ষণ করিয়া তেজস্বী হওয়াও প্রয়োজন, আবার সেই তেজস্বিতার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী-নম্র হওয়াও প্রয়োজন। গুরু গৃহে এই উভয় প্রয়োজনই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। নিরাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিবার কৌশল গুরু গৃহ বাসেই জানা যায়, এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের পর সমাবর্ত্তন করিয়া যাহারা গৃহী হইতে ইচ্ছুক, তাহারা গৃহী হইয়াও অন্তরে মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কর্ম্মের নিষ্পেষণে তাহাদের আনন্দের দিকটা ম্লান হইয়া যাইতে পারে না।

আসক্তির মূলকে শিথিল করিয়া দিতে পারিলেই বন্ধনের কোন আশঙ্কা থাকে না। জন্মের মূল হইতেই আমিত্বের দৃঢ় বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়ি, সুতরাং এই সংস্কার ছাড়া কম কঠিন কথা নয়। দৈনন্দিন জীবনে এই আমিত্বের মূলকে সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে পরম কল্যাণের আশা সুদূর পরাহত! গুরু গৃহে প্রতি কাজে, প্রতি কর্ম্মে আমিত্বের লেশ থাকে না— কেননা তখন 'আমার' বলিয়া তো কিছু থাকে না, সর্ব্বস্ব গুরুতেই সমর্পিত হইয়া যায়। আমিত্বরূপ নিদারুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইলে গুরু গৃহে বাস করার চেয়ে কল্যাণপ্রদ পন্থা আর নাই। আমি সবই করিতেছি, সব লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছি কিন্তু আমার বলিতে কিছুই নাই।

গুরুর আশ্রমে ছোট ছোট ছেলেরা রহিয়াছে, তাহাদের মুখেও সমর্পণের কি সুন্দর কথা! বড়দের আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহারাও বেশ বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে এখানে নিজস্ব সম্পত্তি কাহারও নাই, সবই শ্রীগুরুর ধন।

সাধন জগতে উন্নত হইয়াও অনেকে এই তীব্র অহংএর কবলে পড়িয়া দিশে হারা হইয়া যায়। এমন কি অনেকে লক্ষ্য ভ্রষ্টও হইয়া পড়ে। কাজেই এই অহংএর হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে শ্রীগুরুর কাছে শরণাগতি ছাড়া আর উপায় নাই। অহঙ্কারে বুক ফুলিয়া থাকিলে ভগবানের কৃপা অনুভব করা দুষ্কর। গুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস হইলে পর ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা যায়।

কর্ম্ম ছাড়া কোন প্রাণীই তিল মাত্র সময় অবস্থান করিতে পারে না— কেননা প্রকৃতির একটা দিকে কর্ম্মের সংস্কার খুবই প্রবল। কাজেই মানুষের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকৃতিই মানুষকে কর্ম্ম করাইয়া নেয়। কর্ম্ম যখন করিতই হইবে, তখন শুভ কর্ম্ম, কুশল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত। গুরুর আদেশানুযায়ী নিষ্কামভাবে কুশল কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিলে জীবনে আর কোন ভাবনা নাই।

পরের জন্য খাটুনিতেও একটা বিশেষ তৃপ্তি রহিয়াছে। এইজন্যই নিষ্কাম-কর্ম্মীর চিত্ত নীরস শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে না। কর্ম্ম করিয়া যাঁহাকে

তাহারা তৃপ্ত করে, তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতাই নিষ্কাম কর্ম্মীর চিত্তকে সরল করিয়া তুলে।

নিষ্কাম কর্ম্মীর কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, তাহা না হইলে সাধারণ মানুষের কর্ম্মে আমিত্বের প্রভাব পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান থাকায় সম্পূর্ণ রূপে বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। আমিত্বের এই দৃঢ় সংস্কারের মূলকে শিথিল করিতে হইলে গুরুগৃহে জীবন যাপনের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। প্রথমে শ্রীগুরুকে আশ্রয় করিয়া চিত্তকে কর্ম্মের বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিলে, পরিশেষে কর্ম্ম করিয়াও বন্ধন দশায় পতিত হইতে হয় না। কৌশল পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার নামই যোগ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সঙ্কেত জানিতে হইলে শ্রীগুরুর শরণাগতি লওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা পূজাদি সেরে বাহিরে এসে মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে চারিদিকের শোভা দেখতে লাগ্‌লাম। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অমৃতকুণ্ড, ঈশান কোণে স্বচল-কুণ্ড, হংসকুণ্ড, তার দক্ষিণে পারা সংযুক্ত রেতঃকুণ্ড (উদককুণ্ড), মন্দিরের সম্মুখে সামুদ্রকুণ্ড, শিবকুণ্ড বিদ্যমান। এসময় বরফ না থাকায় আমরা সবগুলি কুণ্ডই ভালরূপে দেখলাম। এখন কুণ্ডগুলি সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি বলছি। যথা :—

প্রসিদ্ধ কুণ্ড

মদালয়াদ্দণ্ডদশকে হংসকুণ্ডমিতি স্মৃতম্।
যত্র ব্রহ্মা মহাদেবি হংসো ভূত্বা সমাগতো॥

হে দেবি! আমার স্থান হতে দশ দণ্ড অর্থাৎ ৪০ হাত দূরে হংসকুণ্ড বিদ্যমান আছে। যেখানে ব্রহ্মা হংসের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন।

রেতঃপানং তু কৃতবান্ গণৈঃ সংধর্ষিতস্তথা।
তদ্ধংসকুণ্ডমাখ্যাতং পিতৄণাং মুক্তিদায়কম্॥

ব্রহ্মা উক্ত কুণ্ডের জলপান কর্‌ছিলেন, সেই সময় শিবের গণ সকল উক্ত হংসরূপী ব্রহ্মাকে ধর্ষণ করেছিল, তাতেই হংসের শরীর ত্যাগ হয়। তা'হতেই উক্ত কুণ্ডের নাম হংসকুণ্ড হয়েছে। উক্ত কুণ্ডের জলপান কর্‌লে পিতৃগণের মুক্তি লাভ হয়। যথা :—

পিতৄণাং শ্রাদ্ধকর্ত্তারো গচ্ছেয়ুঃ পরমং পদম্।
নরকস্থাপি পিতরো জন্মজন্মসমুদ্ভবঃ॥
ত্রিশূলিনো মহাদেবাশ্চন্দ্রার্দ্ধকৃত শেখরাঃ।
বৃষস্কন্ধস্থিতাঃ সর্ব্বে ব্যালযজ্ঞোপবীতকাঃ॥
ভস্মাঙ্গরাগসহিতাঃ ক্রীড়েয়ুর্ব্বৈ ময়া সহ।
ইতি তদ্ধংসকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বরবর্ণিনি॥

এই হংসকুণ্ড তীর্থে যে ব্যক্তি পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করেন, তিনি পরমপদ লাভ করেন। যে ব্যক্তির পিতৃগণ জন্মজন্মান্তর হতে শুধু নরকেই যাইতেছে, তাহারাও ত্রিশূল তথা অর্দ্ধচন্দ্রধারী মহাদেব সদৃশ বৃষভারোহণ করতঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ করে গায়ে ভস্ম লাগিয়ে আমার সঙ্গে ক্রীড়া করে

থাকেন। হে প্রিয়ে! হংসকুণ্ডের মাহাত্ম্য বল্লাম।

রেতঃ কুণ্ড সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এইরূপ। যথা :—

দক্ষিণস্যাং শিবে দেবি রেতঃ কুণ্ডমিতি শ্রুতম্।
যৎপয়ঃপান মাত্রেণ শিব এব ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি! দক্ষিণ দিকে যে রেতঃকুণ্ড আছে, র জল পান মাত্রেই মানব শিবরূপ হয়ে যায়, এতে সন্দেহ নাই।

যেন চিহ্নেন তত্তীর্থং জায়তে শিব দায়কম্।
পারদং দশ্যতে তত্র তজ্জলং বুদ্ বুদায়তে ॥
তস্য দর্শন মাত্রেণ নরো যাতি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্দ্দেবদেবেশি তৎপানে নিতরাং শিবে ॥

যে চিহ্ন দ্বারা ঐ তীর্থ শিবদায়ক হয়ে থাকে, তাহা শুন। ঐ জলে পারা দেখা যায় এবং ঐ জল সর্ব্বদাই বুদ্ বুদাকারে ফুটিতেছে। হে দেবি! ঐ উদককুণ্ড দর্শন মাত্রেই মানব পরমাগতি লাভ করে থাকে। যারা নিত্য পান করেন, তাদের কথা কি বল্‌ব!

ঐ কুণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। —এক সময় মহাদৈত্য তারকাসুরের ভয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভীত হয়ে সাক্ষাৎ শিবের বীর্য্য দ্বারা উৎপন্ন হোক এই রকম একজন দেবতার জন্য প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন। শিবজীর বীর্য্য দ্বারা উৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে ঐ দৈত্যকে বধ কর্‌বে এইরূপ নিয়ম ছিল। শিব পুত্রোৎপাদন কর্‌তে স্বীকৃত হয়ে কেদারনাথে প্রবেশ করেন। শিব পুত্রোৎপাদন কর্‌ছেন কি না পরীক্ষার জন্য দেবতাগণ অগ্নিদেবকে শিব-পার্ব্বতীর ক্রীড়া স্থলে পাঠিয়ে দেন। সে সময় শিব পার্ব্বতীর সহিত রতিক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। অগ্নিদেবের আগমনে শিব-পার্ব্বতী লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। তখন শিব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে নিজের যে বীর্য্য

রেতঃ কুণ্ডের উৎপত্তির বিবরণ

বাহিরে পতিত হয়েছিল, সেই বীর্য্য খানিকটা হাতে ধরে অগ্নিদেবের মুখে ছুড়ে দেন। বাকী যে টুকু বীর্য্য কেদার ক্ষেত্রে পতিত হয়, সেইখানে শিব কলির জীবগণের মুক্তি লাভের জন্য এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন; যাতে ঐ বীর্য্য এক জায়গাতেই স্থির থাকে, সেই উদ্দেশেই ঐ কুণ্ড তৈরী করেন। উক্ত রেতঃকুণ্ডকে উদককুণ্ডও বলে থাকে। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে— পারা শিবের বীর্য্য, তাই কি রেতঃ কুণ্ডে পারা বিদ্যমান? ...... !

মন্দাকিন্যাস্তু সুতটে তীর্থানি শৃণু পার্ব্বতি।
তস্মাদেব মহাতীর্থাদধোদেশে শুভপ্রদম্ ॥
শিবকুণ্ডমিতিখ্যাতং শিব লোক প্রদায়কম্।
যত্রোপোষ্য সপ্তরাত্রং প্রাণাম্বৈ সংত্যজেদধঃ।
শিবসাযুজ্যতামেতি যতো ধারা বিনিঃসৃতা।
তবর্দ্ধং ভৃগুতুঙ্গং বৈ পাপিনামপি মুক্তিদম্ ॥

হে পার্ব্বতি! মন্দকিনীর তটে যে সব তীর্থ আছে, তাহা শ্রবণ কর। মহাতীর্থের (কেদার নাথের) নিম্ন ভাগেও অনেক তীর্থ আছে। ঐ সব তীর্থের মধ্যে **শিবকুণ্ড** নামক একটি তীর্থ আছে; সেখানে যে কোন লোক সাতরাত্রি ব্রত করে প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন। যেখান হতে জলের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, সেখানে ভৃগুতুঙ্গ নামক তীর্থ বিদ্যমান। উক্ত তীর্থ পাপীদের মুক্তিদান করে থাকে, এমন কি :—

গোঘ্নঃ কৃতঘ্নো বিপ্রঘ্নো যোঽপি বিশ্বাসঘাতকঃ।
শ্রীশিলায়াং তপেদ্যস্তু ভৃগুতুঙ্গমহোন্নতান্ ॥
প্রাণাং ত্যজতি দেবেশি স পরব্রহ্মতামিয়াৎ ॥

গোঘাতী, কৃতঘ্ন, বিপ্রঘাতী, বিশ্বাসঘাতীও পবিত্র হয়ে থাকে। শ্রীশিলাতে ভৃগুতুঙ্গ মহোন্নত আছে, যে ব্যক্তি ঐখানে প্রাণত্যাগ করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মলোক লাভ করে থাকে।

* * *

কেদারনাথের মন্দির হতে চার মাইল দূরে **ভৈরবঝম্প** নামে একটি খোলা আছে।

অনেক সাধু সন্ন্যাসী মুক্তি লাভের আশায় সেই ঝোলা হতে ঝম্প প্রদান করতঃ দেহত্যাগ করে থাকেন। আজকাল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ দুক্রিয়া বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ স্থান হতে দেহত্যাগ করলে যে মুক্তি লাভ হয়, তা শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে। যথাঃ—

মৃতো যত্র মহাদেবি শিব এব ন সংশয়ঃ।
ধন্যাস্তে পুরুষা লোকে পুণ্যাত্মানো মহেশ্বরি ॥

হে মহাদেবি! কেদার স্থানে যাত্রী মরলে পর নিঃসন্দেহে শিব হয়ে যায়, হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি ঐরূপ পুণ্যস্থানে শরীর ত্যাগ করেন তাঁকে পুণ্যাত্মা বলে জানবে।

মহাপথং গমিষ্যামি প্রাণাং স্ত্যক্ষ্যামি তত্র বৈ।
সোঽপি মে দেবদেবেশি প্রিয়াৎপ্রিয়তরোঽস্তি বৈ ॥

যে ব্যক্তি মহাপথে (স্বর্গারোহণ শিখরে যাবার রাস্তা-পঞ্চপাণ্ডবগণ যে পথে স্বর্গারোহণ করেছিলেন) যেয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করব এইরূপ সঙ্কল্প করে, হে দেবদেবেশি! সে ব্যক্তি আমার প্রিয় হতেও প্রিয় জেনো।

উপরোক্ত কারণেই হোক অথবা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হবার পরই হোক, অনেক সাধু যেয়ে ঐস্থানে দেহত্যাগ করতেন। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি না হলে বা সদ্‌গুরুর কৃপা না হলে কেউই সদ্‌গুরুর শিষ্য হতে পারে না। সুতরাং যাঁরা একবার সদ্‌গুরুর শিষ্য হতেন, তাঁরা যাতে আর কর্ম্মফল বাড়াতে না হয় এই উদ্দেশ্যেই ভৈরব ঝম্পে উপনীত হয়ে দেহত্যাগ করতেন। বাস্তবিক পক্ষে যে মুহূর্ত্তে পাপী তাপী সংসার জর্জ্জরিত ব্যক্তি সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করে, সেই মুহূর্ত্তেই সদ্‌গুরু তার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে শিষ্যকে মুক্ত করে দেন। যারা মহাভাগ্যবান্ তারাই মাত্র সদ্‌গুরুর এই অনুকম্পা বুঝতে পারে। কিন্তু যে সব ব্যক্তি সদ্‌গুরুর কৃপায় তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেও ঐরূপ সদ্‌গুরুর মহিমা বুঝতে অক্ষম, তাদের মধ্যে অনেকে পুনরায় পাপ তাপের ভয়ে উপরোক্ত ভাবে ভৈরব-ঝম্প হতে দেহত্যাগ করার সংকল্প করে থাকেন। আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস, যে মুহূর্ত্তে মানব সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় লাভ করে সেই মুহূর্ত্ত হতেই সে সদ্‌গুরুরূপী ভগবানের আশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় পাবার পর সে ব্যক্তি পরে যা' কিছুই করুক না কেন, তিন জন্মের ভিতর তার মুক্তি অনিবার্য্য। ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলতেন "ঢোঁড়া সাপ কামড়ালে সাপেরও কষ্ট দংশিত ব্যক্তিরও কষ্ট, কিন্তু জাত সাপ কামড়ালে তিন ডাকেই ফর্সা।" মহর্ষি বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবন চরিতে পেয়েছি, তিনিও বলেছেন "মানব সদ্‌গুরুর শিষ্য হলেই তিন জন্মে সে মুক্তি লাভ করে থাকে।" একবার আমার জন্মভূমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণতলে উপনীত হয়ে একজন নিষ্ঠাবান মাষ্টার (তিনি রামদাস কাঠিয়া বাবার শিষ্য সন্তদাস বাবার ভক্ত) ঠাকুরকে ঠিক ঐ প্রশ্নই করেছিলেন, তাতে ঠাকুরও তারই অনুমোদন করে-ছিলেন। সুতরাং প্রত্যেক মহাপুরুষেরই একই বাণী দেখা যায়। সদ্‌গুরুর শিষ্য সম্বন্ধে ঐ তিন জন্মই বা ভোগ কেন, এটী বিচার করে দেখতে হবে।

(ক্রমশঃ)

—:•:—

বন্যার্ত্ত সাহায্য

—(:*:)—

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ	২৫৲
মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম	১০৲
পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম	৫৲
জলপাইগুড়ি সারস্বত আশ্রম	৩৲
শ্রীযুক্ত বিহারী মোহন শর্ম্মা, শ্রীহট্ট	২৲
,, গগন চন্দ্র দেব ,,	৩৲
,, মণীন্দ্র নাথ ভুঞা, মেদিনীপুর	১৲
,, কৃষ্ণ গোপাল মুখার্জ্জী, বালেশ্বর-সংগৃহীত	৮৶০

(বিতং— শ্রীহরপ্রসাদ সাঁত ১৲
শ্রীমতিলাল পাল ১৲ শ্রীনলিনী ঘোষ ১৲
শ্রীশিব শঙ্কর রায় ১৲ শ্রীবেনারসী মহাশেঠ ১৲
শ্রীজয়রাম শিবাজী ১৲ শ্রীকৃষ্ণগোপাল মুখার্জ্জী ১৲
মিঃ বিশ্বনাথ, এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ১৲
শ্রী জ্ঞান বাগচী ॥০ শ্রী নিবারণ রায় ।০)

শ্রীযুক্ত রাধানাথ দে, কুমিল্লা	২৲
,, যতীন্দ্র নাথ বানার্জ্জী, মানভূম	২৲
,, রমেশ চন্দ্র দে, সিংভূম	।৵০
,, পীতাম্বর দে সিংভূম	।০
,, ইন্দ্রপীত দে, ,,	৵০
,, হরে কৃষ্ণ সেন, মেদিনীপুর	।৵০
,, হিমাংশু, বেনারস সিটি	১০৲
,, নগেন্দ্র নাথ রায়, ময়মনসিংহ	১০৲
,, সচ্চিদানন্দ ভোল, সিংভূম	৫৲
,, ভুবনচন্দ্র পাল ,,	১৲
,, নরেশ চন্দ্র দে	৩৲
শ্রীমৎ ভুবন ব্রহ্মচারী	২৲
জনৈক সেবক	৶০

সর্ব্বমোট ৯৪॥৵০

সংবাদ ও মন্তব্য

সঙ্ঘবার্ত্তা

বিগত ১০ই, ১১ই ও ১২ই পৌষ এই দিবসত্রয় হালিসহর দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত অশ্রমে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠানুষ্ঠিত ভক্ত সম্মিলনীর ১৭শ বার্ষিক অধিবেশন যথা নিয়মে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ তাহার বিবরণ অন্যত্র পাঠ করুন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ এই কয়দিন সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর পরই তিনি পুরীধাম রওনা হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুদিন সেইস্থানেই তাঁহার অবস্থিতি করিবার কথা।

নিবেদন

মঠের আসন গৃহ ও দরবার গৃহ সংস্কারোদ্দেশ্যে যাঁহারা সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, অথবা এই উদ্দেশ্যে যাঁহারা যাহা কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ, তাঁহারা যেন যথা সময়ে এবং যত সত্বর সম্ভব তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের নামে "নীলাচল কুটীর" স্বর্গদ্বার— পুরী— এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মঠটীই সঙ্ঘের কর্ম্ম সাধনার কেন্দ্রস্বরূপ। অতএব ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা করা সঙ্ঘস্থিত ভক্ত মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দির

গত ইং ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহোদয় জেলা নদীয়ার মেহেরপুর মহকুমা হইতে ৬ মাইল দূরে কাথুলি গ্রামে কুতবপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দির নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবৎকৃপায় স্কুলটী এই অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নৈতিক চরিত্রবান হইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞান ও অন্যান্য শিল্প বিদ্যা অর্জ্জন করতঃ ব্যবহারিক জীবনের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে, এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইহাই অন্যতম উদ্দেশ্য এবং সেই জন্য বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রায় একশত ত্রিশ বিঘা জমিতে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য আয়োজন চলিতেছে। আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতিও কিছু কিছু সংগ্রহ করা হইতেছে।

যে সমস্ত শিক্ষক মহাশয়দিগের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদিগের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা অনেকেই প্রতিষ্ঠাতার ভক্ত ও শিষ্য তাঁহারা প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠানটী একটী আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে, তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে আপাততঃ পাঁচজন বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট আছেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বর্ত্তমানে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষার জন্য যে নূতন সিলেবাস প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তদনুসারে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যা ও ভূগোল শিক্ষার উপযোগী যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আবশ্যক হইবে, তাহা এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলতঃ ছাত্রদিগের শিক্ষা বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতার ও স্কুলের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিশেষ লক্ষ্য আছে। বিদেশী ছাত্রদিগের অবস্থানের জন্য সুবৃহৎ পাকা ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাত্রদিগের আহারের ব্যয় যথাসম্ভব কম অর্থাৎ মাসিক সাড়ে পাঁচ টাকা হারে ধার্য্য করা হইয়াছে। স্কুলের বেতনের হারও যথাসম্ভব কম করা হইয়াছে। বিদেশী শিক্ষক মহাশয়েরা সকলেই বোর্ডিংএ অবস্থান করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ছাত্রদিগের পড়াশুনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন

যাহাতে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে, সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আছে। ছাত্রদিগের পানীয় জলের জন্য একটী সুন্দর "টিউব ওয়েল" বসান হইয়াছে। স্কুল কমিটীর মধ্যে জনৈক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, ছাত্রদিগের প্রয়োজন মত তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ের অন্য কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। ইতি—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন, এম, এ,

হেড মাষ্টার।

কাথুলি পোঃ, জেলা নদীয়া

ভক্ত-সম্মিলনী

সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৩৮

স্থান—দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গত ১০ই পৌষ শনিবার হইতে ১২ই পৌষ সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে (হালিসহর) ভক্তসম্মিলনীর সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন যথা নিয়মে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সবজজ্, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতে এমন কি সুদূর বিহার উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশ হইতেও ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। সম্মিলিত ভক্ত সংখ্যা অন্যূন আড়াই শত হইবে। গত বৎসরের অপেক্ষা এবার মহিলা ভক্তদিগের সংখ্যা অল্প হইয়াছিল।

প্রথম দিবস—বন্দনাগীত ও স্তোত্র পাঠান্তে বেলা ৯॥০ টার সময় সভার উদ্বোধন হয়। সমবেত ভক্ত বৃন্দের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ ভক্তসম্মিলনার উদ্দেশ্য বিশদ ভাবে বিবৃত করেন। আলোচ্য বৎসরে যে সকল গুরু ভ্রাতা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল কামনায় নির্দ্দিষ্ট কাল নিবিষ্ট চিত্তে 'জয়গুরু' মহামন্ত্র জপ করা হয়। অতঃপর তত্ত্বাবধায়িকা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল মহাশয় গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অনন্তর আগামী বর্ষের জন্য প্রয়োজন মত নূতন সদস্যাদি নির্ব্বাচনান্তে মঠ ও আশ্রমগুলির আয় ব্যয় প্রদর্শিত হইয়া সেবক ও সদস্যগণের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যথাযোগ্য মন্তব্য গৃহীত হওয়ার পর বেলা ১॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস—বেলা ২টার সময় আশ্রম প্রাঙ্গণে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ ও প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল সারস্বত মঠের

উদ্দেশ্য ও মঠ আশ্রম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস বি, এল মহাশয় ১৪শ বার্ষিক অধিবেশনের সাধারণ সভায় পঠিত "আমাদের কথা" অবলম্বনে উহা বিশদীকৃত করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ ভাদুড়ী বি, এ মঠের কার্য্য প্রণালী ও শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার পর শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র বি, এল মহাশয় বর্ত্তমানের শিক্ষা সমস্যা ও তাহার সমাধান কল্পে সারস্বত মঠ কি করিতে চান তাহা অতি প্রাঞ্জল ও আবেগময়ী ভাষায় ব্যক্ত করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তাদের বক্তৃতার সমর্থন করিয়া মঠের কার্য্য প্রণালীর প্রশংসা সূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন। সর্ব্বশেষে সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া ঋষি শাস্ত্র হইতে বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্রমের কার্য্যপ্রণালীকে অভিনন্দিত করিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সন্ধ্যা ৫॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত জনমণ্ডলী শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে প্রণাম ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে সভাস্থান পরিত্যাগ করেন।

এই দিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমবেত মহিলাবৃন্দের একটি সভার অধিবেশন হয়।

তৃতীয় দিবস—যথা নিয়মে প্রার্থনা সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠান্তে বেলা ১০॥টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ অনুপস্থিত সদস্য ও ভক্তগণের পত্র পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ (১) আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন (২) সঙ্ঘ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও (৩) ভাববিনিময় এই তিনটী প্রধান বিষয় অবলম্বন করিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দকে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করেন। আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন প্রসঙ্গে ভক্তদের মধ্যে নানা প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ অতি সরল ভাবে সে সবও মীমাংসা করিয়া দেন। পরে ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর অভিবাদন ও আলিঙ্গনান্তে বেলা ৩টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবার সম্মিলনীতে অধিকতর আনন্দের বিকাশ হইয়াছিল, ইহাতে সমবেত ভক্তবৃন্দ বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই কয়দিন উপস্থিত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সম্মিলনীর সমুদয় ব্যয় ভার সমাগত ভক্তমণ্ডলীই বহন করিয়াছেন। আগামী বর্ষে **পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে** (খড়কুসুমা, মেদিনীপুর) সম্মিলনীর ১৮শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

অভিভাষণ

[ভক্তসম্মিলনীর সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, দ্বারা পঠিত]

মাতৃস্থানীয়া মহিলাগণ ও প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ,

আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন—কেবল ভক্ত সম্মিলনী বলিয়া নহে, আমরা ঠাকুরকে আজ ভিন্নরূপে, ভিন্নভাবে ও ভিন্ন আসনে পাইয়াছি। এই শুভ দিন যিনি হারাইলেন তাঁহার পক্ষে এরূপ দিন আবার কবে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই।

আজ শুভদিনে শুভক্ষণে আপনারা শ্রীগুরুর চরণতলে সমবেত হইয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া ধন্য হইয়াছেন। অদ্যকার সম্মিলনীটী সপ্তদশ বার্ষিক সম্মিলনী, অর্থাৎ পূর্ব্বে ১৬ বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসর একটী একটী করিয়া সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। যখন সর্ব্বপ্রথম ভক্তসম্মিলনী হয়, তখন অবশ্যই উহা কোকিলামুখ মঠে হইয়াছিল এবং পরে কয়েক বৎসর ঐ স্থানেই সম্মিলনী হইয়াছিল। এবং শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজকে প্রায়শঃ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্য লইয়াই অধিবেশন করিতে হইত। সুদূর আসাম বলিয়াই হউক কিম্বা ঐ স্থান যাতায়াতের পক্ষে তত সুগম নহে—সেইজন্যই হউক, গৃহস্থ ভক্ত শিষ্য কোকিলামুখ মঠের সম্মিলনীতে অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতে পারিতেন না। ইহাতে ঠাকুরের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সাধিত হওয়ার পক্ষে সম্ভাবনা অনিশ্চিত ছিল। এজন্য আমাদের ঠাকুর ক্রমশঃ বঙ্গের পাঁচ বিভাগে পাঁচটী আশ্রম স্থাপিত করেন এবং বর্ত্তমানে গৃহস্থ ভক্ত ও শিষ্যও অধিক সংখ্যায় সম্মিলনীতে যোগদান করেন। এই পাঁচটী আশ্রমের মধ্যে হালিসহরে অবস্থিত "দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম" অন্যতম। এই উপলক্ষে হালিসহর গ্রাম বা নগর সম্বন্ধে আপনাদের কিছু জানা আবশ্যক। হালিসহর এক কালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাচীন নগর ছিল। ইহা ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের চারিশতাধিক টোল ছিল ও অনেক ছাত্র বিনা ব্যয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। Beeton's Geographical Dictionary of ancient cities নামক পুস্তকে লিখিত আছে—Halisahar is famous for Sanskrit Colleges. College অর্থ টোল। এই স্থানই সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেনের জন্মভূমি। পতিত পাবন মহাপ্রভু এই স্থানেই তদীয় গুরু ভগবান ঈশ্বর পুরীর গৃহে আগমন করতঃ হালিসহরের প্রত্যেক ধূলিকণা পবিত্র করিয়াছিলেন। এই আশ্রমতলস্থ বাঁধাঘাট ধৌত করিয়া ভাগীরথী তখন খরস্রোতে প্রবাহিতা ছিলেন। কত মহাজনী নৌকা এই ঘাটেই বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিত। এখন আর হালিসহরের সে শ্রী নাই। একটু গ্রামের মধ্যে যাইলে দেখিতে পাইবেন যে কত অট্টালিকা সদৃশ বড় বড় বাড়ী জনশূন্য অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পতিত রহিয়াছে। পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে ধ্বংসোন্মুখ হালিসহরকে অভিশপ্ত

নগর না বলিয়া থাকা যায় না। ঠাকুর মহারাজ যখন এই অভিশপ্ত স্থানে আশ্রম স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন কে নাকি বলিয়াছিল যে এখানে আশ্রম না করাই মঙ্গল। ঠাকুর তখন বলিয়াছিলেন যে "পতিত স্থানের উপরই আমার নজর অধিক।" ইহাতে আশা করা যায় যে হালিসহর আবার উন্নত হইবে।

যাহা হউক বর্ত্তমানে হালিসহর নিতান্ত দরিদ্র, আশ্রমটীও ততোধিক। ইহার ভক্তসংখ্যা অন্যান্য আশ্রমের তুলনায় অত্যল্প এবং আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ভক্তগণের আর্থিক অবস্থাও নিতান্ত অনুন্নত। এমন কি সময়ে সময়ে আশ্রম পরিচালনার কার্য্যই দুরূহ হয়। এরূপ দরিদ্র আশ্রমের উপর আপনাদের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিবার ভার পতিত হইয়াছে। আপনারা বহুদূর হইতে কত কষ্ট কত ক্লেশ সহ্য করিয়া, কত অসুবিধা ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, আমরা সে কষ্ট—অসুবিধা দূর করিতে পারিতেছি না। আমাদের পদে পদে ত্রুটি হইতেছে। আমি আশ্রমের পক্ষ হইতে আমাদের ত্রুটির জন্য আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা কি ক্ষমা করিবেন না? আশা আছে আপনারা ক্ষমা করিবেন। কারণ আপনারা যাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি আপনাদের মাতা, যিনি আপনাদের বন্ধু, যিনি আপনাদের সখা, যিনি আপনাদের বিদ্যা, যিনি আপনাদের অর্থ, যিনি আপনাদের সর্ব্বসর্ব্ব, তিনি যখন স্বয়ং এখানে উপস্থিত, তখন আমাদের ত্রুটি নিশ্চয়ই ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইবে না। আপনাদের সকল কষ্ট সার্থক হইয়াছে। গত বৎসর আমি সম্মিলনী আহ্বান করিয়াছিলাম, আজ আবার আমিই আপনাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। এখন ভাই সকল, তোমরা শ্রীগুরু বন্দনা কর ও প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হও। একবার সকলে বল—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি



আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও শাখা আশ্রমগুলির বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

(সন ১৩৩৭ পৌষ হইতে ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত)

আয়			ব্যয়		
শ্রীশ্রীগুরুধাম ও আসাম বঙ্গীয়					৫৫৮৪।৴১২॥
সারস্বত মঠ—		৬২৪৩৸৴৫	শ্রীশ্রীগুরুধামের	৪২৫॥৵২॥	
শ্রীশ্রীগুরুধামের	৪০১৸১০		**সারস্বত মঠের**		
সারস্বত মঠের	২৫০॥৶		ভরণপোষণে	৬৮০।৶১৫	
কৃষি বিভাগের	১৪৪৭৴০		প্রচার বিভাগে	২০৩৮৴০	
প্রচার বিভাগের	৩৫২০॥৴০		সেবা বিভাগে	৬১৮॥৶১৫	
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৬২৩॥৶১৫		শিক্ষা বিভাগে	৪০৲	
সাধারণের সাহায্য	০		কৃষি বিভাগে	১৪৪২।৵৫	
			বিবিধ বিভাগে	৩৩৯৲১৫	
মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		২১৯৮॥৶৫			১৪৪০॥৵১৫
আশ্রমের আয়	১৪৭২॥৶৫				
সাধারণের সাহায্য	৭২৬৲				
উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		৭৬৬॥০			৬২২৲
আশ্রমের আয়	৬১৮৸৵০				
সাধারণের সাহায্য	১৪৭॥৵০				
ঐ জোরপাকড়ীর শাখা আশ্রম		৪১৩।৴১৫			৩৪০৸৴১৫
আশ্রমের আয়	৩৮২॥৶১৫				
সাধারণের সাহায্য	৩০॥৵০				
পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		১০০৬৸৴১৫			১৪৫১৶০
আশ্রমের আয়	৯৯১৸৴১৫				
সাধারণের সাহায্য	১৫৲				
দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		৪৬৫।৵৫			৪৭৪।৵২॥
আশ্রমের আয়	৪৫২।৫				
সাধারণের সাহায্য	১৩৵০				
পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		৭৪১৸৴১২॥			৯১১৴১২॥
আশ্রমের আয়	৬৯৩।৭॥				
সাধারণের সাহায্য	৪৮॥৴৫				
মোট আয়	১১৮৩৬।৶১৭॥		**মোট ব্যয়**		১০৮২৪॥১৭॥

মন্তব্য ঃ— আলোচ্য বর্ষে সারস্বত মঠ ও তদন্তর্গত শাখা আশ্রমগুলিতে সর্ব্বমোট ১০৮২৪॥১৭॥ ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণের সাহায্য ৯৮০৸৶৫ বাদে বাকী ৯৮৪৩॥৴১২॥ মঠ ও আশ্রম সমূহের আয় হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্মিলনীর চিঠি

প্রিয়—, শেষ রাত্রে সম্মিলনী থেকে ফিরে এসেছি। বয়ে নিয়ে এসেছি হৃদয় ভরা আনন্দ আর পরস্পর সম্মিলনের অমৃতময় স্মৃতি। যিনি আমাদের আপনার হতেও আপনার, তাঁর শ্রীচরণ দর্শনে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় সার্থক হয়েছে, তাঁর শ্রীচরণস্পর্শে স্পর্শেন্দ্রিয় কৃতার্থ হয়েছে, তাঁর অমৃত-বাণী শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় ধন্য হয়েছে, আর যাঁরা আমাদের সহযাত্রী—সতীর্থ, তাঁহাদের সঙ্গলাভে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের হিল্লোলে হৃদয় ভরে উঠেছে। এই আনন্দ-রস-প্লাবিত হৃদয়ও জানি না কেন আজ কী এক ব্যথায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, সম্মিলনীর আনন্দ মাখান স্মৃতি জাগরিত হয়ে যুগপৎ আমায় আনন্দ নিরানন্দে অভিভূত করে ফেল্‌ছে। মনে হচ্ছে—এ মিলন যদি চিরন্তন হ'ত, এ আনন্দের মেলা যদি না ভাঙ্‌তো—!

মনে করে ছিলাম তুমি আস্‌বে। তাই ক'দিন ধরে তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম এক সঙ্গে যাব ব'লে। এলেনা, ভাব্‌লাম জায়গা মতই দেখা পাব, কিন্তু আমার সে আশাও ফল্‌ল না, শুন্‌লাম তুমি আস নি, আর আস্‌বেও না।

সম্মিলনী আসার জন্যে যে তোমার কত বড় আগ্রহ তাতো আমার অজানা নেই, সম্মিলনীতে এসে কল্‌কাতা হয়ে যাবে এ planও আগে থেকেই করে রেখে ছিলে, কাজেই তোমার আসা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্তই ছিলাম, হঠাৎ না আসার কারণ তো বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না।

আমাদের সকলের মাঝেই ব্রহ্মানুভূতি রয়েছে। ব্রহ্ম এক ছিলেন, আপন আনন্দে আপনি বিভোর ছিলেন, কিন্তু এ আনন্দ একা ভোগ করে পরিতৃপ্ত হতে পার্‌লেন না বলেই বহুর মাঝে তা সঞ্চারিত কর্‌বার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লেন। এই ব্যাকুলতাই স্পন্দন, আর স্পন্দনেই সৃষ্টি; তিনি বহুরূপী হলেন। আজ আমার মাঝেও যে আনন্দের স্রোত বয়ে চল্‌ছে, তোমাকেও তার ভাগী না করে তো তৃপ্তি পাচ্ছি না ভাই! তাই কালির আঁচড় টেনে তার কিছুটা অংশ তোমার কাছে ব্যক্ত কর্‌বার প্রয়াস পাচ্ছি, হয়তো তোমার না আসার ক্ষোভ এতে কিছু পরিমাণেও মিটতে পারে।

তুমি হালিসহর দেখ নি, কি সুন্দর সে যায়গা! গঙ্গার ঠিক ওপরেই আশ্রম, যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী দিয়ে আঁকা পত্রপুষ্পশোভিত নিভৃত তপোবনের আলেখ্য! মন্দিরটীর নির্ম্মাণ কার্য্য সবেমাত্র শেষ হয়েছে, আর সম্মিলনীর দু'দিন পূর্ব্বে তাতে আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের কোন জায়গায় মন্দির এমন সুন্দর হয় নি। মন্দিরটীর অবস্থিতি স্থানটীও বড় চমৎকার! সম্মুখ দিয়ে পতিত পাবনী ভাগীরথী গঙ্গা আশ্রম পাদমূল ধৌত করে বয়ে যাচ্ছেন, আর পেছনে রয়েছে তার অট্টালিকার ভগ্নস্তূপের সাথে বিজড়িত পুরাতন যুগের কত গৌরব ময় স্মৃতি! এই সুপ্রাচীন কুমার হট্টের অতীত কাহিনী শুনে মনটাও যেন কোন্ সুদূর অতীতের সন্ধানে অন্তরের

অন্তরতম প্রদেশে তলিয়ে গেল। শুনলাম এই কুমারহট্ট একদিন চারিশতাধিক চতুষ্পাঠী বক্ষে ধারণ ক'রে সংস্কৃত বিদ্যার মহাপীঠরূপে বর্ত্তমান ছিল, প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন/ তাঁর শ্রীগুরু শ্রীমৎ ঈশ্বর পুরীর দর্শনোদ্দেশ্যে এসে এর প্রতি ধূলিকণা পবিত্র করেছিলেন। এই কুমারহট্টই সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের জন্মভূমি। শাক্ত বৈষ্ণবের এই মহাসম্মিলন ক্ষেত্রে আজ আবার বুঝি জ্ঞান প্রেমের ধারা একত্র হল, শ্মশানের বুকে সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল।

৯ই পৌষ—বেলা ৩টার সময় আশ্রমে পৌছে দেখি সকল আশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা সমবেত হয়েছেন, প্রায় শতাধিক ভক্তেরও সমাগম হয়েছ। আর একটু পরেই ঠাকুর আস্‌বেন, সকলেই তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চেয়ে আছেন, সকলেই উদ্‌গ্রীব। ৪ টার সময় ঠাকুর এসে পৌছালেন। আসন ঘরের পেছনের বারান্দায়, তাঁর আসন দেওয়া হয়েছিল, তিনি আসন গ্রহণ কর্‌তেই সমবেত সেবক-ভক্ত সকলে তাঁর পদধূলি নিয়ে তাঁর চার পাশ ঘিরে দাঁড়াল। ঠাকুর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তুই কখন্ এলি, তুই কখন্ এলি।"

আমাকেও জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তুই কখন এলি?"

আমি বল্‌লাম—'এই মাত্র।'

তিনি বল্‌লেন—"Weekend return মিলেছে?"

আমি বল্‌লাম—"হাঁ মিলেছে, আমরা ওদিক থেকে যারা এসেছি, সকলেই weekend করে এসেছি।"

ঠাকুর বল্‌লেন—"তোদের উত্তর বাংলারই weekend এর সুবিধে হ'ল, আর কেউ এ সুবিধা পাবে না।"

আমি বল্‌লাম—"বাঙ্গালার যে কোন স্থান থেকেই হোক্ না কেন, সুধু সম্মিলনী ছাড়া যদি আর কিছু অর্থাৎ কল্‌কাতা ইত্যাদি দেখ্‌বার সখ না থাকে, তা হলে সকলেই এর সুবিধা ভোগ কর্‌তে পার্‌বে নিশ্চয়ই।"

ঠাকুর বল্‌লেন—"তা এতদূর এসে কি কেউ কল্‌কাতা না দেখে যাবে মনে করেছিস্?"

এখানে একটা কথা বলে রাখি, আর্য্য-দর্পণে সম্মিলনীর দিন পরিবর্ত্তন জ্ঞাপন, weekend return এর সুবিধা বিজ্ঞাপন এর মূলে আমি, তাই ঠাকুর প্রথমেই আমাকে weekend এর কথা জিজ্ঞেস্ করলেন—ঠিক true to the point আছি কি না তা জান্‌বার জন্যে।

যাক্—নৈহাটী ষ্টেশনে নেমেই শুনতে পেয়েছিলাম, ঠাকুর কল্‌কাতায় এসেছেন, তাঁর শরীর খুব খারাপ, কথা বল্‌তেও কষ্ট হয়। এখানে এসে কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়ে দিলেন যে তাতে মনে করতেই পারলাম না তাঁর শরীর অসুস্থ। ভক্ত সমাগমে তাঁর যে আনন্দ উথ্‌লে উঠেছিল, তাতেই যেন সব যন্ত্রণা তলিয়ে দিল।

সন্ধ্যা হল, আরতির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, কাঁসর ঘণ্টা খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভক্তবৃন্দের আনন্দ ধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। আরতির পর যুক্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের পর যুক্ত করে স্তোত্র পাঠ। নৈশ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেই আরতি-কীর্ত্তন-স্তোত্রের সুরলহরী না জানি গঙ্গার লহর মালার সঙ্গে মিশে কোন্ সুদূরে ভেসে গিয়েছিল।

কাল সকাল ৭টাতেই সভা আরম্ভ হবে। তাতে আশ্রম মঠের হিসাব নিকাশ দাখিল কর্‌তে হবে। তিনজনে সে সমস্ত ঠিক কর্‌বার জন্যে বসেছি, কিছুদূর পর্য্যন্ত করাও হয়েছে, এমন সময় পাগ্‌লা গারদের পাগ্‌লা ঘণ্টার মত একটা দীর্ঘরাবী ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টার আওয়াজ সু-উচ্চ কিন্তু বড়ই মধুর।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চল্‌লেও কানে তা কঠোর লাগ্‌বে না, এমনি মিষ্টি তার সুর! জান্‌তে পারলাম এ হচ্ছে খাবারের ঘণ্টা। আশ্রমের সম্মুখেই একটী প্রকাণ্ড বেল গাছ। তারই মাথায় ঝুলান রয়েছে এক প্রকাণ্ড ঘণ্টা, আর তা থেকে নীচ পর্য্যন্ত সংযোগ রাখা হয়েছে একটা প্রকাণ্ড দড়ীর। যখনি দরকার হয়, ঐ দড়ি ধরে টান্‌লেই ঘণ্টা বেজে ওঠে। ভক্তদের দূরে দূরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজন হলে প্রত্যেকের বাসায় গিয়ে তাঁদের ডেকে আনা একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কোন কারণেই হোক্ ঘণ্টা বেজে উঠলে আর কেউ ঘরে থাক্‌তে পারবে না, সকলকেই আশ্রম-প্রাঙ্গণে এসে জুটতে হবে, এ সঙ্কেত নাকি পূর্ব্ব হতেই দেওয়া ছিল। আঙ্গিনায় এসে আমরা এর সত্যতা প্রত্যক্ষ কর্‌লাম। আমাদের আস্‌তে একটু দেরী হয়েছিল, এসে দেখি শূন্য পূর্ণ হয়েছে, আঙ্গিনা জুড়ে পাতা পড়ে গিয়েছে। বেশ সুন্দর ব্যবস্থা কিন্তু!

দু'দিন ধরে রাত্রি জাগরণ। ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে ছিলাম। হঠাৎ শুনি ভোর কীর্ত্তন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আর তার সুর কাণের ভেতর প্রবেশ করে আস্তে আস্তে একটু ক'রে চেতনার সঞ্চার করে দিচ্ছে। যখন সম্পূর্ণ চেতনা পেলাম, দেখি তখন স্তোত্র-কীর্ত্তন শেষ হয়ে গিয়েছে, ঊষার আলো ধীরে ধীরে ধরণীর বুকে নেমে আস্‌ছে।

* * *

আজ ১০ই পৌষ, সম্মিলনীর প্রথম দিন। সকাল সকাল সম্মিলনীর কাজ আরম্ভ হবে। সকলেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনে ব্যস্ত। সুবিস্তীর্ণ গঙ্গার তটভূমি জনাকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অত বড় শীতের মধ্যে দেখি অতি বড় বৃদ্ধও গঙ্গা-স্তোত্র পড়্‌তে পড়্‌তে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছেন। সম্মিলনীর আনন্দ যেন তাঁদের বৃদ্ধত্বের অভিনয়কে দূরে ঠেলে দিয়ে তাঁদের নব যৌবনে দান করেছে।

পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আশ্রমাঙ্গন পূর্ণ হয়ে গেল। কাল সন্ধ্যায় যে ভক্ত সংখ্যা দেখে ছিলাম, আজ দেখি তার দু'গুণেরও ওপর। কালকার ভক্ত সংখ্যা দেখে ভেবে ছিলাম, এবার আর বেশী ভক্ত সমাগম হবে না, এই দারুণ অর্থকৃচ্ছতার দিনে সমর্থ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এখানে আসবে না। আজ আমার সে ধারণা ভেঙ্গে গেল। বুঝলাম প্রাণের টান থাক্‌লে অর্থাভাব প্রভৃতি কারণ কোন রকমেই শুভ সম্মিলনের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। অর্থের জয় নয়, জয় হচ্ছে প্রাণের ঐকান্তিক আকুলতার।

মনে বোধ হয়, আমাদের সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি পদে এতদিন শঙ্কর-গৌরাঙ্গকেই বসিয়ে আসা হয়েছে, আর ঠাকুর তাঁদের প্রতিনিধি স্বরূপে সভার কাজ নির্ব্বাহ করে এসেছেন। এবারেও তদনুযায়ী শঙ্কর গৌরাঙ্গের আসন পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের প্রতিকৃতি সে আসনে বসান হয়েছিল। পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী তাঁদের আরতি হয়ে গেল। বন্দনা-গীতও শেষ হয়েছে, স্তোত্র আরম্ভ হবে, এমন সময় আমাদের প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমার একটা কথা আছে। এই যে আমরা শঙ্কর-গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তিকে আমাদের সভার সভাপতিরূপে বরণ করে নিয়েছি, এ মৃত অনুষ্ঠান আর কত দিন বহন করে চল্‌ব? আমাদের প্রাণে কি চেতনার সঞ্চার হবে না, সত্য বস্তুকে সত্য বলে তুলে ধরবার সৎসাহস কি আমাদের মাঝে জাগ্‌বে না? শঙ্কর-গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তিই চিরকাল আমাদের কাছে বড় হয়ে থাক্‌বে, আর যাঁর ভেতর আমরা শঙ্কর-গৌরাঙ্গকে পূর্ণভাবে প্রকটিত দেখ্‌তে পাচ্ছি, যিনি জ্ঞান-প্রেমের মূর্ত্ত

বিগ্রহ, তাঁকে আমরা সে আসনে বসাতে পারব না? জানি আমি, সবার চেয়ে তিনিই আপনাদের সকলের অতি আপনার, জানি আমি আপনাদের হৃদয়ে তাঁর আসন ছাড়া আর কারো আসন পাতা নেই, তবু ভয়ে-সঙ্কোচে বাইরে তার অন্যথা'চরণ আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়েরই পরিচয় নয় কি? যখন আমরা কিছু বুঝ্‌তাম না, জান্‌তাম না, তখন এই প্রতিমূর্ত্তিকেই আমাদের সভাপতি পদে বরণ করে নিয়ে ছিলাম। মূর্ত্তি ধরে আমাদের সাধনার সুরু হয়েছিল, আমাদের আজ সে সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে, আমরা এখন প্রকৃত শঙ্কর-গৌরাঙ্গকে চিনেছি। তাই আমি প্রস্তাব কর্‌ছি—এই প্রতিকৃতি আজ হতে বিসর্জ্জিত হোক্‌, তার স্থলে আসুন আমরা আজ জ্ঞান-প্রেমের মূর্ত্ত ঘন বিগ্রহকে এ আসনে বসাই। আপনাদের কারো আপত্তি না থাক্‌লে হাত তুলে সকলে এ প্রস্তাবের সমর্থন করুন।"

সকলেই দেখি আনন্দ কোলাহলে সম্মিলন ক্ষেত্র মুখরিত করে হাত তুল্‌লেন। প্রজ্ঞানন্দজী বল্‌লেন—তা'হলে আপনাদের সকলেরই এ বিষয়ে মত আছে—কেমন? এখন প্রতিমূর্ত্তি তুলে ফেলি!" এমন সময় সুরেন দা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"প্রতিমূর্ত্তির চেয়ে মূর্ত্ত বিগ্রহকে আমরা বড় বলে জানি, বড় বলে মানি। কিন্তু এ কথা ঠিক যে তাঁরই নির্দ্দেশা'নুযায়ী এত দিন এ প্রথা চলে আস্‌ছে, আর তিনি যখন স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন, তখন তাঁকে এ বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমাদের খেয়ালখুসীমত একটা কাজ করতে পারি না। ঠাকুর আমাদের প্রত্যেকের কাছেই বড়, ভেতরের ভাব ভেতরেই থাকুক, বাইরে তা ফলাবার সার্থকতা কি? তিনি আমাদের যে সাধনা দিয়ে ছিলেন তাতে আমরা সিদ্ধ হয়েছি কি অসিদ্ধ হয়েছি তা তিনিই জানেন। তিনি যদি বলেন—'হাঁ, আর শঙ্কর গৌরাঙ্গের প্রতি মূর্ত্তি রাখার প্রয়োজন নেই—তবেই প্রতিমূর্ত্তি সরান হবে, এর পূর্ব্বে নয়।"

সুরেনদার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে সমবেত ভক্তবৃন্দের প্রতিনিধি স্বরূপে ২।৩ জন তাঁর কাছে গেলেন। এদিকে সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাক্‌লেন—কি আদেশ হয়! প্রায় আধ ঘণ্টা পর তাঁরা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। ঠাকুর তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে বসে বল্‌লেন—"কি নিয়ে এত গণ্ডগোল হচ্ছিল এতক্ষণ তোমাদের তা আমায় বুঝিয়ে বল। যেমন করে তোমরা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলে, সমর্থন করেছিলে, ঠিক তেমনি করেই প্রস্তাব উত্থাপনাদি কর দেখি। আমি তোমাদের ভাব বুঝে ব্যবস্থা করব।"

প্রজ্ঞানন্দজী আবার পূর্ব্বের মত প্রস্তাব কর্‌লেন, পূর্ব্বের মতই আবার তা সমর্থিত হল, তখন সকলেই ঠাকুরকে অনুরোধ কর্‌লেন সভাপতির আসনে বস্‌বার জন্যে।

ঠাকুর বল্‌লেন—"আমি তোমাদের যুক্তি তর্কে এখনও সন্তুষ্ট হতে পারি নি, তোমরা তোমাদের বক্তব্য ঠিকভাবে উপস্থাপিত কর্‌তে পার নি। তোমরা আমাকে শঙ্কর গৌরাঙ্গের অবতার বলছ, অথবা আমার মাঝে তোমরা শঙ্কর গৌরাঙ্গকে দেখতে পাচ্ছ এতো তোমাদের নিছক কল্পনা! শঙ্কর গৌরাঙ্গের আসনে বস্‌বার যোগ্যতা আমি রাখি না, আমি তাঁদের দাসানুদাস মাত্র। তোমরা যেমন ছোট, তোমাদের ঠাকুরটীও তেমনি ছোট। আমি যদি বড় হতাম, তা হলে তোমরাও যে সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে উঠতে! যদি তোমরা সত্যি সত্যিই আমার মাঝে শঙ্কর গৌরাঙ্গের বিকাশ দেখ্‌তে পেয়ে থাক, সে তো ভাল কথা। সে ভাব সে অনুভূতি তোমাদের অন্তরে থাক্‌। কিন্তু বাইরে এই যে অনুষ্ঠানটী আজ দীর্ঘ ১০ বৎসর ধরে চলে আস্‌ছে তার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন তো আমি দেখ্‌ছি না কিছুই।"

ঠাকুরের কথায় ভক্তদের মাঝে যেন কেমন একটা নৈরাশ্যের ভাব খেলে গেল দেখ্‌তে পেলাম। মুহূর্তেই তা আবার অপসৃতও হল। তাঁরা আজ ঠাকুরকেই সভাপতির আসনে দেখ্‌তে চান, অন্য কাউকে নয়। তাই ক্ষুব্ধ চিত্ত জনৈক ভক্ত উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"চিরকাল কি আমরা প্রথম ভাগই পড়ে যাব ঠাকুর, আমাদের কি আর ক্লাস প্রমোশন হবে না ?

ঠাকুর বল্‌লেন—"শঙ্কর গৌরাঙ্গের উপাসনাই যে চরম গো ! প্রথমভাগ বলে তাকে আখ্যা দিচ্ছ কেন ? জ্ঞান প্রেমের প্রতিষ্ঠাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য! আমি শঙ্করকে জ্ঞানের প্রতীক আর গৌরাঙ্গকে প্রেমের প্রতীক রূপে তোমাদের সাম্নে তুলে ধরেছিলাম, বুঝেছিলাম এ থেকেই তোমরা একদিন জ্ঞান প্রেমের অধিকারী হয়ে উঠ্‌বে। তোমরা সে ভাব ভুলে গিয়ে মূর্ত্তিকেই আঁক্‌ড়ে ধরে আছ শুধু, তাই মূর্ত্তি আজ তোমাদের এত অসহনীয় উঠেছে। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে শঙ্কর গৌরাঙ্গকে সম্মিলনীর সভাপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, আমার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমরা বল্‌ছ তোমাদের সাধনায় সিদ্ধি হয়ে গেছে, আমি দেখ্‌ছি কারও সাধনাই আরম্ভ হয় নি। শুধু বাগ্‌ জাল বিস্তার করে এক এক জন দেখাচ্ছ যেন তোমরা মস্ত বড় হয়ে গিয়েছ।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন ভক্ত উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"আমরা যুক্তি বুঝি না, তর্ক বুঝি না, জ্ঞান প্রেম বুঝি না। জানি শুধু এ ভক্তসম্মিলনী, ভক্ত ভগবানের শুভ সম্মিলন। ভক্তেরা চায় এখানে তাদের ঠাকুরকে—ভগবান্‌কে সবার চাইতে বড় আসনে দেখ্‌তে, প্রতিনিধি স্বরূপে নয়।"

ঠাকুর বল্‌লেন—"আচ্ছা তাই হবে, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেই আমি সভাপতির আসন গ্রহণ কর্‌ব। কিন্তু বারবার তোমাদের স্মরণ রাখ্‌তে বলি, তোমরা কথাটাকে যে ভাবে উপস্থাপিত করেছিলে, তা সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মূর্ত্তি অপসৃত করতে চেয়েছিলে, আমি তোমাদের সাধনায় অসিদ্ধি হয়েছে জেনে আজ হতে এ অনুষ্ঠানের ধারা বদ্‌লে দিলাম। এতদিন বৃথা অনুষ্ঠানের বোঝা বয়ে এসেছ তোমরা। একদিকে প্রতিষ্ঠিত জগদ্‌গুরুর আসন, অপর দিকে আমি। তার ওপর আবার এই শঙ্কর গৌরাঙ্গের আসন। এতে তোমরা কার কাছে মাথা নোয়াবে, কাকে বেশী ভক্তি কর্‌বে, তাই নিয়ে মুস্কিলে পড়্‌তে। শঙ্কর-গৌরাঙ্গ যে তোমাদের কাছে বেশী কিছু পান না তা আমি বেশ লক্ষ্য করেছি, কাজেই বৃথা অনুষ্ঠানের আর প্রয়োজন কি ? যে অনুষ্ঠানে প্রাণের স্ফুরণ হয় না, ভাবের বিকাশ হয় না, সে অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী আমি মোটেই নই। কাজেই আজ হতে শঙ্কর-গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি তুলে দেবার আদেশ দিলাম। প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তাঁদের ভাব হৃদয়ে পোষণ কর্‌বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর, জীবনে জ্ঞান প্রেমের বিকাশ যাতে হয় তার জন্যে আজ থেকে বদ্ধপরিকর হও। জেনে রেখো শঙ্কর গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি আমাদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের ভাব প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য।"

"জয় গুরু" ধ্বনিতে আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত করে ঠাকুরকে সভাপতির আসনে বসান হল—মাল্য ভূষিত করা হল। সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠ্‌লেন—"আজ হতে ঠাকুরই আমাদের সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলেন। জ্ঞান-প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ রূপে তাঁর পূজা করে তাঁরই নির্দ্দেশে চলে আমরা নিশ্চয়ই একদিন জ্ঞান প্রেমের অধিকারী হতে পার্‌ব, আর শঙ্করগৌরাঙ্গের আসন স্থাপনা সেই দিনই সার্থক হবে।"

সম্মিলিত কণ্ঠে স্তোত্র আরম্ভ হল—শেষ হল।

ঠাকুর বল্‌লেন—তোমরা তোমাদের বিভাগানুযায়ী সকলে বসে যাও। উত্তর পূর্ব্ব, পশ্চিম মধ্য ও দক্ষিণ ক্রমে সকলে বসে গেলেন। তার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে ক্ষেত্র বাবু একটী নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করলেন। তাঁর কথনভঙ্গীতে খুবই সুন্দর লেগেছিল তা। পৌষের আর্য্যদর্পণেই সেটী ছাপা হবে বোধ হয়। তাই চিঠিতে সে সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানিয়ে এর কলেবর বাড়ালাম না।

ঠাকুর বল্‌লেন—"১৬ বছর পূর্ব্বে সম্মিলনীর সূত্র পাত, কোকিলামুখ মঠে তার প্রথম অধিবেশন, ভাওয়াল আশ্রমের অষ্টম বার্ষিক সম্মিলনীতে তার ভাবের প্রথম বিকাশ। সেই থেকে সম্মিলনী পূর্ণ হতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সম্মিলনীতে আসার জন্যে কাউকে আমি ডাকি না, কাউকে অনুরোধ করি না। তার ওপর আবার জনপ্রতি ৫৲ টাকা করে সম্মিলনীর ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়েছে। কত দূর দূরান্তর থেকে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে কত কষ্ট সহ্য করে তোমাদের আস্‌তে হয় এই সম্মিলনীতে। তোমরা কষ্টকে কষ্ট বলে গ্রহণ কর না, বাধা বিঘ্নকে বাধাবিঘ্ন বলে গ্রাহ্য কর না। এতে যে আস্‌তেই হবে তার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, কড়াকড়ি হুকুমেরও বালাই নেই, তবু তোমরা আস শুধু প্রাণের আবেগে মিলনের আশায়। সম্মিলনীতে যে আনন্দের বিকাশ হয়, বৎসর পরে অতি আপনার জনের সঙ্গ পেয়ে সুখদুঃখ ব্যথা-বেদনার আলোচনা ক'রে হৃদয়ে যে অমৃতের সঞ্চার হয়, শুধু তারই আকর্ষণে তোমরা ছুটে আস সম্মিলনীতে—এর অন্য কোন তো হেতু আমি দেখি না। জগতে আর যদি আমি কিছু না-ও করে যেতাম, তবুও এই সম্মিলনীই আমার স্মৃতি রেখে যেত। বাঙ্গালায় এর পূর্ব্বে আর এরকম ধর্ম্মাধিবেশনের প্রচেষ্টা হয় নি, এর প্রতিষ্ঠার পর এখন অনেক প্রতিষ্ঠানই এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন। আমার আশ্রম মঠ দিয়েও যে জগতে কিছু কাজ না হচ্ছে তা নয়, তথাপি যদি সেগুলি জগতের অন্য কোন কাজে না লেগে আমার সম্মিলনীর ক্ষেত্রস্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, তাই যথেষ্ট বলে মনে করি। তারপর ধর, এই আশ্রম-মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তোমরা সকলে আমাকে ধরতে পার নি, এদের প্রতিষ্ঠার পরই তোমাদের সংখ্যা বেড়েছে বেশী। এর পূর্ব্বে আমার স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় তোমাদের অসুবিধায় পড়তে হ'ত যথেষ্ট। আজ বাঙ্গালায় আমার ৫০৭টী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বছরের মধ্যে অন্ততঃ একবার করেও আমি সে সকল আশ্রমে যাই, তখন তোমরা সে সকল আশ্রমে গিয়ে আমার সাক্ষাৎ পাও, এমনি করে আমি এখন তোমাদের কাছে সুলভ হয়েছি। তার পর আমি না এলেও, আমার আশ্রমের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের কাছ থেকেও অনেকে অনেক কিছু পেয়ে থাকে। বাহিরের দৃষ্টিতে এগুলি নগণ্য হলেও - বহিঃকর্ম্মের দিক্ দিয়ে ধর্‌তে গেলে এদের মূল্য অল্প হলেও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নের কাছে এগুলিই আবার মহৎ দান, ব্রহ্মণ্য ভাবে জীব-সেবা! কাজেই বাইরের কর্ম্ম ছেড়ে দিলেও একপক্ষে আমার আশ্রম মঠ দয়ে কিছু কম কাজ হচ্ছে না, আর এগুলির যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা তোমরা স্বীকার করবে নিশ্চয়ই। আর এক কথা—এতদিন আমরা কাজটাকেই বড় ক'রে দেখে এসেছি, তাই কাজ-কর্ম্মের হিসাব নিকাশ দিতেই আমাদের সময় কেটে যেত বেশী, পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের সময় সুযোগ তেমন ঘটে উঠ্‌তো না, আজ থেকে আমি সম্মিলনীর সে ধারা বদ্‌লে দিলাম। প্রথম দিন সাধারণ ভাবে একটু কাজ কর্ম্ম নিয়ে আলোচনা হবে, তার পর শুধু আনন্দ! আনন্দই আমাদের লক্ষ্য, আনন্দকে লক্ষ্য করেই আমার সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা!

তোমরা তোমাদের ব্যথা বেদনা জানাবে, তোমাদের পুঞ্জীভূত প্রশ্নরাশি আমার কাছে স্থাপনা করবে, আমি সব মীমাংসা করে দেব। যাক্—এসম্বন্ধে পরে আরও বল্‌ব, এখন কাজ আরম্ভ হোক্। প্রথমেই তোমাদের গুরুভাইদের মধ্যে এবার যারা দেহত্যাগ করেছে, তাদের বিষয় যে যা জান জ্ঞাপন কর।

ধীরে ধীরে ৫।৭ জন উঠে দাঁড়িয়ে এক একজনের অলৌকিক মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। যাঁর কথাই শুনলাম, তাঁর ভেতরেই কিছু বিশেষত্ব—কিছু অসাধারণত্ব রয়েছে লক্ষ্য করলাম। মরবার সময় কারো চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নি, শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করে হাসিমুখে সকলেই মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন, এমনি মহনীয় মৃত্যু!

ঠাকুরের আদেশে পরলোকগত ভ্রাতাদের আত্মার পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় ১ মিনিট কাল নিবিষ্ট চিত্তে "জয় গুরু" মহামন্ত্র জপ করা হল।

তারপর হেম বাবু গত বৎসরের ভক্ত সম্মিলনীর রিপোর্ট পাঠ করলেন আশ্রমাধ্যক্ষেরা তাঁদের মঠ আশ্রমের বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করলেন। ঠাকুর বললেন—"এবার আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত রিপোর্ট পড়ে শোনান হবে না, সম্মিলনীর ধারা এবার থেকে বদলে গিয়েছে। কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করলেই নানা রকমের দোষ ত্রুটী বেরিয়ে পড়বে, সম্মিলনীতে আর স্তুতি নিন্দা অবতারণার প্রয়োজন নাই। তার উপর এ সমস্ত রিপোর্ট ব্যক্তিগত ভাবে এক এক জনের মনোমত লেখা। কাজেই এ রিপোর্ট শুনেও তোমরা যথার্থ সত্য অবধারণ করতে পারবে না। আমি সব আশ্রম মঠের খবর জানি, তাই আমি এগুলি গ্রহণ করে নিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি "ভক্ত-সম্মিলনী"তে এগুলির মন্তব্য প্রকাশ করব, সে রিপোর্ট শীঘ্রই তোমাদের হস্তগত হবে, তা থেকেই সব জানতে পারবে। তবে গত বৎসরে সমগ্র আশ্রম মঠে যে আয় ব্যয় হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি, শোন।

এই বলে তিনি একটী সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের হিসাব পড়ে শোনালেন ।— মঠ ও তদন্তর্গত আশ্রমগুলিতে গত বার সর্ব্বমোট ব্যয় হয়েছে ১০৮২৪।।১৭।, তন্মধ্যে সাধারণের সাহায্য ৯৮০৸৫ বাদে বাকী টাকাটা আশ্রম মঠের নিজস্ব আয়, আর শিষ্যভক্তদের সাহায্য থেকে সঙ্কুলান হয়েছে। মঠে এক পয়সাও সাধারণের সাহায্য নেই।

ঠাকুর মন্তব্য করলেন—"আমাদের প্রতিষ্ঠানে এবার প্রায় ১১০০০৲ টাকা ব্যয় হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র হাজার খানেক টাকা সাধারণের কাছ থেকে পেয়েছি। বাকী সব তোমরা দিয়েছ, আর আমার আশ্রম মঠের আয় থেকে সঙ্কুলান হয়েছে। সাধারণের কাছ থেকে যা পেয়েছি, সাধারণের কাজ করে আবার তা ফিরিয়েও দিয়েছি। কাজেই সাধারণকে কৈফিয়ৎ দিবার আমাদের কিছুই নাই, প্রয়োজনও নাই। আমি বলি আমার আশ্রম মঠ দিয়ে আর কিছু হোক্ বা না হোক্, তবু এদের টিকিয়ে রাখতে হবে। এই দুর্দ্দিনে যদি আশ্রমগুলি টিকে থাকে, তাহলেই একদিন এদের দিয়ে কাজ হবে।

"আমার বরাবরই উদ্দেশ্য গৃহী এবং ত্যাগীর সম্মিলন সাধন। আমি অনেকবার তোমাদের কাছে একথা প্রকাশও করেছি, এমন কথাও বলেছি, যদি ভারতের কোন দিন উন্নতি হয়, তবে ত্যাগী এবং গৃহীর পরস্পর শুভ সম্মিলনে। মাঝখানে সে ভাবের ব্যত্যয় ঘটে আমার প্রতিষ্ঠানের অনেকখানি ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। যাক্ আমি সেজন্য দুঃখিত নই, আমার ভাব সুদৃঢ় ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে তার শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। কারণ যারা আমায়

ছেড়ে গিয়েছিল, তারাই আবার ক্রমশঃ ফিরে আসছে। এদের মধ্যে প্রজ্ঞানন্দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যে কেমন বিদ্রোহিতাবরণ ক'রে আশ্রম সংশ্রব ত্যাগ করে গিয়েছিল, তা তোমাদের অজানা নাই। গত বার সম্মিলনীতেও কি রকম বিভ্রাট কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল, তা যারা সে সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলে তারা সবাই জান। এখন সে প্রজ্ঞানন্দ সম্পূর্ণ নূতন হয়েছে, সে তার ভুল বুঝতে পেরে আবার আমার কাছে ছুটে এসেছে, ক্ষমা চেয়েছে। আমি তাকে ক্ষমা করেছি, আপন করে নিয়েছি, সে-ও এই ৮মাস কাল আমার কাজ করে আমাকে খুব সন্তুষ্ট করে ফেলেছে। আমাকে ছেড়ে গিয়ে কেউ যদি স্বাধীন চেষ্টায় জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে, তাতে আমি বিন্দু মাত্র ক্ষুব্ধ হব না বরং মনে মনে তার মঙ্গল কামনাই করব, অথবা যদি সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার আমার কাছে ফিরে আসে, আমি তাকে হাসি মুখে ক্ষমা করব, কিন্তু যদি দেখি একুল ওকুল দুকুল হারিয়ে তার জীবনটা পণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার দুঃখ রাখবার স্থান থাকবে কি কোথাও? যাক্—এখন তোমরা তার কাছ থেকেই তার অভিজ্ঞতার দু'চারটী কথা শোন।"

ঠাকুরের নির্দ্দেশে প্রজ্ঞানন্দজী উঠে দাঁড়ালেন, বল্লেন—"গতবার আমি ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে ছিলাম, তিনি ক্ষমা করেছিলেন, তোমাদের কাছেও ক্ষমা চেয়ে ছিলাম, তোমরাও ক্ষমা করেছিলে। কিন্তু তখনও আমার অহঙ্কারের উচ্চ শির অবনমিত হয় নি, অভিমানের প্রচণ্ড প্রতাপ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। তার পর ঠাকুরের আদেশে একান্তে কিছুদিন নির্জ্জন বাস করি। তিনি বলেছিলেন—চিত্ত স্থির হলে আবার আমার কাছে এস, আবার আমার আশ্রম-কার্য্যে যোগদান করো। একলা থাকতে থাকতে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম, নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গ বলে মনে হল : এ নির্জ্জনতা এ নিঃসঙ্গ ভাব বাহিরের নয়—ভেতরের। হাজার লোকের মাঝে থেকেছি—তবু মনে হয়েছে আমি একলা, হাজার লোকের আদর আপ্যায়ন পেয়েছি—তবু মনে হয়েছে আমি নিঃসঙ্গ। বুঝলাম আমাদের অহমিকার দৌড় কতদূর, বুঝলাম আমাদের স্বাধীন চেষ্টার সীমারেখা কতটুকু? আমরা মনে প্রাণে এতই দুর্ব্বল যে অবলম্বন ছাড়া পথ চলা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব! আজ সেই অবলম্বন হারা হয়ে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করলাম আমার যেন কেউ নেই—আমি যেন আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর আঁধারে ডুবে মরছি, আঁধার হতে আলোর পানে ছুটে যাবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে। এই আকুলতা নিয়ে কত সাধু সন্ন্যাসী, সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে ছুটেছি। একদিনের একটী ঘটনা বলি, সেই থেকে আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হল, আমি পথের সন্ধান পেলাম।

"খোঁজ নিতে নিতে একদিন এক সিদ্ধ মহাপুরুষের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত। তিনি অশীতি-পর বৃদ্ধ, বৈষ্ণব সাধু। তিনি যে সিদ্ধ মহাপুরুষ, স্থানীয় অঞ্চলের আবাল বৃদ্ধ বনিতার তা অগোচর নেই। আমি যখন তাঁর আশ্রমে যাই, তিনি তখন কি কারণে বাইরে গেছিলেন, আমি তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় বসে থাকলাম। বর্ষাকাল না হলেও অসময়ের বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট কর্দ্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই যখন তিনি ফিরে এলেন, দেখলাম তাঁর অনাবৃত পা দু'খানি কাদায় অতি মাত্রায় জড়িত হয়ে রয়েছে। তাঁর সৌম্য মূর্ত্তি দেখে ভক্তিতে চিত্ত আপনি তাঁর পায়ে নুয়ে পড়ল। আমি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাঁর পায়ের কাদা ধুয়ে দেবার জন্যে অগ্রসর হয়ে পায়ের কাছে এলাম। তিনি বোধ হয় আমার মনোভাব

বুঝ্তে পেরেই তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়িয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। আমি সেখানেই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে শুন্‌তে পেলাম, তিনি বল্‌ছেন—'নিজ গুরুর পদসেবা ছেড়ে এসে এখন আমার পদসেবা কর্‌তে এসেছে, কি ভ্রান্ত!'

"তাঁর এই কথা শুনেই আমার চমক ভাঙ্গল, ঠাকুরের জন্যে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। * * * তার পর স্বপ্নে, কত ইঙ্গিতে আভাসে নির্দ্দেশ পেলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে ছুটে যাবার জন্যে। আমি সে নির্দ্দেশ বিশ্বাস করলাম না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম স্পষ্ট নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত এখান থেকে এক পাও নড়্‌ছি না। তার পর দেখি একি অঘটন ঘটনা, সত্যই একদিন পথের নির্দ্দেশ পেলাম, সত্যই সে যেন মূর্ত্ত হয়ে আমায় স্পষ্ট বল্‌ল—ছুটে যা ঐ পুরীর পানে।

"তার পর তো পুরী ছুটে এলাম, তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়্‌লাম, আমার অমানিশা দূরে গেল, আমি ধন্য হলাম। ভাই সব, গত বার আমি নতজানু হয়ে তোমাদের কাছে ভক্তি ভিক্ষা করেছিলাম, আমার সে প্রার্থনা বিফল হয় নি। এবার তোমাদের ঘরে ঘরে ঘুরে, তোমাদের ঘরে—তোমাদের ভেতরে ঠাকুরের আসন কোথায় তা দেখে আমার চোখ ফুটেছে, ভ্রম ঘুচেছে। আমি বুঝেছি ভক্ত না হলে ভক্তকে চেনা যায় না, ভক্ত প্রাণের অধিকারী না হলে ভক্তের প্রাণ বোঝা যায় না। যাঁর কৃপায় আমি আজ এ সত্য উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছি তাঁর চরণে শত শত প্রণাম।" এইবলে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর্‌লেন।

তার পরেই মঠের গৌরব মঠের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি "যোগমায়া-যন্ত্র"টা যে পূর্ব্বতন অধ্যক্ষের উদাসীনতায় এবং জনৈক সেবকের ষড়যন্ত্রে বাধ্য হয়ে বিক্রয় কর্‌তে হল, সে সব কথার আলোচনায় সভার মাঝে একটা উত্তেজনার বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন

সুরেন দা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"প্রেসটা মঠের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল, তা থেকে মঠের প্রচুর আয় হত, পত্রিকা আর পুস্তকগুলি সেখানেই ছাপা হত, দু'এক জনের নৃশংস ষড়যন্ত্রে বাধ্য হয়ে তা বিক্রয় কর্‌তে হয়েছে, আমি নিজে সেখানে গিয়ে যে অবস্থা দেখে এসেছিলাম, তাতে প্রেসটী বিক্রয় করা ছাড়া আর উপায়ন্তর ছিল না। আর ৬ মাস ঐভাবে থাক্‌লেই মঠটীকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হত।"

ফণী বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"যাঁদের ষড়যন্ত্রে যাঁদের উদাসীনতায় এই অপ্রিয়কর এবং ক্ষতিকর ব্যাপার ঘটল, যাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায় মঠের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেল, এ সভা তাঁদের ক্ষমা কর্‌তে পারে না কিছুতেই। আমরা তাঁদের অমানুষিক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছি, আজ সমবেতভাবে তাঁদের ব্যবহারে আমরা ঘৃণা বোধ এবং দুঃখ প্রকাশ কর্‌ছি।"

ক্ষুব্ধ ভক্ত মণ্ডলীকে শান্ত করে ঠাকুর বললেন—"যাক্ সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনার আর প্রয়োজন নাই। তারা আমার শিষ্য, আমার পুত্র তুল্য। আমি তাদের ক্ষমা করেছি। ছেলে যদি হঠাৎ কোন অন্যায় করেই বসে, তবে পিতা কি চিরকাল তার প্রতি বিমুখ হয়েই থাকেন? তোমরাও যদি কোন দিন কোন অন্যায় করে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি কি তোমাদের ক্ষমা করব না, তোমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে তোমাদের বুকে তুলে নেব না? তোমরা তো দোষ কর্‌বেই, দোষ করাটা কিছু দোষের নয়, তা যে জীবের স্বভাব; আর আমি গুরু, ক্ষমা করাই আমার স্বভাব। তোমরা শত অপরাধে অপরাধী হলেও আমি ক্ষমাই করে যাব।

"যাক্ যা হবার হয়ে গিয়েছে, আবার তোমরা নূতন উত্তম উৎসাহে নূতন বৎসরের কর্ম্ম করার জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের বাহুতে শক্তি হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ হোক্, শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তোমরা ঠাকুরের নির্দ্দেশিত পথে চল্বার ক্ষমতা লাভ কর। তোমরা জেনে রেখো টাকা পয়সাই বড় নয়, বড় হচ্ছে মানুষ। আমি তোমাদের কাছে টাকা পয়সা চাই না, আমি চাই তোমরা মানুষ হয়ে ওঠ। টাকা পয়সা খুঁজলেই পাওয়া যায়, জগৎময় তা ছড়িয়ে পড়ে আছে, ঝেঁটিয়ে আন্তে পারলেই হল। কিন্তু মানুষ পাওয়া দুর্লভ, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করা বড় কঠিন। আমি চাই তোমরা তিলে তিলে মানুষ হয়ে ওঠ, তোমাদের মাঝে মুক্ত পুরুষ সিংহ বিক্রমে জেগে উঠুন। আমি তোমাদের কাছে কিছু চাই না, তোমাদের আশ্রম মঠ চাই না, তোমাদের কাছে কোন কিছু কাজ পাবারও দাবী রাখি না। আমি শুধু এই ভিক্ষা করছি—তোমরা মানুষ হও। আমি তোমাদের কাছে মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্বের ভিখারী! তোমরা মানুষ হও, দেবতা হও, ঈশ্বর হও, ব্রহ্ম হও, এই আমার আশা এবং আশীর্ব্বাদ।"

শেষের এই কয়টী কথা শুনে সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কোন্ এক নিস্তরঙ্গ ভূমিতে সমষ্টিচিত্ত যেন স্থির হয়ে গেল। ঠাকুরের কথা শেষ হয়েছিল, কিন্তু সকলের কানে তখনও সে সুরের রেশ বাজছে। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঠাকুর বলে উঠলেন—"আজকের মত সভা ভঙ্গ হল, কাল তোমাদের সাধারণ অধিবেশন, আবার পরশু দিন তোমাদের নিয়ে আনন্দ করবো। সে দিন তোমরা আমার কথা শুন্বে, আমি তোমাদের কথা শুনব।"

সভা ভঙ্গ হল, ঠাকুরের চরণে প্রণাম করে সকলেই সভাস্থান ত্যাগ কর্লেন। তার পরই খাওয়া দাওয়ার পালা। পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠ্ল, দেখ্তে দেখ্তে দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে আশ্রমাঙ্গনে মুখরিত হয়ে উঠ্ল।

* * *

শীতের সূর্য্য ক্রমে পশ্চিমের কোণে চলে পড়লেন, সন্ধ্যারাণী ধীরে ধীরে তার ধুসর অঞ্চলখানি ধরণীর গায়ে বিছিয়ে দিলে। আকাশের বুকে দু'একটী করে তারা ফুটে উঠ্ল। সমবেত কণ্ঠোত্থ কীর্ত্তন-স্তোত্রের সুর লহর আবার মন্দির প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে তুল্ল।

স্তোত্র কীর্ত্তন শেষ হলে পর ঠাকুর ডাকালেন, আজ ট্রাষ্ট সভার অধিবেশন। ট্রাষ্টী, সদস্য এবং আশ্রমাধ্যক্ষেরা সকলে মিলিত হলেন ঠাকুরের প্রকোষ্ঠে। আলোচনা আরম্ভ হবে, এমন সময় গ্রামেরই একটী সঙ্কীর্ত্তনের দল খোল করতাল সহযোগে উচ্চ কণ্ঠে নাম গান করতে করতে আশ্রমে এসে হাজির। তিন ঘণ্টা ধরে বাইরে তাঁদের কীর্ত্তন-নর্ত্তন চল্ল, তিন ঘণ্টা ধরে ভেতরে আমাদের সঙ্ঘ সম্পর্কিত আলোচনা চল্ল।

প্রথমেই ঠাকুর বল্লেন—"আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেক দিন ধরে অবসর চেয়ে আস্ছিলাম, ১৩৩৪ সনে আসাম-মঠে সম্মিলনীর সময় তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমার কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে আমাকে নিশ্চন্ত করেছিলে। আমিও সেই থেকে মঠ আশ্রমের ওপর আর ততটা নজর দেই নি, আর দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করি নি। এদিকে তোমরাও তোমাদের স্বেচ্ছায় বৃত কর্ত্তব্য একটুও সম্পাদন কর নি; তার ফলে আজ আমার মঠের এই দুর্দ্দশা! যে মঠ ধনে জনে পূর্ণ করে তোমাদের হাতে আমি তুলে দিয়েছিলাম, আজ সেই মঠের অবস্থা দেখে অশ্রু সম্বরণ না করে থাক্তে পারা যায় না। তোমাদের অবহেলায়, তোমাদের দৃষ্টির অভাবে তা ধ্বংসের

মুখে যেতে বসেছিল, আমি নিজে সে অসময়ে আমার যা কিছু ছিল সব নিয়ে সে ধ্বংসের স্রোতে বাধা দিয়েছি, তাই মঠ আজ রক্ষা পেয়েছে। তোমরা ট্রাষ্টী, তোমাদের কর্ত্তব্য মঠ আশ্রমগুলিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা, যাতে এর বিন্দু মাত্র ক্ষতি না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা, আর প্রয়োজন হলে বুকের রক্ত দিয়েও এদের অধোগতি রোধ করা। তোমাদেরই অনুরোধে গতবারে আমি তোমাদের উপর অর্পিত কার্য্য ভার আবার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলাম, এক বৎসর ধরে তা চালিয়েও এলাম। কিন্তু আর তো আমি পেরে উঠ্ছি না, শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়্ছে, এ শরীর দিয়ে তো আর কুলিয়ে উঠ্ছে না। তোমরা আমাকে নিষ্কৃতি দাও, আমার কর্ম্মের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত কর। আমি তোমাদের ঠাকুর হয়েই থাকি, আমি গুরু রূপেই তোমাদের মাঝে প্রকাশিত হই, কর্ম্ম ঝঞ্ঝাট যেন এর মাঝখানে পড়ে ভাবের ব্যাঘাত না ঘটায়। তোমরা যে কয়জন সন্ন্যাসী ট্রাষ্টী আছ, তাদের মধ্যেই একজন আমার কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ কর। আর তাকেই তোমরা আমার প্রতিনিধি স্বরূপে মেনে নাও।"

বহু বাগ্ বিতণ্ডা আলোচনার পর সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হল যে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহারাজ ট্রাষ্ট সভার সহকারী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি স্বরূপে আগামী বর্ষের কার্য্যাদি পরিচালনা করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দজী বলে উঠ্লেন—"আমি নিতান্তই অনুপযুক্ত, আর কাউকে এ ভার দিলেই ভাল হত। আমার সমর্থ্যানুযায়ী তাঁর অনুবর্ত্তী হয়ে আমি তাঁর কার্য্যাদি সম্পন্ন করতাম।"

এ কথার উত্তরে কে একজন বল্লেন—"এর তো সিদ্ধান্তই হয়ে গেল, কাজেই এ সম্পর্কে আর কোন প্রশ্নই উঠ্তে পারে না। উপযুক্ত বোধেই সভা আপনাকে উক্ত কার্য্যের ভারার্পণ করেছেন।"

ঠাকুর বল্লেন—"তোমরা যেদিন প্রকৃতই নিজেদের অনুপযুক্ত বলে বুঝ্তে পার্বে, সেই দিনই আমি তোমাদের উপযুক্ত করে নেব। নিজের অনুপযুক্তা বুঝতে পারা যে বড় সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু বাবা, তোমাদের এই আর্ত্তির অন্তরালে অহঙ্কারের অভিমানের প্রচণ্ড দৈত্যটা যে আত্মগোপন করে রয়েছে, সে তো নির্জ্জিত হয় নি, তার হাত থেকে তো এখনও রেহাই পাও নি। তোমরা যে নিজেদের খুবই উপযুক্ত বলে মনে কর, মুখে তার অন্যথা প্রকাশ কর্লে কি হবে? যেদিন তোমাদের অহঙ্কার নিঃশেষে বিসর্জ্জিত হবে, সে দিন তোমরা নিজেদের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে নিজেদের প্রকৃতই সকল রকমে কাঙ্গাল বলে অনুভব করবে, যেদিন তোমরা রিক্ত হবে, সেই দিনই আমি তোমাদের উপযুক্ত করে নেব তোমাদের শূন্য হৃদয় মহান্ দানে পূর্ণ করে দেব। আর এ কার্য্যের ভার আমি যখন নিজেই তোমায় অর্পণ করছি, তখন এ ভার বহনের শক্তিও নিশ্চয়ই পাবে।"

প্রশ্ন হল—"গৃহস্থ ট্রাষ্টীদেরই বা কর্ত্তব্য কি, সন্ন্যাসী ট্রাষ্টিদেরই বা কর্ত্তব্য কি?"

উত্তর পেলাম—"বিষয় সম্পত্তি এবং অর্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে গৃহস্থেরা দৃষ্টি রাখ্বে, আর আভ্যন্তরীণ আচার-নিষ্ঠা নিয়ম-সংযম সংরক্ষণে সন্ন্যাসীরা দায়ী থাকবে।"

তার পরেই প্রস্তাব হল—প্রচার বিভাগ আস্‌বে কোথা? এতদিন তা তো মঠেই ছিল, কিন্তু প্রেসটী বিক্রী হয়ে যাওয়ায়, আর মঠটীও বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকায় ওটী সরাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বহু যুক্তি তর্ক আলোচনার পর স্থির হ'ল প্রচার বিভাগ উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে স্থানান্তরিত করা হবে, স্থানীয় ট্রাষ্টী এবং সদস্যের তত্বাবধানে জনৈক আশ্রমসেবক এই বিভাগ পরিচালনা কর্‌বে। প্রয়োজন হ'লে এই কাজের জন্যে একজন বেতনভুক্ত কর্ম্মচারীও নিয়োগ করা যেতে পার্‌বে। টাকা কড়ি ট্রাষ্টী বা সদস্যের হাতে থাক্‌বে, ১০০০৲ হাজার টাকা মূলধন স্বরূপে তাঁদের কাছে গচ্ছিত রাখা হবে, তাই থেকে বই পত্র ছাপান হবে, আবার বিক্রীত পুস্তকের মূল্য থেকে সে স্থায়ী তহবিল পূরণ কর্‌তে হবে। মঠ থেকে যে সব পুস্তক বিক্রী হবে, মঠ তার অর্দ্ধেক টাকা কমিশন স্বরূপে পাবে, এইটাই প্রচার বিভাগ থেকে মঠের প্রাপ্য। তা ছাড়া আর্য্য-দর্পণের যাবতীয় খরচ খরচা বাদে যা কিছু উদ্বৃত্ত হবে, সবই মঠ পাবে। প্রচার বিভাগের আয় থেকেই গুরুধামের স্কুলের দেয় টাকা দিতে হবে। আর্য্য-দর্পণ বগুড়াতেই ছাপান হবে, কিন্তু ইস্যু হবে মঠ থেকেই। তাতে মাসিক ১০৲।১২৲ টাকা খরচ বেশী লাগুক, কিন্তু মঠের নাম—মঠের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে তো!

তারপর এল বিদ্যালয়ের কথা। ঠাকুর বল্‌লেন—"গত বৎসরই আমি এ সব ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম, আর কিছুই রাখ্‌ব না এই ঠিক করে ছিলাম, কিন্তু তোমাদেরই কথায় আর এক বৎসর রাখা হল। আমি বলি—বিদ্যালয়ের বালক বিভাগ তুলে দেওয়াই ভাল। ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে উপযুক্ততা থাকা প্রয়োজন, বর্ত্তমানে আমার সেবকদের মধ্যে সে রকম উপযুক্ত লোকেরই একান্ত অভাব। তাদের বিদ্যাবত্তার দিক্ দিয়ে বল্‌ছি না, বল্‌ছি স্নেহ-প্রবণতার দিক্ দিয়ে। তারা এসেছে সকলে বাপ মা বাড়ী ঘর ছেড়ে কঠোর ভাবে জীবন যাপন করতে, কাজেই তাদের কাছ থেকে স্নেহ মমতার আশা করাও দুরাশা। কিন্তু ঋষিযুগে ঋষির ঘরে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে শিক্ষার্থীরা বাপ মায়ের অভাব বোধ কর্‌ত না, ভাই ভগিনীর অভাব তাদের মনে জাগ্‌তেই পেত না। ঋষিরা ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ, ঋষি এবং ঋষিপত্নী অন্তেবাসীদের স্নেহ মমতায় আচ্ছন্ন করে রাখ্‌তেন, ছাত্রেরাও তাঁদের আদর পেয়ে ঋষিপুত্র কন্যাদের সাহচর্য্য লাভ করে সকল কথা ভুলে যেত। কিন্তু এখানে তারা পায় শুধু নীতি অনুবর্ত্তনেরই আদেশ, প্রাণের পরশ তাদের ভাগ্যে আর মিলে না।

"দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়াও এই প্রাচীন ভাব প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, এতদিন এই প্রতিকূলতাকে স্বীকার করে নিয়েই আমরা এ পন্থার অনুবর্ত্তন করে এসেছি, আমরা আমাদের সঞ্চিত শক্তির চেয়েও বেশী শক্তি এতে নিয়োগ করেছি। বর্ত্তমানে আর অযথা শক্তি অপব্যয় না করে, শক্তি সংগ্রহ করাই আমাদের কর্ত্তব্য বলে মনে করি। আমাদের আশ্রম মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই আমরা কাজ আরম্ভ করে ছিলাম, কাজেই অল্পদূর অগ্রসর হতে না হতেই আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌তে হল। আর বিশেষতঃ যাকে অবলম্বন করে আমার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সে-ই যখন কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছে, তখন আর কার ভরসায় বিদ্যালয় রাখি বল? আমার মনে হয় বালক বিভাগ তুলে দিয়ে শুধু যুবকদের নিয়ে একটী বিদ্যালয় থাকুক মঠে, প্রাচীন ধারা অবলম্বনে সেখানেই ঋষি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা চল্‌তে থাকুক।

[পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর

তার পর যখন দেশের হাওয়া বদ্‌লে যাবে, প্রকৃতই সুদিন আস্‌বে, তখন আবার আমরা এ বিভাগ খুল্‌ব। আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি, ভারতের যদি উন্নতি সম্ভবপর হয় কোন দিন, তবে তা এই পথ ধরেই হবে, এই পন্থা অবলম্বন করেই ভারত একদিন আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করবে। তাই বল্‌ছি তোমরা এখন বৃথা শক্তির অপচয় না ক'রে সংযত হও, সংহত হও। আশ্রম মঠগুলিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে গড়ে তোল, প্রকৃত কাজ একদিন আরম্ভ হবেই।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঋষিবিদ্যালয়ের বালকসঙ্ঘ সমগ্র প্রতিষ্ঠান থেকে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবই গৃহীত হল। মঠে ত্যাগী যুবক ব্রহ্মচারীদের জন্যে একটী বিদ্যালয় থাক্‌বে, মঠের পুরাতন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা তাদের নৈতিক আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের সহায়তা করবেন, আর বহুদর্শী অভিজ্ঞ অধ্যাপক রেখে তাদের লৌকিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ট্রাষ্ট সভা শেষ হয়ে গেল, অন্যান্য বহুবিধ আলোচনা আরম্ভ হ'ল। আশ্রম মঠ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, তার ক্রমিক পরিপুষ্টির বিবৃতি, ট্রাষ্টিদের হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণের কথা, অনবধানতায় যথেষ্ট ক্ষতি সংঘটন, অতঃপর তার প্রগতি রোধ, এই সমস্ত বিষয় শুন্‌তে শুন্‌তে একটা প্রবল চিন্তার তরঙ্গ মনকে আলোড়িত করে গেল। ভাব্‌লাম, এই একজন মানুষ নিঃসম্বল হয়ে, কৌপীন করঙ্ক মাত্র সম্বল ক'রে একদিন বাঙ্গালায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর সাধন সম্পদ্ দেশবাসীকে বিলাবার জন্যে। সে দিন কেউ ভাবে নি যে একদিন এতগুলি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তাঁর সত্য সঙ্কল্পকে মূর্ত্ত করে তুল্‌বে! প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হল, গড়ে উঠ্‌ল; কত লোক এল, কত লোক গেল; কত আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়ে এত দিন ধরে প্রতিষ্ঠানের ধারা চলে এল। —তিনি কিন্তু স্থির, ধীর; বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে যেমনটী ছিলেন, আজও ঠিক তেমনটীই আছেন। প্রতিষ্ঠানের কত দিক দিয়ে কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, আপনার জনই এর কত বিরুদ্ধাচরণ করছে, তিনি কিন্তু হাসি মুখে সে সব সয়ে যাচ্ছেন, কোন কিছুই তাঁর সরল সহজ আনন্দের ব্যত্যয় ঘটাতে পার্‌ছে না। মহাসাগরের মতই তিনি গম্ভীর, নির্ম্মল আকাশের মতই তিনি প্রশান্ত। শত ঝটিকা তাঁর চিত্তকে উদ্বেলিত করতে পারে না, শত মেঘের চঞ্চল নৃত্য তাঁর হৃদয়কে অশান্ত কর্‌তে পারে না।

কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বল্‌লেন—"ক্ষমতা পেলেই বুঝি মানুষ তার অপব্যবহার করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ট্রাষ্ট ডীডের পূর্ব্বে আমার আশ্রম মঠে কোন আন্দোলন আলোচনা ছিল না, আমার কথার ওপর কেউ কথা কইত না, আমি যা নির্দ্দেশ করে দিতাম, অবনত মস্তকে সবাই তা স্বীকার করে নিত। যেমনি আমি আমার ক্ষমতা তাদের ওপর অর্পণ কর্‌লাম, অমনি তারা আমারই ঘাড়ে চড়ে বস্‌ল, স্বেচ্ছায় আমি তাদের যে অধিকার দিলাম, সেই অধিকারে অধিকারী হয়ে তারা আমার কাছে আরও বেশী অধিকারের দাবী কর্‌তে লাগল, সাত চড়েও যাদের মুখ দিয়ে কথা ফুট্‌ত না তারাই আবার আমার সঙ্গে অধিকার নিয়ে বিচার বিতর্ক সুরু করে দিলে।

"মুনি-মূষিকের গল্পটা তোমরা সবাই জান বোধ হয়, মুনি কেমন করে অসহায় মূষিকটীকে বাঘে পরিণত করেছিলেন, সে কাহিনী তোমাদের কারও অজানা নেই নিশ্চয়ই। সেই মূষিক বাঘ হয়ে ভাব্‌লে—আমি যে স্বরূপতঃ মুসিক, তা এই মুনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই মুনিকে তার নাম যশের বিঘ্ন স্বরূপ মনে করে সে একদিন তাঁকেই

গ্রাস করতে গেল। মুনি তার অভিপ্রায় বুঝে বল্লেন—'পুন র্মূষিকো ভব'।"

সুরেনদা বলে উঠলেন—"আমরা মূষিক ছিলাম সত্যি, তুমিই তো আমাদের বাঘ করেছ ঠাকুর! আমরা এত অন্যায় করছি, এত বিপরীতাচরণ করছি, কই তবু তো তুমি "পুনর্মূষিকো ভব" বলে আমাদের মূষিক করে দাও নি। তুমি যে আমাদের সকল অন্যায় অনাচার হাসিমুখে সয়ে নিয়ে তিলে তিলে আমাদের গড়ে তুলছ দেবতা!"

ঠাকুর বল্লেন—"মূষিক থেকে বাঘ করার ক্ষমতাই আমার আছে, পুনরায় মূষিক করার ক্ষমতা বুঝি নেই! আমি চাই তোমরা সকলেই বাঘ হও, অপ্রতিহত বীর্য্য হও; আমি চাই তোমরা আমার চাইতেও বড় হয়ে ওঠ। পুত্র হতে, শিষ্য হতে পরাজয়ের আকাঙ্ক্ষা সকল পিতা—সকল গুরুই করে থাকেন। তাতে পিতার—গুরুর গৌরবই বেড়ে যায়। আমিও চাই তাই, বাঘের সন্তান বাঘ হয়ে ওঠ, এক নিগমানন্দ স্থলে তোমরা শত নিগমানন্দ হয়ে যাও।"

ঠাকুরের কথায় রবীন্দ্র নাথের অমর কবিতার কথা মনে পড়্ল, গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর পাঠান শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন—"বাঘের সন্তানে বাঘ হতে না শিখানু যদি, কি শিখানু তবে?"

* * *

রাত্রি অনেক হয়ে গিয়েছিল, সেদিন আর বেশী কিছুর আলোচনা হ'ল না, ঠাকুরের অনুমতি ক্রমে তাঁকে প্রণাম করে আমরা যার যার স্থানে সরে পড়্লাম।

আজ ১১ই পৌষ, সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিন। বেলা দু'টোর সময় সাধারণ সভা আরম্ভ হবে। কাজেই আজ আর কারো বিশেষ তাড়াহুড়ো নেই। দেখ্লাম অনেকেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে ৺ঈশ্বর পুরীর আশ্রম, ৺রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতি পীঠ প্রভৃতি হালিসহরের দর্শনীয় স্থান দেখ্বার জন্যে দলে দলে বেরিয়ে পড়্লেন, কেউ কেউ আবার সাধারণ সভায় উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে কলকাতায় চলে গেলেন, কারণ কল্কাতা তো হালিসহরের অতি নিকটে, নৈহাটী হতে ।৵০ সাত আনা মাত্র রেল মাশুল। অবশ্য যাঁরা কল্কাতা গেলেন, সে দিন আর তাঁরা ফেরেন নি, তার পরদিন সভার সময় এসে হাজির! তাঁদের কলকাতা দেখা কতদুর সার্থকতা পূর্ণ হয়েছিল জানি না, কিন্তু সম্মিলনীর পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ আস্বাদ থেকে যে তাঁরা অতি নির্ম্মম ভাবেই বঞ্চিত হয়ে ছিলেন, তা মুক্ত কণ্ঠে শত বার বল্তেও কুণ্ঠা বোধ করব না। আমি প্রত্যক্ষ করেছি, সম্মিলনীর প্রতিটী ক্ষণে নূতন নূতন ব্যাপার সংঘটিত হয়, প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব আনন্দের বিকাশ হয়। কাজেই এর একটুও বাদ দেবার নেই, অবহেলা করবার নেই, তুচ্ছ ভাব্বার নেই। দোটানা মন নিয়ে এলে সম্-মিলনীর অর্থাৎ সম্যক মিলনের ফল পাওয়া যায় না। 'রথও দেখ্ব কলাও বেচ্ব' এ ধরণের একটা কথা প্রচলিত থাক্লেও সর্ব্বত্র তা খাটে না, স্থানবিশেষে প্রয়োগ করতে গেলে বরং তাতে 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' গোছেরই হয়ে পড়ে। এই সম্মিলনীতেই তার বিশেষ প্রমাণ পেলাম।

যাক্—আজ আবার ৺দীক্ষার দিনও। সাধারণ সভার দিন সকালে আর কোন কাজের ভিড় থাকে না বলে প্রতি সম্মিলনীতে এই দিনটীই ৺দীক্ষার দিন বলে ধারাবাহিক ক্রমে চলে আস্ছে।

নদী বয়ে যায় সাগরের পানে কল্লোল গীতিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। কত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তাদের ধারা ঢেলে দেয় তাতে নিঃশেষে, মহত্ত্বের

সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণ করে বাঞ্ছিত স্থান পাবার জন্যে। নদী কাউকে ডাকে না, আবার আত্মবিসর্জ্জনেও কাউকে বাধা দেয় না, শত শত স্রোতস্বতী এসে জুটলেও সে নির্ব্বিকার চিত্তে তাদের গ্রহণ করে।

মহাপুরুষের জীবনও এমনি। জগদ্ধিতায় সে জীবন উৎসর্গীকৃত। পিয়াসী যে, সে ঢেলে দেয় তার ক্ষুদ্র প্রাণ এই মহাপ্রাণে চিরশান্তি লাভের জন্য, এমনি করে মহতের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে প্রতিনিয়তই কত ক্ষুদ্র প্রবাহ এসে জোটে, মহৎ তাদের আপন করেই নেন।

স্নানান্তে দেখি দীক্ষাপ্রার্থী কয়েকটী তরুণপ্রাণ পুষ্পপাণি হয়ে ঠাকুরের দুয়ারে এসে দাঁড়াল, ঠাকুর তাদের দীক্ষা দিলেন, তাদের নবজীবন লাভ হ'ল।

ঠাকুরের অসুস্থ শরীর, কথা বল্‌তেও কষ্ট হয়, কিন্তু সে দিন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখ্‌লাম, ৯টার থেকে আরম্ভ করে বেলা ২টা পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে তিনি তাদের উপদেশই দিয়ে চল্‌লেন, বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই।

এমনি করে আজ দীর্ঘ দিন ধরে তিনি আত্মদান করে যাচ্ছেন, উপদেশ দিতে বস্‌লে তিনি আত্মহারা হয়ে যান, রোগ যন্ত্রণার কথা তখন আর তাঁর মনেই থাকে না।

* * *

দু'টো বাজ্‌ল। ধীরে ধীরে আশ্রমপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ক্ষেত্র বাবু প্রস্তাব কর্‌লেন স্থানীয় স্কুলের প্রবীণ হেড্‌ মাষ্টার মশায়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্যে, সুরেন বাবু তা সমর্থন কর্‌লেন, সকলে তাতে সম্মতি দিলেন। আনন্দ ধ্বনিতে অভিনন্দিত হয়ে সভাপতি মশায় তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে বস্‌লেন, বরণ প্রথায় তাঁকে মাল্য ভূষিত করা হ'ল। আসনের বিশেষত্ব কিছু ছিল না, চেয়ার টেবিলের নাম গন্ধও ছিল না, সাধারণের জন্যে যে আসন দেওয়া হয়ে ছিল, তারই এক পাশে একখানি কম্বল বিছিয়ে তাঁর আসন রচিত হয়েছিল।

প্রথমেই উঠ্‌লেন হেম বাবু। তিনি সরল সহজ ভাষায় আশ্রম মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গ ধরে বহু বিষয়ের অবতারণা কর্‌লেন। শেষে বল্‌লেন—"আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রথমতঃ মনুষ্যত্ব লাভ, দ্বিতীয়তঃ দেবত্ব লাভ, তৃতীয়তঃ ঈশ্বরত্ব লাভ, চতুর্থতঃ ব্রহ্মত্ব লাভ। ব্রহ্মস্বরূপত্ব না পাওয়া পর্য্যন্ত কারো অভাব মিট্‌বে না, কারো দুঃখ ঘুচ্‌বে না। সারস্বত মঠ এ পথেই আমাদের ডাক্‌ছেন, স্বরূপ প্রাপ্তির পন্থাই আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন।"

তারপর উঠ্‌লেন প্রসন্ন বাবু। তিনি হেম বাবুর কথাকে অবলম্বন করেই তা আরও বিশদ করে তুল্‌লেন, তা আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তাকে আরও স্পষ্টতর করার জন্যে ১৪শ বার্ষিক ভক্তসম্মিলনীতে আমাদের গুরু ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় পঠিত "আমাদের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পড়ে শোনালেন, তারপর বল্‌লেন—"আমার বলার চেয়ে আপনারা এই প্রবন্ধ থেকেই মঠের উদ্দেশ্য ভাল করে বুঝ্‌বার অবসর পেলেন।"

তৃতীয়তঃ উঠ্‌লেন জ্ঞানানন্দ বাবু। তিনি বল্‌লেন—"ভারত জগতের ধর্ম্ম গুরু, শ্রীভগবানের অতি প্রিয় লীলানিকেতন। ভারত তাঁর প্রিয় বলে তিনি এখান থেকে সরে বেশীদিন থাক্‌তে পারেন না, প্রায়ই তাঁকে আস্‌তে হয়, অবতার গ্রহণ কর্‌তে হয়। অবতারে আর সদ্‌গুরুতে আমি বিশেষ কোন পার্থক্য দেখি না। অবতারের উদ্দেশ্য জগতের অধোগতি রুদ্ধ করে তাকে উর্দ্ধে প্রচোদিত করা, ধর্ম্ম সংরক্ষণ করা। সদ্‌গুরুও ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই পৃথিবীতে আসেন। এই যে এক জনকে

দেখে আস্‌ছি, যাঁরা তাঁর সঙ্গলাভ করেছেন তাঁদের জীবনেই একটা কিছুনা কিছু পরিবর্ত্তন এসেছেই, তা একটু লক্ষ্য কর্‌লে সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আর তাঁর এই যে আশ্রম মঠ গঠনের প্রচেষ্টা, তাও জগতের গতি উর্দ্ধমুখী করার সূত্র অবলম্বন করে। আমি তাঁর সঙ্গ পেয়ে যতটুকু বুঝেছি, তাতে যদি আমরা ঠিক ঠিক তাঁর নির্দ্দেশে জীবন পরিচালিত কর্‌তে পারি, তা হলে আমাদের জীবনে শান্তির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী ! * * আমি তাঁকে যেরকম বুঝেছি, সেই ভাবেই প্রকাশ কর্‌লাম। আমার আধার ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র আধার দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করার প্রয়াস আমার বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নয়। আমার পরেই ফণী দা আস্‌ছেন তাঁর কাছ থেকেই আপনারা ঠাকুরের উদ্দেশ্য শুন্‌বেন ভাল ক'রে।"

ফণী বাবু উঠ্‌লেন—বল্‌লেন—"বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বহু সমস্যাই এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, বেকার সমস্যা, এমনিতর কত কি ! এই সমস্ত সমস্যার আবর্ত্তে পড়ে আমরা শান্তি পাচ্ছি না কেউই। এ সমস্ত সমস্যাকে সমস্যা বলে স্বীকার করি, কিন্তু এদেরই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে পারি না কিছুতেই। আসল সমস্যা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা সমস্যা। শিক্ষার অভাবে অশিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের জীবন জর্জ্জরিত হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে এখন প্রকৃত মানুষেরই অভাব। পিতা মাতা চান পুত্র চরিত্রবান হোক্, শিক্ষক চান ছাত্র বিনীত হোক্, প্রভু চান ভৃত্য বিশ্বাসী হোক্। এমনি করে যে দিকেই তাকান যায় সে দিকেই দেখি সর্ব্বত্র মানুষেরই চাহিদা, অথচ এতবড় সমস্যাটাকে ধামা চাপা দিয়ে এর প্রতিকারের কোন প্রচেষ্টা না করে বাজে বিষয় নিয়ে আমাদের দেশে প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা সমস্যার সমাধান না হলে যে কোন সমস্যারই কূল কিনারা পাওয়া যাবে না, দেশবাসীকে আগে মানুষ হতে না শিখালে যে কোন আন্দোলনই সাফল্য মণ্ডিত হবে না তা যেন কেউ বুঝেও বুঝ্‌ছেন না। তাই বলি মানুষকে আগে মানুষ করে গড়ে তুল্‌তে হবে; হাকিম, উকিল, ডাক্তার পরে। সরাস্বত মঠ এই মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের প্রচেষ্টাই কর্‌ছেন, আর এই প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করেই তাঁদের কর্ম্ম ধারা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। আপনারা আসুন, আপনারা এর সঙ্গে আপনাদের মহাপ্রাণ মিলিত করুন, দেখুন, বুঝুন এঁদের প্রচেষ্টা সত্য কিনা, এঁরা যা বল্‌ছেন তাই কর্‌ছেন কি না। সারস্বত মঠ কারো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান নয়, তা দেশের দশের। আজ এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের হাতেই তুলে দিলাম, আপনারাই আজ হতে এর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করে আপনাদের সর্ব্ববিধ সহানুভূতি দিয়ে একে সঞ্জীবিত করে তুলুন।"

সভাপতি মশায় তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত ভদ্র মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন—"আপনাদের মধ্যে যদি কারো কিছু বল্‌বার ইচ্ছা থাকে বল্‌তে পারেন।" সভা নিস্তব্ধ; কেউ উঠে দাঁড়ালেন না, কেউ একটী কথাও বল্‌লেন না। তাই দেখে সভাপতি মশায় নিজের যা বক্তব্য সংক্ষেপে তা প্রকাশ কর্‌লেন। তিনি বল্‌লেন —"পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাদের বক্তৃতা থেকেই আপনারা এঁদের কর্ম্ম পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যতদুর জানা প্রয়োজন সব জেনেছেন। আমি এঁদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন কর্‌ছি। আমি এঁদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের খবর রাখি না, কিন্তু আজ যেখানে আমরা সম্মিলিত হয়েছি, সেই প্রতিষ্ঠানের—এই হালিসহর আশ্রমের সংবাদ কিছু কিছু রেখে থাকি। শিক্ষা বিস্তারের দিকেই এঁদের প্রধান লক্ষ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে একটী ব্রহ্মচর্য্য

বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখানের স্বাস্থ্য অনুকূল না হওয়ায় তাঁরা সে বিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করেছেন। তারপরও বরাবর একাধিক ছেলে এ আশ্রমে থেকে, এঁদের নিয়মাধীনে পরিচালিত হয়ে স্থানীয় স্কুলে পড়া শুনা করে আসছে। এ ছাড়া এঁরা সাধারণের উপকারার্থেও কিছু কিছু কাজ করে থাকেন। সম্প্রতি আশ্রমে একটী নলকূপ বসিয়ে এঁরা স্থানীয় সাধারণের যথেষ্ট উপকার সাধন করেছেন। আপনারা দূরে দূরে সরে না থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে আপন করে নেন, আপনাদের সহায়তা পেলে প্রতিষ্ঠানটী একটী অক্ষয় কীর্ত্তি রূপে হালিসহরের বুকে বিরাজ করবে।"

মনে করলাম, এই খানেই বুঝি সভা ভেঙ্গে গেল। উঠি উঠি করছি, এমন সময় দেখলাম সাধারণের মধ্য থেকে কে একজন উঠে দাঁড়ালেন। উদগ্রীব হয়ে থাকলাম, তাঁর মুখ দিয়ে কি মন্তব্য বের হয়! তারপর শুনি, তাঁর কথায় যেন অমৃত ঝরে পড়তে লাগল। তিনি নানা শাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধার করে প্রাচীন ঋষিদের কত মহান্ উদার হৃদয়ের কথা প্রচার করলেন, তাঁদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের কত প্রশংসা করলেন, সরল দৈনন্দিন জীবন যাপনের সঙ্গে তাঁরা কেমন করে পারলৌকিক মঙ্গলানুষ্ঠান জড়িত করে জীবন মধুময় করে তুলেছিলেন, তার কত কথার অবতারণা করলেন। তিনি বললেন "প্রাচীন ঋষিরাই আমাদের আদর্শ, সে আদর্শ ভুলে গিয়ে ইহকাল সর্ব্বস্ব ভোগবাদের পেছনে ছুটে আমাদের আজ এই দশা! যাঁরা সেই প্রাচীন আদর্শকে আবার আমাদের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁরা নমস্য। যদিও আমি এ আশ্রমের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত নই, তথাপি এঁদের কার্য্যপ্রণালী আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করে আসছি। এঁদের কাজ দেখে, এঁদের সরল অমায়িক ব্যবহার পেয়ে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারা যায় না। আবার যখন লোক মুখে এঁদেরই নিন্দাবাদ শুনতে হয়, তখন ভাবি—নিন্দুকের নিন্দা করাই বুঝি স্বভাব! এমন অনেক সমালোচক আছেন, যাঁরা আশ্রমের ছায়া মাড়ান না, এঁদের কোন খোঁজ খবরই রাখেন না, অথচ তাঁদেরই মুখে যখন আশ্রম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনতে পাই, তখন একটা প্রচলিত গল্পের কথাই মনে পড়ে যায়। গল্পটা এই :—একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। কিছুদিন ধরে সেখানে একজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর প্রকৃতি সরল, স্বভাব অমায়িক। দুষ্ট লোকেরা রটনা করলে সন্ন্যাসী ঠাকুর মানুষ নয়, সে রাক্ষস। ছেলে ধরে ধরে সে খায়, এমনি করে যে গ্রাম উজাড় হতে চলল! সত্বর তাকে গ্রাম থেকে তাড়াতে না পারলে কারো বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। গ্রামের সকলেই সে কথা বিশ্বাস করলে, মস্ত বড় এক সভা বসল। সভার নির্দ্দেশানুসারে ৫।৭ জন সাহসী যুবা সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে গিয়ে সভয়ে করজোড়ে বললে—"ঠাকুর! আপনাকে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমাদের সভা বসেছে, সভার আদেশে আপনাকে এই কথা নিবেদন করছি।"

সন্ন্যাসী বললেন—"গ্রাম ত্যাগের হেতু?"

তাঁরা উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে, আপনি ছেলে ধরে ধরে খান, তাতে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে তাই।"

সন্ন্যাসী বললেন—"চল তোমাদের সভাস্থলেই যাই। সেখানেই আমার যা বক্তব্য তা বলব।"

পথ দিয়ে সন্ন্যাসীকে যেতে দেখে সকলেই ছেলে পিলেদের সামাল দিয়ে আপন আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। সন্ন্যাসী গিয়ে সভায় হাজির হলেন। তাঁকে দেখে সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত

হল। সন্ন্যাসী বললেন—"আমি তো ছেলে ধরে খেতে খেতে গ্রাম উজাড় করে ফেললাম, কেমন? আচ্ছা এখন বলুন তো, কতগুলি ছেলে আজ পর্য্যন্ত আমার পেটে গিয়েছে, আর তারা কার কার ছেলে? এখানে তো সকলেই উপস্থিত আছেন, অনুসন্ধান করুন, যার যার ছেলে ধরে খেয়েছি, তাঁরা উঠে বলুন।"

সন্ন্যাসীর এই কথা শুনে সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্‌তে লাগল, কারো ছেলে ত নষ্ট হয় নি, সকলের ছেলেই যে ঠিক আছে!

আমাদের সমালোচকদের দশাও তাই। কাকে কান নিয়ে গেল এই কথা শুনে নিজের কানে হাত না দিয়ে কাকের পেছনে ছোটার বাতিক অনেকেরই আছে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধান না নিয়ে, ভেতরের খবর না জেনে বিরুদ্ধ সমালোচনা করাটা যে মস্তবড় ভুল! আমি তাই বল্‌ছি— আপনারা সকলে আসুন, এঁদের সঙ্গে মিশুন, এঁদের বুঝবার চেষ্টা করুন, আপনাদের কল্পিত ধারণা নিশ্চয়ই ভেঙ্গে যাবে।"

তাঁর বক্তৃতায় সভায় যেন একটা আনন্দের বিদ্যুত প্রবাহ ছুটে গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সমবেত ভদ্র মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে আবার বহু দূর থেকে এসেছেন, শীঘ্র শীঘ্র তাঁদের ফির্‌তে হবে কাজেই সভাপতি মশায় তখন সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন। সভা ভঙ্গ হল। সভা ভঙ্গের মুখে ঠাকুর বাইরে বেরিয়ে ছিলেন। সকলে তাঁকে প্রণাম করে, তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে সভাস্থান ত্যাগ করলেন।

সাধারণ সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়েদের একটী সভার অধিবেশন হল। ভক্তসম্মিলনীতে মহিলা সঙ্ঘের অধিবেশনের ইতিহাসে এটী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। রাম প্রসাদের স্মৃতিপীঠের সন্নিকটে কুটীর বেঁধে একজন সন্ন্যাসিনী বাস করেন, তাঁকে এ সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি তাঁদের নিয়ে 'গুরুতত্ব' এবং 'গুরুভক্তি'কেই প্রধানতঃ অবলম্বন করে তাঁদের ভেতর একটা নূতন প্রেরণা জাগিয়ে তুল্‌লেন। আমার আর সে সভার বিস্তৃত আলোচনা শুন্‌বার অবকাশ হল না, এদিকে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, আমাকেও সেখানে ছুট্‌তে হল। ওখানের কীর্ত্তন স্তোত্র শেষ হলে পর এখানে এসে দেখি মহিলা সভা শেষ হয়ে গিয়েছে, একটী নূতন অধিবেশনারম্ভের আয়োজন চল্‌ছে। ঠাকুরেরও পৃথক্‌ভাবে এক জায়গায় আসন দেওয়া হয়েছে দেখ্‌লাম। শুন্‌লাম আজ সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিন, সম্মিলনীর প্রথানুসারে আজ তাঁর আরতি হবে।

আমরা বলে থাকি, গুরু 'নরাকার পর ব্রহ্ম'— প্রাচীন ঋষিরাও শাস্ত্র মুখে সে বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। এই বাণী যথার্থভাবে উপলব্ধি কর্‌বার জন্যে, বুঝ্‌বার জন্যে, প্রাণে প্রাণে সেই ভাব উপলব্ধি করে জীবনের সঙ্গে তা মিলিয়ে নেবার জন্যে, ৪ বৎসর ধরে আমাদের মাঝে এ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এ শিলা-প্রস্তরে আরোপিত দেবতার পূজা নয়, এ প্রত্যক্ষ দেবতার জীবন্ত আরতি!

আমাদের এই অনুষ্ঠানের কথা জান্‌তে পেরে অনেকেই হয়ত এর কত সমালোচনা আরম্ভ করে দেবেন, হয়ত কত বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যও প্রকাশ করে ফেল্‌বেন। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি—এখানে সমালোচনা বা মন্তব্য প্রকাশের স্থান কোথায়? ব্রহ্মভাব আরোপ করে যদি শিলামূর্ত্তির—মৃণ্ময়ীমূর্ত্তির পূজারতি সম্ভবপর হয়, যদি তাতে কোন সমালোচনার অবকাশ না থাকে, তবে এখানেই বা থাকবে কেন? মাটী পাথরের স্থানে জীয়ন্ত মানুষকে বসান হ'ল বলে?

আমরা মাটী পাথর অবলম্বন করে পূজা করি বলে পাশ্চাত্য দেশবাসী (আমাদের ভেতরের ভাবের সন্ধান না নিয়েই) আমাদের পৌত্তলিক আখ্যায় আখ্যাত করে বসেন, আবার আমাদের দেশের মাঝে যাঁরা প্রাজ্ঞ এবং প্রাচীন পন্থী, ভাবারোপণে পূজার নিগূঢ় রহস্যের কথা তাঁদের অবিজ্ঞাত না থাক্‌লেও যখন তা কাঠ পাথরের পরিবর্ত্তে মানুষে আরোপিত হয়, তখন দেখি তাঁরা আর তা সহ্য কর্‌তে পারেন না, বলে বসেন – এরা অশাস্ত্রীয় কাণ্ড সুরু করে দিয়েছে! আবার আধুনিক যাঁরা, তাঁরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে, কলাক্ষেত্রে "জয়ন্তী" উৎসব করে জীয়ন্ত মানুষের পূজা কর্‌তে দ্বিধা বোধ করেন না, কিন্তু তা ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেই যেন অমেধ্য হয়ে গেল, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ঘরে-বাইরের সমালোচনার মূল্য তো এই!

দেশান্তরের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে আবহমানকাল মানুষ পূজার প্রথা চলে আস্‌ছে। পুত্রের কাছে পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রত্যক্ষ দেবতারূপেই তাঁদের পূজাবিধি আমাদের দেশে প্রচলিত, পত্নীর কাছে পতি প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রত্যক্ষ দেবতারূপেই পতি পূজার বিধিও শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত, আবার শিষ্যের কাছে গুরু "নরাকার পরব্রহ্ম", তাই পরব্রহ্মস্বরূপেই তাঁর পূজারতির প্রথা আমাদের দেশে চির-অনুষ্ঠিত। মানুষ পূজা—গুরু পূজা আমাদের দেশে নূতন কিছু নয়।

দেখ্‌তে হবে আমরা পূজা করি কার? বাইরের মানুষটীর, না সেই মানুষের ভেতর যে অতিমানুষের দিব্যদ্যুতি প্রত্যক্ষ কর্‌ছি তাঁর? ব্রহ্ম চৈতন্য সর্ব্বত্রেই ব্যাপ্ত, কিন্তু মানুষের মাঝেই তাঁর প্রকাশ বেশী, একথা সবাই স্বীকার কর্‌বেন নিশ্চয়ই। যদি জড় ভাবাপন্ন কাঠ পাথরের মাঝে চৈতন্য সত্তা আরোপ করে আরোপ সাধনায় চৈতন্যময় হতে পারা যায়, তা হলে আমরা যাঁর মাঝে আমাদের ধারণার অতীত চৈতন্যের বিকাশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেই অতি মানুষের পূজা করে কেন চৈতন্যময় হয়ে যাব না? আমাদের কল্পনানুযায়ী ভগবানের সব ভাব যাঁতে প্রস্ফুট দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাঁকে কেন দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা কর্‌তে পার্‌ব না? আমরা যে মানুষ, মানুষ ছাড়া আর আমাদের অতি আপনার কে আছে? পথের সন্ধান, লক্ষ্যের সান্নিধ্য সবই আমরা মানুষের কাছ থেকেই পাই, মানুষেতর থেকে নিশ্চয়ই নয়। তাই মানুষই আমাদের আপন, মানুষই আমাদের পূজ্য!..................

লিখ্‌তে লিখ্‌তে দেখি কত অবান্তর কথাই লিখে ফেল্‌লাম, এরজন্যে আমায় ক্ষমা ক'রো ভাই! হয়তো আমার এই অতি বিস্তৃত চিঠি পড়্‌তে পড়্‌তে বিরক্তিতে তোমার চিত্ত ভরে উঠ্‌ছে, তোমায় তেমন আনন্দ দিতে পার্‌ছি না, কিন্তু না লিখেও যে পার্‌ছি না ভাই! যাক্ আর বেশী বাজে বক্‌ব না, এখন কাজের কথা আরম্ভ করি।

* * *

ঠাকুর এসে আসনে বস্‌লেন তাঁকে পুষ্প সম্ভারে সজ্জিত করা হ'ল, প্রতিমাকে যেমন করে নাকি সাজায়। তিনি স্থির হয়ে বস্‌লেন যেন ঠিক পাথরের মূর্ত্তি!

আমাদের ক্ষেপাদাকে চেন বোধ হয়, তিনি যে ঠাকুরের কি রকম ভক্ত, তা ঠাকুরের ভক্ত মাত্রেই জানেন। ঠাকুর বলেন—"আমিই ক্ষেপা দাসের গুরু, কি ক্ষেপা দাসই আমার গুরু তা আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না।" ক্ষেপা দা এখন বন্যার ষ্টেটে থাকেন, এই সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্যই তিনি সেই সুদূর থেকে ছুটে এসেছেন। তিনিই কর্‌লেন ঠাকুরের আরতি। যেমনি আরতির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল

কাঁসর ঘণ্টার সম্মিলিত বাদ্য সমবেত ভক্তদের আনন্দধ্বনিতে শতগুণিত হয়ে আকাশ বাতাস আলোড়িত করে তুলল। আরতির পর হ'ল নৈবেদ্য নিবেদন, তারপর প্রসাদ বিতরণ! সে নিবেদনের দৃশ্য, সে বিতরণের ভঙ্গিমা, ভক্ত-ভগবানের সে মধুর মিলন স্মৃতি চিরদিন মনে থাক্‌বে, বুঝি আর কখনও ভুলব না, ভুলতে পারব না। যাঁরা সম্মিলনীতে গিয়েও এ মধুর দৃশ্যোপভোগের সৌভাগ্য লাভ কর্‌তে পারেন নি, তাঁদের আমি দুর্ভগ বলেই বল্‌ব।

আরতির পর হ'ল স্তোত্র পাঠ। সম্মিলিত প্রাণের সমবেত কণ্ঠের সে সুর লহর শ্মশানের নিশীথ স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে জানি না কোন্ সুদূর প্রান্তে প্রাণের বেদন বয়ে নিয়ে গিয়েছিল!

মনে করলাম এর পরই বুঝি ঠাকুর উঠে যাবেন, আমাদের কয়েকটীকে নিয়ে কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করবেন। তা আর হল না, ঠাকুর বলে উঠ্‌লেন—"ততঃ কিম্?"

ঠাকুরের এই কথা শুনেই সকলে আসর জমিয়ে বস্‌লাম, দেখতে দেখতে আনন্দ সভা সুরু হয়ে গেল। আনন্দ-সভায় কি বিষয় আলোচিত হয়, আনন্দ সভার উদ্দেশ্য কি তা জান্‌বার জন্যে হয়ত তোমার মনে একটা ইচ্ছা জাগতে পারে। তাই তার কৈফিয়ৎও আগ থেকেই দিয়ে রাখি।

আনন্দ-সভায় ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে শুধু আনন্দই করেন। তত্ত্ব কথার আলোচনা ছেড়ে দিয়ে, বৈষয়িক কাজ কর্ম্মের আলাপন ঠেলে ফেলে ভক্তেরা ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দ করেন, ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে আনন্দ করেন। আধ্যাত্মিক জীবন যাত্রায় এর প্রয়োজনীয়তা কম নয়। গুরু শিষ্যে যত মাখামাখি হবে, যত বেশী মেশামেশি হবে, গুরুশক্তি ততই শিষ্যের মাঝে সঞ্চারিত হতে থাকবে। শিষ্যের চিত্তকে গুরুমুখী করার জন্যে এর আবশ্যকতা আছে নিশ্চয়ই। ঠাকুর আনন্দ সভা করে দেখান যে তিনি আমাদের ভয়ের ঠাকুর নন, প্রেমের ঠাকুর। এমনি করে তিনি আমাদের সঙ্গে অসঙ্কোচে সহজ সরলভাবে মিশে আনন্দ দিয়ে আমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত সঞ্জীবিত করে ধীরে ধীরে আমাদের উচ্চ ভূমিতে তুলে নিচ্ছেন। ব্যবহারিক জীবনেও লক্ষ্য করে থাক্‌বে হয়ত, যে সব ছেলে পড়াশুনা কর্‌তে চায় না, পড়াশুনার নাম শুন্‌লে ভয় পায়, রাত দিন খেলা ধূলা নিয়ে থাক্‌তেই ভালবাসে, অভিজ্ঞ পিতামাতা—অভিজ্ঞ শিক্ষক তাদের খেলাধূলার মধ্য দিয়েই ক্রমে লেখাপড়ার পথে নিয়ে আসেন, নানা লোভনীয় জিনিষের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দিয়ে কাজ আদায় করে নেন। এও যেন তেমনি। তেমনি করেই বুঝি ঠাকুর আমাদের হাসি খেলার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যের পানে নিয়ে চলেছেন!

আজকের আনন্দ সভার প্রধান বিষয় হল বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার কথ্য ভাষার তারতম্য প্রদর্শন। বাঙ্গালার সকল জেলা থেকে ভক্ত সমাগম হয়েছে, একে একে সকল জেলার ভাষার নমুনাই পেলাম। দেখলাম একই দেশ, অথচ তার কথ্য ভাষার পার্থক্য কত! আবার কথ্য ভাষার পার্থক্য থাক্‌লেও তাদের প্রাণের কেমন মিল! ঠাকুর এই বিভিন্ন আচার ব্যবহার সম্পন্ন, বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নিয়ে এক প্রেমের সংসার পেতেছেন।

শুন্‌লাম তো সকল জায়গারই ভাষা, কিন্তু সবটা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রসন্ন দা যখন চাটগাঁয়ের ভাষা বলতে আরম্ভ করলেন, তখন তা উর্দ্দু কি ফার্সী, তেলেগু কি মারাঠী, তা আর বুঝবার উপায় থাক্‌ল না, তিনি তাঁর অবোধ্য ভাষায় আমাদের গালই পেড়ে গেলেন কিনা তাও বুঝে উঠতে পারলাম না। শ্রীহট্টের ভাষাও

কতকটা তাই, কল্‌কাতা অঞ্চলের ভক্তেরা তা শুনে তো হেসেই অস্থির!

এমনি ক'রে সে দিনের আনন্দ সভা শেষ হল। রাত্রিও অনেক হয়ে গিয়েছিল, তাই ঠাকুর সে দিনের মত তা স্থগিত রাখার আদেশ দিলেন। তারপরই তো আরম্ভ হল নৈশ ভোজনের বিরাট ব্যাপার!

* * *

আজ ১২ই পৌষ, সম্মিলনীর শেষ দিন। যাতে সকাল সকাল সভা বস্‌তে পারে তার উদ্যোগ আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌ল। একটু বিশিষ্ট রকমে পুষ্পসম্ভারে ঠাকুরের আসন সাজাবার প্রচেষ্টা চল্‌ছে দেখতে পেলাম, আরও আশ্চর্য্য হলাম তা একজন মায়ের (জনৈকা গুরুভগ্নী) অনুজ্ঞায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে।

আশ্চর্য্য হবার কারণ এই—গুরুভগ্নিটী আমাদের একজন বিশিষ্ট সঙ্ঘনায়কের সহধর্ম্মিণী। আমাদের সঙ্ঘনায়কটী এতদিন তাঁকে ধর্ম্মের সহায়িকারূপে পান নি, পেয়েছিলেন ঠিক বাধা রূপেই। তাই তাঁর ব্যথিত চিত্তের করুণ বেদন আমাদের চিত্তকেও মাঝে মাঝে আলোড়িত করে তুল্‌ত। বাস্তবিক পুরুষ সর্ব্বক্ষেত্রে যদি শক্তিরূপিনী দের সহায়তা না পায়, তবে তার পৌরুষ বিকাশের অবকাশই যে হয়ে ওঠে না! অল্প কিছু দিন হল তিনি তাঁর সহধর্ম্মিণীকে সহ-ধর্ম্মিণীরূপেই পেয়েছেন, তাঁর বুকের ব্যথা ঘুচেছে, মুখে তাঁর হাসি ফুটেছে।

আসন সাজান শেষ হয়ে গেল। তখনও বুঝলাম না এ কুঞ্জ-রচনার প্রয়োজনীয়তা কি, এর সার্থকতা কোথায়?

ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, সকলে এসে সম্মিলন ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন; বেলা তখন সাড়ে আটটা। "নিবেদন" সঙ্গীত গাওয়া হল, স্তোত্র পাঠ শেষ হল, ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করছি, এমন সময় ক্ষেত্র বাবু ঠাকুরের আদেশ জানিয়ে বললেন—'আপনারা সকলে বিভাগানুযায়ী শৃঙ্খলাক্রমে বসে যান, তিনি আস্‌ছেন একটু পরে।'

শৃঙ্খলাক্রমে বস্‌তে গিয়ে যেটুক শৃঙ্খলা ছিল তাও ভেঙ্গে গেল, একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল। এই সুযোগে আমি একেবারে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির! দেখি, ঠাকুর সভায় আসার জন্যে প্রস্তুত হয়েই বসে আছেন। কে জানি বলে গেছে ওদিকের সব ঠিক হলে ঠাকুরকে সংবাদ দেবে।

সম্মিলনীতে ঠাকুরের বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নেই। অন্য সময়ে তাঁর একটা নিয়ম থাকে, নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া কেউ তাঁর সঙ্গে দেখাটীও করতে পারে না, উপদেশও পায় না। আর এই সম্মিলনীতে সর্ব্বক্ষণের জন্য যেন তিনি সকলের ব্যথা-বেদনার কথা শুন্‌বার জন্যে প্রস্তুতই থাকেন। এখনও দেখ্‌লাম তাই। এই একটু মাত্র সময়, সভায় যাচ্ছেন ব'লে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মাঝেই একে একে এসে এক একজন তাদের বক্তব্য বলে যাচ্ছে, শ্রোতব্য শুনে যাচ্ছে। সময় খুব সঙ্কীর্ণ, ২।৩ মিনিট করে সময়, একজন ঘরে ঢুক্‌ছে, কথা শেষ হচ্ছে, চলে যাচ্ছে; আবার একজন ঢুক্‌ছে। এমনি করে দেখ্‌লাম বহুর আশা মিট্‌ল। সকলের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু তিনজন যে কথা বল্‌ল, আর ঠাকুর তার যা উত্তর দিলেন সে সব যেন এখনও কানে লেগে রয়েছে।

একজন বল্‌লে—"ঠাকুর! কাম-ভাবে আমার চিত্ত বড়ই জর্জ্জরিত, এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? আমি যে পশুরও অধম হয়ে গিয়েছি।"

ঠাকুর বল্‌লেন—"কামের হাত থেকে নিষ্কৃতি কেউই পায় না, এমনি তার অপ্রতিহত প্রভাব! আজীবন তার সঙ্গে লড়াই করেই যেতে হবে, যুদ্ধবিরতি দিলে চলবে না। কখনও হারবে

কখনও জিতবে, এমনি ভাবেই জীবন কাটাতে হবে। তারপর যৌবনে তার বিকার স্বাভাবিক, তাকে নির্জ্জিত করবার শুভ ইচ্ছা সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থাক্‌লেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাবও কমে আসবে।"

আর একজন বললে——"তিন বছর হল আমার দীক্ষা হয়েছে, তিন বছরের মধ্যে তিন মাসও ঠাকুরের দেওয়া প্রক্রিয়া সাধন করেছি কিনা সন্দেহ। এখন আর তা করতে মোটেই ভাল লাগে না, সাধন ভজনে প্রবৃত্তি হয় না, পূর্ব্বে যেটুকু ভক্তির ভাব ছিল, তাও যেন আজ নেই, এ অবস্থায় ঠাকুরের কৃপা ভিন্ন আর গতান্তর দেখ্‌ছি না, তাই ঠাকুরের কাছে আমি কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালাম।"

ঠাকুর বললেন——"কৃপা কি মুখের কথা বাবা! এমন নয় যে আমার ভাণ্ডার বোঝাই হয়ে আছে, যেমনি চাইলে অমনি দিয়ে দিলাম। কৃপা আকর্ষণের জন্যও যে সাধনা চাই। আমি যে সামান্য একটু প্রক্রিয়া দিয়েছি, তাই তুমি করছ না, ফল পাবে কেমন করে? আমি গুরু, আমার আদেশ-উপদেশের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাক্রমে চলছ তুমি, আর কিছু হল না বলে আবার আমারই কাছে কৃপার দাবী করছ? যাও আগে আমার নির্দ্দেশিত পন্থায় চল, আমি যে প্রক্রিয়া দিয়েছি দিনে অন্তত: ২ বার তার সাধন কর, দেখ ফল পাও কি না। পুরুষকারের চরমে কৃপার আবির্ভাব, এর পূর্ব্বে নয়। তোমার মাঝে ভক্তির বীজ রয়েছে, তবে তা আবৃত হয়ে। তাকে সাধনার দ্বারা ফুটিয়ে তোল, এই আমার বক্তব্য।"

আর একজন বললে——"দীক্ষা যখন নিয়ে ছিলাম তখন যেন মানসিক অবস্থা খুব ভাল ছিল, আর এখন যেন দিন দিন তলিয়েই যাচ্ছি। কেন এমন হল ঠাকুর?"

ঠাকুর বল্‌লেন—"জীবনটা কতকগুলি স্তরে ভাগ করা রয়েছে, এক স্তরের কাজ শেষ হওয়ার পর আর এক স্তরের কাজ আরম্ভ হয়। যে সময় একটা খুব ভাল স্তরের বিকাশ হয়েছিল জীবনে, তখনই তোমার দীক্ষা হয়ে যায়। এখন আবার যে স্তরের বিকাশ হয়েছে তা আবার একটু নিম্ন ভাব সম্পন্ন, তদনুযায়ী তোমার মনের গতিও নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়েছে। এ ভাব চিরকাল থাক্‌বে না, ভাল স্তরের ক্রিয়া শীঘ্রই আরম্ভ হবে। ব্যস্ত হয়ো না, উতলা হয়ো না। স্বভাব ক্রমে যে ভাবই আসুক জীবনে, হাসি মুখে সবই বরণ করে নিও তাঁর দান বলে, তা হলে কোনটাই আর দুঃখদায়ক হবে না। প্রতীক্ষা কর, শুভদিন এল ব'লে।"

প্রশ্নগুলি যেন ঠিক এক ধরণের, সকলেরই শান্তি-সমস্যা হয়েছে, সকলেই তার সমাধান চায়। উত্তর যা শুন্‌লাম কারো সঙ্গে কারোর মিল নেই। একজনকে বল্‌লেন, আজীবন লড়াই কর, ভয়ের কারণ নেই, যুদ্ধে হারলেও যুদ্ধ চালিয়ে যাও। আর একজনকে বললেন—নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক্‌লে চলবে না, সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হও। আর একজনকে বল্‌লেন—স্থির হয়ে শুভদিনের প্রতীক্ষা কর।

এ থেকেই বুঝে নিলাম, সদ্‌গুরু যাঁরা তাঁরা শিষ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থানুযায়ী আদেশ উপদেশের ব্যবস্থা করে থাকেন। সকলেই কথার উত্তর পেল, প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল।

তারপরই শরৎ বাবু এসে বললেন——"ওদিকে সব প্রস্তুত, সকলেই ঠাকুরের প্রতীক্ষায় আছেন।"

ঠাকুর সভায় চললেন, আমরাও যারা এখানে ছিলাম সকলেই তাঁর অনুগমন করলাম।

তিনি আসন গ্রহণ করতেই "জয়গুরু" ধ্বনিতে আশ্রমাঙ্গন প্রতিধ্বনিত হল, সঙ্গে সঙ্গে দেখি সেই কুঞ্জ-রচয়িত্রী মা'টী ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে প্রণাম করে তাঁকে মাল্য ভূষিত করলেন। অস্পষ্ট ভাষায় ঠাকুরকে যেন কি বললেন, শোনাও গেল না, বোঝাও গেল না। তারপরই দেখি, ঠাকুরের ইঙ্গিতে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সজ্জনায়কটী তাঁরই এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মায়েদের আসন দেওয়া হয়েছিল ঠাকুরের আসনেরই দক্ষিণ ভাগে। সে দিকে মুখ করে মা আমার সাশ্রুনেত্রে বললেন——"ভগিনীগণ, তোমরা জেনে রেখো, পতিই আমাদের পরম গুরু, পতি ভিন্ন সতীর অন্যগতি নাই। আমি আমার এমন স্বামীকে এতদিন চিনতে পারি নি, বুঝতে পারি নি, তাঁর পথ চলায় সহায়তা করি নি, বরং বাধাই দিয়ে এসেছি। তিনি কিন্তু নীরবে সে সব সয়ে গিয়েছেন। আজ আমি আমার স্বামীকে চিনেছি, স্বামীর কৃপায় আজ ঠাকুরকে পেয়েছি, আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে!" এই বলে স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে একটী প্রণাম করলেন। এ দৃশ্য দেখে সকলেরই চিত্ত আনন্দে ভরে উঠল। সকলেই একবার সমস্বরে "জয়গুরু" ধ্বনি করে উঠলেন।

এতক্ষণে কুঞ্জরচনার কারণ সূত্রটী আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম, সার্থকতা সন্ধানের প্রয়াস সার্থক হল।

উভয়েই ঠাকুরের পদধূলি মাথায় নিয়ে নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন। অতঃপর যখন প্রকৃত সভার কাজ আরম্ভ হল, তখন বেলা কম পক্ষে ১০॥ টা।

* * *

তুমি জান বোধ হয় সম্মিলনীতে ঠাকুর ভক্তদের মাঝে একদিন পরস্পর পরিচয় করিয়ে দেন, কে কতটুকু ঠাকুরের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে সে কথাও ব্যক্ত করেন। আজ সেই পরিচয়ের দিন, ভাবলাম প্রথমেই তো আরম্ভ হবে তারই পালা!

এবার কিন্তু আর তাও ঘটে উঠল না, সব রীতিরই যেন এক আধটু ক'রে রদ বদল হল। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন—"প্রথমেই আমি তোমাদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিতাম এই দ্বিতীয় দিনে। (সাধারণ সভা বাদ দিলে ভক্ত সম্মিলনার এটী দ্বিতীয় দিন বৈ কি?) তা যখন এবার কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হল না, তখন পরিচয়েরই বা প্রয়োজন কি? আর যারা বরাবর সম্মিলনীতে এসে থাক তারা তো পরস্পর পরস্পরকে চেনই। তবে এবার যারা তোমাদের নূতন সতীর্থ হল তাদের চিনে রাখ। এই বলে তিনি তাঁদের উঠে দাঁড়াতে আদেশ করলেন। তাঁরা উঠলেন, আমাদের সকলের দৃষ্টি সমভাবে তাঁদের ওপর পড়ল। একটুতে যতখানি পারি সকলকে চিনে রাখ্‌বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, এখন আর কারও চেহারাই স্মরণ নেই।

ঠাকুর বললেন—"আমার সম্মিলনীর প্রধান উদ্দেশ্য তিনটী। (১) আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন (২) সজ্ঞশক্তির প্রতিষ্ঠা (৩) ভাব বিনিময়। আমি চাই তোমরা আদর্শ গৃহস্থ হও, আমি চাই তোমরা সজ্ঞবদ্ধ হও, আমি চাই তোমাদের মাঝে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান চলুক; এমনি করে মর্ত্ত্যেই তোমরা অমৃত আস্বাদনের অধিকারী হও। আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন সম্পর্কে আমি বরাবরই তোমাদের উপদেশ দিয়ে আসছি, সে উপদেশানুযায়ী তোমরা কে কি করেছ আর আদর্শ গৃহস্থ জীবনে সম্বন্ধে কে কি বোঝ, তা এক একজন উঠে বল দেখি।"

ঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সভার মধ্য থেকে দু'চার জন উঠে আদর্শ গৃহস্থ জীবন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা, সে সম্পর্কে তাঁরা কে কতটুকু চেষ্টাযত্ন করেছেন করছেন, আর তা করতে গিয়ে কত বাধা বিঘ্নর সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের, তা বেশ সরলভাবে ব্যক্ত করলেন। ঠাকুর সে সব কথা শুনে বললেন —"তোমাদের কথা শুনে আমি খুসী হলাম, আদর্শ গৃহস্থ জীবন প্রতিষ্ঠা করতে সফলকাম হও বা না হও, তার জন্যে তোমরা যে চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করছ না এই টুকু জেনেই আমি তৃপ্তি পেলাম। আমার ভক্তদের মাঝে এমন ২।৪ জন এখানে উপস্থিতও আছে, যারা প্রকৃতই আদর্শ গৃহস্থ জীবনের ধারা ধরে চলছে, তবে নিজেদের গুণপনা প্রচার করতে তারা একান্তই নারাজ, তাই কেউ আর উঠছে না।

"আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন সম্পর্কে একটা কথা বলে রাখি, জীবনটা করতে হবে আনন্দময়, দুঃখে কষ্টে, রোগে শোকে, জন্ম মৃত্যুতে সর্ব্বাবস্থায় নিজের আনন্দ স্বরূপকে বজায় রাখতে হবে, যারা এ জীবনের সংস্পর্শে আসবে তাদেরও আনন্দে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সেইটেই হবে আদর্শ জীবন। তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের এমনি ভাবে তৈরী করবে, যাতে সহধর্ম্মিণী মনে করে আমার স্বামীর মত এমন স্বামী আর কারো হয় না, ছেলে মেয়ে মনে করে আমাদের বাবার মত এমন বাবা কেউ পায় না, ভাই মনে করে আমার দাদার মত দাদা কারো ভাগ্যে জোটে না, প্রতিবেশী মনে করে এমন প্রতিবেশী কারো মিলে না। সকলকে ভাল বেসে আনন্দ দিয়ে তাদের জীবনটা-কেও মধুময় করে তুলতে হবে যে! এই-ই তো হল আদর্শ গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এদিকে কিন্তু ভাববে তুমি কারো নও, কেউ তোমার নয়; কারো কাছে যেন বাঁধা পড়ো না। আর্য্য-দর্পণে "বৈদান্তিকের গৃহস্থালী" বলে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, এই সম্পর্কে সেইটে ভাল করে পড়ে দেখো।

"সঙ্ঘ-শক্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি বুঝি—বিরোধের একান্ত পরিহার, প্রাণের ঐকান্তিক মিলন। এ মিলন আরম্ভ হবে আপনার ঘরে, আর তা ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে দেশ দেশান্তরে।

"তারপর ভাব বিনিময়ের অর্থ হচ্ছে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান। এই সম্মিলনীই তোমাদের ভাব বিনিময়ের বিস্তৃত ক্ষেত্র। এখানে তোমরা বৎসরান্তে তোমাদের ভাইদের—আপনার জনদের বুকের কাছে পেয়ে পরস্পর সুখ দুঃখ-ব্যথা-বেদনা জানাবে, তোমাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস ব্যক্ত করবে, এমনি করে একের ভাবে অপরের অভাব পূরণ হবে, আশার কাহিনী শুনে নিরাশ প্রাণেও আশার আলোক জ্বলে উঠবে। আমি এখন তোমাদের তারই অবসর দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের আশা নিরাশার কথা, অভিজ্ঞতার কথা, সুখ দুঃখের কথা পরস্পর আলোচনা কর—ভাব বিনিময় কর।"

হঠাৎ দেখি ভক্তদের মাঝ থেকে কে একজন উঠে দাঁড়ালেন। এতদিন সম্মিলনীতে আসছি, আর কোন দিন এঁকে দেখি নি। পরিচয় পেলাম ইনি কলকাতার একজন কবিরাজ মশায়, বছর খানিক হল ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে।" এই বলতে বলতে তিনি গট্ গট্ করে ঠাকুরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভাবলাম কি কথাই বা বলবেন, তার পরেই শুনলাম তিনি ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলছেন—"আমার একজন বন্ধুর অনুগ্রহে এবং আপনার কৃপায় আমি আপনার আশ্রয় পেয়েছি। আমি যেচে আপনার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করি নি, আপনি নিজে থেকে ডেকে স্বেচ্ছায় আমায় মন্ত্র দিয়েছেন। আমিও ঠিক করে রেখেছিলাম যেথে

[মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর

আমি কারো কাছে মাথা বিকাব না, যিনি আমার গুরু হবেন তিনি নিজ হতেই ধরা দেবেন। আমার দীক্ষা ব্যাপারে আমার চিরন্তন কল্পনারই জয় হল। ভাব্‌লাম আর ভাবনা কি, এখন তো সিদ্ধি অনিবার্য্য! আমি উপযুক্ত না হলে কি আর গুরু আমায় স্বেচ্ছায় ডেকে নিলেন? কি তাঁর গরজ পড়েছিল? কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে আমি আমার কোন উন্নতিরই লক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। সাধন ভজনেও প্রবৃত্তি নাই, আর জোর করে তা কর্‌তে যাওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আমি জানি, যিনি সদ্‌গুরু তাঁর বীজ অমোঘ। সেই বীজ আপন শক্তিতে শিষ্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে, কিন্তু এক বৎসর হয়ে গেল, সে বীজের তো অঙ্কুরোদ্গম দেখ্‌ছি না! আমার ক্ষেত্র যদি উসর হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে আপনি বীজ ছড়ালেন কেন? বীজ দেওয়া আপনার ভুল হয়েছে। আর যদি বীজেরই কোন শক্তি না থেকে থাকে তবে অমন শক্তিহীন বীজ আমি চাই না, আপনার শিষ্যত্ব চাই না। আপনি আপনার মন্ত্র ফিরিয়ে নিন

তাঁর এই কথায় সভা যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল, তাঁর এই বাচালতায় অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন, কিন্তু বেয়াদবী হবে বলে সকলে স্থির থাক্‌লেন।

ঠাকুর প্রশান্ত ভাবে বল্‌লেন—"সভার নিয়মানুযায়ী তোমার কথার প্রারম্ভেই আমি তোমাকে বসিয়ে দিতে পার্‌তাম, কিন্তু তা করি নি, তোমার সব কথাই শুনে গিয়েছি। তোমার এ প্রশ্ন করার স্থান এ নয়, এ তোমার ব্যক্তিগত কথা, আমার সঙ্গে বোঝা পড়ার কথা। আমি যদি তোমাকে ঠিক ঠিক না বুঝাতে পার্‌তাম, আমার কথায় যদি তোমার কল্পিত ধারণা না ভাঙ্‌ত তাহলে তুমি সাধারণ ভাবে প্রকাশ্যে এ সব কথা বল্‌তে পার্‌তে। আর এটা হচ্ছে ভক্ত সম্মিলনী, ভক্তেরই প্রাণের কথা এখানে শোনা যাবে, অন্য কারো নয়। কাজেই তোমার কথা বলার অধিকারও তো এখানে নেই।"

"কেন অধিকার নাই ঠাকুর, আমি তো আপনার শিষ্য অতএব ভক্ত, আপনিই তো আমাদের ব্যথা বেদনার কথা জানাতে বল্‌লেন।"

"আমার শিষ্য হলেই ভক্ত হয় না, আবার শিষ্য না হয়েও ভক্ত হয়। যারা আমার কাছে দীক্ষা নেয়নি, অথচ আমার ভাব বুঝেছে, আমাকে চিনেছে, তারাই আমার ভক্ত, আবার আমার কাছে দীক্ষা নিয়েও - আমার শিষ্য হয়েও যতক্ষণ তার সে ভাব না ফুটছে ততক্ষণ আমি তাকে ভক্ত বলে মনে করি না। তুমি আমার শিষ্যই হয়েছ, ভক্ত হও নি। আর এটা হচ্ছে ভক্তসম্মিলনী। আমার শিষ্যদের মাঝে এমন দু'একজন আছে যারা এতদিন হয়ে গেল তবু সম্মিলনীতে আসে না, বলে, "ঠাকুর ঐ "ভক্ত-সম্মিলনী" নামটা বাদ দিয়ে যদি "শিষ্য-সম্মিলনী" নাম দেন তাহলেই আমরা যেতে পারি নতুবা নয়, কারণ আমরা শুধু ঠাকুরের শিষ্যই হতে পেরেছি, ভক্ত হতে পারি নি।" আর বাবা, তুমি শিষ্য হয়েও তো শিষ্য জনোচিত শিষ্টতাটুকু পর্য্যন্ত দেখালে না। এতো তোমার ব্যথা বেদনার অভিব্যক্তি নয়, এ যেন হৃদয়ের কতকটা উষ্মা প্রকাশ। বেশ তো, আমার কাছে যদি কিছু না পেয়ে থাক, পাবার আশা একেবারেই না থাকে, সোজা রাস্তা পড়ে রয়েছে অন্য পথ দেখ। আমি তো কাউকে জোর্‌ করে বেঁধে রাখ্‌তে চাই না। আমার মন্ত্র দেওয়া ভুল হয়েছে বল্‌ছ; তাই স্বীকার করে নিলাম, আমি আমার দেওয়া মন্ত্র ফিরিয়ে নিলাম। আজ থেকে আর তোমায় আমায় গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ থাক্‌ল না, আমার ওপর কোন

দাবী দাওয়ার অধিকারও থাক্‌ল না। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে গুর্ব্বস্তুর গ্রহণ কর্‌তে পার, প্রত্যবায় ভাগী হতে হবে না, আমি প্রাণ ভরে তোমায় আশীর্ব্বাদ করব। যাও এখন বস গে।”

এই বলে তিনি ভক্তদের লক্ষ্য করে বল্‌লেন—“অশ্বিনীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ নাই?”

অমনি দেখি অনেকেই মাথা কাঁড়া দিয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছেন, এমন সময় সর্ব্বতোবৃদ্ধ হরপ্রসাদ দা খুব ব্যস্ত ভাবে উঠে ঠাকুরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে আমি বেশ চিনি, স্বল্পভাষী, যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করে জীবনে যা সত্য বলে বুঝেছেন, সরল ভাবে তা প্রকাশ করাই তাঁর স্বভাব। এ ক্ষেত্রেও হল তাই। তিনি বল্‌লেন—“আমারও দশা এই রকমই হয়েছিল, আমার সতীর্থদের নানা রকমের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়, দীক্ষা নেবার ৬ মাস গত হল, আমার কিন্তু কিছু হয় না। তাই দেখে ভাবলাম আমি অনুপযুক্ত; প্রাণের বেদন জানিয়ে ঠাকুরের কাছে চিঠি লিখ্‌লাম, তার উত্তরও পেলাম। তিনি লিখ্‌লেন—“আধ্যাত্মিক উন্নতি শ্রীভগবান্‌ তথা শ্রীগুরু কৃপা সাপেক্ষ, সাধন ভজন উপলক্ষ্য মাত্র। নিঃস্বার্থ ভাবে গুরুকে ভালবাস্‌তে পার্‌লেই, নিষ্কাম ভাবে গুরুর উদ্দেশ্যে কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌লেই গুরু শক্তি আহরিত হয়ে থাকে।” এই চিঠি পেয়েই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—কেমন করে নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁকে ভাল বাস্‌তে পারা যায়, কেমন করে নিষ্কাম ভাবে তাঁর কর্ম্ম করা যায়? সুযোগ জুটল, তাঁর কর্ম্ম করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। তার পর থেকে দিনে দিনে তাঁর দানে হৃদয় ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে তার ঠেলা সামলানই দায় হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি।”

হরপ্রসাদ দার কথাক’টী সংক্ষিপ্ত হলেও নির্ব্যূঢ় সত্য বলে তা বড়ই প্রাণস্পর্শী হয়েছিল। ঠাকুর বল্‌লেন—“একেই বলে প্রকৃত ভাব বিনিময়, হর প্রসাদকে দিয়েই এ বিনিময় আরম্ভ হল।”

এর পর দু’চার জন ক্রমান্বয়ে উঠে এ সম্বন্ধে দু’চার কথা বলে গেলেন। দু’জনের কথা—সকল না হলেও কিছুটা মনে আছে, তাই সে দু’জনের উক্তিই লিখ্‌বার প্রয়াস পাচ্ছি।

জ্ঞানানন্দ দা কবিরাজ মহাশয়কে লক্ষ্য করে বল্‌লেন—“আপনি একটুতেই এত অধীর হয়ে পড়্‌ছেন কেন মশায়! নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুন, আপনার প্রাপ্য যা, তা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পাবেনই। আমি কিছু করি বা না করি, আমি জানি আমি রাজ রাজেশ্বরের সন্তান, পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে কোন দিন বঞ্চিত হব না, বুক ঠুকে বল্‌তে পারি, আমি কোন দিন ফাঁকিতে পড়্‌ব না। নির্ভয় হন, নিশ্চিন্ত হন, হৃদয় উজাড় করে দিন, চুপ করে বসে থাকুন বিশ্বাসের খুঁটী ধরে, প্রেমের প্লাবনে একদিন সব প্লাবিত হয়ে যাবেই।”

ফণী বাবু বল্‌লেন—“জ্ঞানানন্দ দা যা বল্‌লেন তা ভাবের দিক দিয়ে; আমি এখন যুক্তি-তর্কের দিকটাও দেখাচ্ছি। অবশ্যি অশ্বিনীদার বোঝা উচিত ছিল যে ঠাকুর যখন নিজে ডেকে নিয়েছেন তখন একটা বিহিত করবেনই, এর মাঝে এত শীঘ্র উতলা হয়ে পড়াটা যেন আমার কাছে সমীচীন বলে বোধ হল না। সকল জিনিষেরই ফল সময় সাপেক্ষ, বীজ কিছু ছড়াবা মাত্রই এক দিনে গাছ গজিয়ে উঠে না। অনুকূল মাটী, জল হাওয়া পেলে সময়ে সে গজায়, সকলেরই একটা সময় আছে। আবার সিমেণ্টের মেজেতে কতকগুলো তাজা বীজ ছড়ালেও তাতে গাছ হবে না নিশ্চয়ই, তা কি বীজের দোষ? ক্ষেত্র অনুযায়ী

যে অঙ্কুরোদ্গমের তারতম্য হয়, তা অস্বীকার করলে চলবে কেন? আর একটা কথা, সূর্য্য কিরণের যে কত প্রচণ্ড অমোঘ শক্তি রয়েছে তা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না। আজ একটা প্রকাণ্ড পাথর দেখছি, কালে হয়ত সে পাথরটা সূর্য্য কিরণে রেণু রেণু হয়ে ক্ষয় হতে হতে হাজার বছর পর একদম মাটীতে পরিণত হয়ে যাবে। সূর্য্য কিরণের সে শক্তি রয়েছে। কিন্তু ১০ বছর যেতে না যেতেই যদি দেখি পাথরটা যেমন ছিল তেমনই আছে, সূর্য্য কিরণের শক্তি তো এতে বিন্দুমাত্র ক্রিয়া করে নি, তা হলে সেটা কি সত্যভাষণ হবে? হাজার বছর লাগবে যার ক্ষয় হতে, ১০ বৎসরে তার বিশেষ কি পরিবর্ত্তন বুঝতে পারব আমরা? আমাদের মাঝেও তেমনি কত জীবনের সঞ্চিত সংস্কার রাশি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, সেগুলি ক্ষয়ে গিয়ে সত্যের বিকাশ হওয়া কি কম সহজ কথা, ২।১ দিনের কাজ? আমাদের মাঝে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে, আমরা উন্নত হচ্ছি কি অবনতির দিকে যাচ্ছি, তাই বা বুঝব কেমন করে? মোটের উপর রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কল্পনাটা বৃথা।"

ঠাকুর বললেন—"সকলের মূল হচ্ছে বিশ্বাস, বিশ্বাস না থাকলে কোন পথেই সুফল পাওয়া যায় না, বিশ্বাসহীনের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। যে বুক ঠুকে বলতে পারে কিছু করি বা না করি আমি পাবই, সে বড় কম বীর নয়, কম সাধক নয়। তার বিশ্বাসের জোরেই একদিন তার অভীপ্সিত বস্তু লাভ হবে। নারদ একদিন বীণা বাজাতে বাজাতে বৈকুণ্ঠ পুরীতে যাচ্ছিলেন—পথে একজন পাগলের সঙ্গে দেখা, সে বিড় বিড় করে বকতে বকতে বলল, তাকে জিজ্ঞাসা করো কখন আমার মুক্তি লাভ হবে। রাস্তায় যেতে আর একজন সাধকের সঙ্গে দেখা, তিনিও বললেন তাই। নারদ গিয়ে ত উভয়ের কথাই পাড়লেন। প্রথম ব্যক্তির অর্থাৎ পাগলের কথার উত্তরে বললেন, তার আর তিন জন্ম পরে মুক্তি হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বললেন না। বললেন —তাকে বলো প্রভু সূচের ভেতর হাতী ঢোকান ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন, তাই তোমার কথার উত্তর দিতে পারলেন না। নারদ ফিরে যেতেই সাধক বললেন—কি ঠাকুর! কি আদেশ হল আমার? নারদ বললেন- তিনি তোমার কথারই উত্তর দিলেন না, তিনি সম্প্রতি সূচের ছিদ্রের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড হাতী প্রবেশ করান ব্যাপারে বড়ই ব্যস্ত আছেন। সাধক শুনে বলল—আমার ভাগ্য মন্দ, আমার বুঝি এখনও অনেক দেরী আছে, তাই প্রভু অমন অসম্ভব কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। পাগলের কাছে গিয়ে একথা বলতেই পাগল ত হেসেই অস্থির! বলে—কি আশ্চর্য্য! যাঁর ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চলছে, তাঁর কাছে সূচের ভেতর হাতী ঢোকান ব্যাপারটা এমনিই শক্ত হয়ে উঠল যে কথাটার জবাব পর্য্যন্ত দিলে না? এই বলে ভগবান্‌কে আরও বেশী করে গালাগালি দিতে লাগল। নারদ বুঝলেন, কেন ঠাকুর সাধকের সম্বন্ধে কিছু বলেন নি, আর এর সম্বন্ধেই বা তিন জন্মের কথা কেন বলে ছিলেন!

"তোমাদের কাছে সম্প্রতি আর একটা কথা না পেড়ে থাকতে পারছি না। যে প্রশ্ন নিয়ে এতক্ষণ ধরে আলোচনা চলছে, তোমাদের অনেকের মাঝেই হয়ত এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে গোপন ভাবে জাগে, অশ্বিনী তোমাদের সে সমষ্টিগত ভাবকে যেন পূর্ণ রূপেই ব্যক্ত করে দিল।

"অনেকের ধারণা—ধর্ম্মের পদাশ্রয় গ্রহণ করলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে জীবনটা কাটাতে

পারা যায়। তোমাদেরও অনেকের ধারণা থাক্‌তে পারে—সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়েছি যখন, তখন রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট, বিপদ্‌ আপদ্‌ আমাদের আস্‌বে কেন? কিন্তু পৌরাণিক যুগের কথা ভেবে দেখ দেখি! শ্রীবৎস, নল, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষেরা ধর্ম্মের শরণাপন্ন হয়ে কি কম লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের সখা, সেই পঞ্চ পাণ্ডবেরও ব্যবহারিক জীবন কি কম দুঃখ কষ্টে কেটেছিল? আমি জানি ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে বিপদ্‌ আপদের প্রভাব আরো বেশী বেড়ে যায়। এতে চিত্ত বি-মল হয়, বি-রজ হয়।

"যাক্‌ অশ্বিনী বল্‌ছে সে আমার কাছে এসে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ কর্‌তে পারে নি। কিন্তু সে আমার কাছে কিসের কাঙ্গাল জান কি? সত্যের নয়—দুধ ভাতের। কয়েক দিন পূর্ব্বে সে আমাকে একখান চিঠি দিয়েছিল "ঠাকুর! এখন ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। আশীর্ব্বাদ কর যেন এ দুর্দ্দিনে ছেলে পিলে নিয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দুধে ভাতে থাক্‌তে পারি।" অথচ আজ সে সকলের কাছে প্রকাশ কর্‌ছে যেন তার সত্যের জন্য প্রাণ কত ব্যাকুল!

"প্রার্থনা একমুখী না হলে তাতে কোন ফল পাওয়া যায় না, ভেতর বাহির সমান না হলে সত্যের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

"আমি তোমাদের গুরু, তোমাদের সকল কর্ম্মের বোঝা আমি নিজে গ্রহণ করেছি তোমাদের মুক্তি দেব বলে। আমি আগুন, তোমাদের মাঝে স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ বীজ অর্পণ করেছি তোমাদেরও আগুন করে তুল্‌ব বলে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চিরন্তন সত্য, তার দাহিকা শক্তি অপ্রতিহত। ইন্ধন শুষ্ক হলে তা দপ্‌ করে জলে উঠে, ভিজা হলে ধরতে দেরী হয়। তোমরাও যারা আমার কাছে এসেছ তাদের মধ্যে শুক্‌নো কাঠ তো নাই-ই, সব ভেজা, সব পচা, ধ্বসা, গলা। আমার কাছে তো ভাল কেউ আসে না, আসে যত অধম পতিত। আমিও তো কাউকে ফেলে দিতে পারি না, আমি যে গুরু! প্রতীক্ষা কর, নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বসে থাক। তোমরা যতই হীন হও, যতই তুচ্ছ হও, সকলেই এ'দিন অগ্নিময় হয়ে যাবে। আমার দুয়ার হতে নিরাশ হয়ে কাউকে ফির্‌তে হবে না। তবে যারা কাঙ্গালের মত ভিক্ষা প্রার্থী, আমার দুয়ারে আমার অবসরের প্রতীক্ষায় বসে থাক্‌বার দেরীটুকু যাদের সহ্য হয় না, আমি তাদের বল্‌ছি, স্বচ্ছন্দে অন্য দুয়ারে প্রার্থী হতে পার। আর যারা থেকে থাক নির্ভরশীল, তারা বসে থাক আমার প্রতীক্ষায় লাখ বৎসর ধরে আমার দুয়ারে, আমি আমার মহান্‌ দানে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ করে দেব। অনন্ত কালের তুলনায় লক্ষ বৎসর যে কিছুই নয়। শুনেছি মহাপ্রভু নাকি একদিন ভাবাবেশে বিষ্ণু খট্টায় উপবিষ্ট হয়ে ভক্তদের ডেকে ডেকে বর বিলাচ্ছেন। যবন হরিদাস—ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ঠাকুর হরিদাস বাইরে বসে অশ্রু মোচন কচ্ছেন। সকলকেই সকল রকম বর দিচ্ছেন এই দেখে তিনি বলে পাঠালেন একজনকে দিয়ে—মহাপ্রভু তার সম্বন্ধে কি বলেন। মহাপ্রভু বলে দিলেন হরিদাসকে বল গিয়ে লক্ষ বৎসর পরে সে আমার দর্শন পাবে। হরিদাস এই কথা শুনেই তো উদ্দণ্ড নৃত্য সুরু করে দিলেন। আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"তাহলে পাব, লক্ষ বৎসর পরে হলেও তাঁর দর্শন পাব!" পাব এই ভরসাটুকু লাভ করাও কম কথা নয়! 'হবে' এ আশ্বাস বাণীই বা কয় জনের ভাগ্যে মিলে? আমি বল্‌ছি—তোমরা নিশ্চয়ই একদিন সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী

হবে, সব পাবে। আমার কথায় নির্ভর করে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসে থাক।"

ঠাকুরের এই অভয় বাণী প্রত্যেকের প্রাণ স্পর্শ করল, আশার জোয়ারে সকলের বুক ভরে উঠ্‌ল। কবিরাজ মশায় উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"আমি আমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার ভ্রম ঘুচেছে, পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী আমি বিপরীত বুঝে ছিলাম, এখন আমার সে ধারণা ভেঙ্গে গিয়েছে। ঠাকুরকে যদি আমি সিদ্ধ মহাপুরুষ বলেই না জান্‌তাম, যদি তাঁকে ভক্তিই না কর্‌তাম, তবে তাঁর কাছে ছুটে আস্‌ব কেন? আমি যে তাঁর শিষ্য, তিনিই যে আমার গুরু!"

বুঝ্‌লাম এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনায় তাঁর ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন এসে গিয়েছে, তাঁর কল্পিত ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভেঙ্গে গিয়েছে।

যে ঠাকুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁকে শিষ্যত্বের অধিকার থেকে চ্যুত করে ছিলেন, সেই ঠাকুরই আবার এখন তাঁকে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন—"তুমি সময়ান্তরে আমার সঙ্গে দেখা করো, তোমাকে এ বিষয়ে আরও বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে বল্‌ব।"

গুরু শিষ্যের আবার মিলন হল। শিষ্যের হৃদয়ান্ধকার দূর করে গুরু তাতে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দিলেন। বিচ্ছেদ সূত্র-অবলম্বনে যে অভিনয়ের সূত্রপাত হয়েছিল, এমনি করে মহা মিলনে তা পর্য্যবসিত হল।

* * *

তখন দুটো বেজে গিয়েছে। ঠাকুর বল্‌লেন "তোমরা আর একটু অপেক্ষা কর, আর একটু হলেই সভার কাজ শেষ হবে। যদিও এখন অসময় হয়ে গিয়েছে, তথাপি এখন ভেঙ্গে ফেল্‌লে আজকের মধ্যে আর বস্‌তে পারব বলে ভরসা হয় না। এবার অগ্রহায়ণের আর্য্য-দর্পণে "ব্রতভঙ্গ" বলে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, পড়েছ কি তা তোমরা?"

উত্তর হল—"এখনও অগ্রহায়ণের পত্রিকাই পাই নি।"

ঠাকুর বল্‌লেন "বেশ, তা হলে সেইটাই শোন, তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সভা ভঙ্গ হবে, বেশ নিবিষ্ট চিত্তে শুনে যেও। সকল প্রশ্নের না হোক্, এতে তোমরা তোমাদের অনেক প্রশ্নেরই মীমাংসা পাবে।"

এই বলে তিনি আমায় সেটা পড়ে শোনাবার জন্যে আদেশ কর্‌লেন। আমার বুকটা দুরু দুরু করে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালাম, পড়া সুরু হল। কি ভীষণ lengthy প্রবন্ধ! ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ব্রতভঙ্গ পড়্‌তে পড়্‌তে আমার স্বরভঙ্গ হবার জোগাড় আর কি! আমি হাঁফিয়ে উঠ্‌লাম, কোন প্রকারে সেটাকে শেষ করে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়্‌লাম।

ঠাকুর বল্‌লেন "এই প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, মীমাংসা করা হয়েছে। এ থেকেই বোধ হয় তোমাদের সকল প্রশ্নেরই সমাধান হয়ে গেল। এটা একটা সত্য ঘটনা। আমার আশ্রমেরই কোন সেবক সম্পর্কিত। তোমরা কেউ কিছু না করেই আমার কাছে হঠাৎ কিছুর দাবী করে বস, আর এই যার কথা বল্‌ছি সে তার সর্ব্বস্ব ঢেলে দিতে চেয়ে ছিল ঠাকুরের পায়ে, কিন্তু দেহ-মন তার আন্তরিক ইচ্ছার বিঘ্ন স্বরূপ হওয়ায় সে দেহত্যাগে সঙ্কল্প করে প্রায়োপবেশন ব্রত গ্রহণ করেছিল। তোমাদের মাঝে এমন কয়জন আছ যে সত্যের দরুণ দেহপাতী সাধনে প্রবৃত্ত হতে পেরেছ? যাক্, এইত গেল আমার আশ্রমসেবকের কথা, গৃহস্থ ভক্তদের

মাঝেও একজন এরকম প্রচেষ্টা করেছিল। গতবার সম্মিলনীর সময় সে আমায় বলে—"আচ্ছা ঠাকুর! সাপের গর্ত্তে মণি আছে, সেই মণি যদি কারো জীবনের একমাত্র কাম্য হয়, আর সেই মণি আহরণ কর্‌তে গিয়ে সর্পাঘাতে যদি তার প্রাণ বিনাশ ঘ.ট, তবে তা কি তার আত্মহত্যা বলে গণ্য হবে? আমি বল্‌লাম না। তখনও আমি বুঝ্‌তে পারি নি সে কোন্ মাণিকের কথা বল্‌ছে। পরে জান্‌লাম সত্য লাভ না হলে সে প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হয়েছে, তাই কৌশলক্রমে আমার কাছ থেকে তার অনুমতি নিয়ে গেল। তার পরে সেখানের ভক্তদের কাছ থেকে চিঠি আস্‌তে লাগ্‌ল—অমুক মরার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে, ঠাকুর এর একটা ব্যবস্থা করুন। আমি আর কি কর্‌ব? ভাবলাম, আচ্ছা তার দৌড়টাই দেখি না! আমি জানি আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ হলেও মরবার ক্ষমতাটুকু তাঁর নেই। তা যার নিয়ে এই ব্যাপার সে এখানেই উপস্থিত আছে, এই বলে কামেশ দাকে লক্ষ্য করে বললেন— 'এই কামেশ, তোর ঘটনাটা উঠে দাঁড়িয়ে বল্ দেখি কেমন করে মর্‌তে চেয়েছিলি?'

ঠাকুরের আদেশে কামেশ দা আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করল, মনে হল তার ঘটনার এক বিন্দু বিসর্গও ফাঁক যায় নি। কেমন করে সে প্রকারান্তরে ঠাকুরের অনুমতি নিল, কেমন করে সে হরিদ্বার-হৃষীকেশে ছুটে পালাল, কেমন করে ৪ দিন অনাহারে থেকেও ৪০ মাইল পথ চড়াই করে পাহাড়ের উপর উঠে গঙ্গার খরস্রোতে ঝাঁপ দেওয়ার প্রয়াস পেল, কি স্বপ্ন দেখে তার আবেগ আরও বেড়ে গেল, কোন্ বিবেকের বশবর্ত্তী হয়ে আবার তা হতে প্রতিনিবৃত্ত হল, কেমন করে ঘুরতে ঘুরতে বৃন্দাবনে চলে এল, এসব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হতে লাগ্‌ল—একি বাস্তব ঘটনা!

কামেশ দা বল্‌লে—ক'দিন যে অনাহারে ছিলাম ঠিক আমার তা মনে নাই, তবে ৪।৫ দিনের কম নয় নিশ্চয়ই। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌বার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি, রাত্রিতে স্বপ্ন দেখ্‌লাম যেন গঙ্গার স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সমুদ্রের ঢেউয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে আমি ঠাকুরের চরণপ্রান্তে হাজির হয়েছি। এই স্বপ্ন দেখে ভাব্‌লাম স্বপ্নে পেলে চল্‌বে না, আমাকে প্রকৃতই পেতে হবে। আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, হয় আমার সত্য লাভ হোক্, নয় দেহ পাত হয়ে যাক্। গঙ্গার ওপর গিয়ে বস্‌লাম, পাহাড় খুব উঁচু, নিম্নে—বহু নিম্নে গঙ্গার খরস্রোত বয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে ঝাঁপ দিতে পার্‌লেই সব শেষ। একবার ভাব্‌লাম দেই ঝাঁপ, দেখি ঠাকুর আমায় কোলে তুলে নেন কিনা? আবার ভাব্‌লাম ঠাকুরকে তো ছুটে আস্‌তে হবেই, তা বলে তাঁকে এত কষ্ট দিতে যাব? না—থাক্! আবার ভাব্‌লাম—যদি কোলে তুলে না নেয় তবে আমার আত্মহত্যা যে তাঁরই কলঙ্ক ঘোষণা কর্‌বে, জগতের লোক বল্‌বে তার ঠাকুর তাকে তার ঈপ্সিত বস্তু দিতে পারল না বলে সে আত্মহত্যা করেছে। না—আমি তা সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না, ঠাকুরের নিন্দা হয় এমন কাজ যদি করে যাই তাহলে আমি তাঁর ভক্ত কিসের? —গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আমার আর মরা হল না, ধীরে ধীরে সেখান থেকে রওনা হয়ে একেবারে বৃন্দাবনে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে একটা কুঞ্জবন আছে, ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। রাত্রিতে নাকি প্রতিদিনই সেখানে ভগবান্ রাস লীলা করে থাকেন, কিন্তু রাত্রির বেলায় কাউকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয় না, এর পূর্ব্বে নাকি রাত্রি বাস করতে গিয়ে সেখানে কয়েক জনের

প্রাণ বিনাশ ঘটেছে। এই ব্যাপার শুনে আমার আবার পূর্ব্ব-ভাব জেগে উঠল। আমি সেই কুঞ্জবনে রাত্রি বাস করবার জন্য মনে মনে ফন্দী আঁটতে লাগলাম। ভাবলাম রাত্রি বাস করে যদি রাসলীলা দর্শনের ভাগ্য ঘটে যায়, তাহলে ত মহালাভ, আর যদি মৃত্যুই হয়, তাও তো আমার অনভীপ্সিত নয়। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম, অন্যের অগোচরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুঞ্জবনে ঢুকে পড়লাম। সন্ধ্যার সময় কে যেন বলে গেল—যে আছ ভেতরে বেরিয়ে যাও, গেট বন্ধ হবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি স্থির হয়েই ছিলাম, তার পর যেন মনটা কেমন উতলা হয়ে উঠল, আমি বাইরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, কিন্তু যাবার তো উপায় দেখছি না, লতায় পাতায় পা দু'টী এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। ভাবলাম—যদি কেউ এই অবস্থায় আমায় দেখে ফেলে? —প্রাণপনে ছুটবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু সব বিফল! এমনি করে কতক্ষণ কাটল জানি না, হঠাৎ দেখি আমার পায়ের লতা পাতা কোথায় সরে গিয়েছে, আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। সেই থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম মরার চেষ্টা আর করব না। তার পর তো এই ফিরে এসেছি।"

ঠাকুর বললেন—"নিজে ইচ্ছা করলেই কেউ মরতে পারে না। আমি একজন সাধুর কথা জানি, জীবনে তাঁর সত্য লাভ হল না বলে তিনি নিশীথ রাত্রে লছমন ঝোলা হতে গঙ্গার খর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন তাঁর বাহ্য জ্ঞান ছিল না। যখন তাঁর চেতনা হল—দেখেন তিনি গঙ্গার স্রোতের মাঝখানে একটী পাথরের উপর শুয়ে আছেন, সূর্য্যের তপ্ত কিরণ তাঁর শীতল অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বুঝেই উঠতে পারলেন না—কেমন করে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর শুধু এইটুকু মনে ছিল, গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি মরবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন, নিজের অসহায় অবস্থা দেখে তাঁরই এখন চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হল, ভাবলেন কেমন করে কূলে যাওয়া যায়! আবার তাঁর চিত্তে নির্ভরতার ভাব খেলে গেল, ভাবলেন যিনি আমায় মরণের থেকে উদ্ধার করে এই শিলাপৃষ্ঠে রেখে গিয়েছেন, তিনিই এর ব্যবস্থা করবেন। এই ভাবতে ভাবতেই দেখেন একটী নৌকা তাঁর দিকে কারা যেন বেয়ে নিয়ে আসছে। তার পর তো সেই নৌকা করে তিনি তীরে এলেন।

"আসল কথা হচ্ছে নির্ভরতা। নির্ভর করলে আর কিছুই করতে হয় না। তোমাদের মধ্যে যদি কারো কিছু হয়ে থাকে তবে তা সাধনায় নয়, আমার উপর নির্ভর করে, আমায় ভালবেসে। নির্ভরতার—ভালবাসারও আবার ভাবভেদে তারতম্য রয়েছে। এক জন সাধু ছিলেন—(তাঁর নাম ধাম ঠাকুর বলে ছিলেন, কিন্তু সে সব কথা আমার মনে নেই) ছোটর থেকে তিনি গুরুর আশ্রমেই লালিত পালিত, স্ত্রীলোকের দর্শন লাভ তাঁর আর ঘটে ওঠে নি। একদিন গুরুর আদেশে নগরে এসে এক বাড়ীতে ভিক্ষা চাইতেই একটী যুবতী কন্যা তাঁকে ভিক্ষা দিতে এল। যুবতীর বক্ষে স্তনভার দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন, স্পষ্ট ভাষায় বললেন—'মা তোমার বুকে উঁচু উঁচু ওসব কি?' যুবতী লজ্জিত হয়ে, ক্ষোভে অপমানে একেবারে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির! মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলতে মা সেখানে এসে দেখেন কি একটী সৌম্য মূর্ত্তি কিশোর! এর মধ্যে অসদভিপ্রায়ের লেশ মাত্র থাকার কল্পনা করাও যে অসম্ভব!

মা জিজ্ঞেস্ করলেন—"বাবা, তুমি আমার মেয়েকে কি বলছিলে?"

সাধু বল্‌লেন—"তাঁর বুকে খুব উঁচু উঁচু দেখে ওঁকে জিজ্ঞেস্‌ করেছিলাম—ওগুলি কি? এখন আবার দেখ্‌ছি তোমারও ঐ রকম! আমি ত এর কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। আমি আর কারো এমন বুক উঁচু দেখি নি।"

মা বুঝ্‌লেন, যে তাঁর দুয়ারে আজ এসেছে সে কোন দিন নারীসন্দর্শন করে নি। তা আরও স্পষ্ট বুঝবার জন্যে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা বাবা, তোমার মায়ের কথা মনে পড়ে কি? তুমি কি কোন দিন তোমার মায়ের আদর যত্ন পেয়ে ছিলে?"

"না মা, আমি বরাবরই গুরুর আশ্রমে প্রতিপালিত, মা ব'লে যে কেউ আমার ছিল, সে কথা তো স্মরণ নেই।"

"তুমি যে বাবা আজ এত বড়টী হয়েছ, তা এক দিনে হও নি, ছোট হতেই ক্রমশঃ বড় হয়েছ। ছোট্টটী হয়ে প্রথমে মায়ের কোলে তোমায় জন্ম নিতে হয়েছিল। এমনি করে প্রত্যেককেই মায়ের কোলে জন্ম নিতে হয়। শিশু যখন অসহায় থাকে, নিজের তার আহার সংগ্রহের ক্ষমতা না থাকে, তখন মাতৃস্তন্য পান করেই সে বেঁচে থাকে। আমাদের বুকে যে উঁচু উঁচু দেখ্‌তে পাচ্ছ, তা হচ্ছে মাতৃস্তন। অসহায় শিশুর জন্যে এতে অমৃত সঞ্চিত থাকে।"

"আচ্ছা মা, ওঁর বুক খুব বেশী রকম উঁচু দেখে ছিলাম, আর তোমার তো সে রকম দেখছি না।"

বর্ষীয়সী রমণী সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞা ছিলেন, তিনি তার উত্তর দিলেন—"বাবা, আমার মেয়ের স্তন যে বেশী উঁচু দেখ্‌লে, তার কারণ হচ্ছে ও এখনও মা হয় নি, ওর কোলে এখনও কোন অসহায় শিশু আসে নি, তাই ভগবান্‌ এখন শুধু তাতে অমৃত সঞ্চারই করে যাচ্ছেন। আবার ও যখন মা হবে, তখন তার স্তনও ঢলে পড়্‌বে, আমার মত হয়ে যাবে, কেননা বেশী শক্ত হলে সন্তানের স্তন্য পানে কষ্ট হয় যে বাবা!"

তাঁর এই কথা শুনে মহাপুরুষের একটা দিক খুলে গেল। তিনি তখনই ভিক্ষাপাত্র ফেলে দিয়ে বলে উঠ্‌লেন—আর কেন তবে এ অভিনয়? জন্মাবার পূর্ব্ব হতেই যিনি আমাদের আহার্য্যের সঞ্চয় করে রাখেন, আজও তিনিই সে ব্যবস্থা করবেন। তাঁর ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে সময়ের একি অপব্যবহার করছি আমরা? এই বলতে বল্‌তে সেখান থেকে ছুটে চলে গেলেন।

"সে মহাপুরুষ আজ আর নাই, অনেক দিন হল তাঁর প্রস্থিতি ঘটেছে। কিন্তু আজও তাঁর স্মৃতি বর্ত্তমান, আমি নিজে তাঁর আশ্রম দেখে এসেছি। এখন তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরা সে আশ্রম পরিচালনা করছেন, কিন্তু পূর্ব্বের সে গৌরব আর নাই।

"যাক্‌, এই তো গেল নির্ভরতা বা ভক্তির এক দিক, আর একটা দিকও আছে। তোমরা ভক্ত-প্রবর রূপ-সনাতনের কথা জান বোধ হয়। এক দিন রূপ গোস্বামী ব্রহ্মকুণ্ড তীরে বসে কৃষ্ণধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা আর তাঁর মনেই নেই। ভক্তের অনশনে ভগবানের প্রাণে ব্যথা লাগ্‌ল, তিনি গোপ বালক বেশে তাঁর আহার যুগিয়ে গেলেন। বড় ভাই সনাতন গোস্বামী এই সব ব্যাপার শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে রূপকে খুবই অনুযোগ দিতে লাগ্‌লেন। বল্‌লেন—ভগবান্‌কে এত কষ্ট দাও কেন! তিনি তো তোমার আহার সংগ্রহের উপযোগী সামর্থ্য, তদুপযোগী ইন্দ্রিয়গ্রাম সমস্তই তোমায় দিয়ে রেখেছেন, সে গুলি না খাটিয়ে সামান্য আহারের জন্য তাঁকে কষ্ট দেওয়া ভক্তের পক্ষে কোন দিনই সমীচীন হয় না রূপ!

"যে দিক দিয়েই হোক্ একটা ভাব অবলম্বন করে চল্‌তে হবে। ভাবের আশ্রয় নিলে আর অভাবের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। নির্ভয় কর, নির্ভয় হও। যাক্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি ৩ টাই বেজে গেল। এখন সম্মিলনীর প্রথানুযায়ী সম্মিলনীর অভ্যর্থনাকারী পক্ষ তোমাদের ভাইদের কাছে তোমাদের ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাও, তারপর আগামী সন যারা সভা আহ্বান করবে তারা তোমাদের ভাইদের নিমন্ত্রণ কর।"

নারায়ণ দা উঠে বললেন——"আপনারা বহু দূর থেকে বহু কষ্ট সহ্য করে এ সম্মিলনীতে যোগদান করে আমাদের মহা-আনন্দ দিয়ে গেলেন। আপনাদের উপযোগী আহার বাসস্থানের সংস্থান করতে পারি নি, যা কিছু করেছি তার মধ্যেও বহু ভুল ত্রুটী রয়ে গিয়েছে। আপনারা আজ আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করুন।"

জগৎ দা দাঁড়িয়ে বললেন——"এসমস্ত বিরাট ব্যাপারে ভুল ত্রুটী হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এসমস্ত ভুল ত্রুটীকে আমার ভুল ত্রুটী বলে গ্রহণই করি না, এত কোন সামাজিক মিলন নয়, এ হচ্ছে আমাদের প্রাণের মিলন। এখানে এসে এই কয় দিনে যে আনন্দটুকু পেলাম, তাতেই সমস্ত দোষ ত্রুটী কোথায় যে ভেসে গিয়েছে তার তো এখন খোঁজই পাচ্ছি না।"

মেদিনীপুর জেলা সদস্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন——"এবার যেমন এখানে এসে আপনারা ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দ করে গেলেন, আমি আপনাদের কাছে আনন্দ ভরে নিবেদন করছি, আগামী সন ঠিক এমনি করেই আপনারা সকলে মিলে ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের পশ্চিম বাঙ্গালার শঙ্খকুসুমা আশ্রমে আনন্দোৎসব করবেন, আমি সাদরে আপনাদের আমন্ত্রণ করছি।

সভা ভঙ্গ হল, ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর বিজয় আশীর্ব্বাদ নিয়ে সকলে এসে দাঁড়ালেন মিলন-অঙ্গনে। তারপর যে আনন্দের খেলা চলল তা অভাবনীয়, অবর্ণনীয়!

পূজা শেষ হয়ে গেলে প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়, আনন্দের প্রতিষ্ঠা হয়। বিজয়ার দিন পরস্পর অভিবাদনালিঙ্গন রীতিতেই তা অভিব্যক্ত! চিরাচরিত প্রথানুসারে এই রীতির অনুসরণ তেমন করে বুঝি প্রাণে সাড়া দেয় না, আনন্দ হিল্লোলে প্রাণ তেমন করে বুঝি নেচে ওঠে না। বছরের পর বছর ধরে এমনি করে আলিঙ্গনের অভিনয় করে এসেছি, প্রাণের সাড়া তো পাই নি, বছরের পর বছর ধরে বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান করে এসেছি বিজয় লাভ তো করি নি। আজ এই মহামিলনোৎসবে সকলই বুঝি ফুটে উঠল মূর্ত্ত হয়ে, জীয়ন্ত হয়ে। তাই আজ ফিরে পেলাম প্রাণ, ফিরে পেলাম আনন্দ, লাভ করলাম বিজয়। আনন্দের আতিশয্য মিলনের মহাভূমিকায় আজ সকলকে এক করে দিলে। যা নাকি বহির্জ্জগতে মিলনের প্রধানতম অন্তরায়, সেই আভিজাত্যের অভিমান তো এখানে দেখছি না, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী নির্ধনের অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান কি জানি কেমন করে ঘুচে গিয়েছে। জাতি কুল মানের বহিরাবরণ খসে গিয়ে আজ আসল আনন্দ স্বরূপটী ধরা পড়েছে। আমরা এক হয়ে গিয়েছি।

গুরু যে নির্গুণ তার স্পষ্ট আভাস পেলাম গুরুধামের এই নির্গুণ লীলায়, গুরু যে আনন্দ স্বরূপ তার পূর্ণ অভিব্যক্তি হল এই আনন্দ মেলায়!

* * *

সন্ধ্যা হল, আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল, স্তোত্র কীর্ত্তন শেষ হল। কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় আজ আর আমি তাতে যোগ দিতে পারি নি।

আমরা ছিলাম দশ জন, রাত্রি ৮টার সময় ঠাকুর আমাদের ডাকালেন, আমরা তাঁর সম্মুখে মাটীর উপর সারি দিয়ে বসে পড়্‌লাম।

ঠাকুর বল্‌লেন—"এখন তো তোমাদের কাজ অনেক পাতলা করে দিলাম. কর্ম্মের চাপে তোমরা তোমাদের সাধুত্ব বজায় রাখ্‌তে পার্‌ছ না বলে আমায় অনুযোগ জানিয়ে ছিলে, আমি তাই তোমাদের কাছ থেকে কর্ম্মের বোঝা সরিয়ে নিলাম, তোমাদের অনেকটা অবসর দিলাম। তোমরা প্রকৃত সাধু হও এই আমার ইচ্ছা। আমি তোমাদের ভগবানের চাইতেও বড় করে দেখি, আমার এই ভাবনাকে তোমরা সফল করে তোল। আমি মঠ চাই না, আশ্রম চাই না. আমি চাই শুধু তোমাদের। তোমরা থাক্‌লেই আমার সব থাক্‌বে। তোমরা তোমাদের গৃহী গুরু ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে থেকো, মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয় যেন কখনও। তোমরা অনেকে আমায় অনুযোগ দিয়েছ, আমি নাকি তোমাদের বিশ্বাস করি না। তোমাদের বিশ্বাস কর্‌ব না তো কর্‌ব কাকে? তোমাদের ওপর অবিশ্বাসের ভাব আমি তো কোন দিনই পোষণ করি নি, তোমাদের জমাখরচের খাতাটা পর্য্যন্ত এক দিনও উল্টিয়ে দেখ্‌তে চাই নি। তোমাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেই তো আমার মঠ আশ্রমের সম্পূর্ণ ভার তোমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছি। কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট এসেই আমাদের মাঝে ভাবের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ছিল, সে ঝঞ্ঝাট এবার থেকে অপসারিত করে দিলাম। আমি যে তোমাদের ভালবাসার ঠাকুর, ভয়ের ঠাকুর নই, এ কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রেখো।

"এখন সংক্ষেপে কয়েকটা কাজ কর্ম্মের কথাও বলে রাখি। (১) ঋষি বিদ্যালয় উঠে গেলে ও তোমাদের সাধের-সামর্থ্য আছে, ২।১টী করে অনাথ বালক রেখে শিক্ষা দিতে পার। এ বিষয়ে তোমাদের স্বাধীনতা দিলাম, তোমাদের সুবিধানুযায়ী ব্যবস্থা করো। (২) ত্রৈমাসিক রিপোর্ট আর আমার কাছে পাঠাতে হবে না, প্রজ্ঞানন্দের নামে তা মঠে পাঠিও। মঠে মাসিক হিসাবও আর পাঠাবার দরকার নেই, ত্রৈমাসিক রিপোর্টেই সে কাজ চল্‌বে। রিপোর্ট ট্রাষ্টীদের কাছ থেকে ঘুরে প্রজ্ঞানন্দের কাছেই আবার ফিরে আস্‌বে। প্রত্যেক আশ্রমের রিপোর্টের ওপর ট্রাষ্টীরা সেই সেই আশ্রম সম্বন্ধে মন্তব্য লিখ্‌বে। বৎসরান্তে অর্থাৎ এই সম্মিলনীর সময় তা আবার তোমাদেরটা তোমাদের ফেরৎ দেওয়া হবে, তখন তোমরা সেই মন্তব্যানুযায়ী কার্য্যাদি সম্পাদন ক'রো। (৩) প্রেস সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে যে এবার আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে তাতো তোমাদের অজানা নেই। আশ্বিন মাস থেকে নগদ তহবিল ভেঙ্গে 'আর্য্য দর্পণ' চালান হচ্ছে। এ বৎসরটা আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি স্বীকারই কর্‌তে হল। আগামী বৎসরে যাতে এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করো। তোমরা তো মাঝে মাঝে এক এক পল্লী-সঙ্ঘে যাও, সে সময় তোমাদের গৃহী গুরু ভাইদের অনুরোধ ক'রো যেন প্রত্যেকেই পত্রিকার গ্রাহক হয়, এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশীর মধ্যেও যাতে এর প্রচলন হয় তার চেষ্টা করো। আমি একটা নিয়ম করে দিয়ে ছিলাম আমার শিষ্য মাত্রকেই পত্রিকার গ্রাহক হতে হবে। প্রথম দীক্ষার্থীদেরও সেই নিয়মের কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম বৎসরটি তারা বেশ নেয়, তার পর বছর থেকে আবার বন্ধ করে দেয়। এ সম্পর্কে তোমাদেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে—আর বিভাগীয় সদস্য

আর জেলা সদস্যদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। প্রকৃত পক্ষে সদস্যদের ত্রুটীতেই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। আমার এতগুলি শিষ্য, বাহিরের ভরসা ছেড়ে দিলেও, এদের প্রত্যেকেই যদি পত্রিকা নেয়, তবে পত্রিকা পরিচালনের জন্য চিন্তা করতে হয় কি?"

ইতি পূর্ব্বে তোমাকে আর একটা কথা বোধ হয় লিখতে ভুলে গিয়েছি। এই দিন সভা ভঙ্গের মুখে ঠাকুর বলেছিলেন—"সন্ধ্যার পর তোমরা সকলে মিলিত হ'য়ো, আমিও উপস্থিত থাকব।"

ঠাকুরের সে কথা স্মরণ ছিল, আমরা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই ঠাকুর বললেন—"তোমাদের সঙ্গে যা কথাবার্ত্তা ছিল, মোটামুটি সবই হয়ে গেল। তোমাদের আর বিশেষ কি বলব, বুঝে শুনে কাজ ক'রো। এখন একবার বাইরে যেতে হবে, ওরা অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে।"

* * *

ঠাকুরের বসবার জন্যে চেয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাই দেখে তিনি বললেন—"আজ আর উচ্চাসন নয়, আজ সমভূমি। আমি সকলের সঙ্গে মাটীতেই বসব।" একথা শুনেই তাড়াতাড়ি ক'রে কম্বল বিছিয়ে দিলাম, ঠাকুর আসন গ্রহণ করলেন, ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে চতুষ্পার্শ্বে বসে পড়লেন। রাত্রি তখন বোধ হয় ৯॥ টার বেশী হবে না।

আসন গ্রহণ করেই ঠাকুর গুরুগিরির ব্যাখ্যা আরম্ভ করে দিলেন। শিষ্যদের ভক্ত্যাতিশয্যে গুরুকে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়, তাদের মনস্তুষ্টির জন্যে তাঁকে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কি পরিমাণে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তা ঠাকুর নিজের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী থেকে এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে তাতে করে গুরু গিরির গুরুত্ব (ঠেলা) সম্পূর্ণ উপলব্ধি করলাম। এর কিছু পূর্ব্বেই আমরা যখন ঠাকুরঘরে ছিলাম, তখনই এই রকম একটা কাণ্ড ঘটে ছিল। আমাদের কথাবার্ত্তা চলছে, এমন সময় কে একজন ত্রস্তে ব্যস্তে ১ঘটি জল হস্তে ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি নাকি তখনই রওনা হয়ে যাচ্ছেন, যাবার সময় চরণামৃত নিয়ে যাবেন এই তাঁর ইচ্ছা। সমস্ত দিনে আর তাঁর এ সুযোগ ঘটে নি, তাই এই শীতের রাত্রে এলেন চরণামৃত নিতে। ঠাকুর আর কি করবেন, আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে দিলেন, ভক্তটী কম্পিত হস্তে ঘটীটি কাত করে পা'টী তাতে ডুবিয়ে নিতে যাবেন, এমন সময় জল গেল বিছানায় পড়ে, আর সেই জল মাটীতে গড়িয়ে আমরা যারা নীচে বসে ছিলাম সবাইকে অভিসিঞ্চিত করে দিলে। শীতের রাত্রে এ অভিসিঞ্চন উপভোগ্য হয় নি নিশ্চয়ই, তা তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে।

হাঁ—যা বলছিলাম। তারপর ঠাকুর তাঁর বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, দিন নাই, রাত নাই, এমনি করে তাঁকে যত প্রকার যানের প্রচলন আছে আমাদের দেশে, সর্ব্ব প্রকার যানারোহণে কত দুর্গম স্থানে যেতে হয়েছে, কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটে গিয়েছে, সে সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনে আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। সে সব কাহিনী সবিস্তারে লিখবার অবসর খুবই কম। প্রথম প্রথম খুবই কলম চালিয়ে এসেছি, এই শেষের সময় আর তো কুলিয়ে উঠতে পারছি না। কাজের তাগিদ এমন এসে পড়েছে যে চিঠিটা কোন প্রকারে শেষ করতে পারলে বাঁচি।

যাক্—তারপরই তো আনন্দ সভা আরম্ভ হল।

সভার উদ্দেশ্য তো আমি পূর্ব্বেই তোমায় জানিয়েছি। কালকের চেয়ে আজ যেন ঠাকুর

আবার আমাদের সঙ্গে বেশী করে মিশলেন, আমাদের যেন বুকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রাখলেন। আজ আর ভাষার তারতম্য প্রদর্শিত হল না, আজ হ'ল হাস্য রসাত্মক গল্প প্রভৃতির অবতারণা। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত এ আনন্দের স্রোত বয়ে ছিল, রাত্রি ২টা পর্যন্ত ঠাকুরকে নিয়ে সকলের আনন্দোৎসব চলেছিল।

ঠাকুরের "নাড়ীর ভেতর মসর মসর" করার গল্প, পাকা খুঁটি কাঁচা করে দেওয়ার গল্প, হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর গল্প, ক্ষেপাদার গাড়ু বিক্রীর কথা, ভীমদার "dinner discharge" এর কাহিনী, হেমদার স্বর্গ মর্ত্ত্য একীকরণের বক্তৃতা, লিখতে বসে সব যেন এখন কলমের আগা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। কোন প্রকারে তাদের সম্বরণ করে রাখলাম। নরেশদার নানা রকম স্বরের অনুকরণ, তাঁর অভিনয়ভঙ্গী সকলকে চমৎকৃত করে ছিল, আমি সে সময় আমাদের সুধীরদার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলাম। মনে করেছিলাম, এর সঙ্গে সুধীরদার যোগ হলে যে কি কাণ্ডটাই না হতো! থাক্ ভাই, এ নিয়ে আর বেশী বক্‌ব না।

এ দু'দিনের আনন্দ সভার বিবরণ কালী কলমে লেখা চলে না। লিখতে গেলে রস ভঙ্গ হয়ে যায়। এর পর তোমার সঙ্গে যদি কোন দিন সাক্ষাৎ মিলে সেই দিনই প্রাণ খুলে সব বলব।

যতদূর সম্ভব ৺ অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ব্বেই মঠের মন্দির সংস্কার কার্য্য শেষ হয়ে যাবে। ঠাকুর সে সময় সেখানে গিয়ে নূতন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই আনন্দোৎসবের সময় একবার মঠে যাবার ইচ্ছা রইল।

*　　*　　*

আজ ১২ই পৌষ, বিদায়ের দিন। আজই ফিরতে হবে স্বস্থানে, থাকবার উপায় নেই। নইলে Weekend টিকেট মারা যাবে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে চলে গিয়েছেন, কেউ কেউ আবার যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখনও কিন্তু আনন্দের হাট ভাঙ্গে নি, পঞ্চোৎসব করার জন্য তখন দেখি ভারে ভারে গঙ্গামাটী এনে আঙ্গিনায় জমা করা হচ্ছে। আমার আর এই উৎসবে যোগ দেওয়ার ভাগ্য ঘটে উঠল না, weekend টিকেট আমার থাকার অন্তরায় হল। ফিরতে হবে বুঝে বুকে বাজতে লাগল বড়। ঠাকুরকে প্রণাম করে চোখের জলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম নৈহাটী ষ্টেসনে, বেলা তখন ১০টা।

*　　*　　*

ভোর রাত্রে ফিরে এসেছি। লিখতে বসেছিলাম আনন্দের আতিশয্যে, লিখতে লিখতে সে আনন্দ-ধারা যে কোথায় শুকিয়ে গিয়েছে জানি না। এখন আসছে শুধু হৃদয় জুড়ে কান্না। হৃদয়টা যেন বাস্তবিকই আজ খাঁ খাঁ করছে। তাতে যেন সুধু ব্যথা আর বেদনা! কি কারণে প্রাণটা আজ এমন আকুল হয়ে উঠছে, তাতো বুঝতে পারছি না কিছুতেই। এতগুলি আপনার জনকে ছেড়ে আসতেই কি এই দশা হল! আবার কোন্ দিন তাঁদের সকলকে একত্র পাব, কোন্ দিন আবার এ সম্মিলনী ফিরে আসবে, তাই এখন ভাবছি শুধু।

অনেকে টাকা খরচের ভয়ে সম্মিলনীতে যোগদান করেন না। কিন্তু আমি বলি, সম্মিলনীতে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, যে রসায়নের সংযোগ হয়, হাজার টাকার বিনিময়েও তা মিলে না, তা যে অমূল্য। সামান্য কয়টা টাকা খরচ করলে যদি জীবন পথের আলোর সন্ধান পাওয়া যায়, সাংসারিক কর্ম্ম হতে দু'চার দিন অবসর নিলে যদি আকর্ষণের

বাঁশী শোনা যায়, তা হলে এ মহান্ লাভ হতে স্বেচ্ছায় নিজেদের বঞ্চিত করে যারা, তাদের আমি কি আখ্যায় আখ্যাত করব, তা বুঝে উঠতে পারছি না।

সম্মিলনীর কথা লিখলাম বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক তা তোমার কাছে উপস্থাপিত করতে পারলাম কিনা বুঝতে পারছি না। কারণ আমিতো তখন note করে রাখি নি, আর এ স্বভাবটুকুরও আমার চিরন্তন অভাব। কাজেই লিখতে বসে পর পর যা মনে এল তাই লিখে গেলাম। আমার স্মৃতি-শক্তি যে কত বড় প্রখর তাতো তোমার অজানা নেই, তার ওপর আবার এতগুলি ঘটনা ঠিক ঠিক পর পর সাজিয়ে লেখা—সে যে কি ভীষণ ব্যাপার! তোমার ভাই লেখার অভ্যাস আছে, এক এক দিনে এক একটা বই লিখে ফেলতে পার। আমি কিন্তু এইটুকু লিখতেই হাঁফিয়ে উঠেছি। আমার ভাষার ক্রটী হয়ে থাকলে ক্ষমা করো, ভাবের বিপর্য্যয় ঘটে থাকলে সয়ে নিও।

সম্মিলনী থেকে যে আনন্দটুকু বয়ে নিয়ে এসেছিলাম, তারই উন্মাদনায় এই চিঠিখানা লিখে ফেললাম। জানি না এ চিঠি তোমায় আনন্দ দিতে পারবে কিনা, জানি না এ চিঠি পড়ে তুমি তৃপ্তি পাবে কি না। এই চিঠি পড়ে যদি তোমার সম্মিলনীতে যোগ দেওয়ার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, আর সেই আকাঙ্ক্ষা যদি আগামী সন সম্মিলনীতে তোমায় উপস্থিত করতে পারে, তা হলেই বুঝব আমার এ চিঠি লেখা সার্থক হল, আমার উদ্দেশ্য সফল হল। আসি তবে। ইতি

তোমার " ——"

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২৪শ বর্ষ
সমষ্টি সং ২৬১

মাঘ—১৩৩৮

২য় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে

আরূঢ়স্য বিবেকাশ্বং তীব্রবৈরাগ্যখড়্গিনঃ।
তিতিক্ষা-বর্ম্মযুক্তস্য প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে॥

(সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ)

এ সংসারে কাহার সঙ্গে মানুষ কিছুতেই পারিয়া উঠে না, কাহার প্রতিযোগী দেখিতে পাওয়া যায় না? —যিনি বিবেকরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন, তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাঁহার হস্তে, তিতিক্ষারূপ বর্ম্মে যিনি সুরক্ষিত!

সংগ্রাম সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, আধ্যাত্মিক জগতে যাঁহারা উন্নত হইতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকেও অনবরত সংগ্রাম করিয়াই ধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হয়। সহজে কেহই কাহারও প্রভুত্ব ছাড়িতে চায় না। আধ্যাত্মিক জগতে যাঁহারা উন্নত হন, তাঁহাদিগকে পথ ভ্রষ্ট করিবার, উন্নত হইতে বাধা প্রদান করিবার অসংখ্য শত্রু রহিয়াছে। ধর্ম্মবীর এই সব তুচ্ছ বাধা বিঘ্নকে আত্মবলে পরাজিত করিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম শিখরে আরোহণ করেন।

জয়লাভ করিবার অদম্য চেষ্টা থাকা চাই। শুধু চেষ্টা থাকিলেই চলিবে না—সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বৈরাগ্য চাই—তিতিক্ষা শক্তি চাই, তবেই কঠোর পরীক্ষায় জয়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সংগ্রাম করিতে করিতে নৈরাশ্য আসিলে চলিবে না। ভয় কি? নীচের দিক হইতে যেমন অশুভের আকর্ষণ রহিয়াছে, উর্দ্ধ জগত হইতেও তেমনই শুভের আকর্ষণ রহিয়াছে। কাজেই পূর্ণ চেতনা লইয়া সংগ্রাম করিয়া গেলে জয় অবশ্যম্ভাবী।

আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই, আর কাহাকেও বাহন করিতে নাই—একমাত্র বিবেকই হইবে ধর্ম্মবীরের যথোপযুক্ত বাহন। তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তীব্র বৈরাগ্যরূপ খড়্গ দ্বারা সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করিতে হইবে। তিতিক্ষায় জয়ী হইতে পারিলে সাধারণ শত্রু কাছে ঘেঁসিতেই ভয় পাইবে। আর কাছে আসিলেও তো তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকিবে না।

বিবেক কখনো আমাদিগকে অসত্যের পথে লইয়া যাইবে না। আমাদের যাহাতে কল্যাণ হইবে, বিবেক আমাদিগকে সেই পথেই বহন করিয়া লইয়া যাইবে। কাজেই বিবেকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াও যদিই বা দৈবাৎ কোন শত্রুর মাঝে পড়িতে হয়, তাহা হইলেও চিন্তার কোন কারণ নাই। তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি দ্বারাই সকল শত্রু পরাজিত হইবে।

বিবেক—বৈরাগ্য—তিতিক্ষা, এই ত্রিবিধ ধনে যিনি ধনবান্—তাঁহার প্রতিযোগী হইতে পারে জগতে এমন কে আছে? প্রতিযোগিতা করিয়াও সকল শত্রুকেই তাঁহার কাছে মস্তক অবনত করিতে হয়, পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

সকলেই চায় যাহার যাহার দলবৃদ্ধি করিতে, এই জন্যই গতানুগতিক জীবনে যাঁহার তৃপ্তি নাই, তিনি যদি জড়ত্ব ছাড়িয়া চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্ব সাথীরাই হইয়া উঠে তাঁহার শত্রু। এই একদিক্‌কার নিয়ম—উন্নত হইতে দেখিলে তাহাদের হিংসা উপস্থিত হয়। বহু বাধা বিঘ্ন দ্বারা তাহারা উন্নতিকামীর উন্নতির পথকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়।

আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত হওয়াও বড় সহজ নয়। এই জন্যই মুমুক্ষু যিনি হইবেন, তাঁহাকে যোদ্ধা সাজিতে হইবে। অবশ্য এই যুদ্ধ বাহিরের শত্রুর সঙ্গে নয়—নিজেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সাহায্যকারী যাহারা তাহাদের সঙ্গেই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ—এইরূপ কত শত্রুর নাম করিব ? কেহ কাহারও আধিপত্য সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। অধিকার-লোলুপতা প্রত্যেকেরই রহিয়াছে। কাম—যাহার প্রভুত্ব সকলের চেয়ে বেশী, সে যদি সাধকের ভিতর তীব্র বৈরাগ্যের হস্কা না দেখে, তাহা হইলে কেমন করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইবে ? জগতে তো তাহার ভয়ের পাত্র কেহই নাই। সকলকেই সে অনায়াসে জব্দ করিয়া বসে। কাজেই তাহার প্রতিযোগী হইতে হইলে —তদপেক্ষা বেশী ক্ষমতা অর্জ্জন করা চাই। এই দুরন্ত রিপুকে বশীভূত করিতে হইলে—চাই বিবেক, চাই তীব্র বৈরাগ্য, চাই তিতিক্ষা।

নিয়ত সংগ্রামই সিদ্ধির একমাত্র উপায়। বিজেতা হইয়া গেলে তখন আর সংগ্রামের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধককে যে কতখানি সাবধান হইয়া চলা প্রয়োজন তাহা আর বলিবার নয়। সিদ্ধ মহাপুরুষদের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়াও এক এক সময় এক এক রিপুর আক্রমণে তাঁহাদিগকে কিরূপ নাকাল হইতে হইয়াছে। কাজেই কোন পথই সহজ নয়। সর্ব্বত্রই সাধনার উপর সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে।

সাধকের জীবন সংগ্রামের বিরতি নাই। তবে শত্রু নির্ম্মূল হইয়া গেলে সংগ্রাম অনায়াস হইয়া উঠে। নিজকে সচেতন রাখিয়া চলার সাধনা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করিয়া যাইতে হইবে। নতুবা কোন্ শত্রু যে কখন কোন্ বেশে, কোন্ পথে আসিয়া অহিত সাধন করিবে কে জানে ? এইজন্যই সাধকের জীবন হইবে পূর্ণ চেতনার জীবন। সাধককে গুড়াকেশ হইতে হইবে ;

ঘুমকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া পূর্ণ চেতনায় অধিষ্ঠিত হইতে পারিলেই আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। যাঁহার চেতনা কোন সময় নিষ্প্রভ হয় না,—জাগ্রতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে কোন সময় শত্রু আসিয়া তাঁহাকে অলক্ষ্যে আক্রমণ করিয়া জয়ী হইতে পারে না। সাধনা দ্বারা সকল আড়ষ্ট ভাব হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পূর্ণ চেতনার রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই আসনে যিনি অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, জগতে তাঁহার—প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে।

গলদ কোথায় ?

উচ্ছ্বাসে, আনন্দের অতিশয্যে আমরা এক এক সময় কল্পনাতীত, আশাতীত কাজ করিয়া ফেলিতে পারি। আবার উচ্ছ্বাস—আনন্দ কমিয়া গেলে তেমনি জড়ত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। জীবনকে একভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার লোক খুব অল্পই মিলে। কতখানি সংযম, কতখানি সাধনা আয়ত্ত হইলে তারপর যে মানুষ এক ভাবে দিব্য প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনকে অতিবাহিত করিতে পারে, তাহা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সাত্ত্বিক ভূমিতে আরোহণ করিতে না পারা পর্য্যন্ত জীবনের কাজগুলোর মাঝে একটা বিশৃঙ্খলা থাকিয়া যায়ই যায়। এইজন্যই রাজসিক ভাবের পর তামসিক ভাব আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, উত্তেজনার পর অবসাদ আসিয়া দেখা দেয়। কিন্তু মানুষ যখন সাত্ত্বিক হইয়া যায়, তখন তাহার ভিতর উদ্দীপনা আসে অনন্ত। কিন্তু অবসাদ কোন সময়ের তরেই দেখা দেয় না। সাত্ত্বিক মানুষের একটা প্রধান লক্ষণই এই যে, তাঁহারা সব সময় ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত। তাঁহাদের মাঝে যেন তীব্র অনুভূতির বিদ্যুৎ সর্ব্বদাই খেলিয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য কোন ভাবের কবলে পড়িয়া তাঁহাদের দীপ্তি বিনষ্ট হইয়া যায় না।

আমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ—এই জন্যই সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার সঙ্কেত আমরা জানি না। এক এক সময় আনন্দে লাফাইয়া উঠি, আবার এক এক সময় অবসাদের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে তলাইয়া যাই। চলা ফেরা, উদ্যম চেষ্টার মাঝে একটা সঙ্গতি সামঞ্জস্যের সুর রক্ষা করিয়া চলিতে পারি না আমরা। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—একমাত্র চিত্তশুদ্ধির অভাব। আর শুদ্ধচিত্ত নাই বলিয়াই কর্ম্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আসক্তি এবং গ্লানি অর্জ্জিত হইতে থাকে।

ঝোঁকের মাথায় কাজ করিতে গেলে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কোন কিছুর সম্বন্ধেই স্পষ্ট ধারণা থাকে না। এই জন্যই আবেগ উচ্ছ্বাসের মাঝেও অবিচলিত থাকিয়া যাঁহারা কর্ম্মের ধারা নিরূপণ করেন, তাঁহাদের কর্ম্মে কোথায়ও বিভ্রাট উপস্থিত হয় না। তাঁহাদের জীবন কর্ম্মময়—কিন্তু কর্ম্মের অবসাদ তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। উপর হইতে প্রেরণা পাইয়া পূর্ণ চেতনা লইয়া যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের কাজ চলে নীরবে মন্থর গতিতে ; ভাব প্রবণ, উচ্ছ্বাস প্রবণদের মত তাঁহাদের কাজ হঠাৎ ফাঁপিয়াও উঠে না, আবার হঠাৎ সব চুরমার হইয়া অদৃশ্যও হয় না।

বীর্য্যের শক্তিই হইল ধারণশক্তি। যাঁহারা সংযমী, আমরণ তাঁহারা অক্লেশে খাটিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কখনো তাঁহাদের ভিতর দৈন্য দেখা দেয় না। জাতির জীবনে জীবন সঞ্চার করিতে পারেন এইরূপ নীরব কর্ম্মীরাই! তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালীর মাঝেও একটা সুন্দর সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসে। অতিরিক্ত উত্তেজনা, কর্ম্মোদ্যম যেমন অহিতকর, তেমনি অতিরিক্ত অবসাদ-জড়ত্ব মনুষ্যত্ব উন্মেষের বিঘ্ন সম্পাদক।

লোভ জিনিষটা মানুষের সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। বরঞ্চ আধ্যাত্মিক জগতে বিনামূল্যে 'মুক্তি'রূপ রত্ন সকলেই আহরণ করিতে চায়। নিজকে ফাঁকি দিয়া, নিজের সঞ্চিত সংস্কারকে চাপা দিয়া হঠাৎ বিরাগী সাজিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অষ্টাদশ অধ্যায় ব্যাপী বিচিত্র উপদেশ দ্বারা স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর্য্যবন্ত জাতি কখনও ফাঁকিকে পছন্দ করে না। এইজন্যই তাহারা অন্তরের তীব্র একাগ্র শক্তি লইয়া জীবন ভরা কর্ম্ম করিয়া যায়—ফল প্রাপ্তির সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভাবনাও তাহাদের অন্তরকে উতলা করিয়া তুলে না। তাহাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ফাঁকি না দিয়া কাজ করিয়া গেলে একদিন না একদিন মূল্য পাইবই পাইব।

সাময়িক ভাবে মুক্তির পিপাসা অনেকের চিত্তেই জাগ্রত হয়, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির অভাবে সেই পিপাসাকে স্থায়ী করিতে পারেন কয়জন? এই জন্যই গীতাকার বলিয়াছেন—**নকর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।** কর্ম্ম না করিয়া কেহই নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কাজেই কর্ম্মের ভিতর দিয়াই চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি হইলেই আত্ম জ্ঞান লাভ সম্ভবপর এবং তাহাতে অশেষ কল্যাণও সাধিত হইয়া থাকে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে কেবল মাত্র সন্ন্যাস দ্বারাও কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এই জন্যই সন্ন্যাস লাভের পরও সন্ন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ সাধনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম বিভাগের মূলে গভীর তাৎপর্য্য এবং নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি রহিয়াছে। এই অন্তর্দৃষ্টির বলেই গীতার টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এক জায়গায় বলিয়াছেন—'অথ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি।' আত্ম-জ্ঞান প্রণোদক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সাধকের দেহ-মন-প্রাণ যখন বিশুদ্ধ হইয়া যায়, তখন তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অতীত। কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার চিত্তের আধ্যাত্মিক দীপ্তি ক্ষণেকের তরেও নিষ্প্রভ হইতে পারে না।

মানুষ অনায়াসে সব লাভ করিতে চায়। সিদ্ধিটাই মানুষের চোখে পড়ে বেশী, কিন্তু সেই সিদ্ধির মূলে যে কত ব্যক্ত অব্যক্ত সাধনার, তপস্যার দুঃসহ ক্লেশ রহিয়াছে, সেই কথাটা কেহই ভাবিয়া দেখিতে চায় না। ফল লাভের

অত্যুগ্র লোলুপতাই ইহার কারণ। বুদ্ধদেবও এক জায়গায় ভিক্ষুদের উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'ধর্ম্ম বিনয়েও ক্রমিক শিক্ষা, ক্রমিক কার্য্য, ক্রমিক আচরণ রহিয়াছে। হঠাৎ কেহই অর্হত্ব লাভ করিতে পারে না।' বুদ্ধদেব এক জন্মে সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইতে পারেন নাই—বহু জন্ম অতিক্রম করিয়া কিছু কিছু করিয়া সাধন শক্তি সঞ্চয় করিয়া, তবে তিনি বোধিদ্রুম তলে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেন। কাজেই অধিকারী বিচার তো চাইই, মুক্তিও সময় সাপেক্ষ! আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিব্য প্রেরণা ধারণ করিবার মত সুস্থ সবল বলিষ্ঠ মস্তিষ্ক, মন, বুদ্ধি থাকা চাই, তাহা না হইলে অনেক ক্ষেত্রেই মহাপুরুষদের অহেতুক কৃপায় যে সর্ব্বনাশও হইয়াছে তাহাও দেখা যায়। কাজেই ব্যক্তিগত সাধনার যে বিশেষ মূল্য রহিয়াছে, এই কথা যাঁহারা একটু তলাইয়া দেখিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

বীর্য্য চাই, নিষ্ঠা চাই। বীর্য্য হারাইয়া, নিষ্ঠা হারাইয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা পরীক্ষাচ্ছলেই শিষ্যদের কত বৎসর এমনিই ঘুরাইয়াছেন—ইহা করিবার কারণ আর কিছুই নয়—তাহারা যাহা চায় তাহা তাহাদের প্রাণের চাওয়া কি না, তাহা সম্যক উপলব্ধি করা। মুক্তির পিপাসা যদি তাহাদের আত্যন্তিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়াও তাহাদের সেই অনির্ব্বাণ আকুলতা থাকিবেই, তাহা না হইলে সাময়িক উচ্ছ্বাস সময়ে বিলীন হইয়া যাইবেই যাইবে। আজকাল দু'দিন যাইতে না যাইতেই সকলেই চায় ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া যাইতে। কিন্তু ব্রহ্ম সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার তেজ, তাঁহার দীপ্তি সহ্য করিবার শক্তি আছে কিনা, তাহা বড় কেহই ভাবিয়া দেখিতে চায় না।

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরাই অধিকার নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবস্থাদি করিতেন। পূর্ব্বে গুরুগৃহ বাসের ব্যবস্থা ছিল। শিষ্যের মানসিক গতি, আচার বিচার দেখিয়াই আচার্য্য কাহাকেও সমাবর্ত্তনের দরুণ গৃহে পাঠাইতেন, আবার কাহাকেও সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিতেন। সকলের ভিতর এক বীজ, এক প্রেরণা নাই। কাজেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গুরু যাহার যাহাতে হিত হইবে, তাহারই ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু আজকাল গুরুকে স্বীকার করাও কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বর্ণাশ্রমের তো কোন মূল্যই নাই। স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া যে দিন হইতে আমরা অবাধে আনন্দ করিয়া যাইতেছি, সেই দিন হইতেই আমাদের পতন সুরু হইয়াছে।

বর্ণাশ্রম বিভাগের মূলে ক্রমোন্নতির পথকেই দেখানো হইয়াছে। ক্রমশঃ যাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহাদের উন্নতিই স্থায়ী হয়। কিন্তু আশ্রমোচিত নিয়ম পালন না করিয়াই যাহারা আশ্রমাতীত হইতে চায়, তাহাদের জীবন যে ব্যভিচারে পর্য্যবসিত হয়, তাহা কি আর বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে?

নিষ্ঠা না থাকাতেই আমাদের এত দুর্গতি। সাধন ভজনে, জ্ঞানালোচনায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে সর্ব্বত্রই আমরা নিষ্ঠাহীন। নিয়মিত ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমরা কয়জন চলিতে পারিয়াছি? ধর্ম্মে কর্ম্মে আমাদের এই নিষ্ঠাহীন ভাবই সর্ব্ব অনিষ্টের প্রসূতি।

আবার সেই বৈদিক যুগ, ঋষি যুগ যাঁহারা ফিরাইয়া আনিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রথমেই বিজাতীয় ভাব দূর করিয়া শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সংযম ইত্যাদির ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। গুরুর নির্দ্দেশ, গুরুর আদেশকে প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে।

বুদ্ধদেব শিষ্যদের উপদেশ দিতে গিয়া আর এক জায়গায় বলিয়াছেন—"হে ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র যেমন স্থির স্বভাব বিশিষ্ট, কখনো তীর অতিক্রম করে না, এইরূপ আমার গৃহী বা ভিক্ষু শ্রাবকগণের জন্য আমি যেই শিক্ষাপদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা আমার শিষ্যগণ জীবনের জন্যও লঙ্ঘন করে না। আমার শ্রাবকগণ যে আমার নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাপদ জীবন রক্ষার জন্যও লঙ্ঘন করে না ইহাই আশ্চর্য্য! ভিক্ষুগণ ইহা দ্বারাই আকৃষ্ট হয় বেশী এবং এই জন্যই এই ধর্ম্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়।" কিন্তু আজ কাল তো সকলেই সর্ব্বজ্ঞের আসন দখল করিয়া বসিতে চায়, কাজেই কে কাহার শিক্ষাপদকে শ্রদ্ধাবনত হইয়া স্বীকার করিবে? আচার্য্য শঙ্কর, বুদ্ধ, রামানুজ সকলেই গুরুপদমূলে বসিয়াই চরম জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাচারী হইয়া কবে কোথায় কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে? সকলকেই বিধি-নিয়মের ভিতর দিয়াই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া কেহই মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেবল জ্ঞানেও সুষ্ঠু মুক্তিলাভে অধিকারী হওয়া যায় না, তেমনি আবার নিছক কর্ম্ম দ্বারাও মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। চরম জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সামঞ্জস্যের পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে। ঈশোপনিষদে জ্ঞান-কর্ম্মের মাঝে সমন্বয় করিয়া চলিবার উপদেশই প্রদান করা হইয়াছে। অতিরিক্ত কর্ম্মের পারিশ্রান্তিতে মানবের উচ্চাঙ্গীন বৃত্তি সমূহের বিকাশ অসম্ভব হইয়া উঠে, তেমনি নিছক জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিলেও অন্তর হইতে আনন্দের উৎস শুকাইয়া যায়, হৃদয়ের স্বাভাবিক গুণ গুলিও শেষে অপসৃত হয়।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে কোন আশ্রমকেই অবহেলা করা চলিবে না। আমাদের সকল দুর্গতির মূল, আমরা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলি না তাই। অধিকারী বিচারের ভিতর দিয়াই যে ক্রমশঃ আমরা চরম উন্নতিলাভে সমর্থ হই, এই কথাটী অবিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়াই আজ আমাদের এই দুর্গতি। বেদান্তের 'অনুবন্ধ চতুষ্টয়' 'সাধন চতুষ্টয়ে'র মাঝে গভীর তাৎপর্য্য রহিয়াছে। বেদান্তের উচ্চাঙ্গীন আদর্শ সমূহ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর নয়। ব্রহ্মচর্য্য, সংযম নিষ্ঠা দ্বারা যাহাদের চিত্তশুদ্ধি, বলবীর্য্য সঞ্চিত হয় নাই, তাহারা বেদান্তের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যগুলি হৃদয়ঙ্গমই করিতে সক্ষম হইবে না। অধিকারী বিচার না করিয়া উচ্চ আদর্শগুলি সার্ব্বভৌমভাবে প্রচার করিলে তাহার প্রতিক্রিয়াও দ্রুত দেখা যায়। এইজন্যই দৈনন্দিন সাধনা, নিয়ম সংযমের ভিতর দিয়া জীবন গঠিত হইলেই আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না। বুদ্ধদেব ভগবান্ আছেন কি নাই—এই সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকিতেন, কিন্তু শীলাদি পালন বিষয়ে তিনি বারংবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার মাঝেও যে কল্যাণের নিগূঢ় বীজ সঙ্গোপিত রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সংযম-নিষ্ঠায়, চারিত্রিক গুণে যদি মানুষ গঠিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহারা ভগবানের সন্ধান পাইবেই পাইবে। দেহ-মন-বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে ভগবান সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলেও তো কোন ফল হইবে না। তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিবার সেই শুদ্ধচিত্ত কোথায়,

তাঁহার কৃপা ধারণ করিবার দৈহিক মানসিক শক্তিই বা কই ?

নিজের গলদ অনেক সময় নিজের কাছে ধরা পড়ে না, এইজন্যই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয়ে যাঁহারা জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের দোষ ক্রটী ধরাইয়া দিয়া গুরু তাঁহাদিগকে কল্যাণের পথে প্রচোদিত করেন। ক্লীবত্ব, জড়ত্ব, অবসাদ আসিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। তখন জীবনের একজন দিশারীর যে খুবই প্রয়োজন তাহা আর বলিবার নয়। পূর্ব্বে ছিলও তাই। অর্জ্জুনের পেছনে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, রামের পেছনে ছিলেন বশিষ্ঠ দেব। এই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর অনর্গল উপদেশ বাণীতে উবুদ্ধ হইয়া তাহার পর তাঁহাদের জীবন আদর্শস্থানীয় হইয়াছে। নিজের খেয়ালবশে কোন সময় আমাদের সাধন ভজন পিপাসা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, কোন সময় প্রচণ্ড কর্ম্মস্রোতে জীবন ঢালিয়া দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠি—কিন্তু জীবনের উন্নতির পক্ষে যে কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহা একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন গুরুই বলিয়া দিতে পারেন।

মহাপুরুষদের নির্দ্দেশকে জীবন দিয়া যাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনই আদর্শ জীবনে পরিণত হইয়াছে। ফাঁকি দিয়া কেহই চরম জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের এই দুর্গতির দিনে সাধন নিষ্ঠা যে খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে তাহা আর কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। ফল লাভে ব্যগ্র না হইয়া সংযম নিষ্ঠার প্রতি আমাদের খুব লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। গুরুর আদেশ, গুরুর বাক্যকে নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিয়া চলিলে আক্ষরিক জ্ঞান না থাকিলেও যে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানটীর তাৎপর্য্য কি ? নিছক শ্রদ্ধা দ্বারা মানুষ কতখানি উন্নত হইতে পারে, তাহাই দেখানো হয় নাই কি ?

বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতি আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে অনুকরণ করিয়াছি। তাই শ্রদ্ধার জায়গায় আস্তিক্য বুদ্ধির স্থলে অবিশ্বাস, সংশয়ই অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রদ্ধার বস্তুকে বিশ্লেষণ দ্বারা অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পারি আমরা। এই বিশ্লেষণ বুদ্ধি কেবল পরের গলদ ক্রটী বাহির করিবার বেলায়ই প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিজের জীবনের গলদগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারার্থে উঠিয়া পড়িয়া লাগি আমরা কয়জন ? কাজেই সর্ব্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ ধারা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না।

কাজেই তাঁহাদের অনুকরণপ্রিয় না হইয়া শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় ঋষিদিগকেই আমাদের আদর্শরূপে ধরিতে হইবে। সত্যনিষ্ঠ না হইলে জীবন কখনো উন্নত হয় না। অপরের উপর দোষারোপ করিবার আগে প্রত্যেকের নিজেদের জীবন যাপন প্রণালীর মাঝে অসংযম ব্যভিচার আছে কিনা তাহাই তলাইয়া দেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কোনরূপ ভণ্ডামী না করিয়া ঋষিদের প্রদর্শিত পথে চলিলে জীবনের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আর কিছু না—এই কথাটীই আমাদের আজ প্রাণপণে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সেই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া জীবন গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। ত্যাগে, সংযমে, শ্রদ্ধায়, নিষ্ঠায় যখন আমরা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব—তখনই আমাদের প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত শ্রেয়োলাভ ; ইহার পূর্ব্বে উন্নতির আশা করাও দুরাশা মাত্র।

——ওম্——

সিদ্ধির সঙ্কেত

কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে যেন আবিলতা না আসে। কর্ম্ম কর্‌ছি বলে যেন অভিমানের ছোঁয়াচ না লাগে। কর্ত্তার অভিমানের বালাই থাক্‌লেই বুঝ্‌তে হবে ঠিক ঠিক কর্ম্ম করা হয় নি, নিজকে ঠিক পথে পরিচালিত করা হয় নি। নিজের মধ্যে অনন্তত্বের বীজ পুঁতে কর্ম্ম করাই হচ্ছে প্রকৃত কর্ম্ম। কর্ম্ম কর, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় আত্মার মহিমাকে যেন খর্ব্ব করা না হয়। কর্ম্ম অবশ্য ক্ষুদ্র হ'তে পারে, জগতে নাম জাহির কর্‌বার মত কিম্বা যশ পাবার মত তা না-ও হতে পারে, কিন্তু নিজের আত্ম মহিমা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, আর তোমার কর্ম্মের আদর্শে যদি আরও দশ জন জড়ত্ব পরিহার কর্‌তে পারে, আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যায়, এবং আত্ম জ্যোতিতে নিজের জীবনকেও উজ্জ্বল করে তুল্‌তে পারে, তা হলে সেই কর্ম্মকে তো তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুধু বাইরে থেকে বিচারের মাপকাঠী দিয়ে কর্ম্মের পরিমাপ করা যায় না, কর্ম্মকে নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব কর্‌তে হয়।

কর্ম্মকে অন্তর দিয়ে অনুভব না কর্‌লে আলোক এবং আনন্দ পাওয়া যায় না। সেখানে কেবল অন্ধকার! অন্ধকার! মোহ গর্ত্তের সৃষ্টি! জড়ত্বের পরিণাম! কর্ম্মকে অন্তর দিয়ে অনুভব কর্‌লে জড়ত্বকে কাটিয়ে চেতনার দিকে —আলোর দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে ক্রমশঃ জড়ত্বের বন্ধন ছিন্ন হতে থাকে। সাপের খোলসের মত জড়ত্ব খসে পড়্‌বে, একটা অনাবিল অনাস্বাদিত আনন্দের তরঙ্গ জীবনের ভেতর খেলে যাবে।

আমি আর আমার জীবন এ দু'টো যেন পৃথক জিনিষ। জগৎ সমুদ্রের মধ্যে যেন বুদ্‌বুদের মত জীবনটা ভেসে চলেছে। অপর অসংখ্য জীবনের সঙ্গে আমার জীবনটীও মিশে গেল, আর আমি সকলের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সমগ্র জীবনের দ্রষ্টা এবং সাক্ষী হয়ে রইলাম! দেখ্‌তে লাগলাম জীবন গুলো সবই কর্ম্ম-সূত্রে গাঁথা। মহাসাগরের বুকে বুদ্‌বুদের মত কর্ম্মের সমষ্টি নিয়ে এক একটী করে অসংখ্য জীবন গড়ে উঠ্‌ছে, কর্ম্ম শেষে আবার সে সব কাল সাগরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই রকম করেই অনন্ত কাল ধরে প্রকৃতির খেলা চল্‌ছে, আর অনন্ত কাল ধরে প্রকৃতির এই খেলা দেখাই হচ্ছে বেদান্তের দ্রষ্টৃভাব বা সাক্ষিভাব!

ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী মহা সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হচ্ছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জীবও ভূমার দিকে— অনন্তের দিকে কর্ম্মের ভেতর দিয়ে ছুটে চল্‌ছে। পরোক্ষে-অপরোক্ষে সবাইকে কিন্তু নিজেদের স্বার্থ কিছু পরিমাণ হলেও ত্যাগ কর্‌তে হচ্ছে। গাছ ফল ফুল-ছায়া দিচ্ছে, মায়ের স্তন থেকে ছেলের জন্যে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছে, এ-ও ভূমারই মহিমা—মহা প্রেমের ক্ষুদ্র নিদর্শন! গাছকে কাটা যায়, গাল দেওয়া যায়, যা খুসী তাই করা যায়, তবু ফল ফুল ছায়া দেওয়ার প্রকৃতি সে ছাড়্‌তে পারে না। গাছ অপরোক্ষে নিজের ক্ষুদ্র অহংকে ত্যাগ করেছে, অন্তর প্রকৃতিতে তাকে ত্যাগ

করাতে বাধ্য করছে। জীবজন্তু, গাছপালা এদের কোন বুদ্ধি বিবেচনা নাই, তবু এদের কাছ থেকে অপরে কতখানি উপকার লাভ করছে, এটাই হল অন্তর-প্রকৃতির চিরন্তন মহিমা!

আমি আজ মানুষ ব'লে বাজে বকে মরছি, বাজে কাজ করছি, আমার অন্তরের চিরন্তন প্রকৃতিকে অবজ্ঞা কর্ছি, তুচ্ছ ভোগের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হয়েছি, ইহাই স্বার্থ, অজ্ঞান, ক্ষুদ্র অহমিকা!

মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, নিজের স্বার্থ-নিঃস্বার্থ বুঝ্বার ক্ষমতা আছে। বহুজন হিতায় কর্ম্ম করতে গেলে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে আঘাত পড়ে, এতে বাইরের ক্ষুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে অন্তর প্রকৃতির দ্বন্দ্ব করবার একটা বিরোধ সূত্র এসে পড়ে, অর্থাৎ দু'য়ের মাঝে Royal Struggle চল্তে থাকে। একদিকে 'বহুজন হিতায়' কর্ম্ম অপর দিকে ক্ষুদ্র স্বার্থ! চিন্তাবীরকে—কর্ম্মবীরকে বহুজনের সঙ্গে আত্মব্যাপ্তি করে নিতে হবে, তবেই কর্ম্ম করা সার্থক হয়ে উঠ্বে। এমনি করে কর্ম্মের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে ব্যাপ্তির দিকে নিতে নিতে অভ্যাসের ফলে একদিন ক্ষুদ্র আমির মধ্যেই মহান্ আমি ফুটে উঠ্বে, অহং এর স্থলে সোঽহং এর প্রতিষ্ঠা হবে।

অন্তরের দিব্য প্রেরণা নিয়ে কাজ করতে হলেই ক্ষুদ্র স্বার্থে আঘাত পড়্বে, আর স্বার্থে আঘাত পড়্লেই বহিঃপ্রকৃতিও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্বে। এই সময়েই নিজের চিন্তাধারার balance ঠিক রাখা চাই। ভূমার দিকে আত্মচেতনাকে প্রচোদিত করে তুল্তে হবে, এদিকে অন্তরে তোমার দ্বন্দ্ব চল্তে থাকুক, ক্ষতি কি? দ্বন্দ্ব চলাটাই তো সাধনা! তা নইলে বুঝ্তে হবে তুমি একটা জড় পিণ্ড! জড় পদার্থই বুঝ্তে পারে না, নিজের ভোগ কি, দুর্ভোগ কি! ত্যাগ, যোগ, তপস্যা সবই ওই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে যাবার জন্যে। ভেতরে দ্বন্দ্ব চল্লেই বুঝ্তে হবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

একদিন দু'দিনে কিছু হবার নয়, বহুদিন অভ্যাসের ফলে কর্ম্ম করতে করতে বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করবেই, ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে যাবেই।

অন্তঃপ্রকৃতি চিরন্তন সত্য, বহিঃপ্রকৃতি পরিণামশীল। অন্তর প্রকৃতিকে উদ্বোধিত করবার জন্যই কর্ম্মের প্রয়োজন। ইহাই কর্ম্মের কৌশল বা গীতার কর্ম্মযোগ।

গীতায় শ্রীভগবান্ বল্ছেন—কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মফলে যেন আসক্তি না থাকে। এতে বুঝা যাচ্ছে, কর্ম্ম শুধু কর্ম্মই নয়, কর্ম্ম হচ্ছে মানুষের সাধনা। নিজের গণ্ডীবদ্ধ আমিকে ব্যাপ্তিতে ছাড়িয়ে দেওয়া, বহুর মধ্যে একের নিদর্শন পাওয়া, ইহাই হইল কর্ম্মের উদ্দেশ্য। এইজন্যই কর্ম্ম হবে "আত্মনো মোক্ষায়, বহুজন হিতায় জগদ্ধিতায় চ।" কর্ম্মের ভেতর দিয়েই প্রত্যেকের মাঝে নিজকে উপলব্ধি করতে হবে।

সর্ব্বত্রই যাঁদের আত্মানুভূতি জেগেছে, তাঁদের কোন কর্ম্ম অকর্ম্ম থাক্তে পারে না। আবার কর্ম্ম না করে তাঁরা বসেও থাকতে পারেন না। তাঁদের অন্তরের প্রেরণাতেই সমস্ত কর্ম্ম হতে থাকে। তাঁদের কর্ম্মের মধ্যে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাক্তে পারে না। সাধারণ লোকের মত তাঁদের দুঃখ আছে, বেদনা আছে, কিন্তু জ্বালা নাই। সে দুঃখ-বেদনাতে তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হন না। বরং সে দুঃখ-বেদনার মাঝে তাঁরা অজস্র কর্ম্ম করবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের মাঝে অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন। তাঁদের কোন পাপ-পুণ্য থাক্তে পারে না, কেন না তাঁদের জীবনে কোন আসক্তি

নাই। আসক্তিই মানুষের দুঃখ এবং পাপ। তাঁদের সুখ দুঃখ নাই, পাপ-পুণ্য নাই, কর্ম্ম অকর্ম্ম নাই, তাঁরা যে সকলের অতীত! কোন বন্ধনই তাঁদের বেঁধে রাখ্‌তে পারে না, কোন জাগতিক কারণই তাঁদের আনন্দের ব্যাঘাত দিতে সমর্থ হয় না। মানুষদেহে বর্ত্তমান থেকেও তাঁরা দেবতা, নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনায় তাঁরা সিদ্ধ!

* * *

ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে কর্ম্ম কর্‌লেই কর্ম্ম করেও মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়, অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যায়। এরই নাম কর্ম্মের কৌশল, সিদ্ধির একমাত্র সঙ্কেত হল এই!

সাংখ্য সূত্রম্

(অনিরুদ্ধবৃত্ত্যনুবাদ—প্রথম—বিষয়াধ্যায়)

সরস্বতী-বিষ্ণু-সূর্য্যে প্রণমিয়া গণেশে।
বৃত্তি স্মরু প্রণমিয়া লক্ষ্মী-গঙ্গা-মহেশে॥

বৈরাগ্য হইতে মানুষের মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নে ইচ্ছা হয়। বৈরাগ্য হইতে বিদ্যা (পরাবিদ্যা) হয়, এবং বৈরাগ্য দুই প্রকারে হয়—ভোগ দ্বারা যদি প্রবৃত্তি ক্ষয় হয় তবে, অথবা জন্মান্তরীণ পাপ ক্ষয় হইলে। শ্রুতিও বলেন—যে দিন বৈরাগ্য হইবে, সে দিনই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে যাহাদের রুচি হয়, তাহাদের পরম বৈরাগ্য আসে এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ হয়। পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—লৌকিক ও পারত্রিক (বৈদিক ক্রিয়াজনিত পরকালে সুখ ভোগাদি) বিষয়ে যে বৈরাগ্য তাহার নাম বশীকার বৈরাগ্য। তারপর বিবেক জ্ঞান দ্বারা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ ছাড়িয়া যে নিগুর্ণা বস্থালাভের বৈরাগ্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য। এই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা করিয়াই অতি কারুণিক মহামুনি কপিল জগতের (অজ্ঞানীদের) যাহাতে উদ্ধার হয়, সেই অভিলাষে মোক্ষশাস্ত্র আরম্ভ করিয়া প্রথম সূত্র করিলেন—

অথত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত
নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥১॥

এখানে অথ শব্দ মঙ্গলার্থক। কোনও কার্য্যের 'পরে'—এই অর্থে নয়। (বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরে-এইরূপ অর্থে নয়) কেননা বেদ বলিয়াছেন 'যেদিন বৈরাগ্য, সেই দিনই সন্ন্যাস'—ইত্যাদি। সুতরাং, 'অথ' শব্দের অর্থ 'তারপরে'—এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মভাষ্যের ব্যাখ্যায় রহিয়াছে।—ইহা নির্দ্দেশ মাত্র) . কর্ম্মের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা উচিত, এবং অথ শব্দ মঙ্গল বাচক। শাস্ত্রেও দেখা যায়"ব্রহ্মা কণ্ঠবিনির্গত ওঁকার ও অথ। মাঙ্গলিক তাই এই উভয়ে সতত॥"

বিবিধ দুঃখের কথা বলিতেছেন—(প্রথম) শারীরিক ও মানসিক দুঃখ। উভয়েই আত্মাকে (অর্থাৎ নিজকে) আশ্রয় করিয়া হয়, সেজন্য এ উভয়কে এক আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা হয়। (দ্বিতীয়) আধিভৌতিক দুঃখ, পশুপক্ষী প্রভৃতি (অপর জীব) দ্বারা ঘটিত। (তৃতীয়) আধিদৈবিক দুঃখ, গ্রহ ভূত প্রভৃতি হইতে জাত।

দুঃখ মাত্রই পূর্ব্বক্ষণে থাকে না, যেইক্ষণে উদ্ভব হয় সেইক্ষণ থাকিয়া পরের ক্ষণে তাহা বিনষ্ট হয়, সুতরাং (পূর্ব্বপক্ষী এখানে আপত্তি তুলিতেছেন) দুঃখ সমূহ দ্বিতীয় (বা তৃতীয়) ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে আর দুঃখ নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্র রচনা কেন? এই কথা যাহাতে না উঠে সেই জন্যই "অত্যন্ত" শব্দের প্রয়োগ। কোনও এক বিশেষ দুঃখের নিবৃত্তির কথা বলা হইতেছে না, দুঃখ জাতীয় সমস্ত দুঃখের কথাই বলা হইতেছে। (বর্ত্তমান দুঃখ ছাড়া) ভবিষ্যত দুঃখেরও যাহাতে নিবৃত্তি হয়, সেই জন্যই "অত্যন্ত" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। (অভিপ্রায় এই যে, বর্ত্তমান দুঃখ না হয় পরক্ষণে থাকিবে না, কিন্তু আবার যে এই জাতীয় বা অপর জাতীয় দুঃখ না হইবে, তাহার প্রমাণ কি? সেই সমস্ত দুঃখেরও নিবৃত্তি হয়, তাই বলিলেন অত্যন্ত নিবৃত্তি। অত্যন্ত শব্দের অর্থেই এখানে ভবিষ্যত দুঃখেরও নাশ বুঝিতে হইবে।)

পুরুষার্থ কি? পুরুষের অর্থ বা পরম প্রয়োজন কি কি? ধর্ম্ম, অর্থ, কামনা ও মুক্তি। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কখনও আত্যন্তিক হইতে পারে না। কেননা এই তিনটীরই ক্ষয় আছে এবং বিষয় জনিত সুখ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু মোক্ষ সেরূপ নয়—অর্থাৎ মোক্ষের ক্ষয়ও নাই এবং তাহা বৈষয়িক সুখ হইতেও উৎপন্ন হয় না, কেননা মোক্ষ নিত্য পদার্থ ও প্রকাশ স্বরূপ। এই জন্য মোক্ষকে বলা হইল অত্যন্ত পুরুষার্থ।

আচ্ছা, দুঃখ নিবৃত্তি মানুষের একান্ত প্রয়োজন না হয় হউক, কিন্তু তবু যখন সুগম লৌকিক উপায় দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়, তখন শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট দুষ্কর অনেক জন্মের আয়াসসাধ্য চিত্ত নিরোধ প্রভৃতিতে কোন্ সুস্থ (মস্তিষ্ক) ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মে? কথায় বলে,—"ঘরে যদি মধু মিলে কেবা যায় পাহাড়ে। যাহা চাই যদি পাই, কেবা খুঁজে তাহারে?"

আরও দেখা যায়, শারীরিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ঔষধাদি আছে, মানসিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য শ্রেষ্ঠ সহধর্ম্মিণী, মিষ্টান্ন (অর্থাৎ নানারূপ ভোগ্য পদার্থ) প্রভৃতি আছে। আধিভৌতিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নীতিবিৎ পণ্ডিতগণ কথিত নানা প্রকার উপায় আছে, আধিদৈবিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য শান্তিস্বস্ত্যয়ন মণিমন্ত্রাদি আছে। সুতরাং (শাস্ত্র জিজ্ঞাসার বা শাস্ত্র কথার প্রয়োজন কি?) কোন্ সুস্থ ব্যক্তির চিত্তনিরোধ প্রভৃতিতে রুচি জন্মিবে?

(আধুনিক শিক্ষিতদিগের পাশ্চাত্যশিক্ষা মহাত্ম্যে এইরূপ যুক্তি, এই সমস্ত শাস্ত্রের নিন্দা ও আপত্তি সম্বন্ধে এই কথাগুলি খুব মুখরোচক হইবে। বিশেষতঃ ভোগের দ্বারা ত্যাগ আনিতে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের ত কথাই নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভোগবাদসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য দেশ বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ দ্বারা যে নিত্য নূতন ভোগের উপায় আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতে তৃষ্ণারাক্ষসীর ক্ষুধা দিন দিন আরও বাড়িয়া যে পশুভাবের আধিক্যে দেশ ছারখার হইয়া উৎসন্নের দিকে যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য হয় কি?) তাই উত্তর সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—

ন দৃষ্টাত্তৎ সিদ্ধি র্নিবৃত্তেরপ্য নুবৃত্তি দর্শনাৎ ॥ ২॥

(লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখের) নিবৃত্তি মাত্রকেই আমরা পুরুষার্থ বা মোক্ষ বলিতেছি না (তাহা হইলে ভোগীমাত্রই পরম মুক্ত পুরুষ হইত) কিন্তু (দুঃখের) উৎপত্তির নিবৃত্তির কথা

বলিতেছি। ঔষধাদি (বা ভোগ্য পদার্থ দ্বারা) দুঃখের নিঃশেষ ভাবে নিবৃত্তি হয় না, যদি বা কথঞ্চিৎ উপশম হয়, কিন্তু আবার যে অন্য দুঃখ আর হইবে না, এমন কোনও নিয়ম নাই। (তাই নিত্য নূতন ভোগ্যবস্তু ও ঔষধাদি আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও অভাব রাক্ষসীর তাণ্ডব নৃত্যে ও অকাল মরণ বা জীবন্মৃতের হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ! দুঃখের মূল আশ্রয় মানুষের মন যদি শাস্ত্র কথিত উপায় দ্বারা সংযত ও তৃপ্ত না হয়, তবে 'তৃষ্ণয়া নৈবচ নৈব চ—তৃষ্ণা দ্বারা তৃপ্তি হইবে না—হইবে না।)

(ইহার পরের সূত্রের অবতারণার ভূমিকায় বলিতেছেন)—হউক দুঃখ নিবৃত্তি, তথাপি তাহা পুরুষার্থ হয় না, কেননা পুনঃ পুনঃ সেইরূপ প্রতীকার করিতে হয়। তাই (লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু যখনই দুঃখ আসে, তখনই আবার লৌকিক উপায় দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে হয়। কাজেই এইরূপ ভাবে সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলা যায় না। সেই জন্য লৌকিকোপায় বাদীর পক্ষ হইয়া) বলিতেছেন —

প্রাত্যহিকক্ষুৎ প্রতীকারবত্তৎ
প্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্ ॥ ৩॥

যেমন প্রত্যহ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রকৃষ্টরূপে অন্নাদি ভোজন দ্বারা তৃপ্ত হওয়া পুরুষার্থতা, (মানুষ তাহাও চায়) সেইরূপ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ঔষধাদি দ্বারা প্রতীকার হয় বলিয়া তাহাও পুরুষার্থ। (পুরুষের কাম্য বটে, কিন্তু এই সমস্ত সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ নয়।) তাই সিদ্ধান্ত স্বরূপ পরের সূত্র বলিতেছেন—

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি অত্যন্তা—
সম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ॥৪॥

সমস্ত দেশে বা সব সময়ে (ঔষধের জন্য) বৈদ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সম্ভব হইলেও (এইরূপ ভাবের উপশমে সাময়িক দুঃখ নিরোধ হয় বটে, কিন্তু) ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। দেহ ধারণ করিলেই দেহ নিবন্ধন আসক্তি অবশ্য হইবে। (আসক্তি হইতে কষ্ট স্বাভাবিক তাই) দেহী সুখী, এরূপ দেখা যায় না। (দেহধারী মাত্রেই অভাব দুঃখে দুঃখী) তাই এই পুরুষার্থ (অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ) ছাড়া সাময়িক লৌকিকোপায়জনিত পুরুষার্থকে প্রামাণিকগণ তুচ্ছ বলেন। শাস্ত্র বর্ণিত মোক্ষকে বা পুরুষার্থকে উপাদেয় বলেন। ইহার অন্য যুক্তি স্বরূপ পঞ্চম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য
সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ॥৫॥

অথবা দুঃখত্রয় নিবারণের অন্যান্য উৎকৃষ্ট উপায় দেখা যায় বটে, কিন্তু মোক্ষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা, তাহা নিত্য, একস্বরূপ এবং সমস্ত দুঃখের বিনাশক। (অন্যান্য উপায়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ প্রভৃতি তারতম্য আছে, মোক্ষে তাহা নাই)।

(কর্ম্মবাদী মীমাংসক তাঁহার বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড জনিত মোক্ষের কথা বলিতেছেন)—আচ্ছা, এমন দর্শন নাই, যাহাতে মোক্ষকে পুরুষার্থ না বলা হয়; ঔষধাদি দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি মাত্রকেও মোক্ষ বলা যায় না। সুতরাং সাংখ্যবাদীর যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা আমাদের সিদ্ধান্ত; (সুতরাং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড জনিত মোক্ষকেই মোক্ষ বলা হউক) তাই বলিতেছেন—

অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥৬॥

নিজের পক্ষ সিদ্ধি দ্বারা পরের পক্ষকে তিরস্কার ছাড়া উহার অন্য কোনও প্রকার লাভ নাই।

(অর্থাৎ লৌকিক উপায় জনিত মোক্ষ হইতে বৈদিক ক্রিয়াজনিত মোক্ষের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। উভয়ই সাময়িক তৃপ্তি দায়ক, সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিপাদিত মোক্ষ উহা নহে।) কথিত আছে—

যে উভয়ে সমদোষ পরিহারও তাই।
সে বিচার প্ররোগেতে কোন লাভ নাই॥

(পুরুষার্থ বলিতে পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন অর্থাৎ মানুষ যাহা চায় বা ইচ্ছা করে। এই অর্থে মানুষের সাধারণ ইচ্ছা, সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি বা ভোগ্যাদি উপভোগ সমস্তই পুরুষার্থ; আবার মোক্ষও পুরুষার্থ। কেননা তাহাও মানুষের প্রয়োজন। তাই পুরুষার্থ বলিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। বরং মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা যায়। পরম পুরুষার্থ বলিতে 'পরম' শব্দটী পুরুষের বিশেষণ করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা বুদ্ধিমান্ মানুষের যাহা প্রয়োজন, তাহা নিকৃষ্ট বস্তু নয়—শাশ্বত মোক্ষ, এই অর্থ করা যায়। আবার পুরুষের পরম বা শ্রেষ্ঠ অর্থ—অর্থাৎ প্রয়োজন—ইহাও মোক্ষকেই নির্দ্দেশ করে। সাংখ্যের পুরুষার্থ এই মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, আর অন্যান্য পুরুষার্থ ইহলোক বা পরলোকের সুখ ভোগাদি)।

—ক্রমশঃ

সম্মিলন

সুন্দর তব মিলন আজিকে কত শত জন মাঝ—
আমার এ দেহ যেথাই থাকুক প্রাণ গেছে সেথা আজ।
মন্দিরে তব কত না ভকত গাহে বন্দনা গান—
হৃদয় আমার এত দূরে তবু ওঠে সেথা সেই তান।
দেবতা তোমার চরণে আজিকে কত হবে বলিদান,
দীনের এ পূজা নিও হে দয়াল, নিও বলি এই প্রাণ।
দেহের দূরতা মনের কলুষ সব যেন ঘুচে যায়—
সবার মিলনে এ মোর মিলন সার্থক তব পায়।

কল্পনা

মানুষের নেশার অন্ত নাই। ঘুমের নেশায় বিভোর হ'য়ে সে যেমন দীর্ঘ নিশা কাটিয়ে দেয়, তেমনি অনন্ত নেশায় মুগ্ধ থেকে দীর্ঘ জীবন সে কাটিয়ে দেয়। জাগার চেষ্টা, আলোক দর্শনের ইচ্ছা, সমস্তই সেই মহা তমোর আবরণে আচ্ছন্ন থাকে। অধিকাংশের পক্ষেই দীর্ঘ নিশাতেও ঘুমের ঘোর কাটে না, আবার দিনের পর নিশার প্রয়োজন হয়, নইলে ঘুম মিটে না—জীবনের বর্ত্তমান অন্ধকার সম্মুখে কোনও আলোক প্রাপ্তির প্রচেষ্টা জাগিয়ে দেয় না, বরং এই জীবনের আঁধারেও বাসনা-নিদ্রার ঘোর কাটে না ব'লে পুনরায় সে নূতন জন্মের প্রার্থনা করে। তাই বারবার এই আঁধার ঘরেই সে নেশার ঘোরে যাতায়াত করে। যদি বা কখনও সে নিজের চেষ্টায় গভীর নিশীথে ঘুম ছেড়ে উঠে আলোক প্রজ্বালিত করে, তবু সে আলোক ভাস্করের খরপ্রভা নয়, তাই মলিন ও ক্ষণিক সে ক্ষীণ আলোক পুনরায় নিদ্রার আয়োজন সম্পন্ন করেই স্তিমিত হয়। সাময়িক প্রচেষ্টা এমনি করেই বিনষ্ট হয়। যে পর্য্যন্ত মার্ত্তণ্ডদেব তাঁর প্রচণ্ড কিরণে চক্ষু ঝলসিয়া না দেন, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ তার ঘুমের নেশা কিছুতেই ছাড়ে না।

নেশার ঘোরে কত বিচিত্র রকমের রঙীন দৃশ্যই মানুষের মনে ভেসে যায়। জীবনের বাস্তব রূপকে ভুলিয়ে দিয়ে তার চেয়ে যেন কত মনোরম মূর্ত্তিতে জীবনের কল্পনায় সে তখন বিভোর হয়; কিন্তু হায়, সে নিশা যদি চরম হ'ত! যদি সে রঙীন স্বপ্ন মানুষকে শেষ পর্য্যন্ত শান্তি দিতে পারত, তবুও বুঝি মানুষ সেই অজ্ঞানের মোহে আচ্ছন্ন থেকেও শান্তি পেত! কিন্তু তা হবার নয়। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ নিষ্ঠুর কালের এতই আজ্ঞাবহ যে, মানুষের জন্য তার বিন্দুমাত্র করুণার অবসর নাই। প্রভাতের সূর্য্য—যে নবীন জগৎকে অরুণ আভায় মাতিয়ে তোলে, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তেজে দীপ্ত হয়ে জগতের কাছে সে অন্যরূপ ধারণ করে, আবার মনোহর সন্ধ্যায় সে রঙের খেলা আকাশময় ছড়িয়ে যায়, ঘনান্ধকার আবরণে সে রূপ থাকে না—নক্ষত্র খচিত নভোমণ্ডল আবার নূতন দৃশ্য ধারণ করে।

কালের বিচিত্রগতিতে জগৎ প্রতিক্ষণে নিত্য নূতন রঙে রঙীন হয়ে চলেছে, আর সেই রূপমুগ্ধ মানব প্রতিক্ষণে নূতন আশার স্বপ্ন দেখ্‌ছে। কোনও একটী ক্ষণ তার নূতনত্ব নিয়ে স্থায়ী হয় না। কিন্তু মানুষ কিছুই আঁক্‌ড়ে ধরে রাখ্‌তে না পার্‌লেও তার প্রচেষ্টার সীমা নাই। পূর্ব্বক্ষণের কালের নিষ্ঠুর পরিহাসকে ভুলে গিয়ে মানুষ নূতন মোহের ছদ্মবেশকে স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গন করে। জগৎ পাতার জগৎ পালনে মানুষের এই মুগ্ধ বাসনার পরিকল্পনা এক অপূর্ব্ব কৌশল। শুধু মানুষ নয়, মানবাতিরিক্ত প্রত্যেক চেতন জীবের মধ্যেই এই বাসনার ইন্ধন পরিব্যাপ্ত। বুঝি অচেতনের মধ্যেও এই বাসনা-চুম্বকের আকর্ষণে স্পন্দন অনুভূত হয় এবং ক্রমশঃ জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। আশার ভরসায় নিরাশা দমিত, মুমূর্ষু সঞ্জীবিত এবং এই জগৎ এমনি ভাবে বিধৃত হয়। কিন্তু এই আশার নেশা মানুষের মধ্যে কোন রূপে প্রথমে আবির্ভূত হয়? সে আসে কল্পনা রূপে। আশার ক্ষীণ জ্যোতির প্রকাশের পরই

মানুষ কল্পনায় ক্রমশঃ নিমগ্ন হয়। তখন হতেই তার নেশার সুরু হয়। বস্তুতঃ এইরূপ নেশা যদি না থাক্‌ত, তবে করাল কালের গহ্বরে এমন মনোমোহন রূপে জগতের অস্তিত্ব থাকৃত না। মুমূর্ষুর মধ্যে নব জীবন সঞ্চার ক'রে আশা কল্পনা জগৎকে এত কোমল, এত মধুর, এত সুন্দর করে তুলেছে। ধরণীর সবুজ প্রাণ, আকাশের প্রশান্ত নীলিমা, পবনের মৃদুমধুর হিল্লোল, শিশুর হাস্য, পাখীর কাকলী প্রভৃতি জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি তার সঙ্গে প্রাণের যোগ না থাকে। আর প্রাণ সেই কল্পনার আধার। হৃদয় দিয়া সৌন্দর্য্যকে মানুষ এত আঁক্‌ড়ে ধরে কেন? তার মধ্যে সুন্দরের কল্পনা আছে ব'লে। কল্পনাকে বাদ দিয়ে দাও, দেখ্‌বে জগৎ জড়বৎ হয়ে পড়বে। প্রাণশক্তির যত উন্মাদনা, সজীবতার যত আনন্দ, তার পিছনে রয়েছে এই কল্পনার প্রভাব। আশাকে সম্যকরূপে স্থূলে-সূক্ষ্মে প্রকাশ বা সার্থক ক'রে তোলে এই কল্পনা। কল্পনার প্রভাব ইতর বিশেষ সমস্ত জীবের মধ্যেই পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করে।

কাজেই কল্পনা মিথ্যা বা দুর্ব্বল নয়। যে রঙীন কল্পনা বারম্বার মনে এসে বাসনারূপে চিত্তে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে জন্ম হ'তে আমাদিগকে জন্মান্তরে নিয়ে যায়, তাকে দুর্ব্বল বলি কি প্রকারে? বরং শক্তি তার অফুরন্ত বলেই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকেও সে এমনি খেলিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কল্পনার সঙ্গে জীবন মিশিয়ে না দিলে মানুষের সাধ্য কি যে সে এক মুহূর্ত্তও স্বস্তিতে জীবন ধারণ করে? প্রতিক্ষণে পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের শুভ আশায়-ভরসায়-কল্পনায় দুঃখময় বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে সে চলেছে। বর্ত্তমানের শুভকেও ভবিষ্যতের অধিকতর সুখের কল্পনায় হেয় মনে ক'রে তীব্রবেগে ভবিষ্যের পানে ছুটে চলেছে। এমনি ক'রে জগজ্জোড়া মানুষ শুধু কল্পনায় বাঁচে এবং কল্পনাতেই মরে। কারণ ভয়ের কারণ সমুপস্থিত হলেও মনের মধ্যে অতি দ্রুত ভাবে যদি সেই ভয়ের ফলটী কল্পিত না হয়, তবে সে ভয়ও পায় না, মরণও বিভীষিকারূপে এগিয়ে আসে না। কাজেই শুধু শুভের নহে, শুভাশুভ উভয়েরই কারণরূপে মনের ভাবনা বা কল্পনা জগতের রূপকে আমাদের কাছে অহরহঃ পরিবর্ত্তিত কর্‌ছে। সুতরাং কল্পনা অলীক নয়, সত্যের বীজ।

যদি তার এতই শক্তি, তবে তাকে আবার দুর্ব্বল আখ্যা দেয় কি প্রকারে? তার কারণ মানুষের অনবধানতা। মানুষ তার স্বেচ্ছাধীন এমন এক শক্তি পেয়েও অনবধানতায় তাকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলে। যে কল্পনায় তাকে শক্তিমান করে, যে ভাবনায় তার অন্তরে প্রচণ্ড সিংহবিক্রম উদ্বুদ্ধ হয়, মানুষ তা না ক'রে কর্‌বে শুধু আকাশ-কুসুমের কল্পনা! সে তার নিজের জীবনের যোগসূত্র ছাড়িয়ে অনেক সৌন্দর্য্য কল্পনায় মুগ্ধ থাক্‌বে, কিন্তু আত্মজীবনের পরিপূর্ণ রূপ কল্পনায় সে নিশ্চেষ্ট! আর যদিও বা কখনও আত্ম চিন্তায় সহসা আপনার যথার্থ উন্নতির রূপ প্রকটিত হয়, তবু সে সেই কল্পনার সহিত আত্মপ্রচেষ্টার সংযোগ রাখ্‌বে না। সৌন্দর্য্যকে যদি শুধু আপন মনের কল্পলোকেই রেখে দেওয়া যায়, তা'হতে সেই জীবনে যদি কোনও উন্নতির আনন্দ-রসের সংগ্রহ না হয়, জীবনকে সতেজ ও মধুর না করে, তবে তাই যে হয় অলীক বা মিথ্যা কল্পনা।

কল্পনায় স্বর্গ, কল্পনায় নরক যারা বলে, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত কথাটা তলিয়ে দেখেন না। কল্পনায় স্বর্গ নরক বল্‌তে এমন কথা বুঝা ঠিক নয় যে, স্বর্গ নরক বলতে অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নাই। বরং এই অর্থ ধরায় অধিকতর আনন্দ বা জোর ভরসা হয় যে, স্বর্গ নরক তোমার

নিজের উপর, আপন কল্পনা বা ভাবনা মনের গতির উপর নির্ভর করে। আপন মনের গঠনানুযায়ী নিজকে তুমি নরকের কীট বা স্বর্গের দেবতা যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তোমার ইচ্ছায় যখন এতটা সম্ভব হয় তখন মঙ্গলময় স্বর্গ ছাড়া অমঙ্গলের নিদান নরকের কারণে তোমার কল্পনা যায় কেন? মন যাতে নরকের পথে ধাবিত না হয়, স্বেচ্ছায় যাতে তাকে স্বর্গের দিকে উন্নতির দিকে প্রসারিত করতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যেই বলা যায় যে, স্বর্গও তোমার কল্পনা বা মনের শক্তির অধীন. নরকও তাই। তোমাকে যখন এই দুই বিষয়েই স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল, তখন স্বাধীনতার অপব্যবহার ক'রে নরকের পথে মনকে পরিচালিত ক'রে ধ্বংস হবে কেন? বরং তোমার কল্পনা দ্বারা উন্নতির যে উচ্চতম সোপানে উঠা যায়, তাই দেখাও।

কল্পনার প্রভাবে তুমি উন্নত বা অবনত হ'তে পার, কিন্তু ওর দ্বারা যে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা যায়, তার প্রমাণ তোমার পূর্ব্বেও অনেকে দিয়ে গিয়েছেন। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যে অনেকে অনেক স্তরের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের সেই সমস্ত স্তরের পরিচয় শুনে তোমার স্থান কোথায় বুঝতে পারবে। প্রথমতঃ নিম্ন স্তরের ইতর জীবের কল্পনা ধরা যাক্। তাহাদের আশা বা কল্পনা শুধু দেহের গণ্ডীর মধ্যে। এই দেহটার যাতে সুখ হয় বা রক্ষা হয়, তাদের কল্পনা শুধু সেই সব নিয়ে। এক কথায় বলতে হয় দেহের ভোগের কল্পনাতেই তারা বিভোর থাকে। প্রকৃতির নিয়মে জগতের সৃষ্টিস্থিতি বজায় রাখাই তাদের কল্পনার বিষয়। দেহের ভোগই তাদের কল্পনায় প্রধান কার্য্য। অনেক মানুষও এই পশু ভাবের প্রেরণায় চলে। পশু থেকে তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু দেহ নিয়েই! অর্থাৎ দেহেই তারা মানুষ, মনে নয়।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্"—শাস্ত্রের এই উক্তি উক্তশ্রেণীর নরগণের পক্ষেই খাটে। আর যাদের জ্ঞানরূপ বৈশিষ্ট্য আছে, সেই সমস্ত যথার্থ মানুষের কল্পনা বা চিন্তা পূর্ব্বোক্ত জনসমূহ থেকে পৃথক। এই শ্রেণীর মানুষেরও ভোগ আছে, কিন্তু তা দেহের ভোগ নয়, মনের ভোগ। কবিজনোচিত সৌন্দর্য্য কল্পনাদি দ্বারা এই শ্রেণীর লোকের মনের ভোগ হয়। যোগের ভাষায় বলতে হয়, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের মন থাকে নিম্নে গুহ্যদেশে মূলাধার পদ্মে, আর এই শ্রেণীর মানবের মন থাকে সাধারণতঃ মণিপুর বা অনাহত চক্রে। পশুমনের কল্পনা দেহ নিয়ে, মানবের কল্পনা মন নিয়ে; কিন্তু এই উভয়েরই মন ক্ষণিক বস্তুতে ব্যাপৃত। এদের চেয়েও যাঁদের কল্পনা উচ্চ বিষয় নিয়ে, তাঁরা হলেন দেবতা। অবশ্য দেবতা বললেই যে তাঁরা দেবলোকেই বাস করবেন, পৃথিবীতে আর তেমন অধিকারী মিলবে না, এমন নয়। এই জগতেই মানুষের মধ্যে পশুভাবাপন্ন, নরভাবাপন্ন ও দেবভাবাপন্ন মানুষ আছে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণ ভেদেই যথাক্রমে দেবতা, মানুষ ও পশুর মনের পার্থক্য করা হয়েছে। দেবতার মনের সাত্ত্বিকতা বেশী থাকাতেই তাঁরা স্থির, শান্ত ও মহান্ প্রকৃতির। মানুষ রজঃ প্রধান ব'লে তার মধ্যে দেবভাব ও পশুভাব এই উভয়ের দ্বন্দ্ব চলে এবং তার সমগ্র মনের প্রবলতা অনুযায়ী একবার পশুর দিকে আবার দেবতার দিকে সে ঝুঁকে পড়ে। এই তিন শ্রেণীর সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যকার ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকায় বলেন—

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমো বিশালশ্চ মূলতঃসর্গঃ।
মধ্যে রজো বিশালো ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তঃ॥ ॥৫৪॥

—৫৭

ব্রহ্ম হতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টিতে উর্দ্ধে সত্বপ্রধান দেবতা, মধ্যে রজঃ প্রধান মানুষ এবং মূলে তমঃপ্রধাম পশ্বাদি জীব সমূহ। এই তিনের মনের গতি বা কল্পনা উক্ত গুণানুসারে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতিবশে সাধারণতঃ এরূপ হলেও মানুষের প্রকৃতির উপরও হাত চলে। তপস্যায় প্রকৃতিকে বশ ক'রে মানুষ সত্ব প্রধান হতে পারে, এমনি কি তিনগুণের অতীত হয়ে স্বরূপের তত্বও সে জান্‌তে পারে। এইখানেই তার কৃতিত্ব। সাধারণ তিন লোকের কল্পনাকে তুচ্ছ ক'রে, মানুষ স্বরূপের কল্পনা করে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ কর্‌তে পারে। সাধারণ মানুষ স্বীয় কল্পনাশক্তির বিষয়ে অনবধানতা বশতঃ সামান্য চিন্তায় মনের শক্তি ক্ষয় করে, আর সাবধানী জ্ঞানী আত্মস্বরূপের কল্পনায় বিভোর থাকেন। আত্মধ্যানে বা ব্রহ্মচিন্তায় অক্ষম, অথচ আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী, এমন প্রথম অধিকারীদের জন্যই শাস্ত্রে 'ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।' তা'হতেই ক্রমশঃ দেবতা বিশেষের রূপাদি বর্ণিত হয়। কিন্তু এই কল্পনা বলতে শুধু ক্ষণকালের মিথ্যা ভাবনা নয়। কল্পনার প্রচণ্ড শক্তি আছে বলেই সামান্য প্রলোভনের কল্পনায় মানুষ আপনার মনেই দিন দিন অবনত হয়ে পড়ে, আর উচ্চ বিষয়ে দেবাদিকল্পনায় ক্রমশঃ উন্নত হয়ে একদিন সে শাশ্বত মুক্তির অধিকারী হয়। কাজেই কল্পনা শুধু খেয়াল নয়।

কল্পবৃক্ষের তলে বসে মৃত্যু কল্পনা করা কেন? সে বৃক্ষের কাছে যা চাওয়া যায়,তাই যখন পাওয়া যায়, তখন যাতে অমৃত পান করে অমর হতে পারা যায় তাই চাইতে হয়। যদি আমার মনের কল্পনাতেই শাশ্বত আনন্দ পাওয়া যায়, তবে আর রাজা, উজীর প্রভৃতি সামান্য লক্ষ্যের কল্পনায় প্রাণপাত করা কেন? **"ভূমৈব সুখম্—নাল্পে সুখমস্তি"** লুটিতো ভাণ্ডার, মারিতো গণ্ডার—ব্রহ্মরূপের কল্পনা চাই। বেদান্ত তাই আত্মস্বরূপের কল্পনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা প্রত্যক্ষে বা কল্পনায় আসে, সমস্তকে নিয়ে স্বরূপ ক না কর্‌তে বলেছেন। ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই অনন্তবিস্তৃত এই বর্ত্তমানের মধ্যে কল্পনা করেছেন। তোমার আমার সাধারণ কল্পনাও যখন সত্য হয়, তখন এই বিরাট কল্পনা কি মিথ্যা হতে পারে? তাই আবার বলি, কল্পনা কর বিরাটের—মহানের। জেনো—**ভূমৈব সুখম্—নাল্পে সুখমস্তি**।

আলোচনা

—(০)—

ভগবান সকলকে সমান শক্তি দিয়া জগতে প্রেরণ করেন নাই। এইজন্যই প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা! তবে কাহারও কাহারও মাঝে সামঞ্জস্যের শক্তি দেখা যায়।

সমস্যার যিনি সৃষ্টি করেন, তাহার সমাধান করিবার শক্তি হয়ত তাঁর নাও থাকিতে পারে, এই বলিয়া সেই চিন্তাবীরকে উপেক্ষা করিবার কোন হেতু নাই। আলস্য জড়তায় আচ্ছন্ন মানবের মাঝে যিনি সংশয়া-

ন্দোলন আনিতে পারেন, তাঁহার শক্তি কম নয়। সমাধান করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি দ্বারাই প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

সমস্যার সৃষ্টি হইলে সেখানে সমাধান করিবার চিন্তাও জাগ্রত হয়, কিন্তু মোটেই যেখানে চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, সেখানের অবস্থা যে কি শোচনীয় তাহা আর বলিবার নয়।

ঘুমন্ত মানবের প্রাণে যিনি প্রথম সংশয় সৃজন করেন, তাঁহাকে অশেষ দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইতে হয়। প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলেন যিনি, তাঁহার উপর চারিদিক হইতে শর বর্ষণ হইতে থাকে! কিন্তু অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে সুদৃঢ় অনুভূতির বল লইয়া যিনি নামিয়া আসেন নিজের মত প্রকাশ করিতে, তাঁহাকে কোন কিছুতেই অবদমিত করিয়া রাখিতে পারে না। তাঁহার বিশেষ প্রতিভার পরিচয় এইখানেই।

সংস্কারের ঝোঁকে বা হুজুগে মাতিয়া একদল লোক অনায়াসে জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয়। তাহাদের মনে কোন দিন প্রশ্ন জাগে না, সংশয় উঠে না, তাহারা যেন এমন একটা নির্ভরযোগ্য স্থলে পৌঁছিয়াছে যেখান হইতে আর তাহাদের পতন নাই। কিন্তু কঠিন বাস্তব জীবনের অগ্নি পরীক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের আসল স্বরূপটী প্রকাশ হইয়া পড়ে।

সেদিন নরেশ আর নরেনের মাঝে কথোপকথন চলিতেছিল, এমন সময় আমি গিয়া উপস্থিত। বয়সে বড় হইলেও আমাকে উহারা একদিক দিয়া উহাদেরই একজন বলিয়া মনে করে, কেননা বয়স হইয়াছে দেহের, কিন্তু আমার মনটী সেই সবুজ তাজাই রহিয়াছে। যাক্, আমাকে দেখিয়া উহাদের কথোপকথন বন্ধ হয় নাই, বরঞ্চ একজন নিরপেক্ষ বিচারক পাইয়া উহারা যেন নিজেদের মত আরও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল।

নরেন। —পরের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে আত্মার মুক্তি হইবে, এই কথা আমি কোন দিন বিশ্বাস করি না, তুই যতই কেন বলিস্ না নরেশ! তোদের গীতাতেও তো আছে—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"। সাহায্য কারীর যে প্রয়োজন নাই, এই কথা আমি বলি না, কিন্তু সাহায্যকারীর আশায় যে আমাকে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, এই কথা মানিতে আমি কিছুতেই রাজী নই। তুই বল্‌তে চাস্ নির্ভর কর্‌লে আর কোন চিন্তা থাক্‌বে না! কিন্তু এই জায়গাতেই আমার সঙ্গে তোর মস্তবড় তফাৎ। আমি মনে করি চিন্তা-বৃত্তির বিশ্রাম মৃত্যু তুল্য! অনুসন্ধিৎসা যদি মৃত্যুর পথেও টানিয়া লইয়া যায়, তাহাও ভাল, কিন্তু ভয়ে আশঙ্কায় কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা আরও ক্ষতিকর!

নরেশ।—তুই যতই কেন বলিস্ না নরেন, আত্মশক্তি দ্বারা কেবল অভিমান গর্ব্বই বাড়িয়া উঠে, এই জন্যই নির্ভরের পথ সহজ পথ! আমার এত চিন্তা ভাবনার দরকার কি—তিনিই তো সব করিতেছেন, করাইবেন। নির্ভরের পথে যে কি আনন্দ তা তুই বুঝ্বি কেমন করিয়া?

নরেন।—'প্রক্সি' দিয়াও মাঝে মাঝে কাজ করা যায়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক জগতেও আমার হইয়া আমাকে একজন বৈকুণ্ঠ পাওয়াইয়া দিতে পারে? বাঃ, তাহা হইলে আর চিন্তা কি? কিন্তু নির্ভর করিয়া তোর যে সব লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে চরিত্রে—দৈনন্দিন জীবনে, তাহাতে তো আমার সংশয় বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। বেদের সার ভাগই হইল উপনিষদ, এই-জন্যই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হইয়া থাকে। সেই বেদান্ত খানা পড়িয়া দেখিস্ তো কোথায়ও নিজের আধিপত্য বিস্তারের কথা, কিম্বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয়-প্রশ্ন জাগিলে তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখার কথা আছে কি না? ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ঋষিরা বেদ বেদান্ত লইয়া এত আলোচনা করিতেন না। ব্রহ্মকে বা সত্যকে জানিতে হইলে চারিটী জিনিষের প্রয়োজন—শাস্ত্র, স্বানুভব, যুক্তি, বিদ্বদনুভূতি! আমাদের মনের মাঝে অনেক রকমের ধারণা বা সংস্কার পূর্ব্ব হইতেই জমিয়া আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যের বিচার না করিয়া সত্যকে আমরা মানিয়া লই। এইজন্যই দেখি, ভণ্ড নির্ভরবাদীই সব চেয়ে বড় বিদ্রোহ করিয়া বসে শেষে। কিন্তু বিশ্লেষণবাদী জ্ঞানীর সিদ্ধান্ত কোন সময়েই বিধ্বস্ত হইতে পারে না। আমার আসল কথা হইল এই যে, নিজকে ছাড়িয়া দিয়া কোন সময় ধর্ম্ম লাভ হয় না। নিজের শক্তি সম্পুর্ণ প্রয়োগ করিয়া বিদ্বদনুভূতির সাহায্য লইতে পারি এই মাত্র। কিন্তু আমার হইয়া একজন আমাকে মুক্তি দিবেন, আর আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিব না—এ কেমন কথা? সংশয়—প্রশ্ন কিছুই জাগিবে না, অথচ আমার 'ভূমার' উপলব্ধি হইয়া যাইবে—ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। আর আমার সত্যিকার সংশয় বা জিজ্ঞাসা বৃত্তিকে যিনি উপেক্ষা করেন, তাঁহাকেই বা কেমন করিয়া নির্ভরযোগ্য শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি বলিয়া পূজা করিতে পারি? উপনিষদের মাঝে দেখিতে পাই, এক এক ঋষি সংশয় লইয়া, প্রশ্ন লইয়া তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ঋষির নিকট গিয়া উপস্থিত! সেই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি প্রশ্নকারীর অসংখ্য প্রশ্নে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন নাই—বরঞ্চ প্রশান্ত চিত্ত লইয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। যেখানে নিজে না পারিয়াছেন, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি সক্ষম হন নাই, সেই ক্ষেত্রে নিজের জানা থাকিলে তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির সন্ধান আবার তিনিই বলিয়া দিয়াছেন।

এই ভাবে তখন জ্ঞানের একটা সত্যিকার সাধনা চলিত। বৃথা গর্ব্ব বা অভিমান লইয়া কেবল পদমর্য্যাদা প্রত্যাশা করিতেন না কেহ।

কাহারও ভিতর যদি কোন প্রশ্ন না জাগে, তাহা হইলে সেটা বড় শুভলক্ষণ নয়। সংশয় করিয়া করিয়াই মানুষ নিঃসংশয়ের রাজ্যে পৌঁছিবে। চোখ বুজিয়া কেহ হঠাৎ সেই নিঃসংশয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক অনুভূতির বেগ ধারণ করিবার দরুণ দেহ-মন-বুদ্ধি সকলেরই উৎকর্ষতার প্রয়োজন রহিয়াছে। দেহে-মনে প্রাণে-জ্ঞানে-বুদ্ধিতে ধর্ম্মকে ধারণ করিবার সামর্থ্য হইলেই বুঝি হাঁ, তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক! কৃপাবাদ আমি স্বীকার করি, কিন্তু কৃপার মর্য্যাদা দিতে পারে কয়জন? তুমি আমি নির্ভর করিয়াও চলিয়াছি, আবার সেই নির্ভরপূর্ণ জীবনে কত অবাঞ্ছনীয় গলদ এবং ত্রুটী যে হইয়া যাইতেছে, তাহারও সীমা সংখ্যা নাই। কাজেই নিজের জীবনকে সংশোধন না করিয়া নিছক 'কৃপা' 'কৃপা' করিয়া যাহারা চিৎকার করে, তাহারা কৃপার বিকৃতার্থই নিজ জীবনদ্বারা প্রতিপন্ন করে।

নিদ্রাকে, জড়ত্বকে আমি বড়ই ভয় করি। অশান্তি, উদ্বেগ, বিবিধ প্রশ্নে মণ্ডিত হইয়া যদি নিশ্চিন্তে ঘুমও না হয় তাও ভাল, কিন্তু তৌষ্টিকতারূপ সুষুপ্তি কোন মতেই মানব জীবনের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে না। মানুষ গতানুগতিক ভাবে চলিয়াই সুখ পায়, আরাম ছাড়িয়া কেহই সত্যের অনুসন্ধান করিতে চায় না। এইজন্যই যাহারা প্রথমে আসিয়া সংশয়-বাণ দ্বারা লোকের চিত্তকে জর্জ্জরিত করিয়া দেয়, তাহারা মানব সমাজের কল্যাণ-পরিপন্থী নয়। মানব প্রাণে এই অসন্তুষ্টির বীজ বপন করে বলিয়াই মানুষ আরাম ছাড়িয়া সত্যের দরুণ প্রাণ দিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

সাহিত্যে যাঁহারা সংশয়, অসন্তুষ্টি জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুই মন্দ বলিস্? কিন্তু আমি ইহাতে কিছুই মন্দ দেখিতে পাইতেছি না। যে সংশয়, যে সমস্যা লইয়া মানুষ সত্যি সত্যি ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, তাহার কথা প্রকাশ যিনি করেন, তিনিই বুঝি হইলেন সকল অনিষ্টের গোড়া! আলোচনা-চর্চ্চা দ্বারা আমরা অনেক উপায় আবিষ্কার করিতে পারি—এই কথা কি তুই অস্বীকার করিস্ নরেশ? আমার মনে হয়, দেশে আজকাল যথার্থ বিদ্বান, যথার্থ জ্ঞানী, যথার্থ সাধু পুরুষ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে! এই জন্যই বৃথা গর্ব্ব অভিমান লইয়া মানুষকে কেবল চাপিয়া রাখিবার চেষ্টাই অনেকের মাঝে প্রবল হইয়া দেখা দিতেছে। যথার্থ জ্ঞানী যিনি, তিনি সংশয়কে অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেন না। সংশয়ের স্তরে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের প্রতিও তাঁহাদের যথেষ্ট সহানুভূতি অনুকম্পা রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে নরেন এবং নরেশের মাঝে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে, আমি মাত্র শেষ সময় আসিয়া হাজির। তবুও তাহাদের দু'জনের মাঝে যে কথোপকথন চলিয়াছিল, তাহার আভাস তাহাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের ধারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। নরেনের বক্তব্য শেষ হইলে, নরেন আমাকে বলিল আচ্ছা বিমলদা, আমরা যে আলোচনা করিলাম, এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?

আমি বলিলাম, এখন সময় খুব অল্প, আর আমার বিশেষ একটা কাজও রহিয়াছে, তাই এখনই আমাকে বাড়ী চলিয়া যাইতে হইবে, তবে এ সম্বন্ধে যাহা আমার বলিবার আছে তাহা আমি লিখিয়াই তোমাদের জানাইব। তবে যাইবার সময় নরেশকে আমার একটা কথা বলিবার আছে, সেইটাই বলিয়া যাই। "দেখ নরেশ! 'নির্ভর' কথাটার যে গভীর অর্থ রহিয়াছে, সেই অর্থ বুঝিবার মত সাধনা তোমার সঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং তোমার মতের পেছনে একটা দৃঢ় ভিত্তি আছে কি না সেই বিষয়েই আমার সন্দেহ।" —ভাই নরেন! সাক্ষাতে তোমাকে কিছু বলিয়া যাইবার সুযোগ হইল না বলিয়া দুঃখিত হইও না। বাড়ীতে গিয়াই আমি তোমাকে লিখিয়া আমার অভিমত জানাইব। তবে এখন চলিলাম········!

আশ্রম জীবন

আশ্রম শব্দের লাক্ষণিক অর্থ যাহাই হউক, শব্দটা একটী রূঢ়ী অর্থে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আশ্রম বলিতে শুধু আশ্রয়স্থলই বুঝায় না—আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলনসহ বিশেষ কোনও মহাত্মার আশ্রয়ে যে নিবাস, তাহাকেই আমরা আশ্রম বলিয়া জানি। আশ্রম বলিতেই বিশেষ একটা পবিত্রতা মিশ্রিত মহান্ উদ্দেশ্যের কথা মনে জাগে। এই উদ্দেশ্য পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক জীবন-সম্পর্কেই ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দ মঠে আধ্যাত্মিকভাবের সঙ্গে সন্ত্যানন্দের মুখ হইতে দেশের কাজের কথা শুনাইলেন, সেই হইতে এখন আশ্রম বলিতে শুধুই আধ্যাত্মিক ধর্ম্মালোচনা মনে আসে না। ঋষির আশ্রয়ে গুরু গৃহে বাসার্থী ছাত্রদের কথার পরিবর্ত্তে বঙ্কিমবাবু আশ্রমে অন্য প্রকার মহদুদ্দেশ্যে জীবন গঠিত মানুষেরও সন্নিবেশ করিলেন। তারপর কত উদ্দেশ্যে দেশে কত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।

কালিদাস বর্ণিত দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মিলনভূমি মহামুনি কণ্বের আশ্রমের অনুকরণ করিতে গিয়া বা প্রাচীনকালের মুনিঋষিদের অরণ্য বেষ্টিত

আশ্রমের অনুসরণে বর্ত্তমানে নানাপ্রকার কৃত্রিম ভাবে বৃক্ষলতাদি রোপণ করিয়া নিভৃতে মনোহর কুঞ্জনিবাস প্রস্তুত হইয়াছে ও আশ্রম নাম দেওয়া হইয়াছে। আবার নগরের মধ্যস্থলে বিলাসিতার সমস্ত প্রকার বিলাসের মধ্যে আশ্রম নামে বড় বড় অট্টালিকাও রহিয়াছে। ইহার কোনও আশ্রম হয়ত প্রাচীন ঋষিদের আদর্শেই মহৎ জীবন গঠনের প্রচেষ্টা হইয়া থাকে, আবার কোথায় শুধু খাবার হোটেল তৈরী করিয়াও নাম দেওয়া হয় 'মহৎ আশ্রম'। অর্থাৎ সেখানে যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারাই মহৎ হইয়া পূর্ব্বস্থিত আশ্রম নিবাসীদের মহান্ আনন্দবর্দ্ধন করিবেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে যথোচিত দক্ষিণা দিয়া আসিবেন। অনেকস্থলে ধনীর গৃহও আশ্রম সংজ্ঞা পাইয়াছে। এমন কি কুস্তির আখড়াও এখন আশ্রম নামে পরিচিত হয়—ইহা ছাড়া অন্য যাহা হয়, তাহার কথা না বলাই ভাল। তবুও তাহার নাম আশ্রম, কেননা নামের উপর টেক্স নাই, ইচ্ছা হইলেই হইল।

নানাপ্রকার জিনিষ যেখানে থাকে, সেখানে ভালমন্দ মিশ্রিত জিনিষ একই নামে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নয়। তাহার মধ্যে ভাল কোন্‌টী তাহা বিচার করিবার ভার বিবেচনার উপর নির্ভর করে। দোকানে ভালমন্দ দুইই থাকে, ক্রেতা ইচ্ছামত বাছিয়া যেটী ইচ্ছা গ্রহণ করে—। এই সব আশ্রম সম্বন্ধেও বলিবার কিছু নাই—ভালমন্দ সবই আছে, যাহার যেমন অভিরুচি বাছিয়া লইতে হয়।

কাজেই বলিতে ছিলাম, আশ্রম বলিতেই এখন আর কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের আলোচনাস্থল দেখিতে পাই না, অথচ নামটীর মোহ এখনও কাটে নাই। ভাল জিনিষ মাত্রেরই এরূপ হয়। প্রথম যাহা ভাল থাকে, তাহার উপর মানুষের এমনি একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ আকর্ষণ হয় যে, তখন অনেকে অনেক প্রকার কৃত্রিম জিনিষও সেই সুযোগে সেই নামে চালাইতে থাকে। তাহাতে ভাল বস্তুকে দায়ী করা চলে না; তবে সেই চালকে অনেক লড়াই করিয়া তবে টিকিয়া থাকিতে হয়। সে লড়াইয়ে, কালের নিষ্পেষণে ও বিধাতার নিষ্ঠুর ন্যায়-বিচারে, মন্দ যাহা তাহা আপনি অস্তিত্বশূন্য হইয়া পড়ে; আর যাহা সত্যই ভাল, দেশের দশের মঙ্গলজনক, তাহাই শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া ক্ষুদ্র হইলেও বাঁচিয়া থাকে এবং আপন শক্তি অনুসারে জগতের মঙ্গল কার্য্যে নিয়োজিত হয়। তাহা হইলে এক কথায় আমরা জিনিষটী কতদিন ধরিয়া টিকিয়া আছে, তাহা দেখিয়াও উহার সারবত্তা সম্বন্ধে কতকটা বিচার করিতে পারি। অবশ্য অন্য নানা দিক দিয়াও উহা বিচার্য্য, তবু প্রথমেই নূতন জিনিষ দেখিয়াই কতদিন ইহা টিকিবে সেই কথাই আগে মনে আসে বলিয়া জিনিষটী টেক্‌সই কি না, সে বিচার আগে করি; আপাতঃ সুদৃশ্য বস্তুকে পছন্দ করি না।

আশ্রম সম্বন্ধেও সেই কথা। সমাজের অহিতকর কোনও আশ্রম বেশী দিন মানুষের চোখে ধূলিনিক্ষেপ করতঃ বিধাতাকেও ঠকাইয়া বাঁচিতে পারে না। কাজেই কোন্‌টীর অভ্যন্তরে কি রহিয়াছে তাহা আমরা শীঘ্রই জানিতে পারি এবং যেটী সমাজের যত অহিতকর, সেটীর ধ্বংস তত শীঘ্র, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে ভাল যেটী, তাহারও বাঁচিয়া থাকিতে কম বিপদ সহ্য করিতে হয় না—কাজেই সাময়িক দৈন্য দেখিয়াই হতাশ হইবারও কারণ নাই, আবার সাময়িক সমৃদ্ধিতেও উন্নতির লক্ষণ সব সময়ে না-ও হইতে পারে। এইজন্য আশ্রম-

প্রতিষ্ঠাতাদিগের বা আশ্রমবাসীদিগের যেমন দুঃখ-সুখের কারণ নাই, তেমনি সমাজের দিক হইতেও হঠাৎ নিন্দা বা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত নহে। ধীর ভাবে প্রতি কার্য্যের উদ্দেশ্য ও গতি এবং অবস্থার কারণ চিন্তা করিয়া আমাদিগকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে হইবে। কোনও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যখন অসৎ নহে, তখন যাহাতে সেই সেই উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে, আমাদিগকে তাহাই চিন্তা করিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা কাহাকেও অসৎ বলিয়া একবাক্যে রায় দিয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টাটাই বাহাদুরী নয়—বরং আগাছা বাছিয়া বৃক্ষকে বাঁচাও, সমূলে ধ্বংস করিয়া কৃতিত্ব দেখাইতে যাওয়া ভাল নহে।

দেশে যখন নূতন কিছু আসে বা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একদল লোক যেমন ইহার সারবত্তা বুঝিয়া সেদিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি আর একদল লোক আবার শুধুই দেখাদেখি নির্ব্বিচারে ঝোঁকের মাথায় সেদিকে অগ্রসর হয়। যাহারা এইরূপ ঝোঁকের বশে সাময়িকভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহাদের সংখ্যাই বেশী, কারণ জগতে যথার্থ মস্তিষ্কওয়ালা লোক খুবই কম। বিচারশীল যাঁহারা, তাঁহারা স্বভাবতঃই অপরের শ্রদ্ধাস্থল হন বলিয়া তাঁহারা যে দিকে চলেন, অপর সকলেও গড্ডালিকা প্রবাহের মত সেই দিকে চলে। অসাধারণে যেই মহান ব্যক্তির বা যে সমস্ত লোকের অনুসরণে চলেন, তাঁহাদের যে সমস্ত কারণে উক্তরূপে অগ্রসর হইতে হয়, অপর সকলের হয়ত সে সমস্ত কারণ নাও থাকিতে পারে, কিন্তু বিচার বুদ্ধির অভাব হেতুই তাহাদিগকে অন্ধের মত চালাইয়া নেয়। ইহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে অনেক সময় যেমন খুব সাহায্য ও উৎসাহিত করা হয়, তেমনি আবার বিচারাক্ষম ব্যক্তিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা অনেক সময়ে দলপতির মহান্ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া কম নিরুৎসাহের কারণ হয় না। কাজেই সাবধান, দলপুষ্টিই সিদ্ধির লক্ষণ নয়।

বরং মুষ্টিমেয় বিচারশীল ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি নিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন বা বুদ্ধিশূন্যের সংখ্যাধিক্যে কার্য্য পণ্ড হয়। তাই বলি রাজা মূর্খ নিয়ে স্বর্গে বাস অপেক্ষা পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস শতগুণে শ্রেয়ঃ বোধ করিয়াছিলেন।

আশ্রমে জীবন যাপন করিবার জন্য যাহারা ছুটিয়া যায়, তাহাদের মধ্যেও উক্ত দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। একদল চিন্তা করিয়া আপন পারিপার্শ্বিক, জীবন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অবস্থা প্রজ্ঞা-বলে অনেকটা বুঝিতে পারিয়া আশ্রম অনুকূল বলিয়া বা আশ্রম-দেবতার আকর্ষণে ছুটিয়া যায়; আর একদল আপনার চঞ্চল মনের সাময়িক আকর্ষণে পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়া, আপনার জীবনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পারিপার্শ্বিক বা উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, শুধু দেখাদেখি হয়ত ঝোঁকের বশে বা আকস্মিক বৈরাগ্যে আশ্রম জীবন যাপনে লালায়িত হয়। তারপর সেই শ্মশান-বৈরাগ্য যে মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যায়, তখন নানারূপ কপটাচার দ্বারা যে কোনও উপায়ে সেখান হইতে পালাইতে পারিলে রক্ষা পায় মনে করে। বাহিরে অজুহাতের অভাব হয় না—কিন্তু অন্তরে সব ধরা পড়ে।

এই সমস্ত আশ্রমবাসীর দ্বারাই আশ্রমের নানারূপ অলীক অপবাদ সৃষ্টি হয়। সামান্য বিচার বুদ্ধি বিশিষ্ট মানব তাহাদের কবলে পড়িয়া এই সমস্ত মহৎ প্রতিষ্ঠানের বিরোধী হইয়া উঠে। অবশ্য ইহাতে প্রতিষ্ঠাতা, উদ্যোক্তা বা অন্যান্য বিচারশীল আশ্রমবাসী দিগের হতাশ হইবার কারণ নাই, কিন্তু

তবুও তাঁহাদিগকে দুষ্টের সঙ্গে সংগ্রামে অনেকখানি শক্তিক্ষয় করিতে হয়। সে জন্য তাঁহারা যদি শক্তিমান্ না হন, তবে সে সংগ্রামে তাঁহাদের লোপ পাওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু বিধাতার বিধানে মহৎ উদ্দেশ্য যার—বিধি সহায় তার। সাংখ্যের ধ্বংসের মতে তাঁহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হন না—কিছুকালের জন্য অভিভূত থাকেন মাত্র। পুনরায় সহায় সুযোগ প্রাপ্তে বলশালী হইয়া অন্যায়াসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন, কেননা সত্ত্বস্বর কখনও বিনাশ হয় না।

যাহারা আশ্রম জীবনে বিতৃষ্ণ, তাহারা প্রায়ই সমাজের ভোগের জন্য সতৃষ্ণ। যদি সাময়িক ভাবে কোনও মহান্ উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য কেহ আশ্রম দেবতার অনুমোদনে অন্যত্র থাকে, তবে তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা বিশেষ চিন্তা করিয়া আশ্রম জীবনাবলম্বন করিয়াছে বলে, অথচ তারপর তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের পূর্ব্বাবলম্বিত পথের বা স্থানের নিন্দায় মুখর হয়, সেই সমস্ত অবিবেচকের কপাই হইতেছে। সাধু ব্যক্তি কখনও আপন উদ্দেশ্যের প্রতিকূল অবস্থা দেখিলে নিন্দায় মুখর হয় না। সুধী লোক তাহাতেই তাহার চরিত্র বুঝেন।

নিন্দার শত কারণ ঘটিলেও মহান্ উদ্দেশ্য স্থাপিত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা প্রথমে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মত সমাজ বদ্ধ লোকের জীবনের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, সমাজের ও পরিবারবর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা যেমন আমাদের দুঃখ দুর্ব্বলতা লুকাইবার স্থান পাই, ইঁহারা তাহা পান না, তাই আমাদের দুর্ব্বলতা লোকের চক্ষু এড়ায়, কিন্তু ইঁহাদের সহায় শূন্য জীবনে বিশেষতঃ মহদুদ্দেশ্যে পরিচালিত জীবনে সামান্য কলঙ্কও তিলে তাল হইয়া মর্ম্মদাহী হয়। শোকে দুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমাদের মত শত ভরসা বা সান্ত্বনার স্থল ইঁহাদের নাই বলিয়া স্বয়ং ভগবান আসিয়া সে স্থল পূর্ণ করেন, আর তাঁহারা আমাদের চেয়ে সমাজে নিন্দিত হইলেও শ্রীমদ্ ভগবানে আমাদের চেয়ে শতগুণে নির্ভরশীল এবং পদে পদে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া বহুগুণে শক্তিশালী হইয়া উঠেন। আরাম উপভোগে সমাজের কীট হইয়া দিন দিন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, তাহা আবৃত করিতে না পারিয়া বিকৃত উপায়ে আত্মপূরণের চেষ্টার চেয়ে আশ্রম জীবনের নিতান্ত পঙ্গু ও দুর্ব্বল জীবনও আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং ভগবৎসকাশে অধিক অগ্রণী। কারণ আমাদের ভার নেই আমরা—আর তাঁদের ভার নেন স্বয়ং শ্রীভগবান্।

কল্যাণবরেষু

ভাই ধীরেন! লেখায় একটুখানি হাত পাকতে না পাকতেই তুমি আজকাল অপরের মনোরঞ্জনের দিকেই দেখছি বেশী ঝুঁকে পড়েছ, এইজন্যই আজকাল তোমার লেখার মাঝে তেমন একটা মৌলিকত্ব দেখতে পাই না, আর যা বল তার সঙ্গে যেন তোমার তেমন কোন নিবিড় সম্বন্ধ নেই—এটা কিন্তু শুভলক্ষণ নয়। রাগ ক'রো না, তলিয়ে চিন্তা করে দেখো আমি যা বলছি তা ঠিক কি না!

আমাতে আমি নিবিষ্ট হয়ে যে কোন কাজই করিনা কেন, তাতেই অপরের প্রাণ তৃপ্তি পাবে। আসল কথা, আমরা অপরের মনকে আকর্ষণ করতে চাই বটে, কিন্তু অপরের মনকে কি সঙ্কেতে আকর্ষণ করা যায় তা জানি না। আমরা ভাবি অপরের মন জুগিয়ে চল্‌লেই বুঝি অপরে আমায় ভাল বল্‌বে, কিন্তু দু'দিন পর দেখি যার মন জুগিয়ে চলার দরুণ আমার এত আগ্রহ, এত উৎকণ্ঠা, সে-ই আমার প্রতি সব চেয়ে বেশী উদাসীন, বেশী অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে চল্‌ছে! কাজেই প্রথম থেকেই যদি তোমার ভিতর এ দৈন্য দেখা দেয়, তুমি যদি আত্মারাম না হতে পার, তা হলে সাময়িক ভাবে তুমি লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে পারবে বটে, কিন্তু দু'দিন পর তার আর কোন মূল্যই থাক্‌বে না। তোমার প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ আছে, আমি তোমার উপর অনেক আশা রাখি, সুতরাং তোমাকে যদি দু'দিন পর যা তা লেখকের নামের মাঝেই যুক্ত দেখি, তাহলে নিদারুণ দুঃখ পাব। তোমার যে একটা ব্যক্তিগত ভাব—ব্যক্তিগত প্রকাশের শক্তি রয়েছে, এ কথাটা যেন কখনো ভুলে যেও না!

পরেশকে আজকাল অনেকেই নূতন সাহিত্যিক-দের মাঝে উচ্চস্থান পাবার যোগ্য বলে মত প্রকাশ করছে। আমার বোধ হয়, সুনাম কিনবার অস্ফুট লোভটা তোমাকেও দিন রাত্র তাগাদা দিচ্ছে। কিন্তু সাবধান, কারও প্ররোচনায় যেন ভুলে যেও না! পরেশের লেখা আমি বেশ মন দিয়েই পড়ি—আজকাল তার লেখা ব্যক্তিত্ব হারা! এই জন্যই তার লেখার অন্ত নাই. কিন্তু কি যে সে বল্‌তে চায় সেটা সর্ব্বত্রই অস্ফুট অবস্থায়ই থেকে যাচ্ছে। এখানেই বুঝ্‌তে পার—তাকে কোনও না কোনও মোহে অস্ফুট আচ্ছন্নতার দিকেই আকর্ষণ করে নিয়ে চল্‌ছে। কিন্তু দু'দিন আগেও তার লেখার জড়ত্ব বলে কোন জিনিষ ছিল না। অপরের মন জুগাতে গিয়েই এত শীঘ্র তার পতন আরম্ভ হয়েছে। দু'দিন পর সে দেউলিয়া হয়ে যাবে—কিন্তু তখনও সে বৃথা অভিমানের বোঝা বহন করেই গর্ব্ব প্রকাশ করবে দেখো।

সব কথাই কাজের কথা হবে, সব কথাই প্রয়োজনে লাগা চাই—এর কোন মানে নাই। নিছক আনন্দ দেওয়াই কারো কারো কাজ। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য খানা বাস্তব প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিচার করে দেখ্‌লে তেমন কোন উল্লেখ যোগ্য নয়, কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা আর একদিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। মেঘদূত খানা পড়ে বিরহী যক্ষের ব্যথাটা যেন আমাদেরও ব্যথিত করে তুলে! প্রয়োজনের মাঝেও স্থূলসূক্ষ্ম ভেদ রয়েছে। তুমি হয়ত স্থূলের রাজ্যেই আছ, তা'বলে সূক্ষ্ম-লোককে তুমি অবহেলা করতে পার না।

যা প্রকাশ করবে, তা নিজের অন্তর রাজ্যের উৎস থেকেই যেন উথ্‌লে উঠে, তাহলেই দেখ্‌বে অপরে তোমার রচনার প্রশংসা না করে পারবে না, আর সে প্রশংসার এত অল্প হবে না। আপন মনে তন্ময় হয়ে রচনা কর, গান গাও, যাই করনা কেন, তাতেই দেখ্‌বে লোক বেশী মুগ্ধ হবে! নিজের মাঝে ডুবে তন্ময় হয়ে যাও, অপরের দিকে তাকিও না সে তোমার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হল কি না হল। জগতে বিধাতার এই যে ভেদের সৃষ্টি, এরও একটা মহৎ তাৎপর্য্য রয়েছে, নিজের বৈশিষ্ট্যটুকু সকলে ধরতে পারে না বলেই বিধাতার এই ভেদের পরম নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তোমার মাঝে যে বৈশিষ্ট্যটুকু আছে, অপরে তা নাই। তুমি যদি আত্মস্থ হয়ে গিয়ে তোমার বৈশিষ্ট্যটুকু

আবিষ্কার করতে পার, তা হলেই তুমি অপরের কাছ থেকেও প্রকৃত মর্য্যাদা পাবে। রচনা করতে গিয়ে অপরের কথা মনে এনো না। তুমি তোমাকেই সাক্ষী করে প্রাণের কথা ব্যক্ত করে যেও—তাহলেই দেখ্‌বে রচনার মাঝে মৌলিকত্ব বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা ক্রমশঃ লেখার মাঝে ফুটে উঠ্‌বে। পরেশকে আমি কোন কথা বল্‌ব না, এর মানে এ নয় যে তার উন্নতি আমি কামনা করি না। তার এই পর্য্যন্তই গতি, কাজেই উপদেশ দিলেও কোন কাজ হবে না। কিন্তু তুমি যেন হঠাৎ ভুল পথে পা দিয়ে ফেলেছ, একটু সতর্ক হয়ে ফিরে তাকালেই তুমি তোমার আসল পথ চিনে নিতে পারবে। এই জন্যই আমি একটু সচেতন করে দিচ্ছি তোমায়।

সাহিত্যিক জগতে যাঁরাই উচ্চ-সম্মান লাভ করেছেন, তাঁদের লেখা পড়ে দেখো, বরাবর তাঁদের লেখায় তাঁদের বৈশিষ্ট্য জিনিষটা বজায় রয়েছেই। তাঁরা রচনা করে চলেছেন—অপরে তাতে সন্তুষ্ট হবে কি না হবে সেদিকে তাঁদের বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা বা ব্যকুলতা নাই। তা বলে তাঁরা যে সাধারণকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন তা নয়। তাঁরা কোন দিন অপরের ফরমায়েশ নেন না! কেননা ফরমায়েশ অনুযায়ী লিখ্‌তে গেলেই—প্রতারণা করতে হয়।

গভীর ভাবে তলিয়ে গিয়ে যে অনুভূতি তুমি পাচ্ছ—তার মূল্য অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই দেবে। কেননা প্রাণে প্রাণে যোগাযোগ রয়েছে! সকলে প্রকাশ করতে না জান্‌লেও হৃদয়ের গভীর অনুভূতি সকলের প্রাণকেই সহজেই মুগ্ধ বিস্মিত করে ফেলে! তলিয়ে চিন্তা করে—তুমি যে কথাটা বল, তার মূল্য হয় সব চেয়ে বেশী। এর কারণ কি?

ভোগ দ্বারা কেউই তৃপ্ত নয়। কাজেই ভোগের কথা বল্‌লে ভোগীর কাছ থেকে সাময়িক প্রশংসা বা সমাদর পেতে পার বটে, কিন্তু দু'দিন পর এই ভোগীই তোমাকে অন্য প্রশ্ন করবে। কাজেই রোগ দেখে চঞ্চল না হয়ে, আশু প্রতিকারের ব্যবস্থায় লেগে না গিয়ে, স্থির ধীর ভাবে চিন্তা করে দেখো রোগের নিদান কি?—মানুষ কি চায়? কিসের জন্য তার এই অস্থিরতা? মূল তথ্য আবিষ্কার না করে যতই কেন সহানুভূতি দেখাও না, তাতে স্থায়ী প্রতিকার হবে না কিছুতেই।

বেশী লিখ্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। খুব deeply চিন্তা করতে শেখ। আবোল-তাবোল কতকগুলি কথা চারি পাশে ছিটিয়ে গেলে তাতে লোকের হিত হয় না। প্রয়োজন মনে করলে লিখা বন্ধ করে দিলেও কোন ক্ষতি নাই, তবুও যা তা চিন্তা দিয়ে রচনার গুরুত্বকে খর্ব্ব ক'রো না।

তুমি তোমার আসন থেকে নীচে নেমে গিয়ে লোকের সঙ্গে মিতালী করতে যেও না। যখন তারা বুঝ্‌বে, তখন আপনি তারা এসে তোমার উর্দ্ধ প্রতিষ্ঠ আসনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে যাবে। তোমার কথা অপরের মনোরঞ্জন করতে পারল না বলেই যে আর তার কোন মূল্যই রইল না একথা ভেবো না। তুমি যে স্তরের, যে স্তর থেকে কথা বল্‌ছ—সেখানের যাত্রী হয়ত প্রথমে তুমি না-ও পেতে পার। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে—তা বলে তোমার মত, তোমার চিন্তার ধারা বদলে ফেল্‌তে হবে, তার কোন মানে নাই। তোমার চিন্তা, তোমার বাণী যদি সত্য হয়, তাহলে সমষ্টির প্রাণ সেই চিন্তা, সেই বাণী গ্রহণ করবার দরুণ উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। মানুষের মাঝে জড়ত্ব রয়েছে, সংস্কার রয়েছে, তমো রয়েছে—কাজেই সত্য কথা হলেও, তা

হয়ত প্রথমে উপেক্ষণীয়ই হবে। তা বলে কবি-ঋষি তাঁদের সাত্যিকার বাণী প্রকাশে কুণ্ঠিত হন কি?

তৌষ্টিকতার মোহ সর্ব্বত্রই রয়েছে। বরঞ্চ বেদনা নিয়ে চল, তবু যেন না পেয়েও পাওয়ার ভাণ করতে না শেখ! আবেগ থাকা চাই, কল্পনাশক্তি থাকা চাই—কিন্তু কোন কিছুতেই অভিভূত হয়ে পড়ো না যেন। সে দিন রমেশ আমাকে এক পত্র দিয়েছে—আমি তার প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেন প্রশংসা করলাম না। আমি জানি অনেকের পক্ষে প্রশংসা করাও যা, আর তাকে অবনতির পথ প্রদর্শন করে দেওয়াও তা। সময় সময় আঘাতও দিতে হয়, তাতে অনেকখানি কল্যাণই সাধিত হয়ে থাকে।

গম্ভীরভাবে চিন্তা করবার শক্তি সকলের নাই। এইজন্যই সকলেই ঠিক ঠিক প্রাণের কথাটী কি—তা আবিষ্কার করতে পারে না। তুমি ভেবেছ, বেশী পড়লে আর বেশী লিখলেই বুঝি তুমি প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য। আর সকলের কাছে প্রশংসা পেলেও—আমার কাছে কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েই তোমায় ফিরে যেতে হবে। সর্ব্বত্রই সাধনার প্রয়োজন। ফাঁকি দিয়ে কোথাও কেউ সত্য আবিষ্কার করতে পারে নি। এত গুলো কথা বলবার উদ্দেশ্যেই হল এই যে, তুমি লোকের কাছ থেকে প্রশংসা পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠো না যেন। নিজের সাধনায় তন্ময় হয়ে যাও। সাধনার সিদ্ধি লাভ করলে সকলেই তখন প্রশংসা করবে, মানপত্র দেবে, আরও কত কি! আর সময় নেই—এখন বিদায়। ইতি-

তোমার……

বেদনায় *

আঁধার হৃদয়ে মোর জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো
ওহে প্রভু দীন দয়াময়।
ব্যর্থতা লইয়া আর কত কাল রব দেব
শূন্যে সব হইল যে লয়॥
যাহা কিছু ছিল ভালো নিঃশেষিত আজি তাহা
কি কহিব কপাল লিখন।
শূন্য সে হৃদয়ে আজ মায়ার মোহিনী লীলা
হইতেছে হায় অনুক্ষণ॥
ব্যর্থতার হাহাকার হৃদয়জুড়িয়া আজ
শান্তি-সুখ-আনন্দ-বিহীন।
মরমে গুমরি মরি কি হবে উপায় মোর
ভাবি তাই আমি নিশি দিন॥
সাধন ভজন হীনে চরণে যে দেছ স্থান
অহেতুক কৃপা মূল তার।
সেই কৃপা স্মরি শুধু রহিনু পড়িয়া দেব
বহিবারে জীবনের ভার॥

* পুরাতন কাগজ পত্র নাড়া চাড়া করিতে করিতে এই কবিতাটী হস্তগত হয়। বাস্তব গুরুত্বের দিক দিয়া ইহা মূল্যবান্ না হইলেও সত্য সাধকের প্রাণের বেদন স্বরূপে ইহা বড়ই প্রাণস্পর্শী, তাই কবিতাটী পত্রস্থ করিলাম। আঃ দঃ সঃ

কাজ ও প্রাণ

—(০)—

মানুষের কর্ত্তব্য অজস্র। আপনার জীবন, পরিবারস্থ প্রত্যেকের জীবন, দেশের দশের হিত, প্রভৃতি সমস্তই নির্ভর করে নিজের উপর। দুর্ব্বল মানব আপন জীবন নিয়েই অস্থির, তার উপর পারিবারিক নানা বিভ্রাট চিন্তা, এর পরে আর দশের হিত করবে কখন? তবুও অনেক সময়ে চক্ষু লজ্জার খাতিরে, সম্মান বাঁচাতে গিয়ে অনেক সময়ে পেটে না দিয়েও পরের দৌরাত্ম্য পিঠ পেতে সয়ে যেতে হয়—অন্য নানা প্রকার জুলুম তো আছেই। বাইরে থেকে দশের চোখে যিনি মস্ত লোক, অর্থাৎ যাঁর প্রচুর আয়, ভিতর খুঁজ্‌লে হয়ত দেখা যায়, তিনি তাঁর দীনতম প্রজার চেয়েও সম্বল শূন্য। কিন্তু দশের সাম্‌নে ঠাট বজায় রাখা চাই—নতুবা প্রধানতঃ নিজের এবং পিতৃপিতামহদিগের সম্মান থাকে না। আবার কেউ হয়ত এর সম্পূর্ণ উল্টো অর্থাৎ অর্থ আছে প্রচুর, নাই শুধু চক্ষুলজ্জা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও উদার প্রাণ। প্রায়ই দেখা যায়, যার প্রাণ আছে তার ধন নাই, ধন থাকেতো প্রাণ নাই। সুতরাং সে জন্য বিধাতার উপর, ধর্ম্মকার্য্যের উপর গাল কম নয়।

কিন্তু মানুষ চায় প্রাণ। টাকা অবশ্য তার নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু উদার প্রাণের একান্ত চেষ্টার পরেও যদি একদিন কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য না করা যায়, তবু সেই বিশ্বাসী উদার প্রাণ অপরের কাছে অবিশ্বাসের কারণ হয় না। কিন্তু টাকা দিয়েও অনেকে সাধারণ সুনামটুকু কিন্‌তে পারে না। বিশেষতঃ অসৎ লোকের টাকা এক ভয়ানক মারাত্মক অস্ত্র। ওদিকে হিন্দুর মতে এবারের উদারপ্রাণ নির্ধন ব্যক্তির পরজন্মে ধনে-জনে নানা প্রকারে সুখী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম-সুকৃতিলব্ধ অর্থ দ্বারা অপকর্ম্ম করার ফলে এবারের অমন সুখী (?) ব্যক্তিরও পরজন্মে নিতান্ত দুঃখের আশঙ্কা। সুতরাং স্বাভাবিক উদারপ্রাণ ব্যক্তি না চাইলেও দুই দিকে তাঁর লাভ হয়। প্রথমে অনায়াসার্জ্জিত সুনাম (যাহা সুনামপ্রার্থী ধনীর পক্ষে নিতান্ত দুর্ল্লভ) দ্বিতীয় পরকালের সুখ ও আনন্দ।

তবেই দেখা যায়, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কেবল অর্থের উপর নির্ভর করে না। দেশের জন্য বা নিজ দেহ ছাড়া অপর যে কোনও ব্যক্তির জন্য কোনও ব্যক্তির যদি যথার্থ প্রাণ কাঁদে, তবে নানা বিরুদ্ধ যুক্তিসমূহ বা অর্থাভাব সত্ত্বেও যে কোন প্রকারে তিনি অপরের সাহায্য করতে পশ্চাৎপদ হন না। কিন্তু যেখানে প্রাণের সঙ্গে যোগ না হয়ে শুধু কেবল যুক্তির দায়ে বাধ্য হয়ে পরের সাহায্য করা বা যে কোনও কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয়, সেখানে সে কার্য্যের ফল নিতান্ত অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর হয়। আর যুক্তির উপর নির্ভর ক'রে কাজ করার পরে যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তবে তখন সমস্ত দোষ পড়ে যুক্তির উপর। অর্থাৎ তখন যুক্তির মধ্যে নানা দোষ আবিষ্কার হয়। কিন্তু প্রাণের টানে যে কাজ করা যায়, তার মধ্যে যদিও কার্য্য সম্পাদনের জন্য কিছু বিচার যুক্তির প্রয়োজন, তবু সেখানে বিফলতার জন্য শুধু বিচারকে দোষী করা চলে না। মনে

সান্ত্বনা থাকে যে, প্রাণে যা চেয়েছে, যুক্তি সহকারে তাই করেছি, সুতরাং তার ফল যাই হোক্, বরণ করে নেবার শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু অনিচ্ছায় শুধু যুক্তির দায়ে করা কর্ম্মের অশুভ ফলের দোষ চাপাই আমরা অন্যের ঘাড়ে। সাধারণতঃ এই ধরণের লোকই বার আনা।

কিন্তু নিজের পাঁঠা নিজে কাটতে গিয়ে লেজেই কাটা হোক্ বা তার ঘাড়েই কাটা হোক্, সে জন্য যেমন জবাবদীহি অপরের কাছে দিতে হয় না, তেম্নি প্রাণের টানে করা কর্ম্মের অশুভ ফলেও পরের উপর দোষ-চাপান-প্রবৃত্তি বা জবাবদীহি দিবার অবস্থা খুব কম ঘটে। তাই যে কোনও কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে একদিকে যেমন চাই বিচার, অপর দিকে তেমনি চাই বহু গুণে অধিক প্রাণের একান্ত আগ্রহ। অনেক স্থলে বিচার যুক্তির চেয়েও প্রাণের আগ্রহই বেশী প্রয়োজন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিচার-যুক্তির চেয়েও অন্তর হ'তে অন্তর্য্যামীর যে প্রেরণা আসে, তারই উপর নির্ভর করতে হয় বেশী। অবশ্য প্রায়ই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রাণের আগ্রহ যায় না, কিন্তু সৎকার্য্যে প্রাণের আগ্রহ যাদের নাই, তাদের যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই সঙ্গত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নানা উপদেশ দ্বারা কর্ম্মকরা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তা বুঝাবার পরে কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, সে সব বুঝিয়ে বল্ছেন :—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
কর্ম্মণোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

—কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি এবং অর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, তা অনেক সময়ে যাঁরা বিবেকী বা পণ্ডিত, তাঁরাও বুঝ্তে পারেন না। এজন্য আমি তোমাকে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে বল্ছি। তা জান্লে অশুভ থেকে তুমি মুক্তিলাভ করবে। কর্ম্ম কি, বিকর্ম্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি, তা তোমায় বুঝতে হবে—কেননা কর্ম্মের গতি বড় দুরূহ। যিনি কর্ম্মের মাঝে অকর্ম্ম দেখেন (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করেও কিছুই আমি করি নি ব'লে নিরভিমান থাকেন) এবং অকর্ম্মের ভিতর কর্ম্ম দেখেন (অর্থাৎ সাধারণের হিসাবে যাহা অকর্ম্ম, এমন যে ভগবন্নির্ভরতা, তার মধ্যেই সমস্ত কর্ম্মের মূল তত্ত্ব রয়েছে বলে যিনি মনে করেন) তিনিই বুদ্ধিমান, যোগী, ও সম্যকরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী।

এখানেও সেই অন্তরে থেকে যিনি 'ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া' 'মায়া দ্বারা সকলকে চালাইতেছেন' সেই অন্তর্য্যামীর কথাই বল্লেন। তাঁর উপর নির্ভর করলে পর অন্তর হ'তে তিনি যা বলেন, তাই তাঁর আদেশ জেনে প্রাণের টানে তাতে লেগে পড়্বে। তার ফলে শেষে যাই ঘটুক না কেন, সব তাঁরই ইচ্ছা জেনে হাসিমুখে সয়ে যেতে হবে। বাইরে লোকে হয়ত বল্বে, 'অমুক উদারপ্রাণ ব্যক্তি এই সমস্ত দুরূহ মহৎ কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করেছেন'—কিন্তু তুমি জান্বে ও সব অকর্ম্ম অর্থাৎ কিছুই নয়। আর যে দিকে কেউ তাকায় না, সেই অন্তরের অন্তর্য্যামীই তোমার একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর ভজনারূপ অকর্ম্মই তোমার সার কর্ম্ম। আর সব ভেজাল, মাত্র বাইরে কতকগুলি ঠাট বজায় রাখা—আসল কর্ম্ম ও নয়।

এমনি ক'রে অন্তরের ডাক শুনে, সেই অনুযায়ী যে চলে, তার কাছেই কর্ম্মের দুরূহ তত্ত্ব সহজ হয়ে পড়ে। কোন্টা কর্ত্তব্য বা কোন্টা অকর্ত্তব্য

সে দ্বন্দ্বের মীমাংসা শুধু ভগবন্নির্ভরকারীর শুভ হৃদয়েই চলে। অন্যত্র এর মীমাংসা হয় না। কাজেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে হলে আগে চাই হৃদয়ের নির্ম্মলতা। যদি সেই শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীভগবানের কৃপা হয়, তবেই তাতে প্রেরণা ফুটে। তাই উদার প্রাণ—সরল হৃদয়েরই শ্রীভগবানের প্রেরণা লাভের সম্ভাবনা বেশী। নতুবা প্রাণের অন্তরালে কুটীলতা রেখে বাইরে যুক্তি তর্ক সহকারে অজ্ঞজনকে স্বীয় বিজ্ঞতা বুঝিয়ে মহান্ সাজলেই সে মহান্ হয় না। বরং তাতে তার নীচতা শীঘ্রই ধরা পড়ে যায়। সকলের ভিতরেই অন্তর্য্যামী রয়েছেন। একের মনের অশুভ ইচ্ছা তাই অপরের কাছে প্রকাশ হতে বিলম্ব হয় না। মুখে প্রকাশ না করলেও আত্মম্ভরীর মিথ্যা গর্ব্ব অপরের বুঝতে বাকী থাকে না। আর যিনি প্রকৃত মহান্, তাঁর মহত্বে শতবার ছাইচাপা দিলেও তারই ভিতর থেকে মণির মত সে দ্যুতি বিকীর্ণ করে। প্রকৃত মহান্ চান কাজ—নাম নয়।

কাজেই যিনি আপনি না খেয়ে প্রাণের টানে পরকে খাওয়ান, তিনি খবরের কাগজে আপন নাম জাহির না করলেও সকলের নীরব অন্তরে অন্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত বহুদিনের জন্য স্থায়ীভাবে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েন। আর যাঁরা শুধু চক্ষু লজ্জার খাতিরে বা নিজের বা পিতৃপিতামহের নামের জন্যই স্বার্থত্যাগ ক'রে পরের জন্য অর্থ ব্যয় করেন, সেই সব লোক মন্দের ভাল। তাঁরাও যে কোনও প্রকারে শুভকর্ম্ম-জনিত কিছুটা শুভ ফলের অবশ্য ভাগী হন, কিন্তু প্রকৃত যাঁর পরের জন্য যথার্থ প্রাণ কাঁদে, তাঁর কাণাকড়ি দানের তুলনায় সেই লক্ষ টাকা দানেরও সমান ফল হয় না। কারণ, অন্তর্য্যামী দেখেন অন্তর—আর সকলের মত বাইরের কাজটাই তিনি দেখেন না।

তারপর নিজের, পরিবারস্থ ও দেশের হিতের কথা। যার যেমন পরিমাণে শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, দায়িত্বের পরিমাণও তার মনে তত বেশী ও ব্যাপক হয়। অবশ্য এ শক্তি বলতে অর্থ সামর্থ্য ছাড়াও মনের শক্তির বা প্রসারতার কথাই বলছি। নতুবা গান্ধীজীর মত আরও বহু ব্যারিষ্টার ছিলেন বা আছেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়ত তাঁর চেয়েও অধিক উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন ও আছেন, কিন্তু কই! সকলের তো অমনভাবে আপনার বলতে যা কিছু, তৎসমস্ত দেশের দশের হিতের জন্য ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করতে সাহস হয় না! তাই বলছিলাম, চাই মনের প্রসারতা। তাকেই বলে উদারতা। যার মন যতখানি উদার, তার কর্ত্তব্যও তত ব্যাপক। জোর করে বহুর ভার যদি একের উপর দেওয়া যায় এবং সে ব্যক্তি সে ভার বইতে বাধ্য হয়, তবে সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন হয় যুক্তির দায়ে, প্রাণের টানে বা আনন্দ প্রেরণায় নয়, তাই তার মাঝে ত্রুটী ঘটে বহু। তেমন ভাবে যে কোনও কারণে বাধ্য হয়ে, স্বাভাবিক প্রাণের যোগ-শূন্য হয়ে, অনেকেই দশের হিতে হয়ত আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু তাতে অপরের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হতে চায় না।

যে নিজের হিত অর্থাৎ আত্মগঠন না ক'রে দশের হিত অথবা দশজনের মধ্যে গণ্যমান্য একজন হতে চায়, তার ব্যর্থকাম হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য দু'দিনের জন্য নেতাগিরি হয়ত অনেকের ভাগ্যেই জুটে, কিন্তু অনুবর্ত্তীগণের যথার্থ হৃদয়াসন অধিকারের ভাগ্য খুব কম নেতারই হয়। তার প্রায়ই কারণ দেখা যায়, আত্মগঠনের অভাব।

নিজকে যে সর্ব্বদা সামলিয়ে চল্‌তে না পারে, প্রলোভনে, ঈর্ষ্যায়, দুর্ব্বলতায় যে পদে পদে সত্যপথ হতে বিচলিত হয়, তার পক্ষে পরিবার প্রতিপালনই কঠিন, তার উপর দশের হিত তো দূরের কথা! কেউ হয়ত বল্‌বে যে, "জগতের বেশীর ভাগ লোকই তো অসংযত, আত্মগঠনে অপটু, অথচ তারা কি পরিবার প্রতিপালন করে না, বা দেশের দশের কাজে লাগে না? যদি তাই হয়, তবে তেমন লোক মেলাই দুর্ঘট, সুতরাং যোগ্য লোকের অভাবে পরিবার প্রতিপালন ও দশের কাজ সর্ব্বত্রই পণ্ড বল্‌তে হয়। তা'হলে জগৎ চল্‌ছে কি করে? দেশে এত বড় বড় কাজ হয় কি করে?"

কথাটা সত্যি। কিন্তু খোঁজ করলে দেখ্‌বে, দেশের যাবতীয় মহৎ প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যায় শুধু যোগ্য লোকের অভাবে। ঘুণ ধরতে সুরু হয় বহু পূর্ব্ব হতে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান ছোট-বড় অনুসারে সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে মাত্র কয়েক দিন কম বা বেশী লাগে। পরিবারের কথা বল্‌ছ? কয়টা পরিবার সুখী? তার কারণ, যে নিজে আত্মগঠনের শিক্ষা পায় নি, সে পরিবারস্থ অপরকেই বা সেই শিক্ষার কি দিবে? ফলে অসংযমের লীলাভিনয় চল্‌তে চল্‌তে, এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে দোষের বীজাণু সংক্রামিত হ'তে হ'তে, সমগ্র সমাজ বা দেশটাই অধঃপতিত হয়। ব্যক্তির সমষ্টি নিয়ে যখন সমাজ বা দেশ, তখন এই পরিণাম স্বাভাবিক। পরিবার বা সমাজের অথবা সমগ্র দেশের সুখ-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে ক্রমশঃ অবনতির মূল কারণই আমাদের আত্মগঠনের প্রচেষ্টার অভাব। চরিত্র গঠনের পূর্ব্বেই পরিবার-প্রতিপালনের বা সমাজের বড় বড় কর্ত্তব্য নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে, শেষে তা কোনও মতে নামিয়ে দিতে গিয়ে মানুষ ইঁচড়ে পাকা অর্থাৎ অপুষ্ট পেকেই পরিপক্কের রূপ ধারণ করে। এইরূপ মানুষের আধিক্য হয়েই সমাজ বা দেশের অধঃপতন আনে। বর্ত্তমানে দেশের বহু ব্যাপারের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান কর্‌লে এ সত্য প্রমাণিত হবে।

তবে কোথাও যে মহৎ কাজ হচ্ছে না, তা বল্‌ছি না। খোঁজ কর, দেখবে, সেখানে মহৎ প্রাণেরও অভাব নাই। মহৎ প্রাণেই টাকা আনে এবং সে টাকাই মহৎ কাজে লাগে। নতুবা শুধু টাকাই মহৎ প্রাণ সৃষ্টি করে না। টাকা দিয়ে মহত্ত্ব কিন্‌তে গিয়ে অনেকেই শেষে নাকাল হয়। মোট কথা, প্রাণ যত উদার হবে, ততই সমগ্রকে আপন বলে ভাব্‌বার ক্ষমতা ও সমষ্টির প্রতি আপন কর্ত্তব্যের চিন্তা স্বাভাবিক আস্‌বে। তখন দেখ্‌বে আত্মচরিত্রগঠিত ভগবন্নির্ভরশীল উদার প্রাণ ব্যক্তির নিকট আত্মহিত, পরিজনবর্গের হিত প্রভৃতি পৃথক বস্তু নয়। সমগ্র পরিবার সমাজ বা দেশই তখন নিজের অংশ বলে মনে হবে, আর মূলে তাঁর ভগবন্নির্ভরতা থাকে ব'লে কর্ত্তব্য কি, তা বুঝ্‌তে. বা সে সব প্রতিপালনে শক্তির ন্যূনতা হয় না। অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার শ্রীভগবানই তখন সেই সেবকের ভিতর দিয়ে সমস্ত কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করেন।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংসারে এমন অনেক লোক আছে যারা নানা প্রকার দুরভিসন্ধি হাসিল করার উদ্দেশ্যে সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা মনে করে, সাধু সন্ন্যাসীর নিকট এমন একটী জিনিষ বা মন্ত্র শিখে

নিব, যার দ্বারা এ সংসারে নানা প্রকারে সাংসারিক উন্নতি, লোকবশীভূত বা মোকদ্দমাদিতে জয় লাভ করে আপন উদ্দেশ্য পূরণ কর্‌ব—এই উদ্দেশ্য নিয়ে সদ্‌গুরুর চরণে তারা যেয়ে হাজির হয়। সদ্‌গুরু কিন্তু অন্তর্য্যামী হয়েও তার হৃদয়ের ঐরূপ দুরভিসন্ধি বুঝেও তাকে এমন একটী উচ্চাঙ্গের সাধনা শিক্ষা দেন, যার দ্বারা তার মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। শিষ্য কিন্তু প্রথমে সদ্‌গুরুর নিকট উক্ত উদ্দেশ্য প্রকট করে না। দীক্ষা-শিক্ষা লওয়ার কিছুদিন পর যখন সে বুঝতে পারে, সদ্‌গুরুর দ্বারা তার ঐ সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তখন সে নিজেই সদ্‌গুরুর শত্রুরূপে দাঁড়িয়ে নানা প্রকারে তাঁর অনিষ্ট করে থাকে। কিন্তু সদ্‌গুরু পরম করুণাময়—পরম স্নেহময় বলে অকাতরে তার উপদ্রব সহ্য করেও তার মঙ্গল করতে থাকেন। শিষ্য প্রথম জন্ম ঐরূপ ভাবে শত্রুতা করে গেলেও কিন্তু দ্বিতীয় জন্মে সদ্‌গুরুর কৃপায় তার প্রথম উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে সে বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এরূপ অগ্রসরও কিন্তু সদ্‌গুরুর আকর্ষণে হয়ে থাকে। সদ্‌গুরু দীক্ষা দেন আত্মাকে, তাই শিষ্য সদ্‌গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ না করলেও পারার বিষের মত সেই মন্ত্রটি অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদা ক্রিয়া করতে থাকে অর্থাৎ আত্মা সদা সর্ব্বদাই সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করতে থাকেন। দ্বিতীয় জন্মে তার ধীরে ধীরে ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যতই বিতৃষ্ণা জন্মিতে থাকে, ততই উক্ত মন্ত্র ধীরে ধীরে চৈতন্য হতে থাকে। কিন্তু যখন ঐ মন্ত্র চৈতন্য হতে থাকে, তখন তার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হওয়ায় অথবা ঐ স্থূল শরীরে নানা ব্যভিচারিতা করার দরুণ ঐ জন্মে সে কৈবল্য মুক্তির অধিকারী না হলেও কিন্তু তৃতীয় জন্মে সে ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতঃ কৈবল্য মুক্তি লাভ করে থাকে, সুতরাং সদ্‌গুরুর সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেও কিন্তু শিষ্যের রক্ষা নাই। সে যতই বিরুদ্ধাচরণ করুক না কেন, সদ্‌গুরু তাকে কোলে তুলে নিবেনই নিবেন। এইটী হল তৃতীয় জন্মের খবর। কিন্তু এ কথাও অতি সত্য যে, সদ্‌গুরু ইচ্ছা করলে শিষ্যকে সেই জন্মে কৈবল্য মুক্তির অধিকারী করতে পারেন।

সদ্‌গুরুর শিষ্য হবার পর কেন দ্বিতীয়বার জন্ম হয়,সে খবরও শুনুন। যারা সংসারে সুখ ভোগ কর্‌ব এবং ভগবানও লাভ কর্‌ব এই উদ্দেশ্যে সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় নেয়, তাদের দুই জন্মের ভিতরই কাজ হাসিল হয়ে যায়। প্রথম জন্মে তারা সাংসারিক সুখ-লিপ্সার জন্য সদ্‌গুরুর কৃপায় নিজের Position অনুযায়ী সাংসারিক সুখ ভোগ করে থাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির দিকে লক্ষ্য থাকায় অল্প অল্প সাধন ভজনও করতে থাকে। ফলস্বরূপ সাধন ভজ করার দরুণ সাংসারিক ভোগে তাদের বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়ে অল্প অল্প বৈরাগ্য উদয় হওয়ার পর তাদের দেহত্যাগ হয়। পর জন্মে তারা প্রথম জন্মের সাধন বল লাভ করতঃ অনায়াসে ত্রিতাপ মুক্ত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে কুসুম রূপে বিরাজিত থাকেন। এ সমস্তই কিন্তু সদ্‌গুরুর অহৈতুকী কৃপায় সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

আবার যারা সংসারের যাতনায় দগ্ধ হয়ে সংসারের সমস্ত আকর্ষণ ত্যাগ করতঃ একমাত্র মুক্তিলাভ বা ভগবান লাভের আশায় উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে যেয়ে সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় নেয়, সদ্‌গুরু তাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা বুঝে তাদের একই জন্মে মুক্তি লাভ হতে পারে,ঠিক সেইরূপ ভাবেই তাদের আপনার করে নেন। কিন্তু এরূপ ভাগ্যবান্ জীবের সংখ্যা অতীব বিরল।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, সদ্‌গুরুর ভিতর এমন পক্ষপাতিত্ব দোষ কেন? তিনি কাকেও এক জন্মে, কাকেও দুই জন্মে আবার কাকেও তিন জন্মে মুক্ত করে দেন কেন? মুক্তিই ত সকলের লক্ষ্য তথা

মুক্তিই ত একমাত্র চিরশান্তির নিদান ! সুতরাং তিনি একদম একবারেই তাদের মুক্তির ব্যবস্থা না করে দুই তিন জন্মের ব্যবস্থা করেন কেন ? এর উত্তরে এই বলা যায় যে সদ্‌গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু বিশেষ, তাঁর নিকটে যে ব্যক্তি যা প্রার্থনা করবে, তাকে তারই ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে সে সব ভোগ করিয়ে, সেগুলি যে অসার, এটী উপলব্ধি করিয়ে পরে আপনার করে নেন। কষ্টে যে জিনিষ লাভ হয়, তারই কদর বাড়ে। যারা দিনরাত মাথার ঘাম পায় ফেলে টাকা উপার্জ্জন করে দিনান্তে কোনরূপে দুটী অন্নের ব্যবস্থা করে, তারাই জানে টাকা উপার্জ্জন কত কষ্টকর! এত কষ্টের উপার্জ্জিত জিনিষ ব্যয় করতেও তারা বিশেষ সাবধান হয়ে থাকে। আর যারা কখনও টাকা উপার্জ্জন করে নি অথচ টাকার পাহাড়ের উপর বসে আছে, তারা টাকার কদর জানে না, ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয় না। যে জিনিষের কদর নাই, সে জিনিষের মূল্যও নাই। তাই অধম অধিকারী অত উচ্চাঙ্গের সাধনা পেলে তারা তা অপব্যয় করতে পারে, এবং তার কদর না বুঝে ঘৃণাও করতে পারে, অথবা তার শরীরে অত উচ্চাঙ্গের সাধনা হয় ত সহ্য করবার মত শক্তিরই অভাব। এই সব কারণেই সদ্‌গুরু ধীরে ধীরে তাকে উচ্চাঙ্গের সাধনার উপযুক্ত করে নিয়ে ধীরে ধীরে সাধনগুলি ক্রমানুসারে উপলব্ধি করাতে করাতে তাকে পরাশান্তির অধিকারী করতে থাকেন। সুতরাং তিন জন্মের ভিতর কেমন করে মুক্তি লাভ হয়, বোধ হয় বিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝে থাকবেন।

আর একটি কথা, দীক্ষার পর সদ্‌গুরুর শিষ্যের আর কর্ম্মফল ভোগ করতে হয় না—এরইবা কারণ কি ? এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হলেও আমি নিজের জীবনে যে ভাবটি উপলব্ধি করেছি, পাঠকদের তাই জানাব। সদ্‌গুরু যে মুহূর্ত্তে কোন লোককে আপনার করে নিয়ে দীক্ষা দেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাকে এমন নিষ্কাম সাধনা শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যার ফলে পরে শিষ্য সকামাদি কোন কাজ করলেও তার ফল ভোগ তাকে করতে হয় না। সদ্‌গুরু দীক্ষার পরও কিন্তু তাকে জাগতিক কাজ হতে মুক্তি না দিয়ে কর্ম্মে লিপ্ত রাখেন—শিষ্যকে অনবরত কর্ম্ম করতে হয়। সদ্‌গুরু দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে শিষ্যের যে সকল শুভাশুভ কর্ম্মফল জমা ছিল, সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হবার পর শিষ্য সাধনা দ্বারা বা যে সব কাজ করেন তদ্দারা তার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলগুলি ধীরে ধীরে কাটাতে থাকে। শুভ কর্ম্মফলগুলি মন্দ কর্ম্ম দ্বারা এবং মন্দ কর্ম্মগুলি শুভ কর্ম্ম দ্বারা ক্ষয় করে থাকেন। কারণ শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সকল যে পর্য্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত না হবে, সে পর্য্যন্ত তার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। তাই শুভ ও অশুভ দুটী কাজই সদ্‌গুরুর নিকট নিষ্কাম সাধনা (এ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে লেখা উচিত নয়, সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করে বুঝতে হবে) নিবার পর সাধন করতে করতে ধীরে ধীরে শুভাশুভ কর্ম্ম ফলগুলি কাটাতে থাকে। এ বিচার যেন কারও মনে উদয় না হয় যে সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিবার পর তস্য শিষ্য কখনও ভুলেও কোন খারাপ কাজ করেন না—এটী ভুল ধারণা! এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সুস্পষ্টরূপে নিবেদন করেছি। সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় নিবার পর শিষ্য সর্ব্বতো-ভাবে মঙ্গলের দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে। হাঁ—অনেক সাধুর মনে উদয় হত যে, ভগবৎ সদৃশ সদ্‌গুরুর চরণে যখন আশ্রয় পেয়েছি, তখন মুক্ত হয়ে গেছি, সুতরাং এ নশ্বর দেহ ধারণ করে বৃথা কষ্ট পাই কেন? এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই তারা ভৈরব ঝম্প হতে লাফিয়ে পড়ে দেহ ত্যাগ করত। আজকাল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

উক্ত কুণ্ডগুলি ছাড়া ক্ষীর (দুধ) গঙ্গা, মহোদধি, সরস্বতী, স্বর্গদ্বারী, মন্দাকিনী নাম্নী কয়েকটী ঝরণা ও নদী বিদ্যমান আছে। প্রবাহিণী মন্দাকিনী গঙ্গা উত্তরস্থ স্বর্গারোহণ বা মহালয় পর্ব্বত হতে জন্ম নিয়ে এই কেদারনাথের ভিতর অন্যান্য প্রবাহিণীকে নিজের কোলে স্থান দিয়ে শোন প্রয়াগে যেয়ে ত্রিবিক্রমা গঙ্গাকেও নিজের বক্ষেই জড়িয়ে ধ'রে এলোমেলো তথা উদ্ভ্রান্ত ভাবে ছুটতে ছুটতে যেয়ে রুদ্র প্রয়াগে অলকানন্দায় আত্মসমর্পণ করে যেন শান্তি লাভ করেছেন। ক্ষীরগঙ্গা নাম্নী যে ধারাটী মন্দাকিনীতে যেয়ে আত্মসমর্পণ করেছে, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই :—

ক্ষীরগঙ্গাতু যা ধারা মন্দাকিন্যাস্তু সঙ্গমে।
শিবপ্রদং মহাতীর্থং ক্রৌঞ্চহর্ত্তুঃ প্রকীর্ত্তিতং।
যত্র স্নাত্বা বরারোহে কৈলাস নিলয়ে বসেৎ॥

ক্ষীরগঙ্গা যে স্থানে যেয়ে মন্দাকিনীতে আত্মসমর্পণ করেছে, সেই সঙ্গম স্থানকে "ব্রাহ্মসংজ্ঞক" পরম তীর্থ বলে থাকে। সেখানে স্নান করলে যাত্রী শিবগণ তুল্য হয়ে যান। যথা :—

ক্ষীর গঙ্গাতু যা ধারা মন্দাকিন্যা সুসঙ্গতা।
ব্রাহ্মং বৈ পরমং তীর্থং যত্র স্নাত্বা গণো ভবেৎ॥

এই ব্রাহ্মতীর্থের দক্ষিণে যে স্থানে জল বুদ্বুদাকারে বের হচ্ছে, তার নাম সামুদ্র কুণ্ড। সে জল স্পর্শ করলে শিবতুল্য হয়। যথা :—

তস্মাদ্দক্ষিণতো দেবি যজ্জলং বুদ্বুদায়তে।
সামুদ্রং তজ্জলং প্রোক্তং স্পর্শনা চ্ছিবতায়কম্॥

কেদারনাথের মহান্ত মহারাজকে রাবল (রাওল) বলে থাকে। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই উখী মঠে অবস্থান করেন। বেতনভুক্ত ব্রাহ্মণ পূজারী দ্বারা কেদারনাথের পূজা সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। পূজার বায়ের জন্য যাত্রীদের ভেটাদি ছাড়া টিহরী রাজের তরুক হতে গাড়োয়াল, আলমোরা, ও নৈনিতাল জেলার অনেক গ্রামের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। সমস্ত গ্রামগুলিই ভূতপূর্ব্ব টিহরী মহারাজগণ প্রদান করেছেন। এই কেদারনাথের মোহান্ত মহারাজের অধীনেই গুপ্তকাশী, উখীমঠ, মধ্যমেশ্বর, ত্রিযুগী নারায়ণের পূজার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

আমরা সমস্ত স্থানগুলি দেখে রেতঃকুণ্ডের জল পান করলাম। বড়মা'র জন্যই আমাদের খুব ভালরূপভাবে দেখার সুবিধা হল না। এদিকেও খুব বেলা হয়ে গেছিল, অন্যদিকে আবার পেটের ভিতর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নিজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জাহির করতে আরম্ভ করেছিলেন। কাজেই তাড়াতাড়ি ধর্ম্মশালায় ফিরে পুরী আদি দ্বারা তার আহুতি দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এখানে পাকের খুব কষ্ট! কাঠ মহার্ঘ! নীচের রামবাড়া চটী হতে কাঠ এখানে আসে। তার উপর আবার নিত্য দুপুরের পর হতেই বৃষ্টি বা বজ্রী পড়তে আরম্ভ হয়। কাজেই কাঠগুলি অত্যন্ত ভিজে থাকায় পাক করাও খুব কষ্টকর হয়। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুরী দ্বারা উদরপূর্ত্তি করা গেল।

—ক্রমশঃ

শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দির

গত ইং ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহোদয় জেলা নদীয়ার মেহেরপুর মহকুমা হইতে ৬ মাইল দূরে কাথুলি গ্রামে কুতুবপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দির নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবৎকৃপায় স্কুলটী এই অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নৈতিক চরিত্রবান্ হইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞান ও অন্যান্য শিল্প বিদ্যা অর্জ্জন করতঃ ব্যবহারিক জীবনের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে, এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইহাই অন্যতম উদ্দেশ্য এবং সেই জন্য বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রায় একশত ত্রিশ বিঘা জমিতে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য আয়োজন চলিতেছে। আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতিও কিছু কিছু সংগ্রহ করা হইতেছে।

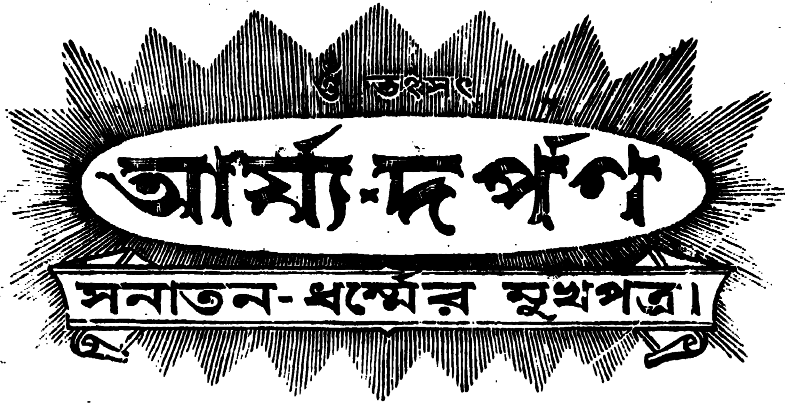
যে সমস্ত শিক্ষক মহাশয়দিগের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদিগের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা অনেকেই প্রতিষ্ঠাতার ভক্ত ও শিষ্য। তাঁহারা প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠানটী একটী আদর্শ শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে, তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে আপাততঃ পাঁচজন বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট আছেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বর্ত্তমানে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষার জন্য যে নূতন সিলেবাস প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তদনুসারে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যা ও, ভূগোল শিক্ষার উপযোগী যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আবশ্যক হইবে, তাহা এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলতঃ ছাত্রদিগের শিক্ষা বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতার ও স্কুলের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিশেষ লক্ষ্য আছে। বিদেশী ছাত্রদিগের অবস্থানের জন্য সুবৃহৎ পাকা ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাত্রদিগের আহারের ব্যয় যথাসম্ভব কম অর্থাৎ মাসিক সাড়ে পাঁচ টাকা হারে ধার্য্য করা হইয়াছে। স্কুলের বেতনের হারও যথাসম্ভব কম করা হইয়াছে। বিদেশী শিক্ষক মহাশয়েরা সকলেই বোর্ডিংএ অবস্থান করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ছাত্রদিগের পড়াশুনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

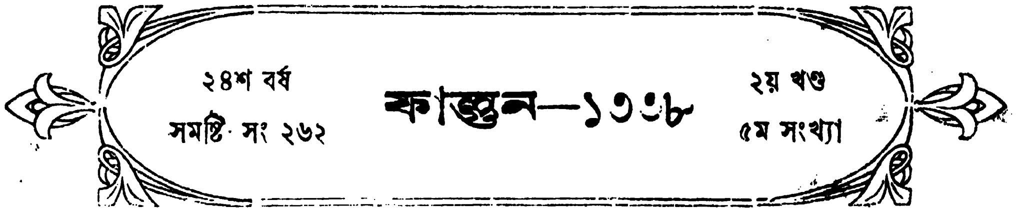
যাহাতে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে, সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আছে। ছাত্রদিগের পানীয় জলের জন্য একটী সুন্দর "টিউব ওয়েল" বসান হইয়াছে। স্কুল কমিটীর মধ্যে জনৈক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, ছাত্রদিগের প্রয়োজন মত তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ের অন্য কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। ইতি—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন, এম, এ,

হেড মাষ্টার।

কাথুলি পোঃ, জেলা নদীয়া।





তদেজতি তন্নৈজতি

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

(ঈশোপনিষদ ৫ম শ্লোক)

ব্রহ্ম সগুণ-নির্গুণ উভয়ই। তিনিই শক্তিমান আবার তাঁহারই শক্তিতে জগৎ নিয়ন্ত্রিত। এইজন্যই তিনি একদিকে সচল আবার অন্যদিকে অচল! সময়ে তিনি চলেন, আবার সময়ে তিনি চলেনও না। অজ্ঞানীর কাছে তিনি বহুদূরে, আবার জ্ঞানীর কাছে অত্যন্ত নিকটে। ব্রহ্ম অজ্ঞানীর হৃদয়েও বিরাজমান; কিন্তু অজ্ঞানী চিত্তের মালিন্য বশতঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারে না। জ্ঞানী নির্ম্মলান্তঃকরণে ব্রহ্মকে আত্মারূপে উপলব্ধি করেন। রামকৃষ্ণদেব অতি সহজ কথায় বলিতেন, জ্ঞানীর ঈশ্বর হেথা হেথা অর্থাৎ কাছে, আর অজ্ঞানীর ঈশ্বর হোথা হোথা— অর্থাৎ বহুদূরে।

ব্রহ্ম সকলের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া বর্ত্তমান, আবার সকলের বাইরেও তিনি! তিনি নির্ম্মল আকাশের ন্যায় বাহির ভিতরে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

ব্রহ্মের এক অংশ মাত্র পরিস্ফুট, আর বাকী তিন অংশই অব্যক্ত। শ্রুতিতে এইজন্যই বলা হইয়াছে—ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। যাহা দেখিতে পাইতেছি, যাহা ব্যক্ত, তাহাতে মাত্র তাঁহার এক অংশ বর্ত্তমান, আর যাহা দেখিতে পাই না অর্থাৎ যাহা তাঁহার আসল স্বরূপ, তাহাতেই তাঁহার তিন অংশ বর্ত্তমান। জানার বড়াই, দর্শনের বড়াই এখানেই সব ভাসিয়া যায়। তাঁহাকে জানি আমরা কতটুকু? সকলকে অতিক্রম করিয়া তিনি যেখানে বসিয়া আছেন, সেইখানেই তিনি স্ব-স্বরূপে বর্ত্তমান। উপনিষদের ঋষি তাহাকেই দিব্যধাম বা অমৃতের রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চঞ্চলতার মাঝেই অচঞ্চলরূপে তিনি বর্ত্তমান। চঞ্চলতার আড়ালেই অচঞ্চল ব্রহ্মের আসন। কিন্তু চঞ্চল দৃশ্যের চঞ্চলতায় আমাদের মনও চঞ্চল হইয়া উঠে—এইজন্যই আমরা বার বার ফাঁকিতে পড়ি। তিনি কিন্তু ফাঁকি দেন না, আমরা স্থিরমনা হইয়া দেখি না বলিয়াই ফাঁকিতে পড়ি। ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় মায়া। তিনি যেন লুকোচুরি খেলিতেই ভাল বাসেন। কাহাকেও ক্ষণেকের দরুণ দর্শন দিয়াই আবার তিনি আড়াল হইয়া পড়েন। কিন্তু একবার যাঁহারা তাঁহার স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা নৃত্যের মাঝেও, চঞ্চলতার মাঝেও অপলক দৃষ্টিতে সেই অচল-ব্রহ্মের পানেই তাকাইয়া থাকেন। খেলনা দিয়াই তিনি আমাদের মনকে ভুলাইয়া রাখিতে চান, কিন্তু যাঁহারা একান্ত মনে তাঁহারই দর্শনের দরুণ ব্যাকুল, তাঁহাদের তিনি কৃপা করিয়া হাত বাড়াইয়া অমৃতের রাজ্যে লইয়া যান। জগৎকে দেখিয়া জগতের বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া যাহারা ভুলিয়া থাকে, তাহারা সেই জগতের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হিরণ্ময় আসনে আসীন ব্রহ্মের অমৃত নগরীতে প্রবেশ করিতে পারে না। অল্প পাইয়া যাহারা তৃপ্ত হইয়া পড়ে, তাহারা বিরাট—ভূমা মহান্ ব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ হইতে বঞ্চিত হয়। চঞ্চলের পাশেই অচঞ্চল রহিয়াছেন বলিয়া চঞ্চলতা স্থায়ী হইতে পারে না। এত পরিবর্ত্তন, এত ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে কি উদ্দেশ্যে, কি অভিপ্রায়ে?—না, অচঞ্চলের সাথে চঞ্চলের যোগাযোগ আছে বলিয়া। শ্রীঅরবিন্দের ঈশোপনিষদে ইহার সুন্দর অর্থ করা হইয়াছে। 'That moves, That moves not'—ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝাইতে গিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন—"The motion of the world works under the government of a perpetual stability. Change represents the constant shifting of apparent relations in an eternal Immutability."

জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন যিনি—তিনি স্তব্ধ নীরব। একদিকে তিনি ভোলানাথ—মৌন, আবার অন্যদিকে তিনিই জগতের অধ্যক্ষ। তাঁহার এই

নিস্তব্ধতার ভিতরই অনন্ত ইঙ্গিত-আভাস পাইয়া যেন প্রকৃতি অবলীলাক্রমে অনায়াসে সৃষ্টির বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার এই মৌন স্তব্ধ ভাবের সুগভীর উদ্দীপনা রহিয়াছে। প্রকৃতি এইজন্যই ভোলানাথ পুরুষকে এত ভালবাসেন। প্রকৃতির মাঝে অবসাদ নাই, কেননা নির্ব্বিকার মৌন পুরুষের কাছ হইতে যে প্রকৃতি অহরহঃ নব নব ইঙ্গিত আভাস পাইতেছে। নিজে কিছু না করিলেও করাইবার শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্ম জগতের অধ্যক্ষ। নিস্তরঙ্গ অনুভূতি হইতেই শক্তির এই বিপুল উচ্ছ্বাস। চঞ্চলা প্রকৃতির অচঞ্চল পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা রহিয়াছে। পুরুষের মনোমত হইবার দরুণই প্রকৃতির এই বিচিত্র বেশ। কাজেই চঞ্চলতার ভিতরও প্রকৃতি সাধ্বী—তাঁহার অচল নিষ্ঠা সেই নির্ব্বিকার উদাসীন স্বামী বা অধ্যক্ষ পুরুষের প্রতিই নিয়ত বর্ত্তমান। সক্রিয় চেতনার বহু উর্দ্ধে সেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের আসন। কাজেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে হইলে নিষ্ক্রিয় চেতনার প্রয়োজন। নিষ্ক্রিয় চেতনারও কাজ আছে, কিন্তু সেই কাজ উচ্চ প্রয়োজনের নিমিত্ত, তাহা মানুষকে উর্দ্ধপ্রতিষ্ঠ আনন্দের অভিমুখী করে। নিম্নাভিমুখী বৃত্তির নিরোধ হইলে, অর্থাৎ মানুষ যখন স্তব্ধ হয়, তখনই সেই উর্দ্ধাভিমুখী সাত্ত্বিক বৃত্তির স্ফুরণ হয়। কাজেই বৃত্তিনিরোধ হইলে যে মানুষ জড় হইয়া যায় তাহা নয়, বরঞ্চ উর্দ্ধমুখী চেতনার দীপ্তিতে তাহার দেহ-মন-প্রাণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

অজ্ঞানীর কাছে—সাধারণ সংসারীর কাছে ব্রহ্ম চঞ্চল। কেননা তাহাদের মন চঞ্চল কি-না। কৈবল্য বাদীর কাছে ব্রহ্ম নিশ্চল, কেননা নিছক বিবেক জ্ঞান দ্বারা কেবলের সাক্ষাৎকারই হয়। কিন্তু সম্যকদর্শী বৈদান্তিকের কাছে ব্রহ্ম চলও বটেন, নিশ্চলও বটেন—তদেজতি তন্নৈজতি। ইহাই উপনিষদের আসল উপনিষদ বা আসল রহস্য।

উপনিষদের বাণী

মানুষের প্রাণকে সজীব সরস রাখতে হলে অনেক সময় নিয়মের দৃঢ় বন্ধনকে শিথিলও করে দিতে হয়। প্রাণশক্তি অবাধে লীলায়িত হতে পারলে তবেই না ভিতর থেকে ত্যাগের শক্তিও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে! আমরা চাই মানুষ মহৎ হোক্, ত্যাগের শক্তি দ্বারা নিজকে উপলব্ধি করতে শিখুক—কিন্তু সেই ত্যাগ করবার শক্তি, মহৎ হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা

কি করে মানুষের ভিতর জাগতে পারে, সে দিকে মোটেই লক্ষ্য করি না। এক কথায় বল্‌তে গেলে—আমরা আশা করি মানুষের কাছ থেকে অনেক, কিন্তু সেই আশা যাতে ফলবতী না হয় প্রকারান্তরে তার ব্যবস্থাও করি অনেক! মানুষকে বিশ্বাস করতে না পারলে, শ্রদ্ধা করতে না জান্‌লে, আমরা যে আদর্শ মানুষের প্রত্যাশা করি, সেই আদর্শ মানুষ মনের মাঝে বাসা বেঁধেই থাক্‌বে, বাইরে কোন দিন তার প্রকাশ দেখবো না।

ভারতের ঋষি আনন্দলোকের স্থায়ী বাসিন্দা! তাই মর জগতে এসেও তাঁদের অচল-অটল অনুভূতি হ'তে কখনও তাঁরা বিচ্যুত হন নি! চারিদিকে রোগ, শোক জরা-মৃত্যু, আদি ব্যাধি দেখেও ভারতের সত্য দ্রষ্টা ঋষির মুখে সেই আনন্দেরই বাণী। এই জন্যই জগতের হিত করতে এসে ঋষি প্রথমে এবং শেষে এক আনন্দের বাণীই প্রচার করে গেলেন— নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধের কথা বলার প্রয়োজনই বোধ করেন নি তাঁরা। তাঁরা একথা বুঝেছিলেন, মানুষ যদি আনন্দে থাক্‌তে পারে, আনন্দই যে মানবের স্বরূপ এ কথা উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে বিনা বিধি-নিষেধ প্রণয়নেও মানুষ সত্যের পথে ক্রমশঃ উন্নতী হবেই। মানুষ যে চিরমুক্ত— এই বাণীই তাঁরা প্রচারিত করে গিয়েছেন।

আমরা চাই অবিকৃত জিনিষ, কিন্তু চাপ দিয়ে নিজেরাই তাকে বিকৃত করে তুলি! আত্মবিশ্বাসে যাঁরা বলীয়ান, তাঁরা অপরকেও বিশ্বাস করতে সন্দেহ করেন না। এই চঞ্চল জগতের মাঝেও—প্রতি কাজে, প্রতি কর্ম্মে যাঁরা সেই অচঞ্চলের অনুভূতি লাভ করেছেন, তাঁরা কখনো একদেশদর্শী হন না। সংস্কারে অন্ধমোহেই মানুষ ছোট হয়ে থাকে, তা না হলে প্রত্যেক মানুষের ভিতরই সেই বিশ্বদেবতার অধিষ্ঠান। অধিকারী অনধিকারী বিচার না করে ঋষিরা এইজন্যই সকলকেই সেই অমৃতের সন্ধান বলে দিয়ে গিয়েছেন। ব্যভিচার যে না হয়েছে এতে তা নয়, কিন্তু ঋষিরা সম্যক্ দৃষ্টি সম্পন্ন, তাই তাঁদের বিচার এক অংশ নিয়ে নয়। তাঁরা দেখেছেন, এই স্খলন এই ত্রুটি বিচ্যুতি অতি ক্ষুদ্র; মানুষ যদি এই আনন্দের—মুক্তির সংস্কার নিয়ে মরতেও পারে, তাহলেও পরম লাভ।

একদেশদর্শী বলেই অনেক ক্ষেত্রে আমরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি। আমাদের তাগাদা বেশী, প্রয়োজন বেশী, এইজন্যই প্রয়োজনের সামগ্রী ছাড়া আর কারও প্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। অবিচারক হয়ে আমরা কত যে অন্যায় জুলুম করে চলেছি অহরহঃ তার ইয়ত্তা নাই। আমার যদি একটা বিশিষ্ট ইচ্ছা থাকে, তাহলে প্রত্যেকেরই যে একটা বিশিষ্ট ইচ্ছা রয়েছে সে কথাও দরদের সহিত মেনে নিতে হয়। সবকে মেনে নিয়ে ব হওয়াই হল আসল বড় হওয়া। অনাদি কাল হ'তে সুরে-অসুরে দ্বন্দ্ব, ভাল মন্দে দ্বন্দ্ব, কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মাঝেই ভগবানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কাউকে অবজ্ঞা করেন না, সকলকেই স্নেহ করেন। এই স্নেহের দ্বারাই পাপীও একদিন নিজের নিজের পাপের বিচার করে অনুতপ্ত হয়, দুর্ব্বৃত্ত তার অপকর্ম্মের দরুণ গ্লানি অনুভব করে।

জগৎ যে ভাবে চল্‌ছে—চলুক, আর তা চল্‌বেই। কিন্তু আমরা এই চলার চঞ্চলতার সঙ্গে যোগ না দিয়েও থাক্‌তে পারি। এই যোগের কৌশল যাঁদের জানা আছে, তাঁরাই জগৎকে এত দুঃখময়, এত আবর্জ্জনাপূর্ণ জেনেও

তাকে ভালবাসেন, এর মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। সে দিন রবি ঠাকুরের 'প্রশ্ন' কবিতায় ঠিক এ কথা গুলোই পেলাম।—

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়া হীন সংসারে ,
তারা ব'লে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালবাসো—
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

প্রত্যাখ্যাত হয়েও, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পেয়েও তাঁরা জগৎবাসীকে সেই অমৃতের মন্ত্রই প্রদান করে গিয়েছেন। মানুষের ভিতর মহত্ত্ব রয়েছে— একদিন সেই মহত্ত্ব সকলেই উপলব্ধি করতে পারবে, এই আশায় এই বিশ্বাসে জগাই মাধাইর ন্যায় দুর্ব্বৃত্তের কানেও প্রেমের মহামন্ত্র সঞ্চার করে গিয়েছেন। তাঁরা ছোটর সঙ্গে নিজকে ছোট করেন নি। নিজে বড় হয়ে সকলকে বড় হ'তেই উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেউ ছোট নয়, কেউ হীন নয়, সকলের ভিতরই সেই নিষ্কলুষ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, এই ছিল তাঁদের বাণী। যুগে যুগে তাঁদের বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে মানুষ, কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষি তবু তো বিচলিত হন নি। তাঁদের চরম অনুভূতির মহিমায় সকল গ্লানিকে তাঁরা সয়ে গিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, একদিন তাঁদের বাণীর সত্যতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। যথেষ্ট ক্ষতি, যথেষ্ট গ্লানি স্বীকার করেছেন, তবু তাঁদের অচল-অটল অনুভূতি হতে তাঁরা বিচ্যুত হন নি। এই অচল অটল শ্রদ্ধার মূল্য জগৎবাসীকে একদিন দিতে হবেই।

শত বন্ধনে জর্জ্জরিত, শত শত সংস্কার মোহের কবলে কবলিত জাতিকে যে একদিন শঙ্করাচার্য্য এই মুক্তির বাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন— এখানেই তিনি পরমপূজ্য জগদ্গুরু। নিদ্রিত জাতির যথেষ্ট জড়ত্ব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে তিনি নিরাশ না হয়ে, প্রত্যেককে—'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন—ইহা কি তাঁর কম উদারতা এবং আত্মশক্তির পরিচয়? অধিকাংশ মহাপুরুষই যখন আসেন, তখন জগৎ অনেক খানি পেছনে পড়ে থাকে, তাঁদের আত্মশক্তির মহিমার বলেই জগৎ আবার দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। তাঁরা ত্রুটী গলদের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে, আত্মশক্তি দ্বারা সকলকে যোগ্য করে তুলেন। মহাপুরুষদের বিশেষত্ব এখানেই। অপূর্ণ জগৎকেও এ ভাবেই তাঁরা পূর্ণ করে তুলেছেন।

উপনিষদের ঋষির কোন সম্প্রদায় নাই। তাঁরা নিজেরা অমৃত লোকের সন্ধান জেনে, বিশ্ববাসী সকলকেই সেই অমৃতের সন্ধান বলে গিয়েছেন। কে অধিকারী, কে অনধিকারী এ বিচার তাঁদের মনে জাগেই নি।

মানুষের আজন্মসিদ্ধ কুসংস্কারকে যাঁরা আত্মশক্তির মহিমায় দূরীভূত করেছেন, তাঁরাই গুরু—জগৎপূজ্য। মানুষ যখন সংস্কারে, মোহে আচ্ছন্ন হয়ে জগৎকে কলুষিত করে তুলে, তখনই সেই অমৃত লোকবাসী ঋষির আগমন হয়। তাঁদের আত্মমহিমার দীপ্তিতে সমস্ত জগৎ তখন রূপান্তরিত হয়ে যায়। পাপ ত্রুটী বিচ্যুতি গলদের কথা তখন মানুষের বিস্মরণই হয়—তাদের যেন সম্পূর্ণ নবজীবন লাভ হয় তখন।

ন্যায়, সাংখ্য বৈশেষিক সকলের মাঝে দুঃখই মূল সূত্র, তাঁরা এই দুঃখ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বের করবার দরুণই ব্যাকুল। কিন্তু বেদান্তের মাঝে ঠিক উল্টো সুর। বেদান্ত বলছেন, দুঃখ কি জানি না, জানি জীবন আনন্দময়, জীবন অমৃত। যজ্ঞে সোম পান করে আমরা অমর হয়েছি। তোমরাও অমৃতের পুত্র, সেই বার্ত্তাই তোমাদের শুনাতে এসেছি। তোমরা আনন্দ

স্বরূপ—আনন্দের এই উজ্জ্বল অভিব্যক্তিই খাঁটী ধর্ম্ম।

উপনিষদ আনন্দের দর্শন, কিন্তু সাংখ্য পাতঞ্জলাদি হল দুঃখের দর্শন। এই দুঃখ হতে নিষ্কৃতি লাভই হ'ল চরম লক্ষ্য। কিন্তু উপনিষদের ঋষির তো দুঃখই নাই, তিনি যে সমস্ত জগৎকে আনন্দের অভিব্যক্তি রূপেই প্রত্যক্ষ করছেন।

সাংখ্য পাতঞ্জলের সৃষ্টি হয়ে মানুষের দুঃখের লাঘব হয় নাই, বরঞ্চ বৈদিক ঋষি সরল বিশ্বাস নিয়ে যে শাশ্বত আনন্দের সন্ধান জেনেছিলেন, দার্শনিক তার কণা মাত্রও উপলব্ধি করতে পারে নাই। উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচারের কচ্ কচি নেই, ব্রহ্মকে যেন তাঁরা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই ব্রহ্মাকে কে মান্‌বে আর কে না মান্‌বে সে আশঙ্কা তাঁদের চিত্তে বিন্দুমাত্র সংশয়ান্দোলন জাগাতে পারে নি।

সরল বিশ্বাসের ন্যায় মূল্যবান্ সম্পদ্ আর নাই। এই বিশ্বাসেই মানবের প্রাণ সুস্থ সবল বলিষ্ঠ থাকে। বেশী সংশয় করে, সন্দেহ করে, প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। বরঞ্চ প্রশান্ত চিত্তেই সমস্ত রহস্যের মূল আবিষ্কার করা যায়।

আনন্দ দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান আর নাই। শোকে দুঃখে মুহ্যমান মানবের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করতে হবে সর্ব্বাগ্রে। জগৎ দুঃখময়, জগতে শান্তি নাই, এ সব কথায় নিরাশাগ্রস্ত মানবকে আরও নৈরাশ্যে ফেলবার বন্দোবস্ত করা হয়। কাজেই জগতের দুঃখের মাত্রা এতে বাড়ে বই একটুকুও কমে না।

উপনিষদ আর্য্য-ঋষিদের চিন্তার যার নিষ্কর্ষ! অন্ধকার, তম, নৈরাশ্য—এ সব কথা উপনিষদে কোথায়ও পাওয়া যায় না। উপনিষদের প্রত্যেকটী বাণী মানুষকে আনন্দে উদ্দীপিত করে তুলে। উপনিষদের ধর্ম্ম সহজ ধর্ম্ম, এইজন্যই তাতে যুক্তির স্থান নাই। যুক্তি দিয়ে মানুষের বুদ্ধিকে তৃপ্তি দেওয়া যায়, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করে অনুভূতির বাণী। সমস্ত উপনিষদে ঋষিদের অনুভূতির মুক্তা ছড়ানো রয়েছে। সেই অনুভূতির বাণী কি?—না জগতের জড় চেতন সবই আনন্দস্বরূপ। জগতে দুঃখ নাই, শোক নাই, আনন্দোৎসবের কলরবে জগৎ পরিপূর্ণ।

ভক্তি ও যোগবল

অনেক সময় মনের মাঝে স্বভাবতঃ সৎচিন্তার প্রবাহ চলিতে থাকে, কিন্তু সেই প্রবাহকে স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা ইচ্ছামত স্থায়ী করিতে পারি না আমরা। আমাদের মাঝে এবং আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত মহাজনদের মাঝে এই জায়গাতেই বিশেষ পার্থক্য। ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা ঊর্দ্ধ প্রতিষ্ঠ আনন্দে নিজকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারেন, আবার ইচ্ছানুযায়ী মনকে সেই ভূমি হইতে নামাইয়াও আনিতে পারেন। মনের এই যে স্বাধীনতা, ইহাও সাধনা দ্বারা আয়ত্ত হইয়া

থাকে। দীর্ঘকাল এবং নিরন্তর অভ্যাসের ফলে এইরূপ অবস্থা লাভ করা যায়।

সাময়িক ভাবে অনেকেই দুর্লভ জিনিবের দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার প্রভাব দৈনন্দিন জীবনের মাঝে স্থায়ীভাবে কোন ক্রিয়াই করে না। ভাব-ভক্তি এসব হ'ল emotional element. ভাবকে, ভক্তিকে স্থায়ী করিতে হইলে যোগবলের প্রয়োজন। হঠাৎ মন অনেক সময় নিবিষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহাকে ইচ্ছামত লক্ষ্যে কিম্বা ইষ্টে সম্বদ্ধ রাখা সহজ নয়। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ইহাই বুঝানো হইয়াছে।—

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০

অন্তিম সময়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে, যোগবল দ্বারা যিনি প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে অচল অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিই সেই দিব্য পুরুষকে লাভ করেন।

শুধু আবেগ বা ভক্তি দ্বারা মনকে একটী লক্ষ্যে বা বিষয়ে অধিকক্ষণ নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারা যায় না, যোগবল না থাকিলে ধারণাশক্তি জন্মায় না। সুতরাং জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে লক্ষ্য বা ইষ্ট সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া যাইতে হইলে ভক্তি এবং যোগবল উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

উপনিষদেও আছে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' বলহীন আত্মার দর্শন পায় না। শক্তি না থাকিলে বল না থাকিলে আত্মদর্শনের পথে যে-সব বিঘ্ন বা বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে অতিক্রম করা যায় না। বীর্য্যের অভাবে অনেক আবেগীর বিষম পতন হইয়া থাকে।

অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা যোগবলকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে যোগ এবং ভক্তির মাঝে যে অহিনকুল সম্পর্ক নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়। ভাবকে, আবেগকে স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়েই যোগশক্তির সাহায্য প্রয়োজন। আমার মনকে যদি ইচ্ছানুযায়ী আমি ইষ্টে লয় করিয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে ইষ্টের প্রতি সাময়িক ভাব বা উচ্ছ্বাসে কি হইবে? ধারণা-শক্তির অভাবে যদি অন্তিমে মন অন্য বিষয় দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ক্ষণস্থায়ী ভাব ভক্তি দ্বারা কি উপকার সাধিত হইল আমার? এই জন্যই তীব্র সংবেগের সঙ্গে সঙ্গে (অর্থাৎ emotional elements এর সঙ্গে) শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এই সব rational elements-এর বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহাদের ভিতর এই সঞ্জিবনী শক্তিগুলির অভাব, তাঁহাদের লক্ষ্য বড় হইলেও পরিশেষে মহা অন্ধকারেই তাঁহাদিগকে নিপতিত হইতে হয়।

যাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসেন বা ভক্তি করেন, তাঁহাদের মাঝে উপরোক্ত দৈবী সম্পদগুলিও রহিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারা ঈশ্বরকে ভালবাসেন with the steady light of faith (শ্রদ্ধা), with vigour (বীর্য্য), with unremitting exertion (স্মৃতি), with calmness & concentration (সমাধি) & with an illumined heart (প্রজ্ঞা)। এই পঞ্চবিধ দৈবী সম্পদ যাঁহাদের ভিতর নাই, তাঁহাদের ভাব ভক্তি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। এই জন্যই ভাব-ভক্তিকে স্থায়ী এবং স্পষ্টোজ্জ্বল রাখিতে হইলে যে যোগ শক্তির অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই

উন্নততর আনন্দে স্বাভাবিক ভাবে মন অল্পক্ষণের দরুণ স্থায়ী হয়, কিন্তু সেই শাশ্বত আনন্দকে জীবনের প্রতি কাজ কর্মের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিতে ইচ্ছুক হইলে যোগবল ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই। বার বার অভ্যাসের ফলে ধারণাশক্তির ক্ষমতা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তখন ইচ্ছানুযায়ী মনকে লইয়া অনাবিল শান্তির রাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে কাল অতিবাহিত করা যায়। অজ্ঞানের ভিতর দিয়া যদি একটা ভাল অবস্থাও চলিয়া যায়, তাহা হইলেও কোন বিশেষ ফল হয় না। কোন না কোনও সময় স্বভাবতঃই মানুষের মন নির্দিষ্ট-তন্ময় হইয়া যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহাদের ভিতর সেই চঞ্চলতা এবং বিকারের আধিপত্য দেখা যায়। কাজেই প্রকৃতি দয়া করিয়া যদি কোন সময় একটা ভাল ভাব বা ভাল অবস্থা আনিয়া দেয় উহাদের, কিন্তু প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিয়া স্বাধীন ভাবে একটা উন্নততর ভাবকে বাহন করিবার সাধ্য উহাদের নাই।

ভাব-ভক্তি-আবেগ, ইহারা নিজেরা চঞ্চল, সুতরাং ইহাদিগকে স্থায়ী বা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পেছনে অবিকম্প যোগের প্রয়োজন। অন্তিমকালে একটা ভাল ভাব লইয়া যাইতে পারিলে পরবর্ত্তী জন্মে ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু অন্তিম সময় ধারণাশক্তির অভাবে সাধারণের মনে কোন ভাবই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। সুতরাং 'অন্ধেন তমসাবৃতা'—লোকেই তাহাদের গতি হইয়া থাকে।

প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সহজ ব্যাপার নয়। দৈনন্দিন জীবনে ধ্যান করিতে বসিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। কিছু সময় ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, পরক্ষণেই মন চঞ্চল হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করিতে থাকে। পতঞ্জলি অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের প্রতি এইজন্যই এত জোর দিয়াছেন। চঞ্চল মন-প্রাণকে একটা বিশিষ্ট দেশে আবদ্ধ করিতে হইলে পেছনে যোগবলের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মন কিছু সময় সকলেরই সতেজ থাকে, কিন্তু অবসাদে, ক্লান্তিতে, ধ্যানের অনভ্যাস বশতঃ মন যখন এলাইয়া পড়িতে চায়, তখন যদি পেছনে যোগবল না থাকে, তাহা হইলে সবই পণ্ড। যোগের নিগূঢ় তাৎপর্য্যই হইল, ধারণাশক্তিকে কিরূপে অচল-অটল রাখা যায়। এই ধারণাশক্তিকে অচল-অটল রাখিতে গিয়াই পতঞ্জলি অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। বৃত্তিনিরোধের উপায় বলিতে গিয়া পতঞ্জলি অভ্যাস এবং বৈরাগ্যকেই প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অনেক কঠোর যোগীর অবস্থা আবার উল্টো দাঁড়াইয়া যায়। তাহাদের কাছে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যটাই হইয়া পড়ে লক্ষ্য, অথচ আসল ভাব পড়িয়া যায় অন্তরালে। এইজন্যই দৈহিক কসরৎ করিয়াই তাহারা তৃপ্ত হইয়া পড়ে। ইহা অধম অধিকারীর লক্ষণ! একটা উন্নত ভাব বা উন্নত লক্ষ্য না থাকিলে জীবনের উন্নতি হইবে কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া? পতঞ্জলি এইজন্যই যোগের কসরৎ-এর মাঝেও ভক্তির স্থান দিয়াছেন। পতঞ্জলির বিশেষত্ব এইখানেই। অভ্যাস-বৈরাগ্য খুবই প্রয়োজন, কিন্তু চিত্তের সম্প্রসাদ তো অভ্যাস-বৈরাগ্য দ্বারা আসিতে পারে না! চিত্ত সরস থাকে ভাব-ভক্তি দ্বারা। এইজন্যই— ঈশ্বরপ্রনিধাণদ্বা, তস্য বাচকপ্রণবঃ, তজ্জপস্তদর্থভাবনম্, এই কয়টী সূত্রও পতঞ্জলিকে রচনা করিতে হইয়াছে।

নেতি নেতি দ্বারা, অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত যখন নিষ্কলুষ হইল, তখন চিত্তের মাঝে প্রসাদগুণ আসিলে বড়ই তৃপ্তি পাওয়া যায়। জ্ঞান দ্বারা, অভ্যাস-বৈরাগ্য দ্বারা অনেক শত্রুকে নির্জ্জিত পরাস্ত করিতে পারি, কিন্তু চিত্তের সম্প্রসাদ আনিতে হইলে ভাব-ভক্তির প্রয়োজন হয়। নিষ্কলুষ চিত্তে দু'চারটী উন্নত ভাব লইয়া জীবন কাটাইতে পারিলে পরম শান্তি পাওয়া যায়। অশেষ কল্যাণগুণসম্পন্ন পরমেশ্বরের চিন্তায় কাহার চিত্ত আনন্দে, সাত্ত্বিক রসে ভরপুর হইয়া না উঠে?

ভাব-ভক্তি ছাড়া যোগবল এবং যোগবল ছাড়া ভাব-ভক্তি কোনটাই সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। সাময়িক ভাব-প্রবণ ভক্তিবাদী বা নিছক কঠোর উপায়াবলম্বী যোগী কেহই আদর্শ নয়। মহাপ্রভুর জীবন ভক্তির পরাকাষ্ঠার জীবন, কিন্তু মহাপ্রভুর মাঝে যোগবল না থাকিলে এত সব ভাবের তরঙ্গ বুকে সহ্য হইত কিনা সন্দেহ! আমরা ভাবেই গদগদ—কিন্তু ভাবকে স্থায়ী করিতে হইলে যে যোগবল—ধারণাশক্তিকে বাড়ানোও প্রয়োজন ইহার দিকে মোটেই লক্ষ্য করি না। ভাবের মাঝে ব্যভিচার আসে এইজন্যই।

ভারতবর্ষ

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—(০)—

ভারতের হিতকল্পে কয়েকটী সঙ্কেত—কি করে ভারতের উন্নতিসাধনে সহায়তা করা যায় সে সম্বন্ধে দু'একটী কথা এখন বল্‌তে চাই। এ সম্বন্ধে রাম দুটী প্রস্তাব করেন। একটী হচ্ছে এই, কয়েকজন সাহসী ও সৎ আমেরিকাবাসীকে ভারতে পাঠাতে হবে। কতকগুলি যা-তা লোক পাঠালে চল্‌বে না,—যারা বেকার অবস্থায় বসে থাকে, কোন কাজ পায় না বলে যে ভারতের ঘাড়ে তাদের চাপাতে হবে, আমি তা বল্‌ছি না, যাঁরা তোমাদের দেশের সেরা—ভাললোক, গুণী, জ্ঞানী তাঁদিকেই পাঠাতে হবে। আমরা এমন লোক চাই, যারা চণ্ডাল পেরিয়া আদিমনিবাসী জঙ্গলী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মানুষের ভিতর গিয়ে কাজ করবে। এরাই কিন্তু ভারতের কৃষক ও মজুর—এদের রক্ত জল করেই ভারতের অন্ন-সংস্থান হয়। তোমাদের কাজের পুরস্কার স্বরূপ এদের কাছে কিছু আশা করো না, এরা নিজেরাই খেতে পরতে পায় না তা তোমাদের দিবে কি? তারা মূর্খ অশিক্ষিত বেকুব বেচারা, আর তার উপর খুব গরীব, তারা কোন রকমেই তোমাদের কাজের পুরস্কার দিতে পারবে না। তেমন লোকের দরকার যারা এদের মাঝে গিয়ে কাজ করতে পারে।—যারা নিজে না খেয়ে এদের খাওয়াবে, আর কোন রকমের প্রত্যুপকার না পেয়ে এদের

সাহায্য করবে। এরকম লোক কি আমেরিকায় নাই ? আমি আশাকরি পৃথিবীর মধ্যে গৌরবময় আমেরিকাখণ্ডে এমন লোকের অভাব হবে না। আমেরিকাবাসীকে আমি মহৎ বলেই জানি, আর তাঁরা চিরদিনই স্বার্থত্যাগী। রাম আশা করেন - ভারতের হিতের জন্য কাজ করতে অনেকেই অগ্রবর্ত্তী হবে। রাম এমন লোক চান না যাঁরা পাদ্রীদের মত সেখানে গিয়ে খুব জাঁকজমকের সহিত ভাল ভাল বাঙ্গলায় বাস করবে আর লোকের উপর আধিপত্য করবে। তাঁরা যে গিয়ে মটর হাঁকাবেন আর খুব সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ-বিলাসপ্রিয় হবেন, তা হলে চলবে না। এসব লোক দিয়ে ভারতের হিত হওয়া দূরে থাক্, অনিষ্টই হবে। আমরা চাই এমন লোক যারা সত্যের জন্য ত্যাগ ও বীরত্ব দেখাতে পারে। চাই প্রকৃত কর্ম্মী ত্যাগী, যাঁরা পেরিয়া চণ্ডালের মধ্যে গিয়ে তাদের কুঁড়ে ঘরে একসঙ্গে মেজেয় শুয়ে নিদ্রা যাবে, তাদের দুঃখ সুখে সমভাগী হবে, তাদের দেওয়া ছিন্ন কন্থা কাপড় পরবে, আর দরকার হলে তাদের সঙ্গে উপবাসীও থাকবে। প্রয়োজন পড়লে তাদের কদন্ন ভোজনেও অরাজী হবে না, যারা নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দ ভুলে যাবে এবং পরের জন্য দুঃখ স্বীকার করতে আনন্দ পাবে, খুব উৎসাহী ও আনন্দময় এমন যুবকরাই এ কাজের উপযুক্ত। তোমরা হয়ত বলবে, 'এ কাজ বড়ই কঠিন, তা আর আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না'। না, এ কাজকে কঠিন এবং অপ্রিয় বলা চলে না, ইহার পুরস্কার যথেষ্টই আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যে, যদি আমরা কারও উন্নতির জন্য চেষ্টা করি, তার উন্নতি হোক না হোক আমরা নিশ্চয়ই নিজে উন্নতি লাভ করি। কার্য্য মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, —তাহারা পরস্পর তুল্য ও বিপরীত। অন্যের উপকার করবো এ ভাব নিয়ে কাজ করা খুবই ভুল আর জঘন্য। আমেরিকাবাসী, তোমরা রামের বক্তৃতা শুনে উপকার নাও পেতে পার, কিন্তু রাম তোমাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, তাই তাঁর যথেষ্ট পুরস্কার। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। পুরস্কারের আশা ছেড়ে দিয়ে এ কাজে নেমে পড়, দেখবে তাতে কি ফল হয়। তোমাদের কাজই হবে তোমাদের কাজের পুরস্কার। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলে ভগবানই ঋণী হয়ে পড়েন, আর তিনি তা সুদে-আসলে ফেরত না দিয়ে থাকতে পারেন না। হে আমেরিকাবাসী! তোমরা ভারতে গিয়ে ভারতবাসীকে আবার কি করে আত্মজ্ঞান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা লাভ করতে হয়, তার শিক্ষা দাও। তোমরা সেদিন রাত্রে রামের বক্তৃতায় 'কৃতকার্য্যতা লাভের উপায়' সম্বন্ধে শুনেছ, সেদিন এই প্রমাণিত হয়েছে যে পৃথিবীতে কৃতকার্য্যতা লাভ করবার একমাত্র উপায় কর্ম্মজীবনে বেদান্ত। সেই বেদান্তকে অনুসরণ কর, অনুভব কর, সে দেশে যাও, তোমরা যদি কথাও না বল, তোমাদের আচরণ, তোমাদের হাবভাব, তাদের যথেষ্ট শিক্ষা দিবে।

যাঁরা ভারতে যাবেন তাঁদের প্রধান কার্য্য হবে এই সব লোকের মধ্যে সৎসাহস জাগিয়ে তোলা। বেচারীরা তাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই বাস করে, পৃথিবীর খবর কিছুই রাখে না। জাতীয়তা নিগড়ে হিন্দুদের পা বাঁধা, তাদের ভারতের বাইরে এক পাও যাবার উপায় নেই। গোঁড়ামী এমনই যে তাদের বিদেশ ভ্রমণ কিম্বা জাহাজে চাপা একেবারেই নিষিদ্ধ। বর্ত্তমানকালে হিন্দুদের মধ্যে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা গোঁড়াদের

কথা গ্রাহ্য না করে সাহসপূর্ব্বক বিদেশ যাত্রা করতে সুরু করেছে বটে, কিন্তু তারা বহু অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে কেবল ব্যারিষ্টারীর সনন্দ নিয়ে যায়, আর নিজেদের দেশের গরীব প্রজার অর্থ শোষণ ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, আর বিলাস ব্যসনে সেই অর্থের শ্রাদ্ধ করে। তারা প্রায়ই সাহেবী চালে চলে আর তাদের আদব কায়দা, বেশ ভূষা, এমন কি গৃহাদি সাহেবী ধরণের ও বিদেশী সাজে সজ্জিত হয়। এমন কি তারা মদ্যপায়ী ও মেজাজী হওয়ারূপ আত্মনাশের উপায়াদিও বিদেশ থেকে অর্জ্জন করে যায়। তারা সাধারণ অশিক্ষিত গৃহস্থকে মামলা মোকদ্দমা করতে শেখায় আর গরীব বেচারিদের অর্থ শোষণ করে। সেই অর্থ দিয়ে যে দেশের কোন কাজ হয় তা নয়, সে অর্থের অধিকাংশই বিদেশে যায় কারণ বিদেশী মালের খদ্দের তারাই বেশী। এইরূপে একদিকে যেমন অর্থের অপব্যবহার হতে থাকে, অন্যদিকে দেশে দারিদ্র্য ও অন্নকষ্ট বৃদ্ধি হতে থাকে।

ভারতীয় নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে জাপানীদের সংসাহস ও উদ্যম প্রচলিত হওয়ার নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। জাপানী যুবকেরা আমেরিকায় এসে আমেরিকাবাসী ভদ্র পরিবারের মধ্যে বাস করে ও তাদের কাজ কর্ম্ম সম্পাদন করে দেয়, আর সেই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়তে থাকে। এইরূপে কয়েক বৎসর আমেরিকায় কাটিয়ে যখন তারা দেশে ফিরে, তখন তাদের পকেট টাকায় ভর্ত্তি করে নিয়ে যায় আর সেই সঙ্গে জ্ঞান অর্জ্জন করতেও ছাড়ে না।

ভারতবাসী জাতীয়তামূলক কুসংস্কারে আবদ্ধ থেকে তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ক্রীতদাসের ন্যায় জীবন যাপন করছে। তাদের এই সব কুসংস্কার ছাড়তে শিক্ষা দিতে হবে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ভিটা ছাড়তে কিছুতেই রাজি নয়, তা তাদের বর্ত্তমান কালোপযোগী করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়ে বসবাস করতেও শিক্ষা দিতে হবে। ইউরোপ থেকে মানুষ এসে এই আমেরিকাতে বাস করে এ দেশকে এখন এমন উন্নত করে তুলেছে যে, ইউরোপকে আমেরিকার কাছে অনেক বিষয়ে হীন হতে হয়েছে। যদি কোন ভারতবাসী দেশান্তরে বাস করতে চায়, তারা আসুক এই আমেরিকায় কিম্বা পৃথিবীর আর কোনও দেশে, তাদের জন্য পৃথিবীতে যথেষ্ট স্থানই পড়ে আছে। তারা বহু দিন ধরে স্বাধীনতা হারিয়ে অচল হয়ে পূতিগন্ধময় বদ্ধবায়ুতে পচতে বসেছে, বেচারিরা দেশের মোহ কাটিয়ে সচল হয়ে স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে বেড়িয়ে আবার জীবন লাভ করুক। আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে যেমন রক্ত চলাচলের আবশ্যক, সেইরূপ পৃথিবীর কিম্বা কোন দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে লোকেদের চলাফেরা করা, এক দেশের লোকদের সঙ্গে অন্য দেশের লোকের পরস্পর মেলামেশা করা নিতান্ত দরকার, নতুবা পরস্পরের ভাব বিনিময়ের যোগাযোগ বন্ধ হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আরও ভারতবাসীর মধ্যে যদি কিছু সংখ্যক অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করে, তবে ভারতে অপেক্ষাকৃত কম লোক বাস করবে আর তারা একটু ভাল খেয়ে পরে থাকতে পারবে।

ইংলণ্ড থেকেই হোক বা আমেরিকা থেকেই হোক যতই কেন হিন্দুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করুক না, তারা কোন প্রকারেই তাদের মধ্যে মুক্তির হাওয়া বইয়ে দিতে পারবে না; কারণ হিন্দুদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বেষ্টনী তাদের এমনই অসাড় করে রেখেছে যে যতই কিছু তাদের

জন্য কর না কেন, তারা তাদের অক্ষমতাই প্রদর্শন করবে। এর দরুণই বলছি যে, তাদের মোহ ঘুচাতে তাদের দেশের বাহির করতে হবে। যখনই তারা আমেরিকা বা অন্য কোন স্বাধীন দেশ দেখবে, তাদের তখন বই পড়াও বা না পড়াও, শিক্ষা দাও বা না দাও, সেই সব স্বাধীন দেশের সভ্য লোকেদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্ব-ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের মধ্যে স্বাধীনতা বা মুক্তির স্পৃহা আপনিই জেগে যাবে। তাদের মোহ অপসারিত হবে, দৃষ্টি খুলে যাবে আর গণ্ডী প্রসারিত হবে। দেশদেশান্তর দেখাই প্রকৃত বাস্তব শিক্ষা।

ভারতের লোক সাধারণতঃ সাদা আদ্মী দেখ্‌লে ভয় পায়, তাদের থেকে দূরে থাক্‌তেই চায়, এমনি কি ভয়ে জড়সড় হয় ও কাঁপ্‌তে থাকে। রেলগাড়ীতে কোন কামরায় যদি কোন সাহেব থাকে, তা হলে সে স্থানে অপর কোন দেশীয় ভদ্রলোককে বস্‌তে দেওয়া হয় না। কোন কোন সময়ে রেলওয়ে ষ্টেশনে রাম স্বচক্ষে দেখেছেন যে, দেশীয় লোক সাহেব কর্ত্তৃক পদাঘাতে বিতাড়িত হয়েছে। যদি কোন সাহেব দেখেছে যে কালা আদ্‌মি তার গাড়ীর দিকে আস্‌ছে, সাহেব অমনি চাকরকে হুকুম কর্‌লে "উস্‌কো নিকালো হিঁয়াসে।" কাজেই এই ভাবে ভারতবাসীকে শক্তি-রহিত ও দুর্ব্বল করতেই বাধ্য বা সম্মোহিত করা হয়েছে। এই মোহের হাত হতে মুক্তি দিবার জন্যই তাদের দেশান্তরে পাঠাতে হবে। আরও তাদের নিজের জাত—নিজ দেশবাসীর দ্বারাও তাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, স্বার্থপরতা বৈষম্যাদি দোষ ঘটিত হীনতা-বৃদ্ধির সহায়তা হচ্ছে। আরও সরকারী কাজ কর্ম্মের যেরূপ ব্যবস্থা তাতেও সম্প্রদায়গত বৈষম্য বাড়ায় এবং ভাই ভাইকে হিংসা না করে থাক্‌তে পারে না। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অবস্থা এরূপ যে, দেশে কিছুতেই মুক্তির হাওয়া বইতে পারে না। শিক্ষা আর কাকে বলে? শিক্ষার লক্ষ্য একমাত্র মুক্তি,—দ্বিতীয় আর কিছুই নয়। যদি শিক্ষায় মোক্ষ এবং স্বাধীনতা না আনে, আমি সে রকম শিক্ষাকে ঘৃণা করি, আমি কিছুতেই তা চাই না, আমি তা থেকে চিরদিনই দূরে। শিক্ষায় যদি আমার বন্ধন বৃদ্ধি করে, আমার তাতে কোন প্রয়োজন নেই। অতএব তাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা বা মুক্তির আশা জাগাতে তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনের একান্তই দরকার। এখন একে কাজে পরিণত করতে হলে হে আমেরিকাবাসী, তোমাদিকেই তথায় যেতে হবে আর তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্ত্তমানে নিতান্ত প্রয়োজন হচ্ছে কিছু টাকার। তা তোমরা ন্যায় ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে উঠাতে পার। আর সেই টাকা দিয়ে কতকগুলি ভারতীয় যুবককে (গ্রাজুয়েট হইলেই ভাল হয়) তোমাদের দেশে নিয়ে এসে আর তাদের তোমাদের কলেজে স্কুলে শিল্প-বিদ্যালয় ইত্যাদিতে ভর্ত্তি করে দিয়ে শিক্ষা দাও। তারা তোমাদের দেশ থেকে নানা বিদ্যা শিল্পকলা ইত্যাদি শিখে গিয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে কাজ করুক। তাদের শিক্ষা দিক্ এবং তাদের উদ্‌বুদ্ধ করুক। তারা তাদের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে পারবে, কারণ তারা তাদের দেশবাসী, তারা তাদের আচরণ ভাষা ইত্যাদি পূর্ব্বে থেকেই ওয়াকিব আছে, তোমরা গিয়ে যা কাজ করবে, তার থেকে তারা বেশী কর্‌তে পারবে। তোমরা অবশ্য উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে কাজ করতে পারবে, কারণ তারা ইংরাজি ভাষা জানে এবং তোমাদের সহজেই গ্রহণ করতে পারবে। নিম্ন-

শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তেমন শিক্ষার বিস্তার হয় নি আর তারা ইংরাজি ভাষাও জানে না। তাদের মধ্যে কাজ করতে হলে তাদের ভাষা আগে জানা চাই। এইরূপে তোমরা যদি কাজ করতে পার, তবেই ভারতের উন্নতির আশা আছে।

ভারতবাসী যখন আমেরিকার ন্যায় স্বাধীন, সভ্য ও উন্নত দেশে এসে পৌঁছে, তখন তাদের চোখের আবরণ খুলে যায়, মোহ কেটে যায়। তারা দেখে, যে সাহেবকে দেখে তারা দেশে ভয়ে জড়সড় হয়, যাদের ছায়া মাড়াতে সশঙ্ক হয়, যাদের সঙ্গে হুজুর-গোলাম সম্বন্ধ, সেই সাহেব মেম কত শত তার পা ঘেঁসে চলে যাচ্ছে, তারা তাদের খাতির করছে, কর মর্দ্দন করছে, এমন কি তাদের সেবার জন্য প্রতীক্ষা করছে, তখন বাস্তবিকই তাদের কাছে এক নূতন জগৎ খুলে যায়, তখন তাদের আর সঙ্কোচ থাকে না, ভয় থাকে না, প্রাণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। স্বাধীনতার আবহাওয়ায় পড়ে তাদেরও তখন মুক্তির স্পৃহা জেগে উঠে।

এ ভাবে শত শত ভারতীয় গ্রাজুয়েটরা এসে তোমাদের দেশে শিক্ষা করে যাক্ আর দেশে গিয়ে এই মুক্তির হাওয়া বইয়ে দিক্। তারা তাদের দেশবাসীকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিক্,— বিজ্ঞান শিল্পকলা প্রভৃতির চর্চ্চা আরম্ভ হোক। তারা কর্ম্মজীবনে আবার বেদান্তকে ফুটিয়ে তুলুক। ভারতের অঙ্গে যে ক্ষত দেখা দিয়েছিল, এই হল তার প্রকৃত ঔষধ। যখন ভারতবাসী প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে, তখন অন্যান্য অভাব অভিযোগ দেখ্‌বে আপনিই দূর হয়ে যাবে। দু'তিন বছরের জন্য কতকগুলি যুবককে এ ভাবে শিক্ষা দিয়ে দেশে পাঠালে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা যায়। তখন তারা নিজেদের ও গরীব দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার করতে পারবে।

যদি কোন আমেরিকাবাসী ধনীব্যক্তি একলক্ষ টাকা এই উদ্দেশ্যে দান করেন, তবে আমরা এখনই এই কাজে লেগে যেতে পারি। রাম এই জন্য তোমাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছেন, তোমরা একটু চেষ্টা কর, খবরের কাগজে আন্দোলন কর, আর তোমরা যদি উদ্যোগী হও, এ কাজ অবশ্যই সফল হবে। এ ত হিতজনক কাজ, কোন দেশের উপকার করলে প্রকারান্তরে জগৎবাসীর — সমষ্টি মানবের উপকার করা হবে। যদি কোন ধনী ব্যক্তি এই টাকা দিয়ে সাহায্য না করতে পারে, তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতিবেশীদের নিকট রামের এই আবেদন জানাও, তাদের রামের সঙ্গে দেখা করতে ব'লো। তোমরা যদি কেউ তেমন বেশী টাকাও না দিতে পার, তোমাদের যথাসাধ্য ত দিতে পার। রাম কিছু তাঁর নিজের জন্যে চাচ্ছেন না, তিনি তাঁর খাবার পরবার জন্যে চাচ্ছেন না, তাঁর ঠোঁট দুটো জাহান্নামে যাক্ যদি তিনি তাঁর স্বার্থ সাধনের জন্য তোমাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করে থাকেন। এতে রামের যতখানি স্বার্থ, তোমাদেরও ততখানি। রাম নিজকে কোন বিশিষ্ট দেশের মানুষ বলে জানেন না, তিনি যতখানি ভারতীয় ততখানিই মার্কিন দেশীয়, —সারা দুনিয়াই তাঁর দেশ, আর মানুষের হিত করাই তাঁর ধর্ম্ম। রামের নিকট কৃষ্ণ যতখানি প্রিয় যিশুখ্রীষ্ট ততখানিই প্রিয়। রাম (অবতার), বুদ্ধ, শঙ্কর—সকলেই রামের কাছে সমান। রাম কোন বিশিষ্ট জাতি নহেন, রাম তোমাদের, সত্য তোমাদেরই। ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, মুক্তির জন্য তোমরা অবশ্যই ভারতবাসীকে সাহায্য করবে এবং তাদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করবে। তোমরা এ কাজে নামবে কি না? —এ প্রশ্ন রাম তোমাদের

নিকট উত্থাপন করছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়ত এ বিষয় নিয়ে লেখালেখি করতে পারে, কেউ বা বক্তৃতাদি করে অন্যকে বুঝিয়ে দিতে পারে, কেউ বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা আবার কেউ হয়ত অর্থ দিয়েও এই মহৎ কাজে সহায়তা করতে পারে। হে আমেরিকাবাসি, তোমরা বল, কে কি দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ? যাঁরা ধনী আছেন, তাঁরা ধন দিন, যাঁরা তেজস্বী-বীর-শক্তিশালী সাহসী তাঁরা ভারতে চলুন, তাঁরা অনার্য্য অশিক্ষিত বর্ব্বরদের মধ্যে, পেরিয়া চণ্ডালের মধ্যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কাজ করুন। যাঁরা বক্তা তাঁরা দেশের মধ্যে এই বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করুন, যাঁরা খবরের কাগজ চালান, তাঁরা এ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখুন। যাঁরা সাহায্য করতে চান, সত্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে চান, যাঁরা আত্মহিত চান, তাঁরা রামকে নাম ঠিকানা দিতে পারেন এবং কে কি ভাবে সাহায্য করতে রাজি আছেন তাও তাঁরা নিজহাতে লিখে দিতে পারেন। যদি আপনারা টাকা দেন, তবে তা ট্রাষ্টীর নিকট গচ্ছিত থাকবে এবং ট্রাষ্টী আমেরিকাবাসী আপনারাই হবেন। যদি আপনারা একাজে হাত দিতে ইচ্ছুক থাকেন, আসুন আমরা এখনই কাজে লেগে যাই, এবং এ কাজটী যাতে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করি। এখন বলুন আপনারা কি করতে চান। এই হচ্ছে আমেরিকাবাসীর নিকট রামের আবেদন। রাম নিজে ব্যক্তিগত ভাবে এ কথা জানাচ্ছেন না, রামের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের কোনই সম্পর্ক নাই। রাম সকল সময় সকল অবস্থাতেই মুক্ত, রামকে কোন বন্ধনেই বাঁধা যায় না। সারা দুনিয়াই রামের, রাম সব স্থানেই আছেন।

তোমরা তোমাদের দেশকে যদি মাথা মনে কর, তবে পা হচ্ছে ভারতবর্ষ। পা'কে অগ্রাহ্য করো না, পা যদি অবশ হয়, অচল হয়, তবে দেহও অচল হবে, ক্রমশঃ মাথা ও বিগড়ে উঠবে, ক্ষুধার্ত্ত ভারতবাসীর বেশে ভগবানই তোমাদের দ্বারে এসেছেন, তাঁকে খাওয়াও। ভগবানই উলঙ্গ ভারতবাসীর বেশে এসেছেন, তাঁকে পরাও। ভগবানই তোমাদের নিকট দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত হয়ে আসেন, তাঁদের দিকে ফিরে চাও—তাঁদের অভাব ঘুচাও। তারা কাতর হয়ে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে আছে, কেন? না—তোমরা দয়া, মমত্ব, প্রেম ইত্যাদি সদ্গুণে বিভূষিত হবার সুযোগ পাবে বলে। তারা পতিত কেন? না—তোমরা উদ্ধার পাবে বলে। তোমাদের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও, যেহেতু তোমরা উচ্চ বৃত্তিগুলির চর্চ্চা করবার সুযোগ পেয়েছ আর নিজের শক্তির সদ্ব্যবহারও করতে পারছ। দেখ, এ সুযোগ হারিও না। তোমরা হাসিমুখে, আনন্দের সহিত তোমাদের ভাইদের উদ্ধারের কাজে হাত বাড়াও।

মার্কিনবাসি! চীন-জাপান রেড্ইণ্ডিয়ান নিগ্রোদের জন্য কতই না করেছে, এমন কি পশুর প্রতি অত্যাচারও নিবারণ করেছে। হে আমেরিকাবাসী! যে হিন্দুরা আর্য্য ব'লে গৌরবান্বিত, যারা তোমাদের রক্তমাংস, যারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যারা খুব মরমী ও প্রেমী, যারা চিরবিশ্বস্ত, তাদের প্রতি অবহেলা করো না!!!

যাঁরা এ বিষয়ে বেশী কিছু অনুসন্ধান নিতে ইচ্ছুক, তাঁরা যেন অমুক ঠিকানায় রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।*

---

* এই বক্তৃতা স্বামীজী আমেরিকা প্রবাসকালে দিয়েছিলেন, সে ত্রিশ বছর আগের কথা। বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। স্বামিজীর এই বক্তৃতার অনেক প্রণিধান যোগ্য বিষয় আছে বলে আমরা এর অনুবাদ প্রকাশ করছি। সঃ আঃ

মাহেন্দ্রক্ষণে

ঐক্য আমাদের ভিতরে, বৈকুণ্ঠ আমাদের হৃদয়ে, বাইরেই যত ভেদ এবং অসামঞ্জস্য! কাজেই পরস্পরের মাঝে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করিতে হইলে, বাহিরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের অন্তরের মাঝে তলাইয়া যাইতে হইবে। বাহিরে আমরা এক হইতে পারিব না, কিন্তু অন্তরের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিব আমরা সকলেই এক। প্রত্যেকে যদি আত্মোপলব্ধি করিবার সন্ধান জানিতে পারে, তাহা হইলেই বাহিরের ভেদ বিরোধ আনিতে পারিবে না। "যস্তু সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।" ঐক্যের মূল মন্ত্র এই খানেই। মানুষ যদি আত্মোপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সকল ভেদ সত্ত্বেও পরস্পরের মাঝে ঐক্য লাভ হয়। উপনিষদ এইজন্যই সর্ব্বাগ্রে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন—'আত্মানং বিদ্ধি!'

* *

মনের সমুদায় শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলেই সমস্ত আলোকিত হইয়া উঠে, তখনই আমরা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান জানিতে পারি। চঞ্চল মনের অস্পষ্টতায় চরম সত্য আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে না। মন দিয়াই জানিতে হইবে, কিন্তু সেই মনকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। মন স্থির হইলেই ভিতরে অসীম শক্তির আবির্ভাব হয়, তখন এই মন দ্বারাই সবকে জানা যায়। পতঞ্জলির বৃত্তিনিরোধের তাৎপর্য্য এই খানেই। আমাদের শক্তি আছে, কিন্তু শক্তি বিক্ষিপ্ত বলিয়াই সাধারণতঃ আমরা উত্তেজনাপ্রবণ বা দুর্ব্বল।

শিল্পী অনেক ধ্যানের পর তাহার মনোমত মূর্ত্তি গঠন করিয়া তুলে, তেমনি আমাদের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে হইলেও অনেক ধ্যানের প্রয়োজন। চিত্ত স্থির করিতে বসিয়া দেখিয়াছি, মনে প্রথমতঃ যা তা ভাসিতে থাকে, আসল লক্ষ্য ফুটিয়া উঠিতে সে-ও মনের মাঝে কম বিপ্লব সাধিত হয় না। সংস্কারের বশে বায়োস্কোপের চিত্রের মত কত কিছুই মনের মাঝে চমক মারিয়া চলিয়া যায়। এই সময় কিন্তু উদ্বিগ্ন বা অস্থির হইলে চলিবে না—শান্ত হইয়া দ্রষ্টার আসনে বসিয়া থাকিলে কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, আমাদের চিত্ত আপনি মেঘনির্ম্মুক্ত নীলাকাশের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ধ্যান করিতে বসিয়া বারবার মন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়, নিরুদ্ধ সংস্কার আসিয়া কোথা হইতে উঁকি মারে, ক্ষণিকের দরুণ তখন লক্ষ্য হারাও হইয়া যাই, কিন্তু আবার মন লক্ষ্য পানে ফিরিয়া আসে। জীবনে সিদ্ধি লাভ হয় অনেক সাধনার পর। আমরা জানি অনেক কিছু, কিন্তু তাহাতে ভেজালের অন্ত নাই। চিত্ত শুদ্ধির পর, অনেক সাধনার পর, বারবার ধ্যান অভ্যাসের পর—আমাদের হৃদয়দেবতা অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া ফুটিয়া উঠেন।

* *

আদিতেও অব্যক্ত, অন্তেও অব্যক্ত, কেবল মাঝখানেই ব্যক্ত! কাজেই চক্ষু মেলিয়া দেখার চেয়ে চক্ষু বন্ধ করিয়া দেখিবার বস্তু অনেক। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, যাহা বলি, তাহা শুধু সম্পূর্ণের আংশিক বিকাশ মাত্র। জড়বাদী অধ্যাত্মবাদী সকলেই মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করিয়া বসে। একজন বলে, এই জগৎ ছাড়া

স্থূল প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছি তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই, আর একজন স্থূল জগৎকে একদম উড়াইয়া দিতে চান। কাজেই তাহাদের মাঝে কেহই সম্পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আমাদের চেতনা অগাধে সমস্ত স্তরে যাতায়াত করিতে পারে না, এইজন্যই যতটুকু দেখি, যতটুকু বুঝি, ততটুকুকেই চরম মনে করি। বিশ্বাসীর কাছে জগতের অনেক নিগূঢ় রহস্য সহজেই আসিয়া ধরা দেয়।

* *

চেতনাকে স্পষ্টোজ্জ্বল রাখিতে হইবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। মৃত্যুচিন্তা আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে, আসলে মৃত্যু কিন্তু তত ভীতিপ্রদ নয়। চেতনা উজ্জ্বল থাকে না বলিয়াই অন্ধকারের মাঝে অনেক শত্রু আসিয়া প্রবেশ করে। মৃত্যু কি তাহাই বলিয়া দিয়া যাইতে আসেন যম, কিন্তু ভয়ে তখন আমাদের চক্ষু নিমীলিত! লাভের স্থলেই আমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি। এক লক্ষ্য, এক চিন্তায় যাহাদের চেতনা স্বচ্ছ থাকে, মৃত্যুর সময়ও বিভীষিকা আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে না। এক আবাস ছাড়িয়া অন্য আবাসে গেলে যেমন দুঃখের কারণ হয় না, তেমনি সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন মানবের কাছে মৃত্যুও ভয়ের কিছু নয়। মেটার লিঙ্ক 'Our injustice to death' এ মৃত্যু সম্বন্ধে ঠিক বলিয়াছেন। 'The more we dread it, the more dreadful it becomes, far it but thrives upon our fears.

* *

যাহা পাই, যাহা অনুভব করি, তাহার সব খানি স্থূল জগতে নামাইয়া আনিতে পারি না; ইহাও এক রহস্য! কাজেই বিচার করিতে হইলে ব্যক্ত-অব্যক্ত সব নিয়া সমগ্র ভাবেই বিচার করিতে হইবে। জগতে কাহাকেও অবহেলা করা যায় না। যে নীরব হইয়া আছে, তাহার যে কোন সম্পদ নাই তাহা নহে, হয়ত তাহার হৃদয় তৃপ্তির আনন্দে ভরপুর। যাহা বলি, তাহা তলাইয়া বলিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হইবে। জগতে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীও হইয়া পড়ে, সেখানে বহির্দৃষ্টিতে বিচার করিলে সেই বিচার সুষ্ঠু বিচার হইবে না। মনের কথা যে বলিতে পাবে, তাহাকেই ভাল লাগে কেন? না, বাহিরে যাহা প্রকাশ করি, অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়ে ঠিক ঠিক সেরূপ ধারণা মোটেই থাকে না, কিম্বা প্রকাশ করিবার বেলায় উল্টো কিছুও প্রকাশ হইয়া পড়ে। মানুষের অব্যক্ত চিন্তা, অব্যক্ত ভাবকে যিনি রূপ দান করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রেষ্ঠ কবি। রহস্যময়ী প্রকৃতির রূপ। যিনি লাভ করিতে পারেন, তিনিই মানব মনের অনেক গুপ্তকাহিনী আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন।

* *

আত্মপ্রত্যয়ের চেয়ে বড় জিনিস আর নাই। সত্য-ভাবনা দ্বারা সকলকেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারা যায়, কিন্তু সত্যে অচল-অটল নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস থাকা চাই। আমাদের কথায় অপরের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে না কেন?—তাহার প্রধান কারণই হইল, যাহা বলি তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না, এইজন্যই আমারই মনের সংশয় শ্রোতার মাঝেও সংক্রামিত হয়, তখন শ্রোতাও আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আমরা তখন রাগ করি শ্রোতার উপর, কিন্তু আসলে গলদ যে নিজের মাঝে। আমার সংশয়ই যে শ্রোতাকেও সংশয়াম্বিত করিয়া তুলিয়াছে সেদিকে মোটেই লক্ষ্য করি না। বিচার করিয়া দেখিলে

দোষারোপ না করিয়া আত্মশুদ্ধি দ্বারাই সর্ব্বাগ্রে নিজকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হয়। চিন্তা-ভাবনা সত্য এবং সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। যাহা বলিব তাহা যেন হৃদয়নিঙড়ানো হয়। বলিব একরূপ, আচরণ করিব অন্যরূপ, তাহা হইলে যথার্থ হিত করা হইবে না।

*　　*　　*

প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে জনসাধারণের মতের মিল হয় না অনেক সময়। সকলের সঙ্গে মতের মিল হইল না দেখিয়া প্রতিভাশালী দমিয়া পড়েন না। অধিকাংশই অপরের মতের বাহন। প্রতিভাশালীর বিশিষ্ট মত। সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের মহিমা উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। প্রতিভা জিনিষটাই আদতে অদ্ভুত। প্রতিভার মাঝে দৈন্য নাই, সেইজন্য লোকমতের পানে তাকাইয়া তাহাকে চলিতে হয় না। আপনাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন, দৃঢ়নিশ্চিত বলিয়াই জগতের সঙ্গে না মিলিলেও প্রতিভাশালীর কোন দুঃখ নাই।

(ক্রমশঃ)

পথভোলা

—(০)—

পথের মাঝেই রইলি ভুলে
　　পথ-ভোলা মোর হায়—
জানিস্ না যে এখনও চোখ
　　ভুলের পানেই ধায়!

মন ভুলানো কল্পনা তোর
　　রঙীণ হয়েই রয়—
আসল কিছুই নাইকো সেথায়
　　তাইতো শেষে ভয়।

রঙের নেশায় পতঙ্গ তুই
　　মরণ পানেই ধাস্,
পথ দেখাবে যেই দিশারী
　　তার পানে না চাস্!

আয়রে আমার মরণ-পথিক
　　পথ ভোলা মোর আয়—
বাইরে এলি যাদের দেখে
　　ওই যে তারা যায়।

যায় দিশারী তাদের নিয়ে
　　যে চায় তারে পায়,
ঘুচ্‌বে জ্বালা, প্রাণের চাওয়া
　　মিল্‌বে তাঁরই পায়।

বিচিত্র প্রসঙ্গ

"বিমল দা! আচ্ছা, আপনি এত জেনেও অমন করে চুপ করে থাকেন কেমন করে? সাংখ্য-বেদান্ত পাতঞ্জল সব দর্শনেই আপনার সমান অধিকার, ইচ্ছা করলে আপনার মত ব্যক্ত ক'রে কতজনের মনের সংশয়কে অবহেলে আপনি নিরসন করতে পারেন, কিন্তু আপনি যেন কৃপণের মত সব ধন আগলিয়ে বসে আছেন—এ থেকে যেন একটী কপর্দ্দকও পাওয়ার কারও অধিকার নেই। আজ আপনাকে ছাড়ছি না, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।"

"আমার এমনি স্বভাব অমল! কতজনেই তো লিখছে, লিখে আর কি করব? পাণ্ডিত্য প্রকাশ দ্বারা কারও সত্যিকার হিত করা যায় না ভাই! এ কথা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছি, তাই এত কিছু জেনেও (তোমার কথায়) চুপ করে থেকেই আজ কাল বেশী আনন্দ পাচ্ছি—আর আমার এই আনন্দোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ সকলকেই স্পর্শ করছে এবং করবে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস আমার হয়ে গেছে। লেখা আলোচনা সব ছেড়ে দিয়েছি, এখন দিন দিন তলিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া নয়—দিব্য-চেতনা, দিব্য আনন্দের অনুভূতি নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকি এই আমার অভিলাষ। অনেককেই প্রত্যাখ্যান করেছি—কিন্তু তোমার আবদার অবহেলা করা বড়ই সুকঠিন দেখছি। তা যাক্—কি আর করা। তুমি যদি কোনও কিছু জিজ্ঞাসা কর, তা হলে আমার বক্তব্য যা তা বলব। নিজ থেকে আমি কিছুই বলতে পারব না কিন্তু, জিজ্ঞাসা করলে দু'এক কথা বলার থাকলে তাই বলে যাব।"

"তা হলেই হ'ল, বিমল দা! আপনি যদি উত্যক্ত না হন, তা হলে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের অবধি নাই। আজ কাল মনটা বড়ই সংশয় প্রবণ হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রের এক একটী সূত্র বা বাণীকে আমি তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখি। শুধু একজনের কথায় তৃপ্ত হওয়া যায় না, এক একটা বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মহাজনদের কি মত তাই অনুসন্ধান করে দেখি। যাক্, অভয় যখন দিয়েছেন, তখন আজ পাতঞ্জলের একটা কথাই জিজ্ঞাসা করব।

"পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদে খুব সম্ভবতঃ ২৯ কি ৩০ শ্লোকে **"প্রত্যক্ চেতনাধিগম"** বলে একটী কথা রয়েছে। আচ্ছা, বৈদান্তিকের কাছে প্রত্যক্ চেতনা কিরূপে প্রতিভাত হয়, প্রত্যক্ চেতনাধিগমের উপায় কি?"

"পাতঞ্জল দর্শন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলার আছে অমল! সে থাক্, পরে না হয় বলা যাবে। আগে তোমার প্রশ্নের জবাব দিই।

"প্রত্যক্‌চেতনাধিগম' বলতে পতঞ্জলি যে undifferentiated egoকে mean করছেন, তাকেই যদি only personality বলে ধারণা করতে পার, তাহলে তুমি বৈদান্তিকের view পেলে। কথাটা বুঝলে? আমাদের প্রত্যেকের মাঝে একটা **'অহং'** আছে। এই **'অহং'টা** consciousnessএর একটা মাঝা মাঝি অবস্থা।

'অহং বোধ' বা self consciousnessএর উদ্ভবই হচ্ছে only differentium between matter & spirit. একদিকে বিরাট প্রকৃতি—ব্যষ্টি অহং বর্জ্জিত; but she means terper আর একদিকে বিরাট 'পুরুষ'—তিনিও "সংস্কার" বর্জ্জিত অতএব—ব্যষ্টি অহং বর্জ্জিত। এই সংস্কার বর্জ্জিত অহংকেই পতঞ্জলি বলছেন, — প্রত্যক চেতনা। কিন্তু তাঁর procedure হচ্ছে—by negation. —অর্থাৎ তাঁর নেতি নেতি পথ! Egoর বিশুদ্ধির পক্ষে যা বাধা, তাকে তিনি হাটিয়ে দিয়ে, 'অন্তরায়' দূর করে প্রত্যকচেতনাকে অধিগত করছেন। He becomes impersonal — Personalityর উচ্ছেদই তাঁর সাধনা! বেদান্তেও impersonal ভূমিতে আমরা যাচ্ছি, কিন্তু not by negation, but by self evolution—self development. জীবভাবে আমার যে 'অহং' তার সঙ্গে তোমার 'অহং' এর বিরোধ! বেদান্ত বললেন অহং undevelopped বলেই এই বিরোধ, যদি অহংকে develop করি অর্থাৎ whole mental horizonকে expand করি তা হলে we reach the **only real personality** or ব্রহ্ম by sacrificing this limited personality of ours.

এর phychological expect কি ? —জানই বোধ হয় মনের তিনটা function: thinking, feeling & willing. এই তিনটা functionএর undevelopped সংস্কার নিয়েই আমাদের ego বা personality. এখন ওই তিনটাকে তুমি develop কর। Willingকে develop কর through the idea of power (শক্তি) to Eternal stability or "সৎ"! অর্থাৎ "will to power" তোমার সাধনা হোক্, আর তার ফলে তুমি 'অটল' হও, 'নির্ব্বিকার' হও, 'কূটস্থ' হও। এই কূটস্থ ভাবই হচ্ছে জীবের তরফ থেকে শক্তির criterion. অবশ্য জীবের এতে প্রলয়; কিন্তু তার ও পিঠেই ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তির বিহ্বলোচ্ছ্বাস। এইজন্য in common life even, you will see, those can create who have the will power to remain stable. এমনি করে পেলে 'সৎ'।

Thinkingকে develop কর into 'চিৎ' which means, 'Eternal wakefulness'. Subject আর objectএ ভেদ আছে বলেই জ্ঞানে ছেদ হয়। ভেদ তুলে দাও, let the object be universed in the subject, তুমি হবে চিন্ময়, এই হচ্ছে highest development of thought-power. এমনি করে by concentration, by বৃত্তিনিরোধ—you attain pure 'চিৎ'।

তারপর feelingকে develop কর into pure আনন্দ বা প্রীতি! Just expand yourself till yon feel the whole universe to be your body. You are the throbbling life in all! এই অনুভূতিতেই ভালবাসার বা আনন্দের বা feelingএর highest development. Thus you attain 'আনন্দ'।

Then you see, **'সচ্চিদানন্দ'** is your ideal & in Vedanta you reach this through the development of your innate psychic powers. This is the Vedantic way of **'প্রত্যক্‌চেতনাধিগমঃ'**।

আর একটা hint তোমায় দিচ্ছি!

Cultivate the ideas of pure স্থৈর্য্য, দীপ্তি, ব্যাপ্তি। Say to yourself :—

কূটস্থোঽহম্—অচলোঽহম্! —(সৎ)
অহং জ্যোতির্জ্যোতিরহম্। —(চিৎ)
বিভুরহম্—বিভুরহম্। —(আনন্দ)

By realising these ideas, you will attain প্রত্যক্ চেতনা through Vedanta.

এখন পাতঞ্জল এবং বেদান্তের 'প্রত্যক চেতনাধিগম' কি তা তো বুঝ্‌লে? আজ এ পর্য্যন্তই। আরও কোন প্রশ্ন থাক্‌লে অন্য একদিন এসো। যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন খুবই বকে যেতে পার্‌ব—যেদিন ইচ্ছে না হবে সেদিন একটী কথাও মুখ দিয়ে বের হবে না। তার জন্য দুঃখিত হয়ো না ভাই! বেশ তো, সব দিন কথাবার্ত্তা নাই-ই হ'ল, তাতেই বা কি? না হয় দুজনে ধ্যান স্তব্ধতায় ডুবে যাব! এতে কি কম কাজ হবে তুমি ভেবেছ? বাইরের কথায় শুধু বুদ্ধি কিম্বা মনের তৃপ্তি হয়, কিন্তু অন্তর ভরে উঠে কিসে জান? আর কিছুতেই নয়—কেবল মাত্র ধ্যানে, উপাসনায়! নিজের মাঝে তলিয়ে যাও। রামপ্রসাদের একটী পদ মনে পড়ছে :—

ডুব দেরে মন কালী বলে!
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে!!

নিজের মাঝে যত তলিয়ে যাবে, দেখ্‌বে, সন্দেহ সংশয় ততই কমে আস্‌ছে। এক অমূল্য রত্নের দীপ্তিতে সব উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে।

আকর্ষণ

—(০)—

এই যে যাদের উজল রূপে
নয়ন আমার নেয়গো হ'রে—
থাক্‌বে না ত তারাও আমার
বিজন পথের একলা ঘরে।
তথায় তখন তুমিই ওগো
আঁধার পথে হে মোর সাথী,
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী
ওগো আমার ব্যথার ব্যথী।
তাইত আজি ডাক্‌ছি তোমায়
এ আঁখি মোর নাওগো টেনে—
হৃদয় আমার হর, হরি!
প্রাণের পরশ দাওগো এনে।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মন্দির হতে আসার সময় মন্দিরের সংস্কারের জন্য কিছু চাঁদা দিয়ে বেশ ছাপান একটী রসিদ পেলাম। মন্দিরে প্রবেশ কালীনও মাথা পিছু কিছু ভেট দিতে হয়। এ ছাড়া কেদারনাথের পূজাদি তথা ভেট নিজের নিজের সাধ্যানুসারে সকলেরই দেওয়া উচিত, আমরাও দিয়েছি। এখানে যাত্রীদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার হওয়ার জন্য প্রয়াগ সেবা সমিতি হতে এখানে সেবার কাজ আরম্ভ হলেও কিন্তু শুধু ভিক্ষার বাক্স ছাড়া অন্য কোনরূপ সেবা দেখ্‌তে পাই নাই। ভিক্ষার জন্য পাণ্ডারা বেশ অনুরোধ করে থাকেন। আমরা সে কথা রক্ষা করে যথাসাধ্য দান করে ছিলাম।

এখানে পাণ্ডারা খুব যত্ন কর্‌লেন, তবে আমরা গরীব যাত্রী বলে আমাদের খাওয়া দাওয়ার কথা মোটেই মুখেও তুলেন নি। নতুবা অনেকের ভাগ্যে পলান্ন পর্য্যন্ত পাণ্ডার তরফ হতে ভেট্‌ হয়ে থাকে। আমরা কিন্তু গরমাগরম চারটী ডাল ভাত হলেই যথেষ্ট খুসী হতাম। পাণ্ডাটি খুব চালাক। সে পূর্ব্বেই বুঝেছিল যে আমাদের দ্বারা বিশেষ কিছুই হবে না। তবে তার কৃপাতে রাত্রে শীতে কষ্ট পাই নি। অনেকগুলি কম্বল এনে গুণতি করে দিয়ে গেলেন। অতগুলি কম্বলের জন্য শীতে আমাদের মোটেই কাবু কর্‌তে পারে নি, বরং এর চেয়ে বেশী শীত ভোগ করেছি পীপলীর পাহাড়ে। পাণ্ডা মহারাজের এ অহৈতুকী (ঠিক অহৈতুকী কিনা বিবেচ্য।) দয়ার জন্য অনন্ত ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এখানে জিনিষাদির দাম খুব বেশী। মোটা চাউল ১৲ টাকা, ডাল ৸৹ আনা, ঘী ৪৲ টাকা, পুরী ১৲ টাকা, পেড়া ১॥৹ টাকা, দুধ ॥৹ আনা, আলু ॥৹ আনা, নানা প্রকার আচার ১॥৹ টাকা, আটা ॥৶৹ আনা, চিনি ২৲ টাকা সের। আমরা পুরী ও সামান্য মিষ্ট দ্বারাই কাজ শেষ করে ছিলাম। দেব প্রয়াগ হতে কিছু লেবুর আচার কিনে আমার বিশেষ উপকার হয়েছিল—অরুচির হাত হতে মুক্ত হয়ে ছিলাম। এখানে আবার আজ আচার পাওয়ায় সর্ব্ব প্রথম আচার কিনে রাখ্‌লাম—অরুচির মুখে আগুণ দিবার জন্য।

আজ আমাদের অদৃষ্টের খুব জোর—তাই আজ এখানে বৃষ্টি হল না। নতুবা প্রায় প্রত্যহই বিকেল বেলা এখানে বৃষ্টি হয়ে থাকে। বৃষ্টি না হলেও কিন্তু বেলা ২টার পর হতে আকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমুদয় মেঘগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এবং ক্রমশঃ নিম্ন দিকে নেমে আমাদেরও ঢেকে ফেল্‌লো। এইরূপ মেঘের খেলার কথা পীপলী হতে আসার দিন পাঠকদের জানিয়েছি—এখানেও ঠিক সেইরূপ। বরং তার চেয়ে আরও বেশী। এইরূপ মেঘের খেলা দেখতে খুব আনন্দ হয়। এ রকম সুন্দর স্থানে কিছু দিন বাস করে স্বর্গ সুখ উপভোগ করা উচিত, কিন্তু আমাদের সঙ্গে অত লোক থাকায় আমরা কালই এখান হতে নেমে যাব স্থির হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা অভুক্ত থাকার উপক্রম। অনেক চেষ্টা করেও কোন দোকান হতে খাবারের বন্দ

পুরী আদি জোগাড় করতে পারলাম না। সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই সমস্ত দোকানদার ঘরের দোর বন্ধ করে নাসিকাধ্বনি করছে। বিকেল বেলা এখানকার আবহাওয়া যেরূপ খারাপ হয়, তাতে কেউই ঘরের বাহির হতে চায় না। অনেক চেষ্টার পর আমাদের ধর্ম্মশালার নীচের দোকানদারকে জাগালাম, সে আমাদের পূজার উপকরণাদি দিয়েছিল- দাম এ পর্য্যন্ত দেই নি। বললাম—"ভায়া! পুরী ভেজে খাওয়াতে হবে, নতুবা পূজার উপকরণাদির দাম দিব না।" সে বেচারা আমাদের ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে (বলা বৃথা যে এখানকার কোন ঘরেই প্রায় জানালা নাই, বিশেষতঃ দোকানদারদের ঘরে) গরমাগরম পুরী ভেজে দিল। আলুকা শাক দিয়ে তার সপিণ্ডীকরণ করে আনন্দ চিত্তে নিদ্রা দেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম। রাত্রে বেশ গাঢ় ঘুম হতে, অত্যধিক শীতে কোনই অসুবিধা হত না, কিন্তু মাঝে মাঝে বড় মা'র হা-হুতাসে ঘুমুতে পারি নাই, তাঁকে সান্ত্বনা দিতে হয়েছে। ❂

* * *

কেদার নাথের মন্দির বদরি নাথের মন্দিরের মতই বৎসরের মধ্যে শীতকালে প্রায় ছয় মাস বন্ধ থাকে। তখন উখী মঠ হতে উদ্দেশ্যে পূজা সুসম্পন্ন হয়। এখানেও অত্যধিক বরফ পড়ে মন্দিরটী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে ঢেকে যায়। নীচের রামবাড়া চটীতেও বরফ পড়ে থাকে। গৌরীকুণ্ডের উপরে কোন লোকজন থাকে না—যদিও গৌরী কুণ্ডে বরফ পড়ে থাকে বটে! কিন্তু অতটা নয়! কেদার নাথের মন্দিরের দরজাও বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রথম খোলা হয় এবং সেই সময় দিব্য জ্যোতিঃ দেখার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়ে থাকে। মন্দিরটী যখন দীপালির সময় বন্ধ হয়, তখন একটি প্রকাণ্ড ঘীয়ের প্রদীপ জেলে দোর বন্ধ করে দেয়। প্রবাদ যে ঐ প্রদীপটী বরাবর ছয় মাস জলতে থাকে। মন্দির প্রথম খোলার দিন লোক সাগ্রহে ঐ প্রদীপের জ্যোতি দেখার জন্য সমবেত হয়ে থাকে এবং জ্যোতিঃ দর্শন করে জীবন ধন্য জ্ঞান করে থাকে।

হিমালয়ে যতগুলি তীর্থ আছে; কেদার নাথ, বদরী নাথ, ত্রিযুগী নাথ, তুঙ্গ নাথ, রুদ্র নাথ, মধ্যমেশ্বর, কল্পেশ্বর, যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, দেব প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ, নন্দ প্রয়াগ, বিষ্ণু প্রয়াগ, শোন প্রয়াগ, গুপ্তকাশী, উত্তর কাশী প্রভৃতি এমন কি তিব্বতের অন্তর্গত কৈলাস, মানস সরোবরও উত্তরাখণ্ড বা কেদার খণ্ডের অন্তর্গত বলে শাস্ত্রে উক্ত আছে। উপরোক্ত সমুদয় তীর্থগুলির অধিপতি শ্রীশ্রীকেদারনাথ দেব এই তীর্থে বিরাজিত আছেন। তাঁরই নামানুসারে উত্তরাখণ্ডের নাম কেদারনাথ হয়েছে। এই কেদারনাথ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অতি সুন্দর। যথা:—

কেদার নাথ প্রতিষ্ঠার কারণ ও ইতিবৃত্ত

পাণ্ডবগণ এই কেদার নাথের প্রতিষ্ঠাতা। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসানে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, গুরু-পুরোহিত আদি বধ জনিত: পাপ ক্ষয়ের মানসে সমুদয় তীর্থ পর্য্যটনান্তেও পাপ ক্ষয় হয়েছে বলে ধারণা না হওয়ায় পাণ্ডবগণ মহাত্মা ব্যাসদেবের চরণে উপনীত হয়ে চিন্তিত ভাবে তাঁকে সমুদয় নিবেদন করলে ব্যাসদেব বললেন "একমাত্র কেদার তীর্থ ব্যতীত তোমাদের আর কোথাও পাপ ক্ষয় হবে না। সুতরাং তোমরা সেখানে যেয়ে শিবের দর্শনার্থ কঠোর তপস্যা কর। সেই পবিত্র ভূমিতে ব্রহ্মা আদি

এবং শিব পার্ব্বতী তথা প্রমথাদি গণগণ সহ সতত বাস করেন। যথা :—

শৃণুধ্বং পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে হন্তারো গোপিনাং তথা।
সর্ব্বস্থ নিষ্কৃতির্দৃষ্টা ন হন্তর্গোত্রিনাং কচিৎ॥
বিনা কেদার ভবনং তত্র গচ্ছত সাম্প্রতম্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শিবদর্শন লালসাঃ॥

* *

তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং কো বা বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ।
অনেক তীর্থসংযুক্তং স্মৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
গচ্ছধ্বং ত্রিদশস্থানং মহাপথ সমীরিতম্।
এতদেব পরং স্থানং ব্রহ্মহত্যা নিবারণম্॥

পাণ্ডবগণ ব্যাসদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ তাঁকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করে শ্রীশ্রীকেদার নাথের দর্শনার্থ হিমাচলে শ্রীশ্রীকেদারনাথ ধামের দিকে অগ্রসর হলে কেদারনাথ গৌরীতীর্থে পাণ্ডবদের দেখ্‌তে পান। তিনি পাণ্ডবদের পরীক্ষার জন্য গৌরীতীর্থ হতে অতি দ্রুত উপরের দিকে পালাতে থাকেন। পাণ্ডবগণ অতি নিকটবর্ত্তী হলে কেদার নাথ অদৃশ্য হবার মানসে পাতালে প্রবেশ করতে থাকেন। সেই সময় পাণ্ডবগণ দ্রুত এসে এঁর পীঠ স্পর্শ করায় তিনি তদ্রূপ অবস্থাতেই অবস্থান করতে থাকেন তথা পাণ্ডবগণ গোত্র হত্যা আদি পাপ হতে মুক্তি লাভ করেন। যথা :—

আগতাম্নিকটং দৃষ্ট্বা প্রাবিশৎ ধরণীং তদা।
তথাবিধং তু মাং দৃষ্ট্বা পৃষ্ঠদেশে সমাগতাঃ॥
কেদারখণ্ডকে দেশে পস্পর্শুঃ পৃষ্ঠকং শুভম্।
স্পর্শ মাত্রেন তে সর্ব্বে বিমুক্তা গোত্র হত্যয়া॥

সেই পীঠরূপী শিবই কেদারনাথ জ্যোতির্লিঙ্গরূপে পাপী তাপী জীবগণের মুক্তিদাতারূপে বিরাজিত আছেন। যথা :—

পৃষ্ঠভাগং তু তত্রৈব স্থিতমদ্যাপি পার্ব্বতি।
কেদারেশ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মুক্তিদঃ॥

কেদার নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিন্তু কিম্বদন্তী অন্যরূপ। এর সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে বটে। পাঠকদের অবগতির জন্য সে কিম্বদন্তীটিও জানিয়ে রাখি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের মনে মহা পাপ করেছি বলে ধারণা হওয়ায় তাঁরা

কিম্বদন্তী

সমুদয় তীর্থ ভ্রমণ করলেও কিন্তু তাঁদের পাপ ক্ষয় হয়েছে বলে মনে ধারণা না হওয়ায় তাঁরা ব্রত উপবাসাদি দ্বারা অতি বিষণ্ণ মনে অবস্থান করার সময় হঠাৎ একদিন দৈববাণী হল যে "তোমরা হিমাচলের কেদারখণ্ডে যেয়ে শ্রীশ্রীকেদার নাথের দর্শন, স্পর্শন, পূজন করলেই পাপমুক্ত হবে।" পাণ্ডবেরা ঐরূপ দৈবাদেশ প্রাপ্ত হয়ে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত মালা (সে সময়ে কোন রাস্তা, ঘাট, চটি আদি ছিল না) উলঙ্ঘন করতঃ কেদার নাথে উপনীত হয়ে, তাঁর দর্শন উদ্দেশ্যে বিধি পূর্ব্বক ব্রত উপবাসাদি করার পর শ্রীশ্রীকেদারনাথ তাঁদের ভক্তি পরীক্ষার্থ চিরতুষারাবৃত স্থানে নিজ মায়া দ্বারা বিশাল মহিষ মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। পাণ্ডবগণ ধ্যান বলে জানতে পারেন এই বিশাল মহিষ মূর্ত্তিই শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর। তখন তাঁরা ঐ মূর্ত্তির কাছে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে ঐ বিশাল মূর্ত্তি পৃথিবীতে প্রবেশ করতে থাকে, সেই সময় পাণ্ডবগণ যেয়ে তাঁর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করেন। স্পর্শ করার সময় যে অবস্থায় ঐ মহিষ মূর্ত্তি ছিল, বর্ত্তমানেও ঠিক সেই অবস্থায় ঐ মহিষ মূর্ত্তির পশ্চাৎভাগ আছে এবং তাই পূজা হয়ে আসছে। পরে কেদার নাথ এঁদের ভক্তিতে প্রীত হয়ে স্ব মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়ে এঁদের কৃতার্থ করেন। পাণ্ডাগণ বলে থাকেন যে শ্রীশ্রীপশুপতিনাথে যে শিবের মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন, তাহা এই বিশাল মহিষের সমস্ত দেবগণ সদা শিবের আরাধনা করে থাকেন

মস্তক, তুঙ্গনাথে এঁর লেজ, এবং কেদার নাথে ধড়টা বিগ্যমান। তাই প্রথম কেদার নাথ দর্শন করে তুঙ্গনাথ দর্শন করতে হয়, পরে পশুপতি নাথ দর্শন করা উচিত। আবার পাণ্ডাদের মধ্যেই কেউ কেউ বলে থাকেন "কেদারনাথের এই কৃষ্ণবর্ণ পাথরের চাঙ্গড় সদাশিবের পশ্চাৎ ভাগ, তুঙ্গনাথে তাঁর বাহু, রুদ্রনাথে মুখ, মধ্যমেশ্বরে নাভি ও কল্পেশ্বরে জটা বিদ্যমান—তথা উক্ত উক্ত স্থানে উক্ত উক্ত বর্ণিত অঙ্গ পূজিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা খুব কঠিন ব্যাপার; সুতরাং ক্ষান্ত থাকাই উচিত।

সন্ধ্যেবেলা শ্রীশ্রীকেদার নাথের আরতি দর্শন করে ছিলাম। সে সময় কেদারপঞ্চক পাঠ হওয়ায় প্রাণে এক নব ভাবের উদয় হয়ে ছিল। পাণ্ডবগণ বলে থাকেন যজুর্বেদীয় শতরুদ্রাধ্যায় এবং শিবের সহস্র নাম পাঠ করে কেদার নাথ পরিক্রমা করা উচিত। কেদার পঞ্চকং যথা :—

ভৃগুপর্য্যঙ্কে বিবুধাতি সঙ্গে
হিমাদ্রিতুঙ্গে হ্যপি মুদা বসন্তম্।
জ্যোতির্ম্ময়ং চন্দ্র কলাবতংসং
কেদার নাথং শরণং ব্রজামি। ॥১॥

কেদার শৈলে বিহিতাবতারম্
মুক্তি প্রদানায় চ পাণ্ডবানাম্।
ভক্তি প্রদানায় কৃপাবতীর্ণম্
কেদার নাথং শরণং ব্রজামি। ॥২॥

মন্দাকিনী তীরে পবিত্র ক্ষেত্রে
গহনে মহাপথ সান্নুদেশে।
বিরাজমানং চ জগদ্বরেণাম্
কেদার নাথং শরণং ব্রজামি। ॥৩॥

গণেশ নন্দী গিরিজা সমেতম্
কৃষ্ণা সমেতৈঃ সহ পাণ্ডবৈশ্চ।
ঋষি সমেতং সদা শোভ মানম্
কেদার নাথং শরণং ব্রজামি। ॥৪॥

অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থম্
নমামি সংসার সমুদ্র সেতুম্।
সুরাসুরার্চিত পাদপদ্মম্
কেদারনাথং শরণং ব্রজামি। ॥৫॥

* * *

পার্ব্বতী দেবী জিজ্ঞাসা করিলে পর শিব উত্তর করিতেছেন। "হে দেবি! এই কেদার ক্ষেত্রের কথা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই পবিত্র ক্ষেত্র আমি কখনই ত্যাগ করি না। উক্ত কেদার ক্ষেত্র তোমা হতেও আমার প্রিয়। যথা :—

কেদারনাথ মাহাত্ম্য

ইদং ক্ষেত্রং তু যৎপ্রোক্তং যদা দেবি ত্বামধুনা।
ন ত্যজামি কদা চৈব স্বতঃ প্রিয়তরং প্রিয়ে॥

যেমন সকলের চেয়ে আমি প্রাচীন, সেইরূপ এই কেদার ক্ষেত্রও সব চেয়ে প্রাচীন। যখন ব্রহ্ম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমি সৃষ্টি রচনা করিয়াছিলাম, তখন আমি পরব্রহ্মকে জয় করিবার ইচ্ছায় এই ক্ষেত্রে নিরন্তর বাস করিতাম। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এ স্থান দেবতাদেরও দুর্ল্লভ। যথা :—

পুরাতনা যথাহং বৈ তথা স্থানমিদং কিল।
যদা সৃষ্টিক্রিয়ায়াং চ ময়া বৈ ব্রহ্মরূপিণা॥
স্থিতমত্রৈব সততং পরব্রহ্ম জিগীষয়া।
তদাদিকমিদং স্থানং দেবানামপি দুর্ল্লভম্॥

হে মহাদেবি! কেদার স্থানে যাত্রী দেহত্যাগ করিলে নিঃসন্দেহ শিব হইয়া যায়। হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি কেদার স্থানে দেহত্যাগ করেন, তিনি বিশেষ পুণ্যাত্মা জানিও।

মৃত্যো যত্র মহাদেবি শিব এব ন সংশয়ঃ।
ধন্যাস্তে পুরুষা লোকে পুণ্যাত্মানো মহেশ্বরি॥

এমন কি হে দেবি! যে ব্যক্তি বলে যে আমি কখনও না কখনও কেদার ক্ষেত্রে যাইব, তাহার তিন শত পিতৃকুল পর্য্যন্ত শিবলোক প্রাপ্ত হয়। এ কথা আমি সত্য সত্য বলিতেছি, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ করিও না।

যে বদন্ত্যপি কেদারং গমিষ্যামি ইতি ক্বচিৎ।
পিতরস্তস্য দেবেশি ত্রিশতং কুলসংযুতাঃ॥
গচ্ছন্তি শিবলোকে তু সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

যে প্রকার সতীর মধ্যে তুমি, দেবতার মধ্যে হরি, সরোবরের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে ভাগীরথী, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, যোগীদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, ভক্তের মধ্যে নারদ, শিলার মধ্যে শালগ্রাম বিষ্ণুশিলা, অরণ্যের মধ্যে বদ্রিকারণ্য, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, মুনিদের মধ্যে শুকদেব, সর্ব্বজ্ঞদের মধ্যে ব্যাসদেব, দেশের মধ্যে কেদার খণ্ড, মানবের মধ্যে রাজা, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, বসুর মধ্যে কুবের, পুরীর মধ্যে কাশী, অপ্সরার মধ্যে রম্ভা, গন্ধর্ব্বের মধ্যে তুম্বুরু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ কেদার খণ্ডের মধ্যে কেদার ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ। যথা :—

তথা সতীনাং ত্বং চৈব দেবানাং চ যথা হরিঃ।
সরসাং সাগরো যদ্বৎ সরিতাং জাহ্নবী যথা॥

* *

ক্ষেত্রাণাং চ যথা প্রোক্তং ক্ষেত্রং কেদার সংজ্ঞিতম্॥

যে যাত্রী—আমি মহাপথে (শিবলোক যাবার পথ) যেয়ে প্রাণ ত্যাগ করব, নিজের মনে এইরূপ সঙ্কল্প করে, হে দেবদেবেশি! সে যাত্রী আমার প্রিয় হতেও প্রিয় এবং যে যাত্রী সমস্ত সাংসারিক মায়া মোহ আদি পরিত্যাগ করে আমাকে (শিবকে) হৃদয় কমলে ধারণ পূর্ব্বক আমার কেদার মন্দিরে গমন করে, তার মাহাত্ম্য আর কি বলব, সে বর্ণনাতীত! যথা :—

মহাপথং গমিষ্যামি প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তত্রবৈ।
সোঽপি মে দেবদেবেশি প্রিয়াৎ প্রিয়তরোঽস্তিবৈ॥
কিং পুনর্ম্মানবো লোকে সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।
মাঞ্চৈব হৃদি চ ধীরে গচ্ছেদ্বৈ মম মন্দিরে॥

যেখানে আমি (শিব) বাস করি, সেই তীর্থময় শৈল দর্শন মাত্রই ব্রহ্ম হত্যা আদি পাপ হতে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। আমাকে পূজা ও স্পর্শ করলে কত যে ফল লাভ হয়, সে কথা আর কে বলতে পারে? যথা :—

অয়ং তীর্থময়ঃ শৈলো যত্রাহং সংস্থিতঃ সদা।
দর্শনাদেব পাপানি ব্রহ্ম হত্যা সমানিচ।
অশুদ্ধে কিমু দেবেশি পূজনাৎ স্পর্শনাত্তথা॥

আমার (শিবের) বাম ভাগে যে পর্ব্বত দেখা যায়, হে মহেশ্বরি! যেখানে ইন্দ্র আমার স্থিতির জন্য আরাধনা করেছিল, সেখানে আমার লিঙ্গ দর্শন মাত্রেই মুক্তি হয়ে থাকে। যথা :—

মত্তো যো বাম ভাগেঽস্তি শৈল পুরমসুন্দরঃ।
পৌরন্দরঃ সমাখ্যাতো যত্র মামিন্দ্র ঈশ্বরী॥
সমারাধ পূর্ব্বং বৈ স্বস্য চ স্থিতিহেতবে।
তত্রৈব মে পরং লিঙ্গং দর্শনাৎ মুক্তি দায়কম্॥

কেদার ক্ষেত্র তীর্থ তীর্থের মধ্যে উত্তম তীর্থ, ওখানে যে কেউ—সে পাপীই হউক বা পুণ্যাত্মাই হউক, যে কোন সময় মরবে, সে শিবলোকে গমন করে থাকে। যথা :—

কেদার ক্ষেত্রমাখ্যাতং তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্।

* * *

যস্মিন্ কস্মিন্নপি শিবে কালে বৈবস্বতকুজবৈ।
মৃতঃ শিবপুরে যাতি পাপী চাপি শুভস্তথা॥

যে কোন দেশে যে কোন মানব, আমি কেদারনাথকে দর্শন করব এইরূপ ইচ্ছা নিয়ে মরে যায়, তিনিও শিবলোকে প্রাপ্ত হন। যথা :—

যত্র দেশে তু যো মর্ত্যঃ কেদারেশ্বর দর্শনে।
ইত্যুদ্দিশ্য মৃতো দেবী শিবো ভবতি মানবঃ॥

* *

কল মাহাত্ম্য কথানি

বিকট আকৃতিওয়ালা মৃগঘাতী এক ব্যাধ গ্রামের পাশে বাস করত এবং প্রত্যহ মৃগ বধ করে তার মাংস ভক্ষণ তথা উদ্বৃত্ত মাংস এবং চামড়া আদি বিক্রি করত। একদিন ঐ মহাব্যাধ নানা জাতীয় মৃগ বধ করতে করতে কেদারক্ষেত্রে যেয়ে উপস্থিত হয়। সেই সময় সে অনেক মুনির সঙ্গে নারদ মুনিকে বীণা বাজাতে

দেখে মোহিত হয়ে যায়। অকস্মাৎ নারদ ঋষি স্বর্ণ মৃগের রূপধারণ করলে ব্যাধ ঐ স্বর্ণমৃগ মেরে ধনবান হবার আশায় ধনুকে বাণ সংযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ-মৃগধারী নারদ ঋষি অদৃশ্য হয়ে যান। এইরূপ ঘটনার ব্যাধ খুব বিস্মিত হয়ে স্বর্ণ-মৃগের অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে হতে একটী সরোবরের নিকট একটী মেডক (ব্যাঙ্গ) দেখতে পায়। সেই সময় একটী বড় কালসাপ ঐ মেডককে গিলবার সঙ্গে সঙ্গে মেডক এমন একটি রূপধারণ করে, যাতে ব্যাধ বুঝতে লাগল যেন ঐ কালসাপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করে আছে এবং তাঁর শিরে অর্দ্ধচন্দ্র তথা জটাজুট শোভা পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক গণের সহিত ত্রিশূল ধারণ করে নৃত্য করতে করতে নীলকণ্ঠ শিব হয়ে যান। এই প্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখে মহাব্যাধ চিন্তা করতে লাগলো—"আমি সর্প কর্ত্তৃক মেডক খেতে দেখলাম, কিন্তু মেডক কেমন করে এরূপ রূপধারণ করল? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? জাগ্রতাবস্থায় কেমন করে স্বপ্ন দেখব? জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন তো হতেই পারে না। তবে আমি কি জ্ঞানভ্রষ্ট হয়েছি? —বা কোন ভূত কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যাপার দেখছি?" ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তা করেও কিছু স্থির করতে পারল না। তখন ব্যাধের অত্যন্ত ভয় হয়েছে। সে ভাবতে লাগল—"এখানে নিশ্চয়ই কোন ভূতের উপদ্রব হচ্ছে, আমার ত মৃত্যু সময় উপস্থিত, এ সময় আমি কি করি? কোথায় যাই?" এই বলে ব্যাধ পালাবার জন্য উদ্যত হলে একটী সিংহ হৃষ্টপুষ্ট শরীর বিশিষ্ট একটি হরিণকে মারছে দেখতে পেলো। এরূপ দৃশ্যে ব্যাধ আরও ভীত হয়ে পড়লো। সে আরও দেখতে পেলো, যে স্বর্ণ-মৃগকে ব্যাধ মারতে উদ্যত হয়েছিল, সেই মৃগ পাঁচমুখ, তিননেত্র, তথা সর্পের যজ্ঞোপবীত ধারণকারী শিবরূপ হয়ে গেল। যে সিংহ হরিণকে মারতে উদ্যত হয়েছিল, অন্য একজন ব্যাধ ঐ সিংহকে মারলে, ঐ সিংহ একটী বলিষ্ঠ বলদ হয়ে গেল। এই ব্যাধ প্রথমে যে মৃগটি মেরেছিল সেই মৃগ এ নবীন বলদের উপর চড়ে দেখতে দেখতেই শিবরূপ হয়ে গেল। যথা:—

আরুরোহ বৃষে তস্মিন্ বৈ পূর্ব্বহতো মৃগঃ।
শিবরূপধরঃ সাক্ষাৎ পশ্যতস্তস্য সুন্দরি॥

এইরূপ নানা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখে ব্যাধ বড়ই বিস্ময়াপন্ন হয়ে প্রত্যেকটি বিষয় বিচার করতে করতে বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো—ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। সেই সময় নারদ মুনি মানবের মূর্ত্তি ধারণ করে তাকে দর্শন দেন এবং ঐ সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বলেন যে তুমি সাধু এবং অসাধু এই দুইই এবং এই বন পরম সাধু। কেননা তুমি ধন্য যে এই পবিত্র তীর্থে এসে শিবের সুন্দর রূপ দর্শন করেছ, এইজন্য আমি তোমায় সাধু বলেছি এবং তুমি কিসে অসাধু তাও শুন। তোমাতে জ্ঞান নাই, তুমি জ্ঞানশূন্য এইজন্য তোমায় অসাধু বলেছি। এই পবিত্র বনকে শ্রেষ্ঠ বলেছি এইজন্য যে, পশুযোনিও তোমার সামনে দেখতে দেখতে এখানকার মাহাত্ম্যের জন্য শিবরূপ হয়ে গেল। —নারদের এইরূপ উক্তি শুনে ব্যাধ নতঃশিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ নারদজীকে নানা প্রকার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট করতে লাগলো এবং নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃত্য উপলব্ধি করতে লাগলো। পরে নারদের কাছে প্রার্থনা করল, "প্রভু! এখন আমায় রক্ষা করুন আমি মহাপাপী, অনেক মুনি ঋষি, জীবজন্তু, সাধু-ব্রাহ্মণ আদি হিংসার কারণ মেরে ফেলেছি।

এখন এই সব মহাপাপ হতে কি করে মুক্তিলাভ করবো আমায় উপদেশ দিন।”

নারদ মহারাজ উত্তর করলেন, “তুমি এই পবিত্র ক্ষেত্রে বাস করলেই তোমার নিষ্কৃতি হবে এবং তুমি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবে।” নারদ ঋষি এইরূপ বলেই অন্তর্দ্ধান হয়ে যান, তথা ব্যাধও কেদারনাথে থেকে পরমাগতি লাভ করে।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবি পশ্যতস্তস্য বৈ প্রিয়ে।
ব্যাধোহপি নিবসংস্তত্র যযৌ বৈ পরমাং গতিম্ ॥

* *

ঘোর কলিযুগে প্রায় সব মানব পুণ্য-কর্ম্ম রহিত হয়ে নানা প্রকার অশান্তিতে মোহগ্রস্ত হলে কি করে জীবের সদ্গতিলাভ হবে, জগন্মাতা পার্ব্বতী দেবী জীবের দুঃখে কাতর হয়ে সদাশিবের শ্রীচরণে প্রার্থনা করলেন :—

ঘোরে কলিযুগে দেব নরাঃ পুণ্য বিবর্জ্জিতাঃ।
কথং তেষাং গতির্দ্দেব ভবিষ্যামি ঘৃণা মম ॥

পার্ব্বতীর করুণাময় অন্তঃকরণে শান্তি প্রদানার্থ মহাদেব উত্তর করলেন।

কেদারং মধ্যমং তুঙ্গং রুদ্রং কল্পেশ্বরং তথা।
কেদার পঞ্চকং নিত্যং স্মরেৎ পাপপ্রণাশনম্ ॥
পঞ্চতীর্থানি যো দেবি গচ্ছতে ভক্তিসংযুতঃ।
নচৈতৎ সদৃশো দেবী পুণ্যাত্মা নাত্র সংশয়ঃ ॥

হে দেবি। কেদারনাথ, মধ্যমেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর এই পাঁচ কেদার নিত্য স্মরণ করলেই সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায়। হে দেবি! যে যাত্রী এ পাঁচ তীর্থে ভক্তি পূর্ব্বক যাত্রা করেন তার সমান কোন পুণ্যাত্মা নাই—এতে সন্দেহ করো না। (ক্রমশঃ)

রাস লীলা

শ্রীশুক উবাচ—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

শরৎ কালের প্রভাবে মল্লিকা পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইলে ভগবান্ যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন।

রাসলীলা সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেকেরই বিকট ধারণা। সুতরাং প্রথমেই শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

“ননু বিপরীতমিদম্। পরদার বিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্ব প্রতীতেঃ। মৈবম্। যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ। আত্মারামোহপ্যরীরমৎ। সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ। আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরত ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ।”

উপরোক্ত কথাগুলি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই রাসলীলার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে, রাসক্রীড়া আর কিছুই নয়—কাম বিজয় তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ ভগবান্—এই খানেই তাহা সুপ্রমাণিত। এত সব অনুরাগী স্ত্রীমণ্ডল দ্বারা পরিবৃত হইয়াও যে মদনবাণে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতে পারে নাই—ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়! বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়াও যিনি এইরূপ ক্রীড়া দর্শন করাইতে পারেন—তিনি যে কতখানি শক্তিধর রসিক

পুরুষ তাহা অনুমান করিয়া বুঝা অত্যন্ত কঠিন। রাসক্রীড়া যদি বাস্তবিকই পরদারবিনোদই হইত, তাহা হইলে ইহার কোন বিশেষত্বই থাকিত না। বিষয়াসক্ত মানুষ নিজের মন বুদ্ধি দ্বারাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে চায় কি না, তাই শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে তাহারা কিছুতেই সক্ষম হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যে বাস্তবিকই কন্দর্পবিজেতা সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ, তাহা মানুষ বুঝিতেই পারিত না, যদি তিনি যুবতী গোপীগণ দ্বারা পরিবেষ্টি হইয়াও চিত্তের এইরূপ নির্ব্বিকার ভাব দেখাইতে না পারিতেন!

মহাপুরুষদের জীবন — ব্যতিক্রমের জীবন। তাঁহারা আসেন লোক-শিক্ষার্থ। যদি শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীলোকের সম্পর্ক নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া কোথায়ও বসিয়া থাকিতেন, আর বলিতেন আমি কাম-বিজয়ী তাহা হইলে মানুষের মনে বিশ্বাস আসিত না। বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যাঁহাদের মন নির্ব্বিকার থাকে তাঁহারাই প্রকৃত বিজয়ী। সুতরাং স্বেচ্ছায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রাস-লীলার ভিতর দিয়া তাঁহার আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, তিনি যে প্রকৃতই আত্মারাম তাহা সুপ্রমাণিত করিলেন। সাধারণ লোকের ধারণা বিবাহাদি করিলেই বুঝি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। বিবাহ করিয়াও যে পূর্ণ সংযমী থাকা যায়, তাহার প্রমাণ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার নিকট অন্য রকমে প্রতিভাত হইয়াছিল। দাম্পত্য জীবন-যাপনেও যে আধ্যাত্মিক পথের কোন বিঘ্ন হয় না, তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়া গেলেন তিনি।

রাসলীলায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেমন কন্দর্পবিজেতা, তেমনি গোপীরাও। তাহারা দেহ সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল। লজ্জা, মান-সরম কিছুই তাহাদের ছিল না—শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় তাহারা সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

"গতি, অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রম, দৃষ্টি, মনোহর আলাপ ও বিলাস দ্বারা গোপীগণ তদাত্মা হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা রমাপতির বিবিধ চেষ্টা অনুকরণ করিতে লাগিল। প্রিয়তমের গতি, হাস্য ও অবলোকনাদিতে গোপীদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং কোন কামিনী কোন কামিনীকে বলিল—"আমিই শ্রীকৃষ্ণ।" সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যাইতে না পারিলে কখনো স্বরূপ প্রাপ্তি হইতে পারে না। কাজেই "আমিই শ্রীকৃষ্ণ" এইরূপ উক্তি দ্বারা বুঝা গেল গোপীদের চিত্তে আর কোন ভাবনার স্থানই ছিল না। কাজেই তাঁহাদের মনে যে প্রাকৃত রমণাকাঙ্ক্ষা মোটেই ছিল না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে?

তারপর শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রাকৃত রমণাভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে গোপীরা যখন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী সকলকে পরিত্যাগ করিয়া নিশীথে যমুনা পুলিনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কিছুতেই প্রশান্তচিত্তে তাহাদিগকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুনয় বিনয় করিতেন না। কামুকের চিত্তে কখনো প্রশান্তি বা ধৈর্য্য থাকে না, পরন্তু কাম-বিজয়ীর চিত্তেই প্রশান্তি এবং ধৈর্য্য থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সাধ্বী, গৃহে গমন করিয়া নিজ নিজ পতির চরণ সেবা কর। বালকগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও। কিংবা যদি আমার প্রতি স্নেহে তোমাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই তোমরা এখানে আসিয়া থাক, তাহাতেও কোন দোষ নাই। যেহেতু যাবতীয় প্রাণী আমাতেই প্রীত হইয়া থাকে। হে কল্যাণীগণ! অকপটে স্বামী ও বন্ধুগণের

সেবা এবং সন্তান পোষণই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। স্বামী দুর্ভগ, দুঃশীল, বৃদ্ধ, জড় বা নির্ধনই হউক না কেন, যদি পাতকী না হন তাহা হইলে সদ্‌গতি অভিলাষিণী স্ত্রীর তাঁহাকে পরিত্যাগ করা কখনই উচিত হয় না। কুলকামিনীদিগের উপপতি সেবন স্বর্গ বিঘ্নকর, তুচ্ছ, দুঃখসম্পাদ্য, ভয়াবহ ও সর্ব্ববিনিন্দিত। আমার নাম শ্রবণ, গুণকীর্ত্তন ও আমাকে ধ্যান করিলে, আমাতে যেরূপ প্রীতি জন্মিয়া থাকে, আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না, সুতরাং তোমরা গৃহে গমন কর।"

কিন্তু গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তিতে ভগ্নমনা ও দুর্ব্বার চিন্তায় নিমগ্না হইল। ইষ্টবস্তুর এইরূপ নির্ম্মম প্রত্যাখ্যানে একান্তমনা গোপীদের মন ব্যথিত হইবারই কথা। কেননা তাঁহাদের তো ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না।

দুঃসহপ্রেষ্ঠ বিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥ ১০

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাহাদিগের যে সন্তাপ জন্মিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত অশুভ নাশ হইয়াছিল, এবং ধ্যানযোগে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যে সুখ সম্ভোগ হইয়াছিল তাহাতেই তাহাদিগের পুণ্যেরও শেষ হইয়াছিল।

কাজেই তাহাদের লোকভয়-ধর্ম্মভয় ইত্যাদি কিছুই ছিল না। গোপীরা এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা নিতান্ত কাতর হইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেক।

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥ ৪২

শুকদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞানময় ও আত্মারাম, তথাপি গোপীদের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। উপরোক্ত শ্লোকে 'অরীরমৎ' কথাটার বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম সুতরাং তিনি আর রমণ করিবেন কি? তিনি গোপীদিগকে রমণ করাইলেন। রাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহা দেখাইয়াছিলেন, তাহা মাত্র তাঁহার লীলা।

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈবদুরাত্মনাম্॥ ৩৪

শুকদেব বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আপনা আপনিই ক্রীড়া করেন, এবং আপনা আপনিই সন্তুষ্ট থাকেন। স্ত্রীলোকের বিভ্রম তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, তথাপি তিনি কামী পুরুষের স্বভাব এবং স্ত্রীলোকের দুরাত্মতা দর্শাইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন।"

যিনি আত্মারাম তাঁহাকে স্ত্রীলোকের বিভ্রম কিরূপে আকৃষ্ট করিতে পারিবে? কিন্তু আত্মারাম হইয়াও গোপীদের মনস্তুষ্টির দরুণ তিনি লীলাভিনয় করিলেন। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া লিপ্তের ন্যায় ক্রীড়া দর্শন করানো কম কথা নয়। আর এইরূপ অভিনয় দ্বারা অপরের মনস্তুষ্টি করাও সহজ নয়। ইহা একমাত্র ভগবানেরই কার্য্য! ভগবানের এই লীলা চাতুর্য্য ভগবানই অবগত, তাহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাও কঠিন ব্যাপার।

অভিনয় করিতে করিতে অনেকের আত্ম-চেতনা লুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাহারা অভিভূত হইয়া পড়ে। অভিভূত হইয়া পড়িলে আর অভিনয় চলে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র অভিভূত হন নাই। ভিতরে ভিতরে তিনি বেশ সজাগ ছিলেন, অথচ দর্শকের মন-প্রাণকেও তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

কামোদ্দীপক কোন কথা শ্রবণে বা দৃশ্য দর্শনে সাধারণের মন বিচলিত হইয়া উঠে, আর কামী

পুরুষের স্বভাব দর্শাইয়া যে অভিনয় তাহাতে যে শ্রীকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র মন বিচলিত হয় নাই, তাহার কারণ আর কিছুই নয়——

এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎ কাব্য কথারসাশ্রয়াঃ॥ ২৫

সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ অনুরাগী স্ত্রীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বরসের আশ্রয়ীভূত নিশা সকলে কামজয় পূর্ব্বক ক্রীড়া সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ——এই কথাটীকে বুঝাইতে গিয়া শ্রীধর স্বামী স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।—**এবমপি আত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতশ্চরমধাতুর্ন তু স্খলিতো যস্য ইতি। কামজয়োক্তিঃ॥ ২৫**

বাস্তবিকই সম্পূর্ণভাবে কামকে জয় করিতে না পারিলে কাম-বিষয়ক এইরূপ অভিনয় করাও দুঃসাধ্য। সাধারণ মানুষের পক্ষে এইরূপ অভিনয় অবনতিরই কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু শক্তিধর ইন্দ্রিয়-বিজেতা মহাপুরুষদের কথা আলাদা। এই সম্বন্ধে পরম ভাগবত শুকদেব দশম স্কন্ধে রাসক্রীড়া বর্ণন নামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের শেষভাগে কয়েকটী অতি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। রাজা এইরূপ স্বাভাবিক সংশয়ান্দোলনে আন্দোলিত হইয়াই শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাজোবাচ——

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ২৬
স কথং ধর্ম্ম সেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥ ২৭
আপ্ত কামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভি প্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥ ২৮

রাজা শুকদেবকে বলিলেন, ধর্ম্ম সংস্থাপন ও অধর্ম্মের শান্তির নিমিত্তই ভগবান অবতীর্ণ হন। হে ব্রাহ্মণ! তিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষক হইয়া কি প্রকারে পরদার বলাৎকাররূপ অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন? তাঁহার অভিপ্রায় কি? হে সুব্রত! আমাদের এই সংশয় ছেদন করুন।

শ্রীশুক উবাচ——

ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ২৯
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ ৩০
ঈশ্বরাণাম্ বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥ ৩১

কুশলাচরিতে নৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েন বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ ৩২
কিমুতাখিল সত্বানাং তির্য্যঙ-মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলা কুশলান্বয়ঃ॥ ৩৩

যৎ পাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগ প্রভাব বিধুতাখিল কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা—
স্তস্যেচ্ছয়াত্ত বপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ৩৪

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ ৩৫
অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ ৩৬

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৩৭
ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবদ্প্রিয়াঃ॥ ৩৮

রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শুকদেব যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব মূল্যবান কথা। উপরোক্ত কয়টী শ্লোক দ্বারাই রাসলীলার প্রকৃত তত্ত্ব সুন্দররূপে বুঝা যায়। কিন্তু প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এইজন্যই পদে পদে সংশয় উপস্থিত হয়। শুকদেব রাজার সংশয় ভঞ্জনার্থ অতি সংক্ষেপে কয়েকটী শ্লোক দ্বারা রাসলীলার নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

শুকদেব বলিলেন—"ঈশ্বররূপী অবতারদিগের ধর্ম্মব্যতিক্রম এবং সাহস দেখিতে পাওয়া যায়। তেজস্বীদিগের তাহাতে কোন দোষ হয় না। যেরূপ অগ্নি সকলকে ভক্ষণ করেন, তথাপি অগ্নি নির্দ্দোষী। যেমন মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহ বিষ পান করিলে মরিয়া যাইত, তদ্রূপ যাঁহারা ঈশ্বর নন (অর্থাৎ দেহাদিপরতন্ত্র) তাঁহারা এইরূপ আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না।"

এই জায়গায় অনেক কথা বলিবার আছে। বিষয়াসক্ত লোভী মানবের লোভ এবং অসংযম অত্যন্ত বেশী। শ্রেষ্ঠ মহাজনদিগের সকল আচরণ অনুসরণ করিতে তাহারা নারাজ, তবে সুবিধা মত যাহা তাহাদের রুচিকর তাহাই তাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে। এইরূপ সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া আচরণগুলি অনুসরণ করিলে ঠিক ঠিক শ্রেষ্ঠজনের আচরণ অনুসরণ করা হয় না। দেহাদি পরতন্ত্র মানব দেহাতীত ভগবানের আচরণ অনুসরণ করিতে কিরূপে সক্ষম হইবে? অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবানের ব্যতিক্রম সাধারণ মানুষের কিছুতেই অনুসরণীয় হইতে পারে না। আর ইচ্ছা করিলেও দুর্ব্বল মানব তাহাতে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ অনন্ত শক্তির মহিমা দেখা যায়—তাহা কি সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব? প্রকৃত অনুসরণকারীর সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া গ্রহণ-বর্জ্জনের ইচ্ছা থাকে না। তাহাদের মাঝে এই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় নাই। তাহারা সুখও সম্ভোগ করিতে পারে, আবার প্রয়োজন পড়িলে অসীম দুঃখের বোঝাও সহাস্যে বহন করিয়া চলিতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বল মানুষ সুখ দুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া চলিতে পারে না।

তারপর শুকদেব আরও বলিলেন—"ঈশ্বররূপীদিগের বাক্যই সত্য, আচরণ কচিৎ সত্য হয়। অর্থাৎ আচরণ সত্য নহে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের বাক্যই প্রতিপালন করিবেন।"

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি"—এই বলিয়া একটা কথা আছে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, অন্যেরাও সেইরূপ আচরণ করিবে। কিন্তু বিষপান মহাদেবের পক্ষই সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সেইরূপ আচরণ অসম্ভব। কাজেই আচরণের ব্যতিক্রমও রহিয়াছে। "বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের বাক্যই প্রতিপালন করিবেন" এই কথাটার মাঝেও বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। অপরকে উপদেশ দিতে গিয়া ভগবান কখনো নিজের শক্তি সামর্থ্যানুযায়ী উপদেশ প্রদান করেন না। ভগবান্ অধিকারী বুঝিয়াই ব্যবস্থা করেন। সুতরাং যাহার পক্ষে যাহা কল্যাণকর, এবং প্রতিপালন সম্ভবপর ভগবান্ তাহারই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কাজেই ভগবানের ব্যবস্থায় কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, কিন্তু বিমূঢ় জীব না বুঝিয়া যখন স্বেচ্ছায় ভগবানের আচরণ অনুসরণ করিতে যায় তখনই মহা সঙ্কটে পতিত হয়। এইজন্যই ঈশ্বররূপীদের বাক্য প্রতিপালন করাই সব চেয়ে নিরাপদের বিষয়।

বিশেষতঃ এই রাসলীলায় ভগবানের আচরণ যে সত্য নয় তাহা প্রথমেই বলিয়া রাখা হইয়াছে—ইহা মাত্র অভিনয়। "শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম তথাপি কামী পুরুষের স্বভাব এবং স্ত্রীদিগের দুরাত্মতা দর্শাইয়া তিনি ক্রীড়া করিয়াছিলেন"। ইহা অভিনয় ছাড়া আর কি? কাজেই শ্রীকৃষ্ণের এই আচরণকে যাহারা সত্য বলিয়া মনে করিবে, তাহারা তো মূলেই ভুল করিয়া বসিল। রাসলীলার মূল তত্ত্ব অবগত না হইয়া নিজের ধারণানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে নানা বিপদের আশঙ্কা থাকিবেই। তেজীয়ানদের পক্ষে যাহা দোষের নয়, দুর্ব্বলের

পক্ষে তাহাই আবার দোষের বিষয়। তেজীয়ানদের আচরণ দুর্ব্বলের ধাতে কিছুতেই সহ্য হইতে পারে না।

রাসলীলা উচ্ছৃঙ্খলতার নিদর্শন নয়! পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষেই এই লীলা সম্ভব। কামকে যাহারা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই, তাহারা যদি দেখা দেখি এই লীলা আস্বাদন করিতে যায়, তাহা হইলে দুর্ভোগ এবং পাপ সঞ্চয় ছাড়া তাহাদের আর কিছুই হইবে না।

পরিশেষে শুকদেব যে কয়টী কথা বলিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। শুকদেব বলিলেন —"মহারাজ! ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ তাহারা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া জানিত যে তাহাদিগের স্ত্রীগণ তাহাদিগের পার্শ্বেই অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গোপীরা তাহাদিগের স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।"

রাসলীলা করিয়াছিলেন পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর এই রাস তত্ত্ব বুঝিতে হইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

যিনি এই রাসলীলার অভিনেতা, **তিনি কাম জয় পূর্ব্বক এই লীলা করিয়াছিলেন**— এই কথাটী সব সময় মনে রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই রাসলীলার গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে।

নিবেদন

শ্রীসম্পদ্ জ্ঞান যুত ছিল যে ভারত,
শ্রীহীন হয়েছে হের আজি তা ভারতি!
সত্যবস্তু হারায়েছে ভুলিয়াছে পথ,
রয়েছে আবরি তার সম্বিতে বিস্মৃতি॥
স্বরূপ ভুলিয়া নিত্য ভাবে এ সংসার,
তীব্র জ্ঞান প্রকাশিয়া ভাঙ্গাও স্বপন;
মায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন হউক তাহার,
তামসী রজনী ঘোরা হোক্ অবসান॥
কৃপার আলোক যদি কর মা সম্পাত,
পাইবে নিমেষে লয় অজ্ঞান আঁধার।
কর্ম্ম মাঝে পুনরায় নিদ্রিত ভারত,
নামিয়া লভিবে কীর্ত্তি অনন্ত অপার।
করিবেনা বরষণ তব কৃপা ধার?
রহিবে অজ্ঞান ঘোর চিরদিন দেশে?
গৌভৃং সমান উচ্চ কীর্ত্তি ছিল যার,
প্রলুণ্ঠিত হবে কি তা ভূমে অবশেষে?
দাও প্রাণ হীন দেহে সংযোজিয়া নূতন পরাণ,
নবীন গৌরবে পুনঃ ভারতের হউক উত্থান॥

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

— ঋগ্বেদ সংহিতা

জগৎটা দর্পণ সদৃশ। দর্পণের সম্মুখে যাহা যে ভাবেই উপস্থিত করা হউক না কেন দর্পণ প্রতিবিম্বরূপে অবিকল তাহাই আবার আমাদের সম্মুখে মেলিয়া ধরে। তেমনি জগতের সঙ্গেও যেরূপ ব্যবহার করা যায় প্রতিদান রূপে জগতের নিকট হইতেও আমরা ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই পাইয়া থাকি।

*

প্রতিক্রিয়া বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহা কঠোর সত্য। আঘাত দিলে আঘাত সহ্য করিতেই হইবে, পরের প্রাণে বেদনা দিলে তাহা শতগুণিত হইয়া আত্ম প্রাণকে নিপীড়িত করিবেই, ইহা জগতের নিয়ম, প্রকৃতির আইন!

*

"অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।" অনুকূল আলো বাতাস মাটী জল পাইলে যেমন অতি শুষ্ক বীজও অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তেমনি আত্মসিদ্ধ স্বভাব অনুকূল ক্ষেত্র পাইলেই আবার স্বরূপে ফুটিয়া উঠে। স্বভাবের প্রভাব দুরতিক্রমনীয়! গীতাকারও এই কথারই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ কিন্তু রসবর্জ্জং।"

*

প্রত্যেকেরই প্রাণ বলিয়া একটা জিনিষ আছে, হৃদয় বলিয়া একটা জিনিষ আছে, ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা জিনিষ আছে। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পরের প্রাণে যে আঘাত দেয়, পরের হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ করে, পরের স্বাতন্ত্র্য যে লোপ করিতে চায়, কঠোরা প্রকৃতির নির্ম্মম বিধানে একদিন তাহার অহঙ্কার বিচূর্ণিত হইবেই, অনুশোচনার দাবানলে পুড়িতে পুড়িতে তাহাকে ভস্মীভূত হইতে হইবেই।

*

নিষ্ঠুর ব্যবহারে—কঠোর পীড়নে চিত্ত দমিতই হয়, আনন্দ স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, চিত্ত তাহাতে জাগে না, প্রাণ তাহাতে উদ্বুদ্ধ হয় না।

*

নিয়ম-শৃঙ্খলার কঠোর নিগড় দিয়া বাহিরকেই বাঁধা যায় ভিতর তাহাতে বাঁধা পড়ে না। ভিতর বাঁধা পড়ে ভালবাসায়—প্রেমে। ভালবাসার স্নিগ্ধ আলোকস্পর্শে শত জনমের নিদ্রিত চিত্তও জাগিয়া উঠে, আনন্দের আতিশয্যে ধীরে ধীরে সে তার চির মুদ্রিত দলগুলি মেলিয়া ধরে।

*

আনন্দই জগতের প্রাণ, আনন্দই জগতের কাম্য। আনন্দ দিয়াই প্রাণকে জাগান যায়, আনন্দ দিয়াই প্রাণ আরত্ত হয়। "আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, অবতিষ্ঠন্তে, অবলীয়ন্তে চ।"

*

নিত্য-আনন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়াই না মানুষ নিরানন্দে ঘুরিয়া মরিতেছে, কঠোর কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কর্ম্মের আবর্ত্তে আবার এই লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধ আনন্দের স্থলে আত্মস্বার্থরূপে প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে।

*

ভূমা হইতে স্খলিত হইয়া মানুষ আঁকড়িয়া ধরিয়াছে ব্যষ্টিকে, আনন্দের পরিবর্ত্তে চাহিতেছে সুখকে। বিরাট্ মহান্ ভাব বিস্মৃত হইয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে ক্ষুদ্র অহংকে লইয়া।

এ সংসারে সকলেই সুখের কাঙ্গাল, সকলেই আত্মসুখ পরায়ণ। চোরের চৌর্য্যবৃত্তিতে, সংসারীর সংসার প্রীতিতে, সাধকের সাধন প্রচেষ্টায় সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠিতেছে এই আত্মসুখ-পরায়ণতা!

*

পরার্থে জীবন উৎসর্গ করা, মহদুদ্দেশ্যে আত্ম দান করা, জগদ্ধিতায় আত্মস্বার্থ বলি দেওয়া সহজ কথা নয়। এই আত্ম নিবেদনরূপ আচ্ছাদনের অন্তরালে অনেকখানি আত্ম স্বার্থের বীজ সঙ্গোপনে থাকিয়া যায়। হয়ত কিছুদিন বেশ মোহ আরামে সমর্পণের অভিনয় চলিতে থাকে, কিন্তু যখনই কর্ম্মের কঠোর আঘাত আসে, তখনই আত্ম সমর্পণের মুখোস খসিয়া পড়ে, আত্মস্বার্থটাই প্রকট হইয়া দেখা দেয়।

*

মানুষ ক'দিন আর অভিনয় করিয়া চলিতে পারে? —কতদিন আর আত্মস্বভাবকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? কষ্টি পাথরের সহিত সংঘর্ষে যেমন স্বর্ণের স্বরূপ পরীক্ষিত হয়, সেইরূপ মানুষের স্বভাবও পরীক্ষিত হয় ব্যবহারে — সংস্পর্শে।

গ্রন্থ সমালোচনা

শ্রীশ্রীঠাকুর মাহাত্ম্য (আমার কাহিনী অবলম্বনে)—শ্রীবিহারীমোহন শর্ম্মা প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দত্ত। মূল্য ৷৷৹ বারো আনা।

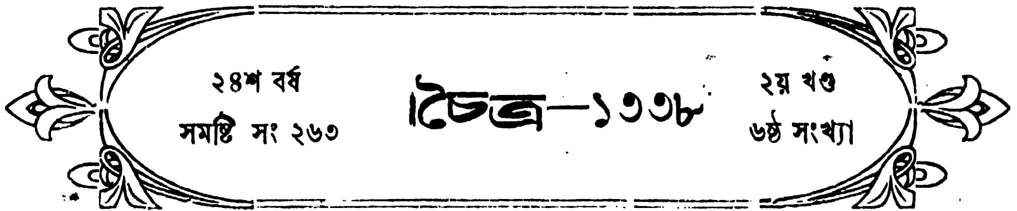
সদ্গুরুর কৃপালাভ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের ভিতরও গ্রন্থকার কিরূপ গুরু মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাহাই অনাড়ম্বর অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তকে ব্যক্ত করিয়াছেন। পরিশিষ্টে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুরের শিষ্য-ভক্তগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন বলিয়া আশাকরি। গ্রন্থখানির ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের অমূল্য উপদেশপূর্ণ কয়েকখানা চিঠিও আছে। শিষ্যের হৃদয়ের সংশয়কে উপেক্ষা না করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর অতি সরল ভাষায় প্রেম-প্রীতির ভাব লইয়া কিরূপে শিষ্যের হৃদয়োত্থিত সংশয়কে নিরসন করিয়াছেন, তাহাও পড়িয়া দেখিবার বিষয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়।

সনাতন ধর্ম্ম ও নবযুগ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র বেদান্তরত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ। মূল্য ৷৷৵৹ দশ আনা।

সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বেদ, এইজন্যই সনাতন ধর্ম্মকে বৈদিক ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। এই বৈদিক ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া চলার ফলেই আমাদের আজ এই দুর্গতি! প্রাচীন ভারতের বৈদিক ঋষিগণই মানব জাতির আদি গুরু, তাঁহারা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেই আমরাও চরম জ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে তাঁহাদের উপদেশ এবং তত্ত্বকথা অবজ্ঞার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই, বিজ্ঞানের দিক দিয়া দ্রুত উন্নতি সাধিত হইলেও, চারিত্রিক গুণে, নৈতিক আদর্শের দিক দিয়া ক্রমশঃই অবনতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। পরাবিদ্যা-অপরাবিদ্যা উভয়ের সামঞ্জস্য এবং চর্চ্চার ফলেই পূর্ণ মানবজীবন লাভ করা যায়। কালের প্রভাবে ভারতবর্ষ জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পিছাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশ এ বিষয়ে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। জড় বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ পিছাইয়া পড়িলেও, তত্ত্ব বিদ্যায় ভারতবর্ষ এখনো শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং পরা-অপরা বিদ্যায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনেই নবযুগের সৃষ্টি হইবে। বেদান্তরত্ন মহাশয় উপরোক্ত গ্রন্থে বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষত্ব, বৈদিক ধর্ম্মকে উপেক্ষা করাতেই যে অধঃপতন, পরাবিদ্যা-অপরাবিদ্যায় যে কোন বিরোধ নাই, অপরাবিদ্যার অনুশীলন না করিলে যে পরাবিদ্যা লাভেও অধিকার জন্মে না, ভারতের উন্নতি বলিতে যে পরা-অপরাবিদ্যা উভয়ের অনুশীলনকেই বুঝায়, ইত্যাদি বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষত্ব ক্রমশঃ পাশ্চাত্যবাদীরাও বুঝিতে পারিতেছে। গ্রন্থকার ইহাকেই শুভলক্ষণ বা নবযুগের সূত্রপাত বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থখানির মাঝে অনেক প্রণিধানযোগ্য বিষয় রহিয়াছে। গ্রন্থখানার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র



সারথির নির্দ্দেশ

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্ন সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥
তস্মাদ জ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।৪২-৪৩)

যোগের সঙ্কেত যাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আর কর্ম্মপরিহারের আবশ্যক হয় না। কাজ ছাড়িলে তমোঽভিভূত হইয়া যাইবে তোমরা—কাজেই ফলাকাঙ্ক্ষা সমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাও। পার্থ-সারথির এই মূল্যবান্ নির্দ্দেশ যেন তোমরা ভুলিয়া না যাও!

অজ্ঞান সম্ভূত সংশয়কে জ্ঞান খড়্গ দ্বারা বিনাশ কর। তাহা হইলেই দিব্য জীবনের, দিব্য কর্ম্মের সন্ধান পাইবে। কর্ম্মের কৌশল জানিয়া কর্ম্ম

কর না বলিয়াই সহজে তোমাদের এত অবসাদ, এত ক্লান্তি আসে! কর্ম্মের রহস্য জানিয়া কর্ম্ম করিলে অক্লান্তভাবে তোমরা কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিবে। কর্ম্ম ছাড়িলেই মুক্তি আসিবে না—নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রলোভন সব চেয়ে বড় প্রলোভন! পার্থ-সারথি এইজন্যই কর্ম্ম ত্যাগকে কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়াছেন।

অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিজকে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া তোল। ভগবানের শুভ ইচ্ছা যেন তোমাদের মাঝে অবাধে লীলায়িত হইতে পারে। জীবনকে বিশুদ্ধ স্বচ্ছ আয়নার মত করিয়া ফেল, তাহা হইলেই দেখিবে এই পার্থিব জীবনেই দৈবী জীবনের অফুরন্ত জ্যোতির প্লাবন আসিয়া ক্ষুদ্র অভিমানকে কোথায় ভাসাইয়া নিয়া যায়! 'অহং'কে বিসর্জ্জন দিলেই তোমাদের বক্ষ জুড়িয়া তাঁহার আসন চির প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া যাও। কর্ম্ম করার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে কয়জন? তাহার উপর তোমরা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কেত জানিয়াছ! কর্ম্ম কোন দিন মানুষকে বন্ধন দশায় ফেলিতে পারে না। মানুষ নিজেরই গড়া শৃঙ্খলে নিজে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

আত্মনিষ্ঠ, ভগবান্নিষ্ঠকে কর্ম্মের বন্ধনে কোন দিন জড়িত হইতে হয় না। কর্ম্ম ছাড়িয়া যাহারা জ্ঞানার্জ্জনে প্রয়াসী, তাহারা ফাঁকি দিয়া শেষে ফাঁকিতেই পড়ে। যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান জীবনে কোন দিনই তাহারা পায় না।

তোমাদের জীবন ভগবৎ প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই তোমাদের প্রাণেই তো অসংখ্য কর্ম্ম সম্পাদনের উন্মাদনা আসিবে। জড়ের মত বসিয়া থাকে কাহারা—যাহারা তামসিক ভাবাপন্ন! কিন্তু সমর্পিত জীবনে তো তামসিকতার উপদ্রব কখনো আসিতে পারে না। কর্ম্ম বিমুখ হইয়াই তোমাদের এই দুর্দ্দশা! কর্ম্ম করিয়া চিত্ত শুদ্ধি কর, শুদ্ধ চিত্তে তখন ভগবানের মহিমা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

তোমরা আদর্শ স্থানীয় হইবে—কাজেই জগৎকে আলস্য কুঁড়েমি শিক্ষা দিবার জন্য তোমাদের জন্ম নয়। কর্ম্মের ভিতর দিয়াও কিরূপে অবিক্ষুব্ধ শান্ত সমাহিত থাকা যায়, এই নির্ম্মম সত্য আবিষ্কারের দরুণই তোমাদের জন্ম! এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তোমাদের দিব্য জন্ম লাভ হইবে।

হেলায়-খেলায় সকলেই দিন অতিবাহিত করিতেছে, তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিতে হইবে তোমাদেরই। তোমরাই জীবনের আদর্শ মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে। কর্ম্মজগৎ হইতে অবসর লইয়া সেই আদর্শ কখনো প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।

অভিমান ছাড়িয়া দিলে তখন জীবনে এক আশ্চর্য্য রূপান্তর আসে। সমর্পণ যে দিন ঠিক ঠিক হইবে, সে-দিনই উপলব্ধি করিতে পারিবে, সমর্পিত জীবনের কি সৌভাগ্য! একটী মহৎ চিত্তের অনুধ্যান কি করিয়া অপরের জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে, আত্মসমর্পণ মন্ত্রে যাহারা দীক্ষা লইয়াছ, তাহারাই একদিন এই কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে।

সত্যের দরুণ আসন পাতিয়া দেওয়া সহজ কথা নয়। সত্য বড়ই সহজ—কিন্তু সত্যকে হৃদয়ে স্থান দেবার যোগ্য হওয়া বড়ই কঠোর সাধনার কথা। অপবিত্র হৃদয়ে ভগবানের আরতি হয় না।

সংযম দ্বারা বীর্য্য সঞ্চয় কর, সঞ্চিত বীর্য্যের অমোঘ শক্তিতে তখন অক্লান্তভাবে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। শোকে দুঃখে অবিশ্বাসে, মারাত্মক সন্দেহে মানুষের দেহ-মন-প্রাণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মুখে হাসি নাই—তোমাদের অজস্র কাজ পড়িয়া রহিয়াছে ইহাদের মাঝেই। কাজেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে অক্ষত বীর্য্যশালী হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগদ্ধিতায় তোমাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দাও। কর্ম্মই তোমাদের জীবনের ব্রত, সেই ব্রতে অভিমানের বালাই যেন না থাকে।

সারতন্ত্রোপদেশঃ

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

গুরু ব্র্হ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ
সেব্যোবন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্বেজনীয় এবায়ং
কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা॥ ১

গুরু স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, মুমুক্ষুগণ গুরুর সেবা ও বন্দনা করিবেন। বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন কৃতজ্ঞ শিষ্য কখনও গুরুর উদ্বেগ উৎপাদন করিবেন না।

এখানে "ব্রহ্মা" শব্দটী ত্রিগুণাত্মক দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপলক্ষক স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। গুরুতে সৃষ্টি স্থিতি সংহারিণী শক্তির আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিয়া ইহাকে

কষ্ট-কল্পনাও বলা চলে না। গুরু রুদ্র, গুরু শিব, —শিষ্য হৃদয়োত্থ হলাহল পান করেন বলিয়া "নীলকণ্ঠ" নাম তাঁহাতে সার্থক; গুরু দ্রষ্টা গুরু স্রষ্টা,—শিষ্য হৃদয়ে ভক্তি-মুক্তি প্রসূ বীজ অর্পণ করেন বলিয়া "ব্রহ্মা" নাম তাঁহাতে সফল; গুরু পাতা, গুরু ত্রাতা,—শিষ্যহৃদয়জাত নবনবোন্মেষিত ভাবরাশির পরিপোষণ করেন বলিয়া "বিষ্ণু"নাম তাঁহাতে সুসিদ্ধ।

সূর্য্যরশ্মি নিরঞ্জন, যখন তাহা সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে তখনই তাহার বর্ণবৈচিত্র্য আমাদের নয়ন গোচর হয়। এই সপ্ত বর্ণাত্মক সপ্ত রশ্মি পৃথক হইলেও বস্তুতঃ তাহা এক। এই এক বহু হইলেই তাহা সবর্ণ, আবার বহু একে পর্য্যবসিত হইলেই নির্ব্বর্ণ। ব্রহ্মও নিরঞ্জন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ ত্রিগুণ দেবতায় যখন তাঁহার ত্রিবিধ প্রকাশ, তখন তিনি সগুণ; আবার তিনে এক হইলেই নির্গুণ। কাজেই "ব্রহ্মা" শব্দটী যে শুধু সগুণ ব্রহ্মেরই উপলক্ষণ তাহা নহে, নির্গুণ ব্রহ্মেরও। এখানে সগুণ নির্গুণের গোলক ধাঁধাঁয় না পড়িয়া সগুণ নির্গুণ রূপ বিশেষণাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মা শব্দটী ব্রহ্মের বাচক স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে ধরিয়া লইলেই আর কোন বিরোধ থাকে না। কাজেই "গুরু স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্মা" এ কথা দ্বারা আমরা পাইলাম যে, গুরু পরম ব্রহ্মস্বরূপ, সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবই তাঁহাতে পরিস্ফুট। স্বরূপে তিনি নির্গুণ, আবার করুণার ঘন বিগ্রহ রূপে তিনিই সগুণ। এমনি করিয়া গুরুতে আমরা অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, অলক্ষ্য ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

গুরুকে অনেকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু 'স্বয়ং' এই শব্দ দ্বারাই তাঁহার নিরাস হইল। স্বয়ং অর্থে নিজেই, প্রতিনিধি নয়। আবার এই যে স্বয়ং তিনি কেমন? না "সাক্ষাৎ" প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ বর্ত্তমান।

কাজেই ব্রহ্মকে আর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না, গুরুকেই স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ ধারণা করিয়া তাঁহার সেবা বন্দনা করিলেই মুমুক্ষু—মুক্তিকামী মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

"সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ" এই কথা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যাহারা প্রকৃতই মুক্তিকামী, সংসারের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া যাহারা নিত্য বস্তুর প্রত্যাশী, সংসার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া যাহারা জন্ম-মৃত্যুর পাশ এড়াইতে চায়, এইরূপ মুমুক্ষুগণই গুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ করিবে। অন্যথায় বিপরীত ফল ফলারই সম্ভাবনা।

অনেকের ধারণা সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে নীরোগ ও অশোক অবস্থায় বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ভোগ উপভোগ করা যায়, তাই অনেক ভোগ লোলুপ ব্যক্তি আত্ম স্বার্থ সিদ্ধি মানসে বাছিয়া বাছিয়া সিদ্ধ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু যখন দেখে যে গুরু কৃপা তাহাদের ভোগ লালসায় ইন্ধন না যোগাইয়া বরং প্রতি কর্ম্মে প্রতিকূলতাচরণ করিতেছে, তখন তাহারা গুরুর শক্তি হীনতার পরিচয় পাইয়া অন্যত্র কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা তাহারই সন্ধানে প্রধাবিত হয়। আচার্য্য প্রবর তাই গুরুকরণ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতেছেন—"**সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।**" যাহারা প্রকৃত মুমুক্ষু, কায়মনোবাক্যে গুরুর সেবা বন্দনা করিয়া তাহারাই সুফল পাইয়া থাকে।

গুরু সেবার অর্থ বহু ব্যাপক। গুরুর দৈহিক পরিচর্য্যাতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায় না। গুরুর উপাসনাও গুরু সেবা। সেবা এবং উপাসনা একার্থ বোধক। উপাসনা অর্থে উপ অর্থাৎ

সমীপে বাস। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কর্ম্মে গুরুর সান্নিধ্য, গুরুর অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে পারিলেই তাহা গুরু সেবারূপে আখ্যাত হইয়া থাকে।

গুরুর সন্নিকটে না থাকিয়াও গুরু সেবা করা যায়। গুরু নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবন পরিচালন করাই প্রকৃত গুরু সেবা। পথে চলিতে চলিতে কত বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কত প্রকার বিপত্তি আসিয়া পথিককে পথচ্যুত করিয়া দেয়, এবম্বিধ সঙ্কটাবস্থায় অধীর না হইয়া শ্রীগুরুর শরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাঁহারই চরণ স্মরণ করিয়া আকুল প্রাণে তাঁহার উদ্দেশ্যে মনোব্যথা জানান প্রয়োজন। ইহাই গুরু বন্দনা।

বন্দনা এবং প্রার্থনা সমার্থ জ্ঞাপক। প্রার্থনার যে কি অমোঘ শক্তি তাহা আমরা ঋষিদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারি। ঋষিরা সরল দৈনন্দিন জীবন যাপনের সঙ্গে বিশ্ব দেবতার পায়ে আত্ম নিবেদন করিতেন, হৃদয় উঘারিয়া প্রার্থনা করিতেন। তাহাতেই তাঁহারা ইহ জীবনে পরাশান্তি ও পর জীবনে পরমাগতি লাভ করিতে পারিতেন। প্রার্থনার মত এমন সহজ সরল সাধনা আর নাই। গুরুর সেবা করিয়া গুরুর বন্দনা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা আনয়নই মুমুক্ষুর একান্ত কর্ত্তব্য। গুরুর প্রসন্ন দৃষ্টিতেই পথের বাধা অপসারিত হয়, লক্ষ্যের সান্নিধ্য সহজেই লাভ হয়। তাই ঋষি আকুলকণ্ঠে গুরুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—"গুরো যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

বিচার বিশ্লেষণ করিয়া অসত্য হইতে সত্যকে এবং অনিত্য হইতে নিত্যকে বাছিয়া লইবার যে শক্তি রহিয়াছে তাহাই বিবেক, আর উপকারীর উপকার স্মরণ করিয়া উপকারকের উপর যে স্বতঃ উৎসারিত শ্রদ্ধার ভাব তাহাই কৃতজ্ঞতা। "নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা" এই শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, কোন প্রকারে গুরুর প্রাণে আঘাত দেওয়া বিবেক যুক্ত এবং কৃতজ্ঞতা সম্পন্ন শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে যে অমূল্য সম্পদ্ পাইয়া থাকে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা দিয়া সে ঋণ শোধ হইতে পারে। পরশ মণির স্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চনে রূপান্তরিত হয়, গুরুর পরশ পাইয়া শিষ্যের জীবনেও সেইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন আসে, তবে শিষ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থানুযায়ী এ পরিবর্ত্তন সংঘটনে সময়ের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে এই মাত্র। কিন্তু ইন্ধন যে কোন অবস্থাসম্পন্নই হউক না কেন আগুনের সংস্পর্শে আসিলে আজ হোক্ কাল হোক বা দু'দিন পরেই হোক্ তাহা আগুনে পরিণত হইবেই। ইহা শাশ্বত সত্য। যাঁহার স্পর্শে যাঁহার কৃপায় এ রূপান্তর, এ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় তাঁহার দান কি শোধিবার? কাজেই সমস্ত জীবন ভোর গুরুর সকাশে কৃতজ্ঞ থাকা ছাড়া বিবেকী শিষ্যের আর উপায়ান্তর নাই।

গুরু যিনি তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতো দৃষ্টি সম্পন্ন। শিষ্যের মঙ্গল চিন্তায় তিনি সর্ব্বদাই নিবিষ্ট। নিজের মতলব সিদ্ধি হইল না দেখিয়া গুরুর উপর বৃথা অনুযোগ দেওয়া, অথবা গুরুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় রাতারাতি কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া সে পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত পন্থার অনুসরণ করা, উভয়ই গুরুর প্রাণে আঘাত দেয়। গুরু চান জন্ম-জন্ম সঞ্চিত মালিন্যরাশি দূরীভূত হইয়া শিষ্যের হৃদয় সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, মায়ার কঠোর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে অমৃতের আস্বাদ লাভ করুক। এ অবস্থায় শিষ্য যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, স্বেচ্ছাকৃত

কৃটিতে মালিন্যের বোঝা বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে গুরুর দুঃখের আর সীমা থাকে কি? শিষ্য এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে গুরুর প্রাণে বিন্দুমাত্রও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। যদি কেহ ইহার বিপরীতাচরণ করে, সে যতই কেন পণ্ডিত হউক না, আচার্য্যের ভাষায় তাহাকে আমরা অবিবেকী এবং অকৃতজ্ঞ বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিব না।

অনেকের ধারণা অল্প কিছুদিন গুরু সেবা বা ধর্ম্মালোচনা করিলেই ভক্তি মুক্তি করামলকবৎ আয়ত্ত হয়। তাই অনেক অসহিষ্ণু সাধক সময়ের দীর্ঘতা সহ্য করিতে না পারিয়া এই সেবার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন চেষ্টার অনুবর্ত্তন করে। কিন্তু তাহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আর এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পন্থান্তরের অনুবর্ত্তন সমধিক অনিষ্টকর। তাই আচার্য্য প্রবর দ্বিতীয় শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন :—

যাবদায়ু স্ত্রয়োবন্দ্যা বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতেরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥২

আজীবন কায়মনোবাক্যে বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বরের বন্দনা করিবে, ইহাই শ্রুতির নিশ্চিত উপদেশ।

এস্থলে 'বন্দ্যাঃ' অর্থে 'অনুসরণীয়াঃ'—আর এ অনুসরণ নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যাপী নয়, সমগ্র জীবন ব্যাপী। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই এই ত্রয়ীর অনুসরণ করিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর ইহাদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি?

বেদান্ত—জ্ঞানোন্মেষক ও মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র। জ্ঞানোদ্বোধক শাস্ত্র মাত্রকেই বেদান্তের পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। এবম্বিধ শাস্ত্রানুসরণেই জীবন কাটাইতে হইবে, শাস্ত্রার্থ আত্মজীবনে প্রতিফলিত করিয়া তুলিতে হইবে। শাস্ত্রবিধির অনুবর্ত্তন না করিয়া স্বেচ্ছাকল্পিত পথের অনুসরণ যে সিদ্ধির পরিবর্ত্তে অসিদ্ধি, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি এবং সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই আনিয়া দেয়, শ্রীভগবান্ গীতামুখে তাহারই উপদেশ দিয়াছেন।

তাঁহার উক্তি :—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে, সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি,সুখ অথবা পরমাগতি লাভ করিতে পারে না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তু মিহার্হসি ॥

অতএব কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। শাস্ত্র বিধান অবগত হইয়া স্বীয় অধিকারানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানিয়া না চলিলে চিত্তের আবিলতা দূর হইবে না, আর চিত্তের আবিলতা দূর না হইলে জীবনে সত্যের বিকাশ কল্পনাও আকাশ কুসুম! প্রতিমুহূর্ত্তে শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী চলিতে হইবে, প্রতিমুহূর্ত্তে বিচারের তীক্ষ্ণধার অসিহস্তে অগ্রসর হইতে হইবে। কত শত্রু কত আততায়ী আসিয়া গমনে বাধা প্রদান করিবে, পথচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইবে, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত সাধককে তত্ত্ব বিচার দ্বারা নির্ম্মমভাবে সে সকলকে নির্জ্জিত করিতে হইবে, সর্ব্বাবস্থায় নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত বেদান্তের অনুসরণ।

শাস্ত্রাধ্যয়নকেই শাস্ত্রানুসরণ বলে না, শাস্ত্র প্রতিপাদিত সত্য আত্মজীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য যে শাস্ত্র প্রদর্শিত পন্থার অনুবর্ত্তন, তাহাই

হইল প্রকৃত শাস্ত্রানুসরণ। আর এই অনুসরণ জীবন ভরিয়া করিয়া যাইতে হইবে কায়মনোবাক্যে।

গুরু অর্থে এস্থলে গুরুবাক্য। শাস্ত্রবাক্যও যেমন অনুসরণীয়, গুরুবাক্য ও তেমনি অনুবর্ত্তনীয়। বেদবাক্য ও গুরুবাক্যে পার্থক্য কোথায়? উভয়ই যে অপৌরুষেয়! পুরুষোত্তমের চিরন্তন সত্যবাণী শুদ্ধ ঋষি হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বেদবেদান্তাকারে, আবার সেই বাণীই বর্ত্তমানে চাক্ষুষ ফুটিয়া উঠিতেছে গুরুর শ্রীমুখ বিনিঃসৃত হইয়া গুরুবাক্যরূপে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে শাস্ত্রবাক্য ও গুরু-বাক্যে যদি কোন পার্থক্যই না থাকে, তবে গুরুর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সাধন পন্থায় পরিচালিত হইতে শাস্ত্রবাক্যই যথেষ্ট, অনর্থক আবার সে ক্ষেত্রে গুরুর অবতারণার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলি—শাস্ত্রবাক্য বহু বিস্তৃত, সর্ব্ববিধ অধিকারীর জন্য তাহাতে সর্ব্বপ্রকারের বিধি নিষেধ—আদেশ উপদেশের সমাবেশ রহিয়াছে। তাহা হইতে নিজ অধিকারানুযায়ী পথের নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। এমন কি নিজের বুদ্ধি বিবেচনার সিদ্ধান্তানুযায়ী পন্থা নির্ব্বাচন করিতে গিয়া অনেকের মতি বিভ্রম ঘটিবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। গুরুর উপদেশে কিন্তু সে ভয়ের আশঙ্কা নাই। গুরু অধিকারানুযায়ী আদেশ উপদেশের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বলিয়া গুরুবাক্যানুসরণে শিষ্য অতি অল্পকাল মধ্যেই সফলকাম হয়। যে যে-পরিমাণ অধিকারী, গুরু তাহাকে তদনুরূপ সাধন ভজন দিয়া থাকেন, আবার স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে যেমন ক্লাশ প্রমোশন রহিয়াছে, এক শ্রেণীর অধ্যয়ন শেষ হইলে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, এ ক্ষেত্রেও তেমনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধন প্রক্রিয়াও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, শিষ্য—সাধক নিম্নস্তর হইতে উন্নীত হইয়া উচ্চস্তরের অনুভূতি লাভের অধিকারী হয়। আত্ম বুদ্ধি নির্ব্বাচিত শাস্ত্রোক্ত পন্থার অনুসরণ আর চাক্ষুষ গুরুর বাক্যানুসরণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই!

কায়মনোবাক্যে জীবন ভরিয়া গুরুর— গুরু-বাক্যের অনুসরণ করিয়া যাইতে হইবে। জীবনকে এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, দেহ দিয়া যদি কর্ম্ম করি, তাহাও হইবে গুরুর কাজ, মন দিয়া যদি কর্ম্ম করি, তাহাও হইবে গুরুর কাজ, আবার বাক্য দিয়া যদি কর্ম্ম করি, তাহাও হইবে গুরুর কাজ। অর্থাৎ দেহ মন প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুচরণে ঢালিয়া দিয়া যন্ত্রস্বরূপে জীবন পরিচালনা করিয়া যাইতে হইবে; মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে হইবে, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র।

বাহিরে আমরা যাঁহাকে গুরুরূপে দেখিতে পাইতেছি, তিনিই আবার আমাদের অন্তরে ঈশ্বররূপে যন্ত্রবৎ আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন। এ যন্ত্র-যন্ত্রী ভাব আমাদের স্ব-কপোল কল্পিত নয়, শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন! তুমি ভাবিও না তোমার কর্ত্তা তুমি স্বয়ং। তুমি যে যন্ত্র মাত্র, তোমার কর্তৃত্ব কোথায়? ঈশ্বর প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ তাহাদের পরিচালিত করিতেছেন।

আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া প্রতি কর্ম্মে, প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে ঈশ্বর কর্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই তাঁহার দান মনে করিয়া হাসি মুখে সকল সহিয়া যাইতে হইবে। ইহাই

হইল প্রকৃত ঈশ্বরের বন্দনা, ঈশ্বরের অনুসরণ। হৃদি মধ্য গত যন্ত্রী স্বরূপ এই ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

যদি আত্ম হিত চাও, যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পরাশান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

আজীবন কায়মনোবাক্যে বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বরের অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা শ্রুতিসম্মত উপদেশ। আচার্য্য তাই বলিতেছেন—"শ্রুতেরেবৈষ নিশ্চয়ঃ।" ইহা অপেক্ষা অদ্বৈত জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট এবং সরল পন্থা আর নাই। এই সেবার পথে—এই অনুসরণের পথে চলিতে চলিতেই অদ্বৈত জ্ঞান লাভ হইবে, বেদান্ত গুরু ও ঈশ্বর যে অভিন্ন পদার্থ তাহা উপলব্ধ হইবে, সমস্ত জীব জগতের সহিত সাধকের অভিন্ন ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু যাহাতে এই অদ্বৈত ভাব ভাব রূপেই অন্তরে থাকে, বহিঃকর্ম্মে তাহা প্রস্ফুট না হয়, আচার্য্য সেই জন্য তৃতীয় শ্লোকের অবতারণা করিয়া তাহার পূর্ব্বার্দ্ধে বলিতেছেন—

ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ
ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ। ৩ (ক)

মনে মনে সর্ব্বদাই অদ্বৈত ভাব অবলম্বন করিয়া চলিবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখাইবে না। কারণ ক্রিয়াতে অদ্বৈত বুদ্ধি স্থাপিত হইলে ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান হইবে না, আর ক্রিয়ার অননুষ্ঠানে —"যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ"— এই উপদেশানুযায়ী সকলেই বহিঃ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাহিরে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া উঠিবে, অথবা আত্ম জ্ঞানীদের বহিরাচরণের অনুকরণে আচার ভ্রষ্ট হইয়া সকলে আত্মোন্নতির পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িবে। তাই গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম সঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ভেদ উৎপাদন করা উচিত নহে অর্থাৎ কর্ম্ম সকল নিষ্ফল ইত্যাদি বলিয়া কর্ম্ম হইতে অন্যদিকে তাহাদের বুদ্ধি পরিচালিত করা কর্ত্তব্য নহে। বরং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সাবধান হইয়া স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম মার্গে নিযুক্ত রাখিবেন।

ভিতরে অদ্বৈত ভাব রক্ষা করিয়া বাহিরে সাধারণের ন্যায়ই আচরণ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রসম্মত উপদেশ। একজন প্রসিদ্ধ পরমহংস সন্ন্যাসীর কথা জানি, তাঁহার আশ্রম ছিল পশ্চিম ভারতের কোন পাহাড়ের উপর। পরমহংসের আর জাতি বিচার মানিয়া চলার কোন প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু ইনি সর্ব্বদাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়াই চলিতেন, এমন কি ব্রাহ্মণেতরের হাতে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে একজন মাত্র ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। সেই শিষ্যটীকেই গুরুর যাবতীয় কাজ কর্ম্ম করিতে হইত। একদিন শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ঠাকুর! তুমি তো পরমহংস সন্ন্যাসী। তোমার আবার জাতি বিচার কেন? তোমার আবার শাস্ত্রোক্ত বিধান মানিয়া চলার প্রয়োজন কি?"

গুরুজী উত্তর করিলেন—"বৎস! শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা পড়িয়াছ কি? শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়া স্পষ্টই বলিলেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

আমাদের আচরণও সেইরূপ আদর্শ রক্ষার জন্যই, বহিরাচারের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠানে কোন কিছুই আসে যায় না।"

শিষ্যের কাছে যেন গীতার অর্থ সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইল, গীতার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুচরণে তিনি প্রণত হইলেন।

ভিতরে ভাবের প্রতিষ্ঠা হইলে বাহিরে তাহার অভিব্যক্তির প্রয়োজন থাকে না, আর ভিতরে তাহা প্রতিষ্ঠিত না হইলে বাহিরে পানাহার করিয়া মিলনের অভিনয় দেখাইলেও তাহাতে কোনই ফল দর্শে না। অনেকের ধারণা জাতীয় গণ্ডী না ভাঙ্গিলে, অথবা শাস্ত্র বাক্যের অন্যথাচরণ না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হয় না, তাই অনেকে ছত্রিশ জাতির অন্ন গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক "সোঽহং" এর স্থলে ক্ষুদ্র 'অহং'কেই প্রতিষ্ঠা করিয়া বসেন। তাঁহাদের এই ধারণা যে কতদূর ভ্রমাত্মক তাহা আচার্য্যের "ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ" এই উক্তিতেই পরিস্ফুট।

আরব্ধ স্থপ্নাবধি অদ্বৈত ভাব পোষণ করিবে, সকলের সহিত অভিন্ন ভাবের সাধনা করিবে, কিন্তু গুরুকে সর্ব্বদাই সর্ব্ব ভাবের অতীত স্বরূপেই রাখিতে হইবে, মুমুক্ষু শিষ্য—অদ্বৈতজ্ঞানলাভেচ্ছু সাধক কোন দিন গুরুর সহিত সমতা ভাব—অদ্বৈত ভাব পোষণ করিবে না। তাহা হইলে তাহার উন্নতির পথেই বাধা পড়িয়া যাইবে। এই কথার সমর্থন করিয়া আচার্য্যপ্রবর তৃতীয় শ্লোকের শেষার্দ্ধে স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন—

অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু
নাদ্বৈতং গুরুণাসহ ॥ ৩ (খ)

তিন লোকে অদ্বৈত বুদ্ধি রাখিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈত ভাব করিবে না, কারণ গুরু ও শিষ্য এক হইলে কখনও জ্ঞান লাভ হইবে না।

গুরুই জীবন পথের একমাত্র দিশারী। পথে চলিতে চলিতে কত বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কত বিপত্তি আসিয়া দেখা দেয়; সে সময় যদি পথিকের স্মরণ থাকে, তাহার সর্ব্ব বিপদ্ হন্তা একজন কেউ আছেন, পথের বিঘ্ন তিনিই অপসারণ করিবেন, তাহা হইলে তাহার চলার শক্তি আপনি বাড়িয়া যায়, পথের বাধা আর তাহার চলায় বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। উপনিষদেও বেশ সুন্দর একটী কথা আছে—

দুইটী পাখী গাছের ডালে বসিয়া আছে, একটী নীচে, একটী উপরে। নীচের পাখীটী ফল খাইতেছে, উপরেরটী দেখিতেছে। যখনই ভোক্তা পাখীটীর অবসাদ আসিয়া পড়িতেছে, তখনি সে উপরের দিকে চাহিতেছে, আর অমনি তাহার সব অবসাদ সব জড়ত্ব দূরে চলিয়া যাইতেছে।

সাধককেও তেমনি শ্রীগুরুকে উচ্চাসনে নির্গুণ ভূমিতে রাখিয়া দিতে হইবে, দ্বৈতাদ্বৈতের পরপারে তাঁহার আসন রচনা করিতে হইবে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় চলিতে চলিতে যখন অবসাদ-জড়ত্বে চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, তখনই একবার তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে, চিত্তকে গুরুমুখী করিতে হইবে, দেখিবে তখনই শক্তির অজস্র ধারা আসিয়া সাধকের মন প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্যই আচার্য্য প্রবর গুরুর সহিত অদ্বৈত ভাব পোষণের নিষেধাদেশ করিলেন।

জ্ঞানের ঘন বিগ্রহ, অদ্বৈত তত্ত্বের চরমপন্থী আচার্য্য শঙ্কর (এত বড় জ্ঞানী হইয়াও) স্বরচিত

বহু শ্লোকে গুরুর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ধনে কি হইবে, জনে কি হইবে, জ্ঞানে কি হইবে, মানে কি হইবে, বিদ্যায় কি হইবে, বুদ্ধিতে কি হইবে,—'মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিম্।' —গুরুর শ্রীপাদপদ্মে মন লগ্ন না হইলে সব বৃথা, সব বৃথা সব বৃথা ." বৈষ্ণব দর্শনেও পাই—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

আবার শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই, শ্রীভগবান্ উদ্ধবের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

আচার্য্যংমাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ॥

আচার্য্যকে—গুরুকে আমি (ভগবান) বলিয়াই জানিবে, অর্থাৎ একমাত্র জগদীশ্বর আমিই গুরুরূপে প্রকাশিত হই। অতএব গুরুকে কখনও অবহেলা করিবে না। মনুষ্যবোধে তাঁহার অসূয়া করিবে না, গুরুকে সর্ব্বদেবময়রূপে ভজনা করিবে, অর্থাৎ একমাত্র গুরুর আরাধনা করিলেই সকল দেবতার আরাধনা হইয়া থাকে।

তাহা হইলেই আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে কি জ্ঞানী সম্প্রদায়, কি ভক্ত সম্প্রদায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তানুসারে গুরুই পরম তত্ত্ব—গুরুর আসন সর্ব্বোচ্চে। গুরুর এ সম্মান দান প্রথা মনুষ্য দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা বেদেরই নির্দ্দেশ। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই বেদবাণী অবনত শিরে পরিপালনীয়, বেদের উপদেশ সর্ব্বথা অনুসরণীয়, কেননা একমাত্র বেদই যে সনাতন ধর্ম্মের ধারক! অতএব বেদানুশাসিত সনাতন ধর্ম্মাশ্রিত জনগণ গুরুর আসন কোথায় এবং গুরুর প্রয়োজনীয়তাই বা কি তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

উপদেশের মধ্যে তত্ত্বোপদেশই শ্রেষ্ঠ, সেই তত্ত্বোপদেশের মধ্যে আবার গুরু সম্পর্কিত উপদেশ সর্ব্বোত্তম। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকত্রয়ের "সারতত্ত্বোপদেশ" নামকরণ করিয়া সেই চিরন্তন সত্যেরই বিজয় ঘোষণা করিলেন।

মাহেন্দ্রক্ষণে

এই স্থূল জগৎকে আমরা যতখানি প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করি, ঠিক ততখানি প্রাণ দিয়াই আবার অবিশ্বাসও করিতে শিখিতে হইবে। বাস্তব জগত অপেক্ষাও বাস্তব বিষয় রহিয়াছে। মানুষের স্বভাবই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়া, এইজন্যই একটা দিক হইয়া পড়ে পরম আদরণীয়, আর অন্য দিকটা হইয়া পড়ে পরম উপেক্ষার বিষয়। প্রয়োজন হিসাবে উভয়েরই কিন্তু সমান মূল্য। ব্রহ্ম স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ সবকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। 'নেতি' 'নেতি' দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, কেননা নেতি দ্বারা (negation দ্বারা) যাহাকে বাদ দেই, তাহাও যে পরিপূর্ণ ব্রহ্মের পরিপূর্ণতারই এক অংশ। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের দৃষ্টি এক অংশে মাত্র নিবদ্ধ। ব্রহ্ম সকলকে লইয়াই পূর্ণ, এইজন্যই ব্রহ্ম কাহাকেও উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেন না

*   *

সংস্কারের মূল শিথিল করিয়া দিলেই যাহাকে অত্যন্ত বাস্তব বলিয়া মনে হইত, তাহাই আবার

উল্টো অবাস্তব বলিয়াও অনুভূত হয়। স্বপ্নকে আমরা মিথ্যা বলি, কিন্তু জাগ্রৎ দশাও যে মস্ত বড় মিথ্যা! স্বপ্ন জাগ্রৎ উভয়ই ফাঁকি! তবে ইহাদের একটা ফাঁকিকেই আমরা খুঁটি বলিয়া, সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরি। অন্তস্থ সত্য যে কি তাহা বলা কঠিন।

* *

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"——আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। উপনিষদের এই বাণীতে নিবৃত্তিপথের সংকেত রহিয়াছে। প্রথমেই স্থূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে মোহে পতিত হইতে হয়। আত্মাকে প্রিয়রূপে যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন——জগতের সবই তাঁহাদের কাছে প্রিয়। সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন বলিয়াই সকলই তাঁহাদের কাছে প্রেমাস্পদ। ভালবাসার মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ভালবাসিতে গেলেই মোহে নিপতিত হইতে হয়। ভালবাসা সেখানে স্থূলের প্রতি আসক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মাকে ভালবাসিয়া মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী—ঋষি হয়, আর দেহকে ভালবাসিয়া মানুষ কামনার দাস হইয়া নরকে পতিত হয়। ভালবাসার পাত্রকে বাহিরে খুঁজিলেই বুঝিতে হইবে সেই ভালবাসায় কোথাও না কোথাও অজ্ঞানতা বা মোহ রহিয়াছে। আমি যাহাকে ভালবাসি তিনি আর আমি যে এক——অর্থাৎ আমার আত্মাই তো আমার প্রিয়! ভালবাসিতে গিয়া মানুষ আসলকে ছাড়িয়া নকলকে পাইয়া তুষ্ট হয়——ভালবাসায় এইজন্যই মানুষের পতন হয়। আত্মা ছাড়া অন্যকে প্রিয়রূপে ভজনা করিতে গিয়াই যত গলদের সূত্রপাত!

* *

অন্ধকারের সঙ্গে শত লড়াই করিলেও অন্ধকার দূর হয় না। ইহার একমাত্র প্রতিকার আলো প্রজ্বালিত করিয়া তোলা, তাহা হইলেই সকল অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তির অপব্যয় করি মাত্র। রাগের সময় প্রত্যেকেরই সামঞ্জস্যের শক্তি বিনষ্ট হয়, তখন যদি তাহার প্রতিকার করিতে হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহার মাঝে সামঞ্জস্যের দৃষ্টি খুলে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে। যদি বাস্তবিকই কেউ ভুল করিয়া বসে, একটু আত্মস্থ হইতে পারিলেই নিজের দোষে নিজে লজ্জিত হইবেই হইবে। মানুষের উপর এইটুকু বিশ্বাস রাখিলে ক্ষতির কারণ নাই। ভুলের দিকে দৃষ্টি থাকিলেই ভুল সংশোধন করা যায় না, ভুলকে ভুলিয়াই যাইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে চাই আমরা প্রতিকার, কিন্তু ব্যবস্থা করিয়া বসি বিপরীত। Negative criticism এ কোথাও শুভ ফল দেখা যায় না। জগাই মাধাই মহাপ্রভুকে কলসীর কানা ছুড়িয়া মারিয়াছিল, কিন্তু মহাপ্রভু তবু তাহাদের বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। হৃদয় দ্বারা এইরূপ সহানুভূতি দেখাইয়া দুর্দ্দান্ত শত্রুকেও মহাপ্রভু অনায়াসে জয় করিয়াছিলেন।

* *

যাহাকে পাইতে চাই, মনকেও তদভিমুখী করিতে হইবে। নাস্তিক, অশ্রদ্ধাপরায়ণ, ভগবান নাই এই কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু আস্তিক সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং জোরের সহিত বলিয়া থাকে ভগবান আছেন। যাহার মন যে বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, সে সেই বিষয়েরই তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হয়। আস্তিকের মন আস্তিক্যভাবে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে—এইজন্যই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে তাহাকে বেগ পাইতে হয় না। নাস্তিকের মন নাস্তিকতার ভাবে পরিপূর্ণ, সুতরাং ভগবান নাই

নাস্তিকের পক্ষে ইহাও অতীব সহজ সরল কথা। যিনি প্রকৃতই আছেন, তাঁহাকে অস্বীকার করিতে হইলে অনেক যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন। এইজন্যই আস্তিকের চেয়ে নাস্তিকের যুক্তি-তর্কের বহর বেশী।

* *

নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই আমাদের আদর্শ। পাতঞ্জলেও আছে 'মহৎ চিত্ত ধ্যানাদ্বা'। আদর্শ যেখানে দোষদুষ্ট সেখানে গলদ থাকিবেই। মানুষকে আদর্শ ধরিয়া অনেক সময় আমরা মস্ত বড় একটা ভুল করিয়া বসি। আমরা ভুলিয়া যাই মানুষ মানুষই। দোষ গুণ নিয়াই মানুষ— মানুষ। স্থূল মানুষকে আদর্শ না ধরিয়া ভাবরূপী মানুষকে যদি আদর্শ ধরা যায়, তাহা হইলেই আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু নিছক ভাব নিয়া তো মানুষের প্রাণে বল আসে না। মানুষ চায়—মানুষরূপী ভগবান। সে ভগবান একদিকে নির্ব্বিকার—গুণাতীত বটে, কিন্তু জীবের দুঃখ দেখিয়া গুণাতীত হইয়াও গুণময় জগতে নামিয়া আসিয়া গুণ দ্বারা পরিচালিত মানুষের সঙ্গেই তাঁহাকে মেলামেশা করিতে হয়। ভগবান যে মানুষের দুঃখে মানুষ হইতে পারেন—ইহাই ভগবানের ভগবানত্ব।

ভগবান জীবকে অসংখ্য কর্ম্মও দিয়াছেন, আবার সেই কর্ম্মের গ্লানি অপনোদনের জন্য অসংখ্য আনন্দের জোগানও দিতেছেন। এত কর্ম্ম করাইয়াও যে ভগবান্ কারও বিদ্বেষের বা ক্ষোভের কারণ হন না—ইহার একমাত্র কারণ এই। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন তিনি! তাই তাঁহাকে আর বলিতে হয় না যে কাজ কর। মানুষ সেই অফুরন্ত আনন্দের উন্মাদনায় অফুরন্ত কাজ করিয়া যাইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদিগকেও এই কথাটী বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। কাজ করাইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীর প্রাণকে আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি কিনা—ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানুষকে আনন্দে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে না পারিলে মেসিন যেমন কাজ করিয়া যায়, তেমনি সজীব মানুষও কেবল আদেশের চাপে মেসিনের মত হইয়া উঠে। মানুষকে যাহারা নিছক মেসিন করিয়া তুলিতে চায়—তাহাদের স্বার্থটাই সব চেয়ে বড়। মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই ওদের! মানুষকে খাটাইতে পারে অনেকেই, কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাও অনেকের থাকে, কিন্তু মানুষের প্রাণকে আনন্দে উৎফুল্ল করিবার শক্তি খুব অল্প লোকেরই আছে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বা গুণ না থাকিলে একজন মানুষ সকলকে সমান ভাবে সন্তুষ্ট পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না।

* *

অন্তরের সব কথাই যদি প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে কত অসংলগ্ন, অপুষ্ট চিন্তাও তাহার মাঝে রহিয়াছে। সংগ্রাম সর্ব্বত্রই রহিয়াছে—চিন্তা ভাবনার মাঝেও অসংখ্য সংঘর্ষ উপস্থিত হয়! বলবানের জয় হয়, দুর্ব্বল মরে গিয়ে বলবানের পথকে নিষ্কণ্টক সহজ অনায়াস করিয়া তুলে। আমগাছে দেখি অনেক মুকুল আসে, কিন্তু তাদের মাঝে টিকে কয়টী, আর সেই মুকুলের মধ্যে কয়টীই বা ফলে পরিণত হয়? অনেক ব্যর্থ চিন্তাও করিতে হয়, কিন্তু সেই ব্যর্থ চিন্তা প্রকাশ যোগ্য নয়। অনেক সংঘর্ষ অনেক বিপ্লবের পরও যাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহাই প্রকৃত অস্তিত্ববান্। যৌবনের প্রথমাবস্থায় কল্পনা বা ভাবুকতার অজস্র মুকুল ফুটিয়া উঠে—কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব খুবই ক্ষণস্থায়ী। অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমরা যে মতটী প্রকাশ করি,

সেই মত সুদৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পাগলের কথায় কান দেয় না কেন মানুষ—তাহাও তো আভ্যন্তরীণ চিন্তারই অভিব্যক্তি! চিন্তা হইলেও তাহা আবোল তাবোল চিন্তা—এই জন্যই তার প্রতি মানুষের উপেক্ষা। কথা বলিবার সময়, লিখিবার সময় সর্ব্বত্রই যাচাই করিবার ক্ষমতা এবং সংযম শক্তি এই দুটো জিনিষ থাকা চাই।

* *

গীতায় নিরাসক্তকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ মানুষ যখন যে বিষয়ে মজে, তখন আর তাহাদের বিপরীত চিন্তাটা মোটেই জাগ্রত সুস্পষ্ট থাকে না। এইজন্যই আঘাত সহ্য করিতে গিয়া তাহারা মুহ্যমান হইয়া পড়ে। যাজ্ঞবল্ক্য দু'জন স্ত্রীকে নিয়া ঘর করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘর করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছাড়িবার সঙ্কল্পটাও তাঁহার মাঝে ছিল। এইজন্যই কর্ত্তব্য শেষ হওয়া মাত্র এক মুহূর্ত্তের দরুণও অপেক্ষা করিলেন না তিনি। তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সংসার করিবার প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সংসার ছাড়িবার প্রবৃত্তিকেও মনে সমান ভাবে স্থান দিয়া রাখিতে হইবে। প্রয়োজন বুঝিয়া উভয়ের প্রয়োগ করিতে হইবে। সংসারী মানুষ সংসারটাকেই চরম মনে করে। বহুপূর্ব্বে সংসারীদের বানপ্রস্থ অবলম্বনের নিয়ম ছিল। সে কঠোরতা অনেক দিন হয় লোপ পাইয়াছে। তাহার পরেও দেখা যায় কাশীবাসের ব্যবস্থা। সংসারের কর্ত্তব্য যখন শেষ হইল, তখন আত্ম-চিন্তায় বাকী কয়টা দিন নির্জ্জনে কাটানো! কিন্তু এখন দেখিতেছি সব উঠিয়া গিয়া সংসারটাই চরম হইয়া উঠিয়াছে। আজীবন ভোগ চাই ইহা অসংযমীর কথা। ত্যাগে-ভোগেই মানুষের জীবন পূর্ণ। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের মর্ম্মও ইহাই!

বৈশিষ্ট্যের কথা

শ্রদ্ধা জোর করে আদায় করা যায় না হীরেন! এইজন্যই হৃদয় যাকে মানতে চায় না, জোর করে তাকে মানাতে যাওয়ার মত পাপ বা দুর্ব্বলতা আর নাই। তোর অধীনে না এসেও তোকে শ্রদ্ধা করে—এরূপ কেউ আছে বা থাকতে পারে এ কথা তুই বিশ্বাস করিস্? আমার মনে হয়, তুই যেখানটায় জোর দিতে চাস বেশী, সেখানটাই ঢিল দেওয়া বা নিরপেক্ষ উদার থাকাই তোর পক্ষে ইষ্টসিদ্ধির নিগূঢ় সঙ্কেত। সত্যি কথা বলতে গেলে, তুই নিজেই মানুষকে তোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলিস্। কাজেই অভিমানটা বাইরে না করে কোথায় তোর আসল গলদ তা নিজে নিজে বুঝবার চেষ্টা কর।

হীরেন।—আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী, আমার মতানুয়ায়ী যে নাকি না চল্‌ল, তার যে আমার প্রতি শ্রদ্ধা আছে তার নিদর্শন কি? আমাকে যে ভালবাসে, আমাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে আমার অনুগত না হয়ে যে

পারবেই না। আমি যাদের বলি আমার নির্দ্দেশে চলতে, তাদের কোন অমঙ্গল বা অহিত করে তো আমি নির্দ্দেশ দিই না। যারা আমাকে মানে না, আমার প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নাই, তারাতো আমায় প্রতি পদে পদে অবজ্ঞা করেই চল্‌ল। রমেশ দা, তুমি কি বলতে চাও, এ সব সয়ে যাওয়াও মহত্ত্বের লক্ষণ ? আমি তো বলি, সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিকারের বিধান না কর্‌লে ওদেরও হিত হবে না, আমারও আত্ম-সম্মানের লাঘব হয় এতে।

রমেশ দা।—অনুগত বলতে তুই যা বুঝেছিস হীরেন, আমার মনে হয়, ওখানেই মস্ত বড় একটা ভুল রয়েছে তোর। তোর অধীনে বা তোর শাসনে না থেকেও, কিম্বা তোর সঙ্গে মতদ্বৈধ থাকলেও—যথার্থ ই যদি তোর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে, তাহলে পৃথক হয়েও তোকে সম্মান কর্‌তে পারে এমন লোক আছে। অপরের উপর সব সময় সবক্ষেত্রে জোর খাটানো যায় না—এতে নিজেকে অপমানিত মনে করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠার মত দুর্ব্বলতা আর নাই। তোকে ভালবাসলেই যে তোর অনুগত হয়ে চলতে হবে, তার কি মানে আছে ? ভালবাসা জিনিষটা কি সমানে সমানে হতে পারে না ? যে কোন দিক্ দিয়েই হোক তোর যদি একটা খাঁটি বৈশিষ্ট্য প্রকৃতই থেকে থাকে, তাহলে এই বৈশিষ্ট্য দ্বারাই লোক আকৃষ্ট হবে তোর প্রতি। মানা না-মানা নিয়ে যারা বেশী মাথা ঘামায়, তাদের প্রতি পদে পদে অপমানিতই হতে হয়। আমার মনে হয় পূর্ব্বের মত আত্ম বিশ্বাস নেই তোর, এইজন্যই নিজেরই দৈন্যে নিজে ক্ষুব্ধ হয়ে অপরের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে অবিচার করে বসিস্।

একের ধ্যানে মন নিরস-অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠবে বলেই বিধাতা বৈচিত্র্যকে এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রত্যেকের জীবন আপন বৈশিষ্ট্যের উপর শতদলের ন্যায় ফুটে উঠুক—ভগবান এই সৌন্দর্য্যই দেখতে চান। এইজন্যই প্রত্যেকের ভিতর একটা না একটা বিশেষত্বের উপাদান দিয়েই জীব সৃষ্টি করেছেন ভগবান। তুই দেখ্‌ছি ভগবানের উপরও অবিচার কর্‌তে চাস্। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও ঐক্যসূত্রে আমাদের জীবন গ্রথিত হয়ে উঠতে পারে।

শুধু নির্দ্দেশ দিয়ে মানুষের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারা যায় না—যদি না প্রাণের সংমিশ্রণ হয় তাতে। ধর্ম্মপুস্তকে অনেক নির্দ্দেশই রয়েছে, কিন্তু তাতে প্রাণের যোগাযোগ নেই বলে, জেনে শুনেও সেই নির্দ্দেশে তেমনভাবে প্রাণটা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে না। তোর গলদ আমি এখানেই দেখ্‌তে পাচ্ছি বেশী। তোর প্রাণে আগেকার সেই ঔদার্য্য আর নেই। মানুষকে কিদিলে, মানুষ কি পেলে, স্বেচ্ছায় অপরের নির্দ্দেশকে মেনে চলতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে, সেদিকে তোর কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই।

'আমাকেকেন মেনে চলে না ওরা'—এই কথা বলে যাতে তোকে ওরা না মানে তারই রাস্তা প্রশস্ত করে দিস্ তুই। অথচ এই সহজ কথাটা বুঝতেই আজ তোর মাথা ঘুলিয়ে যায়।

হীরেন। —তাহলে তোমার কথায় দেখ্ছি রমেশদা, সকলকেই ছেড়ে দিতে হবে। যার যার স্বাধীনতা নিয়ে সবাই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠুক এই তোমার ইচ্ছা! এই ভাবে কি মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কর্‌তে পারে?

রমেশ দা। —এই তো তুই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিস্! সবকে ছেড়ে দিতে তোকে কে বল্‌লে! আমি তোকেই বল্‌ছি, সম্মানের দাবী না করে সম্মানের যোগ্য হয়ে উঠ্! তারপর সকলের দরুণ এক ব্যবস্থাই বা মঙ্গলজনক হবে কেন? পাঁচজনের মাঝ থেকেই কেউ যদি সত্যিকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঁচজনকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চায়, তাহলে তার প্রতি নিয়মের ব্যতিক্রম কর্‌তে হবে বৈ কি? এ জায়গায় যদি তোর বাধে, তাহলে বুঝ্‌ব কোথায়ও না কোথায়ও তোর স্বার্থপরতা বা দুর্ব্বলতা রয়েছে।

একটা বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির সময় এক ধরণের কতকগুলি মানুষের প্রয়োজন হয়। সেখানে প্রয়োজনটাই বড়, সুতরাং বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য দেওয়া চলে না সেখানে! কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে যদি বৈশিষ্ট্য জিনিষটীকে উপেক্ষা করে চলে মানুষ, তাহলে বুঝ্‌ব প্রয়োজনের আর একটা দিক্ সম্বন্ধে সম্পূর্ণই সে অন্ধ! সকলের ধাত সমান নয়, সকলে সমানভাবে sensitiveও নয়, কাজেই স্বাধীন হয়ে যে তোর স্বাধীনতা দেবার শক্তিকে শ্রদ্ধা করে, সে কি প্রকারান্তরে তোরই শ্রদ্ধা কর্‌ল না?

স্বাধীন মত বা স্বাধীন ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেও পরস্পরের মাঝে শ্রদ্ধার আদান-প্রদান চল্‌তে পারে একথা কি তুই বিশ্বাস করিস্ না হীরেন? ধর না বড় বড় মণীষীদের কথা—যেমন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রোঁমারোলা। এই সেদিনও গান্ধী আর রোঁমারোলাতে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের মাঝে কি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের ভাব ফুটে উঠেছিল! অথচ মতের দিক্ দিয়ে, ভাবের দিক দিয়ে হয়ত পরস্পরের মাঝে অনেক জায়গায় বিভিন্নতা রয়েছে। এই পার্থক্য নিয়েও পরস্পরের বৈশিষ্ট্যে পরস্পর মুগ্ধ! এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর মত না হতে পার্‌লেও, গান্ধী তাঁকে প্রাণ দিয়েই ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন; তেমনি গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের মত হতে পারেন নি বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা কর্‌তে বা ভালবাস্‌তে কসুর করেন না। আসল কথা যথার্থ বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

তোর অধীনে থেকে যারা তোকে শ্রদ্ধা কর্‌ছে বলিস্, তার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করে তোকে এমন কেউ কেউ আছে। অবশ্য

তারা তোর অধীনে নাই এখন। তাদের স্বাধীনতা দিয়েই তুই সম্মানের পাত্র হয়েছিস তাদের কাছে! কাছে থেকে যারা তোকে অশ্রদ্ধা করে বলিস, স্বাধীনতা দিলে হয়ত সেই স্বাধীনতা পাবার আনন্দেই তোর প্রতি আবার তাদের চিত্ত সশ্রদ্ধ হতে পারে। কথাটা অবশ্য সকলের দরুণ নয়। আসল কথা, তুই উদার হয়ে যা, উপযুক্ত অধিকারী বুঝে ব্যবস্থা কর্, তাহলেই দেখ্‌বি শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের কোথায়ও অভাব হবে না। তুই যা চাস্, তার বিরোধী তুই নিজেই! এখন চল্‌লাম, কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেল! আর একদিন এ নিয়ে তোর সঙ্গে আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা রইল।

'আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্টং প্রাপয়তীতি'

আচার্য্য হইতে বিদ্যালাভ করিলেই তাহা কল্যাণতম হয়। উপনিষদে সত্যকামের গুরু কৃপা লাভের কথাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সত্য কামের গুরু-ভক্তি ও তপস্যায় নিখিল প্রকৃতি তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়াছিল, এই জন্যই গুরুর আদেশে চারিশত গরুকে লইয়া বনে যখন সত্যকাম তাহাদের লালন পালন করিত, তখন তাহাদের ভিতরই (বৃষের ভিতর) যে বৃষটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিল তাহাতে বায়ু দেবতা প্রবেশ করিয়া সত্যকামকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সত্যকামের শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া ক্রমান্বয়ে বৃষ, অগ্নি, হংস এবং মদ্‌গু ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

যথার্থ শ্রদ্ধার যখন উন্মেষ হয়, তখন সমস্ত প্রকৃতি সাধকের অনুকূল স্বরূপ হয়। সত্যকামের ভিতর যথার্থ শ্রদ্ধার উন্মেষ হইয়াছিল, এই জন্যই অনাহূত উপদেষ্টা তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

সত্যকাম নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ হাজার গরু লইয়া যখন গুরু গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহাকে দেখিয়াই আচার্য্য গৌতম বলিয়া উঠিলেন—"হে সৌম্য! তোমার যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে। কে তোমাকে অনুশাসন করিলেন?"

সত্যকাম বিনয় নম্র বচনে উত্তর করিল—"হাঁ ভগবান,আমি অনুশাসন লাভ করিয়াছি। কিন্তু—অন্যেভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ। কোনও মানুষের নিকট হইতে আমি শিক্ষা লাভ করি নাই। দেবতাগণ আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এখন আমার প্রার্থনা, ভগবান, আপনি নিজে আমাকে সমস্ত তত্ত্ব খুলিয়া বলুন।"

এই জায়গায় একটী নিগূঢ় তাৎপর্য্য রহিয়াছে। গুরুবাক্যই যে বেদবাক্য—সত্যকামের শ্রদ্ধায় তাহা সবিশেষরূপে প্রমাণিত হইল। দেবতাদের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়াও সত্যকামের সুদৃঢ় প্রত্যয় হইল না। গুরুর বাক্যে সত্য

প্রমাণ না হইলে দেবতাদের উপদিষ্ট জ্ঞানকেও সত্যকাম বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই মানুষ গুরু গৌতমের মুখ হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিয়া নিঃসংশয় হইবার জন্য সত্যকামের এইরূপ আকুলতা!

বেদ-বেদান্ত জানিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। একমাত্র গুরুনিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান উপজিত হয়। দেবতাদিগের উপদেশকে সত্যকাম অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করে নাই, কিন্তু সত্যকাম যে মানুষ গুরু গৌতমকেই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া রাখিয়াছে! কাজেই প্রত্যক্ষ গুরুর মুখ হইতে কিছু না শুনিলে তো তাহার প্রত্যয় জন্মিতে পারে না।

বৃষ, অগ্নি, হংস এবং মদ্গু সত্যকামকে যথার্থ উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশে সত্যকামের হৃদয় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্যই—'মানুষের নিকট হইতে আমি শিক্ষালাভ করি নাই' —এই কথাটী সত্যকামের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল।

মানুষগুরুর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। বেদ বেদান্ত পড়িয়া সকল প্রশ্নের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। গুরুর মুখ হইতে নিঃসৃত একটী বাণীতে জীবনের সকল প্রশ্নের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে পারে। মানুষ যদি মানুষের কাছ হইতে অভিজ্ঞতা, শক্তিলাভ না করে, তাহা হইলে অপর কিছুতেই তাহাকে শক্তিবন্ত করিয়া তুলিতে পারে না। বেদ বেদান্ত বাণী উদ্দীপনাময়ী—কিন্তু সেই বাণী যে যথার্থ, তাহা যদি কোন মানুষ গুরুর অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে তো হৃদয়ের সংশয় নিরসন হইবে না কিছুতেই! সত্যকামে ও হৃদয়ের সংশয় এইজন্যই কেবল দেবতাদিগের নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিরসন হয় নাই।

মানুষকে নিঃসংশয় করিতে পারে মানুষই। বিবেকানন্দ যখন সংশয়ে জর্জ্জরিত হইয়া ভগবান লাভের আকুলতা লইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন এই মানুষ-রূপী গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই। মানুষরূপী গুরুর অভয় বাণীতেই বিবেকানন্দের ভিতর বেদান্তের ভাব মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শাস্ত্রে অনেক উপদেশই লেখা থাকে, কিন্তু সেই উপদেশানুযায়ী চলিতে গিয়া সাধককে যে-সব দ্বন্দ্বের মাঝে পড়িতে হয়, তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় সাক্ষাৎ গুরু ভিন্ন অন্য কেহই বলিয়া দিতে পারে না। গুরুর আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় এইজন্যই। সাধন-ভজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুস্তকের নাই—আছে মানুষের। সেইজন্য মানুষই মানুষের সত্যপথের দিশারী।

নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রাণপাতী বিশ্বাস থাকিলে কেহই তাহাকে ছলনা দ্বারা বিপথে লইয়া যাইতে পারে না। সত্যকামকে দেবতারা যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অসত্য ছিল না, কিন্তু তাহা হইলেও মানুষ-গুরুর নিকট হইতে সেই উপদেশের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যকাম প্রাণে পরিপূর্ণভাবে বল অনুভব করে নাই। সত্যকামের আচার্যদেব যখন সত্যকামকে দেবতাগণ প্রদত্ত সেই উপদেশই প্রদান করিলেন, তখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহও তাঁহার রহিল না। শেষ যেটুকু সংশয় ছিল, তাহা নিবারিত হইল সাক্ষাৎ গুরুর উপদেশে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, আচার্য্য হইতে বিদ্যালাভ করিলেই তাহা সবিশেষ কল্যাণপ্রদ হয়।

আসল কথা হইল শ্রদ্ধা। ঠিক ঠিক শ্রদ্ধার উন্মেষ হইলে তাহাকে সত্যপথে প্রচোদিত করিবার দরুণ অনেক সাহায্যকারী আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সত্যকাম দেবতাগণকে ডাকিয়া আনে নাই, তাহার শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইয়া দেবতাগণ স্বয়ং অযাচিত ভাবে সত্যকামকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। গুরুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা আসিলে, গুরুই আসিয়া প্রতি পদে পদে শিষ্যকে রক্ষা করেন। তখন সাক্ষাৎ গুরুবাক্য এবং নিজের অন্তরের উপলব্ধিতে কোন পার্থক্য থাকে না।

ভগবানের চেয়েও মানুষ বড় এই দিক দিয়া যে, মানুষই মানুষকে বলে—ভগবান আছেন। কিম্বা আরও একটু অগ্রসর হইয়া সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে—মানুষ যে ভগবান, তাহা মানুষই বলিতে পারে। কাজেই সবার চেয়ে সেরা মানুষই। আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত হইতে হইলে সাক্ষাৎ গুরুর নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়াই চলিতে হয়।

গুরু স্বীকার করাকে অনেকেই দাসমনোবৃত্তির পরিচয় বলিয়া থাকে, কিন্তু এই দাস মনোবৃত্তি লইয়াই দেখি মানুষ সত্যপথের সন্ধান পায়। শাস্ত্র হইতে উপদেশ পাইয়াও আমাদের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়। ভগবান যে আছেন তাহা শাস্ত্রে পুরাণেও বর্ণিত আছে—কিন্তু মানুষগুরুর অভয় বাণীতে যেন প্রাণে দ্বিগুণ বল আসে। রামকৃষ্ণদেব যখন বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, যে "হাঁ, ভগবান আছেন, তাঁহাকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তুমিও করিতে পার"—তখন যেন বিবেকানন্দের প্রাণে অসীম বল আসিল, আশাতীত আশার সঞ্চার হইল। এই যে আশাতীত বল—ইহা তো কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া পাওয়া যায় না। মানুষের প্রাণ হইতে যে প্রাণের সঞ্চার হয়, সেই প্রাণের শক্তি অসীম। সেই প্রাণ সঞ্চার বা শক্তি সঞ্চার দ্বারাই মানুষ উপলব্ধি করে—"হাঁ, আমি কিছু পাইয়াছি"। এইরূপ একটা দৃঢ় ভিত্তির সন্ধান পাইলেই মানুষ নির্ভয় হয়, বিগতশোক হইয়া যায়। গীতার এই অবস্থা লাভ হয়—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" জীবনে এইরূপ একটা সুদৃঢ় ভিত্তি না পাইলে কোন কথাতেই জোর আসে না, কোন কর্ম্মেই প্রাণ ঢালিয়া দিবার উন্মাদনা আসে না, ত্যাগ করিবার অজস্র ক্ষমতা আয়ত্ত হয় না, এক কথায় বলিতে গেলে প্রকৃত মনুষ্যত্বেরই উন্মেষ হয় না!

প্রকৃত বিশ্বাস আসিলে—দেবতা-মানুষ সকলেই সাহায্যকারীরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানুষও উপেক্ষার বস্তু হয় না, দেবতাও না! বিশ্বাসের অভাব হইয়াছে আমাদের, এই জন্যই মানুষকে করি অবজ্ঞা, আর দেবতাদিগের নিকট হই প্রবঞ্চিত! ঋষিদের মাঝে এই শ্রদ্ধারই আধিক্য দেখা যায়। এই জন্যই তাঁহাদের হৃদয় আস্তিক্যানুভূতিতে সর্ব্বদা উল্লসিত ছিল। তাঁহাদের সেই সরল বিশ্বাসের বাণী দ্বারাই কত বর্ষ পরে আজও আমাদের প্রাণ আশ্চর্য্যরূপে উদ্বোধিত হইয়া উঠে।

শ্রদ্ধাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। শিষ্যের মাঝে শ্রদ্ধার উন্মেষ হইলে গুরুও তাহার শ্রদ্ধার প্রতি সশ্রদ্ধ হন। সত্যকামের শ্রদ্ধা দেখিয়া তাহার গুরুও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন—'হে সৌম্য! তুমি যে ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ।'

শ্রদ্ধায় মানুষকে বিনয়ী করে। আস্তিক্য বুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে। এই জন্যই মানুষরূপী গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবানের অমন অচল-অটল বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসের দ্বারাই জগতে অসাধ্য সাধন হইয়াছে। সংশয়ী জগৎ হিত দূরে থাকুক—নিজেরই কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। গীতায় বলা হইয়াছে—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।'

গুরুপরম্পরায় এই শক্তিই সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে। মানুষরূপী গুরুর সন্নিধান হইতে এই বজ্রদৃঢ় বিশ্বাসের বল পাইয়াই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত হইয়াছে। প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকেও এইজন্যই মানুষগুরু কেশব ভারতীর আশ্রয় নিতে হইয়াছিল।

পুঁথি পুস্তকের উপদেশ দ্বারাও সাময়িক আমরা উদ্বুদ্ধ হই, কিন্তু সদ্‌গুরুর এক একটী কথা যেমন প্রাণে গিয়া বাজে তেমন আর কিছুতেই হয় না। মানুষের কথায় প্রাণে যেমন বল পাই, পুস্তকের কথায় কি ঠিক তেমন বল আসে প্রাণে? কতকগুলি ভাল চিন্তা বা ভাল ভাব জানা থাকিলেই হইল না। পুঁথি-পুস্তক হইতে আমরা বিচিত্র উপদেশই পাইয়া থাকি, কিন্তু সদ্‌গুরু ছাড়া কেহই বলিয়া দিতে পারে না, কোন্ উপদেশ আমাদের পক্ষে ঠিক ঠিক যথার্থ হিতকারী হইবে। এইজন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে—সাক্ষাৎগুরুর নিকট হইতে যে উপদেশ লাভ করা যায়, তাহাই সকলের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী এবং কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে।

দোল

দোদুল দোল দোদুল দোল !
চিত্তেরে আজি অনুরাগ রাগে রাঙিয়ে তোল।
দুলিছে বিশ্ব মহা আন্দোলনে
আনন্দ-সঙ্গীত উঠেছে গগনে
আকাশ বাতাস আলোড়িত করি
উঠিছে আনন্দ রোল,
দোদুল দোল।
দোদুল দোল দোদুল দোল !
দুঃখের স্মৃতি ব্যথার বেদন সকলি ভোল্।
জড় কোথা আর সবি যে চেতন,
প্রকৃতি পুরুষে অভেদ মিলন ;
চলেছে শুধু এ নিত্য লীলায়
আনন্দ-হিল্লোল,
দোদুল দোল।

উত্তম অধিকারী কে?

ইন্দ্রিয়াতীতের প্রামাণ্য আপ্তশ্রুতি ছাড়া সিদ্ধ হয় কই? ইন্দ্রিয়ের মোহ যতদিন না টুটছে, ততদিন ইন্দ্রিয়জয়ী আপ্তের বাক্যে নির্ভর করা ছাড়া আমার উন্নতির উপায় আর কি আছে? ঠিক না বুঝলে পরিতৃপ্তি নাই, কাজেই আমারই গরজে আমি বুঝতে চাই। অতএব যিনি বুঝেছেন, তিনি ছাড়া নিকট আত্মীয় আমার কে হবে?

ব্রহ্মকে জান্‌তে হবে, তার উপায় ত্রিবিধ—শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। উচ্চ অধিকারীর শ্রবণ মাত্রেই অনুভব। যাঁদের চিত্ত শুদ্ধ, আপ্ত-শ্রুতিতেই তাঁদের কাজ চলে যায়। কিন্তু আমরা অধিকাংশই এখন নিম্নাধিকারী—কাজেই বিশ্বাস কম। এইজন্যই শ্রবণ মাত্র আমাদের অনুভবও হয় না, অথচ এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থাও নাই। আপ্তের মুখে শুন্‌তে হবে, মনকে বিশ্বাস করাতে হবে—তার জন্য তর্কবাদ আশ্রয় কর ক্ষতি নাই, কিন্তু আপ্তবচন খণ্ডনের জন্য তর্কবাদের প্রতিগ্রহ করো না। অনুভূতির বাক্যই প্রধান—তর্কবাদ-পরের কথা।

বিশ্বাস পরায়ণই কিন্তু উত্তম অধিকারী—কেননা শ্রুতিমাত্রেই তাদের চিত্তে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অখণ্ডাকার বৃত্তি অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হতে থাকে। সংশয় এসেও যাঁদের চিত্তের এই স্থিতি প্রবাহকে বিনষ্ট করতে পারে না, তাঁরাই উত্তম অধিকারী।

প্রজ্ঞামান্দ্যং ভবেদ্ যেষাং তেষাং ন শ্রুতিমাত্রতঃ।
স্যাদখণ্ডাকার বৃত্তির্বিনা তু মননাদিনা॥

যাদের প্রজ্ঞা মন্দ, অর্থাৎ যারা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, তাদের মনন ব্যতীত কেবল শ্রবণ মাত্রেই অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তাদের অধিকার আরও একটু নিম্নে হল।

আজকালকার বিজ্ঞদের ভাষায় বলতে গেলে শ্রবণ মাত্রই যাদের অখণ্ডাকার বৃত্তিপ্রবাহ চলতে থাকে, তারাই অধম অধিকারী, তাদের মাঝে slave mentality আছে। গুরুবাক্য শ্রবণ মাত্র এইজন্যই তারা এত সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে। অথচ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় কুশাগ্র বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিও কিন্তু শ্রবণমাত্র যাঁদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে যায়, তাদেরই প্রথম অধিকারীর স্থান দিয়েছেন।

বৈদিক যুগটা ছিল বিশ্বাসের যুগ। এইজন্যই শ্রবণ মাত্রই তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ ক্রমশঃ যখন অবিশ্বাসী হয়ে উঠল, তখন থেকেই তর্ক বা মনন শাস্ত্রের উদ্ভব হল। আজকালকার মনীষীরা এই মননকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। বিশ্বাসহারা হয়ে তর্কযুক্তির পথে যতই কেন অগ্রসর হই না আমরা, তাতে নিজের কিম্বা দেশের কারও যথার্থ হিতের আশা নাই। এইজন্যই এত সব মননশীল থাক্‌তেও আমাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হচ্ছে না কিছুতেই। তারপর মননের প্রণালীর মাঝেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বেদান্তবাক্যের অনুকূল যুক্তি দ্বারা গুরুমুখ হতে শ্রুত অদ্বিতীয় ব্যাপক ব্রহ্মের চিন্তা করাকেই পণ্ডিতেরা মনন বলে থাকেন। এই মননই শ্রুত পদার্থের সাক্ষাৎকারের হেতু। আজকালকার মনন কি আমরা ঋষি প্রদর্শিত পন্থায় করি? আমরা সহজে তার্কিক হয়ে উঠি,

কিন্তু যথার্থ মননশীল হতে পারি না। কাজেই আমরা যে উন্নতি উন্নতি বলে চিৎকার করছি, তা কি যথার্থই উন্নতির লক্ষণ? প্রজ্ঞামান্দ্য হয়েছে বলেই যে আমাদের জন্য মহাপুরুষদের এত ভাষ্য টীকা টীপ্পনীর সৃষ্টি করতে হচ্ছে, তা ভুলে গেলে চলবে না। সহজ কথাকে সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করাকেই বলি চিত্তের দুর্ব্বলতা, কিন্তু এই দুর্ব্বলতারই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজকাল বেশী। কেননা মানুষ শান্তি পাচ্ছে না কিছুতেই, সরল বিশ্বাসের স্থলে কূট বুদ্ধির স্থান দিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছে।

ক্রমশঃই আমরা জটিলতায় জড়িয়ে পড়ছি! এই জন্যই সহজ পথ ছেড়ে দিয়ে ন্যায় যুক্তির দিকটাই আমাদের বেশী আকর্ষণ করে। বুদ্ধির গ্রন্থি যতই জটিল হয়ে উঠ্‌ছে—সহজ কথাকে ততই আমরা অস্পষ্ট আচ্ছন্ন করে তুলছি। শেষে মূল হয়ে যাচ্ছে গৌণ, আর তর্কই হয়ে উঠ্‌ছে প্রবল! শ্রুতি মাত্রই যে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে না, তা আমাদের অধঃপতনেরই লক্ষণ। বুদ্ধি প্রজ্ঞা বিশারদ হলে তখন শ্রুতি মাত্রই বস্তুর তত্ত্ব অবধারিত হয়ে যায়। সংশয়প্রবণ হয়ে পড়েছি বলেই আমাদের চিত্তে কখনো অখণ্ডাকার বৃত্তি প্রবাহ চল্‌তে পারে না। এই জন্যই কোন বিষয় সম্বন্ধেই আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে না। শ্রুত পদার্থের অখণ্ডাকার বৃত্তিপ্রবাহই তৎ সাক্ষাৎকারের প্রধান হেতু। সংশয় দ্বারা আমাদের অখণ্ডাকার বৃত্তি প্রবাহ বাধিত হয়ে যায়।

তারপর আমাদের বুদ্ধিও শ্রুতি বিপ্রতিপন্ন। এই জন্যই যে মন-বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মকে অবধারণ করতে হবে, সে বুদ্ধিই ব্রহ্মজ্ঞানের কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়! বেদান্তবাক্যানুকূল যুক্তিতে কখনো আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে না, কিন্তু আমরা এই পথকে অবজ্ঞা করে চলেই সর্ব্বনাশের পথে পা বাড়াই।

বৈদিক ঋষিরা সরল বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে সব তত্ত্বসাক্ষাৎকার করেছিলেন, তা আমরা বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দ্বারা বুঝ্‌তে চাই, এই জন্যই বুঝ্‌তে গিয়ে সরলবাণীর কুটীল অর্থই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়! কেবল মাত্র বুদ্ধির স্ফুরণ দ্বারা প্রাণে শান্তি পাওয়া যায় কি-না, জাতির প্রাণ সুস্থ-সবল প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে কি-না, তাই বিচার করে দেখ্‌তে হবে। বুদ্ধির গ্রন্থি যতই জটিল হয়ে উঠ্‌ছে, ততই আমরা যুক্তির নেশায় অভিভূত হয়ে পড়ছি। কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ হলেও আমরা যেন দিন দিন উদ্যম উৎসাহ শূন্য হয়ে পড়ছি। দার্শনিক চিন্তায় আমাদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই উত্তপ্ত থাকে। যে চিন্তায় আমাদের মাঝে স্বাস্থ্যের সঞ্চার না হবে, প্রাণে বল না পাব, সে চিন্তা উন্নত চিন্তা হলেও, তাতে কোন কিছু এল গেল না। বরঞ্চ এদিক দিয়ে নিরক্ষর যারা, তাদেরই প্রাণশক্তির আশ্চর্য্য স্ফুরণ দেখে আমরা স্তব্ধ বিস্মিত হয়ে যাই! ক্রমেই নাকি আমরা উন্নতির দিকে চলছি, কিন্তু কেবল মাত্র বুদ্ধির উৎকর্ষকেই তো উন্নতি বলা যায় না! শিক্ষা লাভ করে সংশয়ই বেড়ে উঠ্‌ছে আমাদের, যে সব গুণ থাক্‌লে ভগবানের কৃপা অনুভব করা যায়, শিক্ষার ফলে সে সব গুণ আমাদের ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হয়ে চল্‌ছে। আমরা বড় বড় তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করি, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অতি ছোট খাটো বিষয়েরও সুষ্ঠু সমাধান করে উঠ্‌তে পারি না।

সব কথাকে ঘুরিয়ে জটিল করে তোলাকেই আমরা পাণ্ডিত্য মনে করি! কিন্তু আসল পাণ্ডিত্য

তাতে প্রকাশ পায় না। যাকে আমরা অধিগত করে ফেলি, তা যে সহজ ভাবে আমাদের সঙ্গে মিশে যায়। এইজন্যই যথার্থ পণ্ডিতের প্রকাশ করবার ভাষা অতীব সহজ সরল হয়ে ওঠে।

শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, এই দুর্লভ সম্পদগুলিকে হারিয়ে বসেছি বলেই শ্রবণ মাত্রই যে জ্ঞান হয়ে যেতে পারে, সে কথা আর বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু প্রাণে যথার্থ শান্তি পেতে হলে, ভগবানের কৃপা অনুভব করতে হলে, যথার্থ মনুষ্যত্বে উন্নীত হতে হলে, আবার আমাদের ঋষিদের ন্যায় সর্ব্ব কার্য্যে সরলপ্রাণ হতে হবে। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, এসব দৈবীগুণগুলিকেই আয়ত্ত করে নিতে হবে।

প্রশ্নের উত্তর

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ না হলে আত্মস্ফুরণ সম্ভবপর কিনা! আত্মস্ফুরণ আর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ একই কথা। আমার বিশ্বাস এবং সদ্‌গুরুও তাই বল্‌বেন, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য, গুরুও ব্যক্তিত্বের বিকাশই করে দিয়ে থাকেন। আমার অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকে তাঁর হৃদয়ের তাপে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন বলেই গুরুর গুরুত্ব! আধ্যাত্মিক সাধনার পথে ব্যক্তিত্বের অবরোধও যে কখনো প্রয়োজন হয় না, তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে চিরকাল অবরুদ্ধ করে রাখা কখনো সাধনার লক্ষ্য হতে পারে না। লক্ষ্য মুক্তি,—তোমার যে স্বভাব, সেই স্বভাবকে বিকশিত করে তোলা! যার ভিতর যে জিনিষ আছে, স্বচ্ছন্দে —মায়ের মত সন্তর্পণ শুশ্রূষায় তাকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে—এইখানে গুরুর কৃতিত্ব। আত্ম সমর্পণ করে গুরুর কাছে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে যে দেই, তাও এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের জন্যই—সন্তান যেমন মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তুমি একটী চারা গাছকে যত্ন করছ। গাছটী পেয়ারার, তুমি তাকে তালগাছ করবার চেষ্টা করবে কি? না তাকে পেয়ারা গাছ হতেই দিবে?

আমার আমিত্বকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারব, আমার সব রকম সাধ মিট্‌বে, শুধু মুক্তির পিপাসা যে চরিতার্থ হবে, তা নয়, আমার দেহ-মন বুদ্ধির যে স্বাভাবিক ও সুন্দর পরিণতি, সমস্তই অনায়াসে সাধিত হবে, এই আশাতেই আমরা গুরুর কাছে আত্ম সমর্পণ করি এবং গুরুও নিশ্চয়ই এইটুকু করতে পারবেন বলেই আমার ভার নিয়ে থাকেন। গুরু-শিষ্যের মাঝে এই সনাতন সম্পর্কটুকু কখনো নষ্ট হয় না। কিন্তু বাইরের উৎপাতে হয়ত এই সম্বন্ধের মাধুর্য্যটুকু বজায় থাকে না, তাইতে চিত্তের হাহাকারও আর মিট্‌তে চায় না। সে জন্য কাউকে দায়ী করে লাভ নেই। সত্য তোমার লক্ষ্য —আর তোমার সত্য তোমার হৃদয়ে, আমি তোমায় তার সন্ধান মাত্র বলে দিতে পারি, কিন্তু তোমার মাঝে নূতন সত্যের সৃষ্টি করতে পারি না; কেননা সত্য শাশ্বত বস্তু, তা কারুর মন গড়া সৃষ্টি নয়। এই সত্যকে ফুটিয়ে তুল্‌বার জন্য তুমি যাই কর না কেন, সরল চিত্তে প্রাণের

ব্যাকুলতায় যে পথই অবলম্বন কর না কেন, সদ্‌গুরু কখনও তোমার সাধনার পরিপন্থী হবেন না, হতে পারেন না, তাঁর অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডার হতে তিনি তোমার পথের পাথেয়ই জুটিয়ে দেবেন। সুতরাং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কর্‌তে পার্‌লে গুরু শিষ্যের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলে আত্ম বিকাশের আনুকূল্যই কর্‌বেন।

প্রাণ ঢেলে সেই সত্য বস্তুকে চাইতে হবে, তারজন্য পাগল হতে হবে, সত্য স্বরূপ তোমার বুকে বসে তোমায় পথ দেখিয়ে দেবেন।

সাধুত্ব with policy কখনো সত্য পথ হতে পারে না। যেখানে policy আছে, সেখানে নিশ্চয়ই ছলনা আছে, সহজ সরল বিশ্বাস সেখানে নাই। সাধু ভগবন্নিষ্ঠ, অতএব তাঁর সমস্ত আচরণ সহজ, উদার, উন্মুক্ত। তাঁর কর্ম্ম ভগবানের প্রেরণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তিনি কর্ম্মের ফল সম্বন্ধে নির্ব্বিকার। এই গুণগুলি থাক্‌লে সাধু হওয়া যায়, আর তুমি জীবনে practically এই গুণগুলির অনুশীলন কর্‌বার চেষ্টা করে দেখ, কিছুতেই তুমি policyবাজ হতে পার্‌ছ না! Policy মানেই কুটিলতা। কেন কুটিলতা? সহজ পথ থাক্‌তে বাঁকা পথে চলা কেন? না ভগবানের ওপর বিশ্বাস নাই। আমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, মন ফললুব্ধ; অহমিকায় স্ফীত আমরা, অথচ বাস্তবিক আমরা শক্তিহীন। বিবেকানন্দের একটা কথা আছে—"চালাকী দ্বারা কখনো কোন মহৎ কাজ হয় না।" সুতরাং সাধুত্ব with policy কখনো সত্য পথ হতে পারে না।

বিবেকানন্দের ভিতর, গিরীশ ঘোষের ভিতর যে শক্তি, যে বীজ সুপ্ত—অস্ফুট ছিল, রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে তারই সম্পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল মাত্র। কাজেই মহাপুরুষদের সংস্পর্শে ব্যক্তিত্বের লোপ হয় না, বরঞ্চ তা আরও সুন্দর-সংযত সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ফুটে ওঠে। যার ভিতর যা আছে, তাকে ফুটিয়ে তুল্‌বার সাহায্য করেন যিনি তিনিই গুরু। আর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা গুরু এইটুকুই ধর্‌তে পারেন। আমরা মানুষের স্বভাব—মানুষের ভিতর যে বীজ লুক্কায়িত রয়েছে তা ধর্‌তে পারি না, এই জন্যই আমরা অপরকে যথার্থভাবে সাহায্য কর্‌তেও পারি না। কিন্তু গুরু অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করে, যে দিকে তার উন্নতি হবার আশা সেই দিকটাতেই জোর দেন বেশী। পাখী যেমন বুকের তাপে ডিম থেকে তার বাচ্চাকে ফুটিয়ে তোলে, সদ্‌গুরুও স্নেহ দ্বারা, নিজের আধ্যাত্মিক প্রভাব দ্বারা, শিষ্যের ভিতর যথার্থ যে ভাব রয়েছে অথচ এখনো তা অপরিস্ফুট, তাকেই ফুটিয়ে তুলেন মাত্র। ব্যক্তিত্বের ভাবানুযায়ী সাধন প্রক্রিয়া বলে দিতে পার্‌লে তাতে কাজ হয় বেশী।

স্বেচ্ছাচারী কখনো আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌তে পারে না। গুরুর আশ্রয়ে সকল দিক দিয়ে সংযত হয়ে, শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জ্জন করে, মনের একাগ্রতা শক্তি বাড়িয়ে, আমরা সেই আত্মজ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকি। জোর করে অপরের মাঝে নূতন ভাবের সঞ্চার কর্‌লে অনেক ক্ষেত্রে তাতে ক্ষতিই হয়ে থাকে, এর চেয়ে স্ব স্ব ভাবানুযায়ী ভাব বিকাশের পন্থা বলে দিলে কাজও হয় দ্রুত এবং তাতে পতনাশঙ্কাও কম!

তুমি-আমি নিজের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের পথ অবগত নই। তাই গুরুর নির্দ্দেশে প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুল্‌তে হলে বিলাসের পথ না ধরে সংযমের পথই ধর্‌তে হয়। শিষ্য যথার্থ জ্ঞানী হোক, গুরুর এই আন্তরিক অভিলাষ! সন্ন্যাস দেবার সময় গুরু যে মন্ত্র বলেন, তার মর্ম্মার্থই হল— "আমি মুক্ত—সেই মুক্তির সন্ধান জান্‌বার দরুণই

আমার আশ্রয় নিয়েছিলে, ঐকান্তিক নিষ্ঠায় শ্রদ্ধায় আজ তুমি সেই সঙ্কেত জানতে পেরেছ, সুতরাং তুমিও মুক্ত, আমিও মুক্ত।" এর মধ্যে কোথায়ও তো ব্যক্তিত্বকে চেপে রাখ্‌বার কথা নেই!

আত্মাভিমান বা গর্ব্ব নিয়ে নিজকে জানা যায় না, এই জন্যই সদ্‌গুরুতে আত্ম সমর্পণ করে নিজকে জানার পথ সুগম হয়। শ্বেতকেতুকে তাঁর গুরু 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য বলেছিলেন। কিন্তু শ্বেতকেতু প্রথমবার উপদেশেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, বারংবার শ্রবণের পর হঠাৎ তাঁর ভিতর আত্ম জাগরণ হল, তখন তিনি 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। গুরুর কাছে আশ্রয় নওয়া, গুরুর নির্দ্দেশ মেনে চলা, সেই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হবার দরুণই! আমি কি, গুরু তাই আমাকে বুঝিয়ে দেন।

প্রভুত্ব করা, আর শিষ্যের ভিতর যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ করা এক কথা নয়। শিষ্যের আত্মজাগরণকে যে গুরু ভয় করেন, নিশ্চয়ই তাঁর মাঝে গলদ রয়েছে। যে কোন ভাবেই হোক্ না কেন, সত্যের সন্ধান পেলে কোন বিরোধ থাকে না। আপন ব্যক্তিত্বের ভাবানুযায়ীই যদি কেউ সত্যের সন্ধান পায়, তাহলে তোমার ব্যক্তিত্বের ভাবের সঙ্গে মিলন হল না বলেই তাতে কোন ক্ষতি নাই। সত্য যার জীবনের লক্ষ্য, সে কখনো তোষামুদী হতে পারে না, মতলববাজেরাই অপরের মন জুগিয়ে চল্‌বার চেষ্টা করে। সত্য লাভের বেলায় মতলববাজী খাটে না, একথা জেনে রেখো! গুরু-শিষ্যের কারও ভিতর যদি মতলব বা স্বার্থ থাকে, তাহলে সেই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ যথার্থ নয়—একথাও জেনে রেখো। আমার মাঝে যে সত্য নিহিত, সেই সত্যকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন সদ্‌গুরু। তখন আমাকে পেয়েই আমি সদ্‌গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হই।

উপকোশলের পরীক্ষা

ক্রমান্বয়ে আজ বার বৎসর অতীত হল উপকোশল কামালয়ন আচার্য্য সত্যকামের নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে সানন্দে গুরুর আশ্রমে কালাতিপাত করছে। একদিন নয়, দুদিন নয়, ১২টী বৎসর শ্রদ্ধার সহিত গুরুর অগ্নির পরিচর্য্যা করে আস্‌ছে সে। তার মনে কত সাধ, কত আশা-ভরসা, গুরু তাকে উপদেশ দেবেন! এদিকে সত্যকাম উপকোশলের অন্যান্য সতীর্থদের সমাবর্ত্তন করালেন, কিন্তু উপকোশলের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করলেন না।

ঋষিযুগে আচার্য্যই হতেন ব্রহ্মচারীর পিতা, আর আচার্য্যপত্নী হতেন মাতা। এইজন্যই ঘর-সংসার ছেড়ে যে সব ছেলে গুরুগৃহে এসে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করত, তাদের কোন দুঃখ কষ্ট হ'ত না। সংসারে

থাক্‌তে যে পিতৃ-মাতৃ স্নেহ পেত, সংসার ছেড়ে গুরুগৃহে এসেও আচার্য্য এবং আচার্য্য পত্নীর কাছ থেকে সেই যত্ন এবং আদরই পেত। আচার্য্যের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তাদের হয়ে যেত ভাই-বোনের সম্বন্ধ। কাজেই গুরুগৃহে অনায়াসে স্বচ্ছন্দে তারা আপন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পার্‌ত।

উপকোশলেরও কোন দুঃখ ছিল না, আচার্য্যপত্নী তাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ কর্‌তেন। এই মাতৃস্নেহ পেয়েই ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম পালন কর্‌তে উপকোশলের একটুকুও কষ্ট বোধ হয় নি।

একদিন উপকোশলের আচার্য্যপত্নী আচার্য্যকে বললেন, "এই ব্রহ্মচারী নৈপুণ্য সহকারে অগ্নির পরিচর্য্যা করে আস্‌ছে, অন্যান্য সব ছেলেদেরই একটা না একটা ব্যবস্থা করেছ—এর কি কোন ব্যবস্থা কর্‌তে নেই ? তুমি একেও উপদেশ প্রদান কর। বাছা আমার তৃষিত প্রাণে তোমার উপদেশ পাবার দরুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।"

মায়ের প্রাণ কিনা, তাই উপকোশলের দুঃখ দেখে তাঁর স্নেহের উৎস উথলে উঠেছিল। উপকোশলেকে বললেন, "হাঁ, এবার তোমার কোন চিন্তা নেই, তোমার আচার্য্যদেব নিশ্চয়ই এবার তোমাকে উপদেশ দেবেন।" উপকোশল তো মায়ের মুখ থেকে আশ্বাসবাণী পেয়ে আহ্লাদে একেবারে আটখানা! কিন্তু তার আচার্য্যদেব তো আর তার মায়ের মত কোমলপ্রাণ নন, তাই উপযুক্ত না বুঝলে কাউকে তিনি উপদেশ দেন না।

এমনি ভাবে দিন যায়। একদিন উপকোশলকে উপদেশ না দিয়েই তার আচার্য্য দেব সত্যকাম প্রবাসে চলে গেলেন। কবে যে ফির্‌বেন তারও কোন নিশ্চয়তা নাই। উপকোশলের মনের সকল আশা এবার ব্যর্থ হয়ে গেল। মনোদুঃখে উপকোশল অনশন ব্রত ধারণ কর্‌ল। তার মনে কি কম দুঃখ ? গুরুদেব তার সতীর্থদের সমাবর্ত্তনের আদেশ দিয়েছেন, আর আজ বার বৎসর অতীত হয়ে গেল, উপকোশলকে আচার্য্যদেব একটী উপদেশও প্রদান করেন নি। মনোদুঃখে উপকোশল এক জায়গায় গম্ভীর হয়ে বসে বসে কেবলই নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছে। একদিন নয় দু'দিন নয়, বার বৎসর অতীত হয়ে গেল, তবু আমি উপদেশ পাবার যোগ্য হলাম না, তাহলে এমন প্রাণ ধারণ করে কি লাভ ? অনশনে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ কর্‌ব এবার।

ছেলেকে উপবাসী রেখে মায়ের মুখে কি করে অন্নের গ্রাস উঠে! তাই আচার্য্যপত্নী আবার সান্ত্বনা দিয়ে উপকোশলকে বললেন, "বাবা, দুঃখ করো না; দেখ না তোমার সতীর্থদের উপরই তিনি কত কঠোর নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তোমার প্রতি তোমার আচার্য্যদেবের স্নেহদৃষ্টি রয়েছে—এবার প্রবাস থেকে ফিরে এসে দেখবে নিশ্চয়ই তোমাকে উপদেশ দেবেন। রাগ করে

দেহকে কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই। দুঃখ পরিত্যাগ করে উঠে এসো বাবা, স্নান-দান করে এসে গুরুর প্রসাদ পাও। শ্রদ্ধার সহিত যে নিয়ম পালন করে চলছিলে সেই নিয়মেরই অনুসরণ কর, একদিন নিশ্চয়ই তিনি তোমার অভীষ্ট পূরণ করবেন।"

মায়ের এই সান্ত্বনা বাক্যে সাময়িক প্রবোধ পেলেও উপকোশল কিছুতেই তার সঙ্কল্প ছাড়তে চাইল না। উপকোশল প্রত্যুত্তরে বললে—"মা, আমার ভিতর এখনো অসংখ্য কামনা রয়েছে। আমার এখনো চিত্তশুদ্ধির অনেক বাকী, এইজন্যই গুরুদেবের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি এখনো আমার উপর নিপতিত হয় নি। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া তো এখন আর আমার অন্য কোন ব্রত নাই। এতদিন গুরুর আশ্রমে থেকেও যখন চিত্ত আমার পরিশুদ্ধ হ'ল না, তবে আর এ দেহ-মন কবে বিশুদ্ধ হবে মা!" এই বলে উপকোশল চুপ করে মনের দুঃখে মাথা নীচু করে রইল। আচার্য্য-পত্নী উপকোশলের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানেন, উপকোশল তো অন্যান্য ছেলের মত নয়। তার নিষ্ঠা যেমন প্রবল, তেমনি সঙ্কল্পও সুদৃঢ়, এইজন্যই আচার্য্য-পত্নী দ্বিরুক্তি না করে উপকোশলকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করে চলে এলেন। উপকোশলের দুঃখে তিনি বিচলিত হয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন, "ভগবান! তুমি এর মনোবাসনা শীঘ্র পূর্ণ কর! ওর মাঝে তো কোন ছলনা নেই, নিষ্ঠার সহিত আজ ১২ বৎসর ধরে ও গুরু সেবা এবং অগ্নির পরিচর্য্যা করে আসছে। তুমি ওর প্রাণে শান্তি দাও।"

আচার্য্য-পত্নীর এরূপ ঐকান্তিক প্রার্থনা বাস্তবিকই যেন ভগবান শুনলেন। উপকোশলের দুঃখ দেখে অগ্নিত্রয় (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়) মনে মনে ভাবলে, ওর আচার্য্যদেব ওকে উপদেশ দেয় নি বলে কি হল, চল আমরাই আমাদের ভক্ত দুঃখিত তপস্বী ও শ্রদ্ধাবান্ এই ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করি। আজ বার বৎসর ধরে ও সমান নিষ্ঠার সহিত আমাদের পরিচর্য্যা করে আসছে; এখন যদি ওকে আমরা উপদেশ না দিই, তাহলে আমাদেরও কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়। এই বলে অগ্নিত্রয় সম্মিলিত ভাবে উপকোশলকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।

(ক্রমশঃ)



উপদেশ

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমি অনেকবারই তোমাদের একটা কথা বলেছি, বোধ হয় কথাটির গুরুত্ব তেমন ভাবে তোমরা উপলব্ধি কর নি। আজ তোমাদের ব্যবহার-আচরণের অসামঞ্জস্য দেখে আবার সেই কথাটাই তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। "এখানে বেশী জ্ঞানী হলেও চলবে না. বেশী ভক্ত হলেও চল্‌বে না।" নিছক জ্ঞানের আলোচনায় তোমাদের হৃদয় শুষ্ক হয়ে উঠে, তোমরা অভিমানে উদ্ধত হয়ে ওঠ—অনেকবার আমি এর প্রমাণও পেয়েছি! প্রকৃত জ্ঞানীই প্রকৃত ভক্ত! জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা যিনি, তিনি পরম জ্ঞানী ; এইজন্যই অবিরাম সানন্দ-চিত্তে তিনি জগতের সেবা করে যাচ্ছেন। কিন্তু জ্ঞানী হয়ে তোমরা সেবাকে, ভক্তিকে অবজ্ঞা করে চল। কাজেই ওরূপ জ্ঞানে হিত না হয়ে অহিতই হয় বেশী। এই তো গেল বেশী জ্ঞানের কথা ; আর বেশী ভক্ত হয়ে তোমরা স্বার্থপর হয়ে ওঠ, সেবার সুযোগে নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথই বেশী করে আবিষ্কার করবার চেষ্টায় নিরত হও। কাজেই ওরূপ ভক্তিরও কোন মূল্য নাই। সহজ কথায় বল্‌তে গেলে, কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মধ্য পন্থা ধরে চল, তাহলেই দেখবে পতনের কোন আশঙ্কা আর থাক্‌বে না।

তোমাদের এক এক সময় এক এক ঝোঁকে পেয়ে বসে। যখন জ্ঞানী হয়ে ওঠ, তখন ভক্তি হয়ে দাঁড়ায় অবজ্ঞার বস্তু, আর যখন ভক্ত হয়ে ওঠ, তখন জ্ঞান হয়ে যায় অবজ্ঞার বস্তু। এতেই প্রমাণিত হয়, তোমাদের দৃষ্টি সকল দিকে সমান ভাবে খেলে না। শঙ্করের মত, আর গৌরাঙ্গের পথ—এই হল আমাদের আদর্শ। তোমরা এ কথাটাকেও প্রায়ই ভুলে যাও। আমি কতবার তোমাদের এ কথাটা বলেছি।

অজ্ঞানীর দ্বারা সেবা হয় না। কাজেই সেবক যদি জ্ঞানী না হয়, তাহলেও প্রকৃত সেবাকার্য্য তাকে দিয়ে হবে না। নিজের মনের সঙ্গে সঙ্গে অপরের মনও বুঝা চাই, তবেই না অপরের মনোমত কর্ম্ম করা চলে! ভগবান প্রত্যেকের মনের কথা জানেন, এইজন্যই প্রত্যেকের মনোমত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়। অজ্ঞানীর দ্বারা যথার্থ সেবা হয় না—যে জ্ঞানী সে-ই প্রকৃত সেবক।

শাস্ত্রাদি পড়ে জ্ঞান অর্জ্জন করতে পার, কিন্তু হৃদয় জিনিষটা শাস্ত্রের মাঝে নাই। আর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি হৃদয় জিনিষটার সংযোগ না হয়, তাহলে সেই জ্ঞানে অপরের যথার্থ হিত হয় না। গুরু-শিষ্যের এই যে হৃদয়ের যোগাযোগ, ইহাই সব চেয়ে বড় কথা। জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শে না এলে এই হৃদয়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারা যায় না। বিবেকানন্দের কাছে রামকৃষ্ণের হৃদয়ের পরিচয় ছিল ভাল পরিচয়। পরমহংসদেব বেদ বেদান্ত জানেন কিনা, এ প্রশ্ন বিবেকানন্দের মনে জাগে নি, কেননা সবার চেয়ে বড় জিনিষ যে হৃদয়—সেই হৃদয়ের পরিচয়েই বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্যে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন। তোমরা আসল জিনিষের সন্ধান পাও না বা সন্ধান

নেবার চেষ্টা কর না, এইজন্যই নকল জিনিষের প্রতি তোমাদের এত লোভ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের 'নারদ-সনৎকুমার সংবাদ' উপাখ্যানটী বোধ হয় তোমরা জান। নারদ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ স্থানীয় অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস পুরাণ নামক পঞ্চম বেদ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈব-উৎপাত সংক্রান্ত বিদ্যা, কালতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা—এ সব জেনেও সনৎকুমারকে বলেছিলেন—'ভগবোমন্ত্র বিদেবাস্মি নাত্মবিৎ।' এইজন্যই নারদ শোকমগ্ন হয়ে সনৎকুমারকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তোমরা মনে কর শাস্ত্রবিদ্ হলেই আত্মবিদ্ হওয়া গেল। এতগুলো শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েও দেখ, নারদ শোকে দুঃখে মুহ্যমান। কাজেই কতকগুলি শাস্ত্র জানা থাকলেই হল না। সমস্ত শাস্ত্রের চেয়ে একটী যথার্থ অনুভূতির মূল্য আমি বেশী মনে করি। শাস্ত্রবিদের অভাব নাই, তোমরা আত্মবিদ্ হও——সাধু হও।

আমি কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমার মতের সঙ্গে যাদের মতের মিল না হবে, তাদের আমারই প্রতিষ্ঠিত মঠাশ্রমে থেকে আমার ভাবকে—আদর্শকে কলুষিত করা তো উচিত নয়। তাহলে বুঝব তারা প্রকৃত স্বাধীন নয়, তারা স্বেচ্ছাচারী। তোমরা স্বাধীন হও, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছ দেখেই তোমাদের অনেকের দরুণ আমার দুঃখ হয়। সত্যলাভ করব—এই ইচ্ছা থাকলেই সকলের ভাগ্যে সত্যলাভ হয়ে উঠে না। এইজন্যই সহস্রের মাঝে একজন হয়ত সিদ্ধিলাভ করে, আর সব তাঁরই প্রবর্ত্তিত নিয়ম কানুন মেনে আত্মগঠন করে উন্নত হয়। তোমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যলাভ কর - এতে কি আমার কোন বাধা থাকতে পারে? আমি বাধা দেই কখন? —যখন দেখি সত্যের পথে অসত্যের মায়ায় প্রবঞ্চিত হয়ে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছ। আমি বাধা দেই বলে তখন আমার প্রতি তোমরা বিরূপ হও। মনে মনে ভাব—সকলের ব্যক্তিত্বকে তিনি চেপে রাখতে চান। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যখন তোমাদের সত্যদৃষ্টি খুলে যায়, তখন দেখ, তোমাদের বাধা দিয়ে যে পথে ফিরিয়ে এনেছি—সে পথই যথার্থ সত্যের পথ। যে পথে চলছিলে সে পথ তোমাদের অসত্যের দিকে টেনে নিয়ে চলছিল।

পাঁচজনে মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তোমরা উন্নত হয়ে উঠবে, এইজন্যই তোমাদের পাঁচজনকে আমি একত্র করেছি। এতে আমার কোন স্বার্থ নাই। তোমরা উন্নত হয়ে ওঠ, সাধু হও - এই ইচ্ছাকে যদি স্বার্থপরতা বল, তাহলে বাস্তবিকই আমি স্বার্থপর, আর এই স্বার্থপরতা গৌরবের বিষয়! কেননা আমার স্বার্থে তোমাদের মনুষ্যত্ব বিকশিত করবে।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের প্রকৃত অধিকারী কয়টী মিলে? অথচ তোমাদের মাঝে অনেকেই কর্ম্মকে ফাঁকি দিয়ে ধ্যান ধারণায় সময় অতিবাহিত করতে চাও। প্রকৃত ধ্যান পরায়ণ যদি হতে পারতে, তাহলে যে কথাই ছিল না, কিন্তু পুঞ্জীভূত কর্ম্মের সংস্কারে যাদের চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হয় নি, তাদের ধ্যান করতে বসে চিত্তে আবোল তাবোল চিন্তা ছাড়া যে আর কিছুই আসে না। এর জন্যই বলি তোমরা কর্ম্ম সহায়ে চিত্ত শুদ্ধি কর। চিত্ত শুদ্ধি হলে আপনি সত্যপথের নির্দ্দেশ পাবে। কর্ম্ম করার কথা বললেই তোমরা অনেকে মনে কর, এই তো তিনি আমাদের কর্ম্মের মাঝেই কেবল আবদ্ধ করে রাখতে চান। এ তোমাদের

ভুল ধারণা! মঠাশ্রম না করলেও আমার কোন কিছু আস্‌ত যেত না। তোমাদের পাঁচজনের মঙ্গলের দরুণ এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল ক্ষেত্র রূপেই এই মঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার তো সংসারী শিষ্য ভক্তও অনেক রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সাধন পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে—কিন্তু এই মঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এক ভাব এক লক্ষ্য নিয়ে জীবন গঠন করে তোলার দরুণ। এখানে ব্যক্তিগত সাধনার চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ সাধনারই প্রয়োজন বেশী! কাজেই এখানে যারা আছ, তাদের আত্ম প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না করে, আত্ম সমর্পণের পথ ধরেই চল্‌তে হবে।

আমার প্রতি যাদের অটুট বিশ্বাস নাই, তাদের এখানে থেকে কোন কল্যাণ হবে না। কেননা এখানে যে সাধনা বল্‌তে একমাত্র সমর্পণের সাধনাই রয়েছে। অর্থাৎ তিলে তিলে নিজের অহংকে বিসর্জ্জন দিয়ে কি ভাবে একটী সুমহান ইচ্ছার আধাররূপে নিজকে পরিণত করা যায়—ইহাই প্রধান কথা। সমর্পণের মন্ত্রে যারা দীক্ষিত, তাদের জীয়ন্তে-মরা হতে হবে। কাজেই এখানে আত্ম প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে আত্মবলিদানের দিকেই লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। বেদ বেদান্তের বুলি তোমাদের অনেকের মুখেই শুনি—চিত্তশুদ্ধির অভাবে ঋষিদের সেই অমৃতময় বাণীর বিকৃতার্থ কর তোমরা! কারও একটা সুস্পষ্ট ধারণা নাই, অথচ তোমরা অনেক কিছু জান, অনেক বুঝ! তোমাদের এই বিভ্রান্তের অবস্থা দেখে আমার মনে হয়, আবার তোমাদের গোড়া থেকে সংশোধন করে তুল্‌তে হবে। অধিকারী বিচার সর্ব্বত্র রয়েছে। সকলকে শ্রবণ মননের সাধনা দিলে তাতে হিত না হয়ে অহিতই হয় বেশী। আমাদের এখানে ছোট ছোট ছেলেদের মুখে পর্য্যন্ত বেদ বেদান্তের কথা শুনে অনেক আগন্তুক মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে যায়! কিন্তু অপরিণত বয়সে অপরিণত মস্তিষ্কে এসব উচ্চভাব উচ্চ আদর্শের কথা কোন সুফলই প্রসব করে না। বরঞ্চ ভাব-ভক্তি-শ্রদ্ধার স্থলে ছোট ছোট ছেলেদের মাঝে পর্য্যন্ত অনাচার ব্যভিচার দেখা দেয়।

ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু—এবং এই দেহ মন-বুদ্ধি দ্বারাই সেই ধর্ম্মকে উপলব্ধি করা যায়। দেহ-মন-বুদ্ধির মালিন্য অপসারিত না হলে ধর্ম্মও বিকৃতরূপে প্রকাশ পায়। ঋষিরা যে আধার-শুদ্ধির প্রতি এত জোর দিয়েছেন এর প্রধান উদ্দেশ্যই এই! তোমাদের মাঝে যারা যুবক তারা তো উপনিষদাদি পড়্‌ছ, সেই উপনিষদের মাঝে দেখো—এক একজন শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের কি কঠোর নির্দ্দেশ! এই নির্দ্দেশের ভিতর দিয়েই তারা প্রকৃত মানুষ হয়েছে। সত্যকাম গরু চরিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিলেন। গরু চরানো—এতো একটা তুচ্ছ কাজ; কিন্তু নিষ্ঠার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত গুরু বাক্য পালন করেছিলেন বলেই সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন। তোমরাই তো বল, শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করা। আমার এখানে যে সব কর্ম্ম, যে সব বিধি নিয়ম আমি প্রবর্ত্তন করেছি, তা মেনে চল্‌লে কি যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন হবে না তোমাদের?

সংশয়বাদী দার্শনিকের অভাব নাই জগতে, কিন্তু তারাও একদিন তোমাদের অটুট বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ বিস্মিত না হয়ে পারবে না। পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা, আর মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করা এক কথা নয়। তোমরা সবাই তো রামতীর্থের কথা জান, তিনিও এক জায়গায় বলেছেন—"The reading of books and learning all knowledge is one thing, and to acquire the truth is

another. You may read all the sacred scriptures and yet not know the truth." পুঁথিগত বিদ্যা আর সত্যলাভ এক কথা নয়। ব্রহ্ম বিদ্যা অর্জ্জন করতে হলে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নাই! বিবেকানন্দ বলতেন, "আমাদের এই calculating egoটাকে মেরে ফেলতে হবে-তবেই আমরা যথার্থ সত্যের সম্মুখীন হতে পারব।" তোমরা ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব বলে খুব জোর দাও—কিন্তু ব্যক্তিত্ব কাকে বলে, আমাদের ব্যক্তিত্ব সত্য কি মিথ্যা, এর রহস্য অবগত আছ কয়জন?

বড় বড় কথা ছেড়ে দিয়ে ছোট ছোট কথাগুলিকে জীবনে রূপ দাও। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস এই দুর্লভ সম্পদগুলিকে লাভ করবার চেষ্টা কর। এই দুর্লভ সম্পদগুলি লাভ করতে পারলে দার্শনিক না হলেও, পণ্ডিত না হলেও কিছু আসবে যাবে না। তখন পণ্ডিত বা দার্শনিকই আসবে তোমাদের কাছে দুটো উপদেশ শুনে প্রাণ জুড়াতে। শ্রদ্ধাপরায়ণ, বিশ্বাসী জগতে যত বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন করেছেন, আর কেউই তেমন পারে নাই। অতীতের ব্যর্থতার কথা ভুলে গিয়ে আবার তোমরা মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের দিকে জোর দাও। তোমরা প্রকৃত মানুষ হও—সাধু হও—এই আমার আশা এবং আশীর্ব্বাদ! (ক্রমশঃ)

ফাল্গুনী পূর্ণিমায়

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা, রাস বিহারী শ্রীকৃষ্ণের আজ দোল যাত্রা। নিত্য লোকে যে নিত্যলীলা চির বহমান, তাহারই একটী ঝলক আসিয়া পড়িয়াছিল দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় এই প্রাকৃত জগতে। জগৎ সেদিন আপনা ভুলিয়াছিল, আনন্দের পুলক শিহরণে দোদুল দোলায় দুলিয়াছিল। সেই মধুময় স্মৃতি স্মরণে আজও কত বর্ষ ধরিয়া সেই লীলার অভিনয় চলিয়া আসিতেছে এই মধুর বসন্তে।

মধু মাসেই এই লীলার প্রবর্ত্তন, বিশ্ব প্রকৃতির স্বভাবস্ফূর্ত্ত কমনীয় শোভায় ইহার আরতি। শিশিরের তপঃক্লিষ্টা প্রকৃতির নির্ম্মল অন্তরে চির সুন্দরের অধিষ্ঠান, বসন্তের আগমনে প্রকৃতি-পুরুষের মধুর মিলনান্দোলন! চারিদিকে আজ স্নিগ্ধতা, চারিদিকে আজ মধুরিমা। শ্যামল পত্রের কোলে স্তবকে স্তবকে কুসুমরাজি দুলিতেছে, কুসুমের কোলে কোলে অলিকুল গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছে, নির্ম্মল আকাশের সুনীল বিম্ব বুকে করিয়া স্নিগ্ধ তটিনী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে আনন্দের অভিসারে।

সমগ্র দেশ জুড়িয়া আজ আনন্দের খেলা, রঙের মাখামাখি, আবীরের ছড়াছড়ি, দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আনন্দের বিজয়োৎসব। এই যে আনন্দোৎসবের প্রবর্ত্তন, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিদিগের ইহা শ্রেষ্ঠ অবদান, করুণাবিগলিত হৃদয়ের প্রস্ফুট পরিচয়। বাহিরের আনন্দ উপলক্ষ্য করিয়াই হয়ত একদিন অন্তরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, হয়ত একদিন কাচ খুঁজিতে

খুঁজিতেই স্পর্শমণির সন্ধান পাইব, তাই বুঝি এই ধর্ম্মক্ষেত্রে উৎসবের এত ছড়াছড়ি, বার মাসে তের পার্ব্বণ !

আসমুদ্র হিমাচল ভারতের ঘরে ঘরে নগরে নগরে আজ এই দোলোৎসব চলিয়াছে, বাঙ্গালা দেশেও ইহার অপ্রতুলতা নাই। কিন্তু শুধু দোল-লীলা বলিয়াই বাঙ্গালীর এ দিন আজ স্মরণীয় নহে। সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে আজিকার মত এমনি একটী দিনেই বাঙ্গালার বুকে বাঙ্গালার ঠাকুর নামিয়া আসিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যরূপে। তাঁহার রূপের আভায় কামিনীর কমনীয় কান্তি ম্লান হইয়াছিল, কণ্ঠের লালিত্যে নারীকণ্ঠ লজ্জা পাইয়াছিল, নৃত্যের ভঙ্গীতে নটরাজের চটুলতা ফুটিয়া উঠিয় ছিল।

সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পরে আজ বাঙ্গালার কোলে বসিয়া স্নিগ্ধ ফাল্গুন পূর্ণিমা রজনীতে বাঙ্গালারই এক কনিষ্ঠ সন্তান আমি মুগ্ধ বিস্মিত অন্তরে ভাবিতেছি সেই পুরাতন কথা। কি পুণ্য করিয়াছিল বাঙ্গালী, যার ফলে সে আপন করিয়া অতি নিবিড় ভাবে বিশ্ব-প্রাণকে বুকের কাছে পাইয়াছিল, তাঁহার সহিত মিশিয়াছিল, তাঁহার অঙ্গসঙ্গে ধন্য হইয়াছিল। কর্ম্মের অবতার, জ্ঞানের অবতার সব আবির্ভূত হইলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, কিন্তু প্রেমের ঠাকুর আমার নামিয়া আসিলেন বাঙ্গালার মাটীতে, জানি না সে কোন পুণ্যফলে ! বাংলার আলোবাতাসে প্রতিধ্বনি কণায় ছড়াইয়া পড়িল প্রেমের বীজ, নিমেষের মাঝে খুলিয়া গেল সত্যের একটী চির আবরিত দিক্। এই প্রেমধন বাঙ্গালীর নিজস্ব, নব বৈষ্ণব দর্শন বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তি !

নিছক জ্ঞান লাভই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের যোগ না হইলে জীবন সর্ব্বভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে না, ব্রহ্মজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপর প্রেমের সৌধ গড়িয়া না উঠিলে জীবন মধুময় হয় না। শুষ্ক জ্ঞানের চর্চ্চায় যখন দেশ ভরিয়া উঠিল, হৃদয়ের হাহাকার প্রশমনের কোন উপায় না করিয়া ন্যায়ের নীরস তর্কে যখন শুধু বুদ্ধি বৃত্তিরই আপ্যায়ন চলিতে লাগিল, তখন তৃষাতুর জীবের তৃষিত কণ্ঠে প্রেমধারা বর্ষণ করিবার জন্য, তাহাদের মরু হৃদয় প্রেমের স্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইলেন বাঙ্গালারই এক পল্লীতে, সুরধুনী কূলে। ক্ষুদ্র 'অহং' জ্ঞানবিশিষ্ট 'সোঽহং' বাদীর শূন্যগর্ভ জ্ঞান বিলয় করিয়া, শাস্ত্রপণ্ডিতের অনুভূতি হীন বাগ্‌জাল প্রশমিত করিয়া প্রেমের প্লাবনে তিনি দেশ ভাসাইলেন, কলিপাবন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্ম জগতে প্রবেশের এক অপূর্ব্ব পন্থা প্রকটিত করিলেন।

ইহকালসর্ব্বস্ব কতকগুলি জড়বাদীর মুখে শুনিতে পাই, মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম্মেই না কি আমাদের দেশ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, পঙ্গু হইয়াছে, শ্রীহীন হইয়াছে। তাঁহার কাছ হইতে আমরা পাইয়াছি শুধু কয়েকটী খোল করতাল, আর শিখিয়াছি শুধু অবলার মত বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দনের কৌশল ! শুনিয়া মর্ম্মন্তুদ বেদনায় চিত্ত অধীর হইয়া উঠে। ভাবি— শূন্যগর্ভ হৃদয়ের একি প্রলাপোক্তি, ঋষির বংশধরদের আজ একি শোচনায় পরিণাম ! অথচ পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলিয়াছেন—"যে দেশে গৌরাঙ্গের ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, সে দেশ এবং সে জাতি কখনও হীন নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের দেশে এমন মহাপুরুষের জন্ম হইত না।" যাঁহার আবির্ভাবে পতিত দেশের পতিত জাতির কলঙ্ক অপনীত হইয়া গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ না করিয়া, তাঁহার

কার্য্যাবলীর সম্যক বিচার না করিয়া স্বেচ্ছাকল্পিত মন্তব্য প্রকাশকে একদেশদর্শিতা ভিন্ন আর কি বলিব? মহাপ্রভুর নিকট হইতে কি জগৎ শুধু কয়েকটী খোল করতাল পাইয়াছে, আর বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেই শিখিয়াছে, আর কি কিছুই পায় নাই? পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ করিয়া মূর্খের সহিত সমভূমিতে তাহাদের নামাইয়াছে কে? ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমান দূরে ঠেলিয়া চণ্ডালের সহিত তাহাদের আলিঙ্গন করাইয়াছে কে? ধনীনির্ধনের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ঘুচাইয়া তাহাদের একত্র নাচাইয়াছে কে? তিনি এমন একটী ঐক্যসূত্রে পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ধনী-নির্ধনের মালা গাঁথিয়াছিলেন, যে সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে জগতের আজ একটা মহা সমস্যার সমাধান হইয়া যায়, হিংসা দ্বেষের পরিবর্ত্তে শান্তি প্রীতির মলয়ানিল প্রবাহিত হয়। বাহিরে পানাহার করাইয়া, ছত্রিশ জাতিকে এক বর্ণ করিয়া তিনি এ মিলন সংঘটন করেন নাই, প্রেমের সূত্রে ঐক্যের বাঁধনে তিনি সকলকে বাঁধিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন একটী জগৎ মেলিয়া ধরিয়াছিলেন, যাহার তুলনায় এই দৃশ্য জগৎ তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল; তিনি জগতের সমক্ষে এমন একটী প্রেমের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার তুলনায় জাগতিক আকর্ষণ সহস্রাংশে হেয় প্রতিভাত হইয়াছিল।

জড়বাদী চায় তাহার সংসারটী সুখের হইয়া উঠুক, এ জগৎ নন্দন কাননে পরিণত হোক্, আধ্যাত্মিকতার পাগলামী জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া যাক্। জড় জগৎ ছাড়া সূক্ষ্ম জগৎ বলিয়া যে কিছু আছে তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। তাই জড় জগৎ মন্থন করিয়া সে আবিষ্কার করিল বিজ্ঞানের কত নব নব সূত্র, উদ্ভাবন করিল কত নব নব যন্ত্র; কিন্তু এই মন্থনে যে শুধু সুধার উদ্ভব না হইয়া হলাহলও উঠিয়া পড়িয়াছে, যে হলাহলের তীব্র জ্বালায় আজ বিশ্বপ্রাণ জর্জ্জরিত, তাহার প্রশমনের উপায় কি জড়বাদী আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? মরীচিকা ভ্রান্ত মৃগের মত ছুটিয়া চলিয়াছে সে কোন্ দিগন্তের পানে অস্থির চরণে কে জানে? যে ইহজগতের সুখের বিধান করিতে পারে, এই সংসারকে নিত্য প্রতিপন্ন করিয়া ইহারই সৌন্দর্য্য বিধানের পন্থা আবিষ্কার করিতে পারে, সে-ই হয় জড়বাদীর চক্ষে বিশ্বহিতৈষী—জগতের মহামানব! আর যিনি এই জড়বাদ চূর্ণ করিয়া চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সংসারের অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়া নূতন জগতের সন্ধান দেন, তিনি হইয়া যান দেশের শত্রু! ইহা অপেক্ষা ইহকাল-সর্ব্বস্বতার উক্তি আর কি হইতে পারে, ইহা অপেক্ষা জড়ত্বের নিদর্শন আর কি থাকিতে পারে? এই জড়ের মোহ ভাঙ্গিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, অনিত্যের মায়াঘোর কাটাইয়া নিত্যের সন্ধান দিবার জন্যই তাঁহার অবতার!

সংসারের প্রতি বিরক্তি না আসিলে অনুরাগের সঞ্চার হয় না, অনুরাগ না জন্মিলে প্রেমের বিকাশ হয় না, প্রেমের বিকাশ না হইলে আনন্দ স্বরূপের অনুভূতি হয় না—এই নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহাদের নিকট পরিস্ফুট, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন মহাপ্রভুর নিকট হইতে জগৎ কি পাইয়াছে!

ভগবানের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং নব ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরও আবির্ভাবের হেতু তাহাই। তন্মধ্যে

একটী বহিরঙ্গ, অপরটী অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ কারণের উল্লেখ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধবে' বলিয়াছেন—

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

চিরকালাবধি পূর্ব্বে যাহা প্রদান করা হয় নাই, সেই সর্ব্ব প্রধান মধুর রস বিশিষ্ট নিজ ভক্তি সম্পত্তি প্রদান করিবার জন্য কলিযুগে করুণা করিয়া যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্বর্ণ অপেক্ষাও প্রকাশিত সুন্দর কান্তি সেই শচীনন্দন তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা বাস করুন।

গোস্বামীপাদের এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে প্রেম ভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহাকে কম বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই, কম আয়োজন করিতে হয় নাই। এই প্রেম ভক্তি প্রচারের প্রথম বিকাশ তাঁর সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনে। প্রেমভক্তি লাভের উপায় স্বরূপ তিনি যে সাধন পঞ্চকের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এই নাম সঙ্কীর্ত্তন তাহাদের মুখ্যতম। তাই তিনি নামের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিয়াছেন ঃ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই হরিনামের বন্যায় তিনি নদীয়া ভাসাইয়াছিলেন, সেই বন্যার উচ্ছল তরঙ্গ শুধু বাঙ্গালা কেন, বাঙ্গালার বাহিরেও বহু স্থান প্লাবিত করিয়াছিল। নাম সঙ্কীর্ত্তন যুগ ধর্ম্ম, তাই আজও ঘরে ঘরে সেই সঙ্কীর্ত্তনের রোল শুনিতে পাই, আজও কীর্ত্তন-অঙ্গনে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধনের মহা মিলন দেখিতে পাই। বাস্তবিকই দুর্ব্বলাধিকারী কলির মানবগণের নাম ব্যতীত গতি নাই। নামে অখিল পাপ দূর হয়, বিষয় বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত হয়, নাম করিতে করিতে প্রেমের সঞ্চার হয়, জীব পরম পদ লাভে কৃত কৃতার্থ হইয়া যায়। তাই দেখি দয়াল ঠাকুর আমার প্রথমে নামের বন্যায় যত কলুষ কালিমা বিধৌত করিয়া, চিত্তের আবিলতা দূরীভূত করিয়া সেই শুদ্ধ সত্ত্ব হৃদয়ে প্রেমের অমিয় ধারা ঢালিয়া দিলেন, নিরাসক্ত প্রাণে প্রেমরসের দিব্য অনুভূতি জাগাইয়া তুলিলেন। নামের শক্তি অসীম, নাম লইতে লইতে আপনা হইতে প্রাণ গলিয়া যায়, ভাবের উদয় হয়। তাই চিত্তকে ভাব ধারণের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্যই তাঁহার এই সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন!

মহাপ্রভুর অবস্থিতিকাল মাত্র ৪৮ বৎসর। তন্মধ্যে ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে অবস্থান, অবশিষ্ট ২৪ বৎসর সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনে ভারত ভ্রমণ ও নীলাচলে অবস্থিতি। যে ধর্ম্ম সংস্থাপন ব্যপদেশে তাঁহার অবতার, গৃহে অবস্থান করিলে তাহা সম্যক্ সাধিত হইবে না বুঝিতে পারিয়া শুধু জগতের হিতের জন্য তিনি সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, পরিব্রাজক হইলেন। সংসারে তাঁহার সুখের অভাব ছিল না; তিনি নিজে ছিলেন অগাধ পণ্ডিত, গৃহে ছিলেন তাঁহার যুবতী ভার্য্যা, বর্ষিয়সী মাতা, আর সর্ব্বদাই তিনি পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন কত বিত্তসম্পদ-শালী অনুগত জনগণে। তথাপি জগতের হাহাকার ঘুচাইবার জন্য, জড়ত্বের মোহ ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহাকে সে সব ত্যাগ করিতে হইল, ভিখারী সাজিতে হইল। আত্মসুখের জন্য তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই, সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইয়া তিনি বৈরাগী সাজেন নাই, পরন্তু যে প্রেমরসে তাঁহার আনখাগ্র কেশ পর্য্যন্ত ভরিয়া

উঠিয়াছিল, যে প্রেমরসে তিনি অবগাহন করিয়াছিলেন, সেই প্রেম-রস বিতরণের জন্যই তাঁর এই সন্ন্যাস!

সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি ২৪ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম ৬ বৎসর নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনচ্ছলে ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন, কত পাষণ্ডীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, শাস্ত্রব্যাখ্যায় নূতন আলোক ফুটাইয়া কত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন প্রেমময়, প্রেমেই ছিল তাঁর তনু গঠিত, তাই যে পথ দিয়া তিনি চলিতেন, সে দেশের বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত প্রেমে পুলক-কণ্টকিত হইয়া উঠিত, মূকের মুখে বাণী ফুটিত, নাস্তিকও নাস্তিক্যবুদ্ধি হারাইয়া "হরি" "হরি" বলিয়া ফেলিত। নিঃশব্দে এই ভাবে তিনি সমগ্র ভারতে প্রেম দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁর পদরেণু স্পর্শে ধরণীর ধূলি ধন্য হইয়াছে, আকাশ বাতাস পবিত্রীকৃত হইয়াছে, জীবকুল কৃতার্থ হইয়াছে। অতঃপর তিনি আর বাহিরে না গিয়া অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলেই কাটাইয়াছেন, নীলাচলেই তাঁহার লীলার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গে কত লীলা রঙ্গ করিয়াছেন, কত নিগূঢ় তত্ত্বের আলাপন করিয়াছেন, বিশিষ্ট ভক্তগণকে প্রেমভক্তি প্রচারের উপযুক্ত করিয়া গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই শিক্ষাদান কার্য্য শেষ হইলে তিনি "জীবে দয়া, নামে রুচি" প্রচার জন্য দেশে দেশে প্রচারক প্রেরণ করিলেন, যে প্রেমধারা তিনি জগতে বহিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার ধারায় জগৎ পরিপ্লাবিত করিবার জন্য বিশিষ্ট ভক্তগণকে দিকে দিকে প্রেরণ করিলেন। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ আসিয়া বাঙ্গালা দেশ নামে প্রেমে ভাসাইলেন, ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইয়া তিনি প্রেমকারুণ্য কণ্ঠে বলিয়া বেড়াইলেন—

"ভজ চৈতন্য, সেব চৈতন্য, লহ চৈতন্যের নামরে,
যে জন চৈতন্য ভজে সেই হয় আমার প্রাণরে।"

নিত্যানন্দের কৃপায় বাঙ্গালায় সংকীর্ত্তনের বহুল প্রচার হইল, প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইল, বাঙ্গালী ধন্য হইল।

রূপ সনাতন প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে আসিয়া ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, বিস্মৃতির অতল তলে বিলুপ্ত পুণ্য তীর্থরাজির উদ্ধার সাধন করিলেন, মহাপ্রভুর শিক্ষা পদ্ধতি, উপদেশ, সাধন কৌশল, সমস্ত অগণিত গ্রন্থসম্ভারে স্তরে স্তরে সাজাইয়া তুলিলেন। এই ভাবে শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ কার্য্য সমাপ্ত হইল, নাম প্রচার এবং প্রেমধর্ম্ম সংস্থাপন সুসিদ্ধ হইল; তিনি এবার অন্তরে ডুবিলেন, স্বকীয় আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ হেতুকে রূপ দিলেন। এই অন্তরঙ্গ হেতুটী কি, সে সম্পর্কে শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়:—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেম সংকারে যে মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ, এবং এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীমতী যে সুখ অনুভব করেন তাহাই বা কিরূপ, এই তিনটী বিষয় জানিবার নিমিত্তই শ্রীমতীর ভাব কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শচী মাতার গর্ভসিন্ধুতে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইটীই হইল অন্তরঙ্গ কারণ।

পৃথকভাবে এই তিনটী কারণের উল্লেখ থাকিলেও ইহারা একটীতেই পর্য্যবসিত হইতেছে,

তাহা হইতেছে আত্মোপলব্ধি। শ্রীরাধিকা—সাধনার জীবন্ত মূর্ত্তি, সাধকের ঘন ব্যাকুলতা, আত্মোপলব্ধির একমাত্র করণ; শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য—আত্মমহিমা, আত্মস্বরূপ; আর আস্বাদনমাধুর্য্য হইতেছে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের বিলয়ে জ্ঞান স্বরূপ কেবলানন্দের অনুভূতি! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও এই আত্মোপলব্ধিজনিত আনন্দাস্বাদ নিমিত্ত রাধাভাব কান্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ভক্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই আত্মোপলব্ধিতে অর্থাৎ নিজেই নিজের আস্বাদন ব্যাপারে বাহিরের কোন কিছু অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না, অপেক্ষা থাকে না, হৃদয়ের অনির্ব্বাণ আকুলতা লইয়া শুধু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তলাইয়া যাইতে হয়; তাই দেখি জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া মহাপ্রভুর রুদ্ধ দুয়ারে গম্ভীরায় অবস্থান। তিনি নামিয়া আসিয়াছিলেন স্বধাম হইতে স্থূলে, আবার ধীরে প্রস্থান করিলেন স্থূল হইতে তুরীয়ে—স্বরূপে। ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনাদি প্রবর্ত্তনে তাঁহার স্থূল লীলার প্রচার, পরবর্ত্তী ৬ বৎসর ধরিয়া ভাব বিকীরণে সূক্ষ্মের লীলা প্রকাশ, তৎপরবর্ত্তী ৬ বৎসর অন্তরঙ্গ সঙ্গে অন্তরঙ্গ বিষয়ের আলাপনে কারণের লীলা বিলাস, আর শেষ দ্বাদশ বৎসর নিঃসঙ্গ হইয়া রুদ্ধ দুয়ারে তুরীয়ের লীলা আস্বাদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যেক আচরণ আমাদের অনুকরণীয়, তাঁর প্রত্যেকটী উপদেশ আমাদের পরিপালনীয়। যদি প্রেমলাভ জীবনের কাম্য লক্ষ্য হইয়া থাকে, যদি আত্মোপলব্ধি জীবনের, হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিশ্বের প্রত্যেক মানবকেই শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে, জড়ের মোহ কাটাইয়া প্রত্যেককেই চৈতন্যের ভজনা করিতে হইবে।

ভারতের ধর্ম্ম—চিরবহমান সনাতন ধর্ম্ম শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে শ্রীচৈতন্যে। ঋষিযুগে দেখিতে পাই ভারতের শিশুর সরল উদার প্রাণ, বন্ধনহারা আনন্দের উচ্ছল বিকাশ! শ্রীকৃষ্ণের যুগে দেখিতে পাই কিশোরের চঞ্চল চটুল নৃত্য, বিকাশোন্মুখ যৌবনশক্তির দুঃসহ প্রকাশ। তারপর পাই শ্রীবুদ্ধে যৌবন প্রৌঢ়ের সন্ধিক্ষণে নিষ্কাম কর্ম্মের অচঞ্চল আবর্ত্তন,—ক্ষান্তি মৈত্রী করুণার স্নিগ্ধ বিচ্ছুরণ। অতঃপর পাই আচার্য্য শঙ্করে পরিপক্ক প্রৌঢ়ের অদ্বৈতসিদ্ধি, আত্মজ্ঞান লাভ। তারপর শ্রীচৈতন্যে বৃদ্ধ ভারতের আত্মসংস্থিতি, প্রেমপ্রাপ্তি, আনন্দ বিলাস!

ভারত এখন বৃদ্ধ। শিশুর সরল প্রাণ, কিশোরের সরল সবল আনন্দ, যৌবনের কর্ম্মোদ্যম, প্রৌঢ়ের জ্ঞান, সকলকে পরিপ্লাবিত করিয়া উপচিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিশ্বপ্রেম। তাই সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ ভারত এখন জগতের ধর্ম্মগুরু!

ভারতে আর যৌবন শক্তির বিকাশ হইবে না, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তাহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। যৌবনের উদ্দাম বিলাসে, জড় বিজ্ঞানরূপ সমুদ্র মন্থনে যে হলাহলের উদ্ভব হইয়াছে সমগ্র জগতে, সেই হলাহল জীর্ণ করিয়া অমৃতের বার্ত্তা প্রচার করিবে এই বৃদ্ধ ভারত, শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে এই পুরাতন আর্য্য ভূমি।

জ্ঞান প্রেম ভারতের সিদ্ধ সম্পদ্। আজ ভারতের প্রত্যেককে সে সম্পদের অধিকারী হইতে হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন জ্ঞান জ্ঞানের বহ্নি জ্বালিয়া—প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইয়াছিলেন, তেমনি প্রত্যেককেই জীবনের মাঝে সেই আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, 'আত্মনঃ মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ' জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।

আজ আর বাহিরে সোণার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে চলিবে না, ভিতরে—অন্তরের মাঝে

গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটাইতে হইবে; বাহিরে ধূপ দীপ দিয়া তাঁহার আরতি করিলে চলিবে না, আত্মজীবনকেই আহুতি দিতে হইবে; বাহিরে ফুল দিয়া তাঁহার পূজা করিলে চলিবে না, পুষ্পের মত নিষ্কলুষ হইয়া তাঁহার চরণে আত্মদান করিতে হইবে।

আজ এই পুণ্য তিথিতে কত কথাই মনে পড়িয়া যাইতেছে, মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মহাপ্রভুর জীবন শুধু আলোচ্য নহে আস্বাদ্য, শুধু শ্রবণীয় নহে অনুকরণীয়। স্তব্ধ হইয়া যাও, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তলাইয়া যাও, নিবাত নিষ্কম্প চিত্তে মহাপ্রভুর অনুধ্যান কর, তাহাই হইবে তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি তর্পণ!

বসন্তের পরিপূর্ণ বিকাশে ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে এমনি একটী রজনীতেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। স্থূলে যে লীলা প্রকটিত হয়, সূক্ষ্মে প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবনেও সে লীলার অভিনয় হইতে পারে; ইহা ভাষার চাতুর্য্য নহে, সাধন জগতের নির্ব্যূঢ় সত্যবাণী। তপস্যার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ হৃদয়ে সত্যের বিমল জ্যোতি প্রকাশ পায়, আর সেই সত্যালোকে ফুটিয়া উঠে শ্রীচৈতন্যরূপ সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ। এই চৈতন্যকেই আমাদের প্রত্যেকের মাঝে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রেমের প্লাবনে ভাসিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্য পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলিত মূর্ত্তি, রাধা-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। তাই আজ তাঁর এই পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে তত্ত্বদর্শী রসিক ভক্ত চূড়ামণির সুরে সুর মিলাইয়া প্রেমের ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলি—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদংগতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতংনৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পঞ্চ কেদারের প্রথম কেদার ত এখানে দর্শন করলাম, অন্য চার কেদারের মধ্যে মাত্র তুঙ্গনাথ দর্শন করেছিলাম। অন্য গুলি দুর্গম রাস্তা তথা চটী, ঘর বাড়ী কিছু না থাকায় যেতে পারি নি। বদরীর পথে যাবার সময় কোন্ কোন্ স্থান হতে ঐ সব জায়গায় যাওয়া যায়, তাহা পাঠকদের জানাব।

কেদার খণ্ডে আরও পাওয়া যায়, সত্যযুগে এই স্থানে ভৃগু মুনির আশ্রম ছিল। কোন কারণে লক্ষ্মীদেবী অসন্তুষ্ট হয়ে ভৃগুক্ষেত্র অপবিত্র ও সর্ব্বদেব বঞ্চিত হবে বলে অভিসম্পাত করলে ভৃগু মহারাজ

ভৃগু আশ্রম

দুষ্কর তপস্যা দ্বারা শিবকে তুষ্ট করেন, তখন শিব সপ্ত পাতাল ভেদ করে অনাদি লিঙ্গরূপে দর্শন দিয়ে এই ক্ষেত্র পবিত্র হবে বলে বর দেন। কাহারও মতে ক্ষত্রিয়-বংশ-ধ্বংস কারী নারায়ণের ষষ্ঠ অবতার শ্রীশ্রীপরশু-

বামদেব এই কেদারক্ষেত্রের উত্তর পার্শ্বে যে স্বর্গারোহণ শেখর নামীয় বিশাল হিমগিরি দৃষ্ট হয়, ঐ স্থানে দেহত্যাগ করেছিলেন বলে এর নাম ভৃগু পতন। ভৃগুতীর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই :—

ভৃগু পতন

তদূর্দ্ধং ভৃগুতুঙ্গং বৈ পাপিনামপি মুক্তিদম ॥

কিন্তু আবার অন্যত্র উক্ত আছে যে পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থান কালে এই পথেই স্বর্গারোহণ করেছিলেন, তাই এই পথের অন্য নাম স্বর্গারোহণ শিখর বা মহাপথ। স্বর্গারোহণ শিখর সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এইরূপ পাওয়া যায়। যথা :—

মহাপথ

স্বর্গারোহণমিদম্ স্থানং মে পরমং মহৎ।
দর্শনাদেব পাপানি বহ্নিহত্যা সমানি চ ॥

দ্রৌপদীদেবী এই পথে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে স্বর্গারোহণ কালে দেহত্যাগ করেছিলেন।

উত্তর দিকে যে স্বর্গারোহণ শিখর বা মহাপথ নামে তুষার মণ্ডিত উচ্চ শিখর দেখতে পাওয়া যায়, তার অপর পার্শ্বে পূর্ব্ব দিকে শ্রীশ্রীবদরীনাথ বিরাজিত। কিম্বদন্তী আছে যে পুরাকালে একজন পুরোহিতই নিত্য শ্রীশ্রীকেদারনাথের ও শ্রীশ্রীবদরীনাথের পূজা সম্পন্ন করতেন। তাঁরা পরম যোগী ছিলেন, যোগবলে ঐ উচ্চ শৃঙ্গ অতিক্রম করে পূজা করা একমাত্র তাঁদেরই সম্ভবপর ছিল। আবার কেউ বলেন, উত্তরদিকের মহাপথ পর্ব্বতের পাশ দিয়ে একটা সংকীর্ণ কঠিন পাকদণ্ডী পথ ছিল, সেই পথ অতিক্রম করে পূজারী মহারাজ প্রত্যহই উভয় স্থানের পূজা সম্পন্ন করতেন। কিন্তু পরিবর্ত্তনময় জগতের সকল জিনিষই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চির তুষারাবৃত হওয়ায় এখন আর কোন লোকই সে পথ অতিক্রম করতে পারে না—সে পথে বরফ এখন অচল অটল। এখন কেদারনাথ হতে বদরীনাথ কোন লোকই ৭।৮ দিনের আগে যেতে পারে না। আবার অন্য দিক দিয়ে ভাবলে উক্ত কিম্বদন্তী সত্য হতে পারে যে একই পূজারী দুই স্থানের পূজা সম্পন্ন করতেন। সমস্ত পৃথিবী যখন জলমগ্ন ছিল তখন হিমালয় সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হয়। তখন আজ কালের মত হিমালয় চির তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ দ্বারা শোভিত ছিল না। যারা সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ করেছেন, তারা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, সমুদ্রের ঢেউগুলি এসে পাড়ে লাগতে লাগতে কোন স্থান উচ্চ কোন স্থান নীচু ঠিক পাহাড়েরই শৃঙ্গের মত সেই সমুদ্রের তটেও সৃষ্ট অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণার শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়। এককালে যখন পৃথিবী একদম জলমগ্ন ছিল এবং সেই সময় জগৎ উৎপত্তির এই স্থান গুলিও ঠিক বর্ত্তমান সমুদ্র তটের বালুকারাশির পর্ব্বতের মতই শোভা পেত। সেই সকল সমুদ্র তটবর্ত্তী বালুকারাশি সুস্থ সবল লোকের পক্ষে তিন চার ঘণ্টায় পনর ষোল মাইল পথ অতিক্রম করা কোনও কষ্টকর ছিল না। সুতরাং পুরাকালে এ সব স্থান যখন সমুদ্র তটবর্ত্তী অতি নিম্নভূমি মাত্র ছিল, তখন পূজারী ঠাকুরের অবেশে বরাবর সোজাসুজি ভাবে বদরীনাথ যেয়ে পূজা সম্পন্ন করা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদ্রতটস্থ বালুকারাশিই আজকাল ক্রমবিবর্ত্তনে উক্ত প্রকার বরফের পর্ব্বতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টির বৈচিত্র্যতা প্রকাশ করছে। হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও বলে গিয়েছেন, "ক্রমবিবর্ত্তনক্রমে একবিন্দু বালুকাকণা মহামহীধরে পরিণত হয়।" বর্ত্তমান সময়ে অনেক বৈজ্ঞানিক মহোদয়ও প্রমাণ করেছেন, উচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট হিমালয়ও এককালে জলের ভিতর মগ্ন ছিল। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে

আরোহণকারীগণ অতি উচ্চেও বড় বড় সামুদ্রিক মাছের হাড় কাঁটা পেয়েছেন। এতেও প্রমাণ হয়, এককালে হিমালয় জলমগ্ন ছিল। সুতরাং এককণা বালুকাকণা যদি কালের পরিবর্ত্তনের দ্বারা মহামহীধর রূপে পরিণত হতে পারে, তাহলে উচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট হিমালয়গুলিও যে সেই সত্যকালের প্রথম সৃষ্টিতে বালুকাকণারূপে থেকে ক্রমবিবর্ত্তন প্রভাবে আজ উচ্চ মহামহীধররূপে অবস্থান করছে, একথাও সত্য বলে মেনে নিতে হবে। সুতরাং পুরাকালে একই পুরোহিতের উভয় স্থানে পূজা সম্পন্ন করা সত্য হতে পারে। কাজেই কিম্বদন্তী অবিশ্বাসযোগ্য নয়।

১২ই আষাঢ়, ২৭ জুন সোমবার—

কেদারনাথ হতে বদরীনাথ যেতে হরিদ্বারের পথে ২৩ মাইল নীচুতে নালাচটী পর্য্যন্ত নেমে যেতে হবে। অথবা ২৪ মাইল দূরে গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত যেয়ে তথা হতে উখীমঠ, তুঙ্গনাথ, চামেলী জংশন হয়ে বদরীনাথ যেতে হবে। সকলেই এই পথেই যান। কেদারনাথ হতে নালাচটী ২৩ মাইল, গুপ্তকাশী ২৪ মাইল, উখীমঠ ২৬½ মাইল, তুঙ্গনাথ ৪১ মাইল, চামেলী ৫৪ মাইল, বদরী-নারায়ণ ১০২ মাইল। আমরা এখন গুপ্তকাশী যাব, সেখান হতে বদরীনাথ যাব। গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত চটির নাম ও দূরত্ব ত্রিযুগীনাথে থাকার সময়ই জানিয়েছি। আবার গুপ্তকাশী হতে চামেলী বা লালসাঙ্গা পর্য্যন্ত চটীর দূরত্ব ও নাম প্রভৃতি গুপ্তকাশীতে পৌছে জানাব। পরে আবার চামেলী বা লালসাংগা হতে বদরীনাথের চটীর দূরত্ব ও নাম প্রভৃতির বিবরণ লালসাঙ্গা যেয়ে জানাবার ইচ্ছা রইল।

আজ আমরা কেদারনাথ ধাম হতে অবতরণ করব। সকলেই শৌচাদি কার্য্য সমাপনান্তে বাসা কাপড়াদি পরিত্যাগ করে (অত ঠাণ্ডায় তখন আর কে স্নান করে?) মন্দাকিনীর জল দ্বারা আচমন করতঃ শুদ্ধ হয়ে বেলা ৭টার সময় শ্রীশ্রীকেদারনাথে দর্শনার্থ বাহির হলাম। আজ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথি। শাস্ত্রে লেখা আছে কৃষ্ণ বা শুক্ল পক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথি যুক্ত সোমবারে কেদারনাথ দর্শন ও স্পর্শন করলে মহাপুণ্য লাভ হয়ে থাকে এবং শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা :—

> শুক্লায়াং বাথ কৃষ্ণায়াং চতুর্দ্দশ্যাং চ যোঽর্চ্চয়েৎ।
> কেদারেশং কমল পুষ্পৈঃ শিবলোকং প্রয়াতি সঃ॥
> সোমবারেহর্চ্চয়েন্তো যে পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করম্।
> তে লভন্ত্যক্ষয়াল্লোঁকান্ পুনরাবৃত্তি দুর্ল্লভান্॥

যে ব্যক্তি শুক্লা বা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে কেদারনাথকে কমল পুষ্প দ্বারা পূজা করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন এবং যে যাত্রী পার্ব্বতীর সহিত কেদার-নাথকে সোমবার দিন বিল্বপত্র, কমল পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন, সে ব্যক্তি জন্ম-মরণ-চক্র হতে মুক্তি লাভ করে দিব্য লোকে গমন করে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার কথা যখনই মনে হয়, তখনই চিত্ত ভক্তি ভরে নত হয়ে পড়ে এবং তাঁর দয়ার কথা মনেঃ হয়ে, না জানি কি এক দিব্য ভাবের উদয় হয়ে থাকে। তাঁর অহৈতুকী কৃপা না হলে এমন তিথি বার সংযুক্ত শুভ দিনে কেনই বা আমরা এমন পবিত্রতম তীর্থে উপস্থিত হতে পারব? আমরা ধন্য যে তাঁর শ্রীচরণ তলে আশ্রয় নেবার পর তিনি আমাদের অজ্ঞাতে শাস্ত্রানুমোদিত শুভ দিনে আমাদের নানারূপে মুক্তির পথে আকর্ষণ করছেন! নতুবা আজ যে সোমবার এবং কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী এতো আমরা জানতাম না। অধিকন্তু এসব দিনে শিবকে পূজা করলে মহাপুণ্য তথা মুক্তি লাভ হয়, তাও জানতাম না। অথচ কেমন সুন্দর উপায়ে তিনি আমাদের যেন কোলে করে এনে শুভ মুহূর্ত্তে কেদারের চরণে পুষ্পরূপে

অর্পণ করে আমাদের ধন্য করে দিলেন। সদ্‌গুরুর কৃপা এমনই ভাবে অজ্ঞাতে সদাই শিষ্যকে মঙ্গলের পথে আকর্ষণ করে থাকে। ধন্য গুরুদেব! তুমিই ধন্য! এবং আমরা তোমার শ্রীচরণ কমলে আশ্রয় নিয়ে তোমারই পুষ্পরূপে বিরাজিত থেকে, আজ নিজেকে ধন্য বলে মনে করে কতই না আনন্দ লাভ করছি! তাইত না জানি কেন হৃদয়কন্দর হতে অহরহ এ সুমধুর গানটী বের হয়ে আসে—আকুল হয়ে গাইও বটে! শান্তিও পাই!

ইচ্ছা হয় ফুলের মত লুটিয়ে পড়ি রাঙ্গা পায়ে।
বাসনা পুরাও মা শ্যামা থাকবো মা তোর পা সাজায়ে॥
লুটে ফুল চরণে ত মন প্রাণ হয় মা বিভোর।
জানিনা মা কোন সাধনে কুসুম হব তব পায়ে॥

তোমায় যে ঠাকুর, মা বলে ডাকতেই আনন্দ লাগে। তাই সদা তোমায় মা বলেই ডেকে থাকি। যেমন করে মাতৃস্নেহে সঞ্জীবিত করে এতদিন তিলে তিলে সারা অশান্তি নাশ করে কোলে তুলে নিয়েছ, শ্রীশ্রীচরণ কমলে সদাই প্রার্থনা, মহাপাতক করলেও যেন তোমার স্নেহময় কোল হতে মুহূর্ত্তের তরেও বিচ্যুত হয়ে না পড়ি এবং যতদিন নশ্বর শরীরে বাস করব, ততদিন যেন তোমারই জয়গাথা গেয়ে গেয়ে তোমাকেই প্রচার করে ধন্য হয়ে যাই।

* *

আজও খুব নির্ব্বিঘ্নে অতি আনন্দের সহিত শ্রীশ্রীকেদারনাথকে দর্শন, স্পর্শন, প্রণাম, প্রদক্ষিণ করে তাঁর নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হয়ে তথা বিদায় নিয়ে ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। খানকয়েক বাসী পুরী ছিল, তদ্বারা উদরের তৃপ্তি সাধন করতঃ বের হব, এমন সময় পাণ্ডা মহারাজ এসে হাজির হলেন। উমাশঙ্কর গিরিজাশঙ্করের ছেলে আমাদের পাণ্ডা। লোকটি বেশ শিক্ষিত বলে মনে হল বটে! এবং বেশ ভদ্র বেশধারী হলেও কিন্তু সুফলের জন্য যেরূপ তার যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম এরূপ যন্ত্রণা আর একবার মাত্র গয়াতে ভোগ করতে হয়েছিল। পাণ্ডার চাহিদা খুব বেশী! ধর্ম্মশালা বানিয়ে তাকে দান কর! একে ত আমাদের রুটী জোটে না, তার উপর আবার ধর্ম্মশালা? হাসবো কি কাঁদবো ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই; যে ভদ্রলোক পাঁচ ছয় হাজার টাকা ব্যয় করে এই ধর্ম্মশালাটি (যে ধর্ম্মশালায় আছি) বানিয়ে তাদের দান করে অক্ষয় পুণ্য লাভ করেছেন, তাঁদের কিন্তু ঐ পাণ্ডা-পুত্ররূপী নব যুবকটী "শালা" বলে গাল দিয়ে উঠলো। বললো —"পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ধর্ম্মশালা বানায়ে দেবার শক্তি আছে, তা না দিয়ে শালারা এই সামান্য পাঁচ ছয় হাজার টাকা দিয়ে এই ধর্ম্মশালা তৈরী করে দিয়েছে।"

একরাত্রি পাণ্ডার আস্তানায় বাস করে পাঁচ ছয় হাজার টাকার একটি বাড়ী তৈরী করে দিয়েও যদি তারা পাণ্ডার "শালা" হতে পারে, তা হলে আমাদের কোন্ উপাধিতে ভূষিত হওয়া উচিত বিবেচনা করুন! এমন সুন্দর এদের ব্যবহার!! সুফল যে কি জিনিষ তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না। যিনি সুফল দানের মালিক তার ত ঐরূপ দুরবস্থা! তিনি নিজেইত টাকার জন্য অতি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করছেন (যদিও বা তার অভাব নাই মোটেই!) নিজেইত নানাপ্রকার অসৎ ব্যবহার তথা অসৎ উপায় করে নরকের পথ পরিষ্কার করে নিজেই তাতে যাবার ব্যবস্থা কচ্ছেন; —(পৌঁছে গেছেন বল্‌লেও চলে!) তাঁর কাছে সুফল নিলে যে আমাদের কোন্ সদ্‌গতি লাভ হবে বুঝতে পারি না মোটেই। তাঁর ব্যবহারে মনটি বিদ্রোহিতা ঘোষণা করে দিল, তাকে স্পষ্টাক্ষরে বল্‌লাম—"আমরা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, সদ্‌গুরুর শিষ্য! তোমার সুফলের আশায় তোমার কাছে আসি নাই। একদিন তোমার

বাড়ীতে ছিলাম এবং একদিন যৎসামান্য আমাদের সেবা করেছ, সুতরাং তারই মজুরী বাবদ বড় মা এই পাঁচটী, সারদা ভায়া দুটী, আমি দুটী, হরিদাস ভায়া দুটী, চিদানন্দ দাদা দুটী, মোট তেরটী টাকা দিচ্ছি, ইচ্ছা হয় নেও, না হয় বসে বসে "হিংসা" "হিংসা" জপ কর। আমরা ত চললাম।

আমরা ঐরূপ বলে যখন রওনা হয়েছি, তখন বেগতিক দেখে আবোল তাবোল কতকগুলি কি আওড়িয়ে অগত্যা সুফল দান করলো। আমার মনে হয় টাকা দিবার যাদের সামর্থ্য আছে, তারা অনর্থক পাণ্ডাদের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে "শালা" উপাধিতে ভূষিত না হয়ে, যদি দাতব্য চিকিৎসালয় হাসপাতাল বা গরীব লোকের উপকারার্থে সে টাকা সদ্‌ভাবে ব্যয় করেন, বোধহয় শঙ্কর তাতেই বেশী সন্তুষ্ট হবেন। গরীব লোকের প্রতি যে তারা কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করে, তাহা ত নিজে দেখতে পেয়েছি। একটী সত্য নমুনাও দিচ্ছি। —আমরা চলে আসার সময় পাগলীমার দল তথা বৃন্দাবনে মাতাজীদের দল তখনও সেই ধর্ম্মশালায় বসে (তারাও শক্তি অনুসারে পাণ্ডাকে কিছু কিছু দান করেছিল, তা সত্বেও) বাসী রুটীগুলির সপিণ্ডীকরণ কচ্ছিলেন, হয়ত ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই তারাও চলে আসবেন। কিন্তু আমরা বেশী টাকা না দেওয়ার জন্য, তথা তারাও বিশেষ কিছু দিতে পারে নাই বলে, তাদের সেই অর্দ্ধ খাওয়া অবস্থাতেই জোর করে বের করে দিয়েছিল, এমন কি সেই পাতের রুটীগুলি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল! তারা যে কত কষ্ট করে এই দুর্গম তীর্থে আমাদের সঙ্গে চলেছে, ভিক্ষার দ্বারা কত কষ্টে উদর পূরণ করছে, একদিন রুটী বানায়ে শুধু সেই বাসী রুটী দ্বারা কতকষ্টে পরের দিনও উদর পূর্ণ কচ্ছিল, তাদের সেই মুখের গ্রাস, অত কষ্টের রুটী ফেলে দিলে! জানি না সংসারে এমন কেউ আছেন কি না, যার প্রাণে ঐ ব্যবহারে ব্যথা লাগে না? অতুল পরাক্রমী, মহা তেজস্বী, জগৎ বিখ্যাত মহারাণা প্রতাপ সিংহকেও একদিন সামান্য ঘাসের রুটীর জন্য শির নত করতে বাধ্য করেছিল। সহৃদয় পাঠকগণ! একবার ভালরূপ বিবেচনা করে দেখুন পাণ্ডাদের কেমন সদয় ব্যবহার! পাণ্ডার বরাত ভাল যে সে সময় আমরা কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, নীচে চলে এসেছিলাম, নতুবা—বোধহয় ঐরূপ নৃশংস অত্যাচারের সময় আমরা সেখানে উপস্থিত থাকলে হয়ত পাণ্ডাকে আর কাকেও দ্বিতীয়বার সুফল দিতে হত না! যারা জন্ম জন্মান্তর ভরে কেদারনাথে বাস করেও নিজেরা সুফল প্রাপ্ত হয় নি, তারা আবার অন্যকে কি সুফল দিবে? তারা যদি সুফলই পেত, তাহলে অন্যের প্রতি ঐরূপ অত্যাচার করতে ধাবিত হত না, তথা অত বুভুক্ষুতা প্রকাশ করতো না। বৎসরে এদের ২০।২৫ হাজার টাকা আয় হলেও এদের ক্ষুধা কেন যে মিটে না, শঙ্করই জানেন! —এরা এমনই অতি লোভী, এদের অত্যাচারের কথা কি আর লিখবো, বড়লোক যাঁরা তীর্থে যান, তাঁরা সুফলের আশায় এমনই অন্ধ হয়ে যান যে, নিজের সামনে এমন কি নিজের উপর এরূপ ঘোর অত্যাচার দেখেও চোখ বুজে থেকে নিজকে মুক্ত মনে করেন। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের আইন ত তা নয়! হিন্দুশাস্ত্র বলে—যদি কোন লোককে অন্যায় কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা যায়, তা হলে ঐ অন্যায় কাজের অর্দ্ধেক পাপ তার হবে—যিনি উৎসাহিত করেন, যে লোকের সামনে অত্যাচার হয়, তিনি দেখে শুনেও যদি বাধা না দেন, তাহলে তাকেও সিকি ভাগ ফল ভোগ করতে হবে। বাকী সিকি ভাগ যিনি অত্যাচার করেন, তিনি

ভোগ করেন। সুতরাং এরূপ অত্যাচার দেখেও যারা চোখ বুজে থেকে নিজকে মুক্ত মনে করেন, তারা একবার শেষ রাত্রে স্থির চিত্তে ভেবে দেখবেন, তাদের কতটা ফল ভোগ করতে হবে। যদি সত্য কথা বললে কারও গায়ে না বাজে ত বলব—তারাইত পাণ্ডাদের এমনি ভাবে হাজার হাজার টাকা দান করে, তাদের লোভী করে তুলেছেন, যার ফলে পাণ্ডারা গরীব যাত্রীদের সঙ্গে অত খারাপ ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং স্থির চিত্তে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, পাণ্ডাদের ঐরূপ লোভী হৃদয়হীন, তথা অত্যাচারী করবার মালিক-তথা-কথিত বড়লোকগণ! দেশবাসী বা যাত্রীগণ যেন আমার বক্তব্যটি উপেক্ষা না করে দয়া করে একবার এ বিষয়ের বিচার করেন—এই আমার বিশেষ বিনীত নিবেদন তাঁদের নিকট।

আমরা ফিরবার সময় অনেকবার ফিরে ফিরে শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দিরাদি দর্শন ও প্রণাম করতে লাগলাম। যদিও শ্রীশ্রীকেদারনাথকে ছেড়ে চলেছি, পা যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল, সে যেন আর এ পবিত্রধাম ত্যাগ করে যেতে নারাজ! কেদারনাথের মাহাত্ম্যাদি পূর্বে যদি এমন ভাবে জানতাম, (আজকাল শাস্ত্র পড়ে যেমন ভাবে জানছি) তাহলে ১৫।১৬ দিন অপেক্ষা করে ভালরূপ ভাবে দেখে শুনে আসতাম। এখন প্রাণে বড়ই যাতনা হয়; মনে হয়, আবার যেয়ে সেখানে দুই এক মাস বাস করে প্রকৃতির লীলা নিকেতনের সুমধুর চিত্রগুলি মহান ভাবে হৃদয়ে ধারণ করে, বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বের বৈচিত্র্যতায় মগ্ন হয়ে যাই। ঠাকুর কি আবার তেমন সুযোগ দিবেন, যেদিন আবার যেয়ে সেস্থানে বাস করে জীবন ধন্য জ্ঞান করতে পারবো!

দেব দর্শন ১ মাইল

আমরা শ্রীশ্রীকেদারনাথের ধাম হতে বের হয়ে অতি মন্থর গতিতে চলে এক মাইল আসার পর **দেব দর্শন** নামীয় স্থানে দাঁড়ায়ে, বোধ হয় জীবনের শেষ কেদারনাথধামকে দেখে নিলাম, তথা প্রণাম করে বিষাদযুক্ত চিত্তে আরও ২½

রামবাড়া ২। মাইল

মাইল এসে **রামবাড়া** চটী পেলাম। রামবাড়া চটী হতে বাবা কালী কম্বলীবালার সদাব্রত নিলাম। যাবার সময় নেই নি, কাজেই যাবার আসবার দুইবারের সদাব্রত তথা গৌরীকুণ্ডের একবারের সদাব্রত (আসার সময় গৌরীকুণ্ড হতে নিবার নিয়ম, কিন্তু এবার গৌরীকুণ্ডে না দিয়ে এখান হতেই গৌরীকুণ্ডের সদাব্রত দিচ্ছে) মোট তিনটী সদাব্রত লয়ে আবার তখনই বের হয়ে পড়লাম. এখন ক্রমশঃ উৎরাই পথ। উৎরাই পথে আমরা খুব জোরে চলতে পারলেও কিন্তু আজ খুব মন্থর গতিতে চলেছি। মনে বল নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই. কি যেন কি এক অব্যক্ত বেদনা হৃদয়ে উদয় হয়ে আমাদের শক্তিহীন করে তুলছিল, তাই আজ আর চলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না—তবুও চলতে হবে। ধীরে ধীরে আধ মাইল উৎরাই করে **ভীমসেন শিলা** দর্শন করে, তার কাছে

ভীমসেন শিলা ॥ মাইল

প্রার্থনা করে আবার চলতে লাগলাম। সোয়া মাইল পথ অতিক্রম করে আবার **স্বর্গ লছমী** চটীতে পৌছলাম। এই স্থানে আমরা

স্বর্গ লছমী ১। মাইল

আমাদের সঙ্গীয় অনেক জিনিষাদি রেখে গিয়েছিলাম। দোকানদারটী লোক ভাল এবং স্থানটি অতি নির্জ্জন বিধায় আজ এখানেই থাকা স্থির করলাম। মনও চলছিল না, বিশেষতঃ পাগলী মায়ের দল তথা বৃন্দাবনের বৃদ্ধ মাতাজীদের দল এসে জোটে নাই। তাদের জন্যই অপেক্ষা করতে

হল, বরাবরই তাদের জন্য অপেক্ষা করতাম, তথা তাদের অতি যত্নের সহিত নিয়ে চলতাম। বৃন্দাবনের একজন বৃদ্ধা মাতাজী, বয়স ৬০ পেরিয়ে গেছে, নামবার সময় পা হড়কে পড়ে যেয়ে হাঁটুতে খুব আঘাত পাওয়াতে তার জন্য এখানে অপেক্ষা করতে হল। তার উপর আবার বড় মা কাল হতে পুত্রের জন্য পাগলের মত হয়ে সদাই 'হায়' 'হায়' করছেন, সেই দুঃখে তার জ্বরও হয়েছে। কাজেই এই স্থানে বেলা ১২টার পূর্ব্বে এলেও নানা কারণে এখানে থাকতে বাধ্য হলাম। আজ মাত্র পাঁচ মাইল পথ এসেছি। পথ সমস্তই উৎরাই শোনপ্রয়াগ পর্য্যন্ত। এইরূপ উৎরাই পথে আমারা রোজ ২০ মাইল চলতে পারি নটে। রাতে এখানে খুব শীত লেগেছিল। (ক্রমশঃ)

বর্ষ বিদায়

বিদায় আজিকে বন্ধু! অকুণ্ঠিত মনে
চলিলাম সঁপিবারে এ ক্ষুদ্র জীবনে
মহা অধিষ্ঠানে—মহাকাল যার নাম।
অনন্ত সমুদ্র মাঝে বুদ্বুদ সমান
যার কোলে ফুটে ওঠে নব বর্ষ কত
নিমেষে বিলয় পুনঃ হয় শত শত,
চলিনু ফিরিয়া সেই অব্যক্ত কারণে
সুখ দুঃখ স্মৃতি রাশি বহি সঙ্গোপনে,
আভরণ করি অঙ্গে কত তপ্ত শ্বাস,
বিরহীর ব্যথাতুর মর্ম্মের উচ্ছ্বাস।
চাহিনাই কারো পানে মমতার চোখে,
সব দ্বন্দ্ব সয়ে গেছি অচঞ্চল বুকে
থাকি নির্ব্বিকার; অনন্তের অক্ষয় ফলকে
অঙ্কিত রহিল সব সোণার অলকে।

*

যদি পেয়ে থাক ব্যথা মম বর্ত্তমানে
হে অনন্ত পথ যাত্রি! ভুলে যেয়ো ক্ষণে
সে সব অতীত কথা। ভুলে যেয়ো সবি,
কি কাজ রাখিয়া বল বেদনার ছবি
অন্তরের মাঝে? অন্তর করিয়া তারে
আশার আলোকে পূর্ণ করি রিক্ততারে
চল বীর কর্ম্ম মাঝে;—পূর্ণ কর হৃদি
অদম্য উদ্যমোৎসাহে। আর "সত্য" যদি
পেয়ে থাক কোন দিন কোন শুভক্ষণে,
রেখো তারে সাথী রূপে জীবনে মরণে
মহা রসায়ন সম; যদি বিফলতা
আনে তব চিতে কভু বিঘ্ন চঞ্চলতা,
স্মরণ করিও সেই অতীতের স্মৃতি
অব্যাকুল একাগ্র অন্তরে; ভরসার গীতি
বাজিবে জীবন-কুঞ্জে, পাবে নব বল,
জীবনের মহাপথে এইতো সম্বল!

*

আজি এই সন্ধিক্ষণে বিদায়ের বেলা,
কি আর কহিব বন্ধু! সবি ধূলো খেলা,
দু'দিনের আসা যাওয়া সার; তারি মাঝে
কত আশা ফুটে ওঠে নব নব সাজে।
মরু মরীচিকা ভ্রান্ত মৃগ সম কত
প্রধাবিত তারি প্রতি; কোথায় শাশ্বত
কে করে সন্ধান তার? অনিত্যেরই পানে
ছুটিয়া চলেছে সবে চঞ্চল চরণে।

*

অতীতের অভিজ্ঞতা অনিত্যের কঠোর আঘাত
সত্যের বিমল জ্যোতি করুক সম্পাত
সবাকার হৃদে; দূরে যাক্ কলুষ কালিমা,
হোক্ চির বিদূরিত অশান্তি-ম্লানিমা
শান্তির পরশে। আজি বিদায়ের ক্ষণে
ভরিলাম বিশ্বপ্রাণ এ আশীর্ব্বচনে।
চঞ্চলতা আসে যদি করিও স্মরণ,
বিদায় বিদায় তবে বিদায় এখন।

বর্ষশেষে

অতীতের অসহনীয় গ্লানি, মর্ম্মন্তুদ বেদনা, সবকে ভুলিয়া গিয়া ভবিষ্যতের আশার সমুজ্জ্বল প্রেরণাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে হইবে আমাদের,—ভোলানাথের পূজায় বর্ষশেষে এই আশীর্ব্বাণীই পাইয়াছি। অতীতের কথা অতীতেই লীন হইয়া থাকুক, অতীত হইতে গ্রহণ করিব আমরা তাহাই, যাহাতে নববর্ষের কর্ম্মোদ্যমের পথে আমরা বল পাই, আনন্দ পাই, দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে শক্তির অব্যর্থ ক্রিয়া অনুভব করিতে পারি। কাজেই অতীতের স্মৃতির মাঝে গ্রহণ-বর্জ্জন উভয়ই করিতে হইবে। অত্যাচার, অশান্তি, উপদ্রব নিঃশেষে কোন সময়ই অপসারিত হইয়া যায় না, প্রাণে বল সঞ্চার করিয়া এই সঙ্কট কালেও দুর্গম পথ দিয়াই সত্যলাভের যাত্রীকে যাত্রাপথে অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে হয়। বাহিরের বাধায়, বাহিরের আঘাতে, আমাদের উৎসাহ আনন্দের আবেগ হঠাৎ যেন রুদ্ধ হইয়া যায়, তাই সাময়িক আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্যম অবনমিত হইয়া আসে, কিন্তু এই আঘাতে আবার আর একদিক দিয়া আমাদের শক্তি-জাগরণও আরম্ভ হয়। সেই আত্মিক শক্তির অমোঘ প্রভাবে বাহিরের বাধা বিঘ্নকে আমরা অক্লেশে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি। সমগ্র বর্ষের কথা মনের মাঝে আলোড়িত করিয়া তুলিলে একদিকে মূহ্যমান হইয়া যাইতে হয়, কিন্তু শত বাধা বিঘ্ন-অত্যাচার-উপদ্রবের মাঝেও অখণ্ড ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কি করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত হইতে পারে— অনেক আদর্শ মহামানবের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রাণ উদ্বুদ্ধই হইয়া উঠে। প্রাণশক্তি যাহাদের লোপ পায় নাই, বাধা বিঘ্নের মাঝেও তাহাদের প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। বরঞ্চ বাহিরের বাধায় প্রাণের একাগ্র শক্তি তখন এক লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া সুস্পষ্ট ভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আদর্শ মহামানবের আহ্বানে যে আমরা স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া এক হইবার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিতেছি, ইহাই ক্রমোন্নতির লক্ষণ। এখনো কিন্তু আমাদের সিদ্ধির অনেক বাকী, তাই আশু ফল লাভের আশায় সাধনা ছাড়িয়া দিলে আমাদের সেই দুর্গতিই ভোগ করিতে হইবে। শত শত মানবের আজীবন সাধনার শক্তিতেই প্রকৃত সত্যের বিকাশ হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা কলঙ্কিত নয় বলিয়াই সেই সত্যই হইবে সকলের আদর্শ!

* *

সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত উত্তেজনার আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন মিটিয়া গেলে তাহার প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হয়। বিচার বিবেচনা শূন্য এই অন্ধ উত্তেজনার ফলে অনেক জাতিই নিঃশেষে তাহাদের অস্তিত্বকে নিজেই লোপ করিয়াছে। কাজেই উত্তেজনার পথ আমাদের লক্ষ্য নহে। তিল তিল সাধনা দ্বারা আমরা যে অব্যাহত শক্তি অর্জ্জন করিব, তাহারই সুষ্ঠু প্রয়োগে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। উত্তেজনা দ্বারা জাতি গঠন হয় না, আর গঠিত হইলেও তাহাদের মেরুদণ্ড দুর্ব্বলতা বশতঃ অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। জাতি গঠনের মূলে ব্যক্তিগত সাধনার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই বিশেষ কথাটী ভুলিয়া যাই বলিয়াই উন্নতির পথে আমরা এত কম অগ্রসর হইতেছি।

* *

শক্তির আতিশয্যে এবং তাহার সুষ্ঠু বিকাশের পথ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া মাঝে কেহ কেহ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাহিত্যকে, রাষ্ট্রকে সনাতন ধর্ম্মের প্রকোষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার দরুণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তেজনার অবসানে তাঁহারা নিজেদের ভুল

ধরিতে পারিয়াছেন। ধর্ম্মবিহীন সাহিত্যের, ধর্ম্ম বিহীন রাষ্ট্রের যে কোন মূল্যই নাই, তাহা ক্রমশই উপলব্ধির মাঝে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। অন্য দেশে ধর্ম্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা যাহাই হউক, আমাদের এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সংজ্ঞা আরও প্রশস্ত। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া ভারতে রাষ্ট্র সাহিত্য কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। কাজেই আমাদের স্বভাবকে অবহেলা করিয়া আমরা যে পথকেই আদর্শ বলিয়া ধরি না কেন, তাহাতে আশু ভাল ফল দেখাইলেও, ক্রমশঃই তাহার দৈন্য প্রকাশ পাইতে থাকিবে। অন্য দেশের আদর্শ অনেক সময় আমাদের মনের জড়তাকে বিদূরিত করিবার সাহায্য করে বটে, কিন্তু আমাদের প্রকৃতিগত ধাতুগত বিষয়কে অবজ্ঞা করিয়া চলিলে মরণের পথকেই আমরা নিষ্কণ্টক করিয়া তুলিব। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া অন্য দেশ বড় হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা ধর্ম্ম ছাড়া কিছুতেই উন্নত হইতে পারিব না। অবশ্য ধর্ম্মের মাঝে অনেক আবর্জ্জনা বা গ্লানি সঞ্চিত হইতে পারে এবং তাহা হইয়াছেও, সুতরাং স্থল বুঝিয়া সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ধর্ম্মকে একদম উড়াইয়া দেবার আসুরিক প্রবৃত্তি গজাইয়া উঠিলে সেটা বড় শুভলক্ষণ নয়।

* *

ব্যক্তিগত সাধনার শক্তিতে অনেক মহাপুরুষই জগৎকে হঠাৎ অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু সমষ্টির সাধন-শক্তির অভাবে প্রায়ই দেখা যায় মহাপুরুষদের অন্তর্ধানে হঠাৎ আবার জগৎ অনেক খানি পিছাইয়াও পড়িয়াছে। এইজন্যই তপস্যা দ্বারা, সংযম দ্বারা অক্ষত বীর্য্যশালী হইতে না পারিলে দেশের সুদিন কখনো ফিরিয়া আসিবে না। ক্ষেত্র প্রস্তুত নাই বলিয়াই অনেক মহান্ আদর্শের বীজ ব্যর্থ হইয়া যায়। ধর্ম্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই সাধনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আর সেই সাধনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাধনা হওয়া চাই, তবেই একটা জাতি আদর্শ জাতিতে পরিণত হইতে পারে। তখন তাহাদের মাঝে জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে, বুদ্ধিতে কোথায়ও দৈন্য দেখা যায় না। অটুট বীর্য্যশালী হইতে না পারিলে ধৃতি শক্তি আসে না। এই ধারণাশক্তিরই সব চেয়ে প্রয়োজন বেশী। অনেক মহামানবের আদর্শ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া যায় শুধু আন্দোলনের সহযোগীদের বীর্য্যের অভাবে, চিত্তের মালিন্যের হেতু। একটা ভাবকে, একটা আন্দোলনকে স্থায়ী করিতে হইলে প্রত্যেককে সাধনসম্পন্ন হইতে হয়। হুজুগী আন্দোলনে যোগই দেয় মাত্র, কিন্তু আন্দোলনকে স্থায়ী করিতে পারে না। এইজন্যই যে কোন মহান্ আদর্শকে রূপ দিতে হইলে সর্ব্বত্যাগী, নিরভিমানী, কষ্টসহিষ্ণু সাধকের প্রয়োজন। তাহাদের জীবন তিলে তিলে গঠিত হওয়া চাই।

* *

একটা কথা আছে, "তর্ক কর, কিন্তু কুতর্ক করিও না! তেমনি শিক্ষা ভাল, কিন্তু কুশিক্ষা ভাল নহে। শিক্ষার প্রভাবে যদি আমাদের জীবন হইতে দৈবী গুণ গুলির ক্রমশঃ বিলোপ সাধন হইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই শিক্ষার মূলে কোথাও না কোথাও গলদ রহিয়াছে। দৈবী গুণ বলিতে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, নিষ্ঠা এই সবকেই বুঝায়। কাজেই শিক্ষার ফলে যদি আমরা কেবলই সংশয়প্রবণ হইয়া উঠি, এবং উক্ত স্বাভাবিক গুণগুলিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখি, তাহা হইলে সে শিক্ষায় আমাদের কোন হিত হইবে না। জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তির সংযোগ না হইলে, তাহা কেবল বুদ্ধি বৃত্তিকেই পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু নিছক বুদ্ধির

পরিতৃপ্তিতে তো আদর্শ-জীবন লাভ করা যায় না। অশিক্ষিতেরা শিক্ষার আলোক না পাইলেও শিক্ষার যাহা লক্ষ্য, তাহা তাহাদের জীবনে সজীব এবং মূর্ত্ত! তবে তাহাদের মাঝে অনেক জায়গায় কুসংস্কার রহিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিতে হইবে বৈ কি? কিন্তু শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা হৃদয়হীন হইয়া উঠি, যে-গুণগুলি থাকিলে মানুষ দেবতাপদবাচ্য হয় তাহা বিসর্জ্জন দিই, তাহা হইলে সেই শিক্ষায় ফল কি? বুদ্ধি-বিশারদ প্রকৃত মানুষ নহে, যাহাদের মাঝে দৈবীগুণগুলি বর্ত্তমান তাহারাই প্রকৃত মানুষ। শিক্ষার আলোক পাইয়া যদি আমরা মনুষ্যত্ব লাভে যত্নপর না হই, তাহা হইলে সেই শিক্ষা যে সফলই হইল না!

* *

আক্রোশ বা বিদ্বেষভাব প্রণোদিত হইয়া সংস্কারকার্য্য করা যায় না। এইজন্যই সকলকে অবজ্ঞা করিয়া যাহার প্রতিষ্ঠা, পরিশেষে সকলেই বিরোধী হইয়া তাহার প্রতিষ্ঠার আসনকে ধূলিসাৎ করে। সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়া অনেকেই সামঞ্জস্যের সূত্রকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসেন। ইহা কিন্তু প্রকৃত সংস্কারের পন্থা নয়। এই জন্যই দেখি অনেকেই নিজকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া বিঘোষিত করিয়া শেষে নিজেরা আবার এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া বসেন। স্তরভেদে এবং অধিকারীভেদে সকলেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ভারতে সর্ব্বত্রই সামঞ্জস্যের সুরকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করা হইয়াছে, এইজন্যই ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকোপসনার প্রবর্ত্তনও রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে রামানুজাচার্য্যের অশেষ কল্যাণগুণ সম্পন্ন ঈশ্বরের যোগ হইয়াছে। বেদের এক অংশকে চরম মনে করিয়া অন্য অংশকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সংহিতা, উপনিষদ, সবকে মিলাইয়া তবেই সমগ্র বেদের পরিপূর্ণতা।

তৌষ্টিকতার চেয়ে অসন্তুষ্টি বা অতৃপ্তি শতগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু নিছক অসন্তুষ্টি বা অতৃপ্তির আগুণে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরাটাই আদর্শ নয়। এইজন্যই নিজের যতখানি শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে প্রয়োজনে খাটাইবার প্রচেষ্টা থাকা চাই— ইহাকেই বলে নিষ্ঠা! অনেক সময় আমরা ঘরের সঞ্চিত ধনকে উপেক্ষা করিয়া সাধ্যাতীত ধনের দরুণ হাতড়াইয়া মরি। ইহাতে কোন দিকেই কল্যাণ হয় না। জাতি উন্নত হয় এই নিষ্ঠার ফলে। আমাদের অবনতির দরুণ অন্যকে দায়ী না করিয়া নিজেদেরই নিষ্ঠার প্রতি সবিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এখনো নিষ্ঠাসম্পন্ন কয়েকজন মহামানবের প্রভাবেই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জাতির প্রাণে যখন এই নিষ্ঠা জিনিষটীর উদ্ভব হয়, তখনই জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। ইহা নির্ব্যূঢ় সত্য যে, প্রকৃত অধিকারীর মর্য্যাদা কেহই কোন দিন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। বেশী তাড়াহুড়া, বেশী অতৃপ্তি আসিলেই যে আমাদের ইষ্ট সিদ্ধি হইয়া যাইবে তাহার কোন মানে নাই, সর্ব্বত্রই সাধন-নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কাজের চেয়ে উত্তেজনাপ্রবণ হইলে, এই উত্তেজনারূপ দুর্ব্বলতার সাহায্যেই অন্যে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পায়। স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেই সেই উন্নতি স্থায়ী এবং কার্য্যকরী হয়।

সংবাদ ও মন্তব্য

আগামী ২৫শে বৈশাখ হইতে ২৭শে বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অত্রত্য সারস্বত মঠের পঞ্চবিংশ বার্ষিক মহোৎসব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইবে। মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎপরমহংসদেবও এই সময় মঠে অবস্থান করিবেন। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে এই উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

গ্রাহকগণের প্রতি

শ্রীগুরুর মঙ্গলময় অঙ্গুলি সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া "আর্য্যদর্পণের" চতুর্বিংশ বর্ষ সমাপ্ত হইল। বৈশাখ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ ২৫শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। শ্রীগুরুর কৃপায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগের আনুকূল্যে আমরা এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দেশের ও বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আর্য্যদর্পণ যে ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের আদরের সামগ্রী হইয়াছে, ইহা ভগবানেরই কল্যাণময় আশীর্ব্বাদের ফল। নববর্ষের পত্রিকা বৈশাখের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করি।

যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনিঅর্ডার যোগে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। বিশেষতঃ পোষ্টাফিসের নূতন নিয়মানুযায়ী এবার হইতে রেজিষ্ট্রেশন ফি ৵০ আনা স্থলে ৶০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। ১০ই বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১০ই বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে তাঁহাদের কোন ক্ষতিই হয় না, কিন্তু আমাদিগকে নিরর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকাখানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরৎ আসিলে আমাদিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা করি আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।

বিনীত—

কার্য্যাধ্যক্ষ—আর্য্যদর্পণ